সমুদ্রযাত্রা

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

সমুদ্রযাত্রা

॥ এক ॥

মার্টিন লুথার কিংকে

শেষ রাত হলে সমুদ্র অস্পষ্ট—গাঢ় নীল অন্ধকার সামনে এবং নাবিকেরা এখন দীর্ঘ সফরের জন্য ক্লান্ত। ভোর হলে সামনে তীর দেখা যাবে আর আশ্চর্য এক জগতের সন্ধান তখন—নাবিকেরা শেষ রাতের দিকে মাস্তুলের নিচে ডেকের রেলিঙে উল্লাসে ফেটে পড়ছিল। ছোট টিন্ডালের গলা সকলের আগে পাওয়া যাচ্ছে। সে রেলিঙে ভর দিয়ে দেশের নদী-নালাকে স্মরণ করে গান গাইছিল। মাস্তুলের সব আলো ক্রমশ নিভে যাচ্ছিল। কোয়ার্টার মাস্টার সব আলো এক-এক করে নিভিয়ে দিচ্ছে। যারা বারোটা চারটার পরীদার, যারা এইমাত্র ফোকসালে নেমে গেছে এবং ঘুমের জন্য বাংকের কম্বল তোশক ঝাড়ছিল তাদেরও গলা পাওয়া যাচ্ছে। কারও ঘুম আসছে না। বন্দরের জন্য, মাটির জন্য নাবিকদের চোখে ঘুম ছিল না। শুধু এখন প্রপেলারের একটানা শব্দ, স্টীয়ারিং এনজিনের শব্দ এবং ছোট টিন্ডালের কণ্ঠস্বর সমুদ্রের জলে ভেসে যাচ্ছে। সবচেয়ে আশ্চর্য বন্দরের টানে জাহাজের গতি খুব দ্রুত মনে হচ্ছিল। তখন সুমন দেখল, ব্রীজে ছোট মালোম। তিনি যেন ব্রীজে দাঁড়িয়ে দূরবর্তী কোনও সমুদ্রের ছায়ায় সূর্যের আলো দেখতে পাচ্ছেন।

তখন কাপ্তানের পোর্টহোল বন্ধ। কেবিনের দরজা বন্ধ। মনে হচ্ছিল সমুদ্র হাল্কা কুয়াশার ভিতর ডুবে আছে। কোন তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্র নয়। নির্জন এবং নিরাশ্রয়ের মতো সমুদ্র একা একা ভেসে বেড়াচ্ছে। আর এই জাহাজ সমুদ্রের শান্তি ভঙ্গ করে যাচ্ছিল—দূরের আকাশে কিছু অ্যালবাট্রস পাখি, নিচে কিছু ডলফিনের ঝাঁক এবং হয়ত এ-অঞ্চলে তিমি মাছের একদা বাসস্থান ছিল—এখন শূন্য সব—শূন্য আকাশে সুমন শুধু ভেড়ার লোমের মতো কিছু মেঘ দেখতে পেল। কাপ্তান পোর্টহোল খুলছেন না। নাবিকেরা তীর দেখার জন্য যখন রেলিঙে উল্লাসে ফেটে পড়ছিল—যখন সকলে পিছিলে হৈ-চৈ করছে—দীর্ঘদিন সমুদ্র অতিক্রম করার পর বন্দরের জন্য আকুল—তখনও কাপ্তান পড়ে পড়ে কেবিনে ঘুমোচ্ছেন। সুতরাং সুমন মাস্তুলের নিচে বসে জলের ভিতর ভাঙা ভাঙা শব্দ শুনল অথবা কোথাও অদৃশ্য এক ইচ্ছার ভিতর তার বাংলাদেশ এবং পল্লীর গাভী সকলের ডাক, আর এইদিনেই হয়ত ধানেরা সোনালি মাঠে শুয়ে আছে।

সুমন মাস্তুলের নিচে অনেকক্ষণ থেকে বসে আছে। ওর ওয়াচের লোকেরা সিঁড়ি ধরে নেমে গেছে কখন! সে চুপচাপ বসে থাকল। জাহাজ ক্রমশ সমুদ্র অতিক্রম করে মোহনার দিকে এগুচ্ছে। ক্রমশ ওর পেছনের আকাশ আলোকিত হচ্ছিল। আর ক্রমশ তীরের গাছ-গাছালি এবং পাখিদের চেনা যাচ্ছে। নাবিকেরা যে যার জায়গা ছাড়ছিল না। ওরা বসে বসে দেশের গল্প করছিল, বিবিদের গল্প করছিল। ওরা পরস্পর ঠাট্টা মস্করা করার সময়ই দেখল, জাহাজ মোহনা অতিক্রম করে নদীর ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। এবং দ্রুত সব মাঠ ফেলে যাচ্ছে দুপাশে। অথবা দূরে দূরে সব তেলের পিপে, মাঠময় শস্যক্ষেত্র এবং এও হতে পারে বনজ ঘাস—ছোট ছোট কীট-পতঙ্গ হয়ত ঘাসের ভিতর এখন খেলা করছে। সুমন আলস্যে হাই তুলল একটা।

কিছু অপরিচিত পাখি মাস্তুলের উপর এসে বসল। যে সব মাঠ দ্রুত জাহাজের দু পাশে ছড়িয়ে পড়ছে, সেখানে কিছু কুঁড়েঘর জাতীয় ঘর এবং কিছু নিগ্রো পুরুষ রমণী দেখা যাচ্ছে। সুমন বসে বসে সব দেখল। আর এক ওয়াচের পথ। সুমনের হাতে অন্য কোনও কাজ এখন নেই। সে বিশ্রামের ভঙ্গিতে বসে থাকল। জাহাজ বন্দরে লাগলে ওদের ওয়াচ ভেঙে দেওয়া হবে। হাতে প্রচুর সময়, সুতরাং সে আলস্যে মাস্তুলে গা এলিয়ে দেখল সূর্যের আলো সোনার জলের মতো মাস্তুলের ক্রোজনেস্ট ধরে উঠে যাচ্ছে। নাবিকদের জটলা ক্রমশ বাড়ছে। দুদিকে নদীর তীর, মাঠ এবং গ্রাম্য টালির ঘর, নিগ্রো যুবক দাঁড়িয়ে শিস দিচ্ছিল, নিগ্রো যুবতী স্কীপে বসে মাছ ধরছিল এবং মাঠ ধরে চাষের জন্য চাষী মজুরেরা ট্রাক্টর চালাতে চলে যাচ্ছে।

আজ আর সুমনের কোন ওয়াচ থাকছে না। বিকেলে বন্দরে বেরোতে পারবে। সে এ-সময় মনে মনে সুচারু অথবা সামাদকে খুঁজছিল। নাবিকদের জটলার ভিতর সুচারু অথবা সামাদ আছে কি না

একবার উঁকি দিয়ে দেখল। বিকেলে ওরা তিনজন একসঙ্গে বের হবে, সুখ এবং আনন্দ···আর বিস্ময়কর ঘটনা মায়ের মৃত্যুর মতো কোথাও না কোথাও উঁকি দিয়ে থাকবে। সুচারুর হাতে উল্কি এবং অস্পষ্ট ছবি, লিজার মুখ সে ছবির ভিতর সে লুকিয়ে রেখেছে। আর ঠিক বুকের মাঝখানে হৃৎপিণ্ডের পাশ ঘেঁষে উল্কিতে আঁকা নাম—'লিজা'। ওর নিরুদ্দিষ্ট বিস্ময়কর লিজার অনুসন্ধানের জন্য, কোনও মিশনারী অথবা হাসপাতালের ভিতর, গীর্জার ছায়ায়, ওর ভিন্ন ভিন্ন অনুসন্ধান। অথবা লাল সূর্য আফ্রিকার মাঠে, যবদ্বীপের কোন প্রাচীন মন্দির গাত্রে অথবা পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের কোনও ফসফেট কারখানার হাসপাতালে সে বার বার লিজাকে খুঁজেছে। লায়নরক অতিক্রম করে নিউপ্লাইমাউথ বন্দরে এক মাউরী যুবতীর মুখে সে লিজাকে আবিষ্কার করে কিছুদিন পাগলের মতো ছিল। সুমন বসে বসে সুচারুর জন্য কষ্ট পেতে থাকল। সুচারু নিশ্চয়ই ফোকসালে বসে এখন লিজার ছবির উপর উপুড় হয়ে আছে।

এখন ডেকে ডেকে জল মারছে নাবিকেরা। সুতরাং জাহাজময় ডেক নাবিকেরা ছড়িয়ে পড়ছিল। ওরা হাসিল তুলছে অথবা ওয়ারপিন ড্রাম ঘুরিয়ে হাসিল খুলে ফেলছে। কেউ গোলা রঙ নিয়ে জানালাতে নীল রঙ দিচ্ছিল। কেউ পোর্টহোলের কাচ মুছে দিচ্ছে। এবং পোর্টহোলে কাপ্তানের মুখ এবং দূরে তেমনি সব মাঠ—সোনালি ধানের মতো রঙ নিয়ে শুয়ে আছে। মিসিসিপি নদী ধরে জাহাজ এগোচ্ছিল। সামনে ছোট বন্দর। নাবিকেরা দীর্ঘদিন পর মাঠ এবং গ্রাম্যকুটির দুপাশে রেখে যেতে পারছে। ওরা এই বন্দর থেকে সালফার নেবে। খালি জাহাজ। ওরা কার্ডিফে ব্রাজিলের ভিক্টোরিয়া পোর্ট থেকে আনা লোহার আকরিক বের করে দিয়ে, সমুদ্র অতিক্রম করে ক্যারিবিয়ান সমুদ্রের ভেতরে ভেতরে এবং পোর্ট অফ জামাইকার বন্দর বাঁয়ে ফেলে ক্রমশ উপরের দিকে উঠে যাচ্ছিল। সেই কবে কোন্ এক দীর্ঘ যাত্রার প্রাক্কালে ওরা কার্ডিফ বন্দর ছেড়ে এসেছে এবং কত যুগ আগে যেন ঘটনাটা। আটলান্টিকেব ঝড় অথবা সেই বে অফ বিসকের সাইক্লোন এখন আর ওরা মনে করতে পারছে না। মাটির জন্য, নারী এবং সুরার জন্য এই নিকটবর্তী বন্দর ওদের বড় টানছিল।

জাহাজ দ্রুত, দু পাশে মাঠ, পপলার কুঞ্জ এবং উইলো ঝোপ পিছনে ফেলে এগোচ্ছে। গাছের ছায়ার ভিতর লাল নীল কাঠের ঘর এবং উন্নততর জীবনধারণের প্রণালী—কিছু শ্বেতকায় রমণীর মুখ অথবা এখানে কোনও ভাঙা গীর্জা চোখে পডছে না, এখানে নিগ্রো বালিকার আলিঙ্গনে কোনও মোরগের ডাক শোনা যাচ্ছে না, কিছু বাস-ট্রাক চোখে পড়ছিল, কিছু মোটর বোট চোখে পড়ছিল এবং ওরা তীরে দাঁড়িয়ে জাহাজ দেখতে দেখতে গল্প করছে। সব কিছুই দ্রুত দু পাশে রেখে জাহাজ ছুটছে। সুতরাং উইলো ঝোপের পাশে অথবা লাল নীল কাঠের জানলায় সুন্দর সুন্দর মুখগুলো দ্রুত সরে যাচ্ছে। নাবিকেরা ওদের দেখে শিস দিচ্ছিল, বন্দরের জন্য নাবিকদের চোখে যথার্থই ঘুম ছিল না এতদিন। যত বন্দরের কাছে এগোচ্ছে তত নাবিকদের উত্তেজনা বাড়ছে। দু পারের গ্রাম মাঠ পাখি দেখে নাবিকেরা উল্লাসে রঙের টব মেসরুমে বাজাচ্ছে। সুমন মাস্টের নিচ থেকে উঠে পড়ল। কারণ রোদের উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে। সে ডেক ধরে পিছনের দিকে এগুতে থাকল। তখন তীর ধরে কচি-কাঁচা বয়সের যুবক যুবতীরা সাইকেলে কাজে বেরিয়ে পড়েছে। কোথাও মোটরের পাশে শীর্ণ এক রমণী এবং নিচে এক নিগ্রো বালকের মুখ আস্তাবলে বাঁধা ঘোড়ার মতো।

তখন ডেক-সারেঙ, এনজিন-সারেঙ হাঁকল জাহাজীরা মাস্তার লাগাও।

তখন জাহাজের চিমনির ভেতর থেকে কে যেন হেঁকে উঠল, ভয়ানক দাঙ্গা বাঁধবে নিগ্রোদের সঙ্গে।

বড় মালোম বললেন, নিগ্রোরা এবার সাহেবদের মাথায় বোতল ভাঙবে।

শহরময় উত্তেজনা। বড় মালোম সকলকে বলে গেলেন, বন্দরে কোন জাহাজী নামবে না। কাপ্তান যেন কি বই পড়ছিলেন। তিনি চোখ তুলে দেখলেন না। তিনি বোট-ডেকে পায়চারি করতে থাকলেন।

তিনি এক সময় বললেন, শুধু ভারতীয় নাবিকেরা নামবে না। তিনি তারপর তরতর করে সিঁড়ি ধরে ব্রীজে উঠে গেলেন।

বড় মালোম বললেন, এ অঞ্চলে কালোদের প্রতি প্রচণ্ড অবহেলা আছে। তিনি 'ঘৃণা' কথাটা

উচ্চারণ করলেন না। তিনি শুধু বললেন, খুব দুঃখিত সারেঙ। কোন উপায় নেই।

সুমন অত্যন্ত ব্যথিত হল। সুচারু দাঁতে দাঁত চাপল, এবং বলল, শুয়োরের বাচ্চা বড় মালোম। খুব দুঃখিত সারেঙ! সে ব্যঙ্গ করল বড় মালোমকে। সে যেন কি বলতে চাইল গজ গজ করে। কিন্তু সারেঙের মুখ দেখে এবং অন্যান্য নাবিকের সম্মানের জন্য সে কিছু উচ্চারণ করল না। সেও অন্যান্য নাবিকদের সঙ্গে সিঁড়ি ধরে নেমে পিছিলের দিকে হেঁটে যেতে থাকল।

খবরটা ইচ্ছে করলে কাপ্তান আগে দিতে পারতেন। পাইলট আফিসার জাহাজে উঠে নিশ্চয়ই খবর দিয়েছে—বন্দরে ভারতীয় নাবিকদের নামতে দেওয়া হবে না। স্থানীয় আইনে এ-বিষয় সম্পর্কে সবল ভাষায় কিছু লেখা নেই অথবা এমনও হতে পারে দাঙ্গা হোক বা না হোক, কালো মানুষের প্রতি অবজ্ঞার হেতুতে কালো মানুষদের জাহাজ থেকে নামতে দেওয়া হবে না। সুচারু গজ গজ করছিল, সুমন কথা বলতে পারছে না। পাইলট অফিসার সমুদ্রে দড়ির সিঁড়ি বেয়ে জাহাজে উঠেছিলেন, এখন তিনিই পথ দেখিয়ে জাহাজ চালিয়ে নিচ্ছেন—এই পিছিল থেকে ব্রীজে কাপ্তানকে এবং পাইলট অফিসারকে দেখা যাচ্ছে। জাহাজের চার নম্বর মিস্ত্রী বোট-ডেক লাফিয়ে পার হচ্ছে। ওর হাতে স্প্যানার, পকেটে হাতুড়ি চিজেল। সে কোনও উইনচ মেসিনের উদ্দেশে রওনা হয়েছে অথবা দেখে মনে হয় বন্দর দেখে সেও উত্তেজিত, মদের জন্য মেয়ের জন্য হেনরী সারারাত রাস্তায় হন্যে হয়ে ঘুরবে।

জাহাজের অলি-গলিতে সকলে এখন অশ্লীল গান গাইছে। যে উল্লাসে নাবিকেরা ফেটে পড়ছিল এখন তা যন্ত্রণার মতো। জাহাজটা বন্দরে বাঁধা থাকবে দিনের পর দিন—ওরা তীর দেখতে পাবে এবং তীরের সব রমণীদের দেখতে পাবে—বাঘের থাবার মতো ওদের চোখ হন্যে হয়ে কেবল যুবতী খুঁজবে অথচ নামতে পারবে না। হেনরী এসে তীরের গল্প করবে কখনও। ওরা ক্ষুধার্ত, ওরা সেজন্য অশ্লীল গান গাইছিল। বার্চ গাছের ভেতর থেকে ওরা সূর্যের মুখ দেখতে পাচ্ছিল। এবং মনে হচ্ছিল বার্চ গাছগুলো সব শাখা-প্রশাখা দিয়ে তীরকে ঢেকে রাখতে চাইছে। সুতরাং জাহাজীরা সিঁড়ি ধরে ফোকসালে নেমে যেতে থাকল। মাটির স্পর্শের আশায় সুমন এতদিন উৎফুল্ল ছিল, সুচারু এই বন্দরে কোন গীর্জায় অথবা মিশনারী বিদ্যালয়ে তার নিরুদ্দিষ্ট সন্ন্যাসিনীকে আর একবার খুঁজে দেখতে পারবে এবং সামাদ নেশা করে বিবির জন্য নতুন সব খবর নিতে পারবে অথবা কোনও অশ্লীল ছবি (সামাদের এক ধরনের অশ্লীল ছবি সংগ্রহের বাতিক) কিছুই আর গোপন থাকল না—ওরা নামতে পারছে না, ওরা মাটির স্পর্শ পাবে না—এক অপার তৃষ্ণা এই মাটির জন্য। ওদের চারপাশে পাখিরা থাকবে, ঘাসেরা থাকবে এবং রমণীরা ফুল ফোটার মতো বিচরণ করবে। ওরা জাহাজে কয়েদী পুরুষের মতো পল-দণ্ড-প্রহর এবং দিন-মাস-কাল কাটিয়ে বৃদ্ধ বাঘের মতো নিজের থাবা নিজেই চেটে চেটে সুখ পাবে। সুতরাং অশ্লীল সব উচ্চারণ সুমনের মুখেও এসে গেছিল। সে সহসা সেই উচ্চারণের মুখে প্রায় কান্না-কান্না গলায় বলে ফেলল, মা, মাগো।

সুমন আর দেরি করল না। তীর দেখে লাভ নেই, এই সব গ্রাম্য মানুষের মুখ দেখে সুখ নেই। সে স্নান করে চা খেল এবং নিচে সিঁড়ি ধরে নেমে ফোকসালের দরজা বন্ধ করে দিল। মায়েব স্মৃতি মনে পড়ছিল। ডারবান বন্দরে সেই শেষ চিঠি মা'র। এবং পরের চিঠিতে, তখন জাহাজ কেপটাউনে, মায়ের মৃত্যুর খবর এসেছিল। সে পাশ ফিরে শুতেই শুনল দরজায় কে যেন কড়া নাড়ছে। ওর মনে হল সামাদ। সুতরাং সে উঠে দরজা না খুলে বাংকের উপর বুকটা ঠেলে শুয়ে থেকেই দরজাটা টেনে খুলে দিল। দরজা খুলে দেখল সামাদ নয়, জাহাজের চার নম্বর মিস্ত্রি, হেনরী। হেনরীর টোবাকোর পাইপে ধোঁয়া উঠছে। সুমন শুয়ে আছে। হেনরীকে সে কোন প্রশ্ন করল না। প্রশ্ন করলেই যেন কষ্টটা বাড়বে যেন বলবে আমি দুঃখিত সুমন, তোমরা বন্দরে নামতে পারবে না। আমি দুঃখিত। আমরা একসঙ্গে ঘুরতে পারব না, দুঃখিত। অন্য সব বন্দরে বিশেষ করে সেই দুঃসহ চিঠির পর এই হেনরী, সামাদ এবং সুচারুর চেয়েও আপনজনের মতো কাছে থেকে সান্ত্বনা দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে রেখে সব বন্দর, জীবন সম্পর্কে নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করতে সাহায্য করেছে।

সামাদ এবং সুচারু ডেক নাবিক। তাই ওরা এখন উপরে কাজ করছে। সুমন শুয়ে থেকেই বুঝতে পারছে এখন জাহাজ বন্দরে বাঁধা হচ্ছে। ওয়ারপিন ড্রাম থেকে হাসিল খুলে দেওয়া হচ্ছিল এবং মেজ

মালোমের কণ্ঠ ভেসে আসছে। তিনি কখনও বলছেন—হাড়িয়া, কখনও—হাফিজ। তখন হেনরী বলল, আমরা এবার এক সঙ্গে বন্দরে ঘুরতে পারব না সুমন।

সুমন পাশ ফিরে শুল। এবং বলল, হেনরী, আমাদের জাহাজ বন্দরে কতদিন থাকবে? যেন, সুমনের বলার ইচ্ছা—যত সত্বর সম্ভব আমাদের এ বন্দর ছেড়ে যাওয়া দরকার। অথবা বলতে চাইল চারপাশে এত সুখ, আর আমরা রোজ জাহাজের ভিতর কয়েদীর মতো দিন কাটাব···এ আমার ভাল লাগছে না হেনরী, তোমরা রোজ বিকেলে বন্দরে নেমে যাবে, রোজ তোমরা ভিন্ন ভিন্ন সুখে মজে থাকবে···এ আমার ভাল লাগছে না হেনরী। তখন হেনরী বলল, বন্দর ছাড়তে অনেক দেরি হবে। বন্দরের শ্রমিক সম্পর্কে সে কিছু মন্তব্য করল।

হেনরী বলল, কাল থেকে ওরা ধর্মঘট করছে।

সুমন বলল, আমাদের কপাল মন্দ হেনরী।

হেনরী শিস দেবার মতো ঠোঁট কুঁচকে বলল, একা একা খুব ঘুরব। তুমি যেতে পারবে না, দুঃখ হচ্ছে।

সুমনের মনে হল হেনরী বোধ হয় ওকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করছে। সিঁড়িতে তখন ডেক টিন্ডাল হাঁক দিল এবং ইনজিনের পরী ভেঙে দেওয়া হয়েছে বলে পিছিলে জুতোর শব্দ এবং সকলে এখন বিশ্রামের ভঙ্গিতে বসে থাকবে অথবা অদূরে শহর, শহরের গীর্জা এবং কাছের লাল-নীল রঙের ঘর আর বড় বড় অট্টালিকার মতো প্রাসাদ দেখে হয়ত সব জাহাজীরা সমুদ্রের দুঃখ ভুলে যাবে, এই সব ভেবে হেনরী বলল, তোমার শুয়ে থাকতে এখন ভাল লাগছে?

সুমন মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

—বাজে কথা, চল উপরে বসব।

—আমার ভাল লাগছে না হেনরী।

—ভাল না লাগুক, ওঠ, উপরে যাবে। হেনরী এই বলে সুমনের হাত ধরে টেনে তুলল।

সুমন ব্যাজার মুখে বলল, আমার ভাল লাগছে না কিছু।

হেনরী সুচারুর বাংকে ফের বসে পড়ল এবং বলল, মাঠে ছেলেরা বেসবল খেলছে।

—অসময়ে!

—রাস্তায় লোকজন দেখা যাবে। সামনে একটা মেয়েদের স্কুল। আমার পোর্টহোল থেকে সব দেখা যাবে।

সুমন বলল, তাহলে উপরে ওঠা যাক।

বসন্তের দিন বলে সূর্যের আলো তেমন তীক্ষ্ণ নয়। হেনরী আগে আগে সিঁড়ি ধরে উঠে যাচ্ছে। সে দেখল ডেক কসপ, দড়ি, ছোট কাঠের টুকরো এবং রঙের টব নিয়ে স্টোর রুমের দিকে যাচ্ছে। যাবার সময় সেও একবার রেলিঙে ভর করে দাঁড়াল। ছবির মতো মেয়েদের বিদ্যালয় দেখল এবং বড় বড় সব ওক গাছের ছায়া, পিচের মসৃণ পথ এবং বিদ্যালয়ে ফুলের মতো সব কিশোরীদের মুখ দেখে সে নড়তে পারল না।

সুমন বলল, নাইস হেনরী। ছবির মতো শহরটা। এবং এ সময় ওরা দূরে কলের চিমনি দেখতে পেল। শীতের শেষ বেলা। মাঠগুলো ফাঁকা। কার্পাস এবং তামাকের ক্ষেতেও কোন শস্য নেই। নদীর অন্য তীরে সব নিগ্রো চাষীদের গ্রাম এবং পাশে ছোট বড় সব গোলাবাড়ি দেখা যাচ্ছে। আর দুগ্ধবতী গাভীরা মাঠে চড়ে বেড়াচ্ছিল। সমুদ্রের মতো এই মাঠের দৃশ্য এক নয়। ইতস্তত সব তেলের পিপে এবং বসন্তের হলুদ রঙের রোদ মাঠময় ভেসে বেড়াচ্ছিল। ছোট বড় বার্চ গাছ, উইলোর ঝোপ এবং কোথাও কোন পারসিমন গাছের সুমিষ্ট গন্ধ ভেসে আসছে। নিচে জেটি। ক্রেনগুলো দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে। আর সেই এক বিদ্যালয়—যেখানে ফুলের মতো মেয়েরা আসতে শুরু করেছে।

ঠিক তখনই সুচারু পাশে এসে দাঁড়াল। হেনরীকে বলল, সাহেব আমার কথা মনে রাখবে তো?

হেনরী ঠিক ধরতে পারল না। সুতরাং ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল।

—আরে সাহেব, বলে সে তার বুকের বোতাম খুলে বুকের উপর আঁকা নামটা দেখাল। বলল, ওকে তুমি কিন্তু খুঁজবে।

হেনরী এবার হেসে ফেলল। বলল, আচ্ছা আমার মনে থাকবে। আমি লিজার ছবি সযত্নে রেখে দিয়েছি।

সুচারু খুব গাঢ় গলায় বলল, লিজার কথা বললে সবাই তোমরা হেসে ফেল, এটা আমার ভাল লাগে না।

হেনরী বলল, আমি কিন্তু তোমাকে অসম্মান করার জন্য হাসি নি।

সুমন এ সময় হেনরী এবং সুচারুর উভয়ের মুখ দেখল, তারপর সুচারুর দিকে তাকিয়ে বলল, জানিস, হেনরী ওর স্ত্রীকে তোর লিজার কথা লিখেছে।

সুচারু আর কোন কথা বলল না। সিঁড়ি ধরে নেমে গেল ফোকসালে।

সুমন বলল, আমি জানি ওকে তোমরা কোথাও খুঁজে পাবে না।

হেনরী কি ভাবল, পরে অন্য কথায় এসে গেল। বলল, চল আমার কেবিনে। সে হাঁটতে হাঁটতে বলল, সুমন তুমি নতুন জাহাজী, সুচারুকে দেখে তুমি খুব বিস্মিত হচ্ছ!

সুমন বলল, আমরা সবাই কোন না কোন আবেগে ভুগছি।

ওরা কথা বলতে বলতে দু নম্বর ফল্কা অতিক্রম করে গেল। ওরা এলওয়েতে ঢুকে প্রথম ডানদিকের কেবিনে বসে পড়ল। এদিকটা জাহাজের সাহেব অফিসাররা থাকে। কোন সাধারণ জাহাজীর আসা নিষেধ। হেনরী বলল, অন্য যে কোনও জাহাজে তুমি এ-ভাবে অকারণ কোন অফিসারের ঘরে ঢুকে বসতে পারতে না।

—আমি জানি।

সুমন নিজের দুঃখজনক ঘটনার কথা মনে করার আগে কলকাতার বন্দরে জাহাজে ওঠার পর হেনরীর অবয়ব, বিসদৃশ চেহারা, হেনরীর মুখ লম্বা পাঁচের মতো, এ সব মনে করার চেষ্টা করল। সুমন হেনরীকে দেখলেই ভয় পেত। এবং হেনরীর জানা ছিল না—এই অল্প বয়সের নাবিক সুমন; এত অল্প বয়সে যে জাহাজের চিমনির আশে পাশে ঘুর ঘুর করছে, নিচে স্টোকহোলডে নামতে ভয় পাচ্ছিল, হেনরী হেসে বলেছিল, তোমার নাম খোকা! তুমি ভয় পাচ্ছ। অথবা স্টিম কক্ থেকে জল নেবার সময় সল্ট টেস্ট করার সময় এক ভয়ঙ্কর শব্দে যখন সুমন ইঁদুরের মতো ইনজিন রুমে নামতে নামতে ফের সিঁড়ি ধরে ছুটে পালাচ্ছিল, তখন হেনরী না হেসে পারে নি—সে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে হাত ধরেছিল সুমনের এবং টেস্ট কক্ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান দেবার সময় বলেছিল, তোমার নাম? সে মিষ্টি চেহারার জন্য সুমনকে ভালবাসতে চেয়েছিল।

হেনরী বলল, কাপ্তান ব্যাপারটাকে ভাল চোখে প্রথম প্রথম দেখতেন না।

—জানি হেনরী।

—অথচ দেখ সব ঠিক হয়ে গেল।

সুমন কোন উত্তর দিল না এবার।

—সুতরাং সম্ভব অসম্ভবের কথা না ভেবে এস, আমরা পোর্টহোল দিয়ে মেয়েদের স্কুলটা দেখি। একটু থেমে তারপর হেনরী ফের বলল, আমার মনে হয় সুচারু আজ হোক কাল হোক লিজাকে খুঁজে পাবেই।

সুমন বলল, পেলে খুব ভাল হয় হেনরী। বন্দর এলে ওর মুখ দেখে আমার বড় দুঃখ হয়। সে মদ খায় না, সব পয়সা বাঁচিয়ে ছুটির দিনে যেখানে যত গীর্জা আছে, মিশনারী বিদ্যালয় আছে অথবা হাসপাতাল সর্বত্র সে লিজার খোঁজে পাগলের মতো ঘুরে বেড়ায়।

সুমন এবং হেনরী পোর্টহোল দিয়ে জেটি অতিক্রম করে মেয়েদের স্কুল দেখছিল, বিচিত্র সব পোশাকে মেয়েরা স্কুলের সদর দরজায় ঢুকে যাচ্ছে। ওরা বসে বসে ভিন্ন ভিন্ন মেয়ের সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন উক্তি করছিল। তারপর ওরা দুজনই চুপ। দুজনকেই খুব নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে। দুই পোর্টহোলে দুটো মুখ তখন মুখোসের মতো। এমন কি পাইপের ধোঁয়া কখন নিভে গেছে, কখন মেসরুম-বয় হেনরীর কফি রেখে গেছে এবং কিছু ফল, কিছুই খেয়াল নেই। ওরা পরস্পর কোন কথা না বলে স্কুলের ঘণ্টা পড়তে শুনল এবং সদর দরজা বন্ধ হয়ে গেলে ওরা পোর্টহোল থেকে মুখ তুলে নিল। সুমনকে বড়

বেশি বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। হেনরী নিজের কফি দুভাগ করে বলল, দেখ সুমন কোন দুঃখ রেখ না। তোমার জন্য পারি তো কিছু ফুল আনার চেষ্টা করব।

সুমন বলল, ভাল লাগছে না।

হেনরী পাইপের ছাইটা জলে ফেলে দেবার সময় বলল, স্থানীয় আইন বড় কড়া। নয়ত একটা রিসক্ নেওয়া যেত। দেখ সুমন, বলে হেনরী তিরস্কারের ভঙ্গি টানল মুখে। মুখ গোমরা রাখবে না। সব সময় হাসিখুশি মুখ চাই—কেমন, মনে থাকবে! বলে সুমনের মাথায় হাত রেখে পুরোহিতের মতো বলল, বন্দর থেকে ফিরে সুন্দরী মেয়েদের গল্প বলব। খুশি!

—খুশি! নারী এবং ফুল জীবনে বড় দরকার।

হেনরী বলল, তোমার জন্য আর কি করতে পারি?

সুমন দুহাত ফাঁক করে ইঙ্গিতে দেখাল।

—আচ্ছা হবে।

সুমন ডেকে নেমে দেখল বড় মালোম ফরোয়ার্ড পিক থেকে জাহাজ বেঁধে ফিরছেন। বড় মালোমকে দেখে সুমন মুখ ব্যাজার করে ফেলল। বড় মালোম আমোদপ্রিয় লোক। তিনি চিৎকার করে বললেন, হেল্লো সন লাইক সেলর, শহরের ঘাস মাঠ ফুল দেখে ভাল লাগছে না!

সুমন বড় মালোমের সামনে দাঁড়িয়ে ফের শুধাল, স্যার, আমাদের কি একদিনও অন্তত একবারের জন্যও কিনারায় নামতে দেওয়া হবে না?

বড় মালোম পর্যন্ত মুখ ব্যাজার করে ফেললেন। তিনি দেখলেন সুমনের চোখে এখনও যেন সেই মাতৃ-বিয়োগের চিহ্ন ফুটে আছে। সুতরাং মাঠে মাঠে ফুল ফুটুক এ-কথা তিনি সুমনকে বলতে পারলেন না। অথবা বলতে পারলেন না কোনও মসৃণ পথ ধরে ঘাস ফুল পাখির অরণ্যে তুমি হারিয়ে যাও। মানুষের প্রতি মানুষের এই ঘৃণা, অবহেলা, বড় মালোমকেও ভয়ঙ্কর কষ্ট দিচ্ছে। তিনি যেন মাথা হেঁট করে সুমনের পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। এই মুহূর্তে স্পষ্ট কোন জবাব দিতে পারলেন না সুমনকে।

॥ দুই ॥

সাল ১৯৫৩। এবং সম্ভবত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ দেশগুলোতে তখন কার্পাস অথবা তামাকের চাষ শেষ। গোলায় ফসল উঠে গেছে। তামাকের ফসল আস্তাবলের মতো দীর্ঘ ঘরে ঠাণ্ডায় শুকোতে দেওয়া হচ্ছে এখনও। আপেল এবং বুনো চেরী গাছে এখন বেগুনী রঙের আবছা অন্ধকার। সারাদিনের রোদ গাছগুলোকে, গাছের পাতাগুলোকে কখনও লাল, কখনও হলুদ রঙে রাঙিয়ে তোলে, যেন রঙীন চলচ্চিত্র। আর সম্ভবত সুমন জাহাজে স্ট্রোকারের কাজ করছিল।

যেহেতু ওয়াচ নেই, যেহেতু ইনজিনের নাবিকরা এখন বয়লার সংক্রান্ত নানা কাজে ব্যস্ত এবং এক নাগাড়ে কাজ, সাতটা থেকে চারটা পর্যন্ত। আর সুমনকে চার নম্বর সাব অর্থাৎ হেনরী উইনচ্ মেসিনে হেলপার হিসাবে নিয়ে কাজ করছিল, সুতরাং নানারকমের কথা অর্থাৎ হাসি ঠাট্টা তামাসা চলছিল। সুমনের মায়ের মৃত্যু সংবাদ কেপটাউনে পৌঁছানো মাত্র জাহাজের সকলে, বিশেষ করে অফিসার মহল এই ছোট্ট নাবিকের জন্য বেদনা অনুভব করেছিল। তখন জাহাজে সুমন বড় নিঃসঙ্গ। তখন ওকে সারেঙ ওয়াচে না দিয়ে ফালতু করে দিয়েছে। বড় মালোম থেকে সব অফিসার, সুমনের ছোট্ট ফোকসালে ঢুকে সমবেদনা জানিয়েছে। অন্যান্য জাহাজিরা ফাঁক পেলেই ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্য ব্যস্ত থাকত। এবং অন্যমনস্ক রাখার চেষ্টা করত। আর এভাবেই চার নম্বর মিস্ত্রী হেনরী, সুমনের সমবয়সীর মতো অথবা কখনও ঠাট্টা তামাসা, কখনও একসঙ্গে বন্দরে ঘুরে বেড়ানো, কেনাকাটা করা—মোট কথা বয়সের ব্যবধান দুজনকে অন্তরঙ্গ হতে বাধা দেয়নি।

—দেন হেনরী? সুমন মেসিনের ভিতর থেকে স্ক্রেপার খোলার সময় কথাটা বলল।

হেনরী বলল, আর একটু নিচে।

—ঠিক আছে হেনরী?

—ইয়েস···ইয়েস···নো। আর একটু নিচে। বেশ।

ওরা উভয়ে মিলে উইনচ্ মেসিনের স্ট্রেপার খুলছিল। অনেক দিন এক নাগাড়ে উইনচ্ চলার জন্য স্ট্রেপারগুলো ক্ষয়ে গেছে। পিতলের ব্রাস ঘষে দিতে হবে এবং সযত্নে লাগিয়ে রাখতে হবে। মাল নামানো হবে না বন্দরে, তবু হাতে যখন কাজ নেই, যখন বন্দরে কিছুদিন চুপচাপ বসে থাকতে হবে, তখন এই সব ছোট ছোট মেরামতি কাজগুলো সেরে ফেলা ভাল। ওরা উভয়ে কাজ করছিল এবং গল্প করছিল।

—তারপর হেনরী···।

—বুঝলে পথের ঠিক উল্টো দিকে একটা সাইনবোর্ড ঝোলানো ছিল।

হেনরী বলল ফের, জোরে টেনে ধর সুমন।

সুমন অনেক চেষ্টা করেও নাট খুলে আনতে পারল না। হেনরী প্লেটের পাশ থেকে নিজেই হামাগুড়ি দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। তারপর ক্রাঙ্ক স্যাফটের ভিতর মাথা গলিয়ে অনেক কষ্টে নাট বোল্ট স্ট্রেপার, সব খুলে ফেলল। তেলকালির জন্য ওর তখন মুখের চেহারা বহুরূপীর মতো; মুখ তুলতেই দেখল সামনে মাঠ আর অন্য তীরে মোটরগাড়ি, একদল যুবক-যুবতী গাড়িতে করে নদীর পাড় ধরে মোহনার দিকে যাচ্ছে—ওরা দক্ষিণ দেশের গ্রাম্য সংগীত গাইছিল এবং রুমাল ওড়াচ্ছিল। হেনরী যুবতীদের দেখে ভিতরে ভিতরে উত্তেজনা বোধ করছে। নাবিকরা ফের রেলিঙে এসে ভিড় করে দাঁড়াল। আর হেনরী হাতের স্প্যানার দুলিয়ে যুবক-যুবতীদের গানের সঙ্গে পা ঠুকে তাল মেলাল এবং গান গাইল—রা···রা···রা।

বালতির ভিতর হাতুড়ি বাটালি এবং স্প্যানার ছিল, পাশে কেরোসিনের পট ছিল একটা। সুমন সেই পটের ভিতর উইনচের ছোট ছোট সব যন্ত্রের অংশ তেলে ভিজিয়ে রাখল। যুবক-যুবতীরা দূরে হুড খোলা গাড়ির ভিতর রুমাল ওড়াচ্ছে এখনও। বড় বড় বার্চগাছ পথের দুপাশে, কচ্ছপের মতো গাড়িটা ধীরে ধীরে যাচ্ছে। হেনরী ওদের দেখে গিনি মুরগির গল্প করছিল, যেন এই সব যুবক-যুবতীরা গিনি মুরগির উদ্দেশে কার্পাস ক্ষেতে হারিয়ে যাবে এবং পরস্পর গিনি মুরগির সন্ধান করতে গিয়ে ভালবেসে ফেলবে। সুমনের যেন বলার ইচ্ছা, এভাবে যেতে পারি না হেনরী? আমরা এভাবে কোথাও কোন যুবতীকে ভালবাসতে পারি না? কিন্তু সে কিছুই বলল না। সে কপালে হাত রেখে দূরের হুড খোলা গাড়ির ভিতর ফের ওদের দেখার চেষ্টা করলে দেখল, বার্চগাছের আড়ালে গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। জিভে সুমন এক ধরনের বিস্বাদ অনুভব করতে পারছে এখন। ওর কিছুই ভাল লাগছিল না। কাজে উৎসাহ পাচ্ছিল না। ডেক ধরে অন্যান্য নাবিকদের যারা কর্ণফুলির মাঠে ঘাসে বড় হয়েছে, এবং যারা মেয়েমানুষের উৎসাহে বন্দরে ধর্মভীরুতার জন্য মদ স্পর্শ করে না তাদের সকলের দু পেনির মতো যে উৎসাহটুকু ছিল, সেটা পর্যন্ত ডেকে মাস্তার দেবার পর নিভে গেছে।

সুতরাং সুমন প্রশ্ন করল, বিজ্ঞাপনে কি দেখলে হেনরী?

হেনরী বলল, 'আসুন, অন্তরঙ্গ হোন'। এই লেখা ছিল।

হেনরী হেঁটে যাচ্ছিল ডেক ধরে। পিছনে সুমন বালতি হাতে চার নম্বরকে অনুসরণ করছে। ওরা ইনজিন্ রুমের দরজার কাছে এসে থেমে গেল। চার নম্বর দরজায় হেলান দিয়ে পাইপে টোবাকো পুরে দিল। এবং টিপে টিপে ভিতরে ফস করে আগুন জ্বালল, তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে সুমনকে বলল, কালকে পেট ভরে মদ খাওয়া গেল। বিনে পয়সায় ভোজ।

—তার মানে।

—ফের নেমন্তন্ন পাওয়া গেছে।

—মেয়েমানুষের!

—আরে না না। কেবল মেয়ে মেয়ে করছ। কাল অনেক চেষ্টা করেও পাইনি।

—মেজ মালোমকে দেখলাম জাহাজেই তুলে এনেছিল।

—উনি গুণী লোক। অথবা হেনরী যেন বলতে চাইল সব বন্দরে ওর রক্ষিতা আছে।

হেনরী আগুনটা বুড়ো আঙুলে টিপে ধরল, তারপর একটু থেমে বলল, ভদ্রলোক পাবের মালিক। ওর ছোট ভাই কার্ডিফের রুদ ইনজিনিয়ারিং ডকে কাজ করছে।

সুমন জানত হেনরী কার্ডিফের লোক। এবং ওর দাদা রুদ ইনজিনিয়ারিং কারখানায় বড় পদে অধিষ্ঠিত। সেজন্য সুমন বলল, ভদ্রলোক খুব খাওয়ালেন?

—খু…উ…ব। ভদ্রলোক বললেন, জাহাজ কোথা থেকে এল? বললাম, কার্ডিফ থেকে। ভদ্রলোক আর ছাড়তে চায় না।

সুমন বলল, শহরটা কেমন দেখলে?

হেনরী টাকরায় এক ধরনের শব্দ করল। তার মানে বলতে চাইল, ফাইন। অথবা বলার ইচ্ছা যেন যেতে যেতে লতানে গোলাপের গন্ধ পাবে খুব।

তারপর সুমন সহসা প্রশ্ন করে বসল, এনি গার্ল?

হেনরী মিষ্টি হাসল। বলল, নো।

সুমন বলল, ফাইভার মনে হচ্ছে খুব চেষ্টা-চরিত্র করছে।

হেনরী বলল, চেষ্টা-চরিত্র করলে আমিও একটা পেতে পারি।

ওরা পরস্পর কথা বলতে বলতে সিঁড়ি ধরে নিচে নামছে। সিঁড়ির সামনে এনজিন-কসপের ঘর। কসপ্ ঘরের ভিতর বড় বড় তামার পাত সরাচ্ছে। আর বসে বসে কিসের যেন হিসাব কষছে। সুমন একবার উঁকি দিয়ে বলল একটা হাফরাউন্ড ফাইল চাই চাচা। সে মিহি হাফ-রাউন্ড ফাইল বাল্তির ভিতর রেখে নিচে নেমে গেল। টানেলে ইনজিন-জাহাজীরা রঙ করছে, ওদের ইতস্তত শব্দ শোনা যাচ্ছে। ইনজিনের কোন শব্দ নেই। মাঝে মাঝে ব্যালেস্ট পাম্পের ওঠা-নামার শব্দ শোনা যাচ্ছে। এবং অদূরে ট্যাঙ্ক টপের উপর বসে কারা যেন অশ্লীল সব গল্প করছে। সুমন মুখটা এক সময় ব্যাজার করে বলল, কাপ্তান অন্তত একদিনের জন্য অনুমতি দিতে পারত। আমরা শান্ত-শিষ্ট বালকের মতো শহরটা ঘুরে আসতে পারতাম।

হেনরী হাতের ফাইলটা ঘষতে ঘষতে বলল, তুমি পাগল সুমন—শহরটাতে তবে হৈ-চৈ পড়ে যাবে না। এখানে কিছু নিগ্রো পল্লী আছে—ওরা পর্যন্ত ওদের শহর এলাকা ধরে হাঁটতে পারে না।

এই সব খবর সুমনও জানত। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ দেশগুলোতে এখনও ভয়ঙ্কর বর্ণবৈষম্য—ওদের বীরগাথা সব শীতের রাতে উনুনের পাশে প্রজ্বলিত হয়, ওরা সেই সব বেদীমূলে মাথা রেখে এখনও বর্ণবৈষম্যের গান গায়। গ্রাম্য সঙ্গীতে এই সব উত্তেজক বীরগাথা এখনও শহরে, মাঠে-ঘাটে এবং সর্বত্র প্রচলিত। এবং শহরের প্রধান জায়গাগুলোতে কোন নিগ্রোর বসতি নেই, দূরে বস্তি অঞ্চলে ওরা থাকে। আলাদা গীর্জা এবং আলাদা সমাধিক্ষেত্র। সুতরাং সুমন চিৎকার করে যেন বলতে চাইল, এটা মানুষের অপমান। এবং ফাইল চালাতে গিয়ে সুমন অন্যমনস্কভাবে একটা আঙুল খানিকটা চেপ্টে দিল।

হেনরী বলল, হল তো! হেনরী তাড়াতাড়ি মেজ মালোমের ঘর থেকে ব্যান্ডেজ এনে আঙুলটা বেঁধে দেবার সময় ফিস ফিস করে বলল, মনে হয় আজ একজনকে ধরতে পারব।

সুমন হাসতে হাসতে বলল, তিন নম্বর কি বলছে?

—ওর তো ঠিক করা ঘর আছে। কিন্তু কাল গিয়ে দেখেছে সেখানে এখন অন্য মেয়েমানুষ। সে খবর নিয়ে জেনেছে ও আর ওর মা টেক্সাসের দিকে মদের দোকানে কাজ নিয়ে চলে গিয়েছে।

বিকেলের দিকে ফাইভার, হেনরী, বড় মালোম এবং তিন নম্বর মিস্ত্রি পর পর প্রায় নেমে গেলেন। সুচারু, সুমন এবং সামাদ ওদের নেমে যেতে দেখল। ওরা তিনজনই দেখল নেমে যাবার সময় কোয়ার্টার মাস্টার ওদের সেলাম দিচ্ছে। সামনে জেটি এবং ক্রেন পেরিয়ে গেলে শহরে ঢোকার পথ, বেসবলের মাঠ ডানদিক ঘেঁষে, পরে পাকা রাস্তা এবং পাশে ঘোড়ার আস্তাবলের মতো লম্বা পাঁচিলঘেরা মাঠ। দুটি তরুণী কিংবা যুবতীও হতে পারে, পরনে সাদা প্যান্ট আর খুব আঁটো গেঞ্জি পরা মনে হচ্ছিল…ওরা আন্দাজে সব ভেবে পরস্পর কিঞ্চিৎ রসিকতা করল।

সুচারু বলল, সামাদ ওর বিবিকে প্যান্ট পরাবে বলছে।

সুমন বলল, পুরোনো বাজার থেকে তবে একটা প্যান্ট কিনে নিতে হয়।

প্যান্টের কথাবার্তা প্রসঙ্গে সামাদ গত সফরের বাদশা মিঞার গল্প করল। গল্পটা এই রকমের—বিবির চিঠি আসে না। বাদশা মিঞা জাহাজের বড় টিন্ডাল। সবে মাত্র চার নম্বর বিবিকে সাদি করে সফর করতে এসেছে। জাহাজে দুজন বাঙালীবাবু ছিলেন…ওরা বাদশা মিঞার বিবির কাছে খৎ লিখে দিত। অথচ একটারও জবাব নেই। ওর চার বিবির নয় ব্যাটা। বড়টা খন্ খন্ করে কথা কয়, মেজটা তালাক, আর তার পরেরটা মরে গেল।

সামাদ বলল, বাদশা মিঞা আমাদের বলত, আমার আট ব্যাটার সাদি দিয়েছি। আর মাত্র এক ব্যাটা বাকি।

বাদশা মিঞা বলত, খতের জবাব আসবেই। তামাম দুনিয়ার চিজ নিয়ে যাচ্ছি বিবির জন্য।

বাদশা মিঞা বন্দরে বন্দরে চিঠি দিয়েছে।

তারপর আসল ঘটনা। সামাদ হেসে হেসে বলতে বলতে থেমে গেল। বলল, এখন হেসে বলতে পারছি। কিন্তু তখন তোদের পর্যন্ত বাদশা মিঞাকে দেখলে মুখে কথা যোগাত না। বাদশা মিঞার বয়স ষাটের কাছে। পুরোনো বাজার থেকে নতুন বিবির জন্য হাই-হিলের জুতো কিনেছে, ছোট ব্যাটার জন্য মেমেদের পুরোনো স্লিপিং গাউন কিনেছে।

সুচারু বলল, কি হবে পুরোনো গাউন দিয়ে?

—সেই তো কথা! সামাদ মাটিতে থুথু ফেলল। বেশি কথা বললে ওর দু ঠোঁটের কশে থুথু জমতে থাকে। বলল, বাদশা আমাদের পাঁচ নম্বর সাবকে সব খুলে দেখাল। শেষ ব্যাটার সাদি, সুতরাং জাঁকজমক করতে হয়। সাদির দিনে ব্যাটা গাউনটা শেরওয়ানীর মতো গায়ে দেবে।

সামাদ এখানে একটু থামল।—আমরা বোধ হয় তখন আফ্রিকা ঘুরে দেশে ফিরছিলাম, পোর্ট সৈয়দে চিঠি এল—ওর বিবি ওর ছোট ব্যাটার সঙ্গে ভেগে গেছে।

সামাদ এবার কেমন বিষণ্ণ গলায় বলল, পুরোনো বাজার থেকে প্যান্ট কিনে গাউন কিনে বিবিকে পরিয়ে দেখতে ভয় হয়। চারধারে মনে হয় তখন বাদশা ঘুরছে।

সামাদের মুখ এখন যথার্থই করুণ দেখাচ্ছে।—চার মাস হতে চলল বিবির একটা খত পাচ্ছি না। ভেবেছিলাম এ বন্দরে বিবির খত আসবে। কিন্তু সকলের খত এল। বলে, সামাদ আর কথা বলতে পারছে না যেন। সামাদ অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। এখন সামাদকে চেনা যাচ্ছে না। ওর বিবির জন্য কষ্ট এবং কিছু অশ্লীল ছবি ওর কাছে সব সময় থাকে—অথচ এই মুহূর্তে সামাদ বিবির জন্য যথার্থই কাঁদছে।

সামাদ ফের বলল, সালিমা বার বার বলেছিল ওর জন্য একটা গরম ব্লাউজ নিয়ে যেতে।

সামাদ ভাবল, এখন এই বিকেলে বাদশা মিঞার গল্পটা ওদের না শোনালেও হত। সেই সব দৃশ্য সে যেন হুবহু মনে করতে পারছে। ভাল মানুষটা কেমন পাগলের মতো হয়ে গেল এবং সবার সামনে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করল।

সামাদ বলল, সেই ভয়ে কার্ডিফের সেকেন্ডহ্যান্ড মার্কেটে ঢুকে ফের ফিরে এসেছি। তারপর সামাদ কেমন সরল মানুষের মতো বলল, কি সব আজে-বাজে কথা বলে ফেললাম তোদের। কিছু মনে করিস না।

সুচারু বলল, আমিও প্যান্ট কেনার ব্যাপারে ঠাট্টা করেছি।

—ঠাট্টা করবি কি রে! বলে সামাদ সুচারুর দিকে তাকাল।

—আমার মাঝে মাঝে খুবই সখ হয় রাতে সালিমাকে প্যান্ট গাউন পরিয়ে পাশাপাশি শুয়ে থাকি। খুব আস্তে আস্তে সামাদ কথা বলছে। ওর গলার স্বর দৃঢ়, কোন বাচালতা নেই। শেষে বলল সামাদ, বিবিকে একদিন কথাটা বলেছিলাম, সে ত হেসে লুটিয়ে পড়ল। মেয়েদের নানা রকমের ছবি দেখিয়ে বলেছি—দেখেছিস কি খুপসুরৎ।

সুচারু বলল, আমি একটু নিচে যাচ্ছি।

সুমন জানত এখন সুচারু কি করবে। কোন করুণ দৃশ্য শেষে সুচারুর লিজার কথা মনে হয়। লিজা

সম্পর্কে সামাদ কিছুটা খবর রাখে, কারণ সামাদ এবং সুচারু অন্য এক সফরে ব্যাঙ্ক লাইনের একই জাহাজে ছিল। সুচারু নিশ্চয়ই এখন পুরোনো সব ছবি টেনে বের করবে। এবং দরজা বন্ধ করে সেই সব ছবির উপর নুয়ে থাকবে।

সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছিল মাঠে। তিনজন নাবিকের মুখেই সূর্যাস্তের শেষে আলো। তখন নদীর জলে কিছু স্কীপ ভাসছিল। শীত শেষ হয়ে গেছে বলে কিছু পাখি ফের রকী অঞ্চলে বোধহয় ফিরে যাচ্ছে। সূর্যাস্তের লাল রঙ উইপিং উইলোর ঝোপে পড়ছে, সেখানে ছোট বড় পাখি ফুর ফুর করে উড়ছিল। জাহাজীরা সব ডেকে বসে কোনও পুরোনো স্মৃতির ভিতর ডুবে ছিল। কেউ সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ হিসাব করে দেশের মাতব্বরদের কথা ভাবছিল, ব্যবসার কথা ভাবছিল এবং ঘর-দোর ঠিক করার কথা ভাবছিল। কেউ হয়তো তীর দেখার সময় ছোট ছোট শিশুদের দেখছিল এবং সন্তানের কথা মনে করে, প্রিয়জনের কথা মনে করে বিষণ্ণ হচ্ছিল। আর কিছু জাহাজী, এখন ডেকে তাস খেলছে বসে বসে, ওরা তীরে না নেমেও মেয়েদের সম্পর্কে কটূক্তি করে আনন্দ পাচ্ছিল।

সুমন দেখল এক সময়, সুচারু, সামাদ কেউ নেই। সে একা। এখন যেন কিছু করণীয় নেই—শুধু বসে বসে তীর দেখা অথবা যারা দূরবর্তী গ্রামের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল—যারা শেষ পর্যন্ত রাত হয়ে যাবে ভেবে আর এগুতে সাহস পাচ্ছে না, তাদের কিছু ক্লান্ত অবয়ব সরাইখানার ভিতর এখনও দৃশ্যমান এবং সহসা মনে হল সর্বত্র আলো, ডেকে আলো, মাস্তুলে আলো, উইংসে আলো এবং বন্দরের বিচিত্র সব বিজ্ঞাপনে আলোর বন্যা। সুতরাং সুমন বসন্তের আকাশ দেখল একবার—এই আকাশ মানুষের জন্য, মাঠ মানুষের জন্য আর ভালবাসা মানুষের জন্য আর নদীর জলে যেন মায়ের মুখ প্রতিবিম্বের মতো ভাসছে। সুমন দীর্ঘ সময় আবিষ্ট হয়ে বসে থাকল। কোন কোলাহল ভাল লাগছিল না। শুধু মায়ের স্মৃতি শরৎকালীন মেঘের মতো কোন শীতের নক্ষত্রকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল।

কতক্ষণ সুমন এভাবে বসেছিল খেয়াল নেই। সহসা খেয়াল হল ভাণ্ডারী গ্যালীতে মশলা দিয়ে মাংস ভাজছে। কিছু জাহাজী মেসরুমে নামাজ পড়ছিল। নিচে এখনও যেন কে রঙের টবটা এক নাগাড়ে বাজিয়ে চলেছে। সুমনের এ সব কিছুই ভাল লাগছিল না। আর সিঁড়ি ধরে নামবার সময় দেখল বড় টিন্ডাল তামাক কাটছে। প্রাচীন নাবিকের মতো মুখ। ফোকসালে অম্বরী তামাকের গন্ধ। উপরের বাংকে ডংকিম্যান বসির জাল বুনছে। বড় টিন্ডালের মুখ ভয়ানক উদাস। সুমনকে নেমে যেতে দেখে বললেন, এত জলদি নিচে নাইম্মা আইলা জ্যাঠা?

সুমন বলল, ভাল লাগছে না জ্যাঠা।

বড় টিন্ডাল বলল, যাও ঘুমাও গা। রাইতের পরীর পরে তো ঘুমাও নাই? অথবা বড় টিন্ডাল যেন সব ধরতে পারছে। এই যে এতদিন সমুদ্রে জাহাজ বেয়ে আসা শুধু যেন তীরের জন্য, ঘাস, মাটির জন্য আর সেই তীর এত কাছে, এত নিকটবর্তী শহর, পাব, রেস্তোরাঁ এবং ভাসমান আকাশের মতো আস্তাবলের মাঠ, যেন সবই দৃশ্যবহুল ছবি অথচ সুমন নিচে নেমে অবাক হয়ে গেল, সুচারু সামাদ রঙের টব বাজাচ্ছে এবং নেচে নেচে গাইছিল, ফান্দে পড়িয়া বগায় কান্দে…। কোনও করুণ দৃশ্য এখন আর সুচারু সামাদ বহন করছে না।

ফোকসালে ঢুকলে সামাদ আর সুচারু চুপ হয়ে গেল।

সুচারু বলল, যুবতীর দুঃখ ভুলে থাকছি।

সামাদ বলল, চমৎকার গান।

অন্যান্য নাবিকরা বলল, শালা জাহাজে আগুন লাগুক।

সুমন শুনল সব। এই বিপরীত-ধর্মী জীবন এখানে সব সময় সুমনকে আঘাত করছে। সে নিচে এসেও কোন শান্তি পেল না। বরং হেনরী তীর থেকে ফিরলে ওর জন্য কিছু নিয়ে আসতে পারে। ঘড়ি দেখে বুঝল, রাত গভীর হতে দেরি নেই। নাবিকেরা এখন যে যার ফোকসালে শুয়ে পড়বে। এবং বড় মালোম হয়ত এখনই কোন বেশ্যা রমণীকে টানতে টানতে কেবিনে তুলে আনবেন;

অথবা নিমন্ত্রিত অতিথির মতো আগে এসেই বসে থাকবে। সুমন ডেক ধরে হেনরীর কেবিন পর্যন্ত হেঁটে গেল।

হেনরী দরজা খুললে সুমন বলল, এত সকাল সকাল?

হেনরী মদ খেয়েছে বলে আচ্ছন্ন মানুষের মতো বিড় বিড় করে কি উত্তর করল সুমন বুঝতে পারল না।

সুমন কেবিনে ঢুকে বাংকে বসল। ওর খুব হাই উঠছে। ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল ওর। তবু তীরের কিছু খবর নেবার জন্য সে বসে থাকল বাংকে।

হেনরী সহসা বাথরুমে ঝড়ের বেগে ঢুকে গেল। কেবিনে নীল রঙের আলো জ্বলছে। ওর মা'র ছবি টেবিলে এবং স্ত্রীর ছবি দেয়ালে টাঙানো। হেনরীর বালিশ থেকে ছবিটা মুখোমুখি। এবং সুমন এই বাংকে বসে টের পাচ্ছে হেনরী বাথরুমে বমি করছে। এক অস্পষ্ট বেদনা হেনরী সব সময় বুকের ভিতর লুকিয়ে রাখে, যা এই বন্দর শহরে এলে ধরা যায়।

বমি করার পর হেনরীকে খুব শান্ত দেখাচ্ছিল। সুমন ওকে বাংকে শুয়ে পড়তে সাহায্য করল এবং কম্বল টেনে দেবার সময় বলল—কি, শরীর হালকা বোধ হচ্ছে তো?

হেনরীর চোয়াল দুটো ভারি এবং বয়স্ক বলে ওর হাসিটুকু ভিতরে আটকে থাকল। বড বড় হাই তোলার জন্য হাত পা শক্ত করে রাখছে। তারপর পাশ ফিরে বলল, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড কি দরকার ছিল জাহাজী হওয়ার। বড় একঘেয়েমি এই জাহাজে।

সুমন বুঝল হেনরী একদম ভাল নেই। স্ত্রীর বিরহে খুবই কাতর। সুতরাং হেনরী এখন সুমনের সঙ্গে সারারাত বক বক করতে চাইবে? অত্যধিক মদের জন্য হেনরী খুব আড়ষ্ট হয়ে আছে। সুমন আর বসল না। ধীরে ধীরে বাইরে এসে দরজা টেনে দিল।

হেনরী মাথা তুলে দেখল সুমনকে। সুমন চলে যাচ্ছে। হেনরী পাশের টেবিল থেকে মায়ের ছবিটা মুখের কাছে নিয়ে এল। মা'র অল্প বয়সের এই ছবি। তারপর সে তার বৌয়ের ছবির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল। স্ত্রীর মুখে সরল হাসি. এই হাসিটুকুর ছায়াতেই হেনরী আশ্রয় চেয়েছে বার বার। তারপর সে উঠে মায়ের ছবির পাশে ওর বৌয়ের ছবি রাখল এবং নিজের ছবি পকেট থেকে বের করে পাশাপাশি ছবিগুলো সাজাল। বন্দরে এমন সব মুখ সে যেন দেখে এসেছে কত। সে মনে মনে বলল, তোমরা সব এক। তোমাদের কোনও তফাৎ নেই। বলে, একা একা এই অপরিচিত বন্দরের ভেতব হো হো করে হেসে উঠল।

॥ তিন ॥

খুব ভোরে উঠেই সুচারু চা করেছে। সামাদ উপরের বাংকে। সে চায়ের গন্ধ পেয়েই নিজের মগ বের করে চিৎকার করতে থাকল, আমার চা, আমার চা।

সুচারু বলল, আমি কারও জন্য চা করিনি।

সামাদ বলল, দে বাবা, একটু দে।

সুচারু বলল, তুই বড্ড কুঁড়ে।

সামাদ বলল, বন্দরে জাহাজ নিয়ে এসেছি। এখন বিশ্রাম। কাল তোকে আমি খুব ভোরে উঠে চা কবে খাওয়াব।

—ঠিক?

—ঠিক।

—নে ধর্। এই সুমন। সুচারু সুমনকে ডাকল। নে, তুইও খা। বলে চা তিনভাগ করে তিনজনই খেয়ে নিল।

জাহাজের খোলে রঙ লাগানোর জন্য ফলঞ্চাতে তখন দড়ি বাধা হচ্ছিল। সবাই এক এক করে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে যাচ্ছে। সুচারু সামাদ চা খেয়ে উপরে উঠে গেল। ফল্কায় ফল্কায় দ্রুত ওরা

ছুটে বেড়াচ্ছে। ডেক-টিন্ডাল হোস পাইপ নিয়ে গেছে বোট-ডেকে। হেনরী কেবিন থেকে ওর সব ক্যানারী পাখিগুলো বের করে খাঁচার উপরে জল ঢেলে দিচ্ছে।

সুমন ওর বাংকে নীল পোশাক পরে নিল। বড় মালোম ইউনিফর্ম পড়ে ডেক-সারেঙের কাজ সম্পর্কে কিছু নির্দেশ দিচ্ছেন। এবং সুমন নীল পোশাকের ভিতর ঢুকে যেতেই রাতের অদ্ভুত স্বপ্নটার কথা মনে হল। অল্প জলে জাহাজটা আটকে গেছে। সে একা একা জাহাজটাকে ঠেলে ঠেলে নিচ্ছিল, যেন একটা কচ্ছপ জাহাজটাকে চড়ায় তুলে দিয়েছে, বড় মালোম লগি মারছেন। জাহাজের ফরোয়ার্ড-পিকে তখন সব সৈন্য-সামন্তরা যেন কুচকাওয়াজ করছিল। আর সামাদ যেন হুবহু ক্রোজনেস্টে বসে কাক তাড়াচ্ছে।

এনজিন-সারেঙ তখন ডেকের ওপড়ে হাঁকল, জোয়ান লোক টান্টু।

সুমন গ্যালীর পাশে এসে দাঁড়াল। এন্‌জিন-সারেঙ সকলকে কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছেন। স্মোক-বক্স পরিষ্কারের জন্য তিনজন ফায়ার-ম্যান আর দুজন কোলবয়কে দিয়ে দিলেন। ছোট টিন্ডাল ওদের নিয়ে এন্‌জিন রুমে নেমে গেল। ডংকিম্যান এবং দুজন ফায়ারম্যানকে আজও টানেল পথে রঙ করতে নির্দেশ দিলেন। কিছু কোলবয়কে প্লেট ঘষতে নির্দেশ দিয়ে নিজে যুবকের মতো লাফ দিলেন একটা। সুমনকে ফালতু হিসেবে আজও হেনরীর সঙ্গে কাজ করতে নির্দেশ দিলেন উইনচে। সুতরাং সুমনও ডেকে নেমে গেল। তারপর এন্‌জিন-রুমে ঢুকে সিঁড়ি ধরে নিচে নামার সময় সে গুন গুন করে গান গাইল। সে কসপের কাছ থেকে নানা সাইজের স্প্যানার হাতুড়ি বাটালি নিয়ে উপরে উঠতেই দেখল ডেক-বড়-টিন্ডাল জাহাজের সর্বত্র জল মেরে যাচ্ছে। সুমন মাস্টের নিচে বালতি নিয়ে বসে থাকল হেনরীর জন্য। হেনরী আসছে। কিছুটা সামনের দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটছে। ওর পকেটে আপেল। সে আপেল কামড়ে কামড়ে খাচ্ছিল। এবং তীরে তেমনি নিকটবর্তী শহর, কল-কারখানা, চিমনি থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। জেটি প্রায় জনশূন্য। শহরের অ্যাম্বুলেন্স গেল। কোনও গীর্জায় হয়ত ঘণ্টা বাজছে। বেসবলের মাঠে একজন মেয়ে গল্‌ফ খেলছে মনে হচ্ছে। পোষা কুকুরটা গলফের বল তুলে আনার জন্য ছুটছিল, পেছনে অন্য তীর এবং মাঠ। গোলায় যারা ফসল তুলছিল তারা বের হয়ে পড়েছে বাজার করার জন্য। দোকানিরা সব কাচের ঘর খুলে দিচ্ছে।

সুমন কিছু ভাবছিল হয়ত। অথবা বলার ইচ্ছা—আর ভাল লাগছে না। রাতে ভাল ঘুম হচ্ছে না। যতসব আজগুবি স্বপ্ন এবং মায়ের প্রতিবিম্ব সর্বদা স্বপ্নের মতো একপাশে বসে থাকছে।

হেনরী ডাকল, হেই! এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখল জোরে একটা আপেল ওর দিকে ছুড়ে দিচ্ছে। সুমন আপেলটা লুফে নিল। তারপর দুজন আপেল কামড়ে খাচ্ছিল এবং পরস্পর দুলে দুলে হাসছিল! তারপর সুমনও সহসা হেনরীর মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ে বলল, হেই! হেই…হেই। ওরা গানের মতো কোমর বাঁকিয়ে ধরল। ডেকে যখন বড় মালোম অথবা কাপ্তান কিংবা বড় মিস্ত্রিকে দেখা যাচ্ছে না এবং চিফ কুকের গ্যালীর জন্য জায়গাটা বেশ গোপনীয় তখন ধীরে-সুস্থে একটু কোমর বাঁকিয়ে নাচা যাক।

কিন্তু ওরা দেখল লাইফ বোটের পাশ দিয়ে প্রায় গুঁড়ি মেরে বড়ো মালোম এবং মেজ মালোম নেমে আসছেন। হেনরী এবং সুমন তাড়াতাড়ি উইন্‌চ মেসিনের উপর ঝুঁকে পড়ল।

ওরা কাছে এলে সুমন বলল, গুড মর্নিং স্যার।

—গুড মর্নিং।

বড় মালোম বললেন, খুব খারাপ লাগছে?

মেজ মালোম বললেন, ট্যান-টেলাস।

সুমন বলল, ইয়েস স্যার।

ছোট মালোম বললেন, শহটরটা বড় সুন্দর।

ওরা চলে যাচ্ছিল। ওরা ঘুরে ঘুরে দেখছে। ওরাও প্রাচীন নাবিকের মতো মুখ করে রেখেছে। নিশান উড়ছে মাস্তুলে। জেটির অন্য প্রান্তে কিছু জাহাজ, হংকং অথবা আফ্রিকার বন্দর থেকে জাহাজগুলি এসেছে। জাহাজের পিকে সোমালি নাবিকের মুখ। মেজ মালোম ঠাট্টা করে বললেন, সুমন ইচ্ছা করলে তুমি নেমে যেতে পার। তোমাকে দেখলে ওরা স্প্যানিশ বলে ভাববে।

সুমন বলল, কোয়ার্টার মাস্টার রাজি হচ্ছে না।

হেনরী ফিস ফিস করে বলল, কাপ্তান তো কিছু দেখছেন না। নেমে গেলেই হল।

বড় মালোম বললেন, খুব মারাত্মক জায়গা। পুলিস কুকুর, নাৎসী বাহিনী এবং এখানেই ন্যাশনেল স্টেটস পার্টির বড় আড্ডা।

সুমন আর কথা বলল না। দাঁড়িয়ে থাকল? এ-সময় হেনরী মেসিনের ভেতর থেকে মাথা বের করে বলল, সেকেন্ড কাইন্ডলি একটা কাজ করিয়ে দিতে হবে।

—কি কাজ?

—আমার ঘরটা একটু রঙ করে দিতে হবে।

—কী ব্যাপার!

—একজন আসবেন। বড় নোংরা হয়ে আছে কেবিনটা।

—একটু চকচকে করে দিতে হবে!

—দিলে ভাল হয়।

—দেন হ্যপি ডে।

—ইয়েস, হ্যাপি-ডে।

ওরা চলে গেলে সুমন কিছুক্ষণ ড্রাম কভারে বসে থাকল। হেনরী মেসিনের ভেতর ঢুকে কাজ করছিল। খুট খুট শব্দ হচ্ছে। হেনরী খুট খুট করে চিজেল চালাচ্ছে। হেনরী এখনও কিছু খুলে বলছে না, এখনও চুপচাপ কাজ করে যাচ্ছে। ওর অভিমান হচ্ছিল। সুতরাং আহত গলায় বলল, হেনরী তোমার কে আসবে?

—একজন মহিলা আসবে।

—আমি কথা বলতে পারব না?

—না।

—কেন?

—ওরা কালা আদমীদের সঙ্গে কথা বলতে ঘৃণা বোধ করে।

—আমার রঙতো কালো নয়।

—কিন্তু কথায় কথায় তুমি ভারতীয় বলে চেঁচালে আমি মুশকিলে পড়ব।

সুমন চুপ করে থাকল। সে নিজেকে খুব অসহায় বোধ করতে লাগল। এবং বালক সুলভ ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, ভারি বয়ে গেল।

সুমন মনে মনে চটে গেছে বুঝতে পেরে হেনরী বলল, বক বক করতে পারবে না কিন্তু। ভাঙা ভাঙা ইংরিজি বলবে আর খুব ভাল মানুষ সেজে থাকবে। অশ্লীল কথাবার্তা বললে পোর্টহোল দিয়ে সমুদ্রে হারিয়া করে দেব। হেনরী এইসব কথা বলছিল আর চিজেল মারছিল। ন্যাশনেল স্টেটস্-রাইট পার্টিকে আমার বড় ভয়। সে ফিস ফিস করে বলল, যে ভদ্রলোক মদ খাওয়াল তার বোন, বোনের মেয়ে আসবে। খুব বনেদী ঘর। কথাবার্তা সাবধানে বলবে।

সংকীর্ণ পরিসরের জন্য চিজেলের উপর হাতুড়িটাকে কিছুতেই হেনরী সহজভাবে মারতে পারছিল না। সে নিচে থেকে উঠে এসে লিভার প্লেটে হাঁটু গেড়ে বসল। পেট বুক ওয়ারপিন ড্রামের উপর রেখে চিজেলটা সে স্ট্রেপারের মুখে গলাতে চাইল। সে যেন ঝুঁকে বুঝল, এখান থেকেই কাজের সুবিধা বেশি। সুতরাং এখন আর কোন মেয়েমানুষ সম্পর্কে কথা নয়। ওরা এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ কাজ করল।

হেনরী খুব নুয়ে নুয়ে কাজ করছিল বলে পিঠে ফিক ধরে গেল। সে মাস্তুলে পিঠ টান-টান করে বসল কিছুক্ষণ। মাস্তুলে রঙ লাগাচ্ছে সামাদ। নিচে সুচারু দড়ি ছেড়ে দিচ্ছে। মাস্তুলের ওপর থেকে ফোঁটা ফোঁটা রঙ ফেলছিল সামাদ। সুমন দুবার মুখ তুলে দেখল, তৃতীয়বার শাসাল। সামাদ কিছু শুনতে পাচ্ছে না-মত মাস্টের চার ধারে ঘুরে ঘুরে রঙ লাগাচ্ছে। সামনের ডেক থেকে নাবিকরা দড়ি কাঁধে ফিরে আসছে। এবং ফল্কার নিচে লম্বা স্টিকব্রুম নিয়ে নাবিকরা জাহাজের খোল পরিষ্কার

করছিল। আর তখনি হেনরী বলল, মিসেস ভারোদীর নানারকমের পাখি পোষার শখ। তিনি আমার সবুজ রঙের ক্যানারী পাখিগুলি দেখতে আসবেন।

জাহাজে এ বড় উত্তেজক খবর। সারাদিনের কাজ বড় দীর্ঘ মনে হচ্ছে। বিকেলের দিকে একটু আগে আগে এনজিন্ জাহাজীদের কাজ থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যারা স্মোক্ বক্স পরিষ্কার করছিল, ওরা এখন স্নান করছে বাথরুমে। সুমন বাথরুমে ঢুকে আনন্দে রা রা করে উঠল।

সুচারু এবং সামাদ ডেক-নাবিক। তবু ওরা এক সঙ্গে ছোট এক ফোকসাল বেছে তিনজন আশ্রয় নিয়েছে এই জাহাজে। এই নিয়ে প্রথম প্রথম দুই সারেঙই ঝুট্ ঝামেলা করেছিল—এখন সব সয়ে গেছে। সুতরাং ওরা তিনজন এক সঙ্গে বাথরুমে ঢুকে উলঙ্গ হয়ে চানে মেতে গেল। বালতি বালতি জল ঢেলে, সাবান মেখে, তেলে জলে শরীর মনোরম করে এক সময় এক সঙ্গে বেরিয়ে দেখল, সূর্য অন্য প্রান্তে মাঠের ওপাশের গোলাবাড়িতে হেলে পড়েছে। গাছের ছায়া এখন দীর্ঘতর অথবা লম্বা ছায়ার মতো। ওরা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখল।

আজও বড় মালোম, মেজ মিস্ত্রি সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। পাশের জাহাজে একটা সোমালিয়ান নাবিক কী এক কারণে অন্য নাবিকের বুকে ছোরা ঢুকিয়ে দিয়েছে, তাই নিয়ে বিচে পুলিশ, অ্যাম্বুলেন্স, ভিড়। সুমন সব নাবিকের সঙ্গে সেই মৃতদেহ দেখার সময় লক্ষ করল, জেটিতে হেনরী এবং ভারোদী, তার মেয়ে—ওরা হেনরীর সঙ্গে জাহাজে উঠে আসছে।

সে এবার চটপট তৈরি হয়ে নিল। বসন্তকাল, ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়া। এবং উষ্ণতা কম। সুমন সাদা হাফ শার্ট এবং হাফ প্যান্ট পরল আর তেলে জলে এই শরীর, কোমল ত্বকে মিষ্টি গন্ধ—পুরোপুরি এক ভারতীয় যুবকের মতো ডেক ধরে হেঁটে গেল।

সামাদ পথে ধরল, বলল; গন্ধে গন্ধে যাওয়া হচ্ছে!

সুমন প্রচ্ছন্ন ভঙ্গিতে হাসল। ভাবটা যেন ওটা কিছু নয়, এমনি ঘুরতে ঘুরতে যাওয়া।

হেনরীর সঙ্গে সুমনের ধীরে ধীরে যেন এক আত্মীয়তা গড়ে উঠছে। জাহাজের সব নাবিকরাই এটা জেনে গেছে, সুমন এক তরুণ নাবিক এবং সুমনের মিষ্টি মুখ অথবা মায়ের মৃত্যুর খবরে অসহায় চোখ সকল নাবিকদের কাছে, সকল অফিসারদের ভিতর কোন এক অলৌকিক ঘটনার মতো। সুমনের বালকসুলভ চপলতা সকলকে আপনার করে নিয়েছে।

সুমন যেতে যেতে এক নম্বর মাস্তুলের নিচে একটু দাঁড়াল। প্রথম ফল্কার পাশে কিছু নরম কাঠ। ক্যারেবিয়ান সমুদ্রে তখন ঝড়, এবং ঢেউ। এই সব ভাসমান কাঠ ঝড়ের তরঙ্গমালায় ডেকে আটকে গেছিল। কাঠগুলো এখনও আছে। নরম কাঠে হেনরী অবসর সময়ে আশ্চর্য সব মূর্তি তৈরি করছে। সে কাঠগুলো খুব যত্নের সঙ্গে এক পাশে জড়ো করে রেখেছে।

হেনরী হয়ত এখন ওর কাঠের মূর্তিগুলো ওদের দেখাচ্ছে। কোথাও যীশুকে গোরুর গাড়িতে টানছে এবং কোথাও পাহাড়ের নিচে সমুদ্রের বেলাভূমি অথবা ভারতবর্ষের কিছু দেবদেবী, তাইফের কোন মন্দিরের বৌদ্ধমূর্তির অবিকল নকল, হ্যানয়ের শান্তির দেবী এবং ত্রিনিদাদ অঞ্চলের কোনও ল্যাটিন আমেরিকান চাষীর মুখ, সে সারি সারি সাজিয়ে রেখে দিয়েছে। কখনও এই কাঠ-খোদাইর ভিতর ক্যানারী পাখিরা শস্য খাচ্ছে। কোন নিগ্রো রমণীর মাথায় মোরগের পালক গোঁজা এবং সুমনের ঘরে একটা বাতিদান রয়েছে যা হেনরী ওর দেশের জন্য এবং ভাবী স্ত্রীর জন্য উপহার দিয়েছে।

হেনরীর পাশের কেবিনগুলো খালি। শুধু ব্রীজের পাশে কাপ্তানের ঘরে আলো জ্বলছে। তিনি বুড়ো মানুষ, সুতরাং বন্দরে নামেননি। প্রায় বন্দরে ডেক চেয়ারে বসে থাকেন এবং ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন। সে সন্তর্পণে হেঁটে এসে দরজার উপর কান রেখে বুঝল হেনরী ওদের পাখিগুলো সম্পর্কে কি যেন বিশ্লেষণ করছে। মাঝে মাঝে মেয়েটির উচ্চকিত হাসি শোনা যাচ্ছিল। সুমন আর দাঁড়াতে পারছে না অথবা অপেক্ষা করার ধৈর্যটুকু যেন তার একেবারেই নেই। সে দরজায় টোকা মারল।

দরজা খোলার আগে জুতোর খসখস শব্দে মনে হল হেনরী এদিকে আসছে। সুমন এই সামান্য সময়টুকুর ভিতর ফের তার বেল্ট এবং জামার কলার টেনে-টুনে নিল আর দরজা খুলতেই সে দেখল এক কিশোরী মেয়ের মুখ—কোন গ্রাম্য পাবের সরল বালিকা যেন, চোখ রেশমের মতো গভীর, চুলে

সোনালি রঙ, শরীরের রঙ অ্যাপ্পালাচিয়ান প্রদেশের বসন্তকালীন গমের মতো। সুমন হেনরীর কথা মতো গোবেচারা লোক সাজতে গিয়ে ভয়ঙ্করভাবে বুড়বক বনে গেল।

সুমনকে সঙ্গে নিয়ে ভিতরে ঢুকে প্রথমেই হেনরী বলল, মাই ফ্রেন্ড। কাপ্তানের সন-লাইক-সেলর। ভেরি জলি, অ্যান্ড ভেরি ইয়াঙ্। তারপর সে বলল, সরল নাবিক আমাদের স্যুমান, নামটাকে সে একটু বিদেশী কায়দায় উচ্চারণ করল। কিছুক্ষণ আগে তোমাদের কাছে এর গল্প করেছি। বিখ্যাত মেটাডর ওজালিওর পৌত্র। দেন ওজালিও দ্য সুম্যান, এরা হচ্ছেন মিসেস ভারোদী টিলডেন আর ইনি তার একমাত্র কন্যা ফুরফুরে প্রজাপতি মারিয়া। এঁদের পূর্বপুরুষ ১৭৯৩ সালে নতুন জমির উদ্দেশে কার্পাস চাষের জন্য এখানে চলে আসেন। হেনরী কোনও রাজনৈতিক বক্তৃতার মতো থেকে থেকে কথাগুলো বলছিল। ভারোদী যেন কিছুই শুনছেন না। বংশ মর্যাদায় গর্বিত চেহারা নিয়ে তিনি গম্ভীর হয়ে বসেছিলেন।

ক্রমশ ঘেমে উঠছে সুমন। সংকোচ এবং মিথ্যা অভিনয়ের জন্য ওর ভিতরে ভিতরে খুব কষ্ট হচ্ছিল। মিসেস ভারোদী পাখির খাঁচাগুলো দেখছিলেন। তিনি মাত্র একবার চোখ তুলে সুমনকে দেখেছেন। ভাবখানা যেন—ইয়েস স্যুম্যান, ওজলিও দ্য এই জাতীয় কোন বিখ্যাত মেটাডর স্পেনে হয়ত থাকবে। তার জন্য লাফালাফি করার মতো কিছু নেই। ভারোদী, কথা প্রসঙ্গে উইলিয়ম হার্পারের নাম উচ্চারণ করলেন। তিনিও আমাদের একজন পূর্বপুরুষ, বলে তিনি ফের পাখির খাঁচার ভিতর থেকে দুর্লভ পাখির অনুসন্ধানে রত হলেন। ফের কী ভেবে বললেন, মিঃ হেনরী আপনার জানবার কথা নয়, কিন্তু আমাদের এই দক্ষিণ দেশগুলোতে যে কোন শিক্ষিত লোককে বললেই তারা শ্রদ্ধার সঙ্গে হার্পারের নাম উচ্চারণ করবে। দাস-প্রথা লোপ করার জন্য যখন খুব বাড়াবাড়ি চলছে তখন তিনি এবং ভার্জিনিয়ার উইলিয়াম অ্যান্ড মেরী কলেজের অধ্যাপক টমাস রডারিক, পরে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন—দক্ষিণ ক্যারোলিনাব জন সি. ক্যালহাউন, তাঁরা এক নতুন যুক্তি আবিষ্কার করলেন এবং বললেন উন্নততর বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা যাতে সরকারী কাজে বেশি আত্মনিয়োগ করতে পারেন তার জন্য দাস প্রথার প্রয়োজন আছে। তিনি চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলছিলেন। অর্থাৎ যেন বলার ইচ্ছা বংশ মর্যাদায় আমরাও কম যাচ্ছি না।

মারিয়া চুপচাপ বসেছিল। সুমন চুপচাপ সামনের একটা বাংকে জুবুথুবু হয়ে বসেছিল। সুমন মারিয়ার মুখের দিকে তাকাতে পারছে না। মিথ্যে পরিচয় দিয়ে তাকে হেনরী ক্রমশ মহৎ করে তোলার চেষ্টা করছে। মেয়েটির হাঁটু থেকে ফ্রক উঠে আসছিল। যত তাকে মহৎ করে তোলা হচ্ছে তত সে তার নাবিক সুলভ প্রবৃত্তি যেন হারিয়ে ফেলছে।

ভারোদী প্রায় সব সময়ই খাঁচার উপর নুয়ে ছিলেন। তিনি কী যেন দেখছেন—পাখিগুলোর ভেতর। তিনি অত্যন্ত সন্তর্পণে কথা বলে যাচ্ছিলেন, আর দুর্লভ প্রজাতির পাখিগুলো লক্ষ করছিলেন, শেষে এক সময় হেনরীর দিকে তাকিয়ে বললেন, এই পাখিটাই রেয়ার। এটা, মিঃ হেনরী, আমার চাই।

হেনরী বলল, আচ্ছা হবে।

মারিয়া বাংক থেকে উঠে পড়ল। এবং পোর্টহোল দিয়ে নিজের পরিচিত শহরটিকে দেখতে গিয়ে কেমন অপরিচিত শহর বলে মনে হল। ছোট ঘুলঘুলি, সব স্পষ্ট দেখা যায় না।

সুমন পোর্টহোলে মুখ না রেখেই বলল, বড় সুন্দর শহর। এইটুকু বলতেই ওর গলা শুকিয়ে কাঠ। সে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে কথা বলতে চাইল।

কিশোরী বালিকা সুমনের কথাবার্তা খুব আগ্রহের সঙ্গে শুনছিল। কারণ সুমনের চুল, চোখ এবং মুখ মেয়েটির কাছে যাদুকরের পালিত পুত্রের মতো। ওর ছবির বইয়ে এমন একটা মুখ যেন কোথাও আঁকা আছে।

সুমন মারিয়ার এই আগ্রহটুকু লক্ষ করে আরও শান্ত হয়ে গেল। মনে হচ্ছে এখন মারিয়া একটু অন্যমনস্ক গোছের। শরীরে নরম সিল্কের স্কার্ট এবং পরনে বাদামী রঙের গাউন। কিছুটা সেমিজের মতো ঢং পোশাকে। খুব হালকা বলে বগল পর্যন্ত খালি দেখাচ্ছে। মুখে এক ধরনের গোলাপী রঙের

প্রসাধন। মুখে কিছু জরির কাজ থাকলে জাপানী পুতুলের মতো মুখ মনে হত। চোখ যথাযথ এবং ভ্রূ টানা বলে কথা বললেই বড় চঞ্চল মনে হয় কারণ মুখে নানা রকমের ভঙ্গি মেয়েটির অজান্তেই ফুটতে থাকে। আর সুকোমল প্রবৃত্তিরা খেলা করতে থাকে শরীরে। সুমন গ্রাম্য বালকের মতো মুখ করে কেবিনের সব কিছু দেখছিল। হেনরী দাস প্রথা সম্পর্কে বলছিল, এই যে ভারতীয় নাবিকরা বন্দরে নামতে পারছে না, তাদের দুঃখের কথা বলছিল এবং পাশের জাহাজে সোমালি নাবিকের বুকে ক্ষত—হয়ত ওকে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়েছে—সবই এক দুঃখের সামিল। সুতরাং সুমনেরও ইচ্ছা হল কিছু বলতে। ইচ্ছা হল বেসবলের মাঠ ধরে দূরে যে অশ্বশালা দেখা যাচ্ছে, তার ওপাশে কি আছে জানতে।

ভারোদী মেয়ের দিকে এবার মুখ করে বসল। সুমন পাশে বাংকের ওপর পা সোজা করে বসে আছে এবং হেনরী মেস-রুম বয়কে ডাকতে বাইরে গেছে।

ভারোদীকে মারিয়া কানে কানে কী ফিস ফিস করে বলতেই, ভারোদী প্রশ্ন করল সুমনকে, তুমি কখনও ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই করনি?

এই প্রশ্নের উত্তর শোনার জন্য যাদুকরের পালিত পুত্রের মুখের দিকে মুখ ফেরাল মারিয়া। মুখ ফেরালেই সেই ঘন কালো চুল এবং সেই এক মুখ অথবা মারিয়ার মনে হল বুনো ফুলের গন্ধের জন্য কেউ যেন সব সময় এই ঘন কালো চুলের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। সুমন অত্যন্ত বিচলিত গলায় বলল, না।

ভারোদী কেমন আহত গলায় বলল, পারিবারিক ট্র্যাডিশন নষ্ট করে দিচ্ছ?

সুমন একটু সোজা হয়ে বসল। এবং ধীর স্থির ভাবে জবাব দিল, খুব বেদনার। তবু চেষ্টা করছি যাতে একেবারে নষ্ট হয়ে না যায়।

—সফর শেষে লড়বে।

এবার সে চতুর হতে চাইল। বলল, না, কাকারা লড়ছে।

—খুব আশার কথা। ট্র্যাডিশন নষ্ট হচ্ছে না খুব আশার কথা।

ততক্ষণে হেনরী ফিরে এসেছে। বয় কফি দিয়ে গেল। কেবিনে সেই এক নীল আলো। আলোর ভিতর সকলকেই কেমন রহস্যময় মনে হচ্ছিল। হেনবী ঢুকেই বলল, কি কথা হচ্ছিল।

—লড়াইর কথা। মারিয়া ফ্রক ঠিক-ঠাক করে বসল।

—ষাঁড়ের লড়াইর কথা। ভারোদী ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যেন ষাঁড় কথাটা যুক্ত করল।

হেনরী এক সময় কফি খেতে খেতে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের গল্প করল। দ্বীপের মেয়েদের গল্প বলল। আনারস সংগ্রহের সময়ে বিচিত্র পোশাক অথবা নীল সমুদ্র, দূর থেকে আনারস ক্ষেতগুলোর ভেড়ার পালের মতো দৃশ্য; লম্বা নীল রঙের মেটাল পথ, সমুদ্রের পারে পারে নারকেল কুঞ্জ এবং নারকেল পাতার বিচিত্র টুপি অথবা দ্বীপবাসীদের খালি গা, হালকা পোশাক সবই গল্প বলার সময় অদ্ভুত রহস্যময় হয়ে উঠেছিল। মারিয়া খুব মন দিয়ে দ্বীপের গল্প, বন্দরের গল্প এবং সমুদ্রের গল্প শুনছিল। আর এই সব গল্প ওকে কোনও রূপকথার জগতে যেন নিয়ে যায়, যেন সে কোনও লালরঙের পাহাড়ের গিরিপথ ধরে কোনও ঝরনা আবিষ্কারের জন্য ছুটেছে। দুধারে বিচিত্র সব গাছে বিচিত্র রঙের ফুল এবং নানা দেশের পাখিরা মধু খেতে এসে এক অপরিচিত ফুলের মতো বালিকাকে দেখে মাথার উপর উড়ছিল। আর দূরে কোথাও কোনও কুঁড়ে ঘর আছে এবং ডাইনী আছে অথবা কোনও ড্রাগন সমুদ্রের নীল জল অতিক্রম করে উঠে আসছে। এইসব গল্পের ভিতর ওর লাইটহাউসের ছবি মনে আসছিল, ছোট এক বালক মিকি, বাবা মা লাইটহাউসের কাজ নিয়ে ব্যস্ত, ছোট্ট মিকি একা একা সমুদ্রের ধারে বসে দূরের সব জাহাজ অথবা শুকনো কাঠ ভেসে যেতে দেখছে এবং সেইসব দূরবর্তী জাহাজের মাস্তুল গোনার সময় ওর চোখে মুখে অপরিসীম এক লাবণ্য ভেসে থাকত। সেই মিকি বড় হয়ে যেন সুম্যান হয়ে গেছে—ওজালিও দ্য সুম্যান। মনে হতেই মারিয়া ভিতরে ভিতরে লজ্জায় গুটিয়ে গেল।

সুতরাং মারিয়াকে দেখে মনে হচ্ছিল খুব শান্ত। মারিয়া ছোট-ছোট প্রশ্ন করছিল। এবং সুমন ছোট ছোট জবাব দিচ্ছে। মারিয়ার হাতে সাদা দস্তানা। ক্যানারি পাখিগুলো এলওয়েতে কিচির-মিচির শব্দ

করছে। ভারোদী গল্প প্রসঙ্গে কার্ডিফের কথা বলল, কার্ডিফ ক্যাসেলের কথা বলল এবং সেখানেই তার দুটো নাইটিঙ্গেল পাখি পোষার সখ হয় এ-কথাও ওদের জানাল।

ভারোদী বলল, আমরা গোল্ডেন ঈগল ধরার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করছি। তারপর ট্যাঙ্গানাইকা থেকে আমদানী করতে হয়েছে।

হেনরী বলল, একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে চাই। যদি অনুমতি দাও।

ভারোদী বলল, কী?

—তোমার এই নানা জাতের পাখি পোষার সখ কেন?

ভারোদী প্রথম এড়িয়ে যেতে চাইল। বলল, এই এমনি।

—অসুবিধা হলে থাক।

এবার ভারোদী কিছু স্পষ্ট হল যেন।—স্বামীর মৃত্যুর পর কিছু করার ছিল না। তাছাড়া পাখিদের ডিম ফুটে বাচ্চা দেবার প্রণালী আমাকে প্রেরণা দেয়।

তারপর ভারোদী দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বলল, কিছু করণীয় নেই। নাচ গান হল্লা আর ভাল লাগে না। ন্যাশনাল স্টেটস্ রাইট পার্টির কিছু কাজ থাকে হাতে, বাকি সময় এই পাখিদের নিয়ে। একসময় প্রচুর দেশ ঘুরেছি, কিন্তু সর্বত্রই এক ঘটনা। ঘটনা সম্পর্কে ভারোদী কিছু বিশ্লেষণ করল না।

হেনরী বিলল, গ্যানীকে আসতে বললাম, এল না।

—ওর অনেক কাজ। ওর স্ত্রী মরগানে যাচ্ছে। সেখানে গ্যানীর বড় একটা মদের দোকান আছে। একা বেচারা সব দেখে উঠতে পারে না।

এলওয়েতে মেস রুম-মেটের গলা পাওয়া যাচ্ছে। ফোকসালে এখন নাবিকরা বসে তামাক খাচ্ছে। আর ফল্কার উপর বসে সুচারু সামাদ তিন তাস খেলতে খেলতে চিৎকার করছে।

পাশের জাহাজে যে হত্যাজনিত ঘটনার উত্তেজনা ছিল, তা এখন নেই। কারণ এইমাত্র মৃত লোকটিকে নামিয়ে নেওয়া হয়েছে।

সুমন কেন যে সহসা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করে বসল মারিয়াকে, তোমার সমুদ্রে যেতে ইচ্ছা হয় না।

মারিয়া বলল, না।

সুমন যেন কোনও কথা খুঁজে পাচ্ছে না তখন। কথা বলে অন্তরঙ্গ হওয়ার চেষ্টা, অথচ কোনও গল্পই যেন ভারোদী এবং মারিয়াকে আবিষ্ট করতে পারছে না। অসংলগ্ন কথার জন্য হেনরী খুক খুক করে হেসে ফেলল। সে চোখ টিপল এবং চোখে ইঙ্গিত অর্থাৎ তুমি সুমন ষাঁড় লড়াইয়ের জাত, তোমার আর কতটা বুদ্ধি হবে।

ভারোদী বলল, এত ছোট বয়সে জাহাজে এসেছ, মা রাগ করে না? ভারোদীর চোখে মুখে কেমন একটা ভর্ৎসনার সুর ছিল।

সুমন বলল, না। কেন, না, তা সে আর বিস্তারিত করে বলল না।

বাকিটুকু হেনরী খুলে বলল, কিছুদিন হল ওর মা মারা গেছেন।

ভারোদীর চোখ সহসা ঝাপসা হয়ে গেল। সে সুমনের মুখ দেখল। সে মাথা নিচু করে রেখেছে। পাশে মারিয়া। এই অপ্রীতিকর সংবাদে ওকেও যেন বিচলিত দেখাচ্ছে।

কেবিনে কোনও শব্দ হচ্ছে না তখন। সকলেই চুপচাপ। জেটি অতিক্রম করলে বন্দর এবং দূরে কারখানায় শিফটের বাঁশি বাজছে। তখন ভারোদী উঠে পড়ল। ওঠার সময় ভারোদী হেনরীকে বলল, কাল তোমরা এস।

যাদুকরের পালিত পুত্রের হাতে হাত রাখল মারিয়া। বলল, কাল এস।

এলওয়ে পথে প্রথম ভারোদী এবং পরে হেনরী। আর মারিয়া সুমন পাশাপাশি হাঁটছিল। ওরা কোনও কথা বলছিল না। হেনরী ওদের এনজিন ঘরে নিয়ে গেল। এনজিনের মোটামুটি কাজের প্রকরণগুলি বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল। মারিয়া ভয়ে ভয়ে সিঁড়ি ধরে নামছিল। নিচের দিকে তাকাতে মারিয়ার ভয় লাগছে। আর সুমন লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙছে।

বড় বড় বয়লারগুলো মারিয়ার কাছে দৈত্যের পেটের মতো। সে ভিতরে মুখ রেখে একবার

হা-হা করে উঠল। শব্দটা এনজিন রুমে গম গম করছে। দুটো বয়লার বন্ধ এবং অন্য বয়লারে এখনও কিছু স্টীম আছে। পাশের স্টীম-ককে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ শব্দ উঠছে। আর উপরে বাংকার। কোন আলো নেই সেখানে, খুব অন্ধকার। অন্ধকারে মারিয়া সুমনের হাত ধরে পা টিপে টিপে হাঁটছিল।

হেনরী একসময় বলল, এগুলো কয়লার বাংকার।

সুমন নিচে নেমে বলল, এটা টানেল পথ। ওটা প্রপেলার শ্যাফট।

মারিয়া প্রশ্ন করল, যদি শ্যাফটটা ভেঙে যায়।

—তবে জাহাজ চলবে না।

এতক্ষণ পরে সুমন ওদের সঙ্গে প্রথম খুব সহজভাবে কথা বলতে পারল। এবং ওদের সঙ্গে ওর নিজের পর্বত-প্রমাণ ব্যবধানটা যেন মুহূর্তে ঘুচে গেল। কারণ তাদের এই জাহাজ এবং সারাদিনের নিমিত্ত নিচের ওই শ্যাফট এবং ইনজিনরুমের প্রতিটি ভগ্নাংশ নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো। সুতরাং সে ঠাট্টার সুরে মারিয়াকে বলল, তোমাকে সমুদ্রে নিয়ে যাব মারিয়া।

—আমি যাবই না। মারিয়া লজ্জিত মুখে বলল।

—কত সুন্দর সুন্দর দ্বীপ আছে, বড় টিয়াপাখি আছে।

—থাকুক গে।

—বড় বড় ঝিনুক আছে, ঝিনুকে মুক্তো আছে।

হেনরী সুর ধরে বলল, বড় বড় তিমি মাছ আছে, ডলফিনের ঝাঁক আছে।

ওরা সিঁড়ি ধরে উপরে উঠছিল এবং এইসব বলছিল। হেনরী ভারোদীকে জাহাজটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল। পিছিলে ভারতীয় নাবিকরা ভিড় করে আছে। ভারোদী ওদের দেখে মুখ কোঁচকাল এবং বলল, দি সেম নিগ্রো পিপ্‌ল। হেল্‌। সুচারু কথাটা শুনে ফেলেছে। তার মুখ দিয়ে একটা বাংলা খিস্তি বেরিয়ে গেল।

সামাদ বলল, খুব যে সংস্কৃত আওড়াচ্ছিস।

সুচারু বলল, দেখ সুমনটা পিছনে পিছনে কুকুরের মতো কেমন ছুটছে।

সামাদ বলল, ভাল করছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সুমনটা পারবে না। আমি হলে ও মাগীর বাপের জাত ধরে টান মারতাম।

রাত বলে এবং বন্দরে কোন কাজ হচ্ছে না বলে জাহাজ চুপচাপ হয়ে আছে। জেটি পেরিয়ে ভাঙা টালির ছাদের ঘর। এবং পরে সেই এক মেটাল রোড, পাব, রেস্তোরাঁ এবং কিছু দক্ষিণে হেঁটে গেলে শহরের বাস স্ট্যান্ড। সামনে সোজা হেঁটে গেলে ছোট দুটো পাব, বাজার এবং বড় মাংসের দোকান। আরও পরে গ্যানীর পাব। এখন হয়ত দোকানে গ্যানী নেই। ওরা রাস্তায় পড়লে ভারোদী বলল, কাল তোমরা কিন্তু এস।

পাশে ওদের গাড়ি, ড্রাইভার এবং পরিচারিকা। ঠিক বন্দরের মুখে সুমন আর হেনরী ওদের বিদায় জানাল। সুমন বেশি দূর হেঁটে যেতে সাহস পেল না। পথে ইতস্তত সব সাদা মুখ—সে ভয়ে ফের জাহাজের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করার সময় দেখল হেনরী ওর হাত চেপে ধরেছে। সে বলল, সামনের পাবটা একবার ঘুরে আসি।

সুমন বলল, তুমি যাও। আমার যেতে ভয় করছে। সুমনের মুখ এখন যথার্থই শুকনো দেখাচ্ছে। কাঁচের ঘরের সামনে কাউন্টার আর বারান্দার মতো ব্যালকনি, থরে থরে সিলভার-ওক সাজানো আর জানালাতে সব রঙিন পর্দা। হেনরী সুমনের হাত ধরে পাবের ভিতর যেন জোর করেই ঢুকে গেল।

ওরা দুজন কাউন্টারে লাইন দিয়ে বিয়ার নিল। তারপর পাশের সোফাতে পাশাপাশি বসে যত তাড়াতাড়ি পারল গিলে ফেলল। আর একটু বিয়ার। এবার কাউন্টারে হেনরী একা উঠে গেল। সুমন এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। সকলেই যেন ওকে লক্ষ করছিল অথবা সে এক আশ্চর্য সামগ্রী এবং পাশের বুড়ো লোকটি হেনরীর কানে কানে ফিস ফিস করে কি বলতেই সে বলল, ইয়েস স্ক্যান্ডেনেভিয়ান। যখন যা মুখে আসছে হেনরী সাদা লোকদের সুমন সম্পর্কে বলে যাচ্ছে। সুমন যে ইন্ডিয়ান তা গোপন করে যাচ্ছে।

ক্রমশ সুমনের ভয় ভেঙে যেতে আরম্ভ করছে। পথে সে হেনরীর সঙ্গে কিছুক্ষণ হেঁটে বেড়ালো। সে দূরের অশ্বশালার পাঁচিলের ওপাশে যেতে চাইল অথবা অন্য তীরে যে সব ক্ষেত খামার এবং যেখানে এখনও অন্ধকারে বসন্তের মাঠ পড়ে আছে···সে যেন ভাবল কাল সে কোথাও চলে যাবে আর হয়ত সেইসব মাঠে ট্রাক্টরে চাষ হচ্ছে এখন, আর ধোঁয়া উঠছে। গ্রাম্য মানুষরা ভিড় করছে রোজ পাবে, রেস্তোরাঁয়। ফসল ভাল হয়েছে বলে বড় বড় ছোলা মুরগি বাজারে প্রচুর বিক্রি।

সিঁড়ি ধরে ওরা জাহাজে উঠছিল। গাঙ-ওয়েতে কোয়ার্টার মাস্টার অনুযোগের সুরে বলল, তুমি পালিয়ে কিনার থেকে ঘুরে এলে?

হেনরী আর সুমন দুজনেই টলছিল। উত্তর দিতে গিয়ে ওরা প্রায় দুজনেই একসঙ্গে খেঁকিয়ে উঠল, চুপ রও।

—সাহেব আমি তোমাকে বলছি না। আমি সুমনকে বলছি।

হেনরী এবারেও ধমক দিল।

কোয়ার্টার মাস্টার বলল, সাহেব আমাদের নামা বারণ।

হেনরী আর কোন কথা বলল না। সে সুমনের হাত ধরে এলওয়েতে ঢুকে গেল। সে বিশ্রী রকমের গান গাইছিল। সুমন হেনরীকে কেবিনে রেখে ডেক ধরে গ্যালি অতিক্রম করতেই সারেঙ প্রশ্ন করল, তুই বাইরে কার হুকুমে গেছিলি?

—আমার হুকুমে চাচা। মাপ করবেন।

সারেঙ বলল, বড় মালোমকে বলব।

—বলবেন। সে থেমে মুখের উপর হাত নেড়ে বলল, চাচা একশবার বলবেন।

সুমন ভয়ানক টলছিল বলে সারেঙ আর কথা বলতে সাহস করল না। সারেঙের সব রাগ তখন হেনরীর উপর। সে এই ছোকরা নাবিককে নিয়ে যা খুশি তাই করছে। ধরে নিয়ে মদ খাওয়াচ্ছে। অন্য সব বন্দরেও এগুলো হচ্ছিল। মায়ের মৃত্যু সুমনকে যেন খুব বেপরোয়া করে তুলছে। মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে ওর শেষ ভালবাসার আশ্রয়টুকু গেছে। বন্দরের কোন সুখকেই সে এখন ছেড়ে দিতে চাইছে না। সুতরাং সারেঙ বড়-টিন্ডালকে ডেকে বলল, আমি কিন্তু আর পারছি না বড়-টিন্ডাল। সুমন খুব বে-সামাল হয়ে পড়ছে।

॥ চার ॥

সেদিন ছিল রবিবার। সুতরাং কাজ থেকে ছুটি। বড মালোম, কাপ্তান, ডেক-অ্যাপ্রেন্টিস এবং মেজ মিস্ত্রি এইমাত্র সেজেগুজে চার্চে যাবার জন্য বেরোচ্ছেন। মেজ মালোমের মালপত্র সম্পর্কিত কিছু কাজ ছিল।

নিউ-আর্লিনস থেকে কোম্পানির এজেন্ট আসার কথা আছে। সে জন্য মেজ মালোমকে জাহাজে থাকতেই হল। এক্ষেত্রে হেনরী জাহাজে ব্যক্তিগত কাজের জন্য থেকে গেল। এই অবসর সময়টুকু সে খেয়াল খুশিমতো নিজের কাজ করবে। যেহেতু ভারোদী তার সবুজ রঙের ক্যানারি পাখিটাকে দুর্লভ জাতের বলেছে, এবং এই দুর্লভ পাখির জন্য হন্যে হয়ে ভারোদি ফের জাহাজে উঠে আসতে পারে, সেজন্য সে তার অন্য ক্যানারি পাখিগুলোকেও সবুজ রঙ করতে বসে গেল। বিশেষ করে ভারোদী তার দুর্লভ পাখিটাকে যেন যথার্থই চিনে ফেলেছে। অনেক দুর্ভোগের পর ডাচক্যানারি হল্যান্ড থেকে সে সংগ্রহ করেছিল। শুধু শরীরের জন্য এবং দিনগত পাপক্ষয়ের জন্য এই দামী পাখিটা হাতছাড়া হয়ে যাক—সে তা চাইল না। পাখিটার উপর ভারোদীর ভয়ঙ্কর লোভ। পাখির মাথার নরম কালো রঙের ঝুঁটি ভারোদীকে আকুল করে দেয়, অথবা গলার সুমিষ্ট স্বর। সে রঙ গুলতে বসে গেল। সে বেছে বেছে ঝুঁটিওয়ালা একটা স্কচ-ক্যানারির শরীরে সবুজ রঙ মাখিয়ে দিল এবং ডাচ-ক্যানারির শরীর থেকে সাবান জলে রঙ তুলে ফেলল। স্বাভাবিক রঙের এই পাখিটা ভয়ঙ্কর কুৎসিত, সে পাখিটাকে স্বাভাবিক রঙেই রেখে দিল।

তারপরও হেনরীর হাতে কিছু কাজ থাকে। সে তার হাতুড়ি, বাটালি নিয়ে, কিছু বার্নিস রজন নিয়ে, কিছু কাঠ নিয়ে বসে গেল। বয় এসে কফি দিল, স্যান্ড-উইচ রাখল, এবং আপেল রেখে চলে গেল একটা।

সুমন বাংকে চোখ মেলে দেখল পোর্টহোল দিয়ে রোদ এসে পড়ছে। এই রোদের ভিতর সে হাত রাখল, হাতের রেখা রোদের জন্য ক্রমশ লাল হয়ে উঠছে। সে শুয়ে থেকে হাই তুলল, তারপর রাতের ঘটনার কথা মনে হতেই ফের বালিশে মুখ গুঁজে দেবার ইচ্ছা হল। ওর খুব সঙ্কোচ হচ্ছিল, এতক্ষণে যেন মনে হল সে সারেঙকে অপমান করেছে।

সিঁড়ির মুখে উঠতেই সারেঙের সঙ্গে দেখা। তিনি বললেন, আমি তোর ভালোর জন্যই চিৎকার করি।

সুমন লজ্জিত মুখে বলল, আর যাব না সারেঙ সাব। অথচ এক ভয়ঙ্কর তৃষ্ণা এই মাটির জন্য, গাছগাছালির জন্য এবং ভিতরে ভিতরে উত্তেজক সব চিন্তা সারারাত, সারা মাস ধরে কাজ করছে।

সে ফের বলল, বড় একঘেয়ে লাগছে সারেঙ সাব।

সারেঙ বলল, কী করবি, জায়গাটা ভাল না। যখন তখন এখানে সাদা কালোকে গুম করে দিচ্ছে, কালো সাদাকে। দাঙ্গার সময় ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস।

সুমন বলল, কাল কিন্তু কেউ ধরতে পারেনি সারেঙ সাব। সুমনের রঙটা উজ্জ্বল বলে, এমন হয়েছে সারেঙ মন্তব্য করতে চাইল।

কথাটা বড় মালোমের কানে এবং শেষ পর্যন্ত কাপ্তানের কানে গিয়ে পৌঁছেছিল। কাপ্তান হেনরীকে ডেকে সব খোলাখুলি জানতে চাইলেন। হেনরী গতকালের ঘটনা, ভারোদী এবং মারিয়ার কাছে সুমন, ওজালিও দ্য সুম্যান এই নামের পরিচিতি এবং ঘরে চা খাবার নিমন্ত্রণ সব খুলে বলল, কাপ্তানের মনে এই ছোকরা নাবিকের জন্য প্রথম থেকেই অদ্ভুত সহানুভূতি ছিল। তারপর ওর মা···আহা, সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে। কাপ্তান যেন নিজের সন্তানের কথা মনে করতে পারছেন। কবর ভূমিতে তখন নানা রকম ফুল ফোটার সময়। তিনি দুদিন বেশি সময় রেখেছিলেন হাতে, তিনি যদি ইতিমধ্যে জাহাজ থেকে বিমান যোগে ফিরে যেতে পারেন···অথচ এই জাগতিক ব্যাপারে কত অক্ষম এই ভাবনায় তিনি শুধু বললেন, ঠিক আছে, সাবধানে চলাফেরা করবে। তা ছাড়া কোন এক নাবিক যুবকের চিন্তা, সমুদ্র অতিক্রম করার পর মাটির স্পর্শের জন্য উদ্বিগ্ন হবার চিন্তা বুড়ো বয়সেও কাপ্তান যেন অনুভব করতে পারছেন। বন্দরে এসে নাবিকেরা নামতে পারল না। জাহাজে আটক হয়ে থাকল, বড় দুঃখজনক ঘটনা, বন্দরে নামতে পারছে না জাহাজীরা—এই অপরিসীম বেদনা এখন কাপ্তানকে কাতর করছে।

রবিবার বলে জাহাজীদের কাজ থেকে ছুটি। ডেকে কোনও নাবিকের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। সকলেই ফোকসালে গড়াগড়ি দিয়ে সময় কাটাচ্ছে। কোনও প্রাচীন নাবিক হয়ত এখন ওর প্রথম সফর কিংবা অন্য কোন ন্যক্কারজনক গল্প বলে সকল জাহাজীদের খুশী করছে। কাপ্তান ডেক চেয়ারে বসে ক্রমাগত হাই তুলছেন। বৃদ্ধের মুখে প্রাচীন সফরের বিচিত্র সব গল্প—তিনি তাঁর দীর্ঘ জাহাজী জীবনের কত সব রোমাঞ্চকর ঘটনার কথা মনে করতে পারছেন···কত সব সমুদ্রে কত রঙ-বেরঙের দ্বীপ এবং রঙ-বেরঙের মেয়েমানুষ। দক্ষিণ সমুদ্রে, ট্যারিয়ান্ট আয়র্ল্যান্ডের কথা মনে পড়ল, অসভ্য মেয়েদের পোশাক কামনা বাসনার উদ্রেক করতে ভীষণ পটু···তিনি সেই সব ছবির ভিতর স্পষ্ট চলে যেতে থাকলেন। সারা সফর ধরে তিনি সংযত থাকতে চেয়েছেন, অথচ এক দুর্নিবার আকর্ষণ বন্দরের, মেয়েদের সঙ্গে সহবাসের জন্য জাহাজীরা আকুল, সমুদ্রের লোনা জল কামনার আমোদে মথিত হয়। সেই সব যৌন আকর্ষণের জন্য বুড়ো কাপ্তান যেন এখনও কোন পাবে অথবা রেস্তোরাঁয় চলে যেতে পারেন তারপর দূরে সব জল-জঙ্গল এবং পার্কের অন্ধকার, কখনও জাহাজের দুর্ভেদ্য কেবিনে···আর স্ত্রীর সন্দিগ্ধ মনটা এই করেই বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল একসময়ে এবং তিনি জাহাজেই খবর পেয়েছিলেন, স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে।

তিনি হেনরীকে বললেন, ওকে নিয়ে সাবধানে চলাফেরা করবে।

হেনরী নেমে গেল ডেকে। হেনরী পিছিলে সুচারুকে দেখল। সে আপন মনে দুটো কাঠি বাজাচ্ছে। এবং ডেকের পিছিলে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। হেনরী ডাকল, এই সুচারু।

সুচারু দেশের বৈরাগীদের মতো পা তুলে তুলে নাচছিল এবং কাঠি বাজাচ্ছিল। সে হেনরীর কথা শুনতে পেল না।

অন্য পাশে ডেক-সারেঙ, এনজিন-সারেঙ বসে বসে গল্প করছিল। বড়-টিন্ডাল ফোকসালে কোরাণ শরীফ পড়ছে। ডংকিম্যান বচসা করছে ভাণ্ডারীর সঙ্গে বিশুর গোস্ত নিয়ে। রাগে দুঃখে ভাণ্ডারী বড় বড় টুকরো করে মাংস কাটছিল। বন্দরের নতুন আমদানী মাংস বলে সোঁদা গন্ধ উঠছে না। হেনরী এইসব দেখতে দেখতে সুমনের ফোকসালে নেমে গেল। দেখল ফোকসাল খালি, দেখল ছোট-টিন্ডাল সুচারুর বাংকে উপুড় হয়ে দেশে খত লিখছে। কোমরের লুঙ্গিটা অনেকটা নেমে গেছে। হেনরী সন্তর্পণে ভিতরে ঢুকে টিন্ডালের লুঙ্গি আর একটু নামিয়ে দিতেই ছোট-টিন্ডাল বলে উঠল, তোবা তোবা। সে পরে বলল, সালাম সাব।

হেনরী বলল, সালাম।

টিন্ডাল তাড়াতাড়ি উঠে পড়তে চাইলে ওকে বসতে বলে হেনরী, সুমন সম্পর্কে প্রশ্ন করল, ছোঁড়াটা কোথায়?

টিন্ডাল বলল, জানি না সাব।

—জান না তো বসে বসে কি করছ? হেনরী কৃত্রিম ভর্ৎসনা করল।

—খত লিখছি সাব।

—কার কাছে?

—বিবির কাছে।

—কি লিখলে পড়ে শোনাও তো। হেনরী ঠাট্টা করে বলল।

—ওটা বলতে নেই সাব।

—কি হয় বললে?

—গুণা হয়। বিবি পরানের ধন। তার কথা মাইনষেরে কইতে নাই।

—সাবাস। হেনরীর যেন মনে হল বিবি যথার্থই পরানের ধন। পাশের বাংকে সামাদ বুকের নিচে বালিশ রেখে নুয়ে নুয়ে কী সব দেখছে। হেনরীর এবং টিন্ডালের কোন কথাই সে যেন শুনতে পাচ্ছে না। সে শুয়ে শুয়ে কিছু অশ্লীল ছবি দেখছিল। প্রতিটি ছবি দেখার পর সংগোপনে বালিশের নিচে লুকিয়ে ফেলছে। হেনরী সামাদকে বলল, কি করছ?

সামাদ উপরের বাংকে বলে, হেনরী নিচে থেকে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না; বেঁটেখাটো এই মানুষটি উঁকি দিতে চাইল না। শুধু বলল, সুমন কোথায় বলতে পারো?

—হ্যাঁ সাব। বাথরুমে গেছে সুমন।

ছবিগুলি প্রতিটিই অশ্লীল। নিঃসঙ্গ এই জীবনে এই ছবিগুলিই সামাদের একমাত্র সম্বল। সে এইসব ছবির ভিতর সালিমার মুখ হারিয়ে ফেলে। সে ওর বিবির কথা সমুদ্রে এসে ভুলে যায়। এখন এই অরুচিকর নগ্ন ছবিই তার পরানের ধন, জীবনধারণের উপকরণ। সে সেজন্য চোখ দুটো হেনরীর দিকে জুল্ জুল্ করে রাখল। হেনরীর কথা সে যথার্থই এতক্ষণ শুনতে পাচ্ছিল না, যেন সে অন্য কোনও আমুদে মুগ্ধ হয়েছিল।

হেনরী উপরে ওঠার আগে একবার স্টিয়ারিং এনজিনে ঢুকে টর্চ মেরে কি সব দেখল, অদ্ভুত এক শব্দ আসছে, ওর সন্দেহ হল—কারা যেন ফিস ফিস করে কথা বলছে, কোথাও। সে চারিদিকটা ভাল করে টর্চ মেরে দেখল। এনজিন ঘরটা এখানে খুবই অন্ধকার। দিনের বেলাতেও আলো ঢুকতে চায় না। ভৌতিক ঘটনার মতো আশ্চর্য করে দিচ্ছে তাকে। সে এনজিন-সারেঙকে ডেকে বলতেই তিনি হেসে ফেলেন। ওরা দুজনে এবার উঁকি দিয়ে দেখলেন নদীর জল, দুটো ভাঙা টিনের বাক্‌সে ধাক্কা খাচ্ছে। এবং শব্দ তুলছে। শব্দটা তেল-জল নির্গমনের পথ ধরে উপরে উঠে আসছিল। এবং ফিস্ ফিস্ শব্দের মতো ইনজিনের উপর ছড়িয়ে পড়ছিল।

হেনরী বলল, কার কাজ?

—সুচারুর। বিকেলে বঁড়শি ফেলে ছোট ছোট সারডিন ধরবে বলছে।

হেনরী উপরে ওঠার সময় ভাবল, ভারোদীকে আর একবার এই পিছিলে এনে ভৌতিক শব্দটা শুনিয়ে দেবে। ভারোদী ওর পাখিটার জন্য পাগল—ওটা কেন যে মরতে সে রঙ করতে গেছিল, ভেবে পেল না। সে তার সব রঙ গুলে সব পাখিগুলোকে বিচিত্র রকমের পাখি করে রেখেছে। ভারোদীকে ঠকাবার জন্য ভাল জাতের পাখিগুলোর সব রঙ তুলে ফেলেছে। হেনরী সিঁড়ি ধরে উঠতে উঠতে ভাবল, এই ভাল। ভারোদীকে নানা রকমের প্রলোভনে মত্ত করতে হবে এবং ভারোদীর জন্য সে নানারকম কৌশল আয়ত্ত করছে। এই বন্দর, বন্দর পথ এবং পারসিমন গাছের সুমিষ্ট গন্ধের ভিতর ভারোদীর আযত চোখ অথবা যৌবন—সব নিয়ে এক খেলা, হেনরী সেজন্য পাগলের মতো সুমনকে খুঁজতে আরম্ভ করেছে। কারণ কাপ্তানের সব কথা সুমনকে বলা হয় নি। সুমন অলীক ওলাজিও নামক ষাঁড় লড়াইয়ের বংশধর। আর এই চালিয়াতি মার্কা পরিকল্পনার ভিতর দিনগুলো মন্দ যাবে না—নাবিক জীবনে এর চেয়ে অধিক মহৎ আর কী করণীয় আছে। শুধু দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রা, বন্দরে বন্দরে অপরিচিত মুখ, দুদিনের আবাসস্থল—আবার সমুদ্র এবং সমুদ্রে কখনও দ্বীপ কখনও নারিকেল কুঞ্জ, জাহাজের মাস্তুল রঙ করা, চিমনি রঙ করা, নিচে বয়লার এবং বাংকারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অমানুষিক খাটুনি অথবা ইকুয়েডরের উষ্ণ প্রবাহে সবই ক্লান্তিকর। বন্দরে রমণীর মুখ শুধু শুভবার্তা বহন করে আনে। সে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গলা ছেড়ে হাঁকল, সুমন…পরে কিছুটা বিকৃত গলায় মস্করা করতে চাইল, সুম্যান দ্য ওজালিও।

বাথরুম থেকে সুমন উত্তর করল, এই যে যাচ্ছি।

হেনরী ফের ঠাট্টা করে বলল, ভিতরে ওজালিও দ্য সুম্যান আছেন?

সুমন বলল, আছেন। ভিতরের লোকটি জানতে চাইছেন কথাটা সুম্যান দ্য ওজালিও অথবা ওজালিও দ্য সুম্যান?

—সেটা মালিকের ইচ্ছা।

—সেটা উল্টা-পাল্টা হলে ধরে ফেলবে।

—ধরে ফেলবে! দেখি মুখটা? বলে সুমন বের হতেই ওর চিবুক ধরে নাড়া দিল এবং পরস্পর হাসতে হাসতে পিছনের দিকে বেঁকে গেল।

—খুব ভাল খবর আছে। হেনরী সহসা হাসি থামিয়ে মুখে রহস্যজনক ছবি ফুটিয়ে তুলল।

—খুব ভাল খবর?

—খু-উ-উ-ব। কাপ্তান কিনারায় ছোকরা নাবিককে দেখেশুনে রাখতে বলেছেন। বলেছেন ওটা তো বাচাল ছোকরা। কিসে কি বলে ফেলবে!

—ঠাট্টা হচ্ছে?

—আরে না। ঠাট্টা কেন করব। হেনরী এবার সবটা খুলে বলল।

সুমন সব শুনে আশ্চর্য এবং ভিতরে যে ভয়টুকুর জন্য সে কাল সারারাত ভাল ঘুমোতে পারে নি, কারণ কাপ্তান তাকে ডেকে শাসন করতে পারেন এবং লগ বুকে নাম তুলতে পারেন—কত রকমের ভয় এইসব জাহাজীদের, সে সেজন্যে অনেকটা হালকা বোধ করছে। সে অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বলল, সত্যি?

—হ্যাঁ সত্যি। বলেছেন, সাবধানে চলাফেরা করতে।

—আমার কিন্তু খুব ভয় করছে হেনরী।

—তা হলে যাবে না। আমি একাই যাব।

সুমন কিছুক্ষণ কি ভাবল। মাটির টান এবং মারিয়ার নীল চোখ নেশার মতো ওকে টানছে। সুমন তারপর কি ভেবে বলল, দরকার নেই ঝুট ঝামেলার। আমার কথা বললে বরং বলবে ওজালিও দ্য সুম্যান অসুস্থ।

—তা হলে মা আর মেয়ে একেবারে এই ফোকসালে। হাতেনাতে ধরা পড়বে। ওরা মাতৃহীন বালককে অসুস্থ জেনে নিশ্চয়ই বসে থাকবে না।

সুমন বলল, তবে বলবে…অথচ কি বলতে হবে ভেবে পেল না। সে ফ্যাল ফ্যাল করে হেনরীর দিকে তাকিয়ে থাকল।

—কী বলব বল?

—বলবে, এই একটা কিছু বলে দেবে।

—এ তো তোমার মা নন, যে লায়েক ছেলে, যা বোঝাবে তাই বুঝবে!

সুমন বলল, তবে যাওয়াই যাক। মারিয়ার সঙ্গে চেঁচামেচি করে ছুটোছুটি করে বিকেলটা কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

॥ পাঁচ ॥

দুপুরের দিকে যখন জাহাজের সবাই যে যার ফোকসালে দিবানিদ্রার জন্য শুয়ে পড়েছে, একমাত্র কোয়ার্টার মাস্টার যখন গ্যাঙওয়েতে পাহারা দিচ্ছিলেন এবং এনজিনরুমে একমাত্র ফায়ারম্যান ইদ্রিশালী, তখন সুচারু চুপি চুপি হেনরীর কেবিনে ঢুকে বলল, আমার কোনও খবর আছে?

হেনরী সুচারুকে দেখল। গলায় রুপোর হার এবং সেখানে সোনার ক্রস ঝুলছে। হেনরী সুচারুকে বলল, তেমন কিছু চোখে পড়ছে না।

সুচারু নিজের হাত বাড়িয়ে বলল, দেখবে, বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলের সঙ্গে ছোট একটা আঙুল আছে।

—তুমি আমাকে আগেই বলেছ।

—ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনী দেখলেই কথা নেই, ঝুঁকে পড়বে।

—পড়ব।

—জানো হেনরী, আমি আজ হোক কাল হোক ওকে খুঁজে পাবই।

হেনরী আজ আর হাসল না। কোথাও সুচারুর এমন দুঃখ নিহিত আছে যে সে ছেলেমানুষের মতো দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বন্দরে বন্দরে ঘুরছে। হেনরী শুধু বলল, সব সময় আমি তোমার কথা মনে রাখি। বন্দরে নামলে তোমার কথা বেশি মনে হয়।

বিকেলে হেনরীর কেবিনে সুমন খুব হৈ-চৈ করছিল। কারণ হেনরী অদ্ভুত রঙের একটা ক্যানারি পাখির পায়ে সরু শেকল লাগিয়েছে। হাতে বালার মতো সরু ইস্পাতের চুড়ি, তাতে ক্যানারি পাখিটাকে ক্লিপ দিয়ে এঁটে নিয়েছে। পাখিটা উড়ে উড়ে হেনরীর কাঁধে, মাথায় বসছিল। যাতে পাখিটা কাঁধে মাথায় হেগে না দেয়, যাতে পাখিটা অযথা যখন তখন মলমূত্র ত্যাগ না করতে পারে তার জন্য সারা দুপুর পাখিটা ওর বরাদ্দ খাবার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সুমন এ-সব দেখে বিরক্ত হয়ে বলল, এটা কি হচ্ছে?

—ভারোদীর জন্য পাখিটা নিয়ে যাচ্ছি।

—তার জন্য সং সেজে!

—সং কোথায় দেখলে।

—সং নয় এটা! হাতে ইস্পাতের চুড়ি, বগলে মিলিটারী কায়দায় ফিতে লাগানো।

—আমি এ-ভাবে অনেক বন্দর ঘুরেছি। এটা আমার প্রথম নয়। তারপর হেনরী দেয়ালের একটা ফটো দেখিয়ে বলল, ওটা দেখলে তোমার নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতে অসুবিধা হবে না।

সুমন দেয়ালের ছবি দেখে বুঝতে পারছে এক সময় হেনরী বন্দরে এই ক্যানারি পাখি হাতে বেঁধে ঘুরেছে। সুমন বলল, এই ছবিটা প্রথম দেখলাম। কোথায় ছিল ছবিটা। আগে দ্যাখাও নিতো!

—লকারে ভরা ছিল। আজ পাখিটা হাতে বাঁধতেই ছবিটার কথা মনে হল।

—সুতরাং ছবিটা দেয়ালে টাঙিয়ে রাখলে।

—সঙ্গে আজ বড় বেশি বৌয়ের কথা মনে পড়ছে।

—হঠাৎ?

—এই পাখিদের জন্য বৌয়ের সঙ্গে বিবাদ। হেনরী যেন বড় বেশি দূর থেকে কথা বলছে এখন। সে ফের বলল, বিবাদ-বিসম্বাদ থেকে কত রকমের অশান্তি এবং অনেক ঘটনা যা তুমি এখনও জান না সুমন। হেনরী এইটুকু বলে অন্যমনস্কের মতো মুখ করে রাখল।

জামার হাত গুটনো ছিল বলে হাতের উল্কি দেখা যাচ্ছে হেনরীর—উল্কিতে উলঙ্গ পরীর ছবি, মাথায় ক্রস, তার নিচে ইস্পাতের চুড়ি। আর ওদের দুজনের মাথায় ফেল্ট ক্যাপ ছিল, ওরা দুজনই হাতি-ঘোড়া ছবি আঁকা হাওয়াইন শার্ট পরেছিল।

গ্যাঙওয়েতে কোয়ার্টার মাস্টার বলল, সুমন তুমি ফের!

হেনরী কাপ্তানের সম্মতির কথা জানাল। তারপর শিস দিতে দিতে ওরা সিঁড়ি ধরে লাফিয়ে নেমে গেল।

রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সুচারু, সামাদ। ওরা দেখল হেনরী এবং সুমন ক্রমশ জেটি ধরে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। ডেক থেকে সারেঙ দেখল, ওরা হেঁটে হেঁটে জেটি ধরে শহরের দিকে যাচ্ছে। কাপ্তান ব্রীজ থেকে দেখল, ওরা মসৃণ ঘাসের মাঠ অতিক্রম করে শহরের পথে উঠে যাচ্ছে।

তখন সুমন হেনরীকে না বলে পারল না দারুন, দারুন—এই মাঠের ঘাসে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে। লাফাতে ইচ্ছে হচ্ছে। সুমন খেলোয়াড়ের ভঙ্গিতে দু'টোয়ের উপর ভর করে ঘোড়ার কদম দেবার মতো কিছুক্ষণ অকারণ পুলকে লাফাল।

হেনরী যত হাঁটছিল পাখিটা তত মাথায় উড়ছিল আর এক বিশ্রী রকমের শব্দ চিপ-চিপ, চিপ-চিপ। এত সাবধানতা সত্ত্বেও পাখিটা একবার ওর মাথায় মুখে মুতে দিল। হেনরী খিস্তি করে বলল, শালা মুরগির বাচ্চা।

সুমন ও হেনরীকে শহরের কিছু নাবালক এবং বৃদ্ধ যাদের হাতে কোন কাজ নেই এবং যারা বিশ্রী রকমের অসভ্যতা করতে ভালবাসে তারা ঘিরে ধরেছে। এই পাখির জন্য যেন হেনরী বাঁদরওয়ালা—আশেপাশের দোকানে অথবা জানলায় মুখ, বাঁদরনাচ দেখার বাসনার মতো মুখ বার করে রেখেছে সাদা মানুষরা। কোন নিগ্রো পুরুষ রমণী চোখে পড়ছে না। ওরা বুঝল এই শহর সংরক্ষিত অঞ্চল। দূরে কিছু বস্তি অঞ্চল চোখে পড়ছে। সেখানে হেঁটে গেলে ভাঙা গীর্জা চোখে পড়বে, ভাঙা টালির ছাদ চোখে পড়বে। খালি গা, ছেঁড়া প্যান্ট পরে কোমরে বেল্ট এঁটে মানুষগুলো মদের দোকানে এখন হয়ত সস্তা মদ গিলছে।

লুসিয়ানার এই বন্দর শুধু সালফার কম্পানীর জন্য বিখ্যাত। কিছু তেলের পিপে আছে। এবং অনেক দূরে একটা দুটো অয়েল ট্যাঙ্কার দেখা যাচ্ছে। যুবতীদের গড়ন লম্বা, কাছিমের পিঠের মতো বলিষ্ঠ পাছা। আর এই সব যৌবনের জন্য, নীল চোখের জন্য এবং যৌনতার সুরসুরিতে ওরা দ্রুত হাঁটছিল। বিকেলের সূর্য এবারে অস্ত যাচ্ছে। ঘন পপলারের ফাঁকে ফাঁকে সূর্যের নরম আলোতে ঘাস মাঠ ফুল হলুদ রঙের মতো—তার উপর দিয়ে সব ছোট ছোট ওয়ারবলার পাখি কার্পাসের জমিতে ফিরে যাচ্ছে। ওরা বিরাট অশ্বশালার পাশ দিয়ে হাঁটছিল। ওরা পুরোনো দুর্গের মতো বাড়ি অতিক্রম করে গেল এবং মনে হচ্ছে ওরা শহরের খুব ভিতরে ঢুকে গেছে।

সুমন বলল, একটা ট্যাকশি ধরা যাক।

—বেশ তো হেঁটে চলে এলাম।

সদর রাস্তার দুধারে বড় বড় বাড়ি। বাস চলছে। গাড়ি অনবরত হর্ন দিচ্ছে। ফুটপাতে মানুষের ভিড় নেই বললেই চলে। বাড়ির সামনে সদর দরজার উপর মৌ-টুসি লতার ঝাড় অথবা লতানো গোলাপের কুঞ্জ। বাগানে থোকা-থোকা হলুদ রঙের স্কাইলার্ক ফুল আর মাঠে সোনালি চুলের মেয়েরা টেনিস খেলছে। যেন কোথাও এতটুকু সংকীর্ণতা নেই, মানুষের অন্তরে ঘৃণা নেই—সবাই ভালবাসার কাঙাল, ওরা দুজনে এই ভালবাসার অন্বেষণে হন্যে হয়ে ঘুরছিল। ঠিক তখনই ঝকঝকে গাড়ির ভিতর থেকে চেঁচিয়ে উঠল মারিয়া, হেই।

ভারোদী বলল, আমরা জাহাজে তোমাদের আনতে গেছিলাম।

হেনরী বলল, এমন তো কথা ছিল না।

মারিয়া বলল, কথায় কথায় কাল একেবারে ভুলে গেছিলাম বলতে। আজ দুপুরে মনে হল, গাড়ি পাঠানো দরকার। মারিয়া এক ফাঁকে ওজালিও দ্য সুম্যানকে দেখে নিল। যাদুকরের পালিত পুত্রকে বড় গম্ভীর মনে হচ্ছে। সে হাত বাড়িয়ে দিল হ্যান্ডশেক করার জন্য। প্রশ্ন করল, শহরটা কেমন লাগছে?

—ভাল। সুমন সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে গাড়ির ভিতর ঢুকে গেল।

গাড়িতে ঢোকার সময় ক্যানারি পাখিটা অনেকক্ষণ ধরে পাখা ঝাপটাল। ভয়ে পাখিটা চোখ উল্টে দিচ্ছে বার বার। ভারোদী ওর মাথায় ফুঁ দিল। আদর করার মতো হাত বুলিয়ে গাড়ি স্টার্ট দেবার সময় বলল, সারাদিন আমি নিজে তদারক করেছি ওর ঘরের জন্য। ঘরটাতে দুটো গোল্ডেন উড-পেকার ছিল। গত শীতে ওরা মারা গেছে। এত যত্ন সত্ত্বেও ওদের বাঁচানো গেল না। ভারোদী আফসোসের ভঙ্গিতে হেনরীর দিকে তাকাল।

সূর্য অস্ত গেছে। নাচঘরের দরজায় ব্যান্ড বাজছে। ওজালিও দ্য সুম্যান গাড়ির পিছনে বসে শহরের বাড়ি-ঘর দেখছিল। কোথাও বেদীর মতো এপিথাপের চিহ্ন। ওরা হ্রদের পাড় ধরে যাচ্ছে। কিছু স্কীপ হ্রদের জলে, কিছু ফানুস কোথাও হাওয়ায় পুড়ছে। শহরটা হ্রদের বুকে রুপালী ছবির মতো ভাসছিল।

ওরা আসতেই সদর দরজার লোহার বড় গেট খুলে গেল। বড় এবং প্রাচীন দুর্গের মতো বাড়ি। উঁচু দেয়াল। দেয়ালের মাথায় সরু লোহার তাব এবং বকের ধারালো ঠোঁটের মতো ছুরির ফলা। সামনে প্রশস্ত মাঠ, পাঁচিল সংলগ্ন বড় ম্যাপল গাছের ছায়া আর ফাঁকে ফাঁকে আলোর ডুম জ্বলছে। দেয়ালে পোর্টহোলের মতো গবাক্ষ পথ। কোথাও অর্কেডিয়ানের সুর থেকে থেকে বেজে উঠছিল। বাড়ির শীর্ষে নেকড়ের ছবি—পারিবারিক চিহ্ন। অভিজাত এই বংশের মর্যাদা পড়তির মুখে অথবা গৌরব অস্তমিত, হেনরী বসে বসে এই সব ভাবছিল।

মোটর ছোট কৃত্রিম পাহাড়ের মতো জায়গাটুকু অতিক্রম করে বড় প্যাসেজের ভিতর ঢুকে গেল। বড় নিঃস্তব্ধ মনে হচ্ছে, অতিকায় এই বাড়ির ভিতর মানুষের সাড়া বিশেষ পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু এক বৃদ্ধ ওদের জন্য পার্লারে প্রতীক্ষা করছিলেন।

কারস্টেন ট্যালডন নাম এবং পরিচয় দিয়ে ভারোদি বলল, আমার শ্বশুর মশাই।

হেনরী এবং সুমন অভিবাদন জানাল।

ওরা নাবিক—এই পরিচয়, তারপর ভারোদী তার সেই বিচিত্র পাখিটার কথা বলল, বলল গ্যানীর মারফত এই নাবিকদের সঙ্গে সংযোগ। ওদের জাহাজ এখন বন্দরে, কোনও কাজ হচ্ছে না—ডক শ্রমিকরা ধর্মঘট করেছে, সুতরাং অবসর সময়টুকু শহরের কোথাও না কোথাও ঘুরে বেড়ানো···পাখিটা বড় বিশ্রীভাবে ডাকছে! ভারোদী এবার ক্যানারি পাখিটাকে নিজের হাতে নিয়ে মাথায় ফুঁ দিতে থাকল—আর ডাকছে না। ওরা এবার নিশ্চিন্তে সবাই যেন সোফায় বসতে পারে। বৃদ্ধও বসে পড়লেন। বিদেশী নাবিকদের কাছ থেকে দ্বীপ অথবা সমুদ্রের অভিজ্ঞতার কথা কে না জানতে চায়!

মারিয়া দাদুকে বলল, জান দাদু ইনি ওজালিও দ্য সুম্যান। ওর ঠাকুরদা বিখ্যাত একজন ম্যাটাডর ছিলেন।

বৃদ্ধ বললেন, তুমি খোকা স্পেন থেকে এসেছ? স্পেন বড় সুন্দর দেশ। কিছু পাহাড় আছে শুনেছি। ছোট ছোট পাহাড়ের নিচে ছবির মতো গ্রাম। বড় ইচ্ছা কোথাও বের হয়ে পড়ি, কিন্তু হল না। বৃদ্ধ কথাপ্রসঙ্গে স্পেনের বিখ্যাত জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নাম করলেন এবং আরও কী বলতে যাচ্ছিলেন, মারিয়া তাড়াতাড়ি ডাকল, দাদু দাদু!

মারিয়া ওদের দিকে চোখ তুলে দেখল। ভারোদী বৃদ্ধের হাত ধরে বললেন, তুমি চল এবার, খাবার সময় হয়ে গেছে। যেন ভারোদী জোর করেই বৃদ্ধকে তুলে নিল। বৃদ্ধ হেঁটে চলে যাচ্ছেন। প্রাচীন দুর্গের মতো এই বাড়ির সরু সব প্যাসেজ—পায়ের চটির শব্দ বহু দূর থেকে যেন ভেসে আসছে।

ভারোদী বলল, ছেলে মারা যাবার পর থেকেই খুব ইমোশানে ভুগছেন। এক্ষুনি হয়ত কেঁদে ফেলতেন।

ভারোদী বলল, লিঙ্কনের আমলের বাড়ি। গৃহযুদ্ধে ওঁদের পূর্বপুরুষ লড়াই করেছেন। বহু বীরগাথা এখনও এ-বাড়ি সম্পর্কে প্রচলিত। এক্ষুনি তিনি কেঁদে কেটে সেই বীরগাথা তোমাদের শোনাতে থাকবেন। তোমরা বিব্রত হও চাই না। ভারোদী ব্যাজার মুখ নিয়ে বসে থাকল। বাইরে ইতস্তত দু-একজন পরিচারিকার পায়ের শব্দ ভেসে আসছে, এবং বাগানের মালি রেড-ইন্ডিয়ান যুবকটি করিডরে অপেক্ষা করছিল। ভারোদী ডাকলেই ঢুকবে, এ-মত চোখ-মুখ যেন।

—কফি খাবার আগে বরং বাড়িটা তোমাদের দেখানো যাক। এই বলে ভারোদী তার যুবক পরিচারককে ডাকলেন। যুবক সামনের সব দরজা খুলে দিচ্ছে। পরিচারক এক এক করে বড় বড় কাঠের দরজা টেনে খুলে দিতেই মনে হল এই দুর্লভ পাথরের দেয়ালের ভিতর মারিয়া ফুলের মতো। ভারোদীর হাতের উপর ক্যানারি পাখি। সে পরিচারকের হাতে পাখিটা দিয়ে আগে হাঁটতে থাকল। ঘরের পর ঘর এবং অদ্ভুত সব গলিপথ। বেঁকে বেঁকে চলে গেছে, শেষ হচ্ছে না। ওরা বড় হলঘরের ভিতর এসে ঢুকল। বড় বড় শ্বেত-পাথরের সব মূর্তি, অধিকাংশ পুরুষ মানুষের এবং নগ্ন। দেয়ালে পরিবারের ঐতিহাসিক পুরুষদের তৈলচিত্র। বড় কালো গ্রানাইট পাথরের টেবিলে ফুলের বড় ভাস। দুর্লভ গোলাপের গুচ্ছ সাজানো, কোনায় বড় পিয়ানো, উপরে ঝাড় লণ্ঠন। আর গ্রানাইট পাথরের মসৃণ মেঝে। ভারোদী বলল, এটা আগে নাচঘর হিসাবে ব্যবহৃত হত। আর ছোট্ট দরজা দিয়ে ওরা প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে অন্য এক অপ্রশস্ত ঘরে ঢুকে গেল। একটু অন্ধকার-অন্ধকার মনে হচ্ছে। ভিতরে ঢুকে কি টিপে দিতেই ভয়ঙ্কর লাল আলোতে ঘরটা ভরে গেল। বিচিত্র সব ছবি দেয়ালে সাজানো। কোথাও রেড ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে প্রথম উপনিবেশ স্থাপনের সময়কার যুদ্ধের দলিল, কোথাও বিস্তীর্ণ মাঠে শাস্তির বিকল্প হিসাবে কোন নিগ্রো পুরুষের অঙ্গহানি করা হচ্ছে—বড় নৃশংস ঘটনা, সুমন চোখ বুজে ফেলল। আর ঠিক পরবর্তী ছবিতে একটা ঈগল পাখিকে খাবার লোভে রেটল সাপটা লাফ দিচ্ছিল। পাখিটা সাপটাব গলা ফুটো করে দিয়েছে। চোখ দুটো সাপের গাল থেকে যেন ঝুলে পড়ছে। ওরা ক্রমশ পর পর সব ঘর অতিক্রম করতে করতে চলে গেল। ঘরগুলোতে অস্পষ্ট অন্ধকার এবং রহস্যের গন্ধ যেন এই বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে বিদ্যমান। একটা পুরানো গন্ধ এই দুর্গের মতো বাড়ির দেয়ালে। বহু পুরানো ফ্যাসনের নিদর্শন এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে। তারপর সামনে ফের বড় বড় হল ঘর, এইসব ঘর অতিক্রম করার সময় ভারোদী এই বংশের নানারকমের বীরগাথা শোনাচ্ছিল। শ্বেতকায় জাতির অধঃপতন আর ওরা জার্মানী থেকে আগত—রক্তে পুরোপুরি আর্য—দাসপ্রথার শেষ সুবিধাটুকু পর্যন্ত উঠে যাচ্ছে এবং বড় কষ্টকর জীবন এই শ্বেতকায় মানুষদের; জীবন মাত্রেই একে অপরের দাস এবং এ ভাবেই সভ্যতা গড়ে উঠছে। যেন সব বক্তব্যে এই অহঙ্কারটুকু ধরা পড়ছিল ভারোদীর—মহান ব্যক্তিরা সব গোরু ঘোড়াকেও স্বাধীন করে দেবার সপক্ষে। এই অসম্মানের বিরুদ্ধে হেনরী, আমাদের আমৃত্যু লড়াই; কেমন এক নেশাগ্রস্থ রমণীর মতো ভারোদী এই সব কথা বলে যাচ্ছিল। ভারোদীকে এখন আর চেনাই যাচ্ছে না। সুমনের মনে হল এ-দেশের সাদা-কালোর ব্যাপারটা ভারোদীর কাছে কোন বন্য জীবের সঙ্গে সুন্দরী রমণীর সহবাসের মতো। এত বর্ণবিদ্বেষ যে মুখে প্রচণ্ড ঘৃণা ফুটে উঠছিল ভারোদীর।

তখন হেনরী বলল, নিগ্রো যুবকের অঙ্গহানির ছবিটা বড় নৃশংস দেখাচ্ছে।

ভারোদী প্রচণ্ড হেসে উঠল। এই ভীতিকর হাসির জন্য সুমন কিছুটা হতবাক হয়ে গেল।

সে ভয়ে গুটিয়ে আসছে। মারিয়া পাশে নেই। কোথায় গেল মারিয়া! মারিয়া পাশে না থাকায় সে বড়ই অসহায় বোধ করছে। সে তাড়াতাড়ি একজন পরিচারকের সঙ্গে খোলা মাঠে নেমে গেল। মারিয়া করিডরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে সুমনকে ফুলের বাগানে নেমে যেতে দেখে হাসছিল। সুমন দেখল এই মিষ্টি মেয়ের মুখ বর্ণ-সংস্কারে এখনও আক্রান্ত নয়। শুধু নিগ্রোদের সম্পর্কে এক অহেতুক ভীতি রয়েছে। সে দূরের কোন এক নিগ্রো পল্লীর কথা বলল। একবার নিউ-অর্লিনস হয়ে ডালাস যাবার পথে নিগ্রো পল্লীর ভিতর দিয়ে যেতে যেতে ওদের দারিদ্র্য, ওদের অপরিচ্ছন্নতা ওকে কী ভাবে আকুল করেছিল,—সে সব গল্প করার সময় সে দেখল, তার মা হেঁটে যাচ্ছেন। সে সুমনের হাত ছেড়ে দিল। হেনরী মা'র সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছে, দাদু তাঁর ঘব থেকে উঁকি দিয়ে ওদের চুপি চুপি দেখছেন। মারিয়া চুপ

করে গোপনে সুমনের হাতে দুটো চকোলেট দিয়ে বলল, কাল তুমি আমার ঘরে এসে বসবে ওজালিও। আমার অনেক সুন্দর সুন্দর বই আছে আমি তোমাকে দেখাব।

সুমন সেই ফুলের জগৎ থেকে দেখল, ভারোদী এবং হেনরী অনেকগুলো অপরিচিত গাছের ফাঁকে হারিয়ে যাচ্ছে। তারপর একটা ঘরের দরজা খুলে দিতেই ডজন খানেক ডালকুত্তা ছুটে বের হয়ে যাচ্ছে। কুকুরগুলো রাক্ষসের মতো বাড়িময় ছুটে বেড়াতে থাকল আর ঘেউ ঘেউ করছে। হেনরীকে আঙুল তুলে কুকুরগুলির জন্ম পরিচয় দেবার সময় হাসতে হাসতে ভারেদী কী সব যেন অশ্লীল ইঙ্গিত করছিল।

সুমন বলল, এই সব কুকুর দিয়ে কী হয়?

মারিয়া বলল, আমি জানি না। শুধু মাঝে মাঝে কিছু অপরিচিত মানুষ এ-বাড়িতে জড়ো হন কোনদিন। তখন ওঁরা কুকুরগুলো নিয়ে কোথায় যান আমি জানি না।

এই বাড়ির ভিতর, এই আলো এবং সমারোহের ভিতর সুমনের মনে হল মারিয়াও খুব নিঃসঙ্গ। ভারোদী মারিয়ার জন্য প্রায় ভিন্ন মহলের মতো করে দিয়েছে। সেখানে একজন পরিচারকের তত্ত্বাবধানে মারিয়া ক্রমশ বড় হচ্ছিল এবং সংসারের কোথাও কোথাও এক ভয়ঙ্কর নৃশংস ঘটনা ঘটছে যা মারিয়া দেখতে পাচ্ছে না অথচ অনুভব করতে পারছে। মারিয়া ঘাসের উপর বসে অপলক যাদুকরের পালিত পুত্রের মুখ দেখতে থাকল। সেইসব ডালকুত্তাগুলো এখন বাড়িময় ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর অনর্থক ঘেউ ঘেউ করে দুর্গের মতো এই বাড়ির পাথরের প্রাচীন দেয়ালে মাথা ঘসছে।

তখন মারিয়া খুব আস্তে আস্তে ডাকল, ওজালিও।

॥ ছয় ॥

জাহাজ দীর্ঘদিন পর বন্দর ধরেছে। এবং সম্প্রতি খবর, ধর্মঘটীরা আপোসকামী। ডক-কর্তৃপক্ষ ওদের শর্তগুলি পুনরায় বিবেচনা করে দেখছেন।

কাপ্তান বড় মালোমকে ডেকে বললেন, আগামী কাল থেকে মনে হয় ডকে ফের স্বাভাবিক অবস্থা চালু হবে।

বড় মালোম ডেক-সারেঙকে চার নম্বর ফল্কা সাফ করতে বলে দিলেন।

ঠিক মাস্তুলের নিচে প্লেট তুললে সিঁড়ি; সামাদ প্লেটটা তুলে ধরলে পঁচিশ টাকার খালাসী আজিজ এবং সারেঙ নেমে গেল। তেইশ টাকার খালাসি সামাদ। সেও ওদের সঙ্গে নেমে গেল। ওরা নিচে সব স্টিক-ক্রম হারিয়া করে দিয়েছে।

সামাদ বলল, সারেঙ সাব সুচারুকে দিন। আমরা তাড়াতাড়ি হাতে হাতে কাজটা সেরে ফেলব।

আর সুচারু নিচে নেমেই অযথা গলা ছেড়ে হৈ-চৈ করতে আরম্ভ করল। এবং এই ফল্কায় নামলে ওর মনে হয় সে যেন কোন গভীর খাদে নেমে গেছে এবং পৃথিবীটা এই সংসার নিয়ে, গাছপালা পাখি নিয়ে, ক্রমশ উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। সে ভিতরে হৈ-চৈ করতেই ফল্কার ভিতরটা গম গম করে উঠল।

ওদের মাথায় টুপি পরা ছিল। কোন্ আদ্যিকালে যেন ওরা ব্রাজিলের ভিক্টোরিয়া বন্দর থেকে আকরিক লৌহ নিয়েছিল কার্ডিফ বন্দরের জন্য। তারপর আর এই ফল্কা সাফসোফ করা হয়নি— জাহাজ শুধু অনির্দিষ্ট যাত্রার উদ্দেশে ক্রমাগত চলছে। আগামীকাল এইসব ফল্কার ভিতর গন্ধক নেওয়া হবে। সুতরাং স্টিক-ক্রম দিয়ে জাহাজের খোল পরিষ্কার করছে তারা।

সেই কবে ওরা ভিক্টোরিয়া বন্দর পিছনে ফেলে এসেছে; অথবা কিছু কিছু স্মৃতি জাহাজীদের মনে এখনও লেগে আছে। একটা অপ্রশস্ত লেগুনের ভিতর দিয়ে জাহাজটা এগোচ্ছিল। দুধারে উঁচু পাহাড়। নীল-সমুদ্র অনেক দূর পর্যন্ত পাহাড় কেটে যেন ভিতরে ঢুকে গেছে। সমুদ্র থেকে ঠিক এমনি বসন্তের বাতাস বইছিল। জাহাজের অনতিদূরে মাথার উপর লম্বা কংক্রিটের ব্রীজ—এবং ব্রীজের নিচে একটা তরুণী মেয়ে সব সময় ভিক্ষা করত। মেয়েটা অন্ধ, গায়ে ভাল পোশাক, ঠোঁট পুরু, চুল নিগ্রোদের মতো এবং গায়ের রঙ তামাটে। সুচারু মেয়েটার জন্য দুঃখ বোধ করত। সে এবং সামাদ প্রতিদিন

রাতে শহরে যাবার জন্য ব্রীজ অতিক্রম করার সময় পয়সা দিত এবং একদিন সামাদ ওকে নিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে, ঠিক যেখানে আকরিক লোহার গুদাম তার পাশে, যেখানে গুদামের রক্ষক বসে বসে পাইপ টানত, অংশীদার হিসাব ওকে ভোগ করল। সুচারু রাগে এবং দুঃখে অনেকদিন সামাদের সঙ্গে কথা বলেনি।

দীর্ঘদিন সুচারু সেই মেয়েটির ছবি ভুলতে পারেনি। সেই সুগঠিত শরীরের মেয়েটিকে সামাদ প্রলোভনে মত্ত করে একটা বিশ্রীরকমের কাণ্ড বাঁধিয়েছিল।

সুচারু এবং সামাদ এক সঙ্গে একটা দিক পরিষ্কার করছিল। অন্যদিকে সারেঙ পঁচিশ টাকার খালাসীকে নিয়ে কাজটা ঘুরে দেখছে। ওরা একমনে কাজ করছিল। ওরা স্টিক-ক্রম উপরে তুলে ক্রমশ হামাগুড়ি দিতে থাকল। দীর্ঘদিন সমুদ্র দেখে দেখে এক ভয়ঙ্কার ক্লান্তি। সামাদ ফিস ফিস করে বলল, রাতে বাংকে আর শুয়ে থাকতে পারছি না, বড় কষ্ট হচ্ছে।

সুচারু বলল, কেন তোর ছবিগুলো।

সামাদ অত্যন্ত বিষণ্ণ গলায় বলল, ওতে আর কিছু হয় না।

সুচারু অন্য কথায় এল, হ্যাঁ রে, সুমন কখন ফিরেছে রে?

—বাবু বেশ রাত করে ফিরেছেন।

—কিছু বলল? সুচারু স্টিক-ক্রম রেখে সামাদের পায়ের কাছে বসল।

—না। সাধু বাবাজী বনে গেছে। খুব ভাল মানুষ, আর অবাক, এক ফোঁটা মদ গেলেনি।

সুচারু বলল, একেবারেই কিছু বলছে না?

—একেবারে বোবা বনে গেছে। আমি বললাম, কি রে কিছু হল?

—কি বলল?

—বলল, না কিছু হয়নি। কিছু খেল না পর্যন্ত, শুয়ে পড়ল।

কিছু জাহাজী ফল্কার ওপাশে কাজ করছিল। সারেঙ উপরে উঠে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ আর কাজ তারপর চর্বিভাজা রুটি খাবার জন্য আধঘণ্টার মতো ছুটি। সেজন্য সামাদ এবং সুচারু গা লাগিয়ে কাজ করল না। কারণ সারাদিন ধরে এই জাহাজের খোল পরিষ্কার করা, সারাদিন এখানে খুট খুট করতে হবে—কোম্পানিকে কিছু কাজ দেখানোর কথা, একই জায়গা বার বার সাফ করতে হবে, ঘুরে ফিরে সারাদিন শুধু হামাগুড়ি দেওয়া, সুতরাং ওরা আড়ালে বসে টিফিন পর্যন্ত আড্ডা মারতে চাইল। কাজ সামান্য অতএব সুচারু পা মেলে বসে পড়ল। আর উপরে তখন ডেক নাবিকেরা সাবান জল দিয়ে বালকেড্ ধুয়ে গেছে, কেউ ফলঞ্চা বেঁধে জাহাজের পাশে ঝুলে পড়েছে এবং স্ক্র্যাপ করছে অথবা রঙ। কোমরে রঙের টব। নদীতে মৃদু বাতাস বইছিল, ছোট ছোট ঢেউ। তীরের কল-কারখানার চিমনির ধোঁয়া এবং মানুষেরা বড় রাস্তায় হাঁটছে। বড় রাস্তায় ট্যাকশি বাস, আর শহরের ঢালুতে ম্যাপল গাছের শাখা-প্রশাখায় এক ঝাঁক পাখি। এ-সময় সুমন ফল্কার ভিতরে উঁকি দিল। তারপর সে ছেলেবেলায় যেমন কুয়োর ভিতর মুখ রেখে নিজের গলার স্বর শুনত, এখানেও তেমনি সে নিজের গলার স্বর শুনতে চাইল।

নিচ থেকে সামাদ স্টিক-ক্রমটা উপরের দিকে ছুঁড়ে দিল। সামাদ জানত এতটা উপরে স্টিক-ক্রমটা উঠবে না, তবু সুমনকে কৃত্রিম ভয় দেখাবার জন্য একটু রসিকতা করল।

সুমন হাতের বুড়ো আঙুল ওদের দিকে ঠেলে ধরল। বলল, পারলি না।

সুমন চলে যাচ্ছিল।

সুচারু ডাকল, এই শোন্, শোন্ না।

—না, নিচে নামব না।

—কিছু বলব না, এই শোন্।

—না রে, সারেঙ দেখতে পাবে। হাতে অনেক কাজ।

—কাজ দেখাস না বাপু, তোর পায়ে পড়ছি, শোন্।

—বল্ না।

—অত জোরে বলা যাবে না।

সুমন চারপাশটা দেখে বলল, কেউ নেই।

—আমি কি খারাপ কথা বলব ভাবছিস?

—তবে কি করবি? সুমনকে খুব লাজুক-লাজুক দেখাচ্ছে।

—একটা কথা বলব কানে কানে।

ওরা কি জানতে চাইছে এবং কি ধরনের খবর শুনলে ওরা খুশি হবে সুমন জানত। ওরা মারিয়ার খবরের জন্য এমন করছে। সুমন ঘড়িতে সময় দেখল। মাত্র পনেরো মিনিট। তারপর চা এবং চাপাটির জন্য টিফিন। ওর ইনজিন-রুমে কাজ, টানেল পথ স্ক্র্যাপ করা এবং রঙ করার কাজ। সে চুপি চুপি ফল্কাতে নেমে বলল, কী বলবি বল্।

—কি রকম লাগল?

—ভাল।

—তারপর?

—তারপর কি আবার। ওরা তোর রাস্তার মেয়ে নয়। বিরাট দুর্গের মতো বাড়ি। বড় বড় সব ডালকুত্তা। উঁচু পাঁচিল ঘেরা বাড়ি, সদর দবজায় বড় লোহার গেট। মারিয়ার মা-টা বড় পাগলাটে। বিচিত্র পাখি পোষার শখ। মারিয়া আমাকে কত রকমের ওয়ারবলাব পাখি দেখাল!

সামাদ বলল, আরে রাখ্ বে, রাস্তার মেয়ের বুঝি ঘর থাকে না! আগে বল কি রকম দিল তোকে!

—জানিস এজন্য আমি নামতে চাইনি। মারিয়াকে নিয়ে ফাজলামি ভাল লাগে না।

সুচারু বলল, ওয়াববলার পাখি কি রকমের রে?

—আমাদের দেশের টুনটুনি পাখির মতো দেখতে। সুমনকে কিছুটা সহজ দেখাল এবার।

সামাদ বলল, টুনটুনি পাখির ডিম পাড়া দেখেছিস?

সুচারু বলল, না। তবে ওরা বড় কামুক। সময় অসময় নেই ঠিক জাহাজীদের মতো। জায়গা পেলেই হল।

সামাদ কেমন তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল, আমি আর সুচারু হাসিল বেয়ে ডাঙ্গায় নেমে যাব ভাবছি। আঃ ভারি আমার দেশ রে! আমাদের রঙ কালো বলে নামতে দেওয়া হবে না!

সুমন বলল, পুলিশে ধরবে।

সুচারু বলল, ধরুক। তবু আমরা ডাঙায় নামব।

ব্রীজে টিফিনের ঘণ্টা পড়ছে। হুড়মুড় করে সকলে উপরে ছুটছে। যারা ডেরিক-হাফিজ করছিল তারা তাড়াতাড়ি বাঁধাছাঁদা করে ছুটে এল। কাল থেকে জাহাজ বোঝাই হতে শুরু হবে। জাহাজীরা যার যার ফোকসালে নেমে চা করে ফেলল এবং চর্বিভাজা রুটির জন্য গ্যালীর পাশে দাঁড়াল। আর এই রোদে নদীর মতো জলের রেখা মিসিসিপির এবং খাড়ি নদীতে নৌকায় পাল তোলার মতো অবস্থা, আবহাওয়ায় যেন পুরোপুরি বাংলাদেশ—শুধু পলাশ ফুল ফুটছে না অথবা শিমূল ফুল ফুটছে না। তবু এক ধরনের নীল রঙের বিচিত্র সব ফুলেরা সামনের মাঠ এবং গোলাবাড়ি ছেয়ে আছে। সুমন, সুচারু এবং সামাদ রেলিংয়ের পাশে বেঞ্চিতে বসে পা দোলাতে থাকল আর চর্বিভাজা রুটি খেতে থাকল।

ভাণ্ডারী, গ্যালী থেকে সুমনকে উঁকি দিয়ে দেখল, তারপর বলল, হাঁ রে বাজান মাইয়াটার সোনা চুলে মুখ ডুবাইছনি?

সুমন রেগে বলল, জ্যাঠা ভাল হবে না; পিছনে লাগলে ভাল হবে না কিন্তু।

ভাণ্ডারী ময়দার হাত ধুয়ে ফেলল। সে এবার গোস্ত কাটতে বসবে। চিফ্-স্টুয়ার্ট একবার উঁকি দিয়ে গেল গ্যালীতে। টিন্ডাল, ডংকিম্যানকে পুরোনো খত পড়ে শোনাচ্ছে। তখন ভাণ্ডারী বলল, আমি খারাপ কথা কই না রে বাজান। তগ বয়সে আমরা-অ কত মুখ ডুবাইছি।

সামাদ বলল, জ্যাঠা মুখ ডুবান নাই, কন সান করছেন।

—তা করছি, সরমের কথা কি আছে। তারপর বলল ভাণ্ডারী, কালা আদমী বলে কেউ কিছু বলছে না তো!

—না জ্যাঠা, ধরতেই পারছে না আমি ইন্ডিয়ান।

সামাদ সুমনের কানে ফিস ফিস করে বলল, ও-সব ওজালিও ফোজালিও বুঝি না। মাগীর দেমাক তোমাকে ভেঙে আসতে হবে। বুক চিতিয়ে চলবে, আদর্শের কথা বলবে—তা চলবে না।

নিচে কে যেন চিৎকার করছিল তখন। গালাগালি দিচ্ছিল। তোবা তোবা করছিল। মনে হচ্ছে বড় টিন্ডালের গলা। সে সারেঙকে নালিশ দিচ্ছিল, দ্যাখেন আইসা কাণ্ড। আমার বালিশের তলাতে...

বৃদ্ধ বড় টিন্ডাল বয়সের জন্য ধর্মভীরু। পাঁচ ওক্ত নামাজ আর অবসর সময়ে কোরাণ শরীফ পাঠ। সুমন তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেল, দেখল বালিশের নিচে এক উলঙ্গ যুবক এবং যুবতীর ছবি। টিন্ডাল চেঁচামেচি করছিল তখন। নাবিকেরা সবাই ভিড় করেছে। বৃদ্ধ টিন্ডাল ছবিটা স্পর্শ করছে না। সে আল্লার কাছে এই গোনাগারের বিচার চাইছে। সুমন বুঝল ওটা সামাদের কাণ্ড। সে তাড়াতাড়ি উপরে উঠে বলল, আবার তুই বড় টিন্ডালের পেছনে লেগেছিস?

সামাদ চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর রাগে দুঃখে ফেটে পড়ল। সে বলছিল, শালা ভণ্ড বেত্তমিজ। কাল ফের দেশে খত লিখেছে, ওর আর একটা নিকার দরকার। লিখেছে, তিন বিঘা জমি লিখে দেবে, হাজার টাকা দেন্ মোহর দেবে। আসার পথে কোন মসজিদে এক তেরো বছরের মেয়ে ওকে অজু করতে কুয়ো থেকে জল তুলে দিয়েছিল, এখন দেশে ফিরে ওকে সাদি করার মতলবে আছে। কাল রাতেও ছোট টিন্ডালকে দিয়ে খত লিখিয়েছে।

—তাতে তোর কি।

—আমার কিছু নয় বলছিস? আমার কিছু না হলে ওটা করি! জাহাজ থেকে নামার আগে ওকে আমি পাগল বানিয়ে ছাড়ব।

যারা জড়ো হয়েছিল, ইনজিন-সারেঙ তাদের সকলকে চলে যেতে বলল। এবং বড় টিন্ডালের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, এত শুচিবাই নিয়ে জাহাজে এস না মিঞা।

বড় টিন্ডাল বলল, আমি অগ কী করছি কন। অরা ক্যান আমার পিছনে লাগে!

সুচারু ঢুকে বলল, কই দেখি ছবিটা। সে ছবিটা হাতে নিয়ে দেখল, তারপর বলল, ঠিক আছে—সব গুনা আমার থাকল। ছবিটা আমি নিলাম। উপরে উঠে সামাদকে বলল, তুই একটা উজবুক। এমন সুন্দর ছবিটা তুই টিন্ডালেব বালিশের নিচে রাখলি! ছবিটার দেখছি জাত গেল।

সামাদ বলল, জানিস, শুয়োরের বাচ্চা ফের আমার বিরুদ্ধে সালিমার বাপকে খত লিখেছে। কাল সারারাত শুয়োরের বাচ্চা ঐ করছিল।

—কেন অমন করছে!

—টাকা! টাকার গরমে করছে। তিন কুলে কেউ নেই, একটা করে সাদি করবে আর জাহাজে আসার আগে তালাক দেবে।

সুচারু তাড়াতাড়ি সামাদকে নিয়ে ফক্কাতে নেমে গেল। সামাদ খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল। —শালা, আমাকে বলে দোজখের পয়দিশ, শালা তুই কি রে! আমি ন্যাংটো মেয়ের ছবি দেখি, একশ বার দেখব। আমার সালিমা ওটা জানে। তুই তো সফরে, তোর বিবি অন্যের সঙ্গে র‍্যালা দেবে ভেবে তালাক দিস। কচি মেয়ের জান লিস। লতুন লতুন তোর ফুল চাই।

—আঃ কী হচ্ছে! সুচারু সামাদকে ধমক দিল। সামাদকে অন্যমনস্ক করার জন্য বলল, বাড়িতে ফেরার সময় ছবিগুলো কোথায় রেখে যাস?

—রেখে যাব কোথায়? সঙ্গে বাড়িতে নিয়ে যাই। সালিমা যত্ন করে রেখে দেয়।

—কিছু বলে না?

—কি বলবে। সেও আমার সঙ্গে উপুড় হয়ে থাকে ছবির ভিতর! জাহাজে আসার সময় ছবিগুলো যত্ন করে পেটিতে রেখে দেয় আর কাঁদে। তারপর সামাদ কিছুক্ষণ কি ভেবে বলল, তুই বিয়ে করিসনি ভাল আছিস। শালা বিয়ে করলে অভ্যাসটা বড় খারাপ হয়ে যায়।

এবার সুচারু ছবিটা ভাল করে চোখের সামনে তুলে ধরল। ফোকসালের আলোতে সে নুয়ে দেখল ছবিটা। শরীরে এক ধরনের লালসার জন্ম হচ্ছে।

দুপুর বারোটায় ভাত খাবার জন্য জাহাজীদের এক ঘণ্টার ছুটি। সামাদ সুচারু দেখল সুমন এখনও ফিরছে না। ওরা নিজেরা বিশু থেকে গোস্ত নিল এবং ভাত নিল। সুমনের খাবারটুকু যত্ন করে লকারে রেখে ওরা খেয়ে এনজিন-রুমের দিকে নেমে গেল। সেখানে বড় মিস্ত্রি, মেজ মিস্ত্রি, হেনরী আর সুমন নাট বোল্ট খোলায় ব্যস্ত—ওরা বুঝতে পারল কনডেনসার খোলা হয়েছে, হাতের কাজ সারতে একটু দেরি, সুমন কাজ না সেরে ওপরে উঠতে পারছে না।

জাহাজে ওদের অমানুষিক পরিশ্রম। সুতরাং সমুদ্রের একঘেয়েমির ক্লান্তি যখন বন্দরে এসেও মিটছে না তখন আর দেরি নয়, সমুদ্রে ভেসে পড়াই ভাল। অন্য বন্দরের জন্য ফের উন্মুখ হওয়া যাবে। সুচারু বলল, দেখলি, কি উৎসাহ-কাজে! নাওয়া-খাওয়ার কথা পর্যন্ত ভুলে গেছে!

সামাদ বলল, কার কথা বলছিস?

—আর কার কথা? যাদুকরের পালিত পুত্রের কথা।

সামাদ সিঁড়ি ধরে ওঠার সময় বলল, সালিমা বড় জ্বালাচ্ছে।

সুচারু বলল, তার মানে?

সামাদ বলল, কাজের ভিতর কেবল সালিমার মুখ দেখতে পাচ্ছি। কোন কিছু ভাল লাগছে না। চার মাস হতে চলল কোন চিঠি নেই ওর। ভিতরে ভিতরে সামাদ সালিমার খত না পেয়ে পাগল হয়ে যাচ্ছে।

সামাদ একদিন বলেছিল, সালিমা আমি সমুদ্রে চলে গেলে তর অন্য পুরুষের মুখ মনে আসে না?

সালিমা মুখ খুব গম্ভীর করে রেখেছিল এবং তিন দিন না খেয়ে থেকেছে। সামাদ বলেছিল তখন, আমার কসুর হয়েছে, ক্ষেমা দে। আর বলব না।

পরমুহূর্তে সালিমাব দাঁতগুলো হাসিতে ঝকঝক করছিল। জাহাজী মানুষটি তার পরাণের ধন এবং স্বপ্নের মতো। কারণ এই দরিয়ার মানুষটি বড় সরল, বড় অবোধ। সংগোপনে কিছু লালন করে না। বন্দরের সব খবর, সব মেয়েমানুষের খবর এবং জাহাজের শক্ত কাঠে শুয়ে সালিমার জন্য যে দুঃখ—সব খুলে বলার সময় সরল মানুষটিকে বড় কাতর দেখায়। সালিমার নরম চুলের ভিতর হাত ঢুকিয়ে কেন জানি সামাদ অপলক চেয়ে থাকে।

সালিমার এমন এক মুখ যার অসতী হবার ভয় নেই। সুর্মাটানা বলে মাঝে মাঝে হিন্দুদের দেবীর মতো মনে হয়। চোখ দুটো ভাসা ভাসা এবং শরীরের উত্তাপ অনেকক্ষণ পোহাতে পারে। সামাদ অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলল, চার মাসের উপর হতে চলল, শালা একটা খত নেই বিবির!

সুচারু বলল, সেদিন তুই চিঠি দিলি না!

—আমি ত দিয়েই যাচ্ছি।

সুচারু বলল, তা হলে চিঠির গণ্ডগোল হচ্ছে।

—সবার বেলায় হচ্ছে না, শুধু আমার বেলায় হচ্ছে!

সুতরাং সুচারু চুপ করে গেল। হাতে ওদের যা কাজ আছে পাঁচটা বাজতে বাজতে শেষ হয়ে যাবে। তারপর স্নান, তারপর রেলিঙের বেঞ্চিতে একটু বসা এবং নদীর চারপাশের দৃশ্য দেখা।

ফোকসালে তখন সুচারু ছিল, সামাদ ছিল। সুমন নেই, হেনরীর সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। ভোর থেকেই সামাদ কথা কম বলছিল, এখন যেন আরও কথা কম বলছে। সুচারু চা করে এনেছিল। দুজনে পাশাপাশি বসে নিঃশব্দে চা খাচ্ছে।

সুচারু বলল, চুপচাপ থাকলে ভাল লাগে না। কথা বল্ সামাদ।

—কি কথা বলব! আমার কিছু ভাল লাগছে না।

—বলেছিলি ছিপ ফেলে মাছ ধরবি।

—ভাল লাগছে না কিছু।

সুচারু বলল, আজ কালের মধ্যে চিঠি আসবে। চল্, উপরে গিয়ে বসি।

সামাদ ক্ষেপে গেল সহসা। সে বলে উঠল, শালা বড় টিন্ডালকে আজ আমি মারব।

—তুই এমন করছিস কেন!

—আমার মনে হয় সালিমার বাপকে ও ভিক্টোরিয়া পোর্টের কথা খুলে লিখেছে।

—ওর কি দায় পড়ল।

—ওর দায় অনেক। কি বলতে গিয়ে সামাদ চুপ করে গেল।

—ওপরে চল্। এ-সব পাগলামী আমার ভাল লাগছে না।

—বিবিটা মনে হয় ছেনালী করছে।

—কি আজেবাজে বকছিস। আর করছে তো বেশ করছে। সুচারু যেন অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত কথা বলছে—তুই তো মেয়েমানুষ পেলে বন্দরে কুকুরের মতো করিস।

—করি। বেশ করি।

—তবে ও কি দোষ করল!

—সাদি করার পর কথাটা বলবি। সামাদ চায়ের কাপটা বাংকের নিচে রেখে দেবার সময় আরও কি বলতে চাইল কিন্তু পারল না। সব যেন খুলে বলা যাচ্ছে না। সমুদ্রের সব বন্দরে, সব মেয়েমানুষের ঘর থেকে বেরোবার পর একটি মাত্র মুখ নক্ষত্রের মতো দূরের আকাশে জ্বলতে থাকে। সে মুখ সালিমার। এই একটি মাত্র মুখই সামাদের বাতিঘর। সে যেন বলতে চাইল, জাহাজে ওঠার পর দেশ বলতে আমি আমার সেই একমাত্র বাতিঘরকে বুঝি। সব হারাতে পারি সালিমাকে হারাতে পারি না।

ফোকসালে ফোকসালে এখন স্নান অথবা আহারের জন্য সবাই প্রস্তুত হচ্ছে। জাহাজ-ডেকে বিকেলের রোদ। গাছের ছায়া ক্রমশ দীর্ঘ হয়ে জাহাজ, ঘাস, মাটি, ফুলকে অদৃশ্য করে দিচ্ছে।

সুচারু এবং সামাদ ফোকসালে বসেছিল। অথচ কোনও কথা বলছে না। যেন ওরা কোনও কথা খুঁজে পাচ্ছে না। এক সময়ে সামাদ বাংক থেকে উঠে পড়ল। সুচারু বাংকের নিচ থেকে মাছ ধরার জন্য ছোট কৌটা নিল একটা। ওরা দুজনই উপরে উঠে রেলিংয়ের ধারে নদীর জলে বঁড়শি ফেলল। ভিতরের দুঃখ বেদনাকে ভুলে থাকার জন্য অন্যমনস্ক হতে চাইল।

ওরা স্টারবোর্ড-সাইডের রেলিংয়ে ভর দিয়ে বঁড়শি ফেলেছে। ডেক-জাহাজীরা পাশাপাশি কোথাও বসে অন্য কোনও বন্দরের গল্প করছে। অথবা কোথাও জোর বচসা হচ্ছে বিশুর গোস্ত নিয়ে—যা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটে থাকে, সারেঙ সব কিছুর ফয়সালা করছে! অন্য তীরে কিছু স্কীপ! স্কীপে যুবক-যুবতীরা নদীর জলে জলবিহার করছে। শহরের ঢালু জমিতে যেখানে মসৃণ ঘাস আছে ও ম্যাপল গাছের অন্ধকার আছে—যুবক-যুবতীরা সেখানে হেঁটে হেঁটে বেড়াচ্ছিল। সুযোগ খুঁজছে কোনও আড়ালের।

সন্ধ্যের সময় ওরা দেখল আকাশের পুব দিকের মাথায় বড় চাঁদ। আজ রাতে এই নদীর জলে জ্যোৎস্না থাকবে। শহরে বন্দরে জ্যোৎস্না থাকবে। সব বার্চগাছের মাথায়, গির্জার মাথায় জ্যোৎস্না থাকবে। বন্দরের কোলাহল ভেসে আসছিল জাহাজে। শহরের ঢালু জমিতে খুব ভিড়। যেন এই জ্যোৎস্নার জন্য ওরা শুকসারি আকাশে ছেড়ে দিয়েছে। সুচারু এইসব দেখে ভাবল, রাতে যখন কেউ জেগে থাকবে না, যখন সব জাহাজীরা ফোকসালে নেমে আসবে—অন্তত এই ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় নদীর জলে নেমে সাঁতার কাটালে সামনে তীর পাওয়া যাবে, ছোট স্কীপও পাওয়া যেতে পারে—অথবা ঘুরে ফিরে সাঁতার কাটা, ঘুরে ফিরে মাঠের মসৃণ ঘাসের ভিতর একটু ডুবে থাকা মন্দ নয়। সুতরাং সুচারু বলল, দেখছিস—চারধারে কি জ্যোৎস্না উঠেছে!

সামাদ বলল, তাইত!

সুচারু বলল, এই যাবি, রাতে কোথাও?

—সামাদ বলল, কি করে?

—কেন দড়ির সিঁড়ি ফেলে দেব। তারপর নিচে, জলে। তারপর ফের সাঁতার কেটে পারে উঠে যাব। অথবা যেন বলার ইচ্ছা, সামনে যে মাঠ দেখছিস, সেখানেও উঠে যেতে পারি; কারণ অন্য তীরে

শুধু চাষাবাদের জমি, রাত হলে সেখানে আলো থাকে না, শুধু এক বিস্ময়কর জ্যোৎস্না। চুপচাপ দুজনে বসে সেই মাঠে দেশের গল্প করব।

কারাগারে বন্দী যুবকের মতো জাহাজীরা ছটফট করছিল। নোঙর তোলার পর ফের সমুদ্র—এক দীর্ঘ যাত্রা, সুতরাং সামাদ, সুচারু ফলঞ্চা বাঁধতে কাঠ লাগবে ভেবে এবং দেরি হবে ভেবে দড়ির সিঁড়ি ঝুলিয়ে দিল। মিসিসিপির এই অংশে জল গভীর। কিছু দূরে দু-পাশে ঘন বন। আর দেওদার জাতীয় গাছ নদীর দু-তীরে। অথবা মাঠ ভেঙে গেলে কোন গ্রাম্য নিগ্রো যুবকের কুটির। সেখানে প্রচুর আঙুর ফল মিলতে পারে।

আর তখন শহরের ভিতর দুর্গের মতো বাড়িতে ওজালিও দ্য সুম্যান মারিয়ার পড়ার ঘরে বসে বসে গল্প করছিল। মারিয়া 'রয় রোজার্স, কাউ বয় অ্যানুয়েল' বইটির পাতা খুলে ছবি দেখাল। সেলফে নানারকমের ছোটদের বই। সামনে বড় টেবিল দামী পাথরের, টেবিলে দামী ক্যালেন্ডার। দোয়াতদানীতে হরেক রকমের কলম এবং লম্বা মেহগিনী কাঠের উজ্জ্বল আসবাব-পত্র, বাতিদান, ঘরে ঝাড় লণ্ঠন, আলোর নানারকমের ফোয়ারা।

দুর্গের মতো এই বাড়িটাকে পাথরের স্তূপ বলে মনে হয়। শুধু এই ঘর, ভালো আসবাব-পত্র ও মারিয়া সব মিলে বাড়িটার প্রাণের প্রতীক। হেনরীকে ভারোদী পাখির জগতে নিয়ে গেছে।

সুমন টেবিলটার অন্যপাশেও সারি সারি আলমারির কাচের ভিতর নানারকমের বই দেখতে পেল। কোথাও 'এনিমেল ট্রেভেলার্স' অথবা 'বার্ডস ইন মাই ইন্ডিয়ান গার্ডেন', দি লিভিং ওয়ার্লড অফ সায়েন্স' কিংবা কোথাও মিকি মাউস অ্যানুয়েল, কত হরেক রকমের বই এবং সেই বইটি অ্যান্ডি প্যান্ডি রকি রেড—মারিয়া বইটি বের করে বুকে চেপে ধরল।

সুমন বলল, বইটা দেখি।

খুব যত্ন করে বইটি সে মেলে ধরলে। বইয়ের বাড়ি ঘরের মতো ছবি, সেই পক্ষিরাজ ঘোড়া রকি, যেন বলার ইচ্ছা মারিয়ার এই রকির পিঠে চেপে কোথাও চলে যেতে ইচ্ছা হয়। সে কথা প্রসঙ্গে ডিজনীল্যান্ডের গল্প করল। ওদের খামার বাড়ির গল্প করল এবং কার্পাস জমির কথা বলার সময় বলল, কই, তুমি কোনও কথা বলছ না কেন! তুমি যে বলেছিলে তিমি মাছের গল্প বলবে?

সুমন বানিয়ে বানিয়ে যত সব আজগুবি গল্পে ডুবে গেল।

মারিয়া অবাক হয়ে বলল, ভয়ে সেখানে কেউ যেত না?

—না। আদিবাসীরা মনে করত ওটা কোন অপদেবতা।

—শব্দটা কেন হত?

—তিমি মাছটা খুব বুড়ো ছিল। ওর দাঁত ছিল না। মাথার ফুটো দিয়ে জল ছেড়ে শব্দ করত। বুড়ো মাছটা একা হয়ে গেল। দুঃখে তিমি মাছটা দ্বীপের যে দিকে খাড়া পাহাড় ছিল এবং যেখানে বড় ঝিল ছিল পাথরের ভিতরে, মাছটা সেখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল।

—ও কি করে খাবে? সমুদ্রে না ঘুরে বেড়ালে খেতে পাবে কি করে!

—যখন সমুদ্রে জোয়ার আসত তখন উপছে জল ঢুকে যেত ঝিলে। তিমি মাছটা জোয়ারের সময় হাঁ করে থাকত; ছোট কুচো মাছ মুখে ঢুকলে মুখ বন্ধ করে জল বের করে দিত—উপরে ছাদ ছিল পাথরের, ছোট একটা মুখ ছাদে। ছাদের মুখে শঙ্খের মতো আওয়াজ হত।

—আরিতুসের ভয় করত না?

—সে তো বন্ধুত্ব করে ফেলল।

—সে বন্ধুত্ব করল কেন?

—ওর বাবা সমুদ্রে মাছ ধরতে চলে যেত। একা ছেলেটা ছোট ছোট মাছ ধরে রাখত বড় মাছ শিকারের জন্য। সে একদিন যেতে যেতে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল।

—ওর ভয় করত না?

—ভয় কি! একটা ঝিল আছে। ও ঝিলের পাড়ে আছে। আর ছোট ছোট দুটো চোখে একটা জাহাজের মতো মাছটা এগিয়ে আসছিল।

—মাছটা লেজ নাড়ছিল?

—মাছটা বলল, খোকা, তুমি আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে?

—আচ্ছা ওজালিও, সমুদ্রে একা একা তোমার ভয় করে না?

—একা কোথায়। আমরা তো অনেকে থাকি।

—যখন ঝড় হয়।

—ঝড়ের সময় খুব কষ্ট।

মারিয়ার ট্রেজার আইল্যান্ডের গল্প মনে পড়ল। বলল, কোনও দ্বীপে যদি কেবল সোনা থাকে কি ভাল হয় না?

—মোটেই না। সোনার চেয়ে মাটি আমাদের বেশি ভাল লাগে। মারিয়ার মতো ফুল বেশি আমাদের ভালো লাগে।

—যা! মারিয়া মুখ নিচু করে বলল, তোমাকে দেখে আমার এক যাদুকরের কথা মনে আসছিল।

—তাই বুঝি!

মারিয়া বলল, গুহায় যাদুকর থাকতেন।

—সেই তিমি মাছটার মতো বুঝি?

—না। তিমি মাছ কেন হবে! সে তো মানুষ। যাদুকরের এক পালিত পুত্র ছিল। তার একটা পোষা বেড়াল ছিল। আর ভোর হলেই সূর্যের আলো এসে গুহায় পড়ত।

—তাহলে যাদুকরের খুব ভাগ্য বলতে হবে।

—বিচিত্র রকমের ফুল ফুটত গুহার মুখে।

—তাহলে যাদুকর খুব সুখী লোক ছিলেন।

—যাদুকর তার জড়িবুটি নিয়ে আলাদা ঘরে থাকতেন।

—ওর একা ভয় করত না? কৃত্রিম বালকসুলভ স্বরে মারিয়াকে রাগিয়ে দিতে চাইল সুমন।

—ওর ভয় করবে কেন? ও-তো একা ছিল না। ওর পালিত পুত্র ছিল। সে যাদুকরের জন্য হাট-বাজার করত।

—তারপর? সুমন খুব কৌতূহল দেখাল।

—বলছি বলছি। একটু জল খাব। বলে সে পরিচারককে ডাকল। সুমনের মনে হল বড় সুখী এবং কোমল মারিয়া। ঠোঁটের রঙ চেরি ফলের মতো, চোখের নিচটা ঈষৎ নীল এবং ভ্রূ জোড়া সরু। সুমন টের পেল, জল খাবার সময় কোমল ত্বকের নিচে জলের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

মারিয়া জল খাবার পর রুমাল দিয়ে খুব আলতোভাবে ঠোঁট মুছল। তারপর রুমালটা ফের ভাঁজ করে বলল, তোমার মুখ ছবিতে আঁকা সেই যাদুকরের পালিত পুত্রের মতো।

সুমন বলল, তাই বুঝি!

—হুবহু তাই। আমি মাকেও তাই বললাম।

—তিনি কি বললেন?

—তোর যত আজগুবি কথা, তিনি বললেন।

—ঠিকই বলেছেন।

সুমনের কথায় কেমন আহত হল মারিয়া। সে সরে গেল এবং ওর ছোট্ট নরম রঙ-বেরঙের চেয়ারটাতে বসে পড়ল। সে বই-এর পাতা উল্টে দেখল, সুমনের দিকে তাকাল না। অল্প সময়ের ভিতর ওর চোখ ফেটে জলে ভারি দেখাল মুখ। সুতরাং সুমন হেসে উঠল। বলল, এই মেয়ে, কি হচ্ছে!

—কিছু হচ্ছে না। মারিয়া উঠে জানালার ধারে চলে গেল।

সুমন পিছনে পিছনে গেল এবং মারিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, তোমাদের কুকুরগুলিকে দেখতে পাচ্ছি না।

—জানি না।

—মা কোথায়?

—জানি না।

সুমন বলল, চল কফি খাবে।

মারিয়া পিছনে ফিরে দেখল তার পরিচারকটি কফির ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকছে। সে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে কফির সঙ্গে দুধ মেশাল এবং মিষ্টি ক'চামচ জিজ্ঞাসা করার সময় পরস্পর হেসে উঠল।

—না ওজালিও, তুমি আমাকে খুব ছোট ভেবে অবহেলা কর।

—তুমি তো খুব ছোট!

—মা-ও আমাকে খুব ছোট ভাবেন। তুমিও আমাকে খুব ছোট ভাববে?

—কি ক্ষতি বল!

—তা হলে তোমাকেও আমি জ্যাক বলে ডাকব।

—তোমার খুশি।

সুমন এবার মারিয়াকে ভাল করে দেখল। বয়সের এমন কোথাও এসে সে পৌঁছেছে যেখানে বালিকাসুলভ ইচ্ছা এবং কৈশোরের স্নিগ্ধ ভালবাসা মারিয়ার প্রাণকে আকুল করছে।

হেনরী এখনও ফিরছে না। ঘড়িতে আটটা বেজে গেছে। মারিয়া আর কথা না বলে টেবিলের উপর ঝুঁকে থাকল এবং কফি খেল। সুমনের কফি খাওয়া হয়ে গেছে।

সুমন বলল, চল হেনরীকে খোঁজা যাক।

মারিয়া প্রথমে তার পরিচারককে পাঠাল মায়ের কাছে। এই মুহূর্তে ওরা সেখানে যেতে পারবে কিনা অনুমতি চাইতে।

তখন ভারোদী হেনরীকে নিয়ে ওর পাখির বাগানে বসেছিল। চারধারে লাল নীল স্তিমিত আলো এবং ফুল-ফলের ছোট ছোট গাছ। ছোট ছোট গাছ, ছোট ছোট খাঁচা, বড় বড় তারে জাল দেওয়া ঘর, এবং নিচে ছোট সরু কৃত্রিম খাল, ছোট সরু রাস্তা, মাঝে মাঝে ছোট ছোট বেঞ্চ। রবিবার সাধারণের জন্য খোলা থাকে বলে কড়া পাহারার ব্যবস্থা আছে।

ভারোদী কথা প্রসঙ্গে হেনরীকে বলল, আমরা আমাদের গুপ্ত আন্দোলন চালিয়ে যাব।

হেনরী ঠোঁট চেটে ভারোদীকে দেখল, তারপর সে উঠে গিয়ে জলার ধারে এক দঙ্গল ফিসার পাখি দেখে এল। এক কৃত্রিম জলাধার, পাশে ছোট ছোট সিলভার ওক এবং কিছু ফার্ন জাতীয় গাছ, জলে লিলি ফুলের মতো এক ধরনের নীলাভ ফুল এবং উপরে সাদা ডুমের আলো। ভিতরে পাখিগুলো উড়ছিল।

হেনরী এইসব দেখতে দেখতে বলল, তোমার দেশের উন্নয়নের পক্ষে ব্ল্যাকদের দান অসামান্য।

ভারোদী ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয়ে পড়ল—আমাদের সুবিধার জন্য যে-সব গোরু-ঘোড়া আমদানি করেছিলাম তাদের সমান অধিকার সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে, তবে! তারপর কেমন নেশাগ্রস্ত রমণীর মতো হেনরীর হাত ধরে টেনে আরও উত্তরের দিকে চলে গেল। পাঁচিল সংলগ্ন ছোট ছোট পাথরের ঘর, দরজায় লোহার শক্ত গেট। এত দীর্ঘকাল পরেও ভয়ঙ্কর মজবুত দেখাচ্ছিল। ভারোদী বলল, এই সব মজবুত ঘর আমাদের উত্তর-পুরুষ পারিবারিক দাস ব্যবসায়ের জন্য করে গেছিলেন।

—কিন্তু তুমি বললে যে কার্পাস জমির জন্য তোমরা এখানে এসেছিলে!

—জমির সঙ্গে শ্রমের সম্পর্ক। আমার মনে হয় সেটা ১৮০৭ সাল হবে, দাস-ব্যবসায়ে আমেরিকানদের অংশ গ্রহণ নিষিদ্ধ করে একটা আইন পাস হয় এবং ১৮২০ সালে দাস-ব্যবসা দস্যুবৃত্তির সামিল বলে ঘোষণা করল। অথচ এ-সব আইন পারিবারিক দাস-ব্যবসায় প্রযোজ্য ছিল না। দাস আমদানি নিষিদ্ধ সুতরাং এই পরিবার পারিবারিক দাস-ব্যবসা শুরু করে দিল। তা ছাড়া, পারিবারিক দাস-ব্যবসা বেশি লাভজনক ছিল।

হেনরী এক অদ্ভুত ছবি দেখল অথবা ভারোদী এই সব পারিবারিক দাস-ব্যবসা সম্পর্কে বলার সময় সাল, তারিখ, নির্ভুলভাবে উচ্চারণ করছিল। যেন কোনও ধর্মযাজক ধর্ম প্রচার করছে। ভারোদীর মুখ চোখ খুব গম্ভীর দেখাচ্ছিল। শ্বেতকায় জাতির শুদ্ধতার জন্য সে ধর্মযুদ্ধের আয়োজন করছে

অথবা সে সন্ন্যাসিনী—এই মহান জাতির সর্বনাশ টেনে যারা আনছে তাদের কারও নিস্তার নেই—এমন এক ভঙ্গি নিয়ে ভারোদী দাঁড়িয়েছিল।

প্রাচীন সব পাথরের ভিতর এক দীর্ঘ অতীতের ছবি ফুটে বেরুচ্ছিল। নৃশংস এবং ঘৃণ্য। নিগ্রো সবল যুবক-যুবতীদের ধরে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রের মতো ব্যবহার করা হত। ওরা কাজ করত ক্ষেত খামারে। আর বড় হলে দু'হাজার অথবা পঁচিশ-শ ডলারে বিক্রি করা হত নিগ্রো সন্তানদের, পশু বেচে দেবার মতো বিক্রির ব্যবস্থা। ভারোদী সেই সব কথা বলল। এই সব সারি সারি ঘর এখন আর কোন কাজে আসছে না। অথচ একসময় তিন চার জন নিগ্রো রমণী প্রতি মাসে এইসব ঘরে সন্তান প্রসব করে চলে যেত। তারপর ওদের জন্য খামার ছিল। তারপর একটু থেমে ভারোদী হাসতে হাসতে বলল, পারিবারিক দাস-ব্যবসা পোলট্রির মতো। লুসিয়ানার বহু পরিবার এ-ভাবে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন এক সময়। অথচ দেখ, কি দিন কি হয়ে গেল! ক্রমশ আমরা হেরে যাচ্ছি। ভারোদীর গলার স্বর কান্নার মতো শোনাল। সে তিক্ত গলায় বলে উঠল, সেদিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এক প্রশাসনিক আদেশে বলেছেন, সশস্ত্র বাহিনীতে বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমান আচরণ এবং সমান সুযোগ থাকবে। একের পর এক সুপ্রিম কোর্ট নিগ্রোদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সব রায় দিয়ে যাচ্ছে। আমরা কি করব হেনরী! সেই গৃহযুদ্ধের আমল থেকে আমরা হেরে চলেছি। আমরা ক্রমশ হেরে যাচ্ছি! ক্রমশ ক্রমশ! পাগলের মতো দুঃখে ভারোদী ভেঙে পড়ল।

ভারোদী অনেকক্ষণ সেই আলো অন্ধকারে স্থবির হয়ে বসে থাকল। সুতরাং হেনরী এই পারিবারিক দাস-ব্যবসা অসম্মানজনক এবং গ্লানিকর এ-কথা বলতে পারল না। ভারোদীর প্রতি যথার্থ নাবিকের মতো ব্যবহার করল। সে অন্য কথায় ফিরে এল। বিধবা রমণীর কিছু ইচ্ছা হেনরীর সব সময় জানা থাকে। কৌশলের দ্বারা সেই ইচ্ছার ঘরে পা ফেলতে হবে। সে বলল, ভারোদী তোমার রুচির প্রশংসা না করে পারা যায় না। কত বিচিত্র দেশের পাখি! তোমার সংগ্রহ দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি! কত বড় বড় সব অ্যালসেসিয়ান কুকুরের যৌনতা তোমাকে নিশ্চয়ই মুগ্ধ করে।

ভারোদীকে কিছুটা স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। সে বলল, চল আর একটু দক্ষিণে এগোনো যাক।

কথায় এবং আচরণে ব্ল্যাকদের প্রতি ভারোদীর সব সময় সেই এক কটূক্তি—ওরা চাষের জন্য, জমি বুনবার জন্য, সমাজে এবং সংসারে ওদের ব্যবহার গরু ঘোড়ার মতো। সমান অধিকার প্রসঙ্গে হেনরী আর ভুলেও কথা বলতে চাইল না। এই বাড়ি দীর্ঘ এবং পাঁচিলের নিচে বিস্তৃত জমি, জমিতে হরেক রকমের পাখি, পাখির খাঁচা, কৃত্রিম সব ঘন জঙ্গল। হেনরী এবং ভারোদী পাশাপাশি হাঁটছিল। দুজন রেড-ইন্ডিয়ান পরিচারক পেরাম্বুলেটরে দুটো রবিন পাখির খাঁচা টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ভারোদীর অনিদ্রার রোগ—অভ্যাস, পাখি দেখা শুয়ে শুয়ে। পাখি দেখতে দেখতে, রাতে পাখির যৌনতা দেখতে দেখতে ভারোদী ঘুমোয়।

কথায় কথায় ভারোদী জেনারেল লী-র কথা বলল। আর 'কথিত আছে' এই ধরনের প্রবাদের ভিতর যেন বলার ইচ্ছা, জেনারেল লী বাড়ির কোথাও না কোথাও এক সময়ে বসে উত্তরের দেশগুলোর বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করেছিলেন।

হেনরী উত্তর দিল না। মারিয়াদের পূর্বপুরুষ বহু বিজয়ের কাহিনী এই অঞ্চলে প্রবাদের মতো সংরক্ষিত করে গেছে। যার ফলে স্থানীয় এই শহরে কোন নিগ্রো বসতি নেই, শহরের ভিতরে কোন নিগ্রো সমস্যা নেই। এবং স্থানীয় আইন এখনও এই দেশের বিশেষ বিশেষ অঞ্চল পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। এই সব কথা বলতে বলতে ভারোদী মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। তারপর সহসা কি ভেবে বলল, তুমি তাজা রেটল্ সাপ দেখেছ হেনরী?

হেনরী বলল, না।

—ভয়ঙ্কর। আমার ইচ্ছা আছে, একদিন তোমাকে এবং ওক্তাভিওকে নিয়ে সামনের মরুভূমির মতো জায়গাগুলো দেখে আসব। এ-অঞ্চলে লোকবসতি খুব কম। মাঠে সামান্য ঘাস, কাঁটাজাতীয় গাছ আর বড় বড় পাথরের ফাঁকে কপাল থাকলে রেটল্ সাপও চোখে পড়তে পারে।

এখন এই বিরাট দুর্গের মতো বাড়িটাতে ভারোদীকে বড় অবসন্ন লাগছে। ভিতরে মিথ্যা অহমিকার

জন্য নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। ভারোদী হাসতে হাসতে বলল, রেটল্ সাপ দাঁত বের করে হাসতে পারে। ভীষণ কুৎসিত। হেনরী স্পষ্ট দেখল ভারোদীর গা ভয়ে এবং বীভৎস দৃশ্যের জন্য শিউরে উঠল। সে একটু সামলে নিয়ে বলল, ওদের দাঁত একরকমের। হাসলে নিগ্রোদের একরকম দেখায়।

হেনরী ভারোদীর কথা অনুধাবন না করতে পেরে বলল, কাদের দাঁত?

—নিগারদের। অর্থাৎ যেন বলার ইচ্ছা ওদের চোখমুখ সবার অমানুষিক। তারপর হেনরীকে ধরে সোজা সামনের একটা ঘরের ভিতর ঢুকে গেল। নিজের হাতে কিছু ছবির আবরণ খুলে দিল। নানা রকমের নিগ্রো পুরুষ রমণীর ছবি, নানাপ্রকার রেটল্ সাপের কঙ্কাল। ভারোদী কেমন পাগলের মতো বলল, কেমন একরকম দেখাচ্ছে না?

হেনরীর এ সময় ভারোদীর জন্য কষ্ট হতে থাকল। অনর্থক একি সংস্কার যা আত্ম-প্রতারণার মতো। রেটল্ সাপের কঙ্কালগুলো খট খট করে বাজছিল। হেনরী বলল, ছবিগুলো রেখে তোমার কি লাভ?

—এগুলো আমি রাখিনি। বহুদিন থেকে এঘরে পড়ে আছে। সেই গৃহযুদ্ধের আমল থেকে।

ক্রমশ বিশ্রী ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে ভেবে হেনরী বিব্রত বোধ করল। সে ভাবল সুমনকে বরং আসতে বারণ করবে। কারণ কালো মানুষদের ভীতি এইসব সাদা মানুষদের পাগল করে দিচ্ছে। এই বর্ণবৈষম্য হেনরী নিজের দেশেও কম-বেশি উপলব্ধি করেছে অথচ যেন এত প্রকট নয় এবং অস্বাভাবিক ভাবে সকলে হিক্কাগ্রস্ত রুগীর মতো ভুগছে না। সুতরাং সুমন ভারতীয় এবং বর্ণবৈষম্যে সে নিগ্রোদের সমগোত্রীয়। এ-কথা প্রকাশ হয়ে পড়লে আর রক্ষা থাকবে না। সে বাচাল ছোকরার জন্য মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। বলল, ওজালিওকে ডেকে দিলে ভাল হয়।

—এত তাড়াতাড়ি।

—বেশ রাত হল।

এমন সময় মারিয়ার পরিচারক রেড-ইন্ডিয়ান যুবকটি ভারোদীব অনুমতি চাইলে বলল, আমরা এক্ষুনি যাচ্ছি।

হেনরী বলল, এবার আমরা যাব।

—আর একটু বোসো। এস না একদিন আমরা এখানে রাতে সবাই মিলে আহার কবি।

—বেশ ভাল প্রস্তাব।

—কবে হবে বল?

—তোমার সুবিধামত।

হেনরী কিছুক্ষণ ভেবে বলল, কাল হলে হয় না!

—ঠিক আছে, কালই হবে।

এখন দেখলে মনে হয় না ভারোদী কিছুক্ষণ আগেও নীল রক্তকে সম্মানিত রাখাব জন্য হিক্কাগ্রস্ত রোগীর মতো ছিল। এখন খুব স্বাভাবিক। সুতরাং এখানে এসে এই সাদা-কালোর কথা বরং না তোলাই ভাল। হেনরী বলল, ভারোদী, মিস্টার টেলডনের ছবিটা দেখালে না তো!

—তাঁর ছবির ঘর আলাদা। সেখানে শুধু তাঁর বাবা থাকেন। আমরা সহজে ঢুকতে পারি না। একটু থেমে বলল, আমার ঘরে দুটো গোপনীয় ছবি আছে। কাল এস তোমাকে দেখাব। হেনরী এবং ভারোদী করিডরের ভিতর হাঁটছে। তাদের পায়ের শব্দ প্রাসাদের অলিন্দে জলের ফোঁটা যেন, অনেক উঁচু থেকে টুপটাপ শব্দ করে পড়ছে।

তখন দূরে ওজালিও এবং মায়িবার উজ্জ্বল হাসির শব্দ ভেসে আসছিল। বহুদূর থেকে ওজালিওর হাসি এবং আনন্দ তরঙ্গের মতো অনেক হলঘর পার হয়ে এই করিডরে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। ভারোদী আপন মনে বলল, বেচারা ওজালিও! তারপর হেনরীর দিকে মুখ তুলে বলল, ওজালিওর মা কতদিন হলো মারা গেছেন?

—এই সেদিন। আমাদের জাহাজ তখন ডাববানে।

—কি অসুখে মারা গেছেন?

—কোন অসুখের কথা চিঠিতে লেখা ছিল না। ওজালিও চিঠি দিয়েও জবাব পায়নি। আমাদের কলকাতার এজেন্ট অফিস খবর দিল, তার মা মারা গেছে। হেনরী তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিল। স্পেনের লোক ওজালিও, সুতরাং কলকাতার সঙ্গে কি সম্পর্ক থাকতে পারে! খুব ভুল হয়ে গেল। হেনরী মিথ্যা জবাবের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল কিন্তু ভারোদীকে ওজালিওর আরামপ্রিয় এবং স্নিগ্ধ মুখের পাশে মাতৃহীন ছবি এত বেশি ভারাক্রান্ত করছিল যে—সে বুঝেই উঠতে পারছে না কেন হেনরী সহসা চোখ মুখ লাল করে কথা বলতে গিয়ে তোতলামিতে আড়ষ্ট হচ্ছে। যেন ভারোদী তখন বলতে চাইছে—প্রিয় ওজালিওর চোখ বড় মহিমাময়। সে স্পষ্ট করে বলল, প্রিয় ওজালিওর মুখ খুব মায়ামাখানো। দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছা হয়।

হেনরী হাসতে হাসতে বলল, সেজন্য আমাদেরও হিংসে হয়। জাহাজের সবাই ওকে ভালবাসে। মায়ের মৃত্যুর পর তো কথাই নেই। জাহাজে যখন প্রথম উঠল, কাপ্তান মেজ-মিস্ত্রিকে বললেন, কিহে, এক নাবালক ছোকরাকে ধরে আনলে। 'নলী' ভাল করে দেখেছে তো!

—উত্তরে মেজ মিস্ত্রি কি বললেন?

—বললেন, ওর কাছে জাহাজী শিক্ষার ছাড়পত্র আছে। এ প্রসঙ্গে বেশিদূর যাওয়া ভাল নয় ভেবে হেনরী বলল, এবারে যাওয়া যাক।

কৃত্রিম পাহাড়টার নিচে গাড়ি ছিল। মারিয়া ছুটে ছুটে আসছে। পিছনে ওজালিও। করিডরে তাদের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। হেনরী গাড়ি-বারান্দায় অপেক্ষা করছিল। ভারোদী পাশে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল—তোমরা এলে বেশ লাগে। নাবিকদের সম্পর্কে আমার সবসময় কৌতূহল আছে। আর যখন জানলাম গ্যানীর কাছে, তুমি আমাদের পরিচিত নাবিক-বন্ধু, তখন তো কথাই নেই। ভাবলাম, তাহলে এবার খুব হৈ-চৈ করা যাবে।

গাড়িতে বসে হেনরী কিন্তু সুমনের সঙ্গে একটা কথাও বলল না, ওরা পরিচিত পথ ধরে যাচ্ছিল। সামনে বড় হাসপাতাল এবং বেসবল খেলার মাঠের বড় আলোটা ওরা অতিক্রম করে গেল। মোটর খুব দ্রুত ছুটছিল। সুমন গাড়ির জানলাতে মুখ রেখে শহরের আলো, ঘর, বাতি দেখতে দেখতে বলল, এস এখানে নেমে যাই। তারপর বাকি পথটা আমরা হেঁটে যাব।

—ভাল লাগছে না সুমন, তাড়াতাড়ি জাহাজে ফিরব।

জেটিতে ঢোকার মুখেই ওদের ছেড়ে দেওয়া হল।

হেনরী হাঁটতে হাঁটতে বলল, তুমি জাহাজে যাও, আমি একটু ঘুরে আসছি।

—মানে!

—মানে আমি একটু খাব।

—আমিও খাব।

—না।

—কেন নয়?

—আমি আর দায়িত্ব নিতে পারছি না। হেনরী খুব ক্লান্ত গলায় বলল।

—কিসের দায়িত্ব?

সুমন হেনরীর এই উত্তেজনার কারণ বুঝতে পারছে না। ক্রেনের শেকলের ছায়াটা ওর মুখের উপর দুলছে। সে মাথা নিচু করে বলল, আমি কালা-আদমী এবং আমি ইন্ডিয়ান, সাদা বলে পরিচয় দিয়ে নিজেও অসম্মানবোধ করছি। মাটির টান, শহরের জৌলুস আর সুন্দরী মেয়েদের ছবি আমার কাছে নেশার মতো। আমাকে...আমাকে...সুমন বাকিটুকু প্রকাশ করতে পারল না। সুমন এই অসম্মানের জন্য অন্ধকারের ভেতর তেমনি মাথা নিচু করে রাখল।

হেনরী বলল, তুমি আমার উপর রাগ করছ?

—না, কারও উপর রাগ নেই। সুমন ধীরে ধীরে জাহাজের দিকে হাঁটতে থাকল।

হেনরী সঙ্গে সঙ্গে হাঁটল। বলল, ভারোদী ন্যাশনেল স্টেট্‌স রাইট পার্টির গোঁড়া সমর্থক।

—আমি জানি। তিনি স্থানীয় শাখার সম্পাদক।

—তিনি কালো মানুষদের সম্পর্কে খুবই বেপরোয়া। খুবই ঘৃণা করেন।

—হেনরী আমি সব জানি। তার ঘরে রেটল্ সাপের ছবি এবং নিগ্রো রমণীর মুখ পাশাপাশি আঁকা আছে।—অহেতুক ঘৃণা পোষণ করছেন তিনি। তাঁর সংস্কার তাকে পাগল করে দিচ্ছে। এও এক ধরনের অসুখ। তারপর হাসতে হাসতে বলল, আমার এক দূর সম্পর্কের বিধবা পিসির কথা মনে পড়ছে। তিনি মুসলমানদের ছায়া মাড়ালে স্নান করতেন। মারিয়ার মাকে আমার সেই বিধবা পিসির মতই দেখাচ্ছিল। আর জান হেনরী, অবাক, এত দীর্ঘদিন পরেও হঠাৎ সেই ছবিটা আমি হুবহু মনে করতে পারলাম।

এই সব কথায় সুমনকে খুব বয়স্ক মনে হচ্ছে। সুমন এক পরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষের মতো কথা বলছে দেখে হেনরীর হাসি পেল। বলল, হয়েছে আর ভারি ভারি কথা তোমাকে বলতে হবে না। বাবুর প্রাণে খুব লেগেছে। চলেন, দেখব কত মদ খেতে পারেন। বলে, ফের দুজনই নিঃসঙ্গ জেটির ভেতর উচ্ছল হয়ে উঠল যেন জাহাজী মানুষের জীবনে মাটি মাত্রেই মদের মতো আর মেয়ে মাত্রেই আলেয়ার মতো—ফাঁক পেলেই জাহাজীদের টানছে আর টানছে।

॥ সাত ॥

ফোকসালে ঢুকে সুমন দেখল, ঠিক পোর্টহোলের পাশে সুচারু এবং সামাদ বসে বসে দড়ির সিঁড়ি ঠিক করছে। ওদের মুখ খুব ঝাপসা দেখা যাচ্ছে। সুমন পোর্টহোল পর্যন্ত হেঁটে গেল না, কারণ শরীর খুব টলছে এবং কোন কথা বলতে পারছে না। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। সে বাংকে বসে হাত তুলে কিছু বলবে ভাবলে। কিন্তু তার আগেই কি ভেবে সে সঙ্গে সঙ্গে জুতো, মোজা, জামা প্যান্ট নিয়ে শুয়ে পড়ল।

সুচারু এবং সামাদ খুব নিবিষ্ট মনে কাজ করছিল বলে সুমনকে একেবারেই লক্ষ্য করেনি। সুচারু দড়িটা টেনে বলল, ঠিক আছে। ছেঁড়বার ভয় নেই। সে হাত ঘড়ি দেখল।

আর সামাদ হাত ঝেড়ে উঠতেই দেখল, বাংকে সুমন। জামা-প্যান্ট না ছেড়েই শুয়ে পড়েছে। সে কাছে যেতেই বুঝল, খুব টেনে এসেছে বাচাল ছোকরা। সুতরাং সে ওকে টানাটানি না করে পায়ের জুতো মোজা খুলে দিল। তারপর সে উপরে উঠে সন্তর্পণে বড় টিন্ডালের দরজার সামনে কান পেতে রাখল। ভিতরে আলো আছে মনে হল। অথচ কোনও শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। মনে হল বড় টিন্ডাল ঘুমিয়ে পড়েছে, আর ওর দোসর ডংকিম্যান ইদ্রিশালীও ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুচারু উপরে উঠে যাবার সময় দেখল সামাদ অন্ধকারের ভিতর লুকিয়ে থেকে বড় টিন্ডালের ফোকসালে কান পেতে রেখেছে। সুচারু ফিস ফিস করে বলল, এই কি হচ্ছে!

—অ্যাঁ! সামাদ ভয়ে আঁৎকে উঠল।

—অঃ তুই। কিছু হচ্ছে না। বলে, সে ধীরে ধীরে সুচারুর সঙ্গে উপরে উঠে গেল। সামাদ ফের কম কথা বলতে শুরু করেছে, ফের ওকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। ডেকের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে সুচারুই প্রায় সব কিছু লক্ষ্য করল। বসন্তকাল—সুতরাং এই ঠাণ্ডা বাতাস বড় আরামদায়ক। নদীর জল এখন অন্ধকারের মতো। ডেকের উপর কোন জাহাজীর সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। গ্যাঙওয়েতে কোয়ার্টার মাস্টার শুধু জেগে আছেন। আর কিছু আলো জ্বলছে ডেকের উপর। সুচারু লক্ষ্য করে বুঝল কোয়ার্টার মাস্টার যাবার সময় তাদের দেখতে পাবে না। এ সময় কাপ্তান বোট ডেকে একটা ডেক-চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকেন, সুচারু দেখল—আজ তিনিও নেই। কোথাও কোন পুলিশ ফাঁড়িতে এগারোটার ঘণ্টা বাজছে। গ্যালীর দরজা বন্ধ। ভাণ্ডারী ফোকসালে চলে গেছে। একমাত্র ইনজিনের আগওয়ালা জেগে। সে উঠে আসার সময় দরজা খোলা দেখতে পেলে সন্দেহ করবে। ওরা নিচে নেমে ওদের ফোকসালের দরজা ভাল করে বন্ধ করে দেবার আগে পোর্টহোল দিয়ে দড়ির-সিঁড়ি নিচে ফেলে দিল এবং এইবেলা বের হয়ে পড়তে হবে। বেশি দেরি করলে ধরা পড়বার ভয় আছে। বন্দরের কোনও কোলাহল শোনা যাচ্ছে না। শুধু দূর থেকে কোন মেশিন ঘরের একটা ঘ্যাস্ ঘ্যাস্ শব্দ

ভেসে আসছে। অন্য তীরে ম্যাপল গাছের নিচে রঙ বেরঙের নৌকার ভিড়। নৌকা খালি করে যুবক-যুবতীরা শহরে উঠে গেছে। অথবা কোন ব্যালেতে নাচ শেষে যুবক-যুবতীরা ঘরমুখী। এ হেন শান্ত নির্জনতার ফাঁকে দূরবর্তী কোন স্টেশনে ট্রেনের হুইসিল শোনা যাচ্ছে। এই বেলা ওরা নিরাপদ ভেবে দড়ির সিঁড়ি বেয়ে নেমে পড়ল নিচে।

উভয়ে সাঁতার কাটছিল জলে। আকাশে অজস্র নক্ষত্র জ্বলছে। ক্রমশ ওরা সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। বন্দরের আলো জলে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করছিল। ওরা ডুবে ডুবে সাঁতার কাটছিল। চারিদিক আলো অন্ধকারে রহস্যময়। নদীর জলে ছোট ছোট ঢেউ। ওরা কোনও কথা বলছিল না। ওরা তীরে উঠে কোনও মাঠে চুপচাপ বসে থাকবে অথবা চারিদিকে আলোকিত জ্যোৎস্না, নানারকমের কীট-পতঙ্গের আওয়াজ এবং কোথাও রহস্যের ছোঁয়া—ওরা মাটি এবং নারীর জন্য তীর ছুঁতে চাইল এবার।

এক সময় সুচারু বলল, বাবার কথা খুব মনে পড়ছে।

সামাদ বলল, সালিমার চিঠি বুঝি আর আসবে না।

সুচারু বলল, বাবা বলতেন বন্দরে নেমে শুধু মেয়েমানুষের খোঁজ করবে না, ঈশ্বরকেও অনুসন্ধান করবে।

সামাদ বলল, হেনরী কিছু বলল তোকে, মেজ-মালোম?

—না।

এই ধরনের উত্তর হবে সামাদ নিশ্চিত ছিল।

সুচারু ফের কিছুক্ষণ সাঁতার কাটল।—দেখেছিস আকাশটা কত পরিষ্কার। কেমন ফুটফুটে জ্যোৎস্না? ঠিক আমাদের দেশের মতো, না!

সামাদ বলল, আকাশটা সব জায়গাতেই এক।

—বাবা হলে বলতেন, মন্দিরে মসজিদে সর্বত্র! বলে মুখ নিচু করে একটু জল তুলে আবার ফুৎ করে ছেড়ে দিল।

সুচারু জলের ভিতর পায়ে কি লাগতেই আঁৎকে উঠল। বলল, এইরে খেয়েছে!

—কি হল! সামাদ ওর সাঁতার কাটা থামিয়ে দিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে গিয়ে মনে হল সুচারু ওকে ভয় দেখাচ্ছে।

—মনে হল পায়ের নিচে কি যেন ঠাণ্ডার মতো লাগছে।

সামাদ ভয়ে ভয়ে বলল, যা! সে তাড়াতাড়ি আরও উপরে ওঠার জন্য বড় বড় হাত ফেলে সাঁতাব কাটতে থাকল। কী জানি নদীর এত উপরেও যদি কোনও হাঙ্গর টের পেয়ে যায়।

সুচারু ডুবে গেল যেন। সামাদ পেছনের দিকে তাকাচ্ছে। সুচারু আর উঠছে না। ওর শরীর হিম হয়ে আসতে থাকল। কালো অন্ধকার জলে সুচারু কোথায় নেমে গেল! সে ডাকল, এই সুচারু! অথচ খেয়াল হল জলের নিচ থেকে ওর ডাক কানে পৌঁছবে না। সে সাঁতার কাটতে পারল না। সে কেমন স্থবির হয়ে যাচ্ছে। আর তক্ষনি ঠিক ওর পিছনে সুচারু ভোঁস করে ভেসে বলল, নিচে জাহাজের মাস্তুলেব মতো মনে হল। সে রহস্য করে বলল, একটা জাহাজের কঙ্কাল জলের নিচে পড়ে আছে।

এই অস্পষ্ট জ্যোৎস্নাব ভিতর সামাদের মনে হল, কোথাও কোন ভয়ের চিহ্ন নেই সুচারুর মুখে। সুচারু মিষ্টি মিষ্টি হাসল। বলল, আমার গান গাইতে ইচ্ছা হচ্ছে! ওদের মুখে এখন বড় বড় অপরিচিত গাছের ছায়া পড়ছে। গাছের ফাঁকে চাঁদের আলো মহিমময় ঈশ্বরের মতো। ওরা বুঝল ক্রমশ ওরা তীরের নিকটবর্তী জায়গায় এসে যাচ্ছে। ওরা আনন্দে যথার্থই এবার জলের উপর ভেসে ভেসে শিস্ দিয়ে গান গাইল।

সামনে ছোট জেটির মতো বাঁধা পার। কিছু স্কীপ বাঁধা সেখানে। পাশে ছোট ছোট বয়াতে লাল আলো। ওরা তীরে উঠে দেখল সেইসব বড় বড় গাছ জড়াজড়ি করে আছে এখানে। জাহাজ থেকে জায়গাটাকে কুঞ্জবনের মতো মনে হয়। ওরা তোয়ালে দিয়ে শরীর মুছে কিছুক্ষণ এই মাঠের ভিতর ছুটে বেড়াল এবং চুপচাপ শুধু আকাশ দেখার সময় সুচারু বলল, আমরা এত কষ্ট করে এখানে এলাম কেন সামাদ?

—কিসের কষ্টের কথা বলছিস?

—এই যে এতটা জল কেটে এপারে এলাম কেন? আচ্ছা, সামাদ, মনে হচ্ছে না দূরে কুকুর ডাকছে?

সামাদ কান পেতে শুনল, হ্যাঁরে, কুকুর ডাকছে।

সুচারু বলল, কোথাও কি মনে হয় তুই আর সালিমা পৃথিবীর দুই বিপরীত বিন্দুতে বসে আছিস?

সামাদ চুপ করে থাকল।

—মনে হয় না, মাঠের জ্যোৎস্না পার হয়ে গেলেই তোর গ্রাম পড়বে? মনে হয় না, এই মাঠের শেষেই তোদের বাড়ি। সালিমা সেখানে কুপি জ্বেলে সরষে বেঁটে পুঁটিমাছ রান্না করছে?

সুচারু একটু হেঁটে এল গাছগুলোর চারধারে। এত জ্যোৎস্নার প্লাবন, সাদা মাঠ এবং আকাশ, পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশের শরৎকালীন আকাশের মতো। ওর মাকে মনে পড়ছে না। ওর বাবাকেই মনে পড়ছে। খুব ছোটবেলায় ওর মা ঝাড়গ্রামের দিকে কোথায় চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছিলেন, আর ফেরেননি। বাবা বলতেন, তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। তখন শহরে নগরে সৈনিকেরা ছড়িয়ে পড়ছিল। আরও এমন সব কথা বলতেন যা সুচারু ধরতে পারত না, খুব হেঁয়ালি করে কথা বলতে ভালবাসতেন। স্ত্রীজাতি মাতৃজাতি—ওদের ভোগে তৃপ্তি। বিপদে ওরা পাথর বনে যায় না। ওহে রবার্ট সুচারু, এস বুকের কাছে এস। প্রতি সফরে ওর বাবা বুকে জড়িয়ে ধরে বলতেন, তুমি গির্জায় যাবে, ওটা মানুষের তৈরি শান্তির ঘর। না গেলে দুঃখ পাব। তারপর একটু থেমে বলতেন, আমার জন্য একটা ভাল দামী পুরোনো কোট আনবে। অনেকদিন ধরে একটা ভাল কোট পরতে পারছি না।

—একটা কিনে দিলেই পারিস?

—প্রত্যেকবারই কিনে নিয়ে যাই।

—কি করেন এত কোট দিয়ে?

—কি আর করবে, টাকার টান পড়লে বেচে মদ খান।

পাশে মেটাল রোড। ওরা দেখল ট্রাক-বোঝাই হয়ে হাঁস-মুরগি যাচ্ছে। ওরা গাছের অন্ধকারে চুপচাপ লুকিয়ে পড়ল। মনে হচ্ছিল, দূরে কোন নিগ্রো-গ্রামে উৎসব চলছে। থেকে থেকে 'হেই হেই' এক ধরনের খুব দূরবর্তী নদীর ঢেউ-এর মতো শব্দ ভেসে আসছিল।

ওরা উঠে গিয়ে সামনের একটা স্কীপে বসল। স্কীপে ছোট মোটর আছে। এবং ওরা হাত দিয়ে দেখল—ওটা চালালে খুব তাড়াতাড়ি অনেকটা দূর ঘুরে আসা যায়।

সুচারু বলল, চল্ নদীর উপরের দিকটা দেখে আসি। বলে স্টার্টারটা টেনে ধরল।

সামাদ বলল, শব্দে মানুষজন জেগে উঠতে পারে।

সুচারু বলল, পাল তুলে দিলে হত। অথচ কোনও বোটেই পাল নেই। বলে, অন্য স্কীপগুলোতে ঘুরে বেড়াল। পালে চলে এমন কোথাও কোনও স্কীপ যদি পড়ে থাকে অথবা নৌকার জন্য ওরা অনেক দূর হেঁটে গেলে দেখল—বিরাট খামার বাড়ি—বাড়ির সদরে আলো জ্বলছে এবং ঘাটে সেই স্কীপ বাঁধা। ওরা পাল তুলে সন্তর্পণে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। জোয়ারের সময়। স্রোতে টান রয়েছে। ওরা খুব তাড়াতাড়ি নদীর উপরে উঠে যেতে পারল।

ওরা ক্রমশ নদীর উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। ক্রমশ বন্দরের আলো পিছনে ফেলে, দু-পারের নিগ্রো বস্তি অঞ্চল পিছনে ফেলে এবং যখন আর জাহাজের মাস্তুলের আলো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল না, যখন মনে হচ্ছিল দু-পারেই ঘন বন, দেওদার জাতীয় গাছের ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্নার আলোতে ওদের মুখ যখন ছায়াছবির মতো কোমল অথবা এও হতে পারে সালিমা তরুণী যুবতী, সামাদ শালুক তোলার ফিকির খুঁজছিল মনে মনে। সামাদ বলল, বর্ষাকাল তখন। সালিমা জমিতে ডুবে ডুবে শালুক তুলছে, আমি ডুব দিয়ে পা ধরতেই ভয়ে ওর মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল।

নদী ক্রমশ সরু হয়ে আসছে যেন। দু-ধারে হেমন্ত গাছ অথবা বড় বড় গরান গাছের মতো গাছের ছায়া জায়গাটাকে অপার্থিব করে তুলছে। নৌকোর কোন শব্দ নেই। এই খাড়ি নদীতে যাতায়াতের জন্য অথবা মাল বইবার জন্য কোন ফেরি বোটের শব্দ ভেসে আসছে না। পুরোপুরি

নিঃসঙ্গ নির্জন এই অঞ্চলে সহসা এক আলোর ফোয়ারা গাছ-গাছালি ভেদ করে ওদের উপর এসে পড়তেই ওরা হকচকিয়ে গেল। যেন কোনও সার্চলাইট থেকে ওদের মুখে আলো এসে পড়ছে। ওরা তাড়াতাড়ি ভাঁটার মুখে ফের স্কীপ ঘুরিয়ে দিতেই মনে হল দূরে কোথাও পিয়ানো বাজছে। কোন গির্জায় হয়ত এই মধ্যরাত্রে কোন মৃতদেহের কবর হচ্ছে অথবা কোন মিশনারী হাসপাতাল থাকতে পারে। সুচারু তাড়াতাড়ি হাত তুলে দিয়ে কি বলতে চাইল। কোন চ্যাপেলের পুরোহিত সার্ভিস শেষ করে যেন বাইবেল থেকে ধর্মীয় সঙ্গীত পাঠ করছেন।

সুচারু বলল শুধু, আমি এখানে নেবে যাব সামাদ।

—তুই পাগল সুচারু।

—আমি দেখে আসব।

—না। আমি আর একমুহূর্ত দেরি করব না। বলে সে জোরে ভাঁটার টানের সঙ্গে নৌকো ছেড়ে দিল।

—সামাদ।

সামাদ বলল, সুচারু তুই আজ হোক কাল হোক পাগল হয়ে যাবি।

ক্রমশ স্কীপ ফের বন্দরের দিকে নেমে যাচ্ছিল। সুচারু কোন কথা বলল না। শুধু দু-গলুইর মাঝখানে পা রেখে পা ফাঁক করে দাঁড়াল। তারপর দু-হাত উপরের দিকে তুলে—একদা যে সব ধর্মীয় সঙ্গীত লিজা এবং সে গির্জার ভিতর পাশাপাশি উচ্চারণ করত—এই মধ্য রাত্রিতে নিঃসঙ্গ নদীর জলে পাগলের মতো সেইসব ধর্মীয় সঙ্গীত সে গাইতে থাকল।

॥ আট ॥

ভোরে উঠে জাহাজীরা দেখল গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। সমুদ্র থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া উঠে আসছে দ্রুত। কিনার থেকে নিগ্রো কুলি উঠে আসছে। ওরা রেন-কোট গায়ে উঠে আসছে। ওদের মাথায় টুপি ছিল। ওরা পকেটে হাত রেখে উপরে উঠে দ্রুত কাজ করতে থাকল। ফল্কা থেকে সব কাঠ খুলে একপাশে সাজিয়ে রাখল তারা। ডেকজাহাজীরা ওদের সাহায্য করছে কাজে। বৃষ্টির জন্য এবং ঠাণ্ডা হাওয়ার জন্য কাজে ডেক-জাহাজীদের নিদারুণ কষ্ট। ওরা মাঝে মাঝে ফোকসালে ঢুকে কাগজে ক্যাপস্টেন তামাক পেঁচিয়ে শরীর এবং হাত গরম করার জন্য সিগারেট টানছে। উইনচ মেসিনগুলো গড় গড় করে উঠল। ডেরিকের সঙ্গে ক্রেন মেশিনগুলোও কাজ করছে। সারি সারি ট্রাক, সালফার বোঝাই। ট্রাক খালি হচ্ছে এবং চলে যাচ্ছে। চারিদিকে ব্যস্ততা। মেজ মালোম ফল্কায় মুখ রেখে কি যেন বলে যাচ্ছেন। সকলে কাজে বের হয়ে পড়েছে। কিনার থেকে কাস্টম অফিসার এসেছিলেন। তিনি জাহাজের সর্বত্র কি দেখে ফের নেমে যাচ্ছেন। ডেক-সারেঙ ফরোয়ার্ড-পিকে যাবার সময় বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছিল এবং সুচারু দুই নম্বর ফল্কার ভিতরে কাজ করছে তখন।

তখন এনজিন রুমে নামার সময় দু-নম্বর ফল্কাতে সুমন উঁকি দিল। ফল্কার ভিতরে একজন নিগ্রো যুবক এবং সুচারু। ওরা নিবিষ্ট মনে কথা বলছিল। সুমন সুচারুকে উঁকি মেরে বলল, আমরা কোথায় যাব জানিস?

সুচারু চিৎকার করে জবাব দিল, সালফার নিয়ে নিউপ্লাইমাউথ যাব।

—সেটা কোথায় জানিস?

—জানবার দরকার নেই।

—আমরা পানামা ক্যানেল পার হয়ে মাসখানেক প্রশান্ত মহাসাগরে পড়ে থাকব।

—তোকে কে বলল?

—হেনরী বলল, এজেন্ট-অফিস থেকে আমাদের ভয়েজের নোটিশ পড়ে গেছে।

সুচারু বলল, নিচে আয় না!

সুমন জবাবে বলল, ভোরে উঠে দেখলাম তুই আর সামাদ নেই। তোদের বাংক খালি।

সামাদ চিৎকার করে বলল, শালা টিন্ডালের কাজ। ভোর রাতে আমাদের ডেকে তুলেছে। সারা রাত যদি চোখে একটু ঘুম লাগত।

—তোরা গেছিলি কোথায়?

সুচারু তাড়াতাড়ি ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে ইসারা করল।—তুই নিচে আয় না! সব খুলে বলছি।

সুমন নিচে নামলে সুচারু নিগ্রো যুবকটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। বলল, বার্ট উইলিয়াম, অ্যান্ড দি ইয়াং ইন্ডিয়ান সেলর শ্রীসৌমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা সুমন বলে ডাকি।

সুচারু একসঙ্গে কথাগুলো বলল।

সুমন বার্টকে লক্ষ্য করে বলল, তুমি টম কাকার কুটির পড়েছ? সুমন নিগ্রোদের সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি খবর রাখে না। বার্টকে কিছু বলবার মতো সুমনের আর কিছু জানা ছিল না। কথোপকথনের জন্য কোন সূত্র দরকার। সে অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর এই একটি মাত্র নিগ্রো সম্পর্কিত ঘটনার কথা মনে করতে পারল।

বার্ট হাসল। বলল, গল্পটা আমাদের জানা আছে।

সুমন প্রশ্ন করল, তুমি পড়নি?

—আমি পড়তে জানি না। আমি বই পড়তে জানি না।

মনে মনে সুমন ভাবল, একেবারে নিরক্ষর। সুমন অন্য কথায় এল, আমরা ডারবান বন্দরে প্রচুর নিগ্রো দেখেছি। ওরা অত্যন্ত সরল।—কি যেন নাম? সুমন সুচারুকে উদ্দেশ করে প্রশ্নটা করল...এই কি যেন নাম, নামটা ভুলে যাচ্ছি। কি যেন বলছিল...হ্যাঁ,হ্যাঁ,—ওয়ান ওয়াইফ নো গুড, টু ওয়াইভস্ গুড, থ্রি ওয়াইভস্ ভেরি গুড্। কি জানি কেন আমাদের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল।

- তাই বুঝি! বার্ট উপরের দিকে তাকাল। সুচারু উপরের দিকে তাকাল। সামাদ বেলচা দিয়ে গন্ধক ছড়িয়ে দিচ্ছে। ওরা নাকে মুখে রুমাল বেঁধে নিয়েছিল বলে মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। সে বলল, বার্ট, আই হ্যাভ্ ওনলি ওয়ান।

সুমন বলল, খুব সুন্দর দেশ।

সুচারু বলল, সাহেব নদীর উপরের দিকটাতে মনে হয় কোন বসতি নেই!

—না। এখানে এই ছোট্ট শহর শুধু গন্ধক রপ্তানীর জন্য গড়ে উঠেছে বলতে পার। আর কিছু তেল রপ্তানী হচ্ছে হাল আমলে।

সুচারু গতরাতের সেই বনের ভেতর থেকে যে উজ্জ্বল আলো বেরোচ্ছিল তার কথা জানতে চাইল।

বার্ট কাজ করে যাচ্ছে এবং কথা বলে যাচ্ছে। ওর মাথায় কালো টুপি, পরনে নীল রঙের বয়লার স্যুট। গাম বুট পরে সে হাঁটছিল। অন্যান্য নিগ্রো কুলিরা উপরে হল্লা করছে। হাতের সংকেতে মাল ওঠা-নামা করছে। বার্ট পকেট থেকে পাশপোর্ট সাইজের একটা ছবি বের করল—খুব যত্নে সে সংরক্ষণ করছে। সে বলল, মাই ডার্লিং। বলে ছবিটা সে সকলকে দেখাল এবং ফের বলল, আই হ্যাভ ওনলি ওয়ান। তারপর সে হা হা করে হেসে উঠল।

ওরা সকলেই বার্টের সরল এবং অকপট ব্যবহারে অবাক হয়ে গেল। সামাদ সুচারু উভয়ে ছবিটার উপর ঝুঁকে পড়ল। নিগ্রো রমণী, চুল খুব ছোট করে ছাঁটা, চোখের নিচে ছোট আব এবং মোটা নাকের নিচে ঠোঁট উঁচু রমণীর সবল বাহু পরস্পরকে আকর্ষণ করছিল। সুমন এক ফাঁকে ছবিটা হাতে নিয়ে দেখল তারপর ছবিটা ফেরত দেবার সময় বলল, নাইস গার্ল।

—ভেরি বিউটিফুল। বার্ট বলল। তারপর বলল, তিনি লিখতে পড়তে জানেন। আলবামাতে আমাদের একটা আন্দোলন চলছে—তিনি এখন সেখানে আছেন।

—তা হলে তুমি এখন একা!

—আমি টাকা জমাচ্ছি। ছুটি নিয়ে ওর কাছে শীগগিরই চলে যাব। বলে সে রা রা করে গান করতে থাকল—অদ্ভুত গান, স্ত্রীর কথা মনে হতেই সে লাফিয়ে লাফিয়ে অদ্ভুত সব ভঙ্গি করে গান

গাইল—ক্লড ম্যাক নামক কবির কবিতা...মৃত্যু যদি আসে আসুক, মরব নাকো খাঁচায় হয়ে বন্দী, বীরের মতো লড়ব মোরা...থাকব নাকো খাঁচায় হয়ে বন্দী।

সুমন উপরে ওঠার সময় বলল, ওকে আমাদের ফোকসালে নিয়ে যাবি, টিফিনে গল্প করা যাবে।

সুমন বাংকারে ঢুকে দেখল প্রায় সব কোলবয় এবং স্টোকাররা কয়লা লেভেলের কাজে লেগে গেছে। সুমনও বেলচা হাতে ভিতরে ঢুকে গেল। এটা ক্রস-বাংকার। গুঁড়ো কয়লা বলে ওদের লেভেল করতে কষ্ট হচ্ছে না। কয়লা অনেক নিচে নেমে গেছে। সামনের কোন বন্দর থেকে ফের কয়লা নিতে হবে। পকেট বাংকারও প্রায় নিঃশেষ। সুতরাং দীর্ঘ যাত্রার আগে আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের কোন বন্দরে বাংকার ভরে প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করতে হবে।

সারেঙ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ দেখছেন। মেজ-মিস্ত্রী একবার কাজের তদারক করে গেছেন। দিনটা মেঘলা বলে বাংকারের অন্ধকার অন্য দিনের চেয়ে বেশি। ওরা আনাচে-কানাচে লম্ফ জ্বেলে কয়লা লেভেল করছে। ওরা কাজ করার সময় দেশ বাড়ির গল্প করছিল। সমুদ্র-যাত্রা কবে শেষ হবে আর কবে দেশের দিকে জাহাজের আগিল ফেরানো হবে এইসব অথবা সারাজীবন যেন এ-ভাবেই কাটবে, শুধু জল, শুধু নীল আকাশ, শুধু বন্দরে অপরিচিত মেয়েমানুষের গন্ধ এবং ওরা আর যথার্থই বন্দরে না নেমে থাকতে পারছিল না।

সুতরাং খারাপ দিনের জন্য, ঝড় বৃষ্টির জন্য জাহাজীদের ফোকসালে অথবা কেবিনে আটকে রাখা যায় না। যে-কোন ফাঁকে, যে-কোন অজুহাতে বন্দরের মাটি ছুঁতে পারলে তারা খুশী হয়। কারণ সমুদ্র অতিক্রম করে যে বন্দর, বন্দরের কোলাহল এবং মাটির স্পর্শ ওদের কাছে তীর্থের মতো। শুধু বুড়ো নাবিকেরা ফোকসালে বসে বসে তামাক টানে আর দেশের বর্ষার জন্য, জলের জন্য মাছ শিকারের আশায় জাল বুনতে থাকে। কিনার থেকে ফিরলে যুবক জাহাজীদের সঙ্গে বন্দরের গালগল্প। ওরা বন্দরের অলিগলি মুখস্ত রেখেছে। সব ওরা অনর্গল বলে যাবে। মনেই হয় না তারা নামাজি মানুষ—পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়ে—কিনারায় নামে না, তবে টমেটোর মতো মেয়েমানুষের রসালো গল্প বলতে ওস্তাদ। তারপর কিছুক্ষণ থেমে বলবে—ওহে যুবক জাহাজীবা, বন্দরে নামলে আমাদের জন্য পাকা টমেটো এনো। অথবা ওরা তাজা মাছের কথা বলবে। বরফ-ঘরের পচা মাংস, মাছ খেতে স্বাদ নেই। দেশের বড় পাবদা মাছের গল্প হবে তখন, কৈ মাছের গল্প হবে...ওরা নদী খাল বিলের কথা ভাবতে ভাবতে একদিন ফেব গোটা সফর শেষ করে সত্যি সত্যিই ঘরে ফিরে যাবে।

সুচারু মেসরুমে দেখল ওদের 'বিশুর' গোস্ত, ডাল এবং কফি ভাজা ভাণ্ডারী আলাদা করে রেখে দিয়েছে। সুচারু নিচে নেমে গেল, তিনটে গেলাস নিয়ে এল উপরে। মেসরুমের টেবিলে থালা এবং গেলাস জলে ধুলো ভাল করে তারপর আলাদা থালায় ভাত ডাল বেড়ে, পাশে কফিভাজা রেখে সামাদ এবং সুমনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকল।

বারোটার ঘণ্টা পড়লে সব এনজিন এবং ডেক-জাহাজীরা দুপুরের খাবারের জন্য পিছিলে জড়ো হল। সুমন সামাদ হাত ধুয়ে নিল তাড়াতাড়ি, তারপর খেতে বসে বলল সুচারু, বার্টকে টিফিনে আসতে বললি না?

সামাদ বলল, সে আসছে। ওর টিফিন নিয়ে আসবে ওর মা। সে নিচে টিফিন আনতে গেছে।

কিন্তু সুমন খেতে বসেই দেখল বার্ট জানালা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে। সুমন হাতে ইসারা করলে বার্ট ভিতরে ঢুকে গেল। সুচারু সুমন তাড়াতাড়ি খেয়ে সামাদকে বাসন ধুতে বলে বার্টকে সঙ্গে করে নিচে নেমে বলল, আমরা এখানে থাকি। এই আমাদের বাংক, এখানে সামাদ; এখানে সুচারু আর আমি এই বাংকে। উই আর থ্রি মাসকেটিয়ার্স।

সুচারু বললে, উই আর থ্রি 'স' অথবা 'এস' বলতে পার। সুমন, সুচারু, সামাদ।

—কবে দেশ থেকে বের হয়েছ?

সুমন কর গুনে বলল, প্রায় আটমাস হতে চলল!

—কবে ফিরবে?

সুমন উপরের দিকে হাত তুলে ঈশ্বরকে দেখাল।—সেটা তিনি জানেন।

বার্ট ওর থলে থেকে বের করল বড় দুটো আলু সেদ্ধ এবং মোটা রুটি, সেদ্ধ মাংস, সেদ্ধ গাজর আর একটু নুন। সে সবগুলো খাবারের উপর নুন ছড়িয়ে দিল। তারপর খাবারগুলো খবরের কাগজের উপর রেখে গব গব করে বিয়ার ঢেলে দিল কতকটা—সে মাংসের সঙ্গে রুটির সঙ্গে কোকোকোলার মতো মদ গিলতে থাকল।

সে খেতে খেতে বলল, ইউ লাইক?

সুমন বলল, না, এখন খেলে কাজ করতে পারব না।

—না খেলে কি করে কাজ করবে?

—তুমি খাও সাহেব। সামাদ বার্টকে বলল।

—না না একটু মুখে দাও। বলে সে জোর করে সুমনের মুখে, সুচারুর মুখে এবং সামাদের মুখে ঢেলে দেবার উপক্রম করল। সে বলল, উঁহু ছোট হাঁ করলে চলবে না। বড়—আরও বড়, বেশ ঢক ঢক করে গিলে ফেল। আমার মা নিজের হাতে তৈরি করেছেন। বিজ্ঞাপন দেবার মতো হাত নেড়ে নেড়ে বলল, স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়।

সুমন বলল, বড্ড ঝাঁঝ।

বার্ট বলল, এ তো সরকারী মদ নয়। মা অনেক যত্ন করে লুকিয়ে-চুরিয়ে করেন। কাল মাকে বলব তোমাদের জন্য আলাদা করে আনতে।

সামাদ বলল, না বাপু তোমার জিনিস খেলে হজম হবে না। আমার এক্ষুনি বমি হয়ে যাবে।

সুমন বলল, বড় কড়া জিনিস।

বার্ট বলল, এটা নামে বিয়ার। কাজে বিয়ারের ফাদার।

কথা প্রসঙ্গেই বার্টের বাবার কথা জানতে চাইল সুমন।

বার্ট গোৎ করে রুটি গিলে ফেলল, তারপর মুখে ফের ঢক ঢক করে মদ ঢেলে বলল, তিনি বেঁচে নেই। তিনি ১৯২১-এ মারা গেছেন।

সুমন বলল, বাট ইউ আর সো ইয়াঙ।

বার্ট ততক্ষণে সব খাবারটা শেষ করে ফেলেছে। সে বলল, মি পসথমাস চাইল্ড। তিনি ১৯২১-এ ওকলাহোমার টুলসাতে শ্বেতাঙ্গদের হাতে মারা যান। ইট্ ওয়াজ এ লিঞ্চিং।

—তার মানে।

—তার মানে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা। লাসটাকে গাছে ঝুলিয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ছাল তুলে নেওয়া হয়েছিল। তখন ভয়ঙ্কর দাঙ্গা।

সুচারু বলল, হরিবল্, এসবও হত তোমার দেশে?

—হোত নয়, এখনও হচ্ছে। এখনও প্রচুর নিগ্রো গুম হয়ে যাচ্ছে।

—ভয়ঙ্কর ব্যাপার। সুচারু বাংকের উপর বসে সিগারেট বের করে বার্টকে একটা দিল।

বার্ট মদ কুলকুচো করার মতো শেষ মদটুকু গিলে ফেলল। রুমাল দিয়ে মুখ মুছে বলল, কেবল মায়ের জন্য এখানে পড়ে আছি। তিনি কোথাও যেতে চাইছেন না। মাকে কত বলছি চল, আমরা উত্তরে উঠে যাই, সেখানে বিদ্বেষ এত তীব্র নয়—কিন্তু মা যেতে চান না। তাঁর পূর্ব-পুরুষ এখানেই প্রথম স্বাধীন বাতাসে নিশ্বাস ফেলেছিলেন। কিছু বললেই বলবেন, পূর্ব-পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে কোথায় যাব?

সুচারু প্রশ্ন করল, তুমি বললে যে ওকলাহোমাতে, সেখানে তোমার বাবা কয়লার খনিতে কাজ করতে গেছিলেন।

—অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার।

—না না, দুঃখের ব্যাপার বেশিদিন থাকছে না। আজ হোক কাল হোক আমরা ওদের সঙ্গে এক সাথে খানা খাবই দেখবে, তোমাকে বলে দিলাম। আমাদের একজন অহিংস আন্দোলন চালাবার মনস্থ

করেছেন। তিনি তোমাদের গান্ধীর মতবাদে বিশ্বাসী। আমাকে ডার্লিং সব খুলে বলেছে। সে এক মারাত্মক ব্যাপার।

বার্টের কথাগুলো খুব ছাড়া ছাড়া ছিল। সে যেন ওর স্ত্রীর কথাগুলো গুছিয়ে বলতে গিয়ে শেষে আর পারছে না।

সে বসে বসে খুব অপ্রতিভ ভঙ্গিতে টোবাকো টানছিল। ওর মুখে সর্বদা বিস্ময়কর হাসি লুকিয়ে থাকে; অথবা মনে হচ্ছিল বার্ট সর্বদাই হাসছে মিষ্টি মিষ্টি করে। তারপর উঠে পড়ল বাংক থেকে এবং দু-হাত উপরে তুলে পা, হাঁটু এবং শরীর শক্ত করে হাই তুলল একটা আর বের হবার সময় বলল, ইউ গান্ধী পিপল প্লিজ লিসেন, অবশেষে আমাদের জয় সুনিশ্চিত। অ্যাট লাস্ট উই মাস্ট উইন। কিছুটা দৌড়ে, কিছুটা উত্তেজনা বশে সে লাফিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে গেল। সুচারু সামাদ পরস্পর মুখ দেখল। সুমন নিজের লকারে কি যেন খুঁজছে তখন। এইমাত্র সে লকারের ভিতর কিছু হারিয়ে ফেলেছে যার জন্য ওর অপরিসীম দুঃখ। সামাদ পুর্ব পাকিস্তানের নাগরিক, সুচারু ভারতীয় আর সুমন পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু। ওরা আর কোন কথা বলতে পারল না। ওরা ধীরে ধীরে সিঁড়ি ধরে যে যার কাজে চলে গেল। এই বর্ণসংস্কারের মতো ওরাও যেন দেশ ভাগ নিয়ে অপমানিত লাঞ্ছিত।

দিন খারাপ যাচ্ছে বলে কাজ কোথাও থেমে নেই। এক সঙ্গে আটটা উইন্‌চ চলছে। মাঝে মাঝে ক্রেনেও মাল তুলে আনা হচ্ছিল। উপরে সেই একই রকমের গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি এবং বাতাস। বোধ হয় ক্যারেবিয়ান সমুদ্রে এখন ঝড় এবং বৃষ্টি দুই-ই হচ্ছে। ম্যাপল গাছের শাখা খুব আন্দোলিত হচ্ছে এবং এই ঝড়ো হাওয়ার জন্য গুঁড়ো সালফার ডেকময়, আকাশময় আর বাতাসে গুঁড়ো সালফার মাঠের প্রান্তে উড়ে যাচ্ছিল। সুচারু ডেকের উপর উঠে দেখল, সব গুঁড়ো সালফার উড়ে উড়ে সাদা পাখির মতো সেই রহস্যময় জগৎটার দিকে যাচ্ছে। সুতরাং সে নিচে ফক্কার ভিতর ঢুকেই বার্টকে প্রশ্ন করল, আচ্ছা বার্ট, নদী ধরে কয়েক মাইল উঠে গেলে একটা গভীর বনের মতো মনে হয় না?

বার্ট ঠিক বুঝতে না পেরে বলল, নদীর কোন্ দিকটার কথা বলছ?

সুচারু গুঁড়ো সালফার দিয়ে জাহাজের খোলে ছোট একটা মানচিত্রের মতো এঁকে ফেলল। বলল, এখানে।

—এখানে ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনীরা একটা শিশুসদন খুলেছে নিগ্রোদের জন্য।

—রাতে একটা সার্চ-লাইট দেখলাম।

—ওটা ওদের হাসপাতালে ঢুকে যাবার সদর দরজার ওপর। বার্ট জায়গাটা সম্পর্কে খুব উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল। বলল, ঘন পপলার গাছ আছে সামনে। সুতরাং রাত্রে খুব জঙ্গলের মতো মনে হয়। তারপব কেমন সন্দিগ্ধ গলায় বার্ট বলল, এত সব খবর পেলে কি করে?

সুচারু কথাটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, কিন্তু এখানে এই তীব্র বর্ণবৈষম্যের ভিতর ওরা সাহস পেল!

—ওরা স্থানীয় নয়। ওরা উত্তর থেকে এসেছে। এবং শোনা যায় সন্ন্যাসিনীদের কেউ কেউ নিগ্রোদের ভিতর মিশনারি কাজ করার জন্য সমুদ্র অতিক্রম করে এখানে চলে এসেছেন।

—ওরা কাজ করতে পারছেন?

—ওরা জীবন বিপন্ন করে কাজ চালাচ্ছেন।

সুচারু তাড়াতাড়ি পাগলের মতো উপরে উঠে গেল। সে তাড়াতাড়ি একটা লিজার ছবি বের করে আনল লকার থেকে এবং নিচে নেমে ছবিটা ওর হাতে দিয়ে বলল, এক কাজ করবে বার্ট? খুব সন্তর্পণে এবং কানে কানে বলল, ওখানে তুমি যাবে একবার?

—কেন বলত?

—ছবিটা দিলাম। বলে ছবিটার উপর ঝুঁকে সে কি দেখে বলল, ষোল বছর আগে তোলা ছবি। তাকে এখনও খুঁজছি।

বার্ট দেখল, এক সুন্দর নীল চুলের বালিকার ছবি। সে বলল, কে?

সুচারু কোন উত্তর না দিয়ে শুধু বলল, একদিন যাবে, ছবির সঙ্গে মুখ মিলিয়ে খুঁজে দেখবে অথবা সে থেমে যেন সেই ছ'টি আঙুলের কথা বলল।—ওর একটা হাতে ছ'টা আঙুল।

বার্ট, সুচারুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর হাত ধরে বলল, আমি যাব। বলে ছবিটা খুব যত্ন করে ওর স্ত্রীর সঙ্গে রেখে দিল।

ফল্কার ভিতর থেকে আকাশটা চারকোনা মনে হচ্ছিল। সুচারু আকাশে যেন কিছু খুঁজছিল। কোনও মুখ, কোনও সন্ন্যাসিনীর মুখ। গড় গড় শব্দ হচ্ছিল উপরে এবং এক সময়ে ওর চোখ ঝাপসা হয়ে এল। সালফারের জন্য হয়ত চোখ মুখ জ্বালা করছে। ওর শরীর চুলকাচ্ছে। সে কাজ করার ভিতর ফের অতীতের স্মৃতি স্মরণ করতে গিয়ে তার প্রিয় কোমল কিশোরীর মুখকে কিছুতেই সন্ন্যাসিনীর মুখের সঙ্গে মেলাতে পারল না। সুতরাং সে ভাবল বিকেলের দিকে নিশ্চয় ঝড় থাকবে না, বৃষ্টি থাকবে না, আকাশ পরিষ্কার থাকবে এবং জলে শান্ত ভাব থাকবে আর সে অনায়াসে এই নদী অতিক্রম করে কোন স্কীপে চড়ে সন্ন্যাসিনীদের রাজত্বের ভিতর ঢুকে গোপনে গাছ-গাছালির স্বাদ এবং সন্ন্যাসিনীদের অবাক মুখের স্বাদ নিতে নিতে হয়ত সে সকল দুঃখ ভুলে যাবে।

॥ নয় ॥

এখন আর গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে না। খুব ঢল নেমেছে। সুতরাং কাজ একেবারে বন্ধ। সুমন পোর্টহোল বন্ধ করে দিল। কাঠের তক্তা দিয়ে সব ফল্কা ঢেকে দেওয়া হয়েছে। ত্রিপলে কিল আঁটা হয়েছে। সুতরাং বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি, বৃষ্টিতে কোন ক্ষতি করতে পারছিল না। ডেক-জাহাজীরা অথবা তীরের লোক-জন আগিল অথবা পিছিলের ডেক-ছাদের নিচে দাঁড়িয়ে নিজেদের বৃষ্টি থেকে রক্ষা করছে। দূরে একদল গাধা বৃষ্টিতে ভিজছিল। ওরা ম্যাপল গাছের ছায়ায় জড়ো হয়েছে। পুরুষ গাধাটা অনর্থক চেঁচাচ্ছিল। আর সব মানুষেরা, যুবক-যুবতীরা দরজায় অথবা জানলায় হাত রেখে বৃষ্টির প্রথম জল ধরার চেষ্টা করছে। মারিয়া নিজের জানালায় বৃষ্টির জলে কাঁচ ভিজতে দেখে সেই এক গল্প মনে করতে পারছে—যাদুকরের পালিত পুত্রের মুখ সেই গল্পের ভিতর কেবল ভেসে উঠছে। সে এ-সময় নিজের পড়ার ঘর থেকে বের হয়ে সোজা সামনের হলঘর অতিক্রম করে সরু প্যাসেজের ভিতর ঢুকে গেল। দীর্ঘ এই প্যাসেজ পেরিয়ে গেলে রান্নাবাড়ি এবং পরে ভারোদীর ঘর। সে হলঘর পার হয়ে সিঁড়ি ধরে মায়ের ঘরে ঢোকার আগে পরিচারককে ডাকল। এবং পরিচারকের অনুমতির অপেক্ষায় সে বেল টিপল দুবার।

বড় বাড়ি, পরিচারকেরা সকলেই রেড-ইন্ডিয়ান। প্রাসাদের মতো জাঁকজমক। দরজার মুখে সেই বৃদ্ধ পরিচারকটি বলল, ইউ মারিয়া! কাম-ইন।

মারিয়া দরজা ঠেলে ঘরের ভিতর ঢুকে গেল।

ভারোদী শুয়েছিল—সামনে আয়না, পিছনে আয়না—আভিজাত্যের সব ছবিটা ঘরের দামী আসবাবপত্র নিয়ে উজ্জ্বল। মারিয়া মায়ের পাশে বসল এবং যেন বলার ইচ্ছা, মা আমি উইচ-ককে যাব। ওজালিও উইচ ককে আসবে। অথবা যেন বলার ইচ্ছা মারিয়ার, এই বৃষ্টির দিনে টার্কির রোস্ট, আহা টার্কির রোস্ট, গ্রীনপীজ, একটু আরকে ভিজিয়ে নরম আপেল...সামনে ওজালিওর সরল অকপট-মুখ থাকবে, হয়ত ওজালিও ওর সমুদ্রের গল্প করবে, বিশেষ করে এই বৃষ্টির দিনে ঘাস মাটি সব যখন ভিজে যাচ্ছিল, আর একা একা এই দৈত্যের মতো বাড়িটা যখন খুব নিঃসঙ্গ তখন বন্দরের উইচ-কক থেকে ওজালিও...মারিয়া ফ্রক টেনে মখমলের মতো ফ্রকের ভিতর মুখ গুঁজে বসে থাকল, চোখে 'উইচ-ককে ওজালিও' এই ছবি ভাসছিল।

ভারোদী খুব আদরের গলায় বলল, কিছু বলবে মারিয়া?

মারিয়া মায়ের দিকে তাকাল। তারপর বলল, খুব বৃষ্টি মা।

ভারোদী আফসোসের গলায় বলল, হুঁ, খুব বৃষ্টি।

আবলুস কাঠের খাটের উপর ভারোদীর সুন্দর এবং পুষ্ট শরীর বিছানার সঙ্গে মিশেছিল।

নরম ইটালিয়ান সিল্কের চাদর, মখমলের মতো সর্বত্র জরির কাজ, পাতলা আলখাল্লার মতো

গাউনে শরীর ঢাকা। শুধু বুকের ভিতর 'ব' এর মতো ফাঁক। সুপুষ্ট যৌবনকে ধরে রাখার সব কৌশল যেন ভারোদীর আয়ত্তে। পাশে বড় আলমারি, কিছু বই এবং পায়ের নিচে বড় জর্জিয়ান রুপোর ফ্রেমের আয়না। আয়নায় এই ঘরের প্রায় সব প্রতিফলিত। ভারোদী পায়ের নিচের আয়নায় প্রথম নিজেকে দেখল, জানালার কাঁচে জল পড়ার শব্দ শুনল, তারপর মেয়েকে দেখতে দেখতে বলল, সত্যি খুব বৃষ্টি হচ্ছে।

মারিয়া জানালার কাছে উঠে গেল একবার, কিছুক্ষণ মায়ের পাশে বসে হাই তুলল। এভাবে বসে থাকতে ভাল লাগছে না। সে পেরাম্বুলেটরের উপর গোল্ডকোস্টের এক বিচিত্রবর্ণের পাখির সঙ্গে কিছুক্ষণ খেলা করল, তারপর সহসা বলার মতো বলে ফেলল, মা আজ ওজালিও আসবে না? মিঃ হেনরী আসবে না?

—ওরা তো আসবে বলে গেছে।

—কিন্তু এই বৃষ্টিতে!

ভারোদী বলল, তুমি ববং যাও। গাড়ি বের করতে বলে দিচ্ছি'

মাবিয়া বলল. মা আমি গাড়ি চালিয়ে নেব।

—সাবধানে চালাবে।

বিছানার ওপাশ থেকে ফোন তুলে কেরানী ঘরে ভারোদী নির্দেশ পাঠাল গাড়ি বের করা হোক. কোন্ কোন্ গাড়ি বেব করা হবে তাও বলে দিল ভারোদী। সে ফোনে জানাল—মারিয়া এখন বের হবে। কোন্ পরিচারক সঙ্গে যাবে—তারও একটা নির্দেশ থাকল। এখন আর কোনও কাজ নেই ভারোদীর। সম্পত্তি-বিষয়ক সব কাজ ভারোদী নটা থেকে একটার ভিতর সেরে ফেলেছে। প্রতিদিন এই সময়টুকু নিচের অফিস ঘরে সে বসে—ওর তখন নানাবিধ কাজ, তেলের খনি থেকে লোক আসে, ডাকের সব অফিসিয়াল চিঠি, কোর্টের নানারকমেব সম্পত্তি-সংক্রান্ত মামলা এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা খামাবের বিস্তর সমস্যা নিয়ে তখন আলোচনা হয়—বৃদ্ধ ম্যানেজার আছেন সম্পত্তি-সংক্রান্ত ব্যাপাবে—মোটামুটি সব কাজেব ভার তাঁরই উপরে। সুতরাং অপরাহ্ণে কোন কাজ থাকে না, অন্যদিন ক্রাইম্ নভেল পড়ার ইচ্ছা এ-সময় সাধারণত হয়ে থাকে অথবা সব যৌন মামলার বিবরণ—স্বামীর মৃত্যুর পর এ স্বভাবটা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। ভারোদী খুব অসহিষ্ণু, যৌন ব্যাপারে খুব রক্ষণশীল, মদ অল্প মাত্রায় স্পর্শ কবেন, আর মাঝে মাঝে হৈ-চৈ প্রিয় মনে হয় অথবা যেন সংসারে একজন বুড়ো মানুষ আছেন—যিনি পুত্রের আকস্মিক মৃত্যুর জন্য সারারাত কাঁদেন। ভারোদীর এই দুঃখজনক পরিস্থিতি ভাল লাগছে না—ওর নাৎসী যুবকরা প্রতি সপ্তাহে রোববার সকালে গীর্জার প্রার্থনা শেষে সমবেত হয—ওরা ওব হাতের মশালের মতো এবং পার্টির কাজকর্ম কমে যাচ্ছে বলে ভারোদীর দুঃখ। আলবামাতে উঁচু পর্যায়েব বৈঠক বসবার কথা ছিল। দিন সম্পর্কে মতবিরোধ চলছে। কেউ বলছিল ইস্টারের ছুটির আগেই সমস্ত কর্মসূচী ঠিক করে ফেলা উচিত। কারণ অনেক নিগ্রো পল্লীতে শোনা যাচ্ছে এক যুবক অহিংস মতবাদেব ঝোলা নিয়ে নাগরিক অধিকারের আন্দোলন গড়ে তোলবার জনা ভিতরে ভিতরে সচেষ্ট হচ্ছে। ভাবোদীর মুখ কুঁচকে উঠছে। মনে মনে আজগুবি সব ভাবনার জন্য সে নিজেকেই ধিক্কার দিচ্ছিল। ওর মনে হচ্ছিল কোটি কোটি কালো লোক এশিয়া আফ্রিকা থেকে দামামা বাজিয়ে অগ্রসর হচ্ছে ক্রমশ। হাইওয়ে ধরে কালো মানুষের মিছিল যাচ্ছে। সাদা মানুষেরা, মেয়েরা, রমণীরা সেই কালো মানুষের হাত ধরে ভালবাসার কথা বলছে। ঘৃণায় ভারোদীর মুখ কুৎসিত হয়ে গেল। সবই দুর্ঘটনার সামিল। ভারোদী বিছানা থেকে উঠে পাফে দামী পাউডার গালে মেখে মুখের ভয়ঙ্কর রেখাগুলো মুছে দিতে চাইল। বারবার মনে হচ্ছে মানচিত্রের মতো বিচিত্র দাগ সৃষ্টি হচ্ছে. ভয়ঙ্কব বেখাগুলোকে সে কিছুতেই মুছে দিতে পারছে না। রেখাগুলো ক্রমশ প্রকট হচ্ছে। উদার আকাশ আর উইলো ঝোপের ওয়ারবলার পাখিরা এখন বৃষ্টিতে ভিজছে—ভারোদী নিজের জানালা খুলে দিল, বৃষ্টিব ছাঁট আসছে—দেওয়ালে মৃত স্বামীর ছবি, দেওয়ালের রঙ মেজেন্টা—ঝড় জলে সবই এক হয়ে যাবার মতো, তবু মুখের প্রকট ছবি আয়নার কাঁচ থেকে মুছে যাচ্ছে না। ভারোদী দু-হাতে মুখ চেপে বিছানার উপর বসে পড়ল।

মারিয়া তখন হালকা পাখির মতো উড়ছিল। বৃষ্টি ক্রমশ ধরে আসছে। পাঁচিলের ওপাশে দীর্ঘ সব উইলো পপলারের শাখা এবং ফাঁকে ফাঁকে আকাশ পরিচ্ছন্ন মনে হচ্ছে। বাড়ির সামনে কিছু জল জমে আছে—ঝড়ের জন্য কীট-পতঙ্গ, সব মৃত ডাল ইতস্তত ছড়ানো। জলের সঙ্গে শুকনো পাতা, ঘাস এবং পাখির পালক ভেসে যাচ্ছিল। মারিয়ার বেগুনি রঙের ফ্রক গায়ে ছিল, নিচে পাতলা রেশমের মতো হালকা জামা এবং হালকা বাদামী রঙের জরির কাজ-করা ফিতা ঝুলিয়ে, সাদা মোজা পরে সোনালি চুলে প্রজাপতি ক্লিপ, হাতে সরু সোনার ফিতাতে মুক্তোর মতো ঘড়ির কাঁটা টিক টিক করে বাজছে...মারিয়া দুবার সেই মনোরম হালকা পোশাকের ভিতর করিডরে ছুটে বেড়াল। তারপর জানালার শার্সি খুলে দেখল, বাগানের ফুলগাছ থেকে অসময়ের সব ফুল ঝরে গেছে। বৃষ্টির জল ঝরছে। সদর দরজা দিয়ে পাঁচিল অতিক্রম করে, সামনের পথ দেখা যাচ্ছে। সহরের সব ছোট ছোট বালকেরা জলের ভিতর পথে পথে হৈ-চৈ করছিল। মারিয়ার জলে নেমে খালি পায়ে হৈ-চৈ করতে ইচ্ছা হচ্ছিল অথবা দূরবর্তী আস্তাবলের প্রাচীন বৃক্ষের নিচে ওজালিওর হাত ধরে চলে যাওয়া এবং কোথাও কোন বিস্তৃত মাঠের সবুজ ঘাসেব ভিতর চুপচাপ বসে থাকা মনোরম, কারণ যাদুকরের পালিত পুত্রের বন উপবনের চাঁপাফুল গাছটির মতো এই বসে থাকা কেন যে শুধু অপেক্ষার কথা বলে।

গাড়িতে বসে মারিয়ার মনে হল রাস্তা ফাঁকা। তেমনি ইতস্তত জল জমে আছে। যারা পাবে অথবা রেস্তোরাঁয় অপেক্ষা করছিল তারা এখন জুতো ভিজিয়ে জলের ভিতর হাঁটছে। গাড়িব জল পথের দু-পাশে ছড়িয়ে যাচ্ছে। মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ি এসে লোকজন নামিয়ে দিয়ে গেল। ওদেব পায়ে গাম বুট, হাতে গাঁইতি। ওরা সব ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে নিমেষে শহরকে শুকনো আতসবাজীর মতো করে ফের চলে যাচ্ছে। শহরে ফের রোদ। আকাশ বড় ঝকঝকে। পার্কে ছোট ছোট শিশুরা, বৃদ্ধ-সকল এবং যুবক-যুবতীরা ফেব উদ্দেশ্যবিহীন ভ্রমণে বের হয়েছে। ভোর থেকে যে অসহায় অবস্থা ছিল শহরে, আবহাওয়ার জন্য সব কিছু পীড়াদায়ক—শহরবাসীরা প্রথম বর্ষণকে দুঃখজনক ভেবে দরজা জানালা বন্ধ করে যখন মুখ গোমড়া করতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই বৃষ্টির জল, পথ ঘাট ধুয়ে মুছে শহরকে তাজা করে চলে গেল আর রোদের জন্য মনে হচ্ছিল শহরটা ফুরফুরে হাওয়ায় ঠিক মরিয়াব মতো উড়তে চাইছে এখন।

মারিয়া ধীরে ধীরে গাড়ি চালিয়ে উইচ্-ককে নেমে গেল। সে ক্রেনগুলির নিচ দিয়ে ছোট্ট পুতুলের মতো হাঁটতে থাকল। মাস্তুলে পাখিরা বসে আছে। শেষ ট্রাক গন্ধক নামিয়ে চলে যাচ্ছে। নিগ্রো কুলিরা মোটর সাইকেলে এক এক করে চলে যাচ্ছিল। এখন ছুটির সময়। এখন ক্রেন-ড্রাইভার সিঁড়ি ধরে নিচে নামছে। মাল তোলা এবং নামানোর কোলাহল ধীরে ধীরে নিঃশেষ এবং গন্ধকের গুঁড়ো আর উড়ছে না। সুতরাং জাহাজের উপর কুয়াশাব মতো ভাবটা নেই। ফল্কার কাঠ ফেলে ত্রিপলে ঢেকে খিল এঁটে দেওয়া হচ্ছে। ডেক-জাহাজীরা পিছিলে জড়ো হচ্ছিল। ইনজিন জাহাজীরা এক এক করে ইনজিন রুম থেকে উঠে আসছে। তখন মারিয়া পোর্টহোলে উঁকি দিল। নীরস এই জাহাজ-ডেকে জাহাজীরা যখন ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছিল, যখন জাহাজীদের ক্লিষ্ট মুখ খুবই করুণ দেখাচ্ছে এবং সর্বত্র নিদারুণ অসহিষ্ণু এক ভাব, তখন মারিয়ার সুন্দর গড়ন, বালিকাসুলভ অবয়বে সকলের ভিতর প্রাণের সঞ্চার করছে। সব জাহাজীদের মারিয়ার উপস্থিতি যেন মহিমময় করছে।

সুমন, কয়লা লেভেল করে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে চিমনির গুঁড়িতে বসে পড়ল। শরীরে খুব ধকল গেছে। বাংকে কয়লার গুঁড়ো উড়ছিল। সুতরাং মুখ নিগ্রো পুরুষের মতো কালো দেখাচ্ছে। চোখ কয়লার গুঁড়োর জন্য ভয়ঙ্কর লাল। নীল পোশাক এখন আর চেনা যাচ্ছে না। সব কালো রঙ—হাত, মুখ এবং পায়ের সাদা রঙটুকু পর্যন্ত কয়লার মতো কালো। ওকে চেনা যাচ্ছিল না। যারা বাংকারে কাজ করেছে তাঁদের সকলেরই এক অবস্থা। ওরা সার বেঁধে বোট-ডেকে উঠে দেখল সুমন চুপচাপ বসে হাঁপাচ্ছে। সকলে চলে যাবার পর পিছনে পিছনে সেও নেমে গেল। বোট-ডেক পার হয়ে টুইন-ডেকে নামার সময় সে মারিয়ার গলা পেল। মারিয়া ওকে ডাকছে। সে ভয়ে ভয়ে মুখ ফেরাল না,

ধরা পড়ে যেতে পারে অথবা কৃষ্ণকায় এই মানুষগুলো এখন মারিয়ার কাছে যথার্থই ভয়ের কারণ। সে দাঁড়াতে চাইল না। সে তাড়াতাড়ি হেঁটে যাবার মতো পা বাড়াতেই মনে হল ফের মারিয়া বলছে, ওজালিও দ্য সুম্যান কোন্ দিকটায় থাকে?

সুমন তাড়াতাড়ি হেনরীর কেবিনের দিকে হাত তুলে সরে পড়ল। মারিয়া খুব বিব্রত বোধ করছে। হেনরীর কেবিন বন্ধ। সে এলওয়ে পথে কাউকে দেখল না। ওর ভয় করছে—সব কালো মুখ—ঠিক নিগ্রো যুবকদের মতো এবং এক নৃশংস চেহারা সব সময় মারিয়াকে যেন ভীত সন্ত্রস্ত করতে থাকল। সে তাড়াতাড়ি মেজ মালোমের কেবিনের দিকে যাবার সময় যেন দেখল ইনজিন-রুমের দরজায় কে নুয়ে আছে। ভাল করে দরজায় উঁকি দিতে যেন মনে হল হেনরী কাজ থেকে উঠে আসছে।

ফোকশালে ঢুকে সুমন লকারের নিচ থেকে মগ টেনে বের করল। খুব আলগা করে তোয়ালেটা কাঁধে নিল এবং সাবান তেল নিয়ে উপরে বাথরুমে ঢুকে গেল। খুব তাড়াতাড়ি সে হাতের কাজগুলো সেরে নিচ্ছিল। কাজের জামা-কাপড়গুলো কোনরকমে কেচে ভাল করে স্নান করল। সে নিচে নেমে অন্য নোংবা পোশাকগুলো লাথি মেরে বাংকের নিচে ঢুকিয়ে দিল। সুমন দ্রুত কাজ সেরে উপরে উঠে ভাণ্ডারীকে বলল, জ্যাঠা সুচারু সামদকে বলবে, খেয়ে নিতে। ওরা যেন আমার জন্য বসে না থাকে। ফিরতে দেরী হবে।

তখন সূর্য ক্রমশ বার্চ অথবা ম্যাপলগাছের নিচে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল। তখন ম্যাপল অথবা ওক গাছের অন্য প্রান্তে সূর্য ডুবে যাচ্ছে বলে গাছের কাণ্ডগুলো দূর থেকে হাতির দাঁতের মতো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। গাছের ফাঁকে মেটাল রোড ধরে আপেল বোঝাই ট্রাক গাড়ি যাচ্ছে। এবং সর্বত্র লাল রঙিন ছবি--কিছু হেবনপাখি উড়ে যাচ্ছে, ওদের ডানা গলা গৃধিনীর মতো। ডেক ধরে যাবার সময় সে সব দেখল। সে নিজের জামা প্যান্ট এবং জুতোর চাকচিক্য ফের ভাল করে দেখে নিল। সামনের এলওয়ে পথে ঢুকে গেলেই বাঁ-দিকে দরজা, দরজা ঠেলে দিলে নিশ্চয়ই মারিয়া...এখন হয়ত মারিয়া হেনরীর সঙ্গে গল্প করছে।

কিন্তু সুমন কেবিনে ঢুকে দেখল, মারিয়া চুপচাপ বসে আছে। হেনরীকে কেবিনের কোথাও দেখা যাচ্ছে না। মারিয়া উঠে আসছে। মারিয়া ওর হাত ধরে অভ্যর্থনা করল এবং ওরা পাশাপাশি বসে পড়ল। হেনরী কেবিনে নেই সুতরাং সে প্রশ্ন করল, হেনরীকে দেখছি না?

—ও আসছে।

কোথায় গেল আবার।

—গেছে পাশের কেবিনে।

পাশের কেবিনে তিন নম্বর মিস্ত্রির। সুতরাং সুমন বলল, থার্ড অথবা সেকেন্ডের সঙ্গে আলাপ হয়েছে।

—না।

—করলে পারতে। খুব জলি। খুব চিৎকার করে গান গায়।

--তাই বুঝি।

—তুমি আলাপ করবে? ডাকব?

--থাক।

সুমন কোন কথা খুঁজে পাচ্ছে না। ওকে খুব বিব্রত দেখাচ্ছিল। একা একজন মেয়ের পাশে বসে থাকার সাহসই যেন তার নেই।

মারিয়া পোর্টহোল দিয়ে নিজের শহরটা দেখছে। সে মাঝে মাঝে উৎফুল্ল হচ্ছে শহরের ট্রাক বাস দেখে।

সুমন বলল, আমি বরং হেনরীকে খুঁজে দেখি।

—কেন? সে তো বলে গেল আসছে।

সুমন ফের বসে বলল, আমাদের থার্ড এবং সেকেন্ড খুব ভাল লোক।

—হেনরী?

—খুব ভাল।

—তুমি? মারিয়া এবার হেসে ফেলল এবং পায়চারী করতে থাকল।

—আমি ভাল নই। এই কথার ভিতর সুমনকে খুব বিষণ্ণ দেখাল। সে অন্যদিকে মুখ করে দেওয়ালের দিকে তাকাল। দেওয়ালে হেনরীর স্ত্রী অথবা মা'র ছবি ঝুলছে না।—সেখানে আজ দুটো কাঠের ক্রস ঝুলছে—ঠিক ছাদের নিচে এবং ক্রসটার সামনে ক্যানারি পাখি, মারিয়া ক্যানাবি পাখির খাঁচাতে মুখ রেখে বলল, আমি তোমাকে একটা কথা বলব ওজালিও?

—আমাকে বলবে? কি কথা!

মারিয়া খাঁচা থেকে মুখ না তুলেই বলল, আমি তোমাকে যাদুকরের পুত্র বলে ডাকব।

সুমন অবাক হয়ে বলল, যাঃ! আমি যাদুকরের পুত্র হতে যাব কেন?

মারিয়া লজ্জায় এবং অপমানে যেন খাঁচা থেকে কিছুতেই মুখ তুলতে পারছে না। সে কেমন মন্ত্রপড়ার মতো বলে গেল, তোমার চোখ এত কালো, চুল এত কালো! ঠিক যাদুকরের পালিত পুত্রের মতো মুখ তোমার। যাদুকরের পালিত পুত্রের নাম এমিল। আমি তোমাকে এমিল বলে ডাকব।

—কেন ওজালিও নামটা তো বেশ।

—আমার এমিল নামটা ভাল লাগে। আমি তোমাকে মিস্টার এমিল বলব!

—আমার কাছে এমিলও যা, ওজালিও তাই। কিছু আসে যায় না মারিয়া। তুমি যে কোন নামে ডাকতে পার।

মারিয়া এবার খাঁচাটা ঘুরিয়ে দিল এবং ঘুরিয়া দিতেই ক্যানারিগুলো উড়তে থাকল ভিতরে আর গান গাইতে থাকল। মারিয়াকে এখন আর লজ্জিত অথবা অপমানিত দেখাচ্ছে না। সে সুমনেব পাশে বসে বলল, ভোরে কি বিশ্রী আবহাওয়া গেছে।

—ভয়ঙ্কর।

—সমুদ্রে বৃষ্টি হলে তোমাদের খারাপ লাগে?

—খুব। খুব খারাপ লাগে। তখন আমাদেব কেবল বমি পায। বলে মুখে চোখে বমিব ভঙ্গি ফুটিয়ে তুলল সুমন।

—আচ্ছা মিস্টার এমিল, বলে মারিয়া চোখে মুখে বয়স্ক যুবতীর ছাপ আঁকতে চাইল, আচ্ছা আমি বলছিলাম তোমরা সমুদ্রে যখন থাক, আচ্ছা মিস্টাব এমিল এই সমুদ্রে তোমরা বড় বড় তিমিমাছ দেখ, তাই না?

—অনেক বড় বড় তিমিমাছ।

—অনেক বড়? কত বড় হবে! জাহাজটার মতো বড় হবে?

—না এত বড় হবে না। তবে শুনেছি জাহাজটার মতো বড় একটা তিমি সেই দ্বীপটার ভিতব থাকত।

—কোন্ দ্বীপটাব কথা বলছ?

—সেই যে বলেছিলাম—একটা বুড়ো তিমিকে তাড়িয়ে দিয়েছিল...

—সেই ছেলেটার কি নাম যেন!

—নামটা আমি ভুলে গেছি। এই এমিল টেমিল কিছু হবে।

—আবার তুমি আমাকে খুব ছোট মনে করছ মিস্টার এমিল।

—ছোট! কোথায় ছোট ভাবলাম। হেল্যো মিস মারিয়া, আপনি সেই ছোট এমিলকে ঠিক চেনেন না। সে ভাল মানুষ নয়।

—ঠাট্টা করবে না মিস্টার এমিল। তা হলে কথা বলব না। আচ্ছা মিঃ এমিল, ছেলেটা তিমি মাছটার কাছে গেল কেন?

—বলেছিলাম না, ওর বাপ সমুদ্রে মাছ ধরতে চলে যেত। ওর একা একা ভাল লাগত না। তাই সে পাথরটা সবিয়ে হামাগুড়ি দিত। ঝিলের পাড়ে ঢুকে যেত।

ভিতরে ভিতরে মারিয়া ভয়ঙ্কর কিছু ভাবছে যেন। সে চিবুকে হাত রেখে বলল, অন্য কেউ দেখতে পেত না ঝিলটা?

—দেখবে কি করে! চারধারে খাড়া পাহাড়। পাহাড় বেয়ে ওঠে কার সাধ্য।

—ছোট ছেলেটা..!

—সে কেবল জানত, ছোট একটা পাথর আছে, ওটা সরালেই ঢুকে যাবার পথ। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে যেতে হয়।

—ওর মা ছিল না?

—না।

—আহা! বেচারার খুব কষ্ট।

—খু..উ...উব। মাছটা ওর দুঃখ বুঝত। মাছটা ওকে লেজ নেড়ে নেড়ে আদর করতে চাইত। নানা রকমের খেলা দেখাত। কখনও ডুবে, কখনও সাঁতার কেটে, কখনও মাথার ভিতর দিয়ে জল বের করে দিত। পাহাড়টা খাড়া হয়ে ক্রমশ সরু হয়ে গেছে। জল বের করে দেবার সময় মনে হত পাহাড়টা কাঁপছে। আর ভীষণ আওয়াজ—জাহাজের বাঁশির মতো। ছেলেটা হাততালি দিত।

—ছেলেটার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?

—না।

—তবে কি করে জানলে? আচ্ছা মিঃ এমিল, ছেলেটা ওর বাবাকে বলত না?

—না! বলত না।

—আচ্ছা মিস্টার এমিল, ও কেন বলত না?

সুমন খুব অসহায় বোধ করল নিজেকে এবার। সেই ছেলেটির কি যেন নাম—নেরুদ্বীপের ঘটনা—ওরা সেখানে ফসফেট আনতে যেত নিউজিল্যান্ড বন্দরগুলোর জন্য। সে খুব হালকাভাবে বলল, ছোট এমিল..।

—না ওকে তুমি এমিল বলবে না

—ছোট এমিল.।

—এমিল বললে আমি রাগ করব মিস্টার এমিল।

—ছোট ওজালিও একদিন দেখল তার মা, বাবার বন্ধুর সঙ্গে পাহাড় থেকে নেমে আসছে। সুমন ওকে ছোট ওজালিও নাম দিল।

ওর বাবা!

- ওর বাবা সমুদ্রে মাছ ধরতে বের হয়ে গেছে।

—ছোট ওজালিও ডাকল, মা। মা তুমি কোথায় গিয়েছিলে? সুমন ফের বলল।

—মা কি বললেন?

- বললেন, বলো না কিন্তু বাবাকে। বললে কিন্তু আমাকে আর পাবে না। মাকে সে গোপনে দেখে ফেলেছিল: বাবা এলে সে বলে দিলে ঘটনাটা। সেদিনই ওর মা হারিয়ে গেল।

মারিয়া একটা ঢোক গিলল।

সুমন বলল, সে ভেবেছিল এই গোপনে দেখা বন্ধুটির কথা বাবাকে কিংবা অন্য কাউকে বলবে না। বললে হয়ত মা'র মতো তার একমাত্র বন্ধুটিও ডুব দেবে। হারিয়ে যাবে।

মারিয়া বড় বড় চোখে সুমনকে দেখল। ফের একটা ঢোক গিলল। সে এবার খুব কাছে এসে বসল সুমনের, তারপর বলল, ওকে আমরা ছোট এমিল বলেই ডাকব। যত সময় যাচ্ছিল, যত ওরা পরস্পর পরিচিত হচ্ছিল উভয়ে, তত নাবিক সুমনকে মারিয়া ভালমানুষ করে তুলছে। নাবিকের চরিত্রে শুধু ভোজের নেমতন্ন অথবা মাটি পেলেই মদ এবং মেয়ে মানুষের ছবি—সুমন এখন যেন মারিয়াকে চুরি করে দেখছিল—ফুলের মতো মেয়ে আর সুমন মারিয়াকে এই মুহূর্তে প্রীতি এবং ভালবাসা দিতে চাইল। সে সহসা বলে ফেলল, মারিয়া তোমাকে আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। অত্যন্ত আড়ষ্ট এবং সংকুচিত গলায় কথাটা বলল সুমন।

মারিয়ার ভিতর ধীরে ধীরে ভালবাসার জন্ম হচ্ছিল বোধ হয়। সে ফ্রক টেনে দিল তারপর সোজা হয়ে বসে বলল, খুব বৃষ্টি হয়েছে। ট্রাউটমাছ ধরতে গেলে হয়।

—এই বিকেলে!

—হ্যাঁ!—খারাপ কি হবে। আমাদের গুডুইর সব জানা আছে। গাড়ি করে আমরা আমাদের গ্রীষ্মাবাসের দিকে চলে যাব। মারিয়া ছোট এক খাড়ি-নদীর কথা বলল, ওদের সম্পত্তির ভিতর দিয়ে এই নদী বয়ে যাচ্ছে। বর্ষা হয়ে গেছে, সুতরাং নদী ধরে তীরের ঘোলা জল নামছে আর ছোট মাছ খাবার লোভে সমুদ্র থেকে ট্রাউটমাছ নিশ্চয়ই নদীর ভিতর উঠে আসছে। মারিয়া বড়শি ফেলে মাছ ধরার কৌশলের কথা জানাল।

কিছু স্মৃতির কথা স্মরণ করে বলল সুমন, মাছ ধরার নেশা আমার ভীষণ। অবিবেচকের মতো দেশের গল্প জুড়ে দিল। স্পেন দেশটা যেন বাংলাদেশের মতো। এবং মেঘনা পদ্মার জলে যখন বর্ষার দিনে মাঠ ভেসে যায়, যখন সারাদিন ধরে বৃষ্টি হয় এবং জমিতে ধান গাছ থাকে, পাট গাছ থাকে--বর্ষার জলে সব সরপুঁটি এবং রাক্ষুসে সব বোযাল মাছ ডিম পাড়ার জন্য অল্প জলে উঠে আসে---মাঠময় তখন মানুষেব মাছ শিকার উৎসব। ট্রাউট মাছ প্রসঙ্গে সে মারিয়াকে এ-সব কথা বলল।

সুমন ফের একটু হেসে বলল, তোমাদের রাক্ষুসে ট্রাউট মাছ আমাদের রাক্ষুসে বোয়াল মাছ একরকমের পেটুক, সাপ ব্যাঙ যা পাবে তাই খাবে।

মারিয়াকে খুব চঞ্চল মনে হচ্ছে এ-সময। সে উঠে দাঁড়াল একবার, পরে সুমনের ডানপাশে বসে বলল, তাই বুঝি।

—বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে খুব বৃষ্টি হলে জোয়ারের জল মাঠে উঠে আসবে। সব ধানের জমি পাটের জমি। মাছগুলো ডিম পাড়ার জন্য ধান গাছের ভিতর চিৎ হয়ে পড়ে থাকবে। পুরুষ বোয়ালগুলো পেট থেকে কামড়ে কামড়ে ডিম বের করবে!

—ও মাঃ, তাই বুঝি!

—তখন আটটা দশটা বোয়াল এক সঙ্গে হুটোপুটি করতে থাকে!

মারিয়া বিস্ময়ে কথা বলতে পারছে না।

—আমরা খুব আস্তে আস্তে বৃষ্টিতে ধানক্ষেতের ভিতর খুব সন্তর্পণে হাঁটি। হাতে মাছ ধরার জন্য পলো। দূর থেকে ধানগাছগুলো খুব নড়তে দেখলে কথা নেই। একবার...বুঝলে এই বড় এক সাপ পলোর তলায়। পানস-সাপ। ভীষণ, ফণা তুলে ছোবল দিতে আসছিল।

—আচ্ছা মিস্টার এমিল, সাপটা তোমাকে কামড়াল না?

- পলোর ভিতর থেকে বের হতে পারছে না, কামড়াবে কি করে!

--ওঃ। পলোটা কি মিস্টার এমিল?

—বাঁশের তৈরি।

—বাঁশ!

—ভীষণ লম্বা একরকমের ঘাস। পঁচিশ ত্রিশ হাত লম্বা হবে। সুমন দাঁড়িয়ে পড়ল এবং হাতের ইশারায় সবটা বোঝাবার চেষ্টা করল।

হেনরী কেবিনে ঢুকে দেখল সুমন দাঁড়িয়ে কি সব ব্যাখ্যা করছে। মারিয়া ঠিক জাপানী পুতুলের মতো বসে ছিল। চিবুকে হাত রেখে, খুব বয়স্ক—মুখের এমন এক ভঙ্গি রেখে অন্যমনস্ক। হেনরীর প্রবেশ এবং বিকেল মরে যাচ্ছে এইসব ঘটনা লক্ষ্য করছিল না।

হেনরী মারিয়াকে হাত নেড়ে বলল, খুব-যে অন্যমনস্ক।

মারিয়া উঠে দাঁড়াল। হাতের রুমাল দিয়ে আলতোভাবে মুখ মুছে বলল, এতক্ষণে এলে?

—কেন, বেশ তো জমে গিয়েছিলে।—তিমি মাছটার গল্প তোমাকে বলেছে! বলেছে খুব মিষ্টি মেয়ে, খুব হাসে, খুব কথা কয়, খুব লাফায়, খুব কোমল।

—হেনরী আমি কিন্তু এবার চিৎকার করব। তুমি আমাকে ঠাট্টা করবে না। আমি এখন খুকি নই।

—বলেছে, মারিয়াকে সমুদ্রে নিয়ে যাবে, সুন্দর এক দ্বীপে যেখানে দারুচিনি গাছ আছে, পলাশগাছ আছে আর শুধু চারিদিকে সমুদ্র। বছরে দুটো একটা জাহাজের মাস্তুল চোখে পড়লে পড়তে পারে তেমন দ্বীপে ওজালিও...

সুমন বলল, কি ঠাট্টা করছ সব।

হেনরী খুব হেসে উঠল এবার। কারণ সে দেখল উভয়েই কেমন আহত হয়েছে অথবা এ-সব কথা নাবিকের পক্ষে শোনা ভাল নয়—শুধু দুঃখকর স্মৃতির কাজ করে ওরা। সুমন খুব হালকা গলায় বলল, এবার ওঠা যাক। তারপর কথাপ্রসঙ্গে বলল মারিয়া, ট্রাউট মাছ শিকারে যাব ভাবছি।

—তোমরা যাও। আমার যেতে সখ নেই। আমি বরং ভারোদীর সঙ্গে কোনও 'বলে' যাব।

মারিয়া এবার উঠে দাঁড়াল। সে, ওজালিও এবং হেনরী জেটিতে নেমে গেল। ওরা কখনও মাছ, সমুদ্র এবং দ্বীপের গল্প করছিল। হেনরী জেটি অতিক্রম করে একটা প্রাচীন হেমলক গাছের নিচে দাঁড়িয়ে চুরুট ধরাল, তারপর সেই দুর্গের মতো বাড়িতে ঢুকে দেখল পরিবারের বৃদ্ধ পার্লারে বসে ঢক ঢক করে মদ গিলছেন।

ওরা বৃদ্ধের ছোট পার্লার অতিক্রম করে সামনের বড় বৈঠকখানায় ঢুকল। মারিয়া দৌড়ে ভিতরে চলে গেল মাকে খবর দিতে। সুমন পায়চারি করে বড় বড় সব ছবির নিচে সন, তারিখ পড়ছিল। ভারোদী সেজেগুজে আসছে। ভারোদীর জন্য হেনরী অপেক্ষা করছে। ঘড়িতে টিক্ টিক্ করে সময় বাজছে। সুমন কোন উৎসাহ প্রকাশ করছে না। কারণ এখনও কোমর ধরে পা ফেলা দেখলে সে কৌতুক বোধ করে। ওর হাসি পায়। গোটা ব্যাপারটাই কেমন কৃত্রিম মনে হয়। বরং মারিয়ার সঙ্গে ট্রাউটমাছ শিকারে গেলে দারুণ জমত; সুতরাং সুমন দরজার সামনে এসে গোপনে উঁকি দিতেই দেখল মারিয়া ফের আলোর ভিতর থেকে নেমে আসছে। কাছে এলে মারিয়াকে বলল, মাছ শিকারের কি হল?

হাতে ইসারা করে কি দেখাল মারিয়া। সুমন দেখল ভিতরের সিঁড়ি ধরে ভারোদী নেমে আসছে। ওর হাতে দামী ব্যাগ এবং খুব নরম পাতলা গাউন পরেছে। পায়ের সবটাই হালকা মোজায় ঢাকা। এবং এত বেশি রঙ মেখেছে আর এত বেশি তীক্ষ্ণ মনে হচ্ছে যে সুমন কিছুতেই ভারোদীর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারল না।

বেরোবার সময় ভারোদী সুমনকে দেখে প্রশ্ন করল, কি ওজালিও যাবে নাকি?

—আমার ভালো লাগে না। বরং আপনারা যান। সুমন মনমরা মানুষের মতো কথাটা বলে হেনরীর দিকে তাকাল। তারপর কাছে গিয়ে বলল, হেনরী আমি বরং জাহাজে চলি। আস্তে আস্তে বলল, একা একা শহরে ঘুরতে ভয় লাগে।

—কেন মারিয়া তো থাকছে।

সুমন বলল, মারিয়া নাচবে না।

—বয়স হলে নাচবে। ভারোদী এগোতে থাকল।

হেনরী চোখ টিপল পিছন থেকে। এবং ভারোদী যখন গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে ঠিক তখন হেনরী ওর পিছনে চিমটি কেটে দিল। বলল হতভাগা! অত্যন্ত ফিস ফিস গলায় বলল, তুমি ওজালিও ভুলে যাবে না তোমার দেশটা এখন ভারতবর্ষ নয়, সেটা স্পেন।

তাছাড়া হাতে সময় কম বলে এবং এত কম সময় নিয়ে ট্রাউট মাছ শিকারে যাওয়া যায় না। বরং রোববার দেখে—এখনও গ্রীষ্মের গরম, এখন রোজই বৃষ্টি হবে এবং রোববারে ওদের সেই ক্যান্ট্রি ভিলাতে লাল রঙের বাড়িতে চলে যাবে তারা, আর মিস্টার উড্ আছেন সেখানে, মিসেস উড্ আছেন—খুব ভাল মানুষ, স্থানীয় সম্পত্তির তদারকে আছেন। ছোট নদী, মিসিসিপির জল নেমে যাচ্ছে ছোট ছোট খাড়ি নদী ধরে; একটু সামনে গেলেই সমুদ্র। এখন গ্রীষ্মের দিন বলে সমুদ্রে ঝড় লেগেই থাকে, বৃষ্টি লেগেই থাকে। মারিয়া সুমনকে নিজের ঘরের দিকে টেনে নিয়ে যাবার সময় কথাগুলো বলল।

সুমন গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে দেখতে পেল। গাড়িটা সদর দরজায় যেতেই গাড়ির দরজা খুলে গেল। মারিয়া আগে আগে যাচ্ছে। পিছনে সুমন এবং ওরা একে একে ভিতরে ঢুকে গেল। সে জানলার

ধারে বসলে দেখতে পেল গাড়িটাকে কেউ অনুসরণ করছে। লোকটাকে দেখে তার কেমন অস্বস্তি হচ্ছে। সে বলল, আমি জাহাজে ফিরে যাব মারিয়া।

মারিয়া দেখল জানলার ওপাশটাতে গুডুই—যে মাছের অলিগলি সব চেনে। গুডুই জানালা থেকে ফ্যাল ফ্যাল করে সুমনকে দেখছে। মারিয়া হেসে উঠল।—আমাদের গুডুই। খুব ভাল লোক, বিনয়ী। আচ্ছা মিস্টার এমিল, তোমার এত বড় বাড়ি ভাল লাগে?

—খুব ভাল লাগে।

—ছাই। আমার লাগে না। একা একা—এই গুডুই আছে বলে আমার খারাপ লাগে না। গুডুই না থাকলে কি যে খারাপ লাগে।

—গুডুইকে তো কাল দেখিনি।

—দেখবে কি করে—এতদিন সে আমাদের কান্ট্রি ভিলাতে ছিল। ও কাল রাতে এসেছে। হোস্টেলে যখন থাকি গুডুই আমাকে কতরকমের চিঠি দেবে। আচ্ছা মিঃ এমিল, তুমি যখন সমুদ্রে থাকবে, আমাকে চিঠি দেবে না?

—একশ' বার দেব। রোজ একটা করে দেব।

—দেবে না ছাই।

গাড়িতে কিছুক্ষণ শহরের এদিক ওদিক ঘুরাঘুরি করে ফিরে এলে সুমন দেখল, গুডুই দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝতে অসুবিধা হল না এই রেড ইন্ডিয়ান প্রৌঢ়টি বিশ্বস্ত ভৃত্য মারিয়ার। সুতরাং ওর ভয় আংশিক কমে গেল। মারিয়া গুডুইকে বলল, ওর নাম ওজালিও দ্য সুম্যান। আমি ওকে যাদুকরের পুত্র বলে ডাকি। দেখেছিস চোখ চুল কত কালো, দেখেছিস গায়ের রঙ।

সুমন বলল, গল্পের এমিলকে কিছুতেই ভুলতে পারছ না।

মারিয়া বলল, না। তারপর সহসা ছুটে কোথায় যে মারিয়া পালিয়ে গেল। সুমন চারিদিকে লক্ষ্য করল। কিছুক্ষণ ঘরে পায়চারি করল—এই ঘর মারিয়ার ব্যবহারের জন্য। ঘরটি কোন জাপানী পুতুলের জন্যই যেন সংরক্ষিত—পাথরের কালো দেয়াল, দেয়ালে সব উজ্জ্বল বাতি, উপরে ঝাড়-লণ্ঠন এবং ছোট পালঙ্ক, বড় টেবিল সামনে এবং আলমারির ভিতর, টেবিলের উপর ওর শিশু বয়সের রাজ্যের খেলনা, কাঠের হাতি, ময়ূরের পালক দিয়ে তৈরি পাখি, ছোট ছোট পাথরের তৈজসপত্র। একটা বড় পেরাম্বুলেটর। এমন একটা বয়স মারিয়ার—যা এইসব শিশুসুলভ ইচ্ছার মায়া নানারকম প্রলোভন তাকে ঘিরে রেখেছে। মারিয়ার সব ছেড়ে ছুড়ে এখন বড় পুতুলের জন্য অথবা জীবন্ত পুতুলের জন্য ভিতরে ভিতরে বুঝি হাহাকার—মারিয়ার এই ঘর তারই যেন সাক্ষ্য দিচ্ছে। সুমন ভিতরে এখন একা এবং সে খুব বিব্রত বোধ করতে থাকল। এমনকি পাশের জানলাতে সে গুডুইকে পর্যন্ত দেখতে পেল না। তাকে মারিযা এই ঘরে একা ফেলে কোথায় সহসা অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুমন ভয়ে ভয়ে ডাকল, মারিয়া! কোন উত্তর আসছে না। পাথরের দেয়ালে মারিয়ার নানা বয়সের ছবি। কোথাও মরিয়া জল-প্রপাতের পাশে দাঁড়িয়ে আছে অথবা বড় ক্যাক্টাসের নিচে ওর চঞ্চল চোখ ঘাসের পোকা খোঁজার মতো। সুমন ওর পালঙ্ক অতিক্রম করে ছোট প্যাসেজ ধরে হাঁটতে থাকল। দেয়াল ধরে বিচিত্র সব গলি, এর শেষ কোথায় সে বুঝতে পারছে না। সে যেন বাড়িটার গোলকধাঁধায় হারিয়ে যাচ্ছে। এতবড় বাড়ির ভিতর সে কিছুতেই এমন কোন নিদর্শন পেল না যা তাকে গাড়ি-বারান্দায় অথবা কৃত্রিম পাহাড়ের নিচে নিয়ে যেতে পারে। সে ফের ডাকল, মা-রি-য়া। সুমন মারিয়ার এই দুষ্টু বুদ্ধির জন্য রাগে দুঃখে চিৎকার করে ডাকল, মা-রি-য়া। সে ক্রমশ হেঁটে গাড়ি বারান্দার উদ্দেশে যতবার যেতে চাইছে ততবার সে যেন একই বৃত্তে ঘুরছে অথবা ততবার একই পাথরের দেয়াল, জানলা, বড় বড় দরজার উপর ওর ছায়া পড়ছে আর নিজেকে কোন এক রহস্যময় বাড়ির ভিতর গুপ্তধন সন্ধানকারীর মতো মনে হচ্ছে, কারণ কোন পরিচারিকার কণ্ঠ পাওযা যাচ্ছে না, বৃদ্ধের কাশির শব্দ আসছে না, বার বার দেয়ালের নিচে নেমে সেই এক জলাশয় দেখল—যা কিছুতেই অতিক্রম করা যায় না।

সুমন সেই জলাশয়ের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকল। আর তখন অন্য পারে মারিয়া হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। সে বলল, চলে এস।

সুমন বলল, জলে সব ভিজে যাবে।

মারিয়া বলল, একটু নেমে দেখ।

জলে নামতেই মনে হল জল অল্প। এবং নিচে সান বাধানো। সে হেঁটে হেঁটে অন্য পারে উঠে গেল। সামনে ভারোদীর সেই পাখির জগৎ—সব নানা রঙের কৃত্রিম ফোয়ারা, পৃথিবীর সব বিচিত্র পাখি এবং সেখানেই মারিয়া হেসে গড়িয়ে পড়ছে। মারিয়া ঘাসের ভিতর, ঝোপের ভিতর সমুদ্রের মানুষটিকে নিয়ে লুকোচুরি খেলতে চেয়েছিল।

ভিতরে না ঢুকলে এত বড় প্রাসাদের এত অলিগলি, কোথায় কোনটা গেছে বোঝা কঠিন। সুমন বিরক্ত এবং আহত গলায় বলল, মারিয়া আমাকে জাহাজে রেখে এস। মারিয়ার প্রচণ্ড আকর্ষণ এ-সময়ে সুমনকে এতটুকু বিষণ্ণ করতে পারছে না। মারিয়া সুমনের কথা শুনতে পেল না, সে ফের উইলো ঝোপের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুমন একটা বড় পপলার গাছের নিচে। ওরা ছায়া আলোর জন্য খুব বড় দেখাচ্ছে। এখন 'ফুল ফোটাবার সময়' কে যেন পাঁচিলের ও-পাশে এ-কথা হেঁকে হেঁকে চলে যাচ্ছে। সুমন নিজের জায়গা ছেড়ে এতটুকু নড়ল না। সে সেই রেড-ইন্ডিয়ান নফরটিকে পর্যন্ত কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না। নফরটি পর্যন্ত ওর সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে যেন। শুধু এই কৃত্রিম অরণ্যের ভিতর কোথাও মারিয়া লুকিয়ে আছে, কিছু খাঁচায় রাখা নানা দেশের বিচিত্র বর্ণের পাখি, কোথাও কৃত্রিম হ্রদের ভিতর অল্প জল আর ছোট ছোট ঝোপ, গিনি মুরগীদের বাসস্থানের জন্য। সুমন আলো এবং অন্ধকারের ভিতর তার সোনার আপেলটিকে খুঁজে বেড়াতে থাকল।

ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর ছোট ছোট আলোর ডুম জ্বলছে। অমসৃণ সংকীর্ণ পথ। সুমন সন্তর্পণে সামনের দিকে হেঁটে গেল এবার। সামনে ছোট ছোট পাথরের ঘর, যেখানে মোরগ-মুরগীর মতো নিগ্রো রমণীরা বসবাস করত ডিম ফোটাবার জন্য। এখন এইসব ঘরের কোথাও হয়ত মারিয়া মুরগী সেজে বসে রয়েছে। সুমন হেঁটে যাবার সময় সব লক্ষ্য করে গেল এবং ফিস ফিস করে ডাকল মারি...য়া, মারি...য়া, এই মারি...য়া এ সব কি হচ্ছে! মারিয়া আমাকে জাহাজে নিয়ে চল, আমি এখানে আর আসব না। মারি.. যা, মারি.. য়া—সে আক্রোশে এবার ফেটে পড়ল।

আর তখনই মারিয়ার সাদা মখমলের মতো ফ্রক ঝোপের ভিতর থেকে ফুলের মতো ভেসে উঠল এবং অত্যন্ত ধীরে ধীরে সুমনের সংলগ্ন হয়ে বলল, তুমি এক্ষুনি জাহাজে ফিরে যাবে মিঃ এমিল!

সুমন দেখল মারিয়ার চোখ অভিমানে ভারী দেখাচ্ছে। তবু সুমন কেমন দুঃখী মানুষের মতো বলতে চাইল যেন, মারিয়া মাঠের কোথাও না কোথাও ডেইজি ফুলেরা নিঃশব্দে ফুটে থাকে আবার মাঠের কোথাও না কোথাও রেটল্ সাপের ঈগল পাখি ধরে খাবার জন্য মরা মানুষের মতো অভিনয়ের স্পৃহা...আমি এই দুর্গের মতো বাড়িতে একা এক নিঃসঙ্গ ভয়ে সর্বদা আতঙ্কে আছি। আমি শুধু এক আকর্ষণে এখানে চলে আসি...মারিয়া তুমি ঝোপে জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে ভয় দেখাবে না—আমি খুব দুখী মানুষ, নাবিক, মাতৃহীন উদ্বাস্তু যুবক অথবা বলতে পারো বর্ষার দিনে ক্যাক্টাসের বিরল হলুদ রঙের ফুলের মতো—সহসা সব কিছু পৃথিবীর চুরি করে দেখার ইচ্ছা। সুমন নিঃশব্দে হাত বাড়িয়ে মারিয়াকে শরীরের ঈষৎ সংলগ্ন করে নিতেই—মারিয়া জুতোর টোতে ভর করে যাদুকরের পালিত পুত্রের ঠোঁটে ঈষৎ হাসির মতো ঠোঁট ছোঁয়াল।

জলের স্পর্শের মতো সুমন মারিয়ার ত্বক স্পর্শ করল।

মারিয়া সুমনের হাত ধরে এখন হাঁটছে। সে বলল, আচ্ছা মিঃ এমিল, আমাদের ছোট এমিল এত ভীতু ছিল না তো!

—ছোট এমিল।

—হাঁ। তার একটা ছোট্ট বেড়াল ছিল। সে একদিন যাদুকরের জন্য বাজার করতে গিয়ে দেখল, মাঠে মাঠে সব মানুষেরা কাঁদছে। সে দেখল, গাছের সব পাতা ঝরে যাচ্ছে। গাছগুলো সব মরে যাচ্ছিল।

—ওঃ। বলে সুমন ফের অন্যমনস্ক হতে চাইল। মারিয়ার গল্পের জন্য সে কোন উৎসাহ দেখাল না। কারণ সে দেখল, রেড-ইন্ডিয়ান প্রৌঢ়টি আড়ালে সব সময় ওদের লক্ষ্য রাখছে। সুতরাং সে মারিয়াকে এক সময় বিরক্ত গলায় বলল, গুডুই দেখছে আমাদের।

—দেখুক।

—গুডুই তোমার লোক ভাল নয়।

—খুব ভাল। সে, জান মিস্টার এমিল, সে আমাকে বড় করে তুলেছে।

—ওঃ। সুমন বলল, তবে চলি।

মারিয়া হাতে টেনে বলল, বোস মিস্টার এমিল। আমি তোমাকে জাহাজে নিয়ে যাব। মারিয়া কৃত্রিম ধমকের সুরে কথাটা বলল। সুমন চুপচাপ হাঁটছিল। সুতরাং ফের মারিয়া বলল, কাল তোমরা এখানে খাবে।

—আমার খেতে ইচ্ছে নেই।

—কিন্তু মা যে হেনবীর সঙ্গে কথা বলে সব ঠিক করে ফেলেছেন।

—বেশ করেছেন। সুমন কিঞ্চিত বিরক্ত গলায় কথাটা বলে হাঁটতে থাকল।

মারিয়াও পিছু পিছু সুমনকে অনুসরণ কবছে। এতবড় বাড়ি এবং এই কৃত্রিম ঝোপ-জঙ্গল অথবা বিচিত্র সব দেশের পাখ-পাখালিব ভিতর দিয়ে সুমন হেঁটে যাচ্ছে। কোথাও এই বাতেব আলোয কোনও হেরনপাখি শুধু ঝিমুচ্ছে, কোন উড-পেকার কাঠেব ভিতর ঠোঁট গুঁজে বসে আছে--আর সুমন এবং মারিয়া ক্রমশ সদব দবজার দিকে পাঁচিলের পাশ দিয়ে হাঁটছিল। আগামী কাল কোথাও ট্রাউট মাছ ধরতে গেলে বেশ হত—এইসব অঞ্চলের কোথাও পাহাড় আছে, জলপ্রপাত আছে অথবা প্রকাণ্ড মাঠেব ভিতর গোলাবাড়ি এবং কোন প্রৌঢ় ব্যক্তি সেইসব রক্ষণাবেক্ষণ কবছেন। সুমন কেমন ছেলেমানুষের মতো বলে ফেলল, ট্রাউটমাছ তবে ধরতে আর যাওয়া হবে না?

—রোববার। রোববাবে যাব।

—আর যাওয়া হবে না।

—সত্যি যাব বলছি। মা না গেলে তুমি আমি চলে যাব। গুডুই সঙ্গে থাকবে।

—গুডুই ভাল নয় মারিয়া।

—গুডুই সোনার মানুষ, সে আমাব ভালোর জন্য প্রাণ দিতে পাবে।

সুমন আর কথা বাড়াল না। সে অন্য প্রসঙ্গে কথা বলার সময় দেখল—সব ফাঁকা, সবই গুলিযে যাচ্ছে। সে সুতরাং চুপচাপ হেঁটে গাড়ি বারান্দার নিচে এসে দাঁড়াল। সে ইচ্ছা করলেও একা জাহাজে যেতে পাবত না—শহরের আঁকাবাঁকা পথ তার কাছে এখনও অপরিচিত। সুতরাং সে মাবিযার হাতে নিজেকে সঁপে দেবার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল।

সুমন গাড়িতে বসে ভাবল—না, আর না, কাল কোনও অসুস্থতার অজুহাতে সংগোপনে রাতের অন্ধকারে ইদ্রিশের ফোকসালে ঢুকে যাবে। এ-ভাবে অদায়িত্বশীল যুবকের মতো অথবা ফেবেববাজ পুরুষেব মতো বেঁচে থাকা অর্থহীন। সুমন জানলা দিয়ে শহরে কাঁচের ঘর, দোকানের শো-রুম এবং কোথাও কার্নিভেলেব বিচিত্র সাজ পোশাক পরা স্ত্রী-পুরুষের দল দেখে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল আর সহসা মনে হল সে একজন ফুলওয়ালা, বসন্তে সে ফুল ফেরি করতে বের হয়েছে। ওর মনে হল যেন এটা হেমন্তকাল, মনে হল কোথাও না কোথাও স্থলপদ্ম ফুটে আছে, শুধু সংগ্রহের যা দেরি।

গুডুই গাড়ি চালাচ্ছে, ওর পায়ের পেশী ভয়ঙ্কর শক্ত। সে বড় বেশি দ্রুত গাড়ি চালাচ্ছে। মাবিয়া অন্য প্রান্তে গাড়ির জানলাতে মুখ রেখেছিল। বাতাসে ওর চুল সামান্য উড়ছে। মুখে সামান্য ক্লান্তির চিহ্ন এবং চোখ দেখলে মনে হবে দূরবর্তী কোন প্রপাতের ছায়া চোখে আর কোথাও এক মেষ-শাবক সন্তর্পণে জলপান করছে।

বন্দরে মারিয়া বলল, কাল একটু সকাল-সকাল আসব। এতটুকু প্রতীক্ষা না করে সুমন সোজা হাঁটতে থাকল। গাড়ির দরজাতে মারিয়া হেলান দিয়ে শৈশবের স্মৃতির পাখিটিকে যেন হেঁটে যেতে দিচ্ছে। পাখিটির অন্তরে রাজ্যের দুঃখ।

সুমন গ্যাঙ-ওয়ের সিঁড়ি ধরে জাহাজে উঠে যাচ্ছে। খুব আস্তে আস্তে খুব ক্লান্ত পায়ে উঠে যাচ্ছে। সিঁড়ি অতিক্রম করে একবার পিছনে তাকাল। জেটির অন্য পাশে মারিয়া এখনও অপেক্ষা করছে। ওর ভিতর থেকে এ-সময় কিছু কাতর উক্তি উঠে আসছিল। সে সুতরাং মাথা নিচু করে হাঁটছে। ওর মনে হচ্ছিল সে নিজের কাছে খুবই ছোট হয়ে যাচ্ছে। কোনও বন্দরে সম্ভ্রান্ত রমণী ওর জন্য অপেক্ষা করেনি। সে সাধারণ নাবিক, সে মায়ের মৃত্যুর পর কিছু অশ্লীলতার জন্য বন্দরে বন্দরে সাধারণ গণিকালয়গুলোতে অন্য অনেক নাবিকের সঙ্গে হানা দিয়েছে। কোন সততার অভিনয় ছিল না, আদর্শের অভিনয় ছিল না, শিস দিয়ে শুধু কখনও কখনও ইতর পুরুষের মতো চলে গেছে বন্দরের সব ঘিঞ্জি গলিতে— সারাদিনের ক্লান্তি দীর্ঘ সমুদ্র সফরের বেদনাবহ স্মৃতি নিমেষে ডুবে গেছে—কিন্তু মারিয়া ফুলের মতো, মারিয়ার আকর্ষণ হেমন্তের স্থলপদ্মের মতো কেবল কাছে টানছে। যত কাছে টানছে তত সুমনের উৎসাহ কমে যাচ্ছে, তত এক বিষণ্ণ করুণ স্বরে সর্বত্র কারা হেঁকে যাচ্ছে। সে কিছুতেই সহজভাবে মারিয়াকে আলোকিত করতে পারছে না। ভারোদীর কঠিন মুখ এবং কঠিন উক্তি নিগ্রো সম্পর্কে অথবা দেওয়ালের সব বীভৎস ছবি ওকে পিছন থেকে কেবল তাড়া করে ফিরছে। সে আর হাঁটতে পারল না। সে ডেকের উপর ক্রমশ যেন স্থবির হয়ে যাচ্ছে। ডেকে কারও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। তীরে সারি সারি পপলার গাছে জোনাকি জ্বলছে, শহরের আলো চোখের উপর শুধু পাক খাচ্ছে এবং নিজে এক হতবুদ্ধিসম্পন্ন যুবক—সে আকাশের দিকে নিজের দুটো হাত প্রসারিত করে দিল এবং আবেগে বলে উঠল, মা...আমার মাগো। শৈশবের কিছু স্মৃতি, দাঙ্গা এবং মৃত এক পুরুষের ছবি অথবা সেই মুসলমান যুবক, মায়ের লাঞ্ছিত মুখ...আর কি যেন,...কি যেন, সে ডেকের উপর দাঁড়িয়ে হাওয়ার ভিতর হাতড়াতে থাকল।...মা...মাগো, সে ফের বলল। মায়ের কাছে বিদায়ের সময়টুকু বড় করুণ। মা দুঃখ করছিলেন, সুমন আমি একা একা কি করে থাকব। মায়ের সেই করুণ স্মৃতি মায়ের সহসা মৃত্যু সুমনকে বড় বেশি আবেগধর্মী করে তুলেছে। কোথাও কোনও আকর্ষণ নেই—বন্দরে বন্দরে রাত যাপনের সময় প্রায়ই ওর এ কথা মনে হত। শুধু মারিয়া নতুন করে মায়ের মতো অন্য এক ভালবাসার জগৎ ধীরে ধীর তৈরি করে তুলছে। সুতরাং মিথ্যার আশ্রয়টুকু সুমনকে বড় বেশি কাতর করছে। মারিয়ার কাছে সহজভাবে বেঁচে থাকার জন্য সে আকুল হতে গিয়ে দেখল আকাশের সব নক্ষত্রেরা সারি সারি পপলারের পিছনে কোন দুর্গের অভ্যন্তরে উইলো ঝোপের ভিতর একে একে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে এবং দূরে সে সহসা একটা হাহাকারের দৃশ্য দেখতে পেল।

॥ দশ ॥

বোধ হয় এ-রজনী দুঃখের রজনী। কারণ সুমন ফোসকালে ঢুকে দেখল সুচারু সামাদ বাংকে শুয়ে আছে এবং মনে হচ্ছে ওরা ঘুমে আচ্ছন্ন। পোর্টহোল খোলা। তিনটে টিপয়ে ভাতের থালা, ছোট ডেকচিতে ভেড়ার মাংস। বাঁধাকপি ভাজা এবং মুসুরির ডাল। কিছু মিষ্টি জলের মাছভাজা সে ভাতের উপর দেখতে পেল। সে প্রথমে পোশাক ছেড়ে লকারে ঝুলিয়ে রাখল। কোন শব্দ না হয় সেজন্য সে সন্তর্পণে বাংকের নিচ থেকে মগ বের করে উপরে উঠে যাবার সময় দেখল, সারেঙের ঘর খোলা। সারেঙ অন্যদিন এসময় নিজের দরজা বন্ধ করে দেন এবং অন্যান্য ফোকসালে ইতস্তত আলাপ শোনা গেলেও দরজা বন্ধ থাকে। এই একমাত্র বন্দর যেখানে ভারতীয় নাবিকদের ভিতর ক্ষোভের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।

সে উপরে উঠে গেল। স্টাবোর্ড-সাইডের বেঞ্চিতে বসে বড় টিন্ডালের কিছু বিপজ্জনক উক্তি শুনতেই বুঝল, এই পিছিলে কিছুক্ষণ আগে যমুনাবাজুর সারেঙ সুচারু এবং সামাদকে নিয়ে প্রচণ্ড গোলমাল বাঁধিয়েছিল। ফলে ওরা অভুক্ত এখনও। এবং ওরা যে দুজনের একজনও ঘুমোয়নি, ঘুমোতে পারে না—সে বাথরুমে স্নান করার সময় তা ধরতে পারল। সুতরাং সুমন তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিচে নেমে এসে তোয়ালে তারে ঝুলিয়ে দেবার সময় ডাকল, এই সুচারু।

সুচারু উত্তর করল না।

সুমন পাশের বাংকে উঁকি দিয়ে ডাকল, এই সামাদ, সামাদ!

সামাদ উঠল। ভয়ঙ্কর বিরক্ত দেখাচ্ছে মুখ। সে বলল, কি ব্যাড় ব্যাড় করছিস।

—কি হয়েছে রে?

—সারেঙ জেগে রয়েছে। আমাদের নামতে দেবে না জলে। নামলে সে কাপ্তানকে নালিশ করবে।

—আচ্ছা লোক তো! তোরা খেলি না?

—সামাদ উত্তর দিল না, সামাদ ফের শুয়ে পড়ল।

—খাওয়ার উপর রাগ করলে সারেঙের কি হবে?

সামাদ ছেলেমানুষের মতো বলল, তোর ইচ্ছা হয় খেয়ে নে। আমরা খাব না।

সুমন বলল, তোরা না খেলে আমি খাই কি করে!

সুচারু কোন কথা বলছিল না। সামাদ পাশ ফিরে শুল এবং অশ্লীল উক্তি করতে থাকল বড় টিন্ডাল সম্পর্কে। বলল গলা টিপে শালাকে একদিন পোর্টহোল দিয়ে দরিয়াতে হারিয়া করে দেব। তবে বুঝবে আমার নাম সামাদ আলী।

সুমন এমন উক্তি শুনে দমে গেল। কারণ বড় টিন্ডালের উপর ওর অহেতুক রাগের কারণটা আজ পর্যন্ত জানতে পারেনি। সে হেসে বলল, ক্ষিদে পেয়েছে, আর দেরি করিস না। আয়।

—সব তাতেই তোর হাসি। হাসার কথা কি হোল। তোর খিদে পেয়েছে তুই খেয়ে নে। আমরা খাব না। আমরা সারেঙ ঘুমালে জলে নেমে যাব।

সুমন এবার বলল, সারেঙ টের পেল কী করে?

সামাদ জবাব দিল, শুয়োরের বাচ্চা বড় টিন্ডাল বলে দিয়েছে। শালা আমাদের তক্কে তক্কে ছিল। কাল রাতে জাহাজে উঠে আসবার সময় দেখেছে। সফরে যাবার সময় যখন দেখলাম, শালা গাঁয়ের মানুষ বড় টিন্ডাল ইবলিশটা, আমার সঙ্গে একই জাহাজে সফর করতে যাচ্ছে, শালা মনটা তখনই ভেঙে গেল। সফরটা ভাল যাবে না, শালা আমি যেখানে যা করছি সব সালিমার বাপকে খতে জানিয়ে দিচ্ছে। ভাল হবে না, ভাল হবে না বড় টিন্ডাল, তুমিও সেখের বাচ্চা, আমিও সেখের বাচ্চা। বলে সামাদ কেন যে অনর্থক চেঁচাতে লাগল।

সুমন তাড়াতাড়ি হাত ধরে বলল, এই সামাদ, তুই ক্ষেপে গেলি! কি করছিস!

সুচারু তখনও কোনও কথা বলছে না, সে চুপচাপ শুয়ে মড়ার মতো পড়ে আছে। কারণ ওর ভিতরে ভিতরে স্থির প্রত্যয় যেন—সে জলে নেমে যাবেই।

সামাদ তখনও বড় টিন্ডালকে উদ্দেশ্য করে চেঁচাচ্ছিল। পাশের ফোকসালে বড় টিন্ডাল, সব শুনতে পাচ্ছে, অথচ কিছু বলছে না। সুমনের ব্যাপারটা খারাপ লাগছিল। সে তাড়াতাড়ি সামাদের মুখে হাত রাখতেই সামাদ যথার্থই পাগলের মতো কেঁদে ফেলল, আমার বিবিটা চারমাস হল একটা খত দিচ্ছে না সুমন!

সুমন বলল, তাতে তোর বড় টিন্ডালের কি দোষ!

সামাদ চুপ করে থাকল। কিছু বলছে না! ওকে খুব নিস্তেজ দেখাচ্ছিল।

অন্য ফোকসালে বড় টিন্ডালকে ডংকিম্যান বলছিল, টিন্ডাল আপনেরে কি কৈতাছে শোনেন।

টিন্ডাল বলল, অরে কৈতে দ্যাও। ছাওয়াল-পাওয়ালের লগে আমার ইতরামি সাজে না।

তখন সুমন সামাদকে বলল, খত নিশ্চয়ই আসবে। আমার মনে হয় চিঠির কোন গণ্ডগোল হচ্ছে। ওরা ঠিকানা ভুল করছে।

সামাদ এবারেও কোন জবাব দিল না। সে চুপ করে থাকল। সালিমা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন উক্তি এ সময় ওর ভিতর থেকে উঠে আসছিল। সুমন অথবা সুচারুকে বড় টিন্ডালের সব ঘটনাটা খুলে বলা দরকার। তিনটে চিঠির একটার জবাব নেই! এ সময় তার নদীর চরের কথা মনে পড়ল, কৈশোরে সালিমা শীতলক্ষ্যার জল থেকে ঝিনুক তুলে আনত এবং দুজনে মিলে ঝিনুকের ভিতর মুক্তা খুঁজত। ওর বাবার ঝিনুকের কারবার ছিল। সালিমা নদীর গর্ভস্থল থেকে ডুবে ডুবে কোঁচড় ভরে ঝিনুক

সংগ্রহ করত। জলের ভিতর শালিমার সেই মিষ্টিমুখ সামাদ এখন মনে করতে পারছে অথবা সামাদের যেন মনে হল সালিমার সঙ্গে সে শীতলক্ষ্যার জলের নিচে ডুবে ডুবে সাঁতার কাটার সময় সালিমার অস্পষ্ট ছবি...সে একবার কচুরিপানার ভিতর সালিমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছিল। সালিমা বলেছিল, তুই আমারে নষ্ট কইরা দিলি, বলে খিল খিল করে হাসতে হাসতে চরের পথে ছুটেছিল। নল-খাগড়ার বন, তরমুজের জমি পার হলে ওদের সেই ছোট গ্রাম্য খড়ের বাড়ি। ঘরের ভিতর লুকিয়ে বারবার হেসে আকস্মিক এই ঘটনার জন্য সে সামাদকে ভালবেসে ফেলেছিল।

সুমন এবার সুচারুর হাত ধরল।—এই ওঠ্। আয় খেয়ে নি। আমার খিদে পেয়েছে। সুমন সামাদের হাত ধরেও অনুরোধ করল।

রাত ক্রমশ গভীর হচ্ছে। অন্যান্য ফোকসালে ডেক অথবা ইনজিন-জাহাজীদের গলা পাওয়া যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে ডেক-সারেঙ ইনজিন-সারেঙকে কি বুঝিয়ে বলছে সুচারু সম্পর্কে। সারেঙ নিজের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন, সে ডেক-সারেঙের কথা কিছুতেই রাখতে পারছে না বলে দুঃখিত। সুতরাং ডেক-সারেঙ নিজের ফোকসালে উঠে গেল এবং দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল।

সামাদ সুচারুকে বলল, আমরা না কাল রাতে নেমে যাব সুচারু।

সুচারু জবাব না দিয়ে নিজের স্মৃতিতে ডুবে থাকতে চাইল। বড় অস্পষ্ট এবং মুখের অবয়বে অপূর্ব কমনীয়ভাব—ঠিক যেন পদ্মপাতায় জল এবং জলে আকাশের প্রতিবিম্ব ভাসছে। লিজার কথা মনে এলেই এমন একটা ছবি চোখের উপর ভাসতে থাকে। সুতরাং সুচারু বার্টের বর্ণিত মিশনারি হাসপাতালের উদ্দেশে যাবেই যাবে। সুচারু আর একবার সেই নিরুদ্দিষ্ট কিশোরীকে খুঁজে বের করবে বলে এবং প্রেম নামক এক বস্তুর জন্য সে পাগলের মতো প্রলাপ বকতে বকতে সারেঙের ঘরের দিকে উঠে গেল। তারপর দরজায় মৃদু আঘাত করে ডাকল, সারেঙ সাব!

—আবার কেন?

—আর একবার বলতে এলাম।

যারা জেগেছিল তারাও ধীরে ধীরে এসে ভিড় করল।

ওরা সকলে বলল, যেতে দিন সারেঙ সাব।

সারেঙ ক্ষেপে গেল। বলল, সব পাগল নিয়ে খেলা দেখছি।

সুচারু খুব বিনীত এবং ভদ্রজনের মতো বলল, আজকের মতো যেতে দিন। রাত ভোর না হতেই ফিরে আসব। কেউ টের পাবে না। আমি আর কোনদিন যেতে চাইব না।

সারেঙ কিছু বলল না। সকলের মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিল। তিনি কোন অনুমতি দিলেন না। তিনি দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লেন। এবং সুচারু ধীরে ধীরে নেমে এসে বাংকে শুয়ে পড়ল। সে খেল না, সে শক্ত হয়ে বাংকে পড়ে থাকল। তারপর সকলে যখন যথার্থই ঘুমিয়ে পড়েছে এবং কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না সে একা একা দড়ির সিঁড়ি হারিয়া করে দিল এবং সন্তর্পণে সকলের অজ্ঞাতে নেমে গেল। ওর ভাত এবং ভোজ্যদ্রব্য টিপয়ের উপর পড়ে থাকল। আলো জ্বলতে থাকল ফোকসালে। এমন কি এই মুহূর্তে সামাদ ঘুমোচ্ছে সুমন ঘুমোচ্ছে। শুধু ফোকসালে নিঃসঙ্গ আলোটা গভীর রাতেও জ্বলছিল।

কিসের শব্দে সুমনই প্রথম জেগে উঠল। দেখল, আলো জ্বলছে এবং সুচারু ফোকসালে নেই। সামাদ বাংকে পড়ে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে। সে ডাকল, এই সামাদ, সাামাদ—দেখ্ সুচারু জলে নেমে গেছে। সামাদ বাংকের উপর উঠে বসলে বলল, সুচারুর এটা বাড়াবাড়ি। কি অর্থ হয় এ-সব ছেলেমানুষীর! কবে কোন্ এক লিজা ওকে ছেড়ে চলে গেছে, কবে ওকে অভিমান করে বলেছে—সে কোথাও গিয়ে সন্ন্যাসিনী হবে আর সেই থেকে সে পৃথিবীর সব বন্দর চষে বেড়াচ্ছে।

সামাদ ডাকল, সুমন। ওর গলার আওয়াজ গম্ভীর শোনাল এবং দেখে মনে হচ্ছে না সামাদ এতক্ষণ ঘুমিয়েছিল বাংকে, যেন সে এইমাত্র দড়ির সিঁড়িতে সুচারুকে নামিয়ে দিয়ে এসেছে আর এইমাত্র সে যেন কোনও শোকাবহ দৃশ্য থেকে উঠে এসেছে। সে যেন বলতে চাইল, আমি সুচারুকে তিন সফর থেকে দেখে আসছি। সে যেখানে গেছে, যে বন্দরে গেছে—প্রত্যেক গীর্জায় সে অনুসন্ধান

করেছে, প্রত্যেক মানুষের ভিতর সে তার লিজাকে অনুসন্ধান করেছে। সে নিজে লিজার ফটো দেখিয়ে সকলকে বলেছে—এই লিজা, পাটকলের বড় সাহেবের মেয়ে, সে বলেছে, কোথাও আমি তাকে খুঁজে পাবই। সে আমার জন্য কোথাও না কোথাও প্রতীক্ষা করে থাকবে। আর তখন আমরা তাকে পাগল ভেবেছি—কত রকমের নাবিক জাহাজ উঠে আসে, কত রকমের দুঃখ বুকে বয়ে বেড়ায় এবং জীবনের আশ্চর্য সব অলৌকিক বিশ্বাস নিয়ে শেষ জীবন পর্যন্ত এই জাহাজের ফোকসালে কাটিয়ে দেয় আর কোনও বন্দরে মৃত্যুর সময় কয়েকজন জাহাজী বন্ধু, কিছু বিদেশী ফুল এবং এক অপরিচিত কবরখানা...সামাদ এবার মুখ তুলে বলল, রবার্ট সুচারু বড় গরিব ছিল। লিজা বড় সাহেবের মেয়ে। ওরা দুজনে একই মিশনারি বিদ্যালয়ে পড়ত, একই গীর্জায় প্রার্থনা করেছে—কিন্তু বড় সাহেব ভয়ঙ্কর কড়া মেজাজের লোক। তিনি তাঁর একমাত্র মেয়েকে একজন নেটিভের হাত থেকে রক্ষার জন্য দেশে ফিরে গেলেন। লিজাকে সুচারুর কোন চিহ্ন সঙ্গে নিয়ে যেতে দিলেন না।

ফোকসালে আলো জ্বলছে। পোর্টহোল খোলা—ঠাণ্ডা হাওয়া তবু আসছে না। সামাদকে পীরের মতো মনে হচ্ছে। সে মাথা ঠাণ্ডা রেখে খুব ফিস ফিস করে কথা বলছিল, সুচারু তারপর থেকে কিছু অদ্ভুত বেনামা চিঠি পেত। কখনও লেখা থাকত—ওরা নূতন বসতি স্থাপনের জন্য অস্ট্রেলিয়ায় নিউ-ক্যাসেল অঞ্চলে চলে গেছে, কখনও চিঠিতে লেখা থাকত, ওরা ডোমিসাইল্ড নিয়ে আমেরিকাতে যাচ্ছে অথবা কখনও সাউথ আফ্রিকা। এমন কি সে এক সময় চিঠি পেয়েছে—লিজা অকল্যান্ডের কোনও গীর্জা থেকে দীক্ষা নিয়ে উধাও। কোথায় গেছে কেউ জানে না। এবং সেই ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

সুমন সামাদের এই মুহূর্তের চেহাবা যেন চিনতে পারছে না। রাতের প্রথম দিকে সামাদ তার বিবি সম্পর্কে নানা সংশয় নিয়ে দুঃখ পাচ্ছিল—দেখে মনে হবে না সেই এক সামাদ—যে সর্বদা অশ্লীল সব বন্দরের ছবি বালিশের নিচে লুকিয়ে রাখতে উৎসাহ পায়। সে ডাকল সামাদ চল্ ডেকে। আমার আজ ঘুম হবে না। আমি সুচারুর জন্য ডেকে জেগে থাকব। সে যতক্ষণ না ফিরছে আমরা অন্ধকারে পাহারা দেব। তারপর সে আরও কাছে গিয়ে বলল, দেখি সারেঙ টের পায় কি করে!

ওরা ফোকসালের আলো নিভিয়ে দিল। ভিতরে অন্ধকার—জেটির মৃদু আলো নেমে আসছে। ওরা দরজা ভেজিয়ে সন্তর্পণে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল। গ্যালীব দরজা খুলে সামাদ একটু চা করে নিল এবং ফল্কার কাঠে বসে ওরা চা খাবার সময় দেখল—চারিদিকে চাঁদের আলো। মাস্তুলের ছায়া ওদের শরীরে আর ডেকে কোন আলো জ্বলছে না, বড় মালোমের কেবিনের দরজা খোলা মনে হচ্ছে—তিনি যেন কোন রমণীকে এলওয়ে থেকে তুলে নিচ্ছেন।

বার্চগাছের অন্ধকারে জ্যোৎস্নার শেষ আলোটুকু পড়ছিল। ওরা মুখোমুখি এখন বসে। ওরা জাহাজী সুচারুর জন্য ডেকে পাহারায় আছে। ওরা সুচারুকে সকলের অলক্ষ্যে তুলে আনতে চায় জাহাজে।

সুমন একসময় বলল, চল্ দেখি পিছিলে, জলে কোন শব্দ হচ্ছে কিনা দেখা যাক।

—টের পাওয়া যাবে না! সুচারু ডুবে ডুবে সাঁতার কাটে।

—তবু একবার দেখা যাক, বলে সুমন উঠে পড়ল। ওরা নিচে নেমে দড়ির সিঁড়িটা প্রথমে ফেলে দিল। তারপর রেলিঙে ঝুঁকতেই দেখল সুচারু নদীর জলে সাঁতার কেটে ফিরছে। ওরা দড়ির সিঁড়িটা টেনে ধরল। ওরা হাত নেড়ে ওদের উপস্থিতির কথা বলল। তাড়াতাড়ি নিচে নেমে দড়ির সিঁড়িটাকে আরও শক্ত করে বেঁধে দিল সামাদ। সুচারু ক্রমশ সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে আসছে। সুমন উঁকি দিয়ে দেখল, যুবক সুচারু ওকে ধরবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে।

উপরে উঠে সুচারু কথা বলতে পারল না।

সুমন বলল কোনও খবর?

সুচারু সামাদের কাঁধে হাত রেখে বলল, না। আর কিছু বলতে পারছিল না। ওর খুব কষ্ট হচ্ছে কথা বলতে। সে হাঁপাচ্ছে।

সুচারু ফের বলল, একটু জল খাব।

সুমন তাড়াতাড়ি জল এনে দিলে সুচারু জল খেল এবং বলল, নিচে চল্ সুমন, ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে গেছে।

—কি কাণ্ড? কিসেব কাণ্ড?

—নিচে আয় বলছি।

ওরা নিচে নেমে গেল। সুচারু জামা-কাপড় ছেড়ে বাংকে বসে বলল, খুব সাহস করে ভিতরে ঢুকে গেলাম।

—কি দেখলি।

—সব ছোট ছোট সন্ন্যাসিনীদের ঘর। পাশে প্রসূতি-কেন্দ্র। খুব ছোট। তিন চারটি বেড। আর সন্ন্যাসিনীদের ঘরগুলো খুবই ছোট। সামনে সব লতানে গোলাপের গাছ, ঠিক ঝোপের মতো।

—তারপর?

—ওরা দেখল, একজন অপরিচিত পুরুষ ওদের জানালায় জানালায় হেঁটে যাচ্ছে!

--তারপর?

—তারপর ভয়ে চিৎকার!

সামাদ বলল, তোর এত সাহস!

—লিজার মুখ আবিষ্কারের জন্যে পাগলের মতো ঘুরছিলাম। ঘরে ওদের অল্প আলো জ্বলছে। ওরা আমাকে দেখে ভূত দেখার মতো ভয় পেল। ওরা চিৎকার করে বলছিল, ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন। এবং সঙ্গে সঙ্গে জানালাগুলো বন্ধ হতে থাকল। কোথাও কোন পুরুষ কণ্ঠ নেই, শুধু শিশু প্রসূতিদের আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছিলাম! সুচারু এইটুকু বলে একটা ঢোক গিলল, তারপর চুপচাপ।

—তারপর কি হল? সামাদ ঝুঁকে পড়ল সুচারুর মুখে।

—শুধু একটি জানালা এই ভয়ঙ্কর রাত্রির ভিতরও খোলা ছিল। অস্পষ্ট আলোতে সাদা পোশাক পরা এক সন্ন্যাসিনীকে দেখলাম- -বীভৎস মুখ—পুড়ে গেছে, চোখ দুটো সামান্য জ্বলজ্বল করছিল, হাতগুলো শীর্ণ দেখাচ্ছে অথবা কঙ্কালের মতো। সুচারু এইটুকু বলে শুয়ে পড়ল।

শুয়ে শুয়ে বলছিল সুচারু, ভিতরে তখন চেঁচামেচি হচ্ছে। দূরের খামার বাড়ি থেকে তখন লোকজন ছুটে আসছে এবং চোর অথবা অন্য কোনও উপদ্রবের কথা ভেবে পুলিশের সাহায্য চাইছিল ওরা। সুচারু এবার পাশ ফিরে শুল। যখন কোথাও কোনও দুঃখ জেগে নেই শুধু থেকে থেকে জেটির অন্য প্রান্ত থেকে পপলাবের শব্দ ভেসে আসছে এবং শেষ রাতের নক্ষত্র জাগছে কোথাও।

সামাদ বলল, সুমন উঠে আয়।

সুমন উঠে নিজের বাংকে চলে গেল। কারণ সুমন এবং সামাদ জানত এই বন্দরে সুচারু আর বের হবে না। ফের অন্য বন্দর এলে, অন্য গীর্জায় অথবা কোনও শহরের পথে ছবিটির সঙ্গে মুখ মিলিয়ে দেখবে তারপর সেই এক বিষণ্ণ সন্ধ্যায় নিরাশ হয়ে ফেরা এবং সে ফের বালকসুলভ কান্নায় ভেঙে পড়বে। সফবে সফরে সুচারু একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে আসছে।

সুতরাং এ রজনী দুঃখের রজনী। তিনজন জাহাজী যুবক ফোকসালের স্বল্প আলোর ভিতরে পোর্টহোল খোলা রেখে মৃত মানুষের মতো পড়ে থাকল। ওদের চোখে ঘুম আসছে না। ভোর হতে দেরী নেই এবং বন্দরে কোন তৈলবাহী জাহাজ এসে ভিড়ছে—কিছু লোকজনের চলাফেরার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে জেটিতে। অথচ এই জাহাজীরা শুধু দূরের মাঠ দেখল অন্ধকারের ভিতর—যুবতীরা কেবল হেঁটে যাচ্ছে, যুবতীরা যুবকরা হাত তুলে হেঁটে যাচ্ছে, যুবতীদের শরীর যেন জাহাজময় ভেসে বেড়াচ্ছিল। ওরা তিনজন এই শেষ রাতটুকুতে কিছুতেই আর ঘুমোতে পারল না। শরীরে ক্রমশ বিশ্রীরকমের উত্তাপ জমছে। ওরা ঘুমের ভান করে শক্ত হয়ে পড়ে থাকল।

শুধু সুমনের মনে হল উইচ-ককের পথ অতিক্রম করে গেলে, আস্তাবলের মাঠ পার হয়ে গেলে এবং শহরের সদর রাস্তা ধরে হেঁটে গেলে সেই দুর্গের মতো বাড়ি যেখানে ফুলের মতো মারিয়া অন্ধকারের ভিতর ফুটে রয়েছে। সে সন্তর্পণে বাংক থেকে নেমে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল এবং মাস্তুলের নিচে একলা হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

॥ এগারো ॥

হেনরী ঘুম থেকে উঠে পোর্টহোলের কাঁচ খুলে দিল। তীরের সব পপলার-জাতীয় গাছগুলো এখনও সামান্য অন্ধকারে ডুবে আছে। দু-একজন শ্রমিককে ইতস্তত হেঁটে জেটিতে নেমে আসতে দেখা যাচ্ছিল। ডানদিকের বড় গুদামখানার মাথায় আলোটা এখনও জ্বলছে। এবং রাস্তার আলো একটা লোক নিভিয়ে দিয়ে গেল। হেনরী অভ্যাস মতো তোয়ালে কাঁধে ফেলে ডেকে বের হতেই দেখল সুমন মাস্তুলের গুঁড়িতে বসে বসে ঘুমাচ্ছে। সে ডাকল, হেই।

সুমন ওর প্রথম ডাকে কোন সাড়া দিল না। সুতরাং হেনরী ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। খুব ঘুমুচ্ছে হতভাগা! মনে মনে এই ভেবে হেনরী একটু রসিকতা করতে চাইল। একটু সাদা পেস্ট নাকের ডগায় এবং দু-গালে লেপ্টে দিতেই সুমন চোখ মেলে তাকাল। সে ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে হাত পা টান করে হাই তুলল।

হেনরী ভাল ছেলের মতো প্রশ্ন করল—কী ব্যাপার? এখানে বসে বসে ঘুমানো হচ্ছে!

সুমন গতরাতের ঘটনাটুকু খুলে বলতে পারত। কিন্তু না বলে সে উঠে দাঁড়াল। এবং চারিদিকে চোখ মেলে তাকাতেই বুঝল পপলার গাছগুলোর ফাঁকে সূর্য এবার উঠবে। কাপ্তান ব্রিজে পায়চারী করছেন। মেজ মালোম বোট ডেকে বসে হাওয়া খাচ্ছেন ভোরের—সুমন হাই তোলার সময় ভেবেই পেল না কখন সে রাতে ডেকের উপর এসে এই মাস্তুলের গুঁড়িতে বসেছিল! হেনরীকে শুধু বলল, রাতে ঘুমোতে পারিনি।

—কেন কী হয়েছে? মারিয়া কিছু বলেছে?

—না। সে চলে যাচ্ছিল পিছিলের দিকে, কি ভেবে ফের ঘুরে দাঁড়াল এবং বলল, রাতে ফিরলে কখন।

—ঠিক বলতে পারব না?

—কেন, হুঁস ছিল না?

—হেনরীর মুখ লজ্জিত দেখাল।

—এত রাত!

—ভারোদীর সঙ্গে সামনের একটা শহরে গেছিলাম।

—খুব ফুর্তি করলে?

—খু-উ-উব।

—আমার কিছু হল না।

—কেন? কেন মারিয়া তোমাকে...

—ধ্যাৎ। একটা বাজে মেয়ে। একটু কচি খুকি...

—তবু এটা ওটা...চুমুটা খেলে কি আর দোষের! বালিকা বলে কিছু জানে না বুঝি?

—বাচ্চা মেয়ে কি আর বুঝবে। সুমন মারিয়া সম্পর্কে নিস্পৃহ থাকতে চাইল। এবং পিছিলের দিকে হেঁটে যেতে চাইলে হেনরী ফের ডাকল, হেই সুমন, দেখ গালে তোমার কি লেগে আছে।

সুমন গালে হাত রেখে বুঝল আঁঠা আঁঠা কিছু এবং সে হাতের স্পর্শে হেনরীর দুষ্টুবুদ্ধিটুকু ধরে ফেলতেই হেনরীকে ধরার জন্য সে কেবিনের দিকে ছুটল। হেনরী ডেক ধরে পালাবার চেষ্টা করছে। হয়ত এখন সুমন ডেক থেকে কিছু সালফার নিয়ে ওর মুখে মেখে দেবে। সুতরাং হেনরী তাড়াতাড়ি নিজের কেবিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিতেই মনে হল দরজার পাশ দিয়ে সুমন হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে। সে দরজা ফাঁক করে ডাকল, হেই। সুমন এবার পিছন ফিরে তাকাল না—সে যথার্থই এবার চলে যাচ্ছে দেখে হেনরী সামনে গিয়ে দাঁড়াল এবং নিজের তোয়ালেটা দিয়ে বলল, মুছে ফেল মুখটা।

সুমন মুখ মুছে ভাল করে দেখল হেনরীকে। হেনরীর চোখ মুখ খুব বসে গেছে। প্রায় সারারাত হেনরী বন্দরে ভারোদীকে নানাভাবে উৎপীড়ন করে এসেছে অথবা বলা যেতে পারে সারারাত

ভারোদীকে নিয়ে এক যৌন ক্রিয়াশীল জগৎ এবং সেই জগতে লোভ, লালসা লাল শালুর মতো সারারাত ঠাণ্ডা হাওয়ায় দেওয়ালের সর্বত্র উড়ছিল। সে বলল, তোমার চোখ মুখ বসে গেছে হেনরী, তুমি মরবে।

—আজ আর যাব না।

সুমন ভারোদীর মেয়ে মারিয়ার প্রসঙ্গে বলল, আজ যে রাতে খাওয়ার কথা!

—তবে কি করা যাবে? সত্যি বলছি আমার আর ইচ্ছা করছে না। হেনরী সামান্য অন্যমনস্কভাবে কথাটা বলল।

—মারিয়াকে বিকেলে বলে দিলে ভাল হত—আমরা যেতে পারব না।

হেনরী হাঁটতে থাকল সুমনের সঙ্গে। বলল, কাল আমিও বলে এলাম, তুমি আমি যাব। একসঙ্গে হৈ-চৈ করে দু-চার দিন যা আছে কাটিয়ে দেব! সামান্য তো খাওয়া, তারপর ওরা রেলিঙের কাছে এসে দাঁড়ালে হেনরী বলল, খেয়ে দেয়ে আর দেরি করব না। সোজা জাহাজে চলে আসব। ফেরার সময় একটা পাইট নিয়ে জাহাজে ফিরব। ওখানে বেশি করে খেলে ভারোদী আমাকে ঠিক বধ করে ফেলবে।

—সেই ভাল। তোমার কেবিনে বসে খাওয়া যাবে।

এখন আর সুমনের নড়তে ইচ্ছা করছিল না। সে রেলিঙের উপর ঝুঁকে বলল, এত রাত পর্যন্ত কি করলে?

—বলব না। মিষ্টি মিষ্টি করে হাসল হেনরী।

—ভেরি গুড। বলে সুমন চলে যেতে চাইলে হেনরী বলল, আরে দাঁড়াও।

সুমন বলল, এবার ঠিক তোমার বৌকে চিঠি লিখে জানিয়ে দেব।

-মাই বয়, বলে হেনরী উদাস গলায় ডাকল।—মাই বয়, তুমি এই ভোরে আর যাই বল আমার এই কেচ্ছার সঙ্গে সেই সতী সাধ্বীকে জড়িয়ো না। এইটুকু বলে হেনরী খুব তড়িঘড়ি দাঁত মাজতে থাকল এবং পাশে নিজের বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। হেনরী এই কথায় যথার্থই বিষণ্ণ হয়ে পড়ছে। হেনরী বাথরুম থেকে কখন বের হবে, কে জানে! সুতরাং ডেকে দাঁড়িয়ে গাছগাছালির ফাঁকে সূর্য উঠতে দেখল। সূর্যের আলো ওর মুখে পড়ে এক নিষ্পাপ বালকের ছবি এঁকে দিয়েছে। সে ইতস্তত করছিল নিজের ফোকসালে নেমে যাবে কিনা, না হেনরী বের হলে ওকে বলে পিছিলে উঠে যাবে কারণ সামান্য রসিকতা করলে হেনরীকে খুব দুঃখিত দেখায়। কোথায় এক অসামান্য বেদনা সব সময় বাজতে থাকে যেন। সুমন অনেক চেষ্টা করেও সেই অসামান্য বেদনার আভাষ আজ পর্যন্ত পায়নি। কিন্তু বাথরুমে কোনও শব্দ হচ্ছে না! মনে হল মানুষটা ইচ্ছাকৃতভাবে ভিতরে দেরি করছে। সে আর অপেক্ষা করল না। বেলা বাড়ছে। এখুনি সারেঙ সকলকে ডাকবে এবং বলবে টান্টু। সে একা একা ডেক ধরে পিছিলের দিকে উঠে যাচ্ছে।

এই নিঃসঙ্গ জাহাজে সুমনের মনে হচ্ছিল কোথাও কোনও ভোরের পাখি ডাকছে—ঠিক নিঃসঙ্গ দুপুরে দূরবর্তী কোন ঘুঘুপাখি ডাকের মতো। নির্জন এই জাহাজ-ডেকে সুমন সেই দুর্গের মতো পাঁচিলের ভিতর মারিয়ার মুখ শুধু মনে করতে পারল। আর মায়ের কোমল মুখ মাঝে মাঝে হাহাকারের দৃশ্য সৃষ্টি করছিল। মারিয়ার সরল এবং অকপট ভালবাসার কথা ভেবে সুমন ফোকসালে নেমে যেতে পারল না। সেখানে নেমে গেলেই অন্ধকার। সেখানে কোন জলের আরশি থাকে না, কোন প্রতিবিম্ব ভাসে না, সুতরাং সুমন রেলিঙের উপর ভর করে দাঁড়াল এবং নদীর জলে নিজের মুখ দেখতে পেল। নদীর জল, ছোট ছোট ঢেউ। ভোরের সূর্য সহজেই আলোর মালা সেই জলে অনবরত নিক্ষেপ করে চলেছে। ওর পেছনে মাস্তুলের ছায়া খুব লম্বা হয়ে নদীর জলে ভেসে যাচ্ছিল। ওর মনে পড়ছিল সেই দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার গল্প, মনে পড়ছিল—সেই লেডী এ্যালবাট্রসের গল্প। লেডী এ্যালবাট্রাস সারাদিন এবং প্রায় সারারাত সমুদ্রে বিচরণ করার পর ভোররাতের দিকে এই মাস্তুলে এসে আশ্রয় নিত। আর সর্বত্র সেই এক করুণ ছবি—শুধু নারীজাতীর জন্য মানুষের ক্রমান্বয় অকপট ভালবাসা। আর তখনই মনে হল পেছনে ওর কে হাত রেখেছে কাঁধে। সুমন ঘাড় তুলে তাকাল। হেনরী, এবং

হেনরী ওর পাশে দাঁড়িয়ে এখন হুবহু ওব মতো নদীর জল দেখে সব দুঃখ ভুলে যাচ্ছে।

জলে অল্প ঢেউ ছিল বলে ওদের দুজনের মুখের প্রতিবিম্ব ক্রমশ বিস্তৃত হতে হতে হালকা পাখির পালকের মতো জলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। ওরা উভয়ে কোন কথা বলছিল না। ওরা জলের নিচে প্রতিবিম্ব দেখে নিজেদের চেনার চেষ্টা করছিল।

তখন সুচারু গঙ্গাবাজুতে হাঁকছিল, সুমন সুমন রে।

সুমন রেলিঙ থেকেই হাঁক পাড়ল, বলল, যাচ্ছি!

এ-সময় ওদের চা খাবার সময়। কিছুক্ষণের ভিতরই জাহাজীরা ফোকসাল থেকে বেরিয়ে পড়বে। চা খেয়ে ওরা ডেকময় নিজেদের কাজ করে বেড়াবে। সুতরাং সুমন চা খাবার জন্যে নিচে সিঁড়ি ধরে নেমে গেল।

পাশাপাশি বাংক। সুচারু সামাদ এবং সুমনের ফোকসাল। সামাদ নিচে বসে চা করছে, সে সুমনেব চা আলগা করে রেখে দেবার সময় দেখল অসময়ে সুমন লকারের দরজা খুলছে। এবং সে কি খুঁজল কিছুক্ষণ তারপর লকারের নিচ থেকে কোন গোপনীয় ছবি বের করে উল্টে পাল্টে দেখল। মায়ের ছবি—বিবর্ণ, সারা মুখে সামান্য হাসি এবং মা তখন যুবতী। সুমন মায়ের জন্য হতাশায় ভেঙে পড়ল অথবা মায়ের মতো মারিয়ার জন্যও যেন এক আকর্ষণ--স্ত্রীজাতির আকর্ষণ থেকে রেহাই পাচ্ছে না। যত ভাবছে আর কিছুতেই নয়, যত ভাবছে আজ অন্য কোনও ফোকসালে নিজেকে অদৃশ্য করে রাখবে—তত এক মারাত্মক আকর্ষণ, যেন সময়ের জন্য সূর্যের প্রতীক্ষা। সুমন ছবিটা রেখে ফেব উপরে উঠে গেল—সামনে সেই উইচককেব পথ এবং সূর্য যখন উইলোঝোপের ভেতর তার রহস্য হারিয়ে ফেলবে—মাবিয়া বড় গাড়ি করে বন্দরে নেমে আসবে তখন। এবং বলবে ওজালিও সুম্যান আমি আবার এলাম অথবা বলবে, যাদুকরের পালিত পুত্র আমি, আবার এলাম।

বার্ট তখন জাহাজের উপর হৈ হৈ করতে করতে উপবে উঠে এল। সুমনেব সামনে এসে হাত প্রায় জোড় করে টেনে নিয়ে হ্যান্ডশেক করল। কিন্তু সুমন কোনও কথা না বলে হাঁটতে থাকলে বার্টের বিস্ময়—এই সুমন, উচ্ছল তরুণ যুবা সুমন মুখ ব্যাজার করে হাঁটছে। সে বলল, এনিথিং রঙ সুম্যান?

সুমন তাকাল বার্টেব দিকে। সুমন হেসে কথা বলার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। সেই ভেতরে থেকে থেকে কষ্ট এবং সুমন ইনজিন রুমে নামার সময় দেখল বার্ট আর তাকে অনুসরণ করছে না। সে কাজেব জন্য কশপের ঘরে ঢুকে বালতিতে কিছু যন্ত্রপাতি ভরবাব সময় দেখল সিঁড়ি ধরে হেনরী নেমে আসছে নিচে। ওর গলায় রুমাল বাঁধা। সুতরাং ছোট ছোট যন্ত্রপাতি হাতুড়ি বাটালি, স্প্যানার নিয়ে ওকে উপরে উঠতে হল না। কোলবয় এবং ফায়ারম্যানদের কাজ এখন স্মোক্‌বকসে। ওবা তিন নম্বর বয়লারের স্মোকবক্‌স্ পরিষ্কারের জন্য দরজা খুলে দেখছে।

সুমন হেনরীকে অনুসরণ করে নিচে নেমে গেল। ঠিক জেনারেটারের পাশে 'বাইশ' টেবিল—কিছু ফাইল সারার কাজ, সুমন নিজেই বিয়ারিঙ বেঁধে ফাইল সারতে থাকল। হেনরী টর্চ মেরে ব্যালেস্ট পাম্প এবং অন্যান্য পাম্পগুলো দেখছিল। একটা প্লেট তুলে সে ট্যাঙ্কটপের ভিতরে নেমে গেল। সব মিষ্টিজলের ট্যাঙ্ক নিচে। তলানি জল ফেলে জাহাজ নোঙর তোলার আগে জল ভরে নেবার জন্য ভেতরটা পরিষ্কার করা হচ্ছে। ছোট ছোট বালতি, পুরোনো পরিষ্কার নেকড়া হাতে জাহাজীরা ট্যাঙ্কের নিচে নেমে লাল ময়লা জল পরিষ্কার করছিল—ওদের কথাবার্তা ভেসে আসছে। ওরা এই ট্যাঙ্কের ভিতরে বসেও অশ্লীল গল্প করছিল। সেই এক স্ত্রীজাতির গল্প। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর জাহাজীরা বন্দরে নামতে পারছিল না—বড় এক দুঃখ, তারা কাতর এই দুঃখে। সুমন মিথ্যা পরিচয়ে ওজালিও দ্য সুম্যান এই নামে পালিয়ে পালিয়ে অথবা আর কতদিন মিথ্যা পরিচয়ে মারিয়াকে পাগল করবে—আর কতদিন এই মিথ্যা মোহকে ধরে রেখে জাহাজী সুমন ইতর যুবকের মতো চলাফেরা করবে—সুমনের এসময় মুখে বিস্বাদ লাগছিল। সুমন আপন মনে ফাইল করার সময় দেখল—সেই এক মুখ, মারিয়ার মুখ মায়ের মতো ভালবাসা নিয়ে যেন সমুদ্রতীরবর্তী বন্দরে অপেক্ষা করছে, মুখটা চোখের সামনে বড় বেশি জ্বল জ্বল করছিল।

হেনরীর হাতে একটা বিয়ারিঙ। সে বিয়ারিঙটার মাপ-জোক নিচ্ছিল। সে সুমনের ফাইল ঘষা

দেখছিল। ঠিক হচ্ছে না, সুতরাং নিজেই ফাইল হাতে নিল। প্যান্টের পেছনে দুবার ঘসল ফাইলটা, তারপর নিবিষ্ট মনে কাজ করতে থাকল। কাজ করার সময় হেনরী বড় বেশি আন্তরিক। কিছু জাহাজী টানেল পথে অথবা স্মোকবক্সের ভেতর কাজ করছে এবং ওরা নিজেদের অদৃশ্য রেখে বাংকারের ভিতর গলে গিয়ে দেশের গল্পে মশগুল। এই জাহাজী ভাইদের আলস্যের জন্য সুমন সংকোচ বোধ করছিল। আর ওরা বড় আন্তরিক—কাজের সময়ে হেনরী অথবা বড় মালোম, মেজ মালোম, মেজ মিস্ত্রি সকলে সমান দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে—কাজের সময় কাজ, ফূর্তির সময় ফূর্তি—সবই চুটিয়ে ভোগ করার স্বভাব এদের। এবং ঠিক এ সময়ই সুমন অত্যন্ত খাটো গলায় বলল, আমি আর মারিয়ার কাছে যাব না হেনরী। আমি ধরা পড়ে যাব। মারিয়ার চাকরটা তক্কে তক্কে আছে, সে আজ হোক কাল হোক ঠিক টের পাবে—আমি ইন্ডিয়ান, আমি স্পেন দেশের লোক নই, আমার বংশ কোন কালে ষাঁড় লড়াইর নাম পর্যন্ত শোনেনি, আমি এক সাধারণ নাবিক সুমন, আমি কোনও মিথ্যা ষাঁড় লড়িয়ে ওজালিওর বংশধর নই। অথবা তোমরা আমাকে আর ওজালিও দ্যা সুম্যান বলে ডেকো না।

—চাকর-বাকর মানুষ, ওরা মনিবের ভাল তো চাইবেই' হেনরী চুরুটের ছাইটা ঝেড়ে বাঁ-পাশে রেখে দিল।

—কাল রাতে ঘুমোতে পারিনি, জীবনে অনেক কষ্ট সুমন, জীবনে নারী সহবাস ছাড়া আর কি থাকে বলো! হেনরী অসহায় যুবকের মতো কথাটা বলল।

—কাল রাতে দুঃস্বপ্ন দেখলাম। সেই ঘরটা, মনে আছে হেনরী তুমি এবং আমি প্রথম যেদিন ভারোদীর ঘরটা দেখি—সেই ঘর, নিগ্রো যুবতীর একটা কঙ্কাল এবং রেটল্ সাপের সেই বিদ্‌ঘুটে হাড়টা আর একটা সোনার ঈগল যেন সেই দুর্গের মতো বাড়িটার উপর উড়ছিল। মারিয়াকে ঠিক রাজকন্যার মতো মনে হচ্ছিল। বন্দিনী।

—আর কিছু দেখনি।

—আমি জানি সব ব্যাপারেই তুমি আমাকে ঠাট্টা করবে।

—আমি ঠাট্টা করছি না সুমন! জাহাজী জীবনে অনেক জটিলতা থাকে, আবার আনন্দও থাকে, বলে সে ফাইলটা পাশে রেখে দিল। 'বাইশ' থেকে বিয়ারিঙটা খুলে ভাল করে কটন ওয়েস্ট দিয়ে মুছে দুবার ফুঁ দিল বিয়ারিঙটার তেল ঢোকার মুখে। তারপর বিয়ারিঙটা পাশে রেখে ফের চুরুটটা ঠোঁটে তুলে বলল, জাহাজী জীবনে বড় একঘেয়েমি থাকে—এই দেখ না, বেশ আমাদের দিনগুলো সমুদ্রে কেটে যাচ্ছিল—তোমার মা মারা গেলেন, ডারবান বন্দরে তুমি মায়ের মৃত্যুর খবর পেলে। তুমি দেশে ফিরতে পারলে না। বেশ ছিলাম আমরা—কিন্তু এই বন্দরে ভয়ঙ্কর বর্ণবৈষম্য বলে, নিগ্রো বিদ্বেষ বলে ভারতীয় নাবিকদের নামতে বারণ করে দেওয়া হল। বল তুমি, কী দরকার ছিল ভারোদীর সঙ্গে আমার আলাপের। সে এই জাহাজে পাখি সংগ্রহের জন্য আমার কেবিনে এল, ওর মেয়ে মারিয়া এল, তুমি আমার ঘরে এলে এবং পরিচয় হল। মিথ্যা পরিচয়ে আমি তোমাকে স্পেনিশ বলে চালিয়ে দিলাম। তোমারও সায় ছিল এতে কিন্তু এখন কি মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে না—যে তুমি ভুল করে ফেলেছ?

—খুব ভুল হয়ে গেল।

—ভুল নয় সুমন এটাই সমুদ্রের নিয়তি। তুমি এখন রোজ ধরা পড়ার ভয়ে কেমন দিন দিন মুষড়ে পড়বে।

—আমি আর যাব না হেনরী।

—যাবার যখন সময় হবে সব ভুলে যাবে সুমন।

—না আজ আমি বলছি, ঠিক বলছি, দেখো...

এবার হেনরী খুব বিরক্ত গলায় বলল, যাবে না, যাবে না। রোজ তোমাকে এই এক কথা বলতে শুনি।

সুতরাং সুমন আর কথা বলল না। হেনরী ইনজিনিয়ার মানুষ, ওয়েলসের লোক। বিদেশী এবং জাহাজের অফিসার। সুতরাং এই মুহূর্তে সুমনের মনে হল ওর সঙ্গে সত্যি বকবক করা মানায় না।

হেনরী ভেতরে ভেতরে হয়ত যথার্থই রেগে গেছে। অথবা মনে হল, হেনরীর তাকে এখন আর দরকার নেই। মাতৃবিয়োগের পর সুমনের এই বিদেশী মানুষটির সঙ্গে যে অসমবয়সী গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল এখন তা আর ধরা যাচ্ছে না। অথবা বিধবা ভারোদী ওকে হয়ত সবই দিচ্ছে। বরং হেনরীর এখন একা একাই ভাল লাগার কথা। সে ভারোদীকে নিয়ে বড় মেটাল রোড ধরে সামনের শহরে চলে যাবে। আর বাকি ক'রাত নাচঘরে অথবা কোনও দামী হোটেলে রাতের আস্তানা গেড়ে, মদ খেয়ে বেলেল্লাপনা করে গাড়িতে মাঝরাতে বন্দরে ফিরে আসা এক ভয়ঙ্কর উত্তেজনার খবর—যেন বেঁচে থাকার জন্যই এমনই এক উত্তেজনা চাইছে। সুমন হাতের কটন ওয়েস্টগুলো বালতিতে রাখল এবং হেনরী সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতে থাকলে, সে শুধু ওকে অনুসরণ করল।

ঠিক ইনজিন সিলিন্ডারের বাঁ-পাশের সিঁড়িতে উঠে হেনরী পেছনের দিকে তাকাল। সে ঘাড় ঘুরিয়ে সুমনের মুখ দেখার চেষ্টা করল। মুখ থম থম করছে সুমনের। মুখ গম্ভীর দেখালে সুমনের চোখ দুটো আরও বড় দেখায়। হেনরী মনে মনে না হেসে পারল না, এই তরুণ যুবা, ভারতবর্ষের যুবা বড় বেশি আবেগে ভুগছে। চোখ দুটি ভারী—আষাঢ়ের জল-ঝড়ের মতো মুখ। স্কাইলাইট থেকে সূর্যের আলো এসে পড়ছে, ওরা উভয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছিল এবং যেতে যেতে হেনরীর যেন বলার ইচ্ছা, ভারোদী এখনও ষোল বছরের ছুড়ির মতো ওজালিও।

হেনবী উপরে উঠে যাচ্ছে, সুমনও উঠে যাচ্ছে।

হেনরীর যেন আরও বলার ইচ্ছা, তুই রাগ করলে আমি মরে যাব বাছা। ভারোদীব বুক আর উরু সমান—এ কথাটাও মনে হল হেনরীর—বড় নরম এবং সময়ে শক্ত। কোমরের কাছে মাংস নেই বললেই হয়। আর পাছাতে কি চর্বি রে ওজালিও। হলদে হলদে দাগ। নীল শিবা উপশিরা সব শরীবেব ভিতর পাকদণ্ডির মতো ঘুরে ফিরে মাংসের ভিতর হারিয়ে গেছে। কি কোমল শরীর রে ওজালিও। অমন জায়গায় হাত রাখলে দু-চারদিন, তুইও অতল জলে ডুবে যেতিস। ভিজা ভিজা, সব সময় ক্ষরণ হচ্ছে, যেন বলার ইচ্ছা হেনরীর—কাঁচি এক বাবুইব বাসা—বৃষ্টির পর ভোরের রোদেব মতো নরম এবং সুকোমল—চাপ চাপ, হাত দিলেই হাত ক্রমশ ভেতরের দিকে বসে যাচ্ছে। হেনরী ঠিক এনজিনের দবজার সামনে সুমনকে এসব বলতে চাইল।

কিন্তু সুমনের গম্ভীর মুখ দেখে কিছুই বলতে সাহস পেল না। সে উইন্‌চ মেসিন পর্যন্ত ধীরে ধীরে হেঁটে গেল।

সব উইন্‌চগুলোই চলছিল। শুধু ডানদিকের উইনচের বিয়ারিঙ ক্ষয়ে যাবার জন্য মাল উঠতে নামতে উইন্‌চম্যানকে খুব অসুবিধায় ফেলছে। আজ সারাদিন মেরামত করলে মনে হয় মেসিন কাল থেকে ঠিক কাজ করতে পারবে। সুমন ডেকে সালফার উড়ছিল বলে মাথায় টুপি পরে নিল। চোখ মুখ জ্বালা জ্বালা করছে। আর সব ডেকময় ব্যস্ততা—নিচে সেই এক ক্রেন-মেসিনেব শব্দ এবং ফক্কার ভিতর সেই সব নিগ্রো কুলিদের চিৎকার—চুরি করে মদ্যপান এবং অমানুষিক পরিশ্রমের জন্য হল্লা।

হেনবী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ চুরুট টানল তারপর চুরুটের শেষ অংশটুকু ঢিল মেরে নদীর জলে ফেলে বলল, দ্যান মাই বয়, তুমি যাচ্ছ না?

—না।

—না গেলে তো চলবে না বয়।

—হেনরী ঠিকভাবে কথা বল।

সুমনের কিছুই প্রায় ভাল লাগছিল না। সে বিরক্ত হয়ে হেনরীকে ধমক দিল।

হেনরী হেসে বলল, আচ্ছা সুমন তুমি বল জাহাজে আমাদের কে আছে?

—কেউ নেই।

—কে আমাদের ভালবাসে?

—কেউ না।

—তবে মিস্টার ওজালিও পাড়ে যদি কেউ তোমার জন্য প্রতীক্ষা করে বসে থাকে—কত সৌভাগ্যের কথা বল।

—অত বড় বাড়িটায় তুমি আমাকে একা ফেলে চলে যাও, ভারোদী তোমাকে নিয়ে বড় শহরে চলে যায় –-আমার ভাল লাগে না—মারিয়ার রেড-ইন্ডিয়ান চাকর গুডুই কোথাও কেবল উঁকি দিয়ে থাকে। আমার ক্রমশ ভয়টা বাড়ে।

—ভারোদীকে নিয়ে কোথাও চলে যাই, ভারোদীর তাই ইচ্ছা।

—তখন আমি একা একা কি করি বলত?

—কেন ফুলের মতো মারিয়া।

—ধ্যাৎ, ওটা নচ্ছার মেয়ে।

—কেন, কিছু বলেছে?

—কী আর বলবে! সুমন এই প্রসঙ্গে ভারোদীর পাখির জগতের কথা বলল। সেখানে নানা দেশের পাখি ছোট ছোট কৃত্রিম অরণ্য সৃষ্টি করে পুষে রাখা হয়েছে। সেই বড় পাঁচিলের পাশে স্পেন দেশের যুবক ওভালিও হেঁটে বেড়ায়। মারিয়া আলো এবং ফুলের ভিতর মাঝে মাঝে অদৃশ্য হয়ে স্পেন দেশের যুবককে বিব্রত করে—এসব কথা বলার সময় সুমনকে খুবই চিন্তিত মনে হল।

—কি আরাম! হেনরী চোখ বুজে বসে থাকল, যেন কত কী ভাবছে! তারপর সহসা কিছু আবিষ্কারের মতো বলল, মেয়ে মা'র মতো ইশারায় কোনও গোপন কথা বলছে না তোমাকে?

—না।

-তবে আর নচ্ছার কিসের।

সুমন এবার লজ্জিত হবার মতো কিছুক্ষণ কী ভাবল। অথব ভিতরে ভিতরে এক সুন্দর দৃশ্য ভেসে বেড়াচ্ছে? ভয়ে হোক ভীতিতে হোক সুমন কেমন পতুলের মতো কাজ করে যাচ্ছিল সেই কৃত্রিম অরণ্যের ভিতর। সে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থেকে যখন দ্বীপ এবং সমুদ্রের গল্প বলছিল—যখন কোথাও কোনও পারসিমন গাছ থেকে সুমিষ্ট গন্ধ ভেসে আসছে অথবা মনে হচ্ছিল এত বড় দুর্গের মতো প্রাচীন বাড়ির ভিতর ফুলের মতো মারিয়া, মারিয়ার সোনালি চুলের সৌরভ, ছোট ছোট ওরারব্লার পাখির ডাক এবং বোধ হয় সেটা জ্যোৎস্নারাত ছিল—সুমন সহসাই বলে ফেলল, জান হেনরী—মারিয়া আমাকে চুমু খেয়েছে।

—আর কিছু? ওটা তো নতুন খবর নয় আমার কাছে।

—না আর কিছু না।

যুবতী হলে হলত হত। স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার মতন চোখ মেলে তাকাল এবার হেনরী। তারপর আফশোসের গলায় বলল, নাবিক জীবনে এটাই বড় দৈব। কথা নেই, বার্তা নেই, বন্দরে এক সুন্দরী বালিকা অথবা যুবতীর সঙ্গে আকস্মিক আলাপ। তুমি নাবিক বলেই সে আলাপ করবে। ঘরে নিয়ে যাবে সমুদ্রের এবং দ্বীপের গল্প শুনতে শুনতে তোমাকে একসময় ভালবেসে ফেলবে। আমরা নাবিকরা তখন মিথ্যা প্রেমের জন্য এবং অহমিকার জন্য বানিয়ে বানিয়ে কত বিচিত্র সব গল্প বলি। সে সব সত্য ভেবে একদিন বলবে, তুমি থেকে যাও, তোমাকে ঘর দেব থাকার, জল দেব খেতে— আর সব ভালবাসা আমার অঞ্জলিতে তোমার জন্য তুলে রাখব।

হেনরী এখন আর সাধারণ নাবিকের মতো কথা বলছে না। সে গত রাত্রে ভারোদীর সঙ্গে রাত্রি যাপনের পর যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছে। সে এবার উইনচের তলায় ঢুকে গেল এবং বলল, বুঝলে সুমন, আমার স্ত্রীর বিশ্বাস আমি তাকে ভালোবাসি না। বাড়িতে যতদিন থাকব—রোজ একবার না একবার আমাদের বচসা হবেই। অযথা মেয়েটা আমাকে গালাগাল করে। অথচ জান, পরিত্যাগ করে কোথাও যায় না। কতবার বলেছি, অসুবিধা হলে অন্যত্র ঘর কর।

সুমন হেনরীর কথা চুপচাপ শুনছে। কোন জবাব দিচ্ছে না।

—স্ত্রী আমার দজ্জাল। বলে, যেদিন ঘর ছেড়ে যাব, সেদিন গলাটা টিপে তবে যাব।

—একেবারে ভয়ঙ্কর।

—ভয়ঙ্কর আর বলতে। শয়তানের মতো কথাবার্তা। কিন্তু যতদিন দেশে থাকব—সে কাজ থেকে ছুটি নেবে। আমার পছন্দমতো রান্না করবে, নিজেই বাজার করবে, ভালমন্দ কিনে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াবে—ঠিক বুঝলে মায়ের মতো। আর বলবে, এবার শহরে বন্দরে কোথাও একটা কাজ

খুঁজে নাও, আর সমুদ্রে যেয়ে কাজ নেই। কতদিন আমরা আমাদের ফুলের মতো মেয়ে জুলির হাত ধরে সেই গ্রাম্য কটেজে ফিরে গেছি। আমাদের গমের জমির ভিতর কতদিন সে এবং আমি একা একা হেঁটে সফরের গল্প করতে করতে আনমনা হয়ে গেছি। তখনই স্ত্রীর মুখ বিষণ্ণ দেখাত, তখনই সে কান্না কান্না গলায় বলেছে, বল তোমার জন্য আমি আর কী করতে পারি, তুমি চলে গেলে আমি কোথাও বেঁচে থাকার সুখ পাই না।

হেনরী বলল, সুতরাং সুমন বেশিদিন পারি না। 'স্ত্রী এবং জুলির কথা মনে আসতেই, বোধ হয় চোখ দুটো জলে ভার হয়ে আসছিল। সে নিচে অন্ধের মতো ওয়াসার খোঁজার অছিলায় চার ধারে হাতড়াতে থাকল এবং বলতে থাকল, আবার সমুদ্র, আবার যাত্রা উত্তর-সমুদ্রে অথবা দক্ষিম-সমুদ্রে। স্ত্রীর বিষণ্ণ মুখ তখন আমাকে বড় কাতর করে রাখে সুমন। তুমি আর যাই বল সেই সতীসাধ্বীর কথা আমাকে মনে করিয়ে দিও না। কেমন পাগলের মতো এবং কান্না কান্না গলায় কথা বলতে থাকল হেনরী। মনে হয় সে এখন উইনচের নিচে শুয়ে থেকে কেবল স্ত্রীর জন্য, ওর সেই গ্রাম্য কুটিরেব জন্য এবং যব, গম গাছের মতো নিরীহ্ এক ভালবাসার জন্য কাঁদবে। অথচ তার সঙ্গেই মানুষের ভেতরে এক মাংসের পাকদণ্ডি আছে, ভারোদীর মতো স্ত্রীজাতির পাকদণ্ডিতে পুরুষের সেই শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ—এবং মানুষেব ইচ্ছা অনিচ্ছা, স্বপ্ন অথবা উত্তেজনার জন্য এই পাকদণ্ডির ভেতরে ভেতরে নীল লাল, হলুদবর্ণের এক রহস্য এবং গন্ধময় বিশ্রী উত্তেজনায় শুধু হাত দিতে পারলেই নরম চাপ চাপ কোমল ত্বকে ভালবাসার স্বাদ। সেই নোনা স্বাদ অথবা সমুদ্রের স্বাদের জন্য হেনরী এখন আকুল। হেনরীকে জাহাজ ডেকে এখন পাগলের মতো লাগছিল দেখতে। সে নিচে লম্বা হয়ে আছে এবং কোথাও সে তার পরম বস্তুটিকে হারিয়ে আকাশের দিকে পা তুলে মাস্তুলের গায়ে মাথা রেখে গুম মেরে গেছে।

॥ বারো ॥

কড়া রোদের জন্য ডেকের কাঠ এবং লোহা ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। লোহার ডেকে প্রায় পা রাখা যাচ্ছিল না। সামাদ লাফিয়ে ডেক পার হচ্ছে। সূর্য এখন মাথার উপর। পিছিলে কশপ্ নদী থেকে জল তুলে স্নান করছে। ভিতরের ট্যাঙ্ক থেকে আজ কেন জানি জল দেওয়া হচ্ছে না। সামাদেব মুখ খুব তিক্ত দেখাচ্ছিল। ফোকসালে ফিরে স্নানের জল আজ আবার তাকে নদী থেকে তুলতে হবে। বড় টিন্ডালের মুখটা মনে পড়ল। যত বড় টিন্ডালের কথাবার্তা রহস্যজনক মনে হচ্ছে, তত সংশয়টা প্রবল হচ্ছে এবং সে ভিতরে ভিতরে ভয়ঙ্কর এক ঘটনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। কতবার ভেবেছে সুচারুকে বললে হয়, সুমনকে বললে হয়। সুচারু সুমন মিলে যদি কোন উপায় বের করতে পারে। কিন্তু এমন এক সংঘাতিক ঘটনা যা প্রাণের চেয়েও গোপনে রাখতে হয়। সালিমার চোখ এবং ভালবাসার কথা মনে হলে সে আর স্থির থাকতে পারে না। সে ডেক ছাদের নিচে দাঁড়িয়ে কেমন বিড় বিড় করে বকতে থাকল— বড় টিন্ডালের গলা টিপে দেব। আমি সব সহ্য করব কিন্তু সালিমাকে নিয়ে তামাসা সহ্য করব না।

এখন বারোটা বাজতে সামান্য বাকি। তারপর দুপুরের খাবার। দু-একজন জাহাজী এবাব বোট-ডেক থেকে নেমে আসবে। সে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেল। কাজের সময় বলে, এবং টিফিন হয়নি বলে ফোকসালের দরজা ভেজানো। ভেতরের মানুষ এখন বাইরে। ওরা উপরে কাজ করছে। এ-সময়টা খালি ফোকসাল বলে সামাদ দ্রুত নিচে নেমে বড় টিন্ডালেব ঘরে ঢুকে গেল। সন্তর্পণে সে টিন্ডালের বালিশের নিচে এবং লকারে যেখানে যতটা পারা যায় হাত ঢুকিয়ে কী যেন খুঁজল। সে কিছু পেল না। সিঁড়িতে জুতোর শব্দ পেতেই সে দরজা টপকে বাইরে এসে দাঁড়াল এবং ভাল মানুষের মতো মুখ করে রাখার সময় মনে হল শরীরের ভিতর অস্থির এক যন্ত্রণা ওকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। ওব মাথায় বুঝি কিছু ছিল না। শুধু রক্ত ছিল। সেই রক্ত কেবল টগবগ করে ফুটছে। যেন সে এক আত্মহত্যাব আসামী। আসামীর মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে।

সংশয়টা যখন দ্রুত মাথার ভিতর লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায়, যখন এই সংশয়ের জন্য তার প্রিয় যুবতীর চোখ মুখ করুণ এবং সে নিজে সংগোপনে আত্মহত্যাকারী এক যুবক, তখন কেবল মনে হয়

সব বন্ধ দরজা জানালার আগুন ডেকময় ছড়িয়ে পড়ুক। সে বড় টিন্ডালের গলায় দড়ির ফাঁসী পরিয়ে দরকার হলে ডেকে নিয়ে যাবে এবং কপিকলে তুলে মাস্তুলের ডগায় ঝুলিয়ে রেখে বলবে—এই বড় টিন্ডাল ইবলিশ। শয়তান। এই বড় টিন্ডাল আমার সই সাদা কাগজে রেখে দিয়েছে। সুচারুরে, আমার হাতে তখন একটা টাকা ছিল না। শিপিং অফিসে মাস্তার দিতে দিতে জুতো ক্ষয়ে গেছে। না জাহাজ, না সফর। হাতের টাকা সব শেষ। কলকাতার লাথিতে আমি তখন একা। নিঃসঙ্গ। সুচারুরে, আমি মরে যাব, আমার তখন অসুখ ছিল। সামাদের কাতর কণ্ঠ পোর্টহোলের ঘুলঘুলিতে শোনা যাচ্ছিল। ওর চোখ আগুনের মতো এখন জ্বলছে। যেন সে এখন এক হত্যাকারী যুবক। মনে মনে সে বড় টিন্ডালের সঙ্গে বচসা করছে! সে তার ফোকসালে বসে চিৎকার করে বড় টিন্ডালের লালসার কথা বলতে চাইছে। জাহাজে যত দিন যাচ্ছে যত সালিমার চিঠি আসছে না, তত তার এক পাগলপ্রায় চিৎকার করার বাসনা—বলার ইচ্ছা, এই বড় টিন্ডাল আমার গাঁয়ের মানুষ। দেশ গাঁয়ে ওর অবস্থা ভাল এবং মাতব্বর মানুষ। বড় টিন্ডাল ফিরে সব প্রতিবেশীদের দাওয়াত দেবে। সে মসজিদের জন্য নানা খাতে তহবিল দিয়েছে। সে মসজিদে বড় একটা ইন্দারা বানিয়ে দিয়েছে এবং বড় টিন্ডালের বাপ আজিজ সারেঙ, বড় বাড়ির হাসিম বিশ্বাসের সঙ্গে এবং চন্দদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছেলে রহমনকে মাতব্বর বানিয়ে দিয়ে গেছে। বাপের রোগ ছেলেতেও বর্তেছে।

সহসা মনে হল পোর্টহোলের ঘুলঘুলিতে দিন দুপুরে আজিজ সারেঙের সাদা চুলের ভিতর কালো কঠিন মুখটা ভাসছে। অথবা পেন্ডুলামের মতো দুলছে। এই আজিজ সারেঙ, সামাদ বলল, অথবা মনে হল সামাদের, এই আজিজ সারেঙ ওর বাপকে ফুসলে ফাসলে তালাকে মত্ত করেছিল। তালাকের বিবি আজিজ সারেঙের ঘরে উঠে গিয়েছিল। সামাদ বলতে চাইল, আজিজ তুমি আমার মাকে গিলে ফেলে এখানে তামাসা দেখাতে এসেছ। আজিজ, মনে নেই তুমি মান্দারের ডালে ঝুলেছিলে। তোমার বেটা বড় টিন্ডাল এবারে জাহাজের মাস্তুলে ঝুলে থাকবে। বলে সে তার চুল ধরে টানতে থাকল।

সামাদ ভাবল আজ ফের একটা সালিমাকে চিঠি দেবে। ঠিকানায় সালিমার বাপের নাম থাকবে না। অন্য ঠিকানা থাকবে, লোক মারফতে চিঠিটা সালিমার হাতে পৌঁছে দিতে হবে। তার গ্রামে কোন্ মানুষ তার আপনার জন খুঁজতে গিয়ে মনে হল ওর পক্ষে বুঝি কেউ নেই। সকলের কাছে সামাদ বেজন্মা। সকলের কাছে সামাদ অহঙ্কারী যুবক এবং সকলেই সামাদের শক্ত সমর্থ চেহারাকে যেন ভয় পায়। আর সেই ভয়ের জন্য সকলেই এখন বড় টিন্ডালের আশ্রয়ে থাকতে চায়। বৃদ্ধ আজিজ সারেঙ যেমন ওর যুবতী মাকে ফুসলে নিয়েছিল, তেমনি আজিজ সারেঙের বেটা এই বড় টিন্ডাল, এখন প্রায় বৃদ্ধ বলা চলে, ওর ভালবাসার বিবি সালিমাকে ফুসলে নিতে চায়। যেমন গ্রামের অন্য সকলে টিন্ডালের আশ্রয়ে থাকতে চায়, তেমনি সালিমার বাপ জমি জিরেতের লোভে হয়ত এতদিনে সেই আশ্রয়ে চলে গেছে এবং বড় টিন্ডাল, ইদ্রিশকে দিয়ে খত লেখাচ্ছে, ওডা একটা ইবলিশের বাচ্চা। ওডারে তুমি অহন পর্যন্ত জামাই রাখছ কোন্ আক্কলে, মিঞা বুঝি না! অথবা হয়ত বড় টিন্ডাল কোন সরিয়াত ব্যাখ্যার সাহায্যে সালিমার বাপের মনকে দুর্বল করে দিচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি পেটি খুলে ফেলল। যেন দেরি করলেই সে সব হারিয়ে ফেলবে। সে একটা চিঠি লিখে ফেলল। সে তার ভিন্ গাঁয়ের ফুফাত ভাই নবির নামে চিঠি দিল। যেন সে সালিমার সঙ্গে দেখা করে। যেন এই চিঠি তার হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়। বড় টিন্ডালের ষড়যন্ত্র কতদূর এগিয়েছে, কী আদৌ কোন সন্দেহের ঘটনা নয় - সে বুঝতে পারছে না সব, এখন কী করা দরকার, কাকে বললে সে এই দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে নিস্তার পাবে বুঝতে পারল না।

তখন উপরে খাওয়ার ঘণ্টা বাজছে। সে তার চিঠিটা যত্ন করে পকেটে রেখে দিল। চিঠি পোস্ট করার ব্যাপারে সারেঙের সাহায্য চাইল না। কারণ বড় টিন্ডালের সঙ্গে সকলেই যেন সলাপরামর্শ করে চলেছে। সে সোজা মেজ মালোমের কেবিনে ঢুকে গেল, এবং বলল, সাব এই আমার খত। সাব ডাকে ফেলে দিয়ো, বলে সে বের হয়ে এল। তার এই চিঠির উত্তর যদি যথাসময়ে আসে, যদি নবি চিঠিটা পেয়ে মুহূর্তে দেরি না করে এবং সালিমাও চিঠির জবাব লিখে দেয় সঙ্গে সঙ্গে, তবে...সে হাতের কড় গুনতে বসে গেল—কবে কোন্ বন্দরে সে সালিমার চিঠি পেতে পারে। কড় গুনে বুঝল

নোঙর তোলার মুখে মুখে ওর চিঠি যদি যথাসময়ে আসে তবে চলে আসবে। না এলে! সে চোখে মুখে অন্ধকার দেখতে থাকল।

বড় টিন্ডাল রহমান তখন দুলতে দুলতে ডেকের উপর দিয়ে হাঁটছে।

সে ফোকসালে নামার জন্য সিঁড়ির দরজার সামনে ঝুঁকে দাঁড়াল। বড় আয়েসী এই রহমান। বয়সে বৃদ্ধ হলে কী হবে—মুখে ওর রাঙানো দাঁড়ি, চুলে খুসবো তেল এবং মেহেদি রঙের দাড়িতে আতরের গন্ধ। এখনও ওর শরীর ভয়ঙ্কর শক্ত সমর্থ। দাঁত একটাও পড়েনি। গলায় কালো তার বাঁধা। রুপোর চাকতি ঝুলছে গলায়। সারাজীবন কয়লার জাহাজে কাজ করে করে হাতের পেশী খুব শক্ত। দাঁত পান দোক্তার জন্য কালো রঙের—যত দাঁত কালো, জিভ তত লাল। হা করলে বড় টিন্ডালের মুখে ভয়ঙ্কর সব দৃশ্য ফুটে ওঠে। কুমিরের মতো মনে হয় তখন। হা করা মুখে পান জর্দার মতো কত সব লালসার লাল ঝোল। এই দৃশ্য দেখলে সরল অকপট যুবতীদের ভয়ে চোখ বুজে আসে।

বড় টিন্ডালের নীল পোশাকে সামান্য কালির দাগ লেগে থাকে না। কাজ করে করে কেমন এক কৌশল আয়ত্ত করেছে অথবা বড় টিন্ডাল যেন শুধু এই জাহাজে আছে আগয়ালাদের নির্দেশ দেবার জন্য। বড় টিন্ডালকে স্টোকহোলডে আরও বেশি কুশলী মনে হয়। কাজের সময় কাজ। কোন্ আগয়ালার সাহস তখন বয়লারে স্টীম না রেখে সোজা দাঁড়িয়ে থাকে। যখন জাহাজে ঝড়েব জন্য স্টীম ঠিক রাখতে পারে না আগয়ালারা, তখন এই বৃদ্ধ টিন্ডাল একাই একশ। মুহূর্তে কয়লায় সে ফার্নেস ভরে দেবে—তারপর এয়ারভালব টেনে বলবে, দ্যাখ্ রে মিঞা আগুন কারে কয়।

বড় টিন্ডালের বড় পিয়ারের লোক ইদ্রিশ। ইদ্রিশই জাহাজের ডংকীম্যান। সে থাকে নিচের ব্যাংকে। বড় টিন্ডাল থাকে উপরের বাংকে। এক ঘরে এক সফরে সে বড় টিন্ডালের বান্দা। টিন্ডাল ওকে কোরাণের শুদ্ধ উচ্চারণ শেখাচ্ছে। বাড়ি ফিরে ইদ্রিশের আবেগ ঢেলে কোরাণ পাঠ সুতরাং ইমামের সামিল এই মানুষ। ইদ্রিশ নিচে নেমে দরজা ঠেলতে দেখল টিন্ডালের পেটির ডালা খোলা। সে দৌড়ে উপবে উঠে ডাকল, বড় টিন্ডাল। বড় টিন্ডাল তখন বদনার জলে হাত মুখ ধুচ্ছিল। এখন খাবার সময়, এখন হাঁক-ডাকের সময় নয়। খানা-পিনা হবে। অজু হবে। নামাজ হবে। তারপর মিএগ সময় বুঝে কথা কও। সুতরাং ডংকীম্যানের এই হাঁক-ডাকে বড় টিন্ডাল একটু বিরক্ত হল।—কি কথা কও?

—নিচে যান। গিয়া দ্যাখেন আপনার বড় পেটির ঢাকনা খোলা।

বড় টিন্ডাল সামান্য ভ্রূ কুঁচকাল।—ওডাতে আমার কিছু নাইরে মিএগ। তারপব হাসতে হাসতে বলল, গোস্তর ড্যাকচিটা লও।

ডংকীম্যানের বিশু বড় টিন্ডালের সঙ্গে। ওরা দুজন মাদুর বিছিয়ে খেতে বসে গেল। সামাদ, সুচারু এবং সুমন টেবিলের উপর ঝুঁকে খাচ্ছে। বড় টিন্ডাল খেতে খেতে দুবার মুখ তুলে তাকাল। সামাদের পেছনটা দেখা যাচ্ছে। শক্ত ঘাড়। লম্বা মানুষ। সে ওস্তাদের মতো দুবার ঢেকুর তুলে জল খেল বদনা থেকে। মাংসের টুকরো দাঁতের ফাঁকে, সে তার দাঁতকাঠিতে মাংসের কুটিটা বের করে ফুঁ করতেই সেই কুচি পাখার বাতাসে উড়তে উড়তে সামাদের পায়ের কাছে এসে পড়ল। ফের মাংসের বড় টুকরো লাল জিভে ফেলে দিয়ে বলল, ছাগল পাগলের কাণ্ড ইদ্রিশ। বলে টিন্ডাল গোস্তর হাঁড়ি থেকে বেশি পরিমাণে গোস্ত নিতে গিয়ে দেখল—সব হাড়, মাংস নেই। টিন্ডাল এবার রুখে উঠল ভাণ্ডারীর উপর—কেডায় আছ এহানে?

দু নম্বর পরীর কয়লায়ালা মুনিম মুখ বাড়াল জানালায়, কিছু বলছেন টিন্ডাল সাব?

—ভাণ্ডারীরে কওত আমি অরে ডাকছি। বলে আঙুলে ইসারা করল।

ভাণ্ডারী এলে টিন্ডাল লুঙ্গি ধরে চিৎকার করে উঠল, তুমি-অ মিএগ ছাগল পাগল হৈলা।

—ক্যান সাব এই কথা কন?

—কমুনা! হাণ্ডির মধ্যে তুমি ইসব কি রাখছ?

—ইট্টু সবুর করেন। দিতাছি। বলে ভাণ্ডারী কিছু নরম মাংস এনে দিলে খুব আয়েসী মানুষের মতো বসে মুখের হা বড় করে রসে ভেজানো গোল্লার মতো জিভের তলায় ফেলে দিয়ে চোখ ঘুরিয়ে তাকাল। কি দেখল যেন—বুঝি সামাদকে! ইবলিশের বাচ্চার হিম্মৎ দেখে জল খেল ঢক ঢক করে।

তারপর রসের কথা বলার মতো বলল, বোঝলা ইদ্রিশ, তোমার মনে আছে? ছোট পোলার সাদিতে ভূইএগারা কি রকম একটা দাওয়াত দিছিল!

—তা মনে আছে না।

—ইবারে ভাবছি, দেশে গেলে তোমাগ সকলরে ভূইএগাগ ছোট পোলার যেফতের মতো একটা সাদির যেফৎ খাওয়ামু। বলে সহসা টিন্ডাল এত জোরে হেসে উঠল যে সামাদ বিষম খেল, কাঁচের গ্লাস ফেলে দিয়ে সুচারু জলে ভাসিয়ে দিল মাদুর এবং অন্য নাবিকেরা পর্যন্ত ছুটে এসে টিন্ডালের গোল গোল মুখ দেখার সময় বলল, এত হাসেন ক্যান?

—হাসির সময়ে লোকে হাসে না কান্দে?

ইদ্রিশ বলল, হাসে।

সামাদ খেতে খেতে হাত থালা থেকে উঠিয়ে নিল। সে মাথা গুঁজে সব শুনে যাচ্ছিল। সে খাচ্ছে না। ওর ইচ্ছা হচ্ছে এখন বড় টিন্ডালেব পাছায় লাথি মারতে। লাথি মেরে নদীর জলে ফেলে দিতে। অথবা দূরে নিয়ে গিয়ে পেটে লাথি। জবাই করা ষাঁড় গোরুর মতো ছটফট করতে করতে এই নৃশংস ইতর লোকটা মুখ থুবড়ে পড়ুক এবং এও হতে পারে সামাদ স্থির থাকতে না পেরে বোধ হয় পাছাতে এই মুহূর্তে লাথি বসিয়ে দেবে। সে উঠে দাঁড়াল। চোখ লাল করে বড় টিন্ডালকে দেখল।

সঙ্গে সঙ্গে সুমনও উঠে গেল। হাত ধরে বলল, এই তুই না খেয়ে যাচ্ছিস কোথায়?

—কোথাও যাচ্ছি না। হাত ছেড়ে দে।

—খেয়ে যা। তোর ভাত নিয়ে কে বসে থাকবে।

—ভাত ফেলে দে। খাব না।

—কী ছেলেমানুষী করছিস সামাদ। বলে সুমন জোর করে ওকে টেনে আনতে চাইল।

—হাত ছাড় বলছি।

—না হাত ছাড়ব না। না খেলে ছাড়ব না।

—ছাড়বি না, বলে সে এমন জোরে ঠেলে দিল সুমনকে যে সে গিয়ে টিন্ডালের ঘাড়ে পড়ল। মাথাটা দেয়ালে ঠেকতেই রক্তপাত হল। সকলে ছুটোছুটি করে মেসরুমে যেতেই দেখল, সুচারু সুমনকে ফোকসালে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। বরফ দিচ্ছে এবং এই দুপুরে দুঃসহ গরমের ভিতর পিছিলে কোলাহল পড়ে গেল। সুচারু এবং অন্য নাবিকেরা ভেবে পেল না—কেন সামাদ এমন সব গোঁয়ার্তুমি করছে। মারধোর করছে। সারেঙ পর্যন্ত চিৎকার করে উঠল, এর একটা বিহিত করতেই হবে। সে ছুটে নিচে সুমনের ফোকসালে ঢুকে বলল, কী হয়েছে বল। কাপ্তানকে আমি নালিশ দেব।

সুচারু বলল, কিছু হয়নি সারেঙ সাব।

সুমন বলল, সামান্য কেটে গেছে। জোর করতে গেছিলাম, ওর সঙ্গে আমি পারি!

ডংকীম্যান নিচে নেমে বলল, সারেঙ সাব যদি এর বিচার আপনি না করেন তবে আপনাকে আমরা কিন্তু ছাড়ব না।

সুচারু লাফ দিয়ে বাংক থেকে নেমে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, কার বিচার করবে মিএগা। যাও বলছি এখান থেকে। বলে সে দরজা বন্ধ করে দিল।

তবু লোকগুলি যাচ্ছিল না। দরজায় ওরা ভিড় বাড়াচ্ছে। খবর এ-ভাবে চাপা দিতে চাইলে কাপ্তানেব ঘরে পৌঁছতে সময় বেশি নেবে না। সুচারু তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বলল, সারেঙ সাব আপনি ওদের যেতে বলুন। বেশি লাগেনি। একটু কেটে গেছে। বরফ দিতেই রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে।

—এই দ্যাখুন। বলে সুমন উঠে এসে মাথাটা দেখাল সারেঙ সাবকে।—এবার আপনারা যান।

ওরা চলে গেল। সামাদ চুপচাপ বসেছিল একপাশে। এই ব্যবহারের জন্য সে সংকোচবোধ করছিল। ভিতরে কী যেন এক গ্লানি অথবা উত্তেজনা অথবা এমনও হতে পারে শরীরের ভিতর সেই রোষের অগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলছে। নিয়ত জ্বলছে। সালিমার কোমল মুখ এবং অসহায় চোখের সুষমাটুকু স্মৃতির ভিতর ভেসে উঠলেই সে যেন কেন পাগলের মতো হয়ে যায়। এই বড় টিন্ডাল রহমান খেতে বসে ওকে নানাভাবে অপমান করার বাসনাতে উঠে পড়ে লেগেছিল। সে ওর পাছাতে

লাথি মারার জন্য উঠেছিল—অথবা সে যে কী করতে উঠে গেল খাবার ফেলে এখন এ মুহূর্তে বুঝতে পারল না। সে চোখ মুখ বুজে বাংকে পড়ে থাকতে চাইলে সুমন কাছে এসে দাঁড়াল।

—যা এবারে উপরে উঠে খেয়ে নে। যেভাবে ধাক্কা মেরেছিলি আমি কিন্তু খতম হয়ে যেতে পারতাম।

সামাদ কোন কথা বলল না। ফ্যাল ফ্যাল করে নির্বোধের মতো তাকিয়ে থাকল। সুচারু খাবার উপর থেকে নিয়ে এল এবং খেতে দিলে সে চুপচাপ খেতে খেতে অঝোরে কাঁদতে থাকল। সুচারু এবং সুমন কিছুতেই বুঝতে পারছে না—সামাদ এখন খেতে খেতে ছেলেমানুষের মতো কাঁদছে কেন?

সুচারু বলল, যা, খেতে বসে কেউ কাঁদে নাকি?

সুমন বলল, তুই কেন কাঁদছিস বল্‌তো!

সামাদ উঠে গেল। পোর্টহোল খুলে নদীর জল দেখতে থাকল। ওর বুকটা কতক হালকা যেন। সে বলল, কবে আমার চিঠি আসবে সুমন?

—দেখিস তোর বিবির চিঠি আমরা এ-বন্দরেই পাব।

বস্তুত সুমন এবং সুচারু শুধু এইটুকু আশ্বাসই দিতে পারে। বড় টিন্ডালের সঙ্গে এখন যেভাবে বিবাদ চরমে উঠছে, ক্রমশ যে ভাবে সামাদ মরিয়া হয়ে উঠছে সময় সময় অথবা কেমন যেন এক হিংসা এবং জ্বালা উভয়ে উভয়ের প্রতি গড়ে তুলছে৷ ভিতরে ওদের কী এক রহস্য লুকিয়ে আছে, সেই সফরের প্রথম দিন থেকে মনে হয় বড় টিন্ডাল সামাদের সাত রাজার ধন এক মাণিক্য লুকিয়ে রেখেছে—দিচ্ছে না, অথবা চুরি করে নিয়েছে সব। সুচারু সারেঙসাবকে ডেকে বলল, বড় টিন্ডালকে সামলাবেন। আমার মনে হচ্ছে, বড় টিন্ডাল আগুন নিয়ে খেলা করছে।

—জানি না বাবু! তোমরা যা খুশি কর!

সুমনের আঘাত খুব যে সামান্য ছিল তা নয়। চোয়ালে লেগেছে। চোয়ালের নিচটা ফুলে উঠেছে। সে বসে বসে বরফ লাগাচ্ছে এখন। তারপর সব বরফটুকু জল হয়ে গেলে সামাদ এসে সুমনের সামনে দাঁড়াল। বলল, আমি পাগল হয়ে যাব সুমন।

—পাগল আর হতে হবে না। এখন লক্ষ্মী ছেলেটির মতো শুয়ে থাক। ডেক-সারেঙকে বলে ছুটি করিয়ে নিচ্ছি। সুমন এবং সুচারু বের হয়ে যেতে চাইলে সামাদ বলল, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যাস। বলে সে বালিশে হেলান দিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকল। সামাদ কেন রেগে যাচ্ছিল টিন্ডালের ওপর—কী সন্দেহ তার—কোন্ সংশয় ওকে এমন করে মাঝে মাঝে পাগল করে দিচ্ছে, সব খুলে বলতে পারলে ভাল হত। অথচ এমন এক ঘটনা যা খুলে বলা যায় না, খুলে বললে ওর সংশয়কে যদি আদৌ গুরত্ব না দেয় ওরা, যদি ভাবে, সত্যি পাগল বনে যাবে সামাদ! সংশয় এবং সন্দেহ সামাদকে পাগল করে দিচ্ছে। বড় টিন্ডালের এই বয়স, বয়সে সালিমার মতো যুবতী বিবি নিকাহ্—না, তা কি করে হয়—কিন্তু সব হয় সুমন, এই বড় টিন্ডাল সব করতে পারে। সামাদ বালিশে মুখ গুঁজে দিল এবার। তারপর ধীরে ধীরে এক গ্রাম্য ছবি চোখের উপর ভেসে উঠল—মাঠ পার হলে বড় এক অশ্বত্থগাছ। গাছের নিচে ছোট নদী। নদীতে এখন আর কত জল, বুঝি হাঁটুজল থাকে। নদীর ওপারে ঘর। কালবৈশাখী উঠলে সালিমা ওর ঘরে গোরু বাছুর নিয়ে যাবার জন্য নদী পার হয়ে—যেন ছোট নদীটি পার হচ্ছে, ছোট এক বালিকার মতো নদী পার হয়ে মাঠে যব গম ফসলের ভিতর ওর সেই গাভী সকলকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তারপর ঝড়! কী ঝড় কী ঝড়! সেই ঝড়ের ভিতর পড়ে সে পথ হারিয়ে অশ্বত্থগাছের নিচে দাঁড়িয়ে তার প্রিয় যুবকের জন্য অপেক্ষায় আছে! ঝড় থামলেই সেই যুবক নদী ধরে নৌকায় উঠে আসবে। আর মনে হল তখন দরজায় কে যেন কড়া নাড়ছে। সে নেমে দরজা খুলে দিল। বার্ট সামনে দাঁড়িয়ে। কালো মানুষ। চোখ শ্বেতপাথরের মতো সাদা। বার্ট সোজা ফোকসালে ঢুকে সুমনের বাংকে বসে পড়ল। সামাদকে বলল, কাজে যাওনি?

—শরীরটা ভাল নেই।

বার্ট ফিস ফিস করে বলল, তোমাদের জন্য একটা জিনিস এনেছি। বার্ট এমন ভাবে বলল যেন

কত গোপনীয় বস্তু সে কিনার থেকে তুলে এনেছে।

---কি এনেছ দেখি? সামাদ সেই গোপনীয় বস্তুটি দেখতে চাইল।

বার্ট এবাব হাসল। আমার মা তোমাদের দিয়েছেন। তোমাদের কথা বলতেই মা বললেন, ওরা তো কিছু ভাল মন্দ খেতে পায় না জাহাজে, তুই ওদের জন্য এটুকু নিয়ে যা।

সামাদ বলল, তোমার মাকে একদিন জাহাজে নিয়ে এস না। আমরা দেখব। আলাপ করব। তোমার মাকে খুব দেখতে ইচ্ছা হয়।

বস্তুত সামাদ এই বৃদ্ধ মহিলার অসামান্য এক ভালবাসা এবং স্নেহের স্পর্শে বড় টিন্ডালের নিষ্ঠুরতার কথা ভুলে গেল।

বার্ট বলল, মা সারারাত জেগে তোমাদের জন্য করে দিয়েছেন। বলে সে তার ব্যাগ থেকে একটা বাক্স বের করল। পদ্মফুলের মতো তিনটে ফুল। দুধ, ডিম, মাখন এবং ময়দা দিয়ে তৈরি এই তিনটে ফুলের ভিতর থেকে মিষ্টি গন্ধ উঠছিল। ছোট একটা প্যাকেট, প্যাকেটের ভিতর গ্রীন পিজ সিদ্ধ এবং আরকে রাখা ভেড়ার মাংস। তারপর ক্যাবেজ এবং ফুল কপির সিঙারা প্রায় দেখতে এক রকমের খাবার। মনে হল সামাদের, স্পর্শ করলে টের পাওয়া যাবে বার্টএবং তার মা কত যত্ন নিয়ে এ-সব করে দিয়েছেন।ভালবাসার স্পর্শে কি যাদু আছে কে জানে, সামাদ তার সব ক্ষোভের কথা ভুলে গেল। সে ফের বলল, আমাদের নামতে দিচ্ছে না বার্ট। নামতে পেলে ওঁর সামনে বসে একদিন খেয়ে আসা যেত।

বার্ট শেষে বের করল—সেই মদ। অবশ্য এ-মদে তত ঝাঁঝ নেই! তত কড়া নয়। তত মাতাল করবে না। সে তার মাকে এইসব সরল অকপট নাবিকদের গল্প করার সময় মদ খাওয়ার গল্প করেছে। সুতরাং তিনি তাদের জন্য কম ঝাঁঝের, কম কড়া হবে এবং তেমন মাতাল করবে না—তেমন মদ পাঠিয়েছেন। বার্ট বলল, সুমন সুচারুকে দেখছি না?

—ওরা উপরে কাজ করছে।

—তোমরা কিন্তু খাবে।

এই বার্টকে এখন দেখলে মনেই হয় না, বার্ট হৈ-চৈ প্রিয় মানুষ। বার্ট বেশ হাত পা ছড়িয়ে বসল। বলল, সুমনকে খুব ঝেড়েছ শুনেছি।

সামাদ সংকোচ বোধ করছিল কথার জবাব দিতে, সে চুপ করে থাকল। বার্ট সামাদের এই সংকোচটুকু দূব করে দেবার জন্য বলল, আরে একসঙ্গে থাকলে এসব হয়।

—তুমি বস। তোমার জন্য আমি একটু চা করে আনছি। দু'লাফে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে গেল সামাদ। কিছু জাহাজী ওকে এড়িয়ে চলছে। সে আদৌ ভ্রূক্ষেপ করল না। যেন বার্ট এসে ওর যা সামান্য-গ্লানি ছিল সব দূর করে দিয়েছে। সে চা করে ফিরে এসে দেখল সুচারু বার্টের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে। সুমন স্নান সেবে ফেলেছে ইতিমধ্যে। সে সাজগোজ করছিল। সে একটা কেক খাচ্ছিল। ওর সবুর সইছিল না। কারণ জেটির ও-পাশে বড রাস্তায় মারিয়ার গাড়ি ওর জন্য অপেক্ষা করছে। সে সাজগোজ করার সময় শিস দিচ্ছিল। হেনরী তাড়া দিচ্ছে। সে মেসরুম বয়কে দুবার পাঠিয়ে খোঁজ নিয়েছে আর কত দেরি সুমনের।

বার্ট বলল, কী ব্যাপার। তুমি যাচ্ছ কোথায়?

সুমন সব খুলে বলল না। সামাদ এবং সুচারু পর্যন্ত বিরক্ত বোধ করল, বার্ট জানে ওদের নামা বারণ। বার্ট জানত সুমন ইন্ডিয়ান—সে যতই সুপুরুষ হোক, জাত এবং অঞ্চলের জন্য সে প্রায় নিগ্রোদের সামিল। সুতরাং সকলেই প্রায় নির্বাক থাকলে সুমন জবাব দিল, যাচ্ছি হেনরীর কেবিনে।

—হেনরী।

—আমাদের জাহাজের চার নম্বর মিস্ত্রী।

—সেখানে কিনার থেকে ওর আত্মীয়-স্বজন উঠে আসার কথা আছে। সুমন সব খুলে বলতে চাইল না।

সুচারু বলল, ফুটফুটে মেয়ে আসবে। আমাদের সে মেয়ে ফুলের মতো। নাম মারিয়া, মারিয়া ট্যালডন।

—ট্যালডন! ওফ! এন আগলী ফ্যামিলি! হরিবল! এন আগলী গার্ল!

সামাদ বলল, তুমি কী বলছ বুঝতে পারছি না বার্ট। খুব সুন্দর মেয়ে। গোলাপ ফুল দেখেছ, তাজা গোলাপ। শিশিরে ফোটা নয়। বেশ বসন্তের দিনে ফোটা—তেমন দেখতে মারিয়া।

এই ছোট্ট শহরে ট্যালডন পরিবার নিগ্রোদের কাছে সেই এক রেটল্ সাপের মতো ভয়ঙ্কর। সুতরাং বার্ট বলল—ওরা কি নৃশংস তোমরা জান না।

সামাদ বলল, কেন ওরা কী করল?

বার্ট কী ভাবল। সে একটা চুরুট টানছিল। সে সেই চুরুটের ছাই পোর্টহোলে ঝেড়ে এসে বসল। বলল, ভারোদী ট্যালডন এখানকার ন্যাশনেল স্টেট্স রাইট পার্টির সর্বময় কর্ত্রী। ওর স্বামী লিবারেল ছিল বলে তকে পর্যন্ত ক্ষমা করেনি।

—কী বলছ! সুচারু প্রায় আঁৎকে ওঠার মতো বলল।

—এরা এ-অঞ্চলের বনেদী পরিবার। আমরা একদিন শুনলাম মিস্টার ট্যালডন মারা গেছেন। তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে গুজব ছড়ানো হল।

—আত্মহত্যাও হতে পারে।

--আরে না, আগের দিন তিনি আমাদের কিঙের সঙ্গে পদযাত্রায় বের হয়েছেন। পরদিন এ-কাণ্ড। বার্ট এবার আপনজনের মতো সুমনকে সাবধান হতে বলল।...তুমি সাবধানে থাকবে! বেশি মেলামেশা করবে না। তারপর কেমন শক্ত হয়ে গেল বলতে বলতে, ওদের শুধু আমরা ঘৃণা করতে পারি সুমন। তোমার যাওয়াটা আমার কেন জানি ভাল লাগছে না।, এদের যা কাণ্ড! ইচ্ছা করলে জাহাজেই তোমাকে গুম করে দিতে পারে।

সুমন বলল, আমরা আর এখানে ক'দিন মাত্র। তারপর বার্ট আমরা অন্য কোথাও চলে যাব। অন্য কোনও বন্দরে। পথে শুধু সমুদ্র, কোনও কোনও সময় দ্বীপ এবং নারকেলগাছ। আর আমাদের এই নিঃসঙ্গ জাহাজ, সে যে কি নিঃসঙ্গতা বুঝবে না বার্ট। আমি, সুচারু, সামাদ তখন অনর্থক এই ফোকসালে বচসা করব। পাগলের মতো অপেক্ষা করব তীরের জন্য। মানুষের মুখ দেখার জন্য রাতদিন ছটফট করব। তাবপর বলার ইচ্ছা যেন—আমাদের এই মারিয়া সুতরাং বন্দরে প্রায় পদ্মফুলের মতো। সেই রাজপুত্রের গল্প মনে পড়ে গেল। দিন যায় মাস যায়! শুধু মরুভূমি। না জল, না আলো এবং বাতাস। এবার রাজপুত্র বুঝি মরে যাবে—কোথাও কিছু নেই। না ফুল ফল, না পাখি! শুধু এক দীঘি সামনে। মাঝে এক পদ্মফুল। রাত হলে পদ্মফুলের পাপড়ি খুলে যায়। সুন্দরী এক রাজকন্যার মুখ সেই ফুলের ভিতর! সেই ফুল ফোটার অপেক্ষাতে রাজপুত্র সব ক্ষুধা তৃষ্ণাব কথা মরুভূমির কথা ভুলে তীরে বসে থাক। সুমন এখন সেই রাজপুত্রের মতো। সব ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা ভুলে ফুল ফোটার অপেক্ষাতে বসে আছে। সে বার্টের হাত চেপে বলল, মারিয়া বড় ভাল মেয়ে বার্ট। সে আমার তোমার মতো অকপট, সরল। কথা বললে, তুমি তাকে না ভালবেসে পারতে না।

—ওরা আমাদের বড্ড ঘৃণা করে সুমন। ওরা কালো মানুষের শত্রু।

সুমন বলল, আমি জানি বার্ট।

—ওরাই তোমাদের বন্দরে নামতে দিচ্ছে না।

--জানি বার্ট।

—তোমরা গান্ধী পিপ্‌ল। তোমরা হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে পার। বার্ট ক্রমশ বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল। সে বলল, আমার স্ত্রী আমাকে সব বলেছেন। তোমার দেশের কথা তাঁর মুখেই প্রথম শুনি। তিনি আমাকে তোমাদের মহাত্মার কথাও বলেছেন। তারপর সে চুরুটটা ফেলে দিয়ে বলল, তোমার আত্মসম্মানে বাঁধছে না ওদের সঙ্গে মেলামেশা করতে!

সুমন চুপ করে থাকল সামান্য সময়। ওর সত্যি ভাল লাগছিল না। বার্টের উপব সে কেমন বিরক্ত বোধ করছিল। তবু বার্ট যখন আপনজনের মতো কথা বলে তখন যেন না শুনে না মান্য করে থাকা যায় না। বার্ট বালকেডে হেলান দিয়ে এখন সুমনের মুখ দেখছে। ঘর অন্ধকার। কারণ সূর্য নেমে গেছে নদীর ওপারে। বার্চ গাছ এবং পপলারের গাঢ় নির্জনতা পোর্টহোলের ভিতরেও যেন ছায়া ফেলেছে।

ফোকসালের ভিতরটা ক্রমে অন্ধকার হয়ে এলে আলো জ্বেলে দেওয়া হল। বার্ট সুমনের অসহায় মুখ দেখে- -মানুষের নারীজাতির জন্য এক আকর্ষণ—ওর স্ত্রী কোথায় এবং কতদূরে সে যেন এখন বলতে পারে না; কিঙের সঙ্গে কোথায় চলে যাচ্ছে সে জানে না—সে কেমন একা এবং নিঃসঙ্গ, সারাদিন কাজের পর ঘরে ফিরলে একমাত্র স্ত্রীর ছবি সম্বল থাকে—সে, সে-ছবির ভিতর ডুবে থাকে, নদীর শান্ত নির্জনে অন্ধকারে সে একা একা হেঁটে বেড়ায়; সুমনকে দেখে তার সেই নির্জনতার কথা মনে পড়ল। ভিতরে বুঝি সেই কষ্টটা কাজ করছে সুমনের—মানুষের শুধু স্ত্রীজাতির জন্য এক আকর্ষণ, সে বলল, আলাপ কী করে?

—হেনরীর ঘরে ভারেন্দী এসেছিলেন। সঙ্গে ও এসেছিল। যেমন সন্তান পিতাকে কৈফিয়ৎ দেয় সুমনের কথাবার্তার ভঙ্গিতে তেমন একটা ভাব ছিল।—যাও, বার্ট যেন পিতৃসুলভ আদেশে কথাটা বলল।—কিন্তু সাবধানে বাছা, ওরা যেমন কালো মানুষ ঘৃণা করে তেমনি শুনেছি সুন্দর মানুষের মাথা পেলে চিবিয়ে খায়। বলে এমন জোরে হাসতে থাকল বার্ট যে ওরা সকলেই বিস্মিত। কেমন পাগলের মতো হাসতে থাকল বার্ট। ওরা দেখল বার্টের অসহায় মুখে কি এক করুণ যন্ত্রণা ক্ষণে ক্ষণে ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। শত বর্ষের অসম্মান, অপমান এবং অবমাননা জাতি সম্পর্কে, দেশ সম্পর্কে এবং মানুষ সম্পর্কে ভয়ঙ্কর এক অবিশ্বাস গাঁথা হয়ে গেছে। সে, ভাল কিছু থাকতে পারে এইসব শ্বেতকায় মানুষদের ভিতর কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না। ঘৃণা, উৎকট বিদ্বেষ এবং শত্রুর মতো আচরণ—সেই এক সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি। মনে মনে সাহস সঞ্চয় করার সময় সুমন দেখল, দরজায় হেনরী উঁকি দিচ্ছে। বলছে, এই ওজালিও মারিয়া এসে বসে আছে। জলদি জলদি। যত দ্রুত এসেছিল হেনরী, ঠিক তত দ্রুত সে উপরে উঠে গেল। আর সুমন হেনরীর লেজ ধরে গাছ থেকে গাছে লাফ দেবার মতো দু-লাফে ডেক পার হয়ে হেনরীর কেবিনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সবই নিদারুণ তৃষ্ণার মতো।

সুমন হেনরীর কেবিনে ঢুকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। মারিয়ার পাশে বসে প্রথম রুমালে মুখ মুছে কী দেখল ঘরের ভিতর, তারপর বলল, কতক্ষণ!

মারিয়া মুখোমুখি বসে। কী ভাবল, তারপর বলল, অনেকক্ষণ।

—আমার একটু দেরি হয়ে গেল।

—তোমার দেরি দেখে হেনরীকে বললাম, চল ওজালিওর কেবিনে গিয়ে বসি।

সুমন তাড়াতাড়ি ঢোক গিলে বলল, গেলে কোথায়?

—হেনরী যে ভয় দেখাল।

সুমন স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করল।—ভয়! কিসের ভয়!

হেনরী বাধা দিল কথায়।—ওজালিও তুমি মারাত্মক কথা বলছ।

মারিয়া বলল, ভয় আছে। কী বল হেনরী?

হেনরীর তর সইছে না। তাড়াতাড়ি জাহাজ থেকে নেমে বন্দরের পথে হাঁটতে চায়। সে বলল, পথে সব শোনা যাবে। বলে হেনরী দেরি করল না। দরজা বন্ধ করে গ্যাঙওয়েতে নেমে গেল। তারপর জেটি। বড় বড় ক্রেন। ওরা ক্রেনের নিচ দিয়ে হাঁটতে থাকল।

—কেবিনটা হেনরীর পাশে নিলে না কেন? মারিয়া হাঁটতে হাঁটতে সুমনকে প্রশ্ন করল।

—কিছু অসুবিধা ছিল মারিয়া।

- -অসুবিধা কেন?

সুমন কি জবাব দেবে ভেবে পাচ্ছিল না; সে ধরা পড়ার ভয়ে কেমন আমতা আমতা করতে থাকল। এবং হেনরী এ সময় সুচতুর নাবিকদের মতো ফের গল্প আরম্ভ করে দিল। বলল, ও হতভাগার কথা আর বলবে না। জাহাজে উঠেই পিছিলে নিরিবিলি একটা কেবিন বেছে নিলে। কত বললাম, কলকাতা থেকে যখন সব ইন্ডিয়ানরা উঠবে তখন বুঝবে ঠেলা। বাবু তখন বললেন, দেখা যাবে। দ্যাখো এখন। কি মজা বোঝো।

—আমার তো ভালই লাগছে। সুমন হেনরীর চেয়ে চতুর হবার চেষ্টা করল। বলল, চলে তো যাচ্ছে। ওরা কিন্তু খুব ভাল লোক মারিয়া। কি বল হেনরী। সুমন হেনরীর দিকে চোখ টিপে হাসল।

—তা ঠিক।

—আমাদের ইন্ডিয়ানদের মতো? মারিয়া হাতের দাস্তানাটা ভাল করে টেনে দিল।

পশ্চিম দিকের বড় গুদাম ঘরটা পার হলে সুমন বলল, কালো মানুষের ভয়ে বুঝি আমার কেবিনে গেলে না!

—হেনরী যে বলল তোমার চারপাশে সব ব্ল্যাক পিপল।

—ওরা কিন্তু ঠিক ব্ল্যাক নয়। ওদের রং বাদামী, উইচ্‌ককের পথে উঠে যাবার মুখে মারিয়াকে ভুল শুধরে দেবার চেষ্টা করল!

মারিয়া বলল, ঐ একই কথা।

—ব্ল্যাকদের ভয় পাও কেন বুঝি না। ওদের ঘৃণা করারই বা কি আছে। আমরা মানুষ, ওরাও মানুষ। সুমনের অন্তর থেকে কথাটা উঠে এল।

—কে বলেছে ভয় নেই ওজালিও। হেনরী প্রায় বিশ্বাসভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত করতে চাইল সুমনকে।

সুমন সরল অকপট মানুষ। সে বুঝতে না পেরে ক্ষেপে গেল, কিসের ভয় হেনরী! এত ভাল লোক হয়! এমন সরল অকপট মানুষ তুমি পাবে, বলতে বলতে সুমনের চোখ মুখ রাগে কুঁচকে যাচ্ছিল।

হেনরী তাড়াতাড়ি চোখ টিপে দিল।—ওজালিও তুমি একটা আহাম্মক। যা তুমি জান না, আর জানবেই বা কি করে! মাত্র প্রথম সফর দিচ্ছ ওদের সঙ্গে। ওরা কি ভয়ঙ্কর আমি জানি। হেনরী চোখে মুখে এমন এক কদর্থ ফুটিয়ে তুলল যে, মারিয়ার সরল চোখে প্রায় কান্না জমে উঠেছে!

মারিযা বলল, লক্ষ্মী ওজালিও—তুমি কাল থেকে হেনরীর কেবিনে চলে এস।

হেনরী গাড়ির ভিতর ঢুকে বসতে বসতে বলল, ওজালিওকে কিন্তু ওরা খুব ভালবাসে মারিয়া। খুব ভালবাসে—আমি তো দেখেছি। ভালমন্দ সব ওকে দিয়ে তবে খায়।

সুমন দেখল গুড়ুই স্টিয়ারিঙে বসে আছে চুপচাপ। হেনরী গুড়ুইর পাশে বসে গেছে। সে মারিয়াকে নিয়ে পেছনের সিটে বসল। গুড়ুইকে দেখে যে সামান্য ভয়টুকু জন্মেছিল, পিছনে মারিযার পাশে বসে সে ভযটুকু ভোলার চেষ্টা করল।

মারিয়া বলল, ওরা খুব ভালবাসে?

—খুব খুব।

—আমি কত বলেছি ওজালিও, তুমি থেকো না ওদের সঙ্গে। আমার পাশের কেবিনটা কাপ্তানকে বলে ঠিক করে দিচ্ছি। তুমি চলে এস। কিন্তু ছোড়া কিছুতেই আসবে না।

মারিয়া সুমনেব হাত চেপে ধরল, ওজালিও বল তুমি আসবে!

হেনরী যেন নিজেব সঙ্গে কথা বলছে। ও আর আসছে!

—কেন আসবে না? মারিয়া হেনরীর কাঁধের উপর ঝুঁকে কারণটা জানতে চাইল।

—ব্ল্যাক ইন্ডিয়ানগুলো শুধু ওকে ভালবাসে না, হতভাগাটাও ওদের ভালবেসে ফেলেছে।

—ওটা কিন্তু ঠিক নয় ওজালিও। মারিয়া কেমন মুখ গোমড়া করে ফেলল।

—তুমিই বলো ওটা ঠিক! হেনরী কপট ভঙ্গিতে চোখ মুখ কুঁচকে ফেলল।

সুমন কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। হেনরীর এইসব কপট উক্তি সুমনকে খুব বিব্রত করছে এবং মাঝে মাঝে সে আন্তরিক ভাবে কালো মানুষের স্বপক্ষে বলার সময় দেখছিল, মারিয়ার বড় বড় চোখ আরও বড় হয়ে যাচ্ছে।

মারিয়া সুমনকে ভয় দেখানোর জন্য বলল, দাঁড়াও মাকে বলছি।

—এই নাও! হয়ে গেল। সুমন ভয়ে টেঁসে গেল।

মারিয়া সোজা হয়ে বসল এবার। এ-সময়ে সুমনের মনে হল মারিয়া আর কিশোরী নয়, যুবতী। মারিয়া চোখ টান টান করে কথা বলছে।—তবে বল, চলে আসবে হেনরীর কেবিনে।

হেনরী এবার সব গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে ভেবে বলল, আরে না না, ও ওখানেই থাকুক। ওকে আমরা জোর করে আমাদের কাছে নিয়ে আসতে চাইলে, জাহাজে বিদ্রোহ দেখা দেবে।

—ওঃ! যেন কত বুঝে ফেলেছে মারিয়া। সে এবার সুমনের দিকে সামান্য চোখ তুলে তাকাল। যেন ওই সুম্যান দা ওজালিও সার্কাস খেলোয়াড়। চারিদিকে সব বন্য জীব। সিংহ, বাঘের খেলা। ওপোসাম দুটো একটা আছে। সুমন সব বন্য জন্তু নিয়ে রিঙের ভেতর খেলা করছে। ওর বিস্ময় ক্রমশ বাড়ছিল ওজালিও সম্পর্কে। যেন মন্ত্র পড়ে সব বন্য জীবদের সে পোষ মানিয়ে রেখেছে। কালো মানুষেরা প্রায় দানবের মতো, অথবা আরও ভয়ঙ্কর—ওজালিওকে ওরা প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসে। যত বিস্ময় বাড়ছিল তত এই তরুণ যুবকটি সম্পর্কে হৃদয়ের গভীরে স্নেহ বলা যেতে পারে অথবা মায়া মমতা এবং এক অসীম আকর্ষণ—ঠিক এক মরুভূমির জলাশয় যেন—এই যুবক মারিয়াকে ক্রমশ ভালবাসায় আবদ্ধ করে ফেলছে।

হেনরী বলল, সুমন সেখানেই ভাল আছে। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে হেনরী ফিস্ ফিস্ করে বলল, মাকে এসব আবার বলো না। তিনি শুনলে দুঃখ পাবেন।

হেনরীর কথা শুনে মারিয়া একেবারে শান্ত। সে বার বার সুমনকে দেখবে বলে চোখ তুলছিল—কিন্তু সামান্য তুলতেই ওজালিওর শান্তশিষ্ট মুখ ওকে বড় বিচলিত করছিল। ভালভাবে চোখ তুলে দেখতে পর্যন্ত বুক কাঁপছে। বেসবলের মাঠ এবং অশ্বশালার পাঁচিল পার হয়ে শহরের বড় পথ। দু-পাশে নানা রঙের ঘরবাড়ি, পারসিমন গাছের সুমিষ্ট গন্ধ এবং হ্রদের জলে লাল নীল রঙের বাতি। এখন বসন্তের উৎসব মনে হয় সর্বত্র। বসন্ত-কালীন গমের শিষ হয়ত কোথাও এখন দুলছে। বাতাসে তার গন্ধ। মাঠ নদী অতিক্রম করে সে ঘ্রাণ এখন ওদের মথিত করছে।

মারিয়া গাড়িতে বসে শুধু ভাবছিল—এই ওজালিও, যাদুকরের পালিত পুত্র ছোট্ট এমিলের মতো মানুষটি এখন ইচ্ছা করলেই ফুল ফোটাতে পারে। সে মনের ভিতর ডুবে যেতে যেতে শুনতে পেল, কোথাও কোনও আলোকউজ্জ্বল রাত্রিতে দেবদূতেরা যেন গান গাইছে। যেন এক মরুভূমির উপর দিয়ে সেই যাদুকর পুত্রের হাত ধরে হাঁটছে। পুত্র ইসাক—এব্রাহাম এক প্রাচীন নগরীর ধ্বংসস্তূপের ভিতর পুত্রকে ঈশ্বরের নামে নিবেদন করছেন। পুত্র ইসাক মৃত্যুভয়ে এতটুকু কাতর ছিল না। অপার এক সুষমামণ্ডিত মুখ ইসাকের। সেই মুখ ধারণ করে আছে যেন ওজালিও। বস্তুত ভালবাসার ফুল ফুটতে থাকলে যেমন হয়—যা কিছু সুন্দর, যা কিছু অলৌকিক এবং যা কিছু নির্মল জলের মতো স্বচ্ছ, সবই ফুল ফোটাবার জন্য। ধীরে ধীরে গোপনে ওজালিওর হাত মারিয়া কোলে নিয়ে বসে থাকল। বলার ইচ্ছে, তুমি আমাকে জড়িয়ে থাকো। তোমার উষ্ণতায় আমাকে উত্তাপ নিতে দাও। আরও কত কিছু বলার ইচ্ছা মারিয়াব। কিন্তু সে কিছুই প্রকাশ করতে পারছে না। সে কেমন অকুণ্ঠ চিত্তে চুপচাপ বসে দূরে এক সমুদ্র দেখতে পেল। সমুদ্রে সাদা জাহাজ ভেসে যাচ্ছে। তার সেই দেবদূত ডেকে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে। এক অলৌকিক হাত। সেই অলৌকিক হাতের স্পর্শ মানুষের জন্য বুঝি শুধু ভালবাসা বহন করে এনেছে। কিন্তু সমুদ্রে সেই জাহাজ মনের আয়নায় বেশিক্ষণ দেখতে পেল না মারিয়া। জাহাজ ক্রমে হারিয়ে গেল। শুধু পোর্টহোলে তখন তার বাঞ্ছিত মুখ। তারপর ক্রমে সেই মুখও হারিয়ে গেল। শুধু দুই চোখ। দুই চোখে টুপটাপ শিশিরের মতো অশ্রুপাত। মারিয়া অবলম্বনের জন্য সুমনের হাত অজ্ঞাতেই জোরে চেপে ধরল। আর তখন দেখল সামনে সেই দুর্গের মতো বাড়ি। বাড়ির সদর দরজা খুলে যাচ্ছে। বড় কালো রঙের গাড়িতে দুজন নাবিক। সদরে আজ বড় বড় লণ্ঠন দুলছে। লনে কত সব গাড়ি এবং কত সব বিচিত্র পোশাকে যুবক-যুবতীরা হেঁটে বেড়াচ্ছে। চপল এবং কপট উচ্ছ্বাস সকলের ভিতর। সকলে নাচের শুরুতেই মদ খেতে আরম্ভ করেছে।

॥ তেরো ॥

সামাদ ওপরের বাংকে শুয়ে শুয়ে পা নাড়ছিল। নিচে সুচারু ঘুমোচ্ছে। এবং ফোকসালে আলো জ্বলছিল। সুমনের ফিরতে দেরি হবে, কারণ সে বন্দরে নেমে গেছে। সামাদেব এখন সাত-পাঁচ চিন্তা—ওর ঘুম আসছিল না। ওর কেবল সালিমার কথা মনে পড়ছে। ভিতরে ভিতরে এক অহরহ আগুন সামাদেব। কী যেন সে ফেলে এসেছে, সফর শেষে বাড়ি ফিরে সেই পদ্মফুলের মতো মুখের রঙ আর বুঝি ভেসে উঠবে না। সামাদের চোখ জ্বলছে। সে রাগে ফুঁসছে। অথবা মনের ভিতর বেশি ডুবে গেলে সব প্রায় আরশির মতো। সে দেখতে পায় সালিমা রুপোর মল পায়ে পুকুরে ডুব দিয়ে ফিরছে। দেখতে পায়, পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে গাছেব নিচে। অথচ কী আশ্চর্য, আজ সালিমর মুখ কিছুতেই মনে করতে পারছে না। সালিমা কুয়াশার মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। সে চিৎকার করতে যাচ্ছিল, সালিমা আমাকে ফেলে তুই কোথায় যাবি।

এ-ভাবেই সব হয়ে যাচ্ছিল। বন্দরের পর বন্দর এসেছে আর সামাদের প্রতীক্ষার সময় বেড়েছে। কার চিঠি এল, কে চিঠি দিল! চিঠি! সারেঙ সাব এক এক করে সব চিঠি বিলি করে দিচ্ছে, বন্দরে কেবল দেশ থেকে তার চিঠি নেই। সে চিৎকার করে দু-হাত তুলে বলতে চাইত, সালিমা তুই কি এখন মাঠেব ভিতর একা ফসল তুলছিস। অথচ বলতে পারত না—ওর গলা ধরে আসত। কাবণ যত দিন যাচ্ছে তত সংশয় বাড়ছে, তত বড় টিন্ডালের ষড়যন্ত্রের ফলে সে যেন হাসফাঁস কবছে। এই বড় টিন্ডাল ছলচাতুরী করে একটা সাদা কাগজ ওর কাছ থেকে হাতিয়েছে, তখন কি ভাল মানুষ টিন্ডাল। এখন মনে হয় এই শয়তান ইবলিশের গলা টিপে দিলে কেমন হয়! সে ক্ষণে ক্ষণে ডেকের উপব চিৎকার করে উঠত—তোমার কি কোনও ইমান নাই। বল টিন্ডাল।

ক্রমে কত বন্দর পার করে জাহাজ আমেরিকার উপকূলে চলে এল। অথচ দেশ থেকে চিঠি এল না। ক্রমে সাত আট মাস কেটে গেল। না চিঠি, না ভালোমন্দ কোনও খবর। এই সফরে বড় টিন্ডাল, গাঁয়ের মাতব্বর মানুষ বড় টিন্ডাল, ওর সঙ্গে সফর দিচ্ছে। শিপিং অফিসে মাস্তার দেবার আগে ওয়াটগঞ্জের লাথিতে দেখা—রহমান গাঁয়ের লোক, সামাদ লাথিতে রহমানকে কার্যকারণে আল্লার সামিল ভেবে ফেলেছিল। এমন শয়তান মানুষটা—সফবে সফরে যার সাদি আর তালাকের ঘটা—সে প্রায়, সামাদের সঙ্গে বাপের মতো ব্যবহার করতে লাগল। তখন সুখে দুঃখে রহমান, অসুখে বিসুখে রহমান, প্রায় যেন যথার্থই আল্লাহ রহমানে রহিম। অসুখে রহমান, বিসুখে রহমান—টাকা লাগে তোমার মিঞা, কত লাগে? লাগে লাও। বিদেশে বিভুঁয়ে অসুখে পড়ে থাকবে—কিছু হলে দেশের লোককে মুখ দেখামু কী করে! বহমান যথার্থই সামাদের কঠিন অসুখে বড় রকমের সাহায্য করে বসল।

সামাদ বলল, এত টাকা মিঞা শোধ দেব কী করে।

—আরে মিঞা, টাকা বড় না মানুষ বড়।

বড়, মানুষ। সামাদ এই ভেবে সাদা কাগজে একটা সই দিয়ে বলল, কাগজটা তোমার হুণ্ডির মতো থাকল বড় টিন্ডাল, ইদ্রিস লিখে দেবে বাকিটা। সফর শেষে শোধ দিয়ে দেব। কাগজ আমাকে ফেরত দিবা।

—আরে মিঞা, রহমান তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করল কাগজটাকে। কাগজ বড়, না মানুষের জবান বড়। তবে দিছ যখন রাইখা দেই। মিঞা তোমার তো কাঁচা বয়স। এই বয়সে মতি ঠিক থাকনের কথা না; দিছ যখন দ্যাও। যত্ন কৈরা রাইখা দেই।

সাদা কাগজে সই দিয়ে দিল সামাদ। ওর শরীর দুর্বল। গোঁয়ার-গোবিন্দ মানুষ সামাদকে এই অর্থ সাহায্য বড় অসম্মানের দায়ে ঠেলে দিয়েছিল। সাদা কাগজে টিপছাপ দিয়ে যেন বলার ইচ্ছা, মিঞা টাকা বড় না, মানুষ বড়। বস্তুত সাদা কাগজে আপাত-সম্মান রক্ষা করে ভেবেছিল, ভালো হলে ইদ্রিসকে দিয়ে কাগজটা পুরো লিখিয়ে নেবে। ওর শরীর দুর্বল এবং দুর্বলতা সেরে গেলে দু-দশজনকে সাক্ষী রেখে গোটা অক্ষরে ইদ্রিসকে দিয়ে লিখিয়ে নেবে—টাকা তোমার সফর শেষে শোধ। নয়ত দেশে গিয়ে তুমি যা মানুষ, দশজনকে ডেকে আমার জমি-জেরাতের উপর হাত বাড়াবে। চশমখোর

লোক তুমি—মিঞা তোমারে চিনতে বাকি নেই।

সামাদ আরোগ্য লাভের পর ভাবল, কাজটা ঠিক হয়নি। সাদা কাগজে সই করা ঠিক হয়নি। ইজ্জতের কথা ভেবে সে কাজটা করেছে। কিন্তু বড় কাঁচা কাজ—কি যে করে! একদিন বলল, কাগজটা দেখি রহমানসাব। কাগজটারে গোটা অক্ষরে লিখা দিই।

রহমান পেটি, বদনা এবং মায় বিছানার নিচে সর্বত্র খুঁজে বলল, কৈ যে রাখছি, এতদিন পরে কি মনে থাকে! কিবা একটারে ব কাগজ। পরে তুমি অন্য কাগজে লিখা দিয়।

কিন্তু ব্রেজিলের ভিক্টোরিয়া বন্দরে সামাদকে রহমান শাসাল—তোমার ইজ্জত নাই মিঞা। পানিতে সব ইজ্জত ডুবাইছ!

সামাদ এখন এই বাংকে শুয়ে ভিক্টোরিয়া বন্দরের সেই সেতু এবং সেতুর মুখে অন্ধ মেয়েটির মুখ মনে করতে পারল। দু-পা ফাঁক করা মেয়েটি গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে ভিক্ষা চাইত। কি যেন ছিল মেয়ের শরীরে, অথবা যা হয়, লোনা জলে; লোনা অন্ধকারে শরীরের ভিতর নিয়ত কেবল কি যেন বাজে—এই শরীর তখন নিজের মনে হয় না। রাত হলে চোখ জ্বালা করে, হাত-পা উত্তেজনাতে অধীর হতে থাকে—তখন সালিমার চোখ-মুখ আর ভাসে না—এক বুক লোনা জল পার হলে কেবল এক কালো বেড়ালের মুখ চোখের উপর ভাসতে থাকে। সে লোভে লালসায় বন্দর পার হয়ে অন্ধ ভিখারীর হাত ধরে বাতে ডুব দিতে চেয়েছিল। প্রতি রাতে ডুব দেওয়া। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা জাহাজীদের পাগল করে দেয়। সবই সময়ের আহার। সুতরাং জাহাজী মানুষের আর ভালোমন্দ বিচার! সে, দেশের মাতব্বর মানুষ বহমানের তিরস্কারকে আদৌ ভ্রূক্ষেপ করল না। আর রহমানও একটা অজুহাত পেয়ে গেল। সময়ে অসময়ে ওর চরিত্রকে কটাক্ষ করে কথা বলছে। ধর্মের দোহাই দিয়ে সামাদ যে ইবলিশ এবং দোজখের পয়দিশ, না পাক মানুষ—ইমানদার রহমান সে কথা বার বার প্রকাশ করছে। আর সেই থেকে চিঠি আসছে না। সেই থেকে সাদা কাগজটা সম্পর্কে সন্দেহ। বড় টিন্ডাল রহমান সেই থেকে—বুঝি ওর কাজ হাসিল—ফাঁক পেলেই ডংকিম্যান ইদ্রিশের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করছে। সেই থেকে মনে হচ্ছিল বড় টিন্ডাল রহমান বুড়ো বয়সে ফের সাদি-সমন্দের কথা ভাবছে। শেষ বয়সে সালিমার মুখ দেখে মাথা ঘুরে গেছে বড় টিন্ডালের। হারমাদ মানুষ, করতে পারে না হেন কাজ নেই।

দেশ থেকে রহমানের চিঠি এলে সামাদ বলত, আমার কোনও খবর আছে মিঞা?

—তোমার আবার খবর কিরে মিঞা।

—সালিমার বাপের খবর, গাঁয়ের মানুষের খবর চিঠিতে থাকে না? সালিমার খবর?

—কথা শোনো! সালিমার খবর আমারে দিব ক্যান। তোমার বিবি, তোমারে খবর না দিয়া আমারে দিব। আল্লা!

বড় টিন্ডালের মুখের ভিতর তখন সে একটা বড় গহ্বর দেখতে পেত। গহ্বরে হিজিবিজি সব কীট-পতঙ্গ। দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে সবুজ সব কীট-পতঙ্গের হাত-পা-পাখা এবং চোখের কিছু অংশ যেন কচি-কাঁচা পেলে মানুষটির খেতে বড় লোভ। সেই সব কচি-কাঁচা পতঙ্গের অংশ মাঝে মাঝে ওর চোখে সালিমার চোখ-মুখ হয়ে দেখা দিত।

সে যেন শুনতে পেত কারা ফিস ফিস করে বলছে—বড় টিন্ডাল রহমান দেনমোহরের নামে সব সম্পত্তি সালিমাকে লিখে দিতে চাইছে।

সেই এক মাঠ—সবুজ এবং প্রায় যেন শস্য-দানাতে কোমলমতি এক বালিকা, বালিকার মুখ সালিমার মতো—কোনও এক প্রলয়ঙ্করী ঝড় এসে সেই মাঠের ফসল উপড়ে ফেলেছে। ফসলের গাছ-গাছালি সব গ্রামময় মাঠময় উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। ওর মনে হচ্ছিল ওগুলো ফসলের অংশ নয়, যেন সালিমাকে পাশবিক অত্যাচারে হত্যা করে, গ্রামময় মাঠময় উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কোথাও চুল, কোথাও ছিন্নভিন্ন হাত পা চোখ। ধূর্ত ঝড়টা ঝোপের আড়ালে বসে বসে হাসছিল। রহমানের চোখেমুখে সেই ধূর্ত হাসি দেখে সে কেমন আঁতকে উঠত।

সে আর বাংকে শুয়ে থাকতে পারত না। সে ধড়ফড় করে বাংকে উঠে বসত। পাগল প্রায় বলে উঠত—আমার কাগজটা, সাদা কাগজটা! সে যেন তার চারপাশে হাতড়ে হাতড়ে কি খুঁজত

অনেকক্ষণ। তারপর নিমেষে চোখ বুজে বলত, আল্লা, তুই ইমানদার না হলে কি করি!

সে নেমে গেল এবার বাংক থেকে। পোর্টহোলের কাচ খুলে দিল। ভিতরে তবুও যেন কেমন হাঁসফাঁস করছে। সে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠবার সময় অলক্ষে বড় টিন্ডালের দরজায় কান পেতে থাকল—না, কিছু শোনা যাচ্ছে না। বড় নির্বিঘ্নে এবং নির্ভয়ে ঘুমোচ্ছে বড় টিন্ডাল। সালিমার বাপকে খত লিখে সব জানিয়ে দেয়—এই সামাদ এক হারমাদ মানুষ, বন্দরে বন্দরে বেশ্যা মেয়ে পেলে পাগল বনে যায়, তোমার কন্যারে কৈয় কি হারমাদ তার খসমের স্বভাব। কিন্তু দরজা থেকে মুখ তুলে আনার সময় যেন শুনতে পেল, পাক জনাবেশু। যথার্থই খত লিখছে সালিমার বাপকে। রহমানের কণ্ঠস্বর সে ভিতরে শুনতে পেল। ইদ্রিশকে দিয়ে খত লেখাচ্ছে। সামাদ খুব সন্তর্পণে পরেরটুকু শোনার জন্য কান পাতল। ওর বুক কাঁপছে। ওর মাথা কেমন পাগলের মতো লাগছে। সে চিৎকার করে বলতে পারত, খুন-খারাবি হবে মিঞা! খতে তুমি মিঞাজীকে কি লিখছ! তোমারে আমি চিনি মিঞা। সফর শেষে তুমি পরবের নিশান উড়াইবা! কিন্তু মনে হল দরজার ওপাশে সবাই চুপচাপ। না কোনও কণ্ঠস্বর. না কোনও শব্দ।

সে মুখ, দরজা থেকে তুলে আনতে পারল না। ভূতের মতো ফিস ফিস শব্দ ফোকসালের ভিতর। লাথি মেরে দরজা ভেঙে দেবার ইচ্ছা হল। সমুদ্রের জলে গলা টিপে হারিয়া করে দিলে কেমন হয়! তারপর ফের কণ্ঠস্বর—আমার শেষ বয়সের সখরে মিঞা, খোয়াব কৈতে পারো। এই বলে খত শেষ করছে বুঝি।

সামাদ চিৎকার করে উঠতে চাইল। মিঞা তোমার খোয়াব ভাইঙ্গা দিমু। কিন্তু সঙ্গোপনে সব করে যাচ্ছে বড় টিন্ডাল। ওর সংশয় বাড়ছে। সংশয়ের উপর নির্ভর করে এই সিঁড়ির মুখে চিৎকার খুব অহেতুক মনে হবে। সে চিৎকার করে কিছু বলতে পারল না। মিঞা তোমার মুখ ভাইঙ্গা দিমু, খোয়াব ভাইঙ্গা দিমু। তবে সকলে ভাববে—সামাদ পাগল, কোন কথা নাই বার্তা নাই সামাদ দরজায় লাথি মারছে। কাপ্তান তবে লগবুকে নাম তুলে ফেলবে সামাদের এবং প্রয়োজনে কাপ্তান তাকে ডেকের নিচে স্টোকহোল্ডের পাশে ভয়ঙ্কর এক অন্ধকার ঘরে নিক্ষেপ করে দিতে পারে।

সামাদ সুতবাং কিছু বলল না। সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতে থাকল। আর বিড় বিড় করে বকতে থাকল—তোমার মুখ ভেঙে দেবো মিঞা, খোয়াবে গরম পানি।

সে এখন কি করবে ভেবে পেল না। ডেকে সাদা জ্যোৎস্না। ব্রিজে কে যেন পায়চারি করছে। মাস্তুলের আলো বাতাসে দুলছে। সে দু-হাঁটু মুড়ে মাস্তুলের গুঁড়িতে মাথা গুঁজে বসে থাকল। সে এ-বন্দর পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। বিবির চিঠি যদি এ-বন্দরে না আসে তবে সামনে যে সমুদ্র পাবে সেখানে এই টিন্ডাল, বড় টিন্ডাল রহমান মিঞার লাশ সমুদ্রে ভাসাবে। মিঞার হাত থেকে সালিমাকে রক্ষা করার আর কি উপায় আছে তার!

সে দু-হাত জোড় করে রাখল প্রার্থনার মতো। কিছু পরে মাথার উপর তুলে দিল হাত দুটো। সে যেন কোনও অবলম্বন চায়। অথবা সে এখন ভয়ঙ্কর রকমের সিদ্ধান্ত মনে মনে নিয়ে ফেলেছে। বোধহয় জাহাজ সমুদ্রে নেমে যাবার আগেই একটা খুন-খারাবি হয়ে যাবে। সে পাগলের মতো নিঃসঙ্গ ডেকে আবার যেন চিৎকার করতে চাইল, আমার সাদা কাগজটা বড় টিন্ডাল।

সামাদ ভূতের মতো কার গলার স্বর শুনতে পেল। সব জাহাজীরা এখন ঘুমে আচ্ছন্ন। পাহাড়ে ঘণ্টাধ্বনি হলে দূর সমুদ্রে মাস্তুলের অগ্রভাগ থেকে জাহাজীরা যেমন বুঝতে পারে কোথাও থেকে বিপদ সঙ্কেতের মতো এই জাহাজ, মাস্তুল এবং সাদা জ্যোৎস্না আর মাস্টের আলো তাকে দুলে দুলে সঙ্কেত দিচ্ছে—শেষ বয়সের সুখ, শেষ বয়সের খোয়াব।

সে একবার ডেক-সারেঙকে বলেছিল, সারেঙসাব আমার একটা সই-করা সাদা কাগজ বড় টিন্ডাল রেখে দিয়েছে।

—কেন দিয়েছিলি! তুই দিয়েছিলি কেন!

—কিছু টাকা নিয়েছিলাম অসুখের সময়। তখন রহমানকে ভালোমানুষ ভেবে সাদা কাগজে সই দিয়ে বলেছিলাম, পরে লিখিয়ে দেব। সুমন অথবা সুচারুকে দিয়ে লিখিয়ে দেব।

—কেউ সাদা কাগজে সই দেয়।

—আমি যে সারেঙসাব ছোট হতে পারি নি। একটা গোঁয়ার মানুষ আছে আমার ভিতর, সে বলতে পারত। কিন্তু না বলে শুধু বলেছে, আহম্মক না হলে দেয়।

—কাগজ তোমার দিয়ে দেবে। বলে সে বড় টিন্ডালকে কাগজের কথা বললে, বড় টিন্ডাল উত্তরে বলত, ওটা কি আর আমার কাছে আছে! কৈ যে রাখছি। বড় টিন্ডাল ভালোমানুষের মতো তখন দু-আঙুলে জর্দা পাতা মুখে ফেলে হাঁ করে থাকত।

সারেঙ বলত, তবে তো সামাদ তোর খুব সুবিধারে। যেন সামাদের সঙ্গে সারেঙ রসিকতা করতে চাইল। বলল, ভালই হল। হারিয়ে গেলে দেনাও হারিয়ে গেল।

—আমি তো তেমন মানুষ না সাব। আমি আমার কাগজটা চাই।

কাগজটা থেকে কি ভয় থাকতে পারে, কেন আতঙ্কে আছে কাউকে খুলে বলতে পারত না। বললেই হাসাহাসি করবে, তোর কি মাথা খারাপ আছে সামাদ! সব খুলেও বলতে পারছে না সুমন কিংবা সুচারুকে। এতে সালিমা সবার কাছে খাটো হয়ে যাবে। এই সালিমা—যার নাকে নথ, কোমরে রুপোর বিছা এবং পায়ে মল—মাঠের ভিতর যখন গমগাছ থাকে, গম তুলতে যব তুলতে ফসলের খেতে কি তার হাঁকডাক, কি তার পালিয়ে বেড়ানো; অথবা পাট খেত বড় হলে সালিমা এবং সে খেতের ভিতর আগাছা বেছে দেবার সময় দুজনে হায়, প্রায় জোড়াপাখি যেন উড়ে যায়—এসব মনে হলে আরও পাগল লাগে। সে চিৎকার করে বলতে চায়—কে আছ রে মিঞা, সালিমারে বাইন্দা রাখে কে! আমার সোনামুখী বৌরে নিয়া যায় কোনে? দেশের ভাষা মনের ভিতর ভাসতে থাকে। ঠিক সালিমার দুই চোখের মতো মাঠ এবং ফসলের কথা মনে হলে ডেকের উপর দু-হাত ছুঁড়ে ছুটে ছুটে যায়। বলে, আমার সোনামুখী বৌরে নিয়া যায় কোনে!

জাহাজ তখন সমুদ্রে। ভিক্টোরিয়া বন্দর থেকে জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে। জাহাজ যাবে কার্ডিফে। আকরিক লৌহ নিয়ে জাহাজ বেশ চলছে। ক্রমশ উত্তরের দিকে জাহাজ উঠে যাচ্ছিল। নীল দরিয়া ধরে ক্রমে উত্তর থেকে দক্ষিণে, দক্ষিণ থেকে পুবে অথবা পশ্চিমে—অথচ খত নেই। সামাদের সেই থেকে আতঙ্ক। বিবির খত এল না। নিশীথে সে ডেকের উপর একা বোট-ডেকের পিছনে হামাগুঁড়ি দিয়ে এগুচ্ছিল। আটটা—বারোটা ওয়াচ শেষে বড় টিন্ডাল ডেকের উপরে উঠে আসবে; ফানেলের গুঁড়ি ধরে মুখটা বার করলেই—কারণ বড় টিন্ডাল সকলের শেষে উঠে যেতে ভালবাসে—অন্য পরীদারদের সে স্টীম এবং কয়লা বুঝিয়ে উঠতে উঠতে ওর পরীদারেরা সিঁড়ি ভেঙে ততক্ষণে ডেক পার হয়ে চলে যায়। থাকে এক শুধু বড় টিন্ডাল। সে সকলেব শেষে ওয়াচ থেকে উঠতে যাবে, কারণ কেউ নেই তখন। পিছনের আলোটা শুধু জ্বলছে। কাপ্তানের ঘরে কোন আলো ছিল না। আর ঝড় ছিল, বৃষ্টি ছিল। ঢেউ পর্বতপ্রমাণ উঠে আসছে। সামাদ হামাগুঁড়ি দিতে দিতে ফানেলের গুড়িতে চলে গিয়েছিল। সিঁড়ি থেকে মুখ তুলতেই সামাদ খপ্ করে রহমানের চুল ধরে ফেলল, মিঞাসাব তোমার মনের ইচ্ছাটা কি ইবারে কও দ্যাখি শুনি।

—আমার আবার ইচ্ছা!

সামাদ চুল আরও শক্ত করে ধরেছিল এবং টেনে বোট ডেকের উপরে তুলে এনেছিল, তা না হলে নিচে যারা স্টোকহোল্ডে কয়লা মারছে এবং ঝড়ের দরিয়াতে যারা আল্লা রহমানে রহিম বলে স্টীম ঠিক রাখার জন্য প্রাণপাত করছে, তারা শুনতে পাবে। শুনলে রক্ষা থাকবে না। সকলে ছুটে এসে সামাদকে ঘিরে ধরবে। বলবে, মিঞা পাগলামির আর জায়গা পাও না। কারণে অকারণে তুমি বড় টিন্ডালের পিছনে লেগে থাকছ। সুতরাং লোকটাকে সে ফানেলের পিছনে টেনে এনেছিল এবং বাঘ যেমন শিকার বস্তুর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে তেমনভাবে সে বড় টিন্ডালের উপর হামলে পড়েছিল। ফলে বাঘের থাবাতে প্রাণ যাবার মতো টিন্ডালের প্রাণ যায় আর কি! সে ভয়ে ভয়ে বলল, আমার ইসছা কিছু নাইরে। বুড়া হৈলে ইসছা থাকতে নাই।

সামাদ হুঙ্কার ছেড়ে বলেছিল, আমার সাদা কাগজটা বড় দরকার টিন্ডাল।

—সাদা কাগজ আমার কাজে লাগে না। ওডা আমার কাছে নাই। থাকলে দিয়া দিতাম।

সামাদ আর স্থির থাকতে পারে নি। সে টেনে টিন্ডালকে বোট-ডেকের পাশে—প্রায় যেখান থেকে ধাক্কা মারলে সমুদ্রের জলে পড়ে যাবে, কোন খোঁজ খবর পাওয়া যাবে না, রাতের আঁধারে একটা ছোট্ট মানুষ দরিয়ায় হারিয়ে যাবে, তেমন জায়গায় এনে দাঁড় করাল। তারপর খুব সন্তর্পণে শাসাল, চিৎকার দিলে পানিতে হারিয়া। শালা তোমাকে গলা টিপে মেরে ফেলব। বলে দে, কাগজটা কোথায়!

টিন্ডালের গলা শুকনো। চোখে সর্ষেফুল দেখছে। সে কোনোরকমে সামাদের প্রায় পায়ের কাছে হাত রেখে বলল, তুই, তুই বিশ্বাস কর সামাদ—যেন সামাদ তার বাপ-দাদা—চৌদ্দ পুরুষের সমান—কৈ যে রাখছি! খুঁইজ্যা পাইলেই তরে দিয়া দিমু। বলে পা বাড়াতে চেয়েছিল টিন্ডাল। কিন্তু সামাদ তেমনি প্রায় দানবের মতো দু-পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে। যেন এক হারমাদ, তার হাত থেকে প্রাণ ফিরে পাওয়া দায়।

হাঁটু কাঁপছিল, গলা কাঁপছিল বড় টিন্ডালের, আমারে যাইতে দে। আমি কসম খাই আর একবার ভালো কৈরা খুঁজমু।

সামাদ কোনও জবাব দিল না। যেমন দানবের মতো পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল, ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে থাকল। ব্রীজে তখন মেজ মালোম। তিনি ব্রীজে পায়চারি করছেন। টিন্ডাল ডেক থেকে দেখতে পাচ্ছে মেজ মালোমকে, অথচ চিৎকার করে বলতে পারছে না—আপনারা কে কোন্‌খানে আছেন, ছুইটা আসেন, আমারে হারমাদটা পানিতে হারিয়া করতে চায়। অথচ কিছুই বলতে পারছে না, কারণ তার বুকের রক্ত হিম হয়ে আসছে। অন্ধকারে সামাদের চোখ প্রায় বাঘের মতো জ্বলছিল।

টিন্ডাল এবার উপায়ান্তর না দেখে মৃত্যুভয়ে কাতরাতে থাকল। আর না পেয়ে সামাদের বুকের কাছে মুখ এনে বলল, কাল তুই আর আমি পেটি বদনা সব খুঁজমু।

সামাদের তারপর কেমন করুণা হয়েছিল মানুষটার উপর। বেঁটে শক্ত সমর্থ মানুষ, বয়স হলে কী হবে, কবজিতে টিন্ডালের প্রচণ্ড জোর, তবু এই মানুষের মৃত্যুভয়ে করুণ মুখ দেখে সে পথ ছেড়ে দিয়েছিল। আর টিন্ডালও পরদিন যথার্থ সামাদকে সঙ্গে নিয়ে সব পেটি লকার এবং বিছানা, মায় পান খাবার জর্দার ডিবার ভেতর পর্যন্ত, সেই সাদা কাগজের অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখল—কাগজ কোথাও নেই। সাদা পাতার মতো ধোওয়া তুলসীপাতা সেজে কেবল বড় টিন্ডাল বসে থাকল। সেই থেকে বড় টিন্ডাল বড় সেয়ানা। সে তখন থেকে আর একা বোট ডেকে উঠে আসে না। একা একা অন্ধকার রাতে রেলিঙে দাঁড়ালে বিচিত্র ঝড় এবং তাণ্ডব মানুষের মনে উন্মার্গগামিতা জাগায়।

বুঝি ভিতরে বড় টিন্ডাল স্বপ্ন দেখছে, সেই ঝড় এবং উন্মার্গগামিতা বড় টিন্ডালকে অসহিষ্ণু করে দিচ্ছে, কবে জাহাজ সফর শেষে দেশে ফিরবে তাই ভাবছে।

আর বন্দরে প্রায় রাতে চিঠি—পাক জনাবেষু, মিঞারে আমার শেষ বয়সের শখ, শেষ বয়সের খোয়াব—আমার ইসছা যায় একবার সদর ঘুইরা আসি। নূতন বিবির চান্দের মতো মুখখানি চোখে ভাসে। ইসছা, দশপাঁচ গাঁ তাজ্জব বনে যায়, বড় টিন্ডাল রহমান খরচ-পত্তর করেছে। আর জীবনভর যা কিছু সঞ্চয় বড় টিন্ডালের, তিলমাত্র অর্থ অপব্যয় না করে কেবল সঞ্চয়, সব তোমার কন্যার মিষ্টিমুখে স্বাদে সোয়াদে—হায় এই সোয়াদে কত প্রাণের মূল্য দেয়। তখন বড় টিন্ডাল উপুড় হয়ে পড়ে থাকে এবং আরশিব ভিতর মুখ দেখতে দেখতে তার চুলের রঙ, দাড়ির রঙ, মেহেদি করার ফের বাসনা জাগে।

এবার জাহাজ থেকে দেশে ফিরলেই দাড়ির রঙটা মেহেদী করে ফেলবে। নিমেষে বড় টিন্ডাল জাহাজে মোল্লা মৌলভি বনে গেল। নামাজের সময় ঠিক রাখল, রুপোর দাঁতকাঠি গলায় ঝোলাল—বয়সের ভারে সম্মানিত ব্যক্তি এবং সজ্জন, এমন মানুষ হয় না, শরিয়াতি ব্যাখ্যাতে মাতব্বর মানুষ—বড় টিন্ডাল যথার্থই দিলের ভিতর মহাফেজখানা খুলে ফেলল।

সামাদ সেই থেকে বাংকে অথবা ডেকের উপর শুকনো মুখে থাকত। যত মানুষটা মোল্লা মৌলভীর ভান করে ক্রমে সব জাহাজীদের হাত করছে, তত সে গলায় একটা শুকনো ভাব অনুভব করছে। গলা কাঠ কাঠ ঠেকছে। সে কিছু বলতে পারছে না। আপন মনে কেবল ফুঁসছে—দিলের ইচ্ছা ফুসমন্তরে হাওয়া কৈরা দিমু মিঞা। সে বলতে পারত, আমার পরাণের ধন, তারে লৈয়া...আমার শেষ বয়সের শখরে মিঞা, খোয়াব কৈতে পারে।...এমন খোয়াব তোমারে মিঞা পুষতে দেব না। গ্রামের অর্থবান

মানুষ বড় টিন্ডালকে এবার যথার্থই তার হত্যা করার বাসনা জাগল।

মাস্তুলের আলোটা কেন জানি দপ্ করে নিভে গেল। এখন আর কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছে না। সামাদ এবার দু-হাঁটু থেকে মুখ তুলে তাকাল। আকাশ বড় পরিচ্ছন্ন। এমন নির্মল আকাশ দেখে মনের ভিতর বড় আশা হয়। নিশ্চয়ই কোথাও ফুল ফুটবে। তকতকে আকাশে কত নক্ষত্র এবং হয়ত এখন সালিমা তার জানলায় জেগে বসে বসে মাঠের ভিতর মসজিদ এবং বড় অশ্বত্থগাছের মাথায় হাজার জোনাকি জ্বলা—এই সব দেখতে দেখতে নিশ্চয়ই তার চোখে জল এসে গেছে।

সেই কবে তার মানুষটা সফর করতে বের হয়ে গেছে, না চিঠি না ফিরে আসা। বুঝি খতে লেখা থাকে —কার খত! বড় টিন্ডাল রহমানের খত, সালিমার বাপের নামে সেই খতে লেখা থাকে, আমার শেষ বয়সের শখরে মিএগ্রা, খোয়াব কৈতে পারো। সামাদ ডেকে পায়চারি করতে থাকল।

সুচারু এবং সুমন দুই বন্ধু জাহাজে, একই ফোকসালে নিবাস, অথচ এই সংশয়ের কথা সে—লজ্জায় হতে পারে ঘৃণায় হতে পারে—প্রকাশ করতে পারছে না। চিঠি না এলে কিছু বলতে পারছে না। ভয়ে এবং বিস্ময়ে ওর দু-হাঁটু ভেঙে আসছে। সরিয়তি মতে এমন কথা চাউর হয়ে গেলেও সে বড় অসহায়।

সে সামনের একটা বীটে ফের বসে পড়ল। সে সালিমার মুখে বুদ্বুদের মতো ঘাম দেখতে পেল। সেই ঘাম বড় বড় ফোঁটা হয়ে গেল। তারপর মুক্তাবিন্দুর মতো চোখের কোণে ঝুলে থাকল। সাদা কাগজে সই, তার উপর তালাকনামা লেখা, সাক্ষী ইদ্রিশ। কে যেন তখন উচ্চস্বরে সেই তালাকনামা উচ্চারণ করে যাচ্ছে। সালিমা দলিজে বসে শুনছে আর বলছে, না, না, মিছা কথা। হারমাদ মানুষটা আমার যব গম গাছের মতো। বলতে বলতে বুঝি সালিমা অজ্ঞান হয়ে গেছে।

॥ চোদ্দ ॥

সুমনের মনে হল সে এক স্বপ্নের জগতে বিচরণ করছে। এমন উজ্জ্বল আলো ঘর বাতি, এত সমারোহ এবং চাকচিক্য জীবনে সে এই প্রথম দেখতে পেল। সেই বাঁশিয়ালা—যে ক্লারিওনেট বাজায়, যার হাতে কত হরেক রকমের লাল নীল পাথরের আংটি থাকে, সে এখন একা ডায়াসে বাঁশি বাজাচ্ছে। সুমন খাবার টেবিলে বসে এই দক্ষিণ অঞ্চলের গান বাজনা এবং বাঁশির স্বর শুনতে শুনতে দু-টুকরো নরম মাংস তুলে মুখে ফেলে দিল। সে সামান্য মদ খেল। মদ খেয়ে মাতলামি করার ইচ্ছা নেই। সে এই সমারোহের ভিতর মারিয়াকে নিয়ে যেদিকে সব পাখি এবং অন্য সব বিচিত্র গাছপালা এবং আলোতে আলোময় আবার কোথায়ও ইচ্ছামত ঘুটঘুটে অন্ধকার সৃষ্টি করা হয়েছে সেদিকে চলে যেতে চাইল। এক সময় হেনরীর নির্দেশে সুমন আহার শেষ করে সকলের সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

মারিয়ার বয়স কম বলে সে মদ স্পর্শ করতে পায়নি। নাচঘর ক্রমশ পাতলা হয়ে আসছে। মদের জন্য এবং হৈ-হুল্লোরের জন্য সকলেই এখন ক্লান্ত। কেউ কেউ বাগানের ভিতর ঢুকে পা ছড়িয়ে গল্প করতে বসেছে। যুবক-যুবতীরা মদ্যপানের পর টলছিল। অতিথিরা কেউ কেউ চলে যাচ্ছে—ভারোদী নিজে গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওদের বিদায় দিচ্ছে। সুমন এবং মারিয়া এখন পড়ার ঘরে, ওরা ছুটোছুটি করছিল। টেবিলের একপাশে মারিয়া, অন্য পাশে সুমন। মারিয়ার হাতে সেই বই—যাদুকরের পালিত পুত্রের মুখ যে বইয়ে আঁকা আছে। সুমন বলল, আমাকে দ্যাখাও মারিয়া। ছবিটা আমি দেখব।

মারিয়া ঠোঁট টিপে হাসল। বলল, না। দেখাব না। তুমি দেখলে অহঙ্কার তোমার বাড়বে।

—অহঙ্কার বাড়বে কেন?

—ছবিতে তুমি এমন সুন্দর দেখতে।

—দেখাও না লক্ষ্মীটি।

—আমার পাশে বসতে হবে।

—বসব।

—একসঙ্গে ছবিটা আমরা দেখব।

—দ্যাখাও। বলে একলাফে সুমন টেবিল পার হয়ে মারিয়াকে জড়িয়ে ধরল। তারপর বইটা কেড়ে নিয়ে বলল, এটা সঙ্গে নিয়ে চলে যাব।

—কোথায়?

—আমার দেশে।

—কী হবে নিয়ে?

—ছবি দেখলে তোমার কথা মনে পড়বে।

কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল মারিয়া। সে আর ছুটল না, লাফাল না। ওজালিওর হাত ধরে সরু লম্বা গলি পার হয়ে গেল। হ্রদের মতো জলের উপর দিয়ে মারিয়া এখন হাঁটছে। ফ্রক টেনে তুলেছে মারিয়া। সুমন নামতে পারছে না। ওর প্যান্ট তবে জলে ভিজে যাবে। সুমন হ্রদের পাড়ে পাড়ে হাঁটছে। মারিয়া জল থেকে উঠে বলল, ওজালিও তুমি এস।

—ওরা ফের হাত ধরে হাঁটতে থাকল। এদিকে আউট-হাউজ ওদের। ওরা আউট-হাউজ পার হয়ে গেল। মারিয়া সুমনের হাত ধরে ভারোদীর পাখির জগতে আজ নেমে গেল না। বাড়িটার পাঁচিলের পাশ দিয়ে হাঁটতে থাকল। কত বড় বাড়ি আর কত উঁচু দেয়াল—সুমন মুখ উঁচু করে বাড়িটা দেখল। বাড়ির এদিকটাতে তেমন আলো নেই। আবছা আবছা অন্ধকার এবং এক ধরনের লম্বা বৃক্ষ, তার জাফরিকাটা ছায়া মুখে গড়িয়ে পড়েছে। মারিয়ার মুখে কত রকমের কথা। চপল হাসি কথায় কথায়। সুমনকে অন্যমনস্ক দেখলে ওর ভাল লাগে না। সে সামনে দাঁড়িয়ে দু-হাতে সুমনকে আগলে বলল, ওজালিও আমাদের এত বড় বাড়ি; তোমার ভাল লাগছে না?

সুমন কেমন নিরুত্তাপ গলায় বলল, ভাল লাগছে।

—তোমাদের বাড়ি এমন দেখতে?

—না।

—দেয়ালে বড় বড় ছবি আছে?

—না।

ওরা কথা বলতে বলতে পুরোনো অশ্বশালার দিকে এসেছে।

সুমন বলল, না মারিয়া আমাদের বাড়ি এত বড় নয়। খুব ছোট বাড়ি, সামনে নদী আছে। ছোট ঝোপের মতো কাশবন আছে। শরৎকাল এলে রেণু রেণু কাশের ফুল উড়ে বেড়ায়। শীত পার হলে তরমুজের লতায় বালির চর সবুজ হয়ে থাকে। তরমুজ, কত তরমুজ গ্রীষ্মের দিনে। বিকেলে সব তরমুজ তুলে নিলে মনে হবে চরটা ফাঁকা। কিন্তু পরদিন ভোরে উঠে সেই বালির চরে দাঁড়ালে দেখবে—আবার সব বড় বড় তরমুজ, রাতের বেলায় কোনও পাখি, বোধ হয় উট পাখিই হবে ডিম পেড়ে রেখে গেছে। তরমুজগুলোকে তখন উট পাখির ডিমের মতো মনে হয়।

মারিয়া বলল, তুমি উটপাখি দেখেছ?

সুমন মারিয়ার দিকে তাকিয়ে কী ভাবল। তারপর গল্প বলার মতো বলে চলল, কারণ এই মারিয়া সুমনের মুখে, কারণ সুমন এক নাবিক, সারা পৃথিবীর সব বন্দরের ছবি ওর নখদর্পণে এবং এই সুমন পৃথিবীর যাবতীয় খবর নিয়ে এসেছে মারিয়া নামক এক বালিকার জন্য। সুমন বলল, আমরা একবার আফ্রিকার উপকূলে, বন্দরের নাম লরেনজুমারকুইস, কী কারণে বন্দরে আমরা মাল নামাতে পারলাম না; কী কারণে আমাদের ছুটি ছিল এখন আর তা মনে করতে পারছি না—উটপাখি ধরার জন্য আমরা জাহাজ থেকে নেমে গেলাম।

—হেনরী সঙ্গে ছিল।

—সে না থাকলে আমি কোথাও যাই না।

সে হাঁটতে হাঁটতে তার কথার ভিতর এক মরুভূমির দৃশ্য ফুটিয়া তুলল। বস্তুত এমন সব কথা বলল যাতে করে মনে হয় ওরা উভয়ে এখন সেই মরুভূমিতে উটপাখির ছদ্মবেশে, উটপাখির দলে ভিড়ে গেছে। পাখিদের অজ্ঞাতে ওরা দলে ভিড়ে গিয়ে এক-দুই করে সহস্র উটপাখি সংহার করে চলেছে।

মারিয়া বলল, এত পাখি দিয়ে কী করা হয়?

—আহার করা হয়।

—কিন্তু কি জান, আমরা দেখলাম সেই মরুভূমির পাড়ে এক মরূদ্যান। সেখানে এক ঝাঁক পাখি দাঁড়িয়ে আছে! কী ব্যাপার! ওরা এখানে দাঁড়িয়ে আছে কেন? আমরা ওদের তেড়ে গেলাম। ওরা কিন্তু নড়ল না। আমাদের মায়া হল। যাদের সঙ্গে আমরা গিয়েছিলাম—ওরা আদিবাসী, আমরা বললাম, হয়েছে, ব্যাস্ এবার চলি, উটপাখি মেরে কাজ নেই। তোমরা আমাদের বরং দুটো বাচ্চা দাও। আমরা জাহাজে পুষব।

—এনেছিলে?

—এনেছিলাম। কিন্তু কী জান, জাহাজ যখন আমাদের বুয়েনএয়ার্স গেল তখন কী শীত! বরফ পড়ছে। পাখির ছানা দুটো শীতে মরে গেল।

—মরে গেল!

—হ্যাঁ, মরে গেল। সুমন আর কথা বলছে না। হ্রদের পাড়ে মারিয়ার হাত ধরে হাঁটছে। সে জাহাজী নানা অলীক গল্পে মারিয়াকে অবাক করে দিতে চায়।

সহসা মারিয়া কী যেন মনে করে পুলকিত হয়ে উঠল—জান ওজালিও, আমাদের খামার বাড়ির পাশে ছোট একটা নদী আছে। মা বলেছেন, নদীতে একসময় সোনা পাওয়া যেত।

—তাই বুঝি!

মারিয়ার ভাল লাগল না। সুমনের স্বরে কেমন এক অবিশ্বাসের সুর ছিল।

—তুমি বিশ্বাস করছ না?

—বিশ্বাস করব না কেন? এখন পাওয়া যায় না? তুমি আমি চলে যেতাম।

—পাওয়া যায়।

—তবে চল না একদিন চলে যাই।

—সে যে অনেক পাথর। কালো কালো পাথর। পাথরের উপর দিয়ে নদীর জল চলে গেছে। ডুব দিয়ে পাথর তুলতে হয়। কপালে থাকলে একটা পাথরেই কপাল ফিরে যাবে, কপালে না থাকলে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ পাথর তুলেও কাজ দেবে না। সব ফাঁকা।

—সে কপাল কি করে পাওয়া যায়?

—গুড়ুই বলেছে, পুণ্যবান হতে হয়।

—কার মতো?

—এব্রাহামের মতো।

তারপর একসময় মারিয়া একরকম পাখির গল্প করল। ওদের দক্ষিণাঞ্চলে সেই সব পাখি পাওয়া যায়। পাখিরা ডিম প্রসবের পরে মুক্তা অন্বেষণে যায়। মারিয়া পাখিটার নাম বলতে পারল না।

সুমন বলল, কে বলতে পারবে?

—গুড়ুই বলতে পারবে। ডাকব গুড়ুইকে।

—না, ডেকে কাজ নেই।

সুমন জানে গুড়ুই এখানে কোথাও আছে। ডাকলেই গাছ-গাছালির ফাঁক থেকে উঠে আসবে।

গুড়ুইকে ডাকতে হল না। সে নিজেই কোথা থেকে বের হয়ে এল। প্রায় সব যেন বেতারে খবর পাঠানোর মতো। সুমনের তাল-বেতালের গল্প মনে পড়ল। গুড়ুই তুমি আমাদের বেতাল পঞ্চবিংশতি। সহস্র এক গল্প বলে বুঝি এই বাড়ি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। সুমন বলল, পাখির নাম কি গুড়ুই।

গুড়ুই জবাব দিল না।

মারিয়া বলল, পাখির নাম কী।

গুড়ুই মোটা গলায় কী বলল সুমন বুঝতে পারল না। সে মারিয়ার দিকে তাকাল।

—পাখির নাম সান। মারিয়া জবাব দিল।

—মুক্তো খুঁজতে যায় কেন?

—সে তার বাচ্চার জন্য।

সুমন একটু অন্ধকার আবছা জায়গায় ঢুকতেই দেখল গুডুই ফের কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। যা থাকে কপালে—এই গুডুই প্রায় গুপ্তচরের মতো অথবা নিশাচর প্রাণীর মতো ওর চারধারে থাকছে। সে আদৌ ব্যাপারটাকে আমল দিতে চাইল না। সে বলল, বাচ্চার জন্য মুক্তো খুঁজতে যায় সে তো ভারি আশ্চর্য।

—মুক্তো না হলে চলে না। বাচ্চার চোখ ফুটানো দায়। পাখি তার বাচ্চার জন্য মুক্তো খুঁজে নিয়ে আসে।

—তারপর?

—তারপর পাখি সেই মুক্তো ঠোঁটে নিয়ে বসে থাকে। জল না হলে কাজ হয় না। বৃষ্টির জল চাই। ঠোঁটে মুক্তো পাখির—মেঘের আশায় আকাশের দিকে চোখ পাখির—বৃষ্টি হলে জল বাচ্চার চোখে পড়বে। মুক্তোর জলে বাচ্চার চোখ ফুটবে।

—তারপর?

—তারপর আবার কী! বাচ্চার চোখ ফুটলে পাখি চলে যাবে অন্যত্র। বাচ্চা আপন প্রাণে তখন পৃথিবীর আলো বাতাস বুক ভরে নেবে। বাচ্চাটা বড় হবে। এবং এই বাচ্চাও একদিন উড়ে চলে যাবে।

—তখন মুক্তোর কী হবে?

—পড়ে থাকবে। যারা যাযাবর জাতি তাদের নাকি একরকমের ঘ্রাণশক্তি আছে। তারাই টের করতে পারে কোন্ বনে 'সান' পাখি আছে। এ-অঞ্চলের মানুষেরা সেই সান পাখি ধরার জন্য দিনের পর দিন বনের ভিতর তাঁবু ফেলে থাকে।

—ওরা খুঁজে পায় তেমন পাখি?

—আমরা একবার গিয়েছিলাম। মা তার দলবল নিয়ে সেই পাখিটি ধরার জন্য দু-বছর কি না করেছেন। মারিয়া সেই রোমাঞ্চকর যাত্রার অভিজ্ঞতা বলার জন্য ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে বসল।

কি এক পাখি—তার নাম সানপাখি—কিংবদন্তীর মতো এই পাখি জলে থাকে, বনে থাকে এবং আকাশের খুব উঁচুতে উড়ে বেড়ায়। এত উঁচুতে বেড়ায় যে অন্য কোনও পাখি তেমন উঁচুতে উড়তে পারে না। এত জলের নিচে ডুবে চলে যেতে পারে যে অন্য কোনও পাখি তেমন নিচে নেমে যেতে পারে না। পাখি মুক্তোর খোঁজে নদীর মোহনাতে বড় বড় ঝিনুক তুলে আনে। ঠুকরে ঠুকরে সেই ঝিনুক ভেঙে তার মাংস খায় আর নদীর মোহনাতে মুক্তো খুঁজে বেড়ায়। এই সানপাখির জন্য ভারোদী এমন কোনও বন নেই, এমন কোনও নদীর মোহনা নেই আর এমন কোন ওপাহাড় পর্বত নেই; যেখানে তাঁবু ফেলে একসময় বসে থাকেনি। গুডুই নাকের ঘ্রাণে বন থেকে বনে, মোহনা থেকে মোহনায় এবং পাহাড়ে পর্বতে পাখি ধরার জন্য দলের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু কোথাও, না সেই পাখি, না সেই মুক্তো। বস্তুত ভারোদী পারিবারিক দাস ব্যবসার পর এই পাখির ব্যবসা অর্থাৎ মুক্তো বিক্রির ব্যবসা বড় রকমের লাভজনক ব্যবসা ভেবে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিল। এমন কি মারিয়া যা বলল, তাতে মনে হয় ওদের সেই খামার বাড়িতে পক্ষীদের জন্য সবুজ রঙের সব বসবাসের উপযুক্ত বাসা তৈরি করে রেখেছিল। কোন রকমে এক জোড়া পাখি সংগ্রহ করতে পারলেই আর কথা নেই। ডিম ফুটবে, বাচ্চা হবে, বাচ্চা বড় হলে পাখি হবে, পাখি তখন নদীর মোহনা থেকে মুক্তো সংগ্রহ করে আনবে। এক দুই তিন—এভাবে হাজার লক্ষ ডিম, হাজার লক্ষ পাখি আর হাজার মুক্তো। সে মুক্তোর ব্যবসা খোলার জন্য সানপাখি ধরার প্রলোভনে তাঁবুতে দীর্ঘদিন বাস করতে করতে এক সময় বিচিত্র এই সব পাখিদের ভালবেসে ফেলল। তার সাঙ্গপাঙ্গরা যত রকমের পাখি ছিল বনে সব ধরে এনে রেখে দিত। গুডুই গন্ধ শুকে বলত—না এটা সানপাখি নয়। গন্ধের তারতম্যে সানপাখি রবিনপাখি হয়ে যায়। তা না হলে দেখতে সানপাখি যীশুর সেই প্রিয় রবিনপাখিদের মতো। তারপর বুঝি একসময় ভারোদী নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন সানপাখির অস্তিত্ব আর নেই। তিনি ঘরে ফেরার সময় বিচিত্র বর্ণের সব পাখি নিয়ে ফিরছিলেন। মারিয়া বসে বসে মায়ের সেই অভিযানের গল্প বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল। এমনভাবে মারিয়া তার মায়ের অভিযানের গল্প বলল, যে সবটাই প্রায় রূপকথার মতো শোনাল। সারি সারি গাড়ি, কর্মচারীর দল, যাযাবর ব্যক্তি হিসাবে রেড ইন্ডিয়ান গুডুইকে ধরে আনা

এবং গভীর বনাঞ্চলে প্রবেশ করার মুখে এক নিগ্রো ডাইনির গল্পে সুমন বিস্ময়করভাবে ডুবে গেল। সে কিছুতেই অবিশ্বাস করতে পারল না। যেন এক রাজহাঁস সত্যি সোনার ডিম পেড়ে চলেছে। তবু সবটা শোনার পর সে এমনভাবে হাসল যেন সব আজগুবি গল্প মারিয়া সুমনকে শোনাচ্ছে।

—আমি জানি তুমি বিশ্বাস করবে না। বলে সে ডাকল, গুডুই, গুডুই।

সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য গুডুই কোথা থেকে বের হয়ে সামনে এসে দাঁড়াল।

সুমন এবার গুডুইকে দেখে কেন জানি যথার্থই ভয় পেয়ে গেল। সে বলল, আমি জাহাজে যাব মারিয়া।

মারিয়া না শোনার ভান করে থাকল। সে গুডুইকে বলল, হ্যাঁরে আমি মা'র সঙ্গে সানপাখি ধরতে গেছি না?

গুডুই ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

সুমন বলল, আমি তোমার সব বিশ্বাস করছি মারিয়া। চল ভিতরে যাওয়া যাক। সে আর এই আবছা আলো অন্ধকারে গুডুইর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস পেল না।

—তুমি মাঝে মাঝে এমন মুখ কালো করে রাখো কেন ওজালিও।

সুমন খুব চালাক চতুর ছোকরার মতো বলল, কই মুখ কালো করলাম। কিন্তু আর তারপর কিছুতেই জমল না। সুমন অত্যন্ত দুঃখের গলায় বলল, মারিয়া তুমি আমি হাঁটছি আর গুড়ুই আমাদের অনুসরণ করছে কেন?

মারিয়া খুব আপনজনেব মতো কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, গুডুইর ওপর আমাব দেখাশোনার ভার। সে সবসময আমার পাশে পাশে থাকবে; এই নিয়ম এই সংসারে। যেন বলতে চাইল, ওজালিও যতদিন আমি যুবতী না হচ্ছি ততদিন এই গুডুই পাশে পাশে থেকে আমাকে রক্ষা করবে।

ওরা এবার অন্য প্রসঙ্গে এল। অন্য কোনও কথা বলে মারিয়া সুমনকে এই বংশ সম্পর্কে অনুপ্রাণিত করতে চাইছে। ওরা প্রাচীন পাথরের গুহার পাশ দিয়ে হাঁটছে। গুহার মুখে লোহার জাল দিয়ে দরজা। ভিতরে এক জোড়া করে অতিকায় হিংস্র কুকুর। মানুষের মাংসে এবং রক্তে এই কুকুরের বুঝি ক্ষুধা নিবারণ হয়। সুমন এক এক করে গুহার মুখ পার হচ্ছে আর সেই কুকুরগুলো আর্তনাদ করে উঠছে। যেমন চোর ঘরে ঢুকলে গৃহস্থ মানুষকে সজাগ করার দায় গৃহপালিত কুকুরটির উপর, তেমনি এই গৃহে কোন কালো মানুষ ঢুকলে কুকুরের দায় আর্তনাদ করা। সুমনের রক্তে বুঝি সেই কালো মানুষের ঐতিহ্যবাহী গন্ধ। যা এই পরিবারকে বিশুদ্ধ করার দায়ে এবার ধরা পড়বে। কুকুরগুলি দরজার কাছে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল, লোভে লালসায় ওদের মুখ থেকে লালা ঝরছে। গুডুই এসব দেখে কেমন তাজ্জব বনে গেল। এই মানুষ তবে কে! এই মানুষ যার নাম ওজালিও দ্য সুম্যান, যে জাহাজের তরুণ নাবিক, এবং স্পেন দেশের মানুষ, তাকে দেখে তবে এই কুকুরদের জিভে এমন লালসার জল গড়াচ্ছে কেন! সে বিশ্রীভাবে একটা হ্যাঁচ্য দিল। সুমন কুকুরের আর্তনাদ শুনতে পেল না। এইসব গুহার ভিতর এককালে সন্তান প্রসব করে নিগ্রো রমণীরা খামারে চলে যেত। সে দরজায় এখন কুকুরের মুখ দেখতে পেল না। যেন বার্টের মা বার্টকে কোলে নিয়ে বসে রয়েছে দরজার মুখে। বসে আছে এক যাদুকরের প্রত্যাশায়। যে মানুষ তাদের সব অপমান এবং দাসত্ব ঘুচিয়ে মানুষের মতো মর্যাদা দেবে। বার্ট বলেছে, সেই মানুষ এসে গেছে আমাদের ভিতর। সে ফুল ফোটাবার জন্য পায়ে হেঁটে সারা আলবামা রাজ্য ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সুমন বার্টের জননীর মুখ দেখেনি। তবু কল্পনায় এমন এক মুখ, চোখের উপর ভেসে উঠল যা ঠিক বার্টের মুখের মতো। এবং বার্টের মা-ই যেন নিগ্রো রমণীর পোশাক পরে গুহার দরজায় বসে আছে। বার্টের তিরস্কার সে যেন এখন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। এত বড় উঁচু পাঁচিল আর সব বড বড় গাছের নিচে পরিত্যক্ত দুর্গের ছবি—সুমন মাথা নিচু করে হাঁটছে। সে এই মারিয়াকে ফেলে কিছুতেই চলে যেতে পারছে না যেন। এত অসম্মান, কারণ গুডুই দূরে দূরে হাঁটছে—সে এই বালিকাকে ক্রমান্বয়ে পাহারা দিয়ে নদীর উৎসের মতো পবিত্র রাখার চেষ্টা করছে। গুডুই সুমনকে বড় বেশি অবিশ্বাস করছিল।

মারিয়া দেখল, চুপচাপ সুমন হাঁটছে। কোন কথা বলছে না। সে হাত ধরে বলল, কী ভাবছ?

—কিছু ভাবছি না।

—কেবল চুপচাপ হাঁটছ। কথা বলছ না।

—তুমি কথা বলছ, আমি শুনছি। শুনতে ভাল লাগছে।

মারিয়া এবার খোলাখুলি বলল, গুড়ুই সম্পর্কে তোমার অহেতুক ভয়টা কাটছে না।

—আমার ভাল লাগে না। আমি হাঁটছি, তুমি হাঁটছ। আড়ালে সে দূরে হাঁটছে।

-- আচ্ছা দাঁড়াও, বলে সে গুড়ুইকে ডাকতেই দু-লাফে ও হাজির; তুই এখানে বোস্। না ডাকলে উঠবি না।

গুড়ুই বসে বসে শিষ দিতে লাগল।

এবার মারিয়া বলল, তুমি হা কর ওজালিও।

সুমন হা করলে মারিয়া ওর মুখে দুটো চকোলেট ফেলে দিল। তারপর ফিসফিস করে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, আমি যুবতী হলে সে আর আমাদের পাশে থাকবে না।

সুমনের যেন বলার ইচ্ছা হল, তুমি আর কোনও দিন যুবতী হবে না মারিয়া। তোমাকে বুঝি ওরা কোনও দিন যুবতী হতে দেবে না।

সামনে সেই ভারোদীর পাখির জগৎ। ওরা হাঁটতে হাঁটতে সেই পাখির জগতে এসে গেছে। দরজায় ঢুকে গেলেই লাল নীল বর্ণের আলো, তার নিচে ছোট বড় সব পাখি।

পাখিব জগতে ঢুকে যাবার আগে সুমন বড় একটা পাথরের মূর্তির নিচে দাঁড়াল। মারিয়ার মুখ দেখল। আলো জ্বালা বলে এখন মারিয়াকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওর মুখে সরল ছবি কি করে যেন সহসা সহসা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল, এখন অন্য এক মুখ, ভালোবাসার মুখ, করুণা কর তুমি—আমি এক যুবতী নদীর উৎসে বসে আছি—লহ মোরে করুণা করে এমন এক বিষণ্ণ ভাব।

জায়গাটার চারপাশে প্রচুর গাছগাছালি। বিচিত্র রঙের সব ঝালর যেন ঝুলে আছে। বাড়ির ভিতর তখনও হয়ত কেউ নাচছে। নাচঘরে কেউ হয়ত এখনও গাইছে—আই নো দাই হার্ট। পিয়ানো এবং বড় মুখখোলা বাঁশির সুর শরীরের যাবতীয় ইচ্ছাকে উদ্দাম করে তুলছে। মারিয়া সুমনের দিকে মুখ তুলে তাকাল। ওর বড় ফ্রক ঘাঘরার মতো দেখাচ্ছিল। ওর সোনালি চুল মাঠের অগুণিত হলুদ ফুলের মতো, যেন সেখানে সকল সময়ের জন্য শীতের মাঠে সূর্যাস্ত হচ্ছে। আর এত বড় বাড়ি, এত বড় মাঠ এবং এত সব বৃক্ষ সকলের নিচে রকমারি আলোর ফোয়ারা হয়ে দুর্গের মতো এই প্রাচীন প্রাসাদ অন্ধকারে ডুবে থাকছে না আর, যেন বন্দিনী রাজকন্যা সোনার কাঠি রূপার কাঠি হাতে নিয়ে জেগে উঠেছে। সুমন পাগলের মতো মারিয়াকে বুকে জড়িয়ে চুমো খেল। আর মারিয়া যেন আঠার মতো লেগে আছে কিছুতেই ছাড়বে না। মারিয়া চোখ বুজে কি ভাবছিল, চোখ খুলে বলল এবার, ওজালিও আমি আর বেশিদিন থাকছি না। আমাদের স্কুল খুলে যাবে। আমি চলে যাব।

সুমন মুখের কাছে নুয়ে বলল, সেই এমিলের গল্পটা তো তুমি বললে না।

মারিয়া বুকের কাছে প্রায় মুখ এনে বলল, আমি চলে গেলে তোমাব কষ্ট হবে না!

সুমন ওর চিবুক তুলে বলল, তার আগে বোধ হয় আমরাই চলে যাব। তুমি আমাকে মনে রাখবে না মাবিয়া? সুমনের কণ্ঠ খুব কাতর শোনাল।

মারিয়ার গলার স্বর গাঢ় শোনাল। তুমি আমাকে ভুলে যাবে না তো ওজালিও।

সুমন হাঁটতে থাকল। সে উত্তর দিতে পারল না।

মারিয়া নিজেকেই যেন শোনাল, কোনদিন ভুলতে পারব না। কোনদিন না।

এই সহজ সরল ইচ্ছার কথা সুমনকে বড় কাতর করছে। সে যেন এবার বলতে চাইল, তুমি কবে যুবতী হবে মারিয়া?

মারিয়া এবার কানে কানে বলল, মা যবে বলবেন।

সুমনের চোখ মুখ কেমন এখন অপার্থিব দেখা[illegible]। দীর্ঘকাল ধরে সমুদ্রের নীল জল এবং অমানুষিক খাটুনির কথা মনে হলে ওর কেবল কান্না পায়। এই জাহাজ আবার অন্য বন্দরে চলে যাবে। শুধু এই অসামান্য ভালবাসার স্মৃতি মাঝে মাঝে ওর স্বপ্নের ভেতর এক মনোরম উপত্যকা সৃষ্টি

করবে। অথবা সমুদ্রের ঝড়ের ভিতর অথবা এও হতে পারে সে বার বার হন্যে হয়ে অন্য কোনও বন্দরে এই মারিয়া নামক বালিকার এক কোমল অবয়বকে পাগলের মতো অন্বেষণ করে বেড়াবে। সুমন এবার বেশ সময় নিয়ে বলল, মারিয়া এমন আশ্চর্য সানপাখির গল্প কোনদিন ভুলতে পারব না।

এ-ভাবেই সুমনের সময় এ-শহরে কেটে যাচ্ছে। সময় পেলেই বন্দরে নেমে যাওয়া এবং প্রাচীন দুর্গের মতো এই বাড়ির ভিতরে ঢুকে মারিয়া নামক এক বালিকার সঙ্গে সব আজগুবি গল্প, সুমন নানারকমের আজগুবি গল্পে মারিয়াকে মাতিয়ে রেখেছে। ওরা জানত না ফুল বেশিদিন ফুটে থাকে না। ওরা জানত না, বর্ষার জল, নদী চিরকাল বহন করে না। তুষারে আবৃত থাকে পাহাড়। বরফ গলা জলে নদী তার রুক্ষতা দূর করতে পারে।

তারপর এই বাড়ি খালি হয়ে গেলে ভারোদী এসে দাঁড়াল গাড়ি-বারান্দায়। হেনরী চুরুট টানছে। গুড়ুই ভাল মানুষের মতো স্টিয়ারিংয়ে বসে আছে। শুধু হাত তুলে দেওয়া। হাত তুলে দিলেই গুড়ুই গাড়ি চালিয়ে কৃত্রিম পাহাড় পেছনে ফেলে চলে যাবে।

পথে যেতে যেতে হেনরী বলল, মারিয়া কী বলছে সুমন।

—কিছু বলছে না।

—এখনও কিছু বলাতে পারলে না।

—তার বয়েস আর কত হেনরী।

—অনেক বয়েস। মেয়েদের বয়েস বারো পার হলেই অনেক।

—আমি জানি না।

—একবার জানার চেষ্টা কর। না জানতে চাইলে তোমাকে জানতে দেবে কেন।

—চেষ্টায় আছি।

—তুমি একটা আকাট মুখ্যু। চেষ্টা করতে করতেই বন্দর ছেড়ে দেবে।

—এই, গুড়ুই শুনতে পাচ্ছে!

—আরে ও মানুষটা তোমার আমার কথা বুঝতে পারে না।

—কেন?

—শুনে অভ্যাস নেই বলে। ঘর বাড়ি দেখার সময় মনে হল সুমন ফের অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। হেনরী আর কিছু বলল না। সুমন এসব কথায় আজকাল রাগ করছে।

॥ পনের ॥

বসন্তকাল বলে সমুদ্রে মাঝে মাঝে ঝড় উঠছে। শনিবারের বিকেল। সুতরাং সকাল সকাল সব জাহাজীদের ছুটি। সমুদ্রে এবং মোহনায় ঝড় লেগে আছে বলে সালফার বোঝাই হতে সময় নিচ্ছিল। ঝোড়ো হাওয়ায় সামনের গুদামঘর অতিক্রম করে বন্দরের সর্বত্র এবং উইচ-ককের পথে এই সালফারের গুড়ো উড়ে উড়ে চলে যাচ্ছে। জাহাজে এখন বেশি মানুষজন হাঁটাহাঁটি করছে না। ঝড়ের জন্য ফল্কাতে সালফার নামানো যাচ্ছে না। বৃষ্টি এলে সালফার ভিজে যাবে ভয়ে, ছুটির আগেই সব কাঠ ফেলে ত্রিপল দিয়ে ফল্কা ঢেকে দেওয়া হল। এবং সকাল সকাল জাহাজীদের ছুটি হয়ে গেল।

হেনরী ছুটি পেয়ে ঘরের ভিতর বসে থাকল না। কিছু কাঠ নিয়ে, রজন নিয়ে কাঠের উপর কারুকার্য করতে বসে গেল। যাবার আগে তার স্মৃতি ভারোদীর ঘরে রাখার বাসনা। সে একটা যীশুর জলপানের ছবি কাঠের ভিতর খোদাই করছিল। যীশুর কাঁধে সেই বড় ক্রুশ এবং নুয়ে ঝরনার জলপান করছেন। হিব্রু ভাষার মতো কিছু ভাষা সেই ক্রুশটার গায়ে সে খোদাই করার চেষ্টা করল। আর নিচে একজন নিগ্রো বালকের মুখ—চাতক পাখির মতো দৃষ্টি চোখে—সে অঞ্জলিতে জল তুলে যীশুর মুখের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। কাল রোববার। পরশু সোমবার। এবং সম্ভবত সোমবার বিকেলে জাহাজ ছাড়তে পারে। এতদিন খুব ফূর্তি করা গেল ভারোদীর সঙ্গে। ভারোদীর শখ কাঠের উপর কারুকার্য করা ছবির ফ্রেমে হেনরীর স্মৃতিকে ধরে রাখে।

হেনরী প্রথম ভেবেছিল ভারোদীর জন্য কুকুরের মুখ এঁকে দেয়। কুকুরের মতো দীর্ঘ যৌনতাই এখন ভারোদীর একান্ত সম্বল। অথবা সব রক্তই লাল সুতরাং গোরু ঘোড়ার ছবি অথবা সাদা মানুষের অবয়ব এবং তার পাশে কোনও শস্যক্ষেত্র—বীজ বপনের সময় চাষীর আন্তরিক মুখ আঁকারও বাসনা ছিল হেনরীর। হেনরী এইসব সংরক্ষিত অঞ্চলে কোন নিগ্রো যুবক অথবা যুবতী দেখতে পায়নি। দূরে দূরে নিগ্রো গ্রাম এবং বসতি। কিছু কুকুরের ডাক এবং মোরগ-মুরগীর লড়াই। বসতি দূর না হলে নিগ্রো যুবক-যুবতীদের সঙ্গে মদ্যপান করা যেত। এবং গোপনে মদ্যপান। তারপর দুজনের পাশাপাশি বসে থাকার ঘটনা এবং দৈহিক ক্রিয়াকলাপের অদ্ভুত এক ছবি, কাঠের ভিতর ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করবে. যদি এই কারুকার্য যথাযথ হয় তবে ভারোদীর জন্য এই উপহার স্মৃতির মতো এবং নিগ্রো যুবক-যুবতী সম্পর্কে হিক্কা তুলতে তুলতে এক সময় নিজের মাংস নিজে কামড়ে ধরবে। ভারোদী যুবতী এবং বিধবা। হেনরীর জিভে প্রায় জল আসার মতো। ভারোদী মদ্যপান করার পর বড় অস্থিরচিত্ত। বড় বেশি ক্ষরণ, ফলে ভারোদী ওকে টানতে লাগলে, যেন এক মেষশাবককে টেনে টেনে সেই অতিকায় নেকড়ে বার বার উল্লম্ফন দিচ্ছে, গত রাতে হেনরী পালিয়ে আসতে চাইলে ভারোদী কলার ধরে ঘরের ভিতর টেনে নিয়ে গেছে এবং দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

জাহাজে ফিরে কাঠের ভিতর ভারোদীর সেই কামনাপীড়িত মুখের ছবি আঁকার বাসনা হয়েছিল কিন্তু মাতাল বলে হাত পা স্থির ছিল না, টলে টলে পড়ে যাচ্ছিল। সুতরাং ভোর হলে উলঙ্গ ভারোদীর অবয়ব কেবল কোমল প্রাণের মতো কেবিনময় পায়চারী করে বেড়াচ্ছিল। এই অবয়বের কারুকার্য কাঠে ওর বড় ধরে রাখার ইচ্ছা। সে ছুটি পেলে কাঠ খোদাই করবে উলঙ্গ ভারোদীর মুখ এবং অবয়ব এঁকে বসে থাকবে। পাশে, ঠিক যোনিদেশের পাশে নিগ্রো এক যুবকের মুখ এঁকে দেবে। এবং দিয়ে রেপ করাতে পারলে যেন আর কিছু থাকে না। ভারোদীর শক্ত শরীরে যেন আবহমানকাল ধরে ঘৃণা মিশে আছে নিগ্রোদের প্রতি, রেপ করাতে পারলে বুঝি প্রতিশোধ নেওয়া হবে। কি যে মাঝে মাঝে মনে হয়, যুবতীর এমন রূপলাবণ্য আর পাছা সে যেন কতকাল স্পর্শ করেনি। সারা রাত যদি নিয়ে পড়ে থাকত, এখন মনে হয় তবে বড় ভালো লাগত। অথচ হেনরী মনে করতে পারছে না সে কেন পালাচ্ছিল। পিচ্ছিল আঁষটে গন্ধ কি ওকে মাঝে মাঝে বমির মতো উৎকট আবেগে ভোগায়? তখন তেমনভাবে কি তাকে ভোগাচ্ছিল? এখন আর সে মনে করতে পারছে না। বাংলা কথায়—যা মাগী, পাছায় যা মাংস এবং শরীরে যা পিঠে পায়েস তাতে করে নিগ্রো যুবক না হলে মানায় না। এইসব কারণে বুঝি ক্ষিপ্ত ছিল হেনরী। সে সুতরাং ভাবল, ঠিক জঙ্ঘার পাশে নিগ্রো যুবকের মুখ এঁকে দেবে। অথবা রেপের দৃশ্য এঁকে দিয়ে বলবে, নাও তোমার স্মৃতি, তুমি তোমার ঘরে উড্-পেকার অথবা স্কাইলার্ক ফুলের মতো গোপনে পুষে রাখতে পার। তারপর সহসা, কি মনে হল হেনরীর—মুখের ছবি কেটে বাদ দিলে পা থাকে, জঙ্ঘা থাকে। সে ইচ্ছা করেই রঙটা কাঠের রঙ হবে এই ভেবেছিল। তারপর মনে হল কি দরকার—এসব বিতিকিচ্ছা ঘটনার সম্মুখীন হয়ে, বরং সে যীশুর ছবি এঁকে দেবে; দিয়ে বলবে, এই নাও, তোমার ঘরে আমার স্মৃতি এবং মানুষের রক্ত লাল, মাছের রক্ত লাল, গোরু ভেড়া সকলের রক্ত লাল, ঈশ্বরের জীবে ঈশ্বরের মতো ভক্তি শ্রদ্ধা দেখাও। সুতরাং সে ক্রুশের নিচে এক নিগ্রো বালকের মুখ যীশুর শৈশবকালীন মুখের রেখাতে ভরে দিতে চাইল। মনে মনে এখন সে দূরের এক মাঠে বোধহয় কোনও বালুবেলা হবে, কারা যেন হেঁটে যাচ্ছে—বুঝি একদল সৈন্য যাচ্ছে—শৈশবের যীশু পালাচ্ছিল। গম খেতের ভিতর দিয়ে পালাচ্ছিল। ছোট ছোট গমের চারা। অনেকদিন আগে তখন গমের চারা ছোট ছিল। ঈশ্বরের অপার মহিমা; গাছের ফলন ক্ষণিকের ভিতর জন্ম নিল। হেনরীর এখন এই সময় কাঠে রজনে এমন এক ছবি আঁকার বাসনা।

টুইন ডেকে বসে কাজ করছিল হেনরী। উপরে বোট-ডেকের ছাদ আছে। সুতরাং বৃষ্টির ছাঁট আসছে না। আকাশের গুমোট ভাবটা কিছুতেই কাটছে না। বৃষ্টি আর বৃষ্টি। কখনও ঝড়! ঝড় থেমে

গেলে বৃষ্টি নামছে। ঝড় এবং বৃষ্টি দুই-ই হেনরীর প্রিয়। সে পিছিলের দিকে মুখ তুলে দেখল, সুচারু সামাদ আসছে। সুমন নেই।

কাল ফিরতে সুমনের খুব রাত হয়ে গেছে। সে সেই শহরের বড় যাদুঘর এবং ক্রিতুস উপগ্রহের মন্দির দেখে এসেছে। মারিয়ার সঙ্গে সুমন আজকাল কখন কোথায় যে চলে যাচ্ছে এবং কখন ফিরে আসছে কেউ টের পাচ্ছে না।

এখন এন্‌জিন রুমে কাজ প্রায় নেই বললেই হয়। ট্যাঙ্ক টপ্‌-পরিষ্কারের কাজ শেষ। বয়লারের পাশে যে স্তূপীকৃত ছাই ছিল তাও শেষ। কিনার থেকে ট্রাক এসে সব নিয়ে গেছে। লেবেলিং শেষ। এবং বয়লারের সব স্মোক বক্‌স পরিষ্কার। মোদ্দা কথা সাফ সুতরোর কাজ বলতে জাহাজে এখন তেমন বেশি-কিছু নেই। কেবল জাহাজ সমুদ্রে নেমে গেলে পাটাতন ধোওয়া হবে। সাবান জলে ডেরিক, মাস্ট এবং বোট-ডেক-ধুয়ে পাকলে, ফের রঙ লাগানো। সুতরাং সুমন, এক তরুণ নাবিক সুমন সারেঙকে বলে মেজ মিস্ত্রীর কাছ থেকে শুক্র শনি ছুটি নিয়েছিল। শনিবার নিশ্চয়ই শহরের কোন বড় হলঘরে ওর মারিয়ার সঙ্গে ছবি দেখার ইচ্ছা। অথবা গাড়িতে করে ওদের খামারে চলে যাবে। ট্রাউট মাছ ধরার কথাও আছে। মারিয়াদের খাড়ি নদীতে এসময় বৃষ্টির জলে সমুদ্র থেকে বড় বড় সব রাক্ষুসে ট্রাউট মাছ উঠে আসবে। মেজ মিস্ত্রির পুরোনো রক্ষিতা আছে। তিনিও এই ছুটির সময়টুকুতে জাহাজে থাকবেন না। পুরোনো রক্ষিতার ঘরে রাত কাটাবার জন্য চলে যাবেন। অথচ হাতে সময় আজ কাল দুদিন। সোমবার জাহাজ ছাড়ছে। দুদিনের ভিতর এই স্মৃতিফলক শেষ না করতে পারলে অন্য সফরে ভারোদীর ঘরে ওঠা যাবে না। উপহারের বিনিময়ে সে ভারোদীর ঘরে আবার এলে উঠতে পারবে। শুধু ক্যানারি পাখিটা এবং পাখিটা মরে যেতে পারে একদিন, কারণ রুগ্‌ণ ক্যানারি পাখি ভারোদীর সংসারে উড়িয়ে দিয়ে ভেবেছিল এই সব, এই শেষ পর্যন্ত পরবর্তী সফরে আতসবাজীর মতো ফুরফুরে বাতাসের ভিতর ফুল হয়ে ভারোদীর মনে ভাসতে থাকবে।

কারণ এই দেশের গরম জল হাওয়ায় বেশিদিন পাখি বাঁচবে না। বরং এই কাঠ খোদাই করে শিল্পসৃষ্টি ভারোদীর মনে নানারকমের ছবি এঁকে দেবে—জাহাজী হেনরী কত রকমের লরেল পাতার মুখ আঁকতে জানে। এত সুন্দর লরেল পাতার ঘর আবিষ্কার করে নিশ্চয়ই ভারোদী তীরের মানুষকে আর ভালবাসতে পারবে না। এই শরীর, হেনরী ভাবল, ভারোদীকে বড় বেশি জঙ্গী সুখ দিচ্ছে। কত বিচিত্র ভঙ্গিতে উত্তাপের কলে বাতাস দিতে জানে ভারোদী। সে তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে কাজ করতে থাকল। এ বন্দরে এলে মেয়েমানুষের জন্যে আর ভাবনা থাকবে না।

ওর চোখে মুখে বৃষ্টির সামান্য ছাট লাগছিল। সে, খুব নিবিষ্ট মনে কাজ করে যাচ্ছে। জল বৃষ্টি ঝড় কিছুই ভ্রূক্ষেপ করছে না। ঘন বৃষ্টির জন্য তীরের গাছপালা পাখি ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এমন ঝড় বৃষ্টি থাকলে রাতে ভারোদীর ঘরে আরাম করে অথবা ভারোদী গাড়ি চালিয়ে অন্য কোথাও নিয়ে যাবে—কোথায় কখন যে নিয়ে যায়—কোন্‌ হলঘরে যে ওর নাচ থাকে, এবং কত সব দূরবর্তী শহরে নিমিষে উধাও হয়ে যেতে পারে, ভাবতে বিস্ময় লাগে। এমন জল ঝড়ের রাতে ভারোদী তাকে ফেলে কোথাও আজ আর যেতে চাইবে না। এই জলঝড়ের রাতে ভারোদীর কাঁচের জানলায় কিছু সেই পেইন্টেড স্টর্কের ছবি এবং পারসিমন গাছের সুমিষ্ট ছায়া—চুঁইয়ে চুঁইয়ে সারারাত জল পড়বে তার শব্দ, আর বড় আয়নার ভিতর বড় খাট, ভারোদীর শরীরে সোনালি গাউন এবং নিচে অন্তর্বাসশূন্য পোশাক এবং ত্বকে তার কোমল ঘ্রাণ—কামনার জ্বরে ভুগে ভুগে মদের গ্লাস সামনে রেখে গাউন কোমরের কাছে তুলে এনে অথবা খুলে ফেলে ধীরে ধীরে মদে সামান্য ঠোঁটের স্পর্শ এবং পাশে নগ্ন যুবকের ছবি, সামনে পিছনে জর্জিয়ান আয়নায় পাশবালিশে পড়ে থাকা বিধবা যুবতীর শরীরে হায় কী কামনা, বাসনার গন্ধ—বস্তুত হেনরী কাঠের ভিতর শিল্প সৃষ্টির সময় এ সব ভাবতে ভাবতে কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠল।

বৃষ্টির জলে জাহাজ ধুয়ে মুছে গেল। জাহাজীরা যে যার ফোকসালে বসে দেশের গল্প করছিল।

সামাদ এই অবেলাতে বাংকে পড়ে পড়ে মনে হয় ঘুমোচ্ছে। সুচারু ওর বাবাকে চিঠি লিখছে। সে তার বাবাকে জানাল—বাবা আমরা পোর্ট অফ জামাইকা হয়ে পানামা ক্যানেল অতিক্রম করব। এবং সম্ভবত তেইশ-চব্বিশ দিনের সমুদ্রযাত্রা। আমরা পরে নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড বন্দর পাব। আপনি আমাকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় চিঠি দেবেন। বলে জাহাজের নাম, এজেন্ট অফিসের নাম এবং রাস্তার ঠিকানা, দেশ বন্দর প্রভৃতির সঠিক পরিচয় দিয়ে সে চিঠি শেষ করল। তারপর উপরের দিকে তাকাতেই দেখল একটা পা উপরের বাংকে ঝুলছে। সহসা দেখলে পা'টা যেন, ছাদ থেকে না বাংকের রেলিঙ থেকে ঝুলে আছে, বোঝা যাচ্ছে না, কারণ সে নিচের বাংকে শুয়ে উপুড় হয়ে চিঠি লিখছিল, বুঝতে পারছিল না সামাদ এখন ঘুমোচ্ছে না ইচ্ছে করে ওর মাথার উপর পা ঝুলিয়ে বসে আছে।

সুতরাং সে উঠে বসল এবং মাথা তুলে তাকালে দেখল, সামাদ ঘুমোয়নি, সে শুয়ে শুয়ে বড় অন্যমনস্ক। ওর নাকের ডগা দেখা যাচ্ছে। ওর চোখ দুটো সুচারু দেখতে পেল না। সে ধীরে ধীরে সামাদের গায়ে হাত রাখল। যদি সামাদ জেগে থাকে, যদি সামাদ এখন একটু চা খেতে চায় তবে চা করে দুজনে বসে বসে খাওয়া যাবে। কিন্তু এই সামাদ, বন্দরে যত দিন যাচ্ছে, সে যত বিবির চিঠি পাচ্ছে না তত সে এখন নির্লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ভিতরে ভিতরে কি এক অসহায় যন্ত্রণা, যেন সময় এবং সুযোগের অপেক্ষাতে সে দিন গুনছে। সুমন জাহাজে নেই। সে ভোরবেলা বের হয়ে গেছে। জাহাজে রাতে ফিরতে পারে। না-ও পারে। আদৌ ফিরবে কিনা কে জানে, সারাদিন জাহাজের মাস্তুলের অথবা ফক্কায় অমানুষিক খাটুনির পর কিছু ভাল লাগে না। দেশে জাহাজ ফিরলে অথবা না ফিবলে...সামাদেরও যেন অনুভূতি ক্রমে মরে আসছে। ক্রমে মরে আসছে। সে কেবল এখন বাংকে সময় অথবা সুযোগ পেলেই ঘুমায়। কেন জানি তার এখন, এই বন্দরের হাতছানি কোনও আগ্রহ সৃষ্টি করে না।

হাতের স্পর্শে সামাদ পাশ ফিরে শুল? চোখ মেলে তাকালে দেখল সুচারু ওর দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। -কিরে কী দেখছিস?

—চা খাবি? বড় ঝড় বৃষ্টি। একটু চা করে আনি।

—আন করে। বলে সে চাবিটা কোমর থেকে খুলে দিল। সুচারু লকার খুলে চা চিনি এবং কনডেন্সড্ মিল্কের কৌটা হাতে নিয়ে উপরে উঠে গেল। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে তখনও। সারেঙ নামাজ পড়ছেন এবং ফোকসালে কিছু ইতব কথাবার্তা হচ্ছিল। সুমন হয়ত এখন সেই বড় বাড়ির পাঁচিলের ভিতর অথবা অন্য কোথাও চলে গেছে। ওর একদিন ট্রাউট মাছ ধরার কথা আছে। মারিয়া, সুমনেব ছোট্ট বালিকা বন্ধু ওকে কোথায় কোন এক নদীর পাড়ে নিয়ে যাবে। বড় খামার বাড়ি। দূরে, বনাঞ্চল এবং নানারকমের গাছগাছালি ভেঙে গেলে, সেই নদী। নদীতে বৃষ্টি হলে বড় সব রাক্ষুসে মাছেরা উঠে আসে—সুমন গতকাল ফোকসালে বসে এমন সব গল্প করতে করতে চা অথবা চাপাটি খেতে খেতে যেন এক রাজকন্যা মিলে গেছে বন্দরে—সে সব ফেলে সেই রাজকন্যার সঙ্গে তপোবনে এবার হারিয়ে যাবে। জাহাজ ছেড়ে দেবার আগে সে আর ফিরছে না—জাহাজে তার আর ভাল লাগছে না। মারিয়াকে ছেড়ে তার আর জাহাজে ফিরতে ইচ্ছা হয় না। আজ যখন এমন ঘন বৃষ্টি এবং মাঠ-ঘাট সব ভেসে গেছে তখন সে মাছ ধরতে নিশ্চয়ই মারিয়ার সঙ্গে নদীব মোহনাতে চলে গেছে। ফিরতে ওর রাত হবে। আর যদি না ফেরে ওর খাবার সুচারু গ্যালী থেকে নেবে কি না, রাতের খাবার লকারে না রেখে দিলে—কী হতে পারে, উপোস থাকতে পারে, তা হবে কেন, সে তো এখন আর রাতে ফিরে কিছু খায় না, দু'দিন হবে, না আরও বেশি হতে পারে—লকারে ওব খাবার নষ্ট হয়েছে। তবু যদি কোন কারণে সুমন, সরল নাবিক সুমন ফিরে এসে খেতে চায়—এই ভেবে সুচারু আজও ভাবল লকারে খাবার তুলে রাখলে কার কি ক্ষতি। রেশনে যা বরাদ্দ সে তো খাবে। সে তা পাবে। খাবার নষ্ট হয় হোক।

সুচারু গ্যালীতে চা করার সময় বলল, ভাণ্ডারী চাচা সুমনের খাবার রাখবে। আমি নিয়ে রেখে দেব। সে তারপর চা করল। দুটো চাপাটি নিল সঙ্গে। নিচে নেমে সামাদকে ডাকলে মনে হল সে ওর মনের ভিতর বড় নিবিষ্ট হয়ে আছে। কথা সহজে বলতে চায় না, যেন সে খুব মহৎ মানুষ এবং অনাবশ্যক কথা—কী কথা হতে পারে, জাহাজে যা কথা হয় ইতর কথা, এবং অশ্লীল চিন্তা, সে একদা যে-সব অশ্লীল

ছবি বালিশের নিচে রেখে দিত, এখন যেন তা সে কোথায় কোন ঝোড়ো বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছে। সে বিনীত যুবকের মতো কাজ করছে। সন্দেহ—ক্রমে এক সন্দেহ; সংশয় বড় টিন্ডালকে কেন্দ্র করে ঝড়ের আগে অনড় বায়ুস্তরের মতো। সে চুপচাপ। কেবল কাজ করে যাচ্ছে। সে এত বেশি কাজ করেছে যে সকলে কাজের তালিকা দেখে তাজ্জব বনে গেছে। সে দু'নম্বর মাস্তুলের সবটা এবং তিনটে ডেরিক একদিনে রঙ করেছে। সে ফানেলের চারপাশটায় নতুন রঙ লাগিয়েছে। দুলে দুলে উড়ে উড়ে প্রায় যেন সামাদ ফানেলের চারপাশে ঝুলে রঙ করছিল। খুব দ্রুত কাজ করছিল—প্রায় একাই একশ। ডেক-জাহাজীরা মাঝে মাঝে এই নিয়ে ইতর রসিকতা করছিল, শালা সামাদ দেখছি এই সফরেই টিন্ডাল বনে যেতে চায়। অথবা কেউ কেউ বলাবলি করছিল, ওরে শালা এত যে কাম দেখাচ্ছিস কামের পয়সা তর খাবে কে! কেউ কেউ বলছিল, শালা তুমি সারেঙকে তেলাচ্ছ।

সামাদের তখন বিনীত উত্তর, কোম্পানির পয়সা খাচ্ছি। কাজ না করলে চলবে কেন। কাজ না করলে গোনাগার হতে হবে।

সামাদ অধিক পরিশ্রমের জন্য ভীষণ ক্লান্তিতে সন্ধ্যায় অবসন্ন হয়ে পড়ত। অধিক পরিশ্রমের ফলে সে ভিতরের কষ্টটা ভুলে থাকতে পারত। ক্রমে সেই এক ভয় তাকে পাগল করে দিচ্ছে—নিজেকে সংযত রাখাব জন্য এবং সব ভুলে থাকার জন্য আর বিশেষ করে নবির চিঠির প্রত্যাশায় আছে, কারণ বিবি তার চিঠি দেয় না, নবি প্রতিবেশী এবং বন্ধু, কি সম্পর্কে ওব আত্মীয়, সালিমার বাপের বাড়ির সম্পর্কে কাছাকাছি লোক, শেষ চিঠি নবির কাছে, নবিভাই, বিবি আমারে চিঠি দেয় না, কি কসুর আমার জানি না, জবাবে তুমি সব বিস্তারিত লিখে জানাবা। সেই চিঠিরও জবাব নেই। দিন যত যায় জাহাজে সে কাজপাগল মানুষ হয়ে ওঠে। সে কাজের ভিতর ডুবে থাকলে সালিমার মুখ, প্রায় যেন কচুরীপানার লাল নীল ফুলের মতো ফুলঝুরি হয়ে ফুটে ওঠে চোখে। আর স্রোতের জলে ভেসে গেলে শুধু পানা থাকে, জল থাকে, কিন্তু মাঠে মাঠে ফুল থাকে না তখন, কেবল বড় টিন্ডালের মুখ ভাসতে থাকে। বড় টিন্ডালের দুঃসহ ইতর মুখ ক্রমে ওকে পাগল করে দেয়। ঐ এক মানুষ আছে জাহাজে, সাদা কাগজে'সই নিয়ে আল্লা মোতাবেক সজ্জন সেজে হাসে, গায়, গুয়া দিয়া শুকনা পান খায়, আর মাঝে মাঝে শেষ বয়সের নিকা—স্বপ্ন দেখতে দেখতে কচি কাঁচা মুখ শালিমার, দাঁতের ভিতর রুপোর দাঁতন কাঠি চালায়। তখন সামাদের চোখ ঘোলাটে হতে থাকে। হাত-পা শক্ত হতে থাকে এবং সব বিসদৃশ ঘটনা—জাহাজে যেন এইমাত্র ঘটে যাবে। বড় টিন্ডালকে হত্যা করার বাসনা। সে তার সব ভিতরের জ্বালা-যন্ত্রণার প্রতিশোধ নিতে চায়। এইসব অমানুষিক ইচ্ছা ভুলে থাকার জন্য সে জাহাজে কাজের ভিতর ডুবে আছে। সে দ্রুত ছুটছে। বল্গা ধরে রাখছে। দ্রুতগামী এক অশ্বের খুরে এইবার আগুন জ্বলবে। সে তার স্থৈর্য দিয়ে খুরের ভিতর আগুন জ্বলতে দিচ্ছে না। ফলে সারাদিন পরিশ্রমের পর ফোকসালে ফিরে গেলেই ঘুম পায়। সে বাংকে শুয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ সালিমার সুন্দর উজ্জ্বল মুখ, নাকে নথ, মেয়ের ঠোঁটে রাজ্যের হাসি, এবং চোখে সালিমার স্বপ্ন নিয়ে জেগে থাকে। তারপর ঘুম চলে আসে। সুতরাং সে টের করতে পারছে না—কখন সুমন জাহাজে উঠে আসছে এবং কখন নেমে যাচ্ছে। সুচারু চা করে আনলে বলল, দুদিন থেকে সুমনটাকে দেখছি না। কোথায় যায়, কী করছে কে জানে।

সুচারু বলল, সেই বড় বাড়িতে যাচ্ছে। হেনরীর যেমন কাণ্ড। সুমন এখন আমাদের ওজালিও দ্য সুম্যান। সে আর ভারতবর্ষের মানুষ না, সে স্পেন দেশের লোক। যার বাড়ি, তিনি বিধবা যুবতী। তার পূর্বপুরুষ দাসপ্রথা রক্ষা করার জন্য লড়েছে। ভয়ঙ্কর বর্ণবিদ্বেষী। ধরা পড়লে রক্ষা থাকবে না। কী সাহস ওর বুঝতে পারছি না। হেনরী কাজটা ঠিক করেনি।

এই হেনরী ইনজিনীয়ার মানুষ, অথচ যেন সে এই জাহাজে কেবল পাখিওড়াতে এসেছে। কী দরকার ছিল সেই বিধবা যুবতীকে বলা, এই আমাদের সুমন, ওজালিও দ্য সুম্যান—ওর পিতৃপুরুষ বিখ্যাত ম্যাটাডর ওজালিওর বংশধর। সরল গোবেচারা সুমনকে কেন যে হেনরী এত বড় বিপদেব মুখে ঠেলে দিল। বিধবা যুবতী ভারোদী, মেয়ে তার মারিয়া। মারিয়ার চোখে, চুলে কি যেন রূপ আছে

প্রায় মায়াবিনীর মতো, বালিকা সুমনকে পাগল করে দিয়েছে। সে জাহাজ থেকে ছুটি নিয়ে বের হয়ে গেছে। কখন আসবে, কি আসবে না, কেউ যেন আর এখন তার খবর দিতে পারছে না।

ইতস্তত দু-একজন জাহাজীর কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। কেউ কেউ দরজা পার হয়ে অন্য ফোকসালে নেমে গেল। কেউ কেউ দরজায় উঁকি দিয়ে জাহাজ কবে ছাড়ছে কোথায় যাচ্ছে, সেকথা বলে গেল। ওরা অন্ধকার থেকে সব শুনল। পোর্টহোলের কাঁচ বন্ধ করে দিল সুচারু। বৃষ্টি আসছে। সে আলো জ্বেলে দিল। সামাদ চা খেতে খেতে শুনছিল বুঝি। দূরে দূরে যে-সব পপলার গাছ আছে তার ফাঁকে শহরের হাজার আলো জোনাকি জ্বলার মতো। সে বুঝি নিবিষ্ট মনে তাই দেখছে। সুচারু বলল, হ্যারে সামাদ, তোর চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

চমকে ওঠার মতো তাকাল সামাদ। সে এই অন্যমনস্কতায় লজ্জা পেল। কিন্তু চা খেতে খেতে তার চোখে অসহায় জ্বালা ক্ষোভ ফুটে উঠল। কি যেন দুরারোগ্য ব্যাধি ভিতরে ভিতরে কাজ করছে—সে কিছুতেই আর সুচারুর দিকে মন দিতে পারল না।

সুচারু বুঝল সামাদ তার বিবির খবরের জন্য উন্মুখ। বড় টিন্ডাল রহমান সম্পর্কে সে ক্রমশ নিস্পৃহ হয়ে পড়েছে। মনে হয় না এখন টিন্ডালের সম্পর্কে ওর কোন সন্দেহ অথবা সংশয় আছে। সে আর এখন মাঝে মাঝে, আমার সাদা কাগজটা বড় টিন্ডাল, এই বলে চিৎকার করে ওঠে না। কথায় কথায় ছুটে গিয়ে বড় টিন্ডালের সঙ্গে বচসা করে না। সুচারু এবং সুমন কিছুতেই এই রহস্য উদ্ধার করতে পারেনি। যত বার টিন্ডাল সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে চেয়েছে ততবার সামাদ চুপচাপ, আপন মনে প্রায় ঠিক সেই এক রহমানে রহিম বনে যাবার মতো মুখ করে থেকেছে। এই চুপ করে যাওয়া, ভালমানুষ হয়ে যাওয়া সামাদের—সুচারুর ভাল লাগছিল না। সে সকলের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করছে। সকলের সঙ্গে হেসে কথা বলছে। জাহাজীসুলভ ইতর কথা সে কারও সঙ্গে বলছে না। এমন কি গতকাল সুচারু সামান্য ইতর রসিকতা করতে গেলে রুষ্ট হয়েছিল। সে পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়তে আরম্ভ করেছে। এবং দিনের শেষে এই সন্ধ্যায় বৃষ্টির শব্দের ভিতর সে নিবিষ্ট মনে নামাজ পড়তে বসে গেল।

সবকিছুই সুচারুর আকস্মিক মনে হচ্ছে। সামাদ নামাজ পড়ার জন্য উপরে উঠে গেল। হাতমুখ ধুয়ে এবং অজু সেরে ফোকসালে ফিরে এল। কোন কথা বলছে না। প্রায় মোল্লা মৌলভীর মতো সে এখন গম্ভীর। সে একটা চাদর বিছাল বাংকে। হাঁটু মুড়ে বসল এবং সে তার ঈশ্বরের প্রতীক্ষাতে যথার্থই অন্য মানুষ হয়ে গেল।

তারপর একসময় অনেকক্ষণ সে চোখ বুজে থাকল। কোথাও আল্লার করুণার কথা ভেবে গম ক্ষেতের ভিতর সহসা সালিমা যেন দূরে দূরে ভেসে উঠছে এবং সহসা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে যেন। সালিমা তার জাহাজী মানুষটির সঙ্গে সেই বিস্তীর্ণ এবং অসীম শস্যক্ষেত্রের ভিতর লুকোচুরি খেলতে চাইছে। সে পিছনে পিছনে যত ছুটছে তত মনে হচ্ছে ওদের পরস্পর ব্যবধানটা বেড়ে যাচ্ছে। কিছুতেই সে তার প্রিয় যুবতীকে ছুঁতে পারছে না।

সুচারু একসময় আর সামাদকে বিরক্ত করতে চাইল না। সে সন্তর্পণে ফোকসাল থেকে বের হয়ে গেল। সিঁড়ি ধরে ডেকে উঠে এল। এখন আর বৃষ্টি পড়ছে না। বন্দরে লাল নীল বাতি এবং মাস্তুলের আলো দুলছিল। তার বলতে ইচ্ছা হল আমরা জাহাজী মানুষ, কত দূরদেশে আমাদের যাত্রা, কত সমুদ্র পার হলে আমাদের বন্দর, বন্দরে আমরা কত অসহায়। সুচারু চুপচাপ রেলিঙে ভর করে দাঁড়িয়ে থাকল। গির্জার মাথায় ক্রস। সেখানে সে হেনরীর পাখিটা আবিষ্কারের চেষ্টা করতে গিয়ে দেখল—না পাখি, না ক্রস, কেবল অন্ধকার সামনে। এত দেশ ঘুরে, এত বন্দর ঘুরে সে তার সবুজ আলো আর আবিষ্কার করতে পারল না। আমরা সকলে সেই আলোর সন্ধানে ঘুরছি। এই বলে সে কিছুক্ষণ আকাশ দেখল, দূরের মাঠ দেখল এবং ওপারে নিগ্রো বস্তি পার হলে হাসপাতালের মাথায় ঈশ্বরের অপার মহিমার স্পর্শ পেল যেন। সে খুব বিচলিত বোধ করল। সে অন্ধকার ডেক থেকে কিছুতেই নড়তে পারল না।

॥ ষোল ॥

এই উপত্যকা সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে ক্রমশ উপরের দিকে যাচ্ছে। জমি বৃহৎ আকারের এবং জল ঝড়ের জন্য সামনের পথ ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসছিল। মারিয়া গাড়িতে জোরে জোরে গান গাইছে। সুমন একদিকে চুপচাপ বসেছিল। গাড়ির কাঁচে বৃষ্টির জল এবং বড় গাড়ি, ইচ্ছা করলে সে এবং মারিয়া আড়াআড়ি করে শুয়ে থাকতে পারে যেন। গুডুই ইচ্ছা করেই ধীরে ধীরে গাড়ি চালাচ্ছিল। শনিবারের বিকেল—ছুটির দিন সকলের। সুতরাং সব গাড়িগুলো হুস করে বন্দর থেকে হাই-ওয়ে ধরে ছুটছিল এবং ওদের অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে। অথবা পেছনে ফেলে টা-টা করে চলে যাচ্ছে। চারদিকে গাড়ি কাদাজল ছিটাচ্ছে। আর এক বিচিত্র শব্দ—বড় বড় রেডউড্ গাছগুলো থেকে জল পড়ছে সুতরাং জলের শব্দ। এইসব অভিজ্ঞতা সুমনের কোনদিন ছিল না, এত বড় গাড়ি চড়ে সে এবং মারিয়া ট্রাউটমাছ ধরতে যাচ্ছে। দু-ধারে কোথাও নিগ্রোপল্লী এবং হাঁস মুরগি এবং শূকরের ডাক। রেডউড্ জাতীয় গাছগুলো রাস্তা অন্ধকার করে রেখেছে।

সুমন ইচ্ছা করেই আজ পাশের সব গাছ-গাছালির নাম জানতে চাইল না। সে আমেরিকার দক্ষিণ অঞ্চলের নিগ্রো-পল্লীগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির জল মাঠ থেকে নেমে যাচ্ছে অথবা ছোট ছোট নিগ্রো বালকদের এই বৃষ্টির ভিতর ছোটাছুটি করতে দেখল। সে দেখল, কোনও নিগ্রো যুবক ঘরে বসে জানলায় মুখ রেখে এই বৃষ্টির শব্দ শুনছে।—কোনও নিগ্রো যুবতী বচসা করছে বোধ হয়। আর কোথাও টালির ছাদের মতো ঘর। কাঠের নীল লাল রঙের দেয়ালের জীর্ণ ভাঙা কাঠ খসে পড়ছে। কোথাও বড় খামার বাড়ি এবং সমুদ্রের ধারে বলে বড় বড় জাল শুকাবার জন্য থাম পোতা। আর সব হাস মুরগিরা গাড়ির শব্দে ছুটে পালাচ্ছিল। বাড়ির চিমনি থেকে ধোঁয়া উঠছে। গ্রামের শেষে কাঠের ভাঙা গির্জা তারপর কোনও ধাবার মতো মদের দোকান—সেখানে সব নিগ্রো পুরুষ রমণীরা এই দিনে জড়ো হয়েছে। কোথাও বড় বড় গোয়াল—আর সব বড় বড় গাভী। অনেক গোরু বাছুর, লম্বা কাঠ দিয়ে তৈরি খোঁয়ার, ভিতরে সব কাদা জলের ভিতর গোরুগুলো বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে হাম্বা হাম্বা করে ডাকছে। আর গ্রামের সব শেষে সমাধিক্ষেত্র। তারপর ফের লম্বা মাঠ, দু-ধারে সেই এক রেডউড্ জাতীয় গাছ—যেন মাঠের শেষ নেই, গাড়ি চলছে তো চলছেই। মাঠে জন-মনিষ্যির কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। দূরে দূরে সব গভীর বন। হাঁস মুরগি বোঝাই হয়ে বড় বড় ট্রাক দক্ষিণ থেকে উত্তরে ছুটছে। কোন রেড্ ইন্ডিয়ান যুবক ঘোড়ায় চড়ে শস্যক্ষেত্রের দিকে যাচ্ছিল। সামনে রেড্-ইন্ডিয়ানদের সংরক্ষিত অঞ্চল, আবার মাঠ এবং মাঠের শেষে বড় লম্বা একটা কাঠের ক্রস। ক্রসের নিচে এসে ওদের গাড়িটা প্রথমবারের মতো থামল। আর প্রথমবারের মতো মারিয়া এই গাড়ির ভিতর কথা বলল সুমনের সঙ্গে—ওজালিও তুমি—কথা বলছ না কেন? চুপচাপ চারপাশে এত কী দেখছ?

এ সময় বৃষ্টিটা ধরে আসছে। গুডুই ইনজিনের ডালা খুলে কী যেন দেখছে। শেষ বেলায় রোদ ওঠার জন্য অবেলায় মাঠ এবং গাছ-গাছালি খুবই ঝকঝকে মনে হচ্ছিল।—তোমার দেশ দেখছি মারিয়া, তোমার দেশের মানুষদের দেখছি।

সুমনের দিকে ঘাড় ঘোরাল মারিয়া, বলল, তুমি কথা না বললে আমার ভাল লাগে না ওজালিও। মারিয়া সুমনের মুখ দেখল, সরল নাবিক সুমন। অনভিজ্ঞ এবং তরুণ আর মারিয়া, কিশোরী। মারিয়া সুমনের হাত ধরে বলল, তোমার ভাল লাগছে না? আমাদের এই খামার, রোদ্দুর শেষ বেলায় ভাল লাগছে না?

—তোমাদের খামারে আমরা কখন পৌঁছাব মারিয়া।

—সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় পৌঁছে যাব। সেখানে সেই বুড়োবুড়িকে দেখবে—ওরা সেখানে আমাদের খামার দেখাশোনা করছে। মারিয়া সামান্য সময় মাঠের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, জায়গাটা তোমার খুব ভাল লাগবে।

—তাই বুঝি!

—মা যে ঘরটাতে এসে থাকেন, তার পাশে ছোট্ট একটা চিড়িয়াখানা, বড় বড় সব পাথর আর আমাদের প্রিয় নদী। বড় দুটো ওপোসাম আছে, সে দিন মা চিঠি পেয়েছেন—ওদের বাচ্চা হয়েছে। মিসেস উড্ বাচ্চাগুলোর কত রকমের গল্প লিখে জানিয়েছে।

গাড়ি ফের চলছিল এবং ওরা বড় একটা মোড় ঘুরতেই দেখল, সামনে বড় একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে। সেখানে টেলডন পরিবারের পরিচিতি লেখা আছে। তার নিচ দিয়ে এই খামারে ঢোকার পথ। সুমন বহুদূর পর্যন্ত চোখ তুলে তাকাল। শুধু জমি এবং নরম মাটি আর ঠিক বাংলাদেশের মতো সোঁদা গন্ধ উঠছে মাটি থেকে। সুমন বলল, তাহলে এসে গেছি।

মারিয়া হাসল। বলল, না ওজালিও আমরা এখনও আসিনি। আমাদের জমি মাত্র আরম্ভ হল। এখন প্রায় আরও আধ ঘণ্টার মতো গাড়ি চালালে তুমি আমাদের গ্রীষ্মাবাস পাবে।

এই পরিবারের গ্রীষ্মাবাস বড় কাছে যেন—ওরা তো ইচ্ছে করলে গরমের সময় উত্তরে চলে যেতে পারে অথবা রকি অঞ্চলের পাহাড়ি জায়গায়। সুমন বলল, গরমের সময় ঠাণ্ডায় যাওয়া দরকার। কিন্তু এখানেও গরমই মনে হচ্ছে মারিয়া।

মারিয়া বলল, গেলে বুঝতে পারবে।

মাঠের ভিতর দূরে দূরে আলো জ্বলছিল মনে হল। ওরা যখন সেই গ্রীষ্মবাসের ভিতর ঢুকে গেল তখন সামান্য রাত হয়েছে। ঠিক সদর দরজার সামনে মিঃ আর মিসেস উড্ ওদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ভিতরে ঢুকে সুমনের মনে হল জায়গাটা তপোবনের মত। এক ধরনের ঠাণ্ডা হাওয়া সেই তপোবনের মতো গাছ-গাছালির ভিতর প্রবাহিত হচ্ছিল যেন।

নানা জাতের গাছ জায়গাটাকে ঢেকে রেখেছে। কেয়ারী করা বাগান। মিঃ আর মিসেস উড্ নানা রকম মৌসুমী ফুলের চাষ করেছেন। মিস্‌ল্‌টোর লতার ঝোপ এবং পাশেই যেন জলাজমিতে বর্ণাঢ্য ফুল ফুটে আছে। বুনো মোস্কোদাইন এবং দ্রাক্ষালতায় ঢাকা ঘাস দিয়ে তৈরি অথবা ঘাসের প্লাস্টার দেওয়া কুঁড়েঘর। প্রচুর অর্থব্যয়ে মারিয়ার মা ভারোদী, এইসব ঘর নির্মাণ করেছেন। গাড়ি থেকে নামলেই মারিয়া বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, মাই সেলর ফ্রেন্ড ওজালিও দ্য সুম্যান। ইনি মিঃ উড্, সুমন সেই বুড়ো বুড়ির সঙ্গে হাত মেলাল। আর এ সময়েই সুমন ফাঁকা মাঠের ভিতর কিছু ঘোড়ার ডাক শুনতে পেল।

মিঃ উড্ আগে যাচ্ছিলেন। যাবার মুখে নানারকমের ফুল এবং লতাপাতা ওদের শরীরে লাগছিল। ওরা সেই লতাপাতার ঝোঁপ ফাঁক করে ঘরের দিকে এগোচ্ছে। মারিয়া প্রায় সব ব্যাপারেই সুমনকে সাহায্য করছিল।

মিসেস উড্ সুমনকে আলোর ভিতর দাঁড় করিয়ে এবার খুব ভাল করে দেখল। ঘাসের তৈরি এই কুঁড়েঘর দুটো মা এবং মেয়ের জন্য। ভারোদীর ঘরে মারিয়া থাকবে। এবং মারিয়ার ঘরে ওজালিও দ্য সুম্যান। সব এত পরিচ্ছন্ন এবং মিষ্টি গন্ধ ফুল-ফলের আর এই বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধার আদর, সুমনকে প্রায় বিব্রত করার সামিল। বৃদ্ধার গলায় বড় বড় পাথরের মালা। মাথায় রঙিন টুপি—শরীরের চামড়া কুঁচকে গেছে এবং চোখের ভিতর ঘোলাটে ভাব। মিসেস উড্ একবার দেখতে দেখতে চিৎকার করে উঠল, এ যে প্রায় দেবদূতের সামিল গা।

মারিয়া সুমনকে জড়িয়ে বলল, মাই সেলার ফ্রেন্ড। মাই ওজালিও। মাই এমিল। সে খুব আদর করার মতো কাছে টেনে বলল, সমুদ্রের ওপার থেকে সে আমাদের কাছে এসেছে। মা ওদের জাহাজে পাখির খোঁজে গিয়েছিলেন। মারিয়া প্রথম পরিচয়ের গল্পটা প্রায় বলে ফেলল। তারপর একসময় কাতর গলায় বলল, ওর মা নেই, বাবা নেই।

বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধার চোখ এই কথায় সজল হয়ে উঠল। বোধ হয় স্মৃতিতে ওদের সন্তানের মৃত্যুর ছবি ভেসে উঠছে। সেই মহাযুদ্ধের কবলে তাঁরা তাঁদের তিন সন্তানকে হারিয়েছিলেন। সুতরাং বৃদ্ধ বলে উঠল, ঈশ্বর মঙ্গলময়। বলে, বিশ্রামের জন্য ছোট পার্লারে নিয়ে সুমনকে বসাল। তাড়াতাড়ি সামান্য কফির আয়োজন করা হল। মারিয়া ঠিক ওর মা ভারোদীর মতো সুমনকে দেখাশোনা করছে।

সে সুমনের ঘরে ঢুকে কি কোথায় রাখা দরকার সব পরীক্ষা করে দেখল। বৃদ্ধার কাজে কোন ফাঁকি নেই। বাথরুমে টাওয়েল, গন্ধযুক্ত সাবান, পেস্ট এবং ঝরনার জল সব ঠিক আছে। বড় খাট, শিয়রে টেবিল, কিছু ক্লাসিকেল ইংরেজি বই এবং নীল আলোর ফুলদানিতে লতানে ক্লিমাটিস এবং কিছু হালকা গন্ধ যেন; সুমন—বাঙালি ছোকরা নাবিক এখন রাজার ছেলের মতো। হায়, বাঙালি ছোকরা নাবিক প্রেমের ফ্যাসাদে পড়ে গেল—মিথ্যা চাটুকার সাজাতে গিয়ে, জাহাজের চার নম্বর সাব হেনরীর দুষ্ট বুদ্ধিতে প্রেমের ফ্যাসাদে পড়ে গেল। মারিয়া সদা শঙ্কিত—কোথাও এই প্রিয় যুবকের আপ্যায়নের ত্রুটি ঘটে যাবে এই ভেবে।

মারিয়া নিজের ঘরে ঢুকে পোশাক পাল্টাবার জন্য বাথরুমে ঢুকে গেল। বৃষ্টি হয়েছে বলে বেশ ঠাণ্ডা মনে হচ্ছিল! সে বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হাত-মুখ সাবানে ঘসে ঘসে ধুল। খুব পাতলা ফ্রক গায়ে দেবার আগে হাত-কাটা হালকা গেঞ্জি গায়ে দিল। মখমলের মতো নরম সিল্কের গেঞ্জিতে বুকের সামান্য অঙ্গ ঢেকে প্রায় সবটাই খোলা রাখল আর কি প্রাণবন্তকর ইচ্ছা, শরীরের ভিতর যুবতী হবার! সব যেন ঠেলে-ঠুলে বের হয়ে আসতে চাইছে। নিজের অঙ্কুর উদ্‌গমনের কথা ভেবে আয়নায় প্রতিবিম্বের কাছে মারিয়া খুব সংকোচিত হয়ে পড়ল। সে তাড়াতাড়ি হালকা গরম পালকের মতো ফ্রক গায়ে দিয়ে বের হতেই দেখল, টেবিলে সুমন; সুমন স্নান সেরে খুব সাধারণ পোশাকে, অর্থাৎ পায়জামা পাঞ্জাবি সাদা রঙের—পিছন থেকে বড় লম্বা মনে হচ্ছে সুমনকে। সে টেবিলে বসে বইয়ের পাতা উল্টাবার সময়—ক্যাপ্টেনের মুখ মনে করতে পারল—জাহাজ-ডেকে বোট মাস্টারের কথা মনে পড়ল—এই দেশ উত্তর আমেরিকার, এখানে নিগ্রোবিদ্বেষ ভয়ানক—ভারতীয় জাহাজীদের সেজন্য এই বন্দরে নামা বারণ—কথাগুলো বার বার মনে পড়ছিল—এবং সুমনকে বড় অন্যমনস্ক করে দিচ্ছে।

অন্যমনস্কতার জন্য হোক অথবা অন্য কারণে সুমন বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারল না। সে বারান্দায় বের হয়ে পায়চারী করতে থাকল। আলো অন্ধকারে সবই রহস্যময় যেন। ডায়নামোর শব্দ ভেসে আসছে অনবরত। বড় বড় গাছগুলোর ফাঁকে আকাশ দেখা যাচ্ছে। আর বড় অবয়বের চাঁদ আকাশে; সব যেন ঠিক তপোবনের মতো মনে হচ্ছিল। মাঝে মাঝে সে ধূর্ত শেয়ালের ডাক শুনতে পেল। এবং মায়ের মুখ মনে পড়ছিল খুব। মারিয়া আপন আত্মীয়ের মতো, মারিয়াকে আর কিছুতেই বালিকা ভাবতে পারছে না সে। মনে হল সামনে এক সোনালি ধানের ক্ষেত, মনে হল সেই জমির উপর এক পুরুষ এবং অবয়বে সুমনের মতো। সোমবার বিকেলে জাহাজ ছেড়ে দিচ্ছে। স্পেনীশ যুবক সেজে বিখ্যাত অলীক ম্যাটাডরের বংশধর সেজে, ওজালিও দ্য সুম্যান সেজে যা হোক এই বন্দরের দিনগুলো সে স্বপ্নের মতো কাটিয়া দিতে পারছে। মাঝে মাত্র একটা দিন—তারপর হয়ত কতকাল পর ফের এই বন্দরে আসা হবে—খুঁজলে দেখা যাবে মায়ের মতো মেয়েও সেদিন বর্ণবিদ্বেষের যন্ত্রণায় ভুগছে। সে পায়চারী করতে করতে ভাবল, আজ রাতে মারিয়াকে বললে কেমন হয়! ভেবে মুখ তুলতেই দেখল মারিয়া ঘরের ভিতরে খাটে বসে পা দোলাচ্ছে।

সুমন ভিতরে ঢুকে ওর পাশে বসল।

—কেমন লাগছে জায়গাটা? মারিয়া বলল।

—ভাল! হেনরীকে নিয়ে এলে পারতাম।

—তোমার বন্ধুটি মা'র সঙ্গে মরগানে চলে গেছে।

—জানি। সুমনের বিধবা ভারোদীর কথা মনে আসছে। বিচিত্র সব প্রাণী পোষার শখ—সে একটা ক্যানারি পাখির খোঁজে হেনরীর কাছে গিয়েছিল—সেই প্রথম দিনের আলাপ—সহসা হেনরীর বলে দেওয়া—এই সুমন, বিখ্যাত ম্যাটাডর ওজালিওর বংশধর। হেনরীর দুষ্টবুদ্ধি সুমনকে স্পেনিশ যুবক ওজালিও দ্য সুম্যান করে তুলেছিল।

—জায়গাটা ছবির মতো। ভোর হলে দেখতে পাবে সব। সুমনকে চুপ থাকতে দেখে কথাটা বলল মারিয়া। দেখবে আমাদের জায়গাটা সব চেয়ে উঁচু। দেখবে চারধারে সব জমি ক্রমশ নিচে নেমে যাচ্ছে। তুমি বাইনোকুলার চোখে দিলে দেখতে পাবে ঠিক হ্যাগল মাউন্টের পাশে আমাদের ট্রাক্টারগুলোর গ্যারেজ। দক্ষিণ দিকে তাকালে দেখতে পাবে নিগ্রোদের বস্তি—ওরা আমাদের এইসব

খেত খামারে কাজ করে। আর পশ্চিমে দেখবে সব বড় বড় গাছ, ফাঁকে ফাঁকে মনে হবে বড় রাস্তা চলে গেছে। কিন্তু সেগুলো রাস্তা নয়—মিসিসিপি নদীর ছোট বড় খাড়ি। আর ঠিক দক্ষিণ-পুবে রয়েছে আমাদের এক বনাঞ্চল। সেখানে তুমি ইচ্ছা করলে কাল শিকারে যেতে পার। সব ধূর্ত শেয়াল চোখে পড়তে পারে তোমার, সুচতুর ওপোসামও তুমি দেখে ফেলতে পার; আর সব নানা রকমের বন্য পাখি। গিনি মুরগিরা পর্যন্ত সে সব জায়গায় ঘর তৈরি করে বেশ সুখে দিন কাটাচ্ছে।

সুমন বলল, ছেলেবেলাতে মা আমাকে রামের বনবাসের গল্প শোনাতেন। রূপকথার গল্প বলতেন। তপোবনের কথা বলতেন। জায়গাটা সেইসব গল্পের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

—তাই বুঝি!

অথবা সুমনের যেন বলার ইচ্ছা—অল দি সেইন্টস্ মে কাম হিয়ার টু লাভ য়্যু। অথচ সুমন কিছু বলল না। শুধু মারিয়ার মুখ দেখার জন্য বসে থাকল। মারিয়া এখনও পা দোলাচ্ছে। রান্নাঘর থেকে টাটকা রোস্টের গন্ধ ভেসে আসছে। বুড়ো বুড়ি এই ছোট্ট মেয়েটির সুখ-সুবিধার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করছে। স্থানীয় সব টাটকা জিনিস এনে ভাঁড়ার ঘর ভরে তুলেছে। কিছু পানীয়—কারণ সঙ্গে একজন বিদেশী বন্ধু আসছেন মারিয়ার। আর গুড়ুই গ্যারেজের দিকে গাড়ি নিয়ে চলে আসবে। ঠিক রান্নাঘরের ও-পাশে গুড়ুইর থাকবার ঘর। ঘরের লাগোয়া বড় এক হলঘরের মতো জায়গায় গুড়ুই থাকবে।

মারিয়া এবার উঠে এসে সুমনের টেবিলের উপর বসল। ঘরে হাওয়া ঢুকছিল বলে সুমন এবং মারিয়ার ববকাটা চুলে বাতাস যেন বিলি কেটে যাচ্ছে। মনে হল মুখে চুমকি পড়লে ঠিক জাপানী পুতুলের মতো, ভাল করে দেখলে মারিয়ার মুখ জাপানী পুতুলের মতো মনে হয়। ভারোদী টেলডনের মেয়ে মারিয়া; সে ওজালিও। সে এতদিন এই বিদেশিনীর কাছে ওজালিও সেজে থাকল। আর কথায় কথায় মেয়েটি বলত, ভালবাসার জন্য বলত, ওজালিও বড় হলে আমি তোমার দেশে চলে যাব। অথবা যেন ওর বলার ইচ্ছা আমি যুবতী হলে সংসার যুবতী হবে—তুমি সেন্ট পিটারের মতো কোনও ম্যাপলগাছের নিচে বসে থাকবে, আমি আমার সংসারের জন্য তোমাকে হন্যে হয়ে খুঁজব।

মারিয়া চুলে হাত রেখে বলল, ওজালিও তুমি, যত যাবার সময় আসছে তত কেমন চুপচাপ—কথা বলছ না ভাল করে। কেবল চুপচাপ আমার পাশে বসে থাকতে ভালবাসো।

সুমন চোখ তুলে তাকাল।

—তুমি অন্তত কিছু বল, চুপচাপ থাকলে আমার বড় কষ্ট। মনে হয় তুমি আমার জন্য ভিতরে ভিতরে আমার বিরহে কাতর।

সুমন এবার টেবিলে কনুই রেখে সেই জরির কাজ করা জাপানী পুতুলের মতো মুখের দিকে অপলক চেয়ে থাকল। কোনও কথা, কোনও আলাপ অথবা কোনও গল্প সে এখন মনে করতে পারছে না। বরং ওর ইচ্ছা হল সারারাত এভাবে, ওরা দুজন চুপচাপ বসে থাকবে। চুপচাপ বসে থেকে এই যে চারদিকে ঈশ্বর ঘাস, ফুল, পাখি এবং গাছ-গাছালি ছড়িয়ে রেখেছেন তার ভিতর এমন এক গান আছে—নীরবে শোনার মতো গান—কোন ফুলের ভিতর প্রজাপতির ডানায় রঙ, আহা আমরা মানুষেরা সুন্দরের জন্য পিপাসার্ত। ভারোদীর হিংসাত্মক কার্যকলাপ নিগ্রো যুবক-যুবতী সম্পর্কে, বড় ঘৃণার জন্ম দিচ্ছিল। সুমন ভেবে পাচ্ছিল না এই মারিয়া যার শৈশব প্রাচুর্যে কাটছে, এই মারিয়া যাব শরীর গমের শিষের মতো হালকা এবং যৌনজীবনে যুবতী হলে বড়ই যে পটু হবে, সে এ-ভাবে একজন সাধারণ নাবিকের জন্য হাহাকার করে উঠছে কেন। সে আলগা করে মারিয়ার কোমরে হাত রাখল, যেন এক সরল বালক এখন কোমল ভালবাসার উপর হাত রাখছে।

মারিয়া সুমনের কপালে চুমু খেল। ঠোঁটে চুমো খেল। বলল, মাই ওজালিও।

সুমন ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলল, কিছু বলবে?

—আমি বড় হলে তোমার দেশে চলে যাব।

—যাবে। কেমন অন্যমনস্কভাবে কথাটা বলল সুমন।

—তুমি যাবার আগে ঠিকানা দেবে না আমাকে?

সুমন অন্যদিনের মতো ফের বিব্রত বোধ করতে লাগল। মনে হল সব কথা বরং খুলে বলা ভাল।

যেন বলা ভাল, আমার দেশ মারিয়া স্পেন নয়, আমি ওজালিও দ্য সুম্যান নই। আমি একজন গরিব ভারতীয় নাবিক। তোমার দেশে কালো মানুষের প্রতি ভয়ঙ্কর বিদ্বেষ। অথচ আমি তোমাদের সঙ্গে সাদা মানুষের অহঙ্কার নিয়ে মিশেছি। আমি সুচতুর অভিনয়ে তোমাকে ঠকিয়েছি।

সুমন বলল, জাহাজী মানুষের আর কি ঠিকানা? এই কথা বলে সে রেহাই পেতে চাইল।

তারপর ওরা দুজন বারান্দা থেকে পরস্পর হাত ধরে নেমে গেল। চাঁদের আলো মাঠময়, সেই ডায়নামোর শব্দ ভেসে আসছে। নিচে পাহাড়ের গায়ে সারি সারি আলো দেখা যাচ্ছে আর বড় বড় গাছের ফাঁকে জ্যোৎস্নার আলো জাফরিকাটা। ওদের মুখে সেই সব ছায়া বড় বেশি কৌতূহল উদ্রেক করছে। ওরা হাঁটতে হাঁটতে ট্রাউট মাছ শিকারের গল্প আরম্ভ করল। মারিয়া গত বছর ট্রাউটমাছ শিকার করতে গিয়ে যে দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিল তার গল্প করল। ওরা কাল ভোরে হ্যাগেল মাউন্টের ওপাশটায় অথবা যেখানে বনের গভীরে ছোট নদী সমুদ্রে মেশার জন্য আকুল—ঠিক সেই বনের শেষে মাছ ধরার জন্য ওরা চলে যাবে। মিস্টার উড় সব ঠিক করে রেখেছেন। যতটা পথ পারা যাবে জিপে এবং পরবর্তী পথটুকু হেঁটে—এ-সব গল্পও মারিয়া সুমনকে শোনাচ্ছিল।

ওরা বড় একটা ওক গাছের নিচে সান-বাঁধানো বেদির উপর বসল। নরম ঘাস নিচে এবং অপরিচিত ফুলের সুবাসে জায়গাটা ভরে গেছে। মাথার ওপর মৌমাছি গুঞ্জন করছিল। বোধ হয় দ্রাক্ষালতায় ফুল ফুটবে। অথবা পালিত মৌচাক কোথাও রয়েছে।

খেতে বসে বৃদ্ধ উড় নানারকমের রসিকতা করলেন, তিনি একসময় মেক্সিকোর কোন দক্ষিণ অঞ্চলের শহরে মদের দোকান খুলে ছিলেন, সেখানে সামনে একটা মাঠ ছিল এবং মাঝে মাঝে বড় মেলা বসত এবং মেলায় বড় এক সার্কাস পার্টি আসত। ঠিক সিংহ বাঘের মেলা নয়, শুধু ষাঁড়ের মেলা। বড় বড় ষাঁড় ছেড়ে দিয়ে কয়েকজন মানুষ রিঙের ভিতর ঢুকে যাবে। ওরা রঙ-চঙে পোশাক পরে ক্লাউনের মতো ক্ষেপা ষাঁড়ের পেছনে ছুটে বেড়াত এবং ক্ষেপা ষাঁড়ের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য নানা অঙ্গভঙ্গি করত। সেই দেখে গ্যালারির মানুষগুলো হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ত। ওজালিও বিখ্যাত ষাঁড় লড়াইয়ের বংশধর সুতরাং বৃদ্ধ উড় সারাক্ষণ খাবার টেবিলে অতিথির প্রতি সম্মান দেখাবার জন্য ষাঁড় লড়াই সম্পর্কে মজার মজার ঘটনার উল্লেখ করলেন।

বড় দুটো খরগোশের রোস্ট। মারিয়া কেটে কেটে একটু বন্য কায়দায় সুমনের প্লেটে তুলে দিচ্ছে। কিছু ফ্রেঞ্চ বিন সেদ্ধ, কিছু গিনি মুরগির ডিম ভাজা, চা এবং পরে পানীয়। স্যালাড সামান্য লেটুসের। আর ফলের আরক রাখা আছে।

পেটা ঘড়িতে ঘণ্টা বাজছিল। রাত দশটা, ওরা তাড়াতাড়ি খেতে থাকল। কারণ সকাল সকাল শুয়ে পড়তে হবে। মিঃ উডের নির্দেশ মতো ওদের খুব সকালে ওঠার কথা। তিনি বিকেলেই সব ঠিক করে রেখেছেন। নানা রকমের মশলা তৈরি করিয়েছেন মাছ শিকারের জন্য। তিনি আজ একবার জিপগাড়ি করে জায়গাটাও নির্বাচন করে এসেছেন। যে পাথরটার চারপাশে জল নেমে যাচ্ছে এবং যে-পাথরটার খাঁজে কিছু লম্বা ঘাস ছিল—তা পরিষ্কার করে জায়গাটাকে পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করেছেন। এই অঞ্চলে যেহেতু কিছু রেটল সাপের-প্রকোপ আছে তার জন্য চারপাশে কিছু নিগ্রো শ্রমিক রেখেছেন যারা সব সময় মারিয়া এবং অতিথিটির উপর সতর্ক নজর রাখবে। মিঃ উড় বুড়ো মানুষ—মারিয়াদের কর্মচারী। যেন কোনও ত্রুটি না থাকে। তিনি মাছ শিকারের জন্য কী কী ব্যবস্থা করে রেখেছেন সব হুবহু বলে যেতে থাকলেন।

মিঃ উডের সঙ্গে কথাবার্তার সময় মারিয়াকে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছিল। বোধ হয় সে এখন তার মায়ের মতো চোখমুখ করে এস্টেটের কর্মচারীটির প্রতি একটু রাশভারী হতে চায়। সে যে সামান্য বালিকা নয়, কথাবার্তায় তা বেশ টের পাওয়া যাচ্ছিল। সে হাত তুলে দেয়ালে আঁকা মানচিত্রের উপর একটা বড় লম্বা লাঠি রাখল। আর মানচিত্রের নিচে সেই লাঠি দিয়ে কী নির্দেশ করতেই উড় উঠে দাঁড়াল এবং বলল, এখানে এবার কিছু বুনে উঠতে পারিনি।

মারিয়া বলল, কেন?

—এবার জল এত বেশি যে আমরা গ্রীষ্মের ধান বুনে উঠতে পারিনি।

—মা বলেছিলেন যে এখানে পাম্পের ব্যবস্থা করা হবে?

—পাম্প ইনস্টলেশানের কাজ শেষ হয়ে ওঠেনি।

—তাহলে আগামী বছর থেকে এখানে কোন অজন্মা থাকবে না। বলে সে মানচিত্র থেকে এবার স্টিকটা তুলে নিল।

বৃদ্ধ বললেন, না।

মারিয়া এবার সুমনের দিকে মুখ তুলে বলল, তোমাকে খুব আশ্চর্য করে দিতে পারতাম।

সুমন বুঝতে না পেরে মাংসের টুকরোটা মুখে রেখেই হাঁ করে তাকিয়ে থাকল।

মারিয়া জিভের উপর থেকে চামচটা আংশিক সরিয়ে নিয়ে বলল, এখানে আমাদের প্রতিবছর ধানের চাষ হয়।

মিঃ উড্ ঘাড় কাত করে বললেন, জলের উপর সেই ধানগাছের ভিতর ছোট স্কিপে ঘুরে বেড়ানো বড় আমারদায়ক স্যার। বলে, সে মারিয়াকে গ্লাসে ফলের রস ঢালতে সাহায্য করল। তারপর ওরা চারজন সেই রসটুকু গিলে যে যার ঘরের দিকে এগুতে থাকল। বৃদ্ধ যাবার আগে সুমনকে অভিবাদন জানাল। সুমন কথাবার্তায় ওদের সঙ্গে বড় বেশি ভদ্র হয়ে উঠেছে। ওর এই মার্জিত আচরণ সব সময় প্রায় নির্বাক শ্রোতার ভূমিকা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে বড় খুশি রাখছে। এতদিন ওদের কথা বলার লোক ছিল না যেন অথবা সেই যুদ্ধের আমলের ছবি—মৃত সন্তানের জনক-জননীর মুখ বড় কষ্টের—দুঃখ এবং কাতর উক্তি সব সময় কথাবার্তার সঙ্গে মিশে থাকে।

সুমন বারান্দার শেষপ্রান্তে এসে বলল, দেন গুড-নাইট মারিয়া।

মারিয়া সুমনের মুখে হাত রেখে বলল, চুপ, তারপর চারিদিকে যখন দেখল কেউ কাছে নেই, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পাশের বাড়িতে চলে গেছেন এবং সেই ঝিঁঝি পোকার মতো ডায়নামোর শব্দ মাঠের উপর দিয়ে ভেসে আসছে তখন মারিয়া ওর হাত ধরে বলল, আমার ঘরে এস ওজালিও।

সুমন এই বালিকার কি ইচ্ছা এখন যেন স্পষ্ট ধরতে পারছে। সে তবু মারিয়ার সঙ্গে খুব সন্তর্পণে ঘরে ঢুলে গেল। মারিয়া দরজা বন্ধ করে দিতে গেলে সুমন অত্যন্ত আড়ষ্ট গলায় বলল, প্লিজ মারিয়া...

মারিয়াকে খুব অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে। ওর গলা চোখ মুখ যেন বসে যাচ্ছিল ক্রমশ। অত্যন্ত অধীর হয়ে পড়ছে। সে কোনওরকমে বলল, গুড়ুই আজ আমাদের পাশে থাকছে না।

—সে বাবুর্চিখানায় শোবে।

মারিয়ার সেই এক ক্ষীণ গলায় ডাক, ওজালিও অথবা যেন বলার ইচ্ছা আমার বড় কষ্ট, আমি এখন যুবতী হবার মুখে ওজালিও...।

সুমন খুবই বিচলিত। মারিয়ার কাছ থেকে সোজাসুজি এমন আচরণ প্রত্যাশা করেনি। তার এই ছদ্মবেশ থেকে যেন এক্ষুনি মুক্তি চাই। বলার ইচ্ছা, মারিয়া আমি ওজালিও নই। আমি ভারতীয় নাবিক। কাপ্তান আমাদের ভারতীয় নাবিকদের নামতে বারণ করেছিলেন। আমি মাটির জন্য, ভালবাসার জন্য নেমে এসেছি। সুমন অথচ কিছু প্রকাশ করতে পারছে না। মারিয়াকে বড় বেশি নির্লজ্জ এবং বেহায়া মনে হচ্ছে। সুমন শেষবারের মতো যেন বলল, তুমি দরজা থেকে সরে দাঁড়াও মারিয়া। আমার সাহস নেই। এমন সুন্দর মেয়েকে কিভাবে আদর করতে হয়—আমি ঠিক কিছু জানিও না। আমার ঘুম পাচ্ছে।

মারিয়াকে নড়তে না দেখে সুমন কঠিন গলায় ডাকল, দরজা থেকে সরে এস মারিয়া।

এই প্রথম সুমনকে যথার্থ পুরুষের মতো ভেবে লজ্জিত এবং সংকোচিত হল মারিয়া। সে দরজা খুলে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকল। ওর চোখ মেঝের দিকে, সে চোখ তুলে যথার্থই তাকাতে পারছে না। বস্তুত মারিয়ার সহসা এই নির্লজ্জ ভাবটুকু সুমনকে ব্যথিত করেছে।

কিন্তু মারিয়া খুব অসহায় বালিকার মতো মাথা নিচু করে দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল। সুমন দরজা অতিক্রম করে বারান্দায় এসে নামল। তারপর খুব সহজ গলায় বলল, এস বাইরে এস। আমরা বারান্দায় বসে মাঠ দেখি। ইচ্ছা করলে তুমি তোমার সেই যাদুকরের পালিত পুত্র এমিলের গল্প করতে পার।

মারিয়া সেই যে দাঁড়িয়েছিল মাথা নিচু করে—তার থেকে এতটুকু নড়ল না। সুমন বাইরে লম্বা চেয়ারে হাত রেখে মারিয়াকে বলল, আকাশ দেখে মনেই হচ্ছে না বিকেলে এত ঝড়-বৃষ্টি হয়ে গেছে।

মারিয়ার কী সব মনে হচ্ছিল তখন—অপমান স্ত্রীজাতির প্রতি পুরুষের অথবা মনে হচ্ছিল এই ভূমিখণ্ড বিদীর্ণ হলে সে তার ভিতরে যেন আশ্রয় নিতে পারত। সুতরাং মারিয়া যে-ভাবে দাঁড়িয়েছিল মাথা নিচু করে ঠিক সেই ভাবেই দাঁড়িয়ে থাকল। চোখ তুলে সে দেখল না মানুষটি তার অপেক্ষাতে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, মানুষটিকে সহসা অন্য গ্রহের বাসিন্দা বলে মনে হল। ঈশ্বরের জগতে সংযম এবং তিতিক্ষা বলে একটা বস্তু আছে যার দাম অথবা মূল্য প্রায় ঈশ্বরের সমান। আর সুমন যেন বুঝেছিল ভালবাসার দাম অত সহজ মূল্যে পরিশোধ করতে নেই। তাই সে সরল বালকের মতো মুখ করে যাদুকরের পালিত পুত্র এমিলের বাকি গল্পটুকু আগ্রহ ভরে শুনতে চাইল।

কিন্তু মারিয়া সেই যে দাঁড়িয়েছিল মাথা নিচু করে—আর এতটুকু নড়ল না।

সুমন বারান্দায় জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়েছিল। সুমন মারিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলল, জান মারিয়া এই মাঠের জন্যই হোক অথবা তপোবনের মতো জায়গাটা বলেই হয়ত আমার আর সমুদ্রে যেতে ইচ্ছে করছে না! তোমাকে নিয়ে সেই যে বলেছিলে না সামনে হ্যাগেল মাউন্ট আছে, অথবা বনাঞ্চলের কথাও বলেছিলে—সেখানে এই রাতে হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে।

তবু মারিয়া মুখ তুলে তাকাচ্ছে না। আর বারান্দা থেকে ওর মুখ স্পষ্ট দেখাও যাচ্ছিল না। সুতরাং সুমন দরজার ভিতর ঢুকে মারিয়ার মুখ তুলে ধরতেই দেখল মারিয়া অপমানে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সুমন ভয়ঙ্কর বিব্রত বোধ করতে থাকল। সে বলল—এই মারিয়া কি হচ্ছে! ছিঃ ছিঃ আমি কিছু বুঝে বলিনি। এই শোন—আহা এমন করতে নেই। মারিয়া...মারিয়া।

পাগলের মতো মারিয়ার ভিতর থেকে কান্নার আবেগ উঠে আসছিল। এ সময় বোধ হয় ওকে কাঁদতে দেওয়াই ভাল। সুমন দরজার উপর হেলান দিয়ে এবার একটা সিগারেট ধরাল। এবং সেই মাঠের দিকে মুখ করে সিগারেট টানতে থাকল। ঘরের নীল আলোর ভিতর মারিয়ার মুখ বড় বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। জানলাতে তেমনি সামান্য হাওয়া এবং চারপাশের নাম না জানা গাছগুলো থেকে পাতা ঝরে পড়ার শব্দ অথবা জলের ফোঁটা পড়ছে যেন কোথাও—তার শব্দ। অনেক দূর দিয়ে বোধ হয় কোন ট্রেন যাচ্ছে—তার শব্দ পেল সুমন। রাত ক্রমশ গভীর হচ্ছে। সামাদ এবং সুচারুর কথা মনে হল। বোধ হয় জাহাজের বাংকে শুয়ে ওরা ঘুমোচ্ছে। বন্দরের কিছু বেশ্যা মেয়ের মুখও মনে পড়ছিল সুমনের। জাহাজে ভয়ঙ্কর পিচিং-এর সময় কাজের ভিতর যে কষ্ট সবই ক্রমশ মনে আসছিল আর পাশে দাঁড়িয়ে লজ্জার জন্য হোক, অপমানের জন্য হোক অথবা দামী ভালবাসার জন্য হোক সরলমতি বালিকা কাঁদছে। সুমনের কিছুই এখন ভাল লাগছিল না। সে তো মারিয়াকে বন্দরের আর দশটা খারাপ মেয়ের মতো ভাবতে পারে না। সে যে কখন মারিয়াকে নিজের মধ্যে বড় জায়গায় বসিয়ে দিয়েছে জানেই না। কাল রবিবার, জাহাজের শেষ ছুটির দিন। এবং এই মারিয়া মায়ের মতো যেন আপন এই মারিয়া, সামান্য পরিচয় থেকে ভালবাসা—হায় জাহাজী মানুষের কত কষ্ট, সব ছেড়ে-ছুড়ে একদিন অন্য বন্দরের জন্য যাত্রা অথচ সে এই বনাঞ্চলের কোনও রেডউডের ভিতর অথবা কোনও বড় ফণীমনসা গাছের নিচে ছোট্ট এক কুঁড়েঘরের স্বপ্ন দেখল। সামনে নদী—কিছু শস্যক্ষেত্র এবং ফলের বাগান—কিছু গাভী আর সেই এক বালিকার মতো মুখ—মারিয়া, মায়ের মতো শাড়ি পরে দরজায় এই নদী-নালার মানুষটির জন্য প্রতীক্ষা করবে। এক সুখ-স্বপ্ন—এক ইচ্ছার কথা এবং স্বপ্নের মতো ইচ্ছা সুমনকে প্রাণের ভিতর বড় আকুল করছে।

সুমন এবার মারিয়ার হাত ধরল। বলল, এস।

মারিয়া সুমনের পাশে হাঁটতে থাকল। বিনীত এবং বাধ্য যুবতীর মতো অথবা বালিকা মারিয়া সুমনের পাশের চেয়ারে বসে চুপ করে থাকল। সামনে শুধু মাঠ। চাঁদের আলো মায়াময়। নানা রঙ-বেরঙের কেয়ারী-করা ফুলের বাগান আশেপাশে। সরু রাস্তার উপর নানা রকমের লতা-পাতায় আচ্ছাদন। এবং দূরের মাঠে জোনাকি জ্বলছে, এমন সব আলোর মালা—সব যেন হায় রহস্যে ঘেরা। পেটা ঘড়িতে রাত এগারোটা বাজল। কিন্তু উভয়ে কোন কথা বলল না। চুপচাপ মুখোমুখি বসে

রাতের কোলাহল—অর্থাৎ পাখিরা কোথাও ডাকছে প্রহরে প্রহরে, ঘাসের ভিতর ঝিঁঝি পোকার ডাক এবং ওপোসামের বাচ্চাটা মনে হয় মায়ের দুধ খাচ্ছিল—তার চুক চুক শব্দ মাঠ পার হয়ে এদিকে ভেসে আসছে। ওরা নিবিষ্ট মনে শেষ সময়টুকু খুব কাছে থাকছে। বাচাল ছোকরার মতো কথা বলে নির্মল জলে নিজের প্রতিবিম্বকে নিয়ে শুধু খেলা করতে চাইল না। বরং স্পষ্ট এক মানুষের চেহারা থাকুক, সন্ন্যাসীর মতো মুখ থাকুক, সন্ন্যাসিনীর মতো তিতিক্ষা এবং সংযম থাকুক সব সময়—ওরা বসে বসে তখন বোধ হয় তাই চাইছিল।

সুমন এবার উঠে দাঁড়াল। বলল, এবার শুতে যাও মারিয়া। রাত জেগে বসে থাকলে শরীর খারাপ হবে।

কিছু না শোনার ভান করে মারিয়া বসে থাকল। মারিয়া উঠল না। সামনের মাঠ দেখতে দেখতে বলল, গ্রামের মানুষরা সব হাহাকার করছে। সব গাছের পাতা ঝরে যাচ্ছিল। সুমন বুঝল, এবার মারিয়া সে তার প্রিয় যাদুকরের পালিত পুত্র এমিলের গল্প আরম্ভ করে দিয়েছে।

—গ্রামের পাশে নদী ছিল একটা। তার জল শুকিয়ে গেল। ফুলে ফলে ভরা সব গাছ নেড়া হয়ে গেল। বেঞ্চিতে বসে গ্রামের বৃদ্ধরা গাছের শেষ পাতা ঝরে পড়তে দেখল। গাঁয়ে তখন আর কোনও বালক-বালিকা দেখা যাচ্ছে না। এই মরুভূমি সদৃশ দেশের অবস্থা দেখে সকলেই আতঙ্কে পালিয়ে গেছে। এমিল এসে যাদুকরকে সব বললে—তিনি বললেন, তুমি সামনের মাঠ পার হয়ে চলে যাবে, সামনের গ্রাম মাঠ এবং পাহাড় পার হলে দেখবে এক নদী। নদী পাহাড় থেকে খুব জোরে নিচে নেমে আসছে বলে জলে স্রোত ভয়ঙ্কর। তুমি নদীর পাড়ে পাড়ে হেঁটে যাবে। লক্ষ করলে দেখতে পাবে একটা করে চাঁপাফুল জলে ভেসে যাচ্ছে। তোমাকে শুধু নদীর উৎসস্থলে সেই চাঁপা ফুলগাছটিকে খুঁজে বের করতে হবে এমিল।

—দিন যায়। এমিল হাঁটছে। সেই চাঁপাফুলের জল যেখানে পড়বে—সব যাদুর স্পর্শের মতো ফের ফুলে ফলে ভরে যাবে। প্রিয় এমিলের সঙ্গে তার পোষা বেড়ালটাও ছিল। ওরা হাঁটছে; মাঠ আর শেষ হচ্ছে না। কিন্তু এমিলের দুঃখ নেই, মানুষের জন্য, ফল ফুলের জন্য তার ভালবাসার অন্ত নেই। সে মাঠ এবং পাহাড় ভেঙে নদীর উৎস খুঁজতে যাচ্ছে। যেতে যেতে দেখল কোনও জন-মনিষ্যির সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। গ্রামগুলো সব হাহাকার করছে। সে ক্রমাগত হাঁটছিল। মানুষের জন্য সে দিন নেই, রাত নেই, হাঁটছে। তারপর সে একদিন নদীর উৎস খুঁজে পেল। পাহাড়ের মাথায় চাঁপা ফুলের গাছটি—বড় কষ্টসাধ্য ওঠা। নিচে নদীর জল, প্রপাতের মতো। গড়িয়ে পড়ে গেলে মৃত্যু। গাছটা থেকে একটা করে ফুল ঝরে পড়ছে। জলের ঘূর্ণিতে পড়েই ফুলগুলি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল দূরে। পোষা বেড়ালটা কেবল মিউ মিউ করছে! এমিল অনেক চেষ্টা করেও সেই ছোট গাছটিতে উঠতে পারল না, অথবা একটা ফুল সংগ্রহ করতে পারল না। কিন্তু দেখল, সোনার চাঁপাগাছটিতে একটি ছোট ফ্রক পরা মেয়ে তরতর করে উঠে যাচ্ছে এবং গাছের সরু ডালটিতে নেমে যাচ্ছে—হায় হায় নিচে প্রপাতের জল, পড়ে গেলে মরে যাবে—এমিল জীবনের মায়া না করে গাছটাতে উঠে গিয়ে ফ্রক পরা মেয়েটিকে নামিয়ে আনতে সাহায্য করল। নিচে নামলে দেখল, ছোট বালিকার হাতে সেই সোনার চাঁপা। চাঁপাফুলটি এমিলের হাতে দিয়ে ফ্রক পরা মেয়েটি অনেক বড় হয়ে গেল—ঠিক এমিলের মা'র মতো। তিনি সামনে দাঁড়িয়ে মা মেরীর গান গাইছিলেন আর বলছিলেন, আমি এই বনের দেবী, এমিল। যতবার যারা এই ফুল নিতে এসেছে ততবার আমি ছোট্ট মেয়ে সেজে গাছে উঠে গেছি। কিন্তু কেউ আমাকে রক্ষা করতে আসেনি। তারা ফুল না নিয়ে চলে গেছে। যাও এমিল, এই ফুলের জল সব গাছে গাছে, মাঠে মাঠে এবং নদীতে সর্বত্র ছড়িয়ে দাও। আবার ঈশ্বর মুখ তুলে তাকাবেন।

এইটুকু শেষ করে মারিয়া সুমনের মুখ দেখল। এই জ্যোৎস্না এবং নিঃসঙ্গ নির্জন রাত্রিতে সুমনের মুখে বোধ হয় ঈশ্বরের অপার মহিমার ছবি ফুটে উঠেছিল যা দেখে মারিয়া নিজের দুঃখ ভুলে যাচ্ছিল।

সুমন বলল, তারপর মারিয়া?

—তারপর থেকে শুনেছি, আমাদের ছোট্ট এমিল গাছে গাছে কেবল ফুল ফুটিয়ে যাচ্ছে। যেখানে

ফুল ফোটে না, শুনেছি সেই প্রিয় যাদুকরের পালিত পুত্র সেখানে চলে যায়। ফুল ফোটানো তার নেশা হয়ে গেছে।

মারিয়া এইটুকু শেষ করে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। মারিয়া এবার বিজয়িনীর মতো চলে যাচ্ছে। সে যাবার সময় একবার সুমনের দিকে তাকাল না পর্যন্ত। সুমন শুধু দেখল মারিয়া চলে যাচ্ছে। সে দেখল দরজা পর্যন্ত মারিয়া সোজা হেঁটে গেছে। তারপর কি ভেবে দরজার উপর মাথা রেখে সামান্য সময় মারিয়া অপেক্ষা করল এবং সুমনের কেন যে মনে হল না, আর না। আর স্পেনিশ যুবকের ছদ্মবেশ নয়। সব খুলে বলা দরকার। না বলতে পারলে চিরকালের জন্য সে মারিয়ার কাছে খাটো হয়ে থাকবে। সে বলল, তোমাকে আজ হোক, কাল হোক সব খুলে বলব। আমার ছদ্মবেশে তুমি প্রতারিত হও—আমি চাই না।

মারিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। কিন্তু সুমনকে ফের অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। সে বার বাব সিগারেট খাচ্ছিল। মারিয়া ক্ষোভে দুঃখে ঘরের ভিতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

সুমন বাকি রাতটুকু বাবান্দায় পায়চারী করল শুধু। সে ঘুমোতে পারল না। সে সামান্য নাবিক। সে সামান্য মিথ্যা কথা বলে এক অসামান্য ভালবাসায় জড়িয়ে পড়েছে। ওর মনে হচ্ছিল কেবল সে মারিয়ার সঙ্গে তঞ্চকতা করছে। অথচ জীবনের কোথাও না কোথাও মানুষ ফুল ফোটাতে চায়। সুতরাং সে ভাবল আজই সে সব খুলে বলবে, মারিযা আমি ওজালিও দ্য সুম্যান নই। আমি শুধু সুমন। আমি স্পেনিশ নই, আমার দেশ পূর্ববঙ্গ। গায়ের রঙ উজ্জ্বল বলে হেনরী স্পেনিশ বলে চালিয়ে দিয়েছে। আমি ভারতবর্ষের একজন গরিব মানুষ। আমার ঘর নেই, আমার মা নেই, বাবা নেই। আমার জন্য কোন ভালবাসা কোথাও অপেক্ষা করছে না। আমি একজন জাহাজের মানুষ, এখন শুধু জাহাজী। আর এই সব ভাবার সময়ই ভারোদীর সেই কঠিন মুখ,—এ অঞ্চলে ভারতীয় যুবকেরা নিগ্রো পুরুষের সামিল, ঘোর নিগ্রো বিদ্বেষী ভারোদী কিছুতেই তবে ক্ষমা করবে না। সেই কঠিন মুখের কথা মনে আসতেই পুলিশের কথা মনে হল। সে জাহাজ থেকে পালিয়ে নামছে। এ-কথা জানাজানি হলে—ওর অপরাধের ক্ষমা নেই। সে মারিয়াদের বড় দুর্গের মতো বাড়ির ভিতর বড় পাথরের ঘর দেখেছিল, বড় বড কুকুরের মুখ দেখেছিল। নিগ্রো পুরুষের সামিল ভেবে লিঞ্চিং অথবা গুপ্ত হত্যার কথা মনে এসে গেল। সে যত সেই প্রিয় এমিলের মুখ স্মরণ করে ফুল ফোটানোর চেষ্টায় সব কিছু খুলে বলবে স্থির করছিল, তত ভিতর থেকে সে বিষণ্ণ হয়ে পড়ছিল। সে সহসা ঠিক সামনে যেন দেখতে পেল, প্রিয় এমিল ফুল ফোটানোর জন্য মৃত গাছে, শুকনো নদীতে এবং মরুভূমির মতো বিস্তীর্ণ মাঠে চাঁপাফুলের জল দিয়ে যাচ্ছে। ওর ইচ্ছা হল সামনে যে মাঠ, যেখানে রাতের জ্যোৎস্না রহস্যময় এবং যেখানে জলাজমিতে সব বর্ণাঢ্য ফুল ফুটে আছে—ঠিক সেখানে অল্প সময়ের জন্য হাঁটতে।

কিন্তু সে বেশিদূর হেঁটে যেতে পারল না। ওর ভীষণ অবসাদ শরীরে। কিছুতেই ঘুম আসছে না। মনে হল সব খুলে বলতে পারলে হয়ত ওর ঘুম আসবে। সে ছুটে মরিয়ার ঘরের দিকে চলে গেল।

তখন প্রায় ভোর হয়ে আসছে। মারিয়ার ঘরের দরজা খোলা। ঘরের ভিতর শুধু নীল আলোটা জ্বলছে। চারপাশে কুয়াশার মতো ভাব। সুমন সামনে পিছনে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। সব অস্পষ্ট। শুধু কোথাও থেকে মিষ্টি সুর ভেসে আসছে পিয়ানোর! সে ধীরে ধীরে বাইরে বের হয়ে গেল। বাবুর্চিখানা পার হয়ে মাঠের গায়ে গির্জার সামনে—সে হেঁটে গেল। সে যত নিকটবর্তী হচ্ছিল তত পিয়ানোব সুর উঁচুলয়ে গম গম করে উঠছে। সে কুয়াশার ভিতরে অস্পষ্ট আলো দেখতে পেল। মনে হল মারিয়াদের পারিবারিক গির্জার ভিতর কে যেন আলখেল্লা পরে ক্রসের সামনে দাঁড়িয়ে পিয়ানো বাজাচ্ছে। সে ধীরে ধীরে ভিতরে ঢুকে গেল। পিছন থেকে সেই মখমলের মতো আলখেল্লা মেঝে পর্যন্ত লুটাচ্ছে। খুব দীর্ঘ মনে হচ্ছিল অবয়বকে। সে বিস্মিত, কারণ মারিয়া এই গির্জার মানুষটি সম্পর্কে সুমনকে কিছু বলেনি। সে কিছুক্ষণ গির্জায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে পিয়ানোর বাজনা শুনল। এই ভোরের হাওয়া এত মিষ্টি লাগছিল, এত তাজা মনে হচ্ছিল যে সে তার তঞ্চকতার কথা ভুলে গিয়ে বেদীর সামনে এগিয়ে যেতে থাকল। সে ভেবেই পাচ্ছিল না, স্লিপিং গাউন পরলে মারিয়াকে এত লম্বা মনে

হতে পারে, এত দীর্ঘাঙ্গী! সে বেদীর সামনে দাঁড়াতেই বুঝল অন্য কেউ নয়,—মারিয়া নিজে, মারিয়া পাগলিনীপ্রায় ঝড়ের বেগে পিয়ানো বাজিয়ে চলেছে। চেতনাশূন্যপ্রায় মারিয়া। ঝড়ের বেগ এখনও বাইরে তেমনি আছে। সুতরাং এই ঘরের পর্দা উড়ছিল। মারিয়াকে এখন যথার্থই যুবতী মনে হচ্ছে। যেন প্রথম থেকে ইচ্ছা করে সাজানো সব আধো আধো কথা মারিয়ার—অত্যধিক আদর অথবা যত্নের জন্য যুবতী হবার বাসনাকে ঢেকে রেখেছিল। এই সুমন এক আশ্চর্য দেশের যুবক, সে যাদুকরের মতো পাষাণে জলের উৎস খুলে দিয়েছে। সুমন ধীরে ধীরে হাতে রাখল মারিয়ার কাঁধে। সে আজ আর কিছুতেই ব্যক্তিগত অপরাধের কথাটুকু বলে মারিয়ার স্নিগ্ধ মুখে হতাশার ছবি এঁকে দিতে পারল না। সে শুধু ধীরে ধীরে বলল, ভোর হয়ে গেছে মারিয়া। এবার আমাদের ট্রাউটমাছ শিকারে যাত্রা করতে হয়।

॥ সতেরো ॥

ভোরের রোদে মাঠ, গাছপালা ঝলমল করছে। খুব ভোবে ভোরে রওনা হবার কথা! কিন্তু আস্তাবল থেকে ঘোড়া আসতে দেরি হয়ে গেল। মারিয়া জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। পাশে সুমন। সামনে বিস্তীর্ণ নিচু জমি এবং পরে নদী। নদী পার হলে সেই প্রিয় পাহাড়। সুমন দূরবীনে সব দেখছিল। মারিয়া কোথায় কি আছে, কোন্‌দিকে তাকালে হেগেল মাউন্ট অথবা তার পাদদেশে এখন কি কি ফুল ফোটার কথা, কোন্ কোন্ প্রজাপতি ওড়ার কথা এবং পাখিদের ডিম পাড়ার সময় হল কি না সব বিস্তারিত বলে যাচ্ছে।—দেখতে পাচ্ছ সেই হেগেল মাউন্টেব পাশে আমাদের ট্রাক্টরগুলোর গ্যারেজ। একটু দক্ষিণে তাকাও...দেখতে পাচ্ছ কিছু নিগ্রো পল্লী। সুমন মারিয়াব কথামতো দূরবীনের কাঁচে সেই ছোট্ট পাহাড়, গ্যারেজ, এক নিগ্রো পল্লী অথবা দূরের সব ঘাস মাটি দেখে কেমন আবেগে ডুবে গেল। এখন আর সেই বিষণ্ণ, করুণ ভাব মারিয়ার চোখে-মুখে নেই। শুধু সারারাত জেগে থাকার জন্য চোখের নিচে সামান্য কালচে আভা কেমন কাজল মাখানো চোখ করে দিয়েছে।

তারপর ওরা দেখল আস্তাবল থেকে ঘোড়া আসছে। ঘোড়াগুলো মাঠের উপর দিয়ে ছুটে আসছে। কি দ্রুত দৌড়াতে পারে। শিকারী কুকুর রয়েছে সঙ্গে। ঘোড়াগুলো দ্রুত ছুটে আসছে। গ্যারেজ থেকে জিপ বার করা হচ্ছে। সামান্য ট্রাউটমাছ শিকারে যাবার জন্য কত রকমের ব্যবস্থা।

মিঃ উড্ জিপের সামনে বসেছিলেন। পেছনে সুমন এবং মারিয়া। ঘোড়ায় চড়ে গুডুই আসছে। তার কাঁধে বন্দুক ঝুলছে। জিপ ঘটাং ঘটাং শব্দ তুলে চড়াই উতরাই পার হয়ে যাচ্ছে। ছোট ছোট ঝোপ এবং চষা মাঠের মতো জমি—চারধারে বড় বড় সব উঁচু লম্বা গাছ—জিপ এঁকে বেঁকে যাচ্ছে। ফলে মারিয়া এবং সুমন স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছিল না। ভীষণ দুলছিল। ভীষণভাবে একে অন্যের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল। আর মারিয়া সেই এক নদীর উৎসে বসন্তের ঝরনার মতো কল কল হেসে সুমনের উপর লুটিয়ে পড়ছিল। ওদের হাত-পা ব্যথা হবার যোগাড়! পিছনে ঘোড়ায় চড়ে কিছু নিগ্রো যুবক আসছে। ওরা সব সময় দূরত্ব বজায় রেখে চলছে! জিপের ভিতর মিঃ উড্ সব বকমের সরঞ্জাম মাছ ধরার জন্য ঠিক করে রেখেছেন। ট্রাউটমাছদের এখন ডিম পাড়ার সময়। ওরা নদীর জলে উজান পেলে বেগে উপরে উঠে আসে। ব্যাঙ অথবা আরশোলা জলের উপর ভেসে থাকলেই হল। গপ্ করে গিলে ফেলবে।

এই অঞ্চলের মাটি গিরিমাটি রঙের। বৃষ্টি হয়েছে বলে ধুলো উড়ছে না। ছোট বড় পাথর জমিতে। বড় বড় ঘাস। ঘাসের ভিতরে জিপটা প্রায় ডুবে আছে। ঘোড়াগুলো এখন আর দেখা যাচ্ছে না। ঘাসের উপর শুধু মানুষের মাথা দেখা যাচ্ছে। ঘাস লম্বা বলে ঘোড়াগুলো পেছনে লাফিয়ে লাফিয়ে আসছে। মারিয়া এবং সুমনের মুখে ঘাসের স্পর্শ লাগছে। কোথাও ছোট কাঠের সেতু, কোথাও দু-পাশে পাতাহীন লম্বা গাছ যা মৃত বলে মনে হয় এবং ক্রমশ ওরা গভীর বনের ভিতর ঢুকে যাচ্ছিল। যেতে যেতে মিস্টার উড্ই বেশি গল্প করছিলেন। তিনি বনাঞ্চলের নাম, গাছের নাম এবং ফুলের নাম বলে যাচ্ছিলেন, এই বনে রেটল্ সাপ এবং পুমা নামক বাঘ জাতীয় জন্তু সহসা চোখে পড়ে যেতে

পারে। পায়ের নিচে রাইফেল। সব ঠিক ঠাক। মিঃ উড্ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য সব রকমের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। সবরকমের নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখতে হয়েছে, কারণ তার উপর ফুলের মতো মারিয়া এবং এই অতিথির রক্ষার দায়িত্ব। তার কোন ত্রুটির জন্য ওদের কোন অসুবিধা হলে অসম্মানের আর অন্ত থাকবে না।

গভীর বনের ভিতর লম্বা সরু গাছ দেখতে পেল। বড় বড় পাতা এবং পাতার ফাঁকে ফাঁকে সাদা লাল অথবা নীল রঙের ফুল দেখতে পেল। এখানে ঘাস এত মসৃণ যে শুয়ে বসে থাকা চলে যেন। কোনও ঝোপ জঙ্গল নেই। পাতা পড়ে নেই—নির্মল আকাশের মতো বনের এই অংশটা পরিচ্ছন্ন। শুধু লম্বা গাছগুলো অনেক উপরে উঠে গিয়ে ছাতার মতো ছায়া দিচ্ছে। ওরা এবার হেঁটে যাবে। ঘোড়াগুলো গাছে বেঁধে রাখা হল। পাতা এত ঘন এবং গাছের ছায়া এত ঘন যে এতটুকু রোদ মাটিতে এসে পড়ছে না। সুমন এমন সুন্দর বনভূমি দেখে বিস্মিত হল। সে মারিয়াকে ঠাট্টা করে বলল, বুঝলে মারিয়া আমার মনে হয় সেই যাদুকরের পালিত পুত্র, আমার আসার আগে এ পথে চলে গেছে। ফুল ফুটিয়ে অন্য বনভূমিতে যে-সব গাছ আমরা আসার পথে মৃত দেখে এসেছি সেখানে চলে গেছে।

এমন বনভূমি পেলে কেবল ছোটা যায়। কেবল লুকোচুরি খেলা যায়। গাছে গাছে কেমন সব লতানে গাছ, গাছে হলুদ রঙের বন্য ফল। কুচফলের পাতার মতো লতাগাছ। ওদের মুখে শরীরে সেই সব লতা সুড়সুড়ি দিলে যা হয়, যেন পুলকিত হওয়া চলে, পুলকিত হলে বন এবং নদী পার হয়ে কোনও দূর দেশে আশ্রমের মতো ঘর করে বসবাসের ইচ্ছা। সুমন ভাবল, যদি যেতে যেতে তেমন কোনও আশ্রয় মিলে যায়। যেতে যেতে যদি কোনও নদী মিলে যায় এবং সামান্য শস্যক্ষেত্র মিলে যায়—তাহলে আর কি লাগে? নদীর জল, বনের ফল আর জমির শস্য। জীবনে মারিয়ার মতো ফুল ফুটে থাকলে শুধু ফুল ফল শস্যই ঈশ্বরের সামিল। সে এবার আড়ালে মারিয়ার মুখ দেখার জন্য টুপ্ করে বনের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ডাকল, মারিয়া আমি কোথায়?

—তুমি কোথায় ওজালিও!

—তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ না?

—আমি দেখতে পাচ্ছি না।

—আমি এদিকে। তুমি এস।

—আমার ভয় করছে।

—ভয় কি। আমি তো রয়েছি।

—তুমি হাত বাড়িয়ে দাও। হাত না বাড়ালে আমি যেতে পারছি না।

সুমন বলল, আমি এখানে।

—তুমি কেবল দূরে সরে যাচ্ছ ওজালিও।

—না আমি এখানে! সুমন জোরে চিৎকার করে বলল।

—অনেক দূরে চলে গেছ ওজালিও।

—না আমি এখানে। আমাকে তুমি তুলে নিয়ে যাও।

—এত দূরে চলে গেছ! তুমি কোথায় ওজালিও। পাহাড়ে পাহাড়ে ওদের কথার প্রতিধ্বনি উঠছে। যেন এই প্রতিধ্বনি ভুবনময় ছড়িয়ে পড়ছে। দেখ আমরা হারিয়ে গেছি। আমাদের খুঁজে নাও। সুমন ছুটছিল, ছোট ছোট টিবির আড়ালে আড়ালে ছুটছিল। ক্ষণে দেখা গেল সুমন ছুটছে; ক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেল। মারিয়া দেখেই ডাকল, ওজালিও তুমি একা কোথায় যাচ্ছ! পথ হারিয়ে ফেলবে। সামনে যে-বন আছে বনের ভিতর ঢুকে গেলে তুমি পথ চিনতে পারবে না। তুমি আর ছুটো না।

পিছনে উড্। ওদের শুধু অনুসরণ করা। উড্ মাছ ধরার জায়গা করছে। গুডুইকে শুধু মারিয়ার পিছনে অনুসরণ করতে বলছে। গুডুইকে ফলে দেখা যাচ্ছে না। সে ঘোড়ায় চড়ে অনেক দূরে দূরবীনে ওদের পথ এবং বনের ভিতর ওদের ছোটাছুটি দেখে মনে মনে হাসছিল। মারিয়াকে খুব ভীত দেখাচ্ছে। কোথায় ওরা চলে এসেছে কে জানে। সে নিরুপায় হয়ে ডাকল, গুডুই। বনের ভিতর মুহূর্তে

তোলপাড় শব্দ শোনা গেল। গুড়ুইর নেড়া মাথা দেখা গেল। সামনে এসে একেবারে হাজির। সে পায়ের কাছে বসে পড়ল। মারিয়ার ভয় কেটে গেছে। সে বলল, যা তুই। মাছের জায়গা ঠিক করে রাখ। আমি ওজালিওকে নিয়ে ফিরছি।

একটা টিবির উপর দাঁড়িয়ে সুমন ডাকল, দ্যাখো দ্যাখো মারিয়া কী সুন্দর পাখি!

মারিয়া এবার ছুটে টিবিটার উপরে উঠে গেল। বলল, কোথায়?

—দেখতে পাচ্ছ না! বলে হাত তুলে দিল সুমন।

এক জোড়া পাখি। ওরা নিবিষ্ট মনে সুমন এবং মারিয়াকে দেখছে। পাখির রঙ সোনালি। ঠোঁট নীল রঙের। পা রুপোলি রঙের। চোখের রঙ লাল—সিঁদুরের মতো লাল। সুমন বলল, দেখলে মনে হয় এরাই সানপাখি।

মারিয়া কিছুক্ষণ দেখল পাখি-জোড়া। ওরা ওদের ভাল করে দেখার জন্য গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়াল।—কী সুন্দর না দেখতে।

—ঠিক তোমার মতো মারিয়া।

—আমি খুব সুন্দর!

—খুব। তুমি পাখির মতো দেখতে।

—ওজালিও। মারিয়া সুমনকে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু সুমন বলল, পাখি দ্যাখো মারিয়া।

—তোমার হাত বড় ঠাণ্ডা ওজালিও।

—পাখির চোখ দ্যাখো মারিয়া।

—বুকে তোমার শব্দ হচ্ছে না ওজালিও।

—পাখির হৃদ্‌পিণ্ডে শব্দ হয় না।

—তুমি কি ওজালিও!

—আমি কিছু না।

—তোমার কি কিছু ভাল লাগে না।

—আমার সব কিছু ভাল লাগে মারিয়া।

—ভাল লাগলে তুমি এমন ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছ কেন!

—দ্যাখো গুড়ুইর মুখ! সুমন দূরে গুড়ুইকে লতাপাতার ভিতর আবিষ্কার করে পাথর হয়ে গেল।

—তুমি ওদিকে তাকাবে না। তোমার ভয় কি!

—গুড়ুইকে বড় ভয় লাগে!

—তুমি রাজার মতো থাকো।

—আমি সামান্য জাহাজী।

—না তুমি রাজা। বনের রাজা! তুমি দ্যাখো। তুমি দ্যাখো। তুমি নিজেকে দ্যাখো।

—কোথায় দেখব। কার আয়নায় মুখ দেখব মারিয়া।

আমার চোখে তুমি তোমার মুখ দ্যাখো বুঝি বলার ইচ্ছা হল মারিয়ার। কিন্তু বলতে পারল না। মারিয়া, পাগলের মতো বনের রাজাকে, যেমন লতাপাতা বড় বৃক্ষ পেলে জড়িয়ে ধরে আশ্রয় চায়, আকাশ স্পর্শ করতে চায়, তেমনি মারিয়া সুখ অথবা আকাশ স্পর্শ করার লোভে সুমনের গায়ে লতাপাতা হয়ে গেল। বনের রাজা স্থির ছিল কারণ, কেবল যেন এক দ্রুতগামী অশ্বের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সেই অশ্ব একবার পুবে আবার পশ্চিমে ছুটছে। অশ্বারোহী মানুষের ভয়ঙ্কর মুখ লতাপাতার আড়ালে কেবল ভেসে উঠছে।

মারিয়া লতাপাতা হয়ে গেল। সময় পার হল; কিন্তু বনের রাজা পাথর। সুমন কোন কিছুই পরিবর্তে অর্পণ করল না। সে শুধু শরীরে তার মারিয়া নামক লতাপাতা নিয়ে স্থির থাকল। মারিয়া ক্রমে আকুল হল, মারিয়া ক্রমে বনের ভিতর সোজা হয়ে দাঁড়াল এবং পাথরের কাছে কিছুই প্রাপ্য নেই ভাবতেই সে ছুটতে থাকল। এবার সুমনও ছুটতে থাকল। মারিয়া বেশি দূরে যেতে পারল না। জমিটা ক্রমে উঁচুতে উঠতে উঠতে নদীর খাদে শেষ হয়ে গেছে। সেই জমির আড়ালে দাঁড়িয়ে সে

তাদেব প্রিয় নদীটা দেখতে পেল। অনেক নিচে নদী খুব সরু জলের রেখাতে বইছে। সুমন এবং মারিয়া পাড়ে দাঁড়িয়ে সেই নদীর জল উবু হয়ে দেখতে থাকল।

সুমনকে বেশ প্রসন্ন দেখাচ্ছে। মনে হল গুডুই যথার্থই মাছ ধরার জায়গা করার জন্য মিঃ উডের কাছে ফিরে গেছে। যখন এত গাছগাছালি রয়েছে, যখন দু-পাশে হ্যাগল মাউন্টের ছায়া রয়েছে এবং উপত্যকার মতো বনভূমি তখন বনের রাজা হতে ক্ষতি কি! সে রাজা হয়ে সব দুঃখ ভুলে থাকার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। সব নৃশংস ঘটনা মনে উঁকি দিচ্ছে। কেবল গুডুইর মুখ ভেসে উঠছে আর সেই আত্মীয়ের মুখ—মা যার ভয়ে সর্বদা বিষণ্ণ থাকতেন। মা'র মুখে এক গ্লানিকর ছবি ফুটে থাকত সব সময়। কেবল তিনি যেন সুমনের জন্যই বেঁচে আছেন, সুমন কবে বড় হবে, সুমন বড় হলে সুমন আর তার মা—মা'র চোখে তেমন একটা আশার আলো ফুটে থাকত। কিন্তু কেন জানি আসার আগে মা'র চোখ সাদা সাদা দেখাচ্ছিল, মা সব সময় গর্ভবতী রমণীর মতো দুঃখে কাতর থাকতেন। কী যেন এক রহস্য লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন তিনি—তার সব ধরা পড়ে যাবে, ধরা পড়ে গেলে তিনি আর মুখ দেখাবেন কি করে—সেই ভয়। আর আত্মীয়টি সুমনকে নানাভাবে অত্যাচার করত পীড়ন করত। সুমন দুঃখে এবং বেদনায় শীতের এক ভোরে হালিসহরের ক্যাম্পে জাহাজী মানুষের ছাড়পত্র নিয়ে রাইফেল ট্রেনিং-এ চলে গেল। সামান্য দু'মাস আড়াই মাসের ট্রেনিং, তারপর ভদ্রা জাহাজ! ভদ্রা জাহাজের চ্যাটার্জি সাহেবের মুখ মনে পড়ছিল কেবল। সবকিছু ছেড়ে এত দূরে দেশে এই বনের ভিতর মারিয়ার পাশে নিজেকে বড় বেশি অবিশ্বাস্য। কেমন স্বপ্নের মতো ঘটনা, কেমন যাদুকরের ভোজবাজির মতো গোটা জীবনটাই পাল্টে গেল বুঝি!

সহসা মারিয়ার চিৎকারে সুমনের হুঁশ ফিরে এল। নিচে এক নিগ্রোপুরুষ চুরি করে মাছ ধরছে। মারিয়া চিৎকার করছে, হেই তুই কে রে? চুরি করে মাছ ধরছিস?

সুমন বলল, কী করছ। মাছ ধরছে ধরুক না। কিন্তু মারিয়া সুমনের কথা আদৌ ভ্রূক্ষেপ করছে না! যারা দূরে দূরে ছিল তারা পর্যন্ত ছুটে আসছে। বুঝি গুডুইর ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঘোড়ার খুরের শব্দ পাথরে ঠোক্কর খেয়ে আগুন ছড়াচ্ছিল। মানুষটি তাড়াতাড়ি বড়শি ফেলে দিল হাত থেকে। সে উপরের দিকে তাকাল! সুমন অবাক—মনে হচ্ছে বার্ট যেন। ঠিক বার্টের মতো মুখ। এবং মনে হয় নিচে সেই নিগ্রো পুরুষ যে বিস্ময়ে হতবাক। যার মুখ থেকে কথা সবছে না। আর তোতলতামিতে পেয়ে বসেছে—হতবাক মানুষটি কোথায় বড়শি ফেলে বনের ভিতর লুকোবার চেষ্টা করবে —তা না, সে সেই যে উপরের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে—মুখ আর নামাচ্ছে না। কারণ বুঝি এই মানুষের বিশ্বাসে কিছুতেই সায় দিচ্ছে না—সুমন, সরল নাবিক সুমন জাহাজ থেকে পালিয়ে এতদূরে চলে আসতে পারে! বার্ট বনের ভিতর অদৃশ্য হবার পরিবর্তে ক্রমশ সামনের দিকে উঠে আসতে থাকল। ঠিক খাদের মুখে এসে যখন দেখল—না সুমনই, সে চিৎকার করে উঠল, হেল্যো ইন্ডিয়ান। তুমি এখানে! কি সর্বনাশ।

মারিয়া ব্যাপারটা প্রথম বুঝতে পারল না। জঘন্য নিগ্রো যুবকের সঙ্গে কি করে আলাপ! সে একবার বার্টকে দেখছিল, একবার সুমনকে। উড্ এবং গুডুইকে পাশাপাশি কোথাও দেখা যাচ্ছে না। সুমন বার্টকে সহাস্যে বলল, আমি ট্রাউটমাছ ধরতে এসেছি।

বার্ট চিৎকার করে বলল, হাউ ইটস পসিব্‌ল। তুমি কি করেছ! সুমন বুঝতে পারল, এই পরিবার এ-অঞ্চলে কুখ্যাত পরিবার। নিগ্রো পুরুষ-রমণীর কাছে ভয়ঙ্কর পরিবার। তার পক্ষে এতদূর আসা উচিত হয়নি। সে এবার স্থির করে ফেলল, গতকাল যা সে বার বার মারিয়াকে বলবে বলে স্থির করেছিল, এই মুহূর্তে সব বলে দেবে—কারণ বার্ট উঠে আসছে; তার কাছে পরিচয় জেনে নেবে মারিয়া—সুমনের আত্মসম্মানের পক্ষে ভয়ঙ্কর লজ্জা। সে তাড়াতাড়ি চিৎকার করে সেই পাহাড়ময় প্রতিধ্বনি তুলে দিল—আমি মারিয়াদের কাছে ইন্ডিয়ান নই। স্পেনিশ। আমি সুমন নই, সুম্যান দ্য ওজাল্গিও।

বার্ট এবার যথার্থই বোবা বনে গেল যেন। কি সর্বনাশ, এই মানুষের এখন প্রাণ বাঁচানো দায়। এই আগুন নিয়ে খেলা, সুমন আগুন নিয়ে খেলছে—কী যে করা উচিত, বার্ট স্থির করতে পারছে না, সে পায়ে শক্তি পাচ্ছে না। পা অবশ হয়ে আসছে। সে দুর্বল বোধ করছিল। এখন কি বলা দরকার সুমনকে

সে বুঝতে পারল না। কিছু বলতে গেলেই এত নিচে সে আছে যে চিৎকার করে না বললে কিছু শুনতে পাবে না। অথচ আশেপাশে এই মেয়ের রক্ষাকারী গুডুই থাকতে পারে, ফার্মের ম্যানেজার উড্ থাকতে পারে এবং সেই সব গুপ্তচর মানুষ, যারা এখানে সেখানে নীল রক্তের সম্মান রক্ষার্থে অর্থাৎ আমরা সাদা মানুষ, আমরা উচ্চবর্ণের মানুষ, গোরু ঘোড়ার সামিল কালোজাতির রক্তে স্বাধীনতার ইচ্ছা বেইমানের সামিল; এবং সব কিছু বেইমানের সামিল ভেবে—যেখানে যত নীতি ন্যায় সব ধূলিসাৎ করে ওরা বুঝি এবার ঘোড়া ছুটিয়ে দেবে। বার্ট ঘোড়ার পায়ের শব্দ—বুঝি পাহাড় উৎবাই পার হয়ে গেলে সামনে যে নদী, নদীর দু-পাশে ঘাস এবং ঝোপের ভিতর যে সামান্য পথ, সেখানে যেন খুরের শব্দ, দ্রুত কারা ছুটে আসছে সুমনকে ধরার জন্য—শুনতে পেল। যদি সুমনের এই স্পেনিশ ছদ্মবেশ ধরা পড়ে যায় তবে নির্ঘাৎ গুপ্তহত্যা অথবা আকস্মিক মৃত্যু। রক্ত নীল নয়, বাপু তুমি কালো মানুষ, এত কি স্পর্ধা থাকে তোমার—এমন যে নীলবর্ণের রক্ত, রক্তের ভিতর কেবল নীল পদ্ম ফুটে থাকে, তুমি এমন কি মানুষ, যার রক্ত নীল নয়, সাদা নয় এবং যে রক্ত কালো এবং বিষের মতো যে রক্তে কেবল নোনা স্বাদ...ফুলের মতো মেয়ে মারিয়ার সঙ্গে লুকোচুরি খেলে ভেবেছিলে পার পাবে—কে যেন, বুঝি গুডুই আশেপাশে রয়েছে, কুকুরের মতো ঘ্রাণ-শক্তি গুডুইর থাকে। ওর সেই ভেসে ওঠা মুখ এবং মাঝে মাঝে অতিকায় এক দৈত্য সদর দেউড়ি আগলে আছে, বন-উপবনে ঢুকতে মানা—সেখানে সেই ফুলকুমারী যার দু-পাশে ক্ষীরের নদী, মাথায় যার সোনার পাহাড় এবং গাছে গাছে মণি-মাণিক্য ঝুলছে—তুমি এক সামান্য কালো রক্তের মানুষ, কোথাকার এক উটকো লোক এসে এমন নীল রক্তকে ছুঁয়ে দিলে। সুতবাং বার্ট চিৎকার করে আর কিছু বলল না। সে উঠে আসতে থাকল। সে দ্রুত পাহাড় বেয়ে উঠে আসতে থাকল। সে মুখে আঙুল রেখে অনেক দূর থেকে হুঁশিয়ার করে দেবার অছিলাতে নানারকমের অঙ্গভঙ্গি করতে থাকল। যেন বলার ইচ্ছা, বাপু আর কোন কথা নয়। ভালো ছেলে স্পেনিশ ছেলে ওজালিওর মতো দিনটা কাটিয়ে জাহাজে ফিরে যাও। বাপু তোমার যে কি সব ছেলেমানুষী। বার্ট মনে মনে সুমনের উপর ক্ষেপে গেল।

গল্পের এমিল তখন সুমনকে তাড়া করছে। মাঠে মাঠে ঘাসে ঘাসে এমিল ফুল ফোটাচ্ছে। এখন সেই যেন এক এমিল। সদর দেউড়িতে গোপন অহঙ্কার দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে। সে ফুলে ফুলে সেই দৈত্যকে মানুষের গান শোনাতে চাইল। ওর হাতে সেই জল। সব অহঙ্কার, মানুষের অহঙ্কার মুছে দিয়ে—আমরা নিয়ত এক মানুষ, বর্ষায় বৃষ্টিতে আমরা নিয়ত এক মানুষ, তুমি আমি এবং সকলে। এই পৃথিবীময় নিরূপম এক সৌন্দর্য আছে—যেখানে যা কিছু ফুল ফল সব আমাদের জন্য মানুষের জন্য। এস এবারে ফুল ফোটাই। সুমনের মনে হল জীবনে এই প্রথম সে একবার ফুল ফোটাবার সুযোগ পেয়েছে। সে কোনদিন এমন সুযোগ আর পাবে না। সেই চাঁপাফুলটি আর হয়তো ঈশ্বর তার হাতে কোনদিন গুঁজে দেবেন না। সে মনে মনে বলল, এই সময়, এমন সময় আর আসবে না।

মারিয়া অবাক চোখে দেখতে পেল বার্ট শশকের মতো ক্রমে ছুটে আসছে। সে চড়াই উতড়াই পার হয়ে আসছে। কখনও ওর মুখ দেখা যাচ্ছে, কখনও ঝোপ জঙ্গলের ভিতর হারিয়ে যাচ্ছে। ওর সেই দ্রুত ধাবমান অশ্বগুলির খুরে কোন শব্দ উঠছে না। কেমন সব নিমেষে চুপ হয়ে গেছে। ওরা জঙ্গলের ভিতর কান পেতে সকলে কী শোনার চেষ্টা করছে। সে সন্তর্পণে এবার সুমনের বুকের কাছে মুখ এনে বলল, সুম্যান তুমি স্পেনিশ নও। তুমি...তুমি...।

—না।

সুমনকে শান্ত এবং স্থির দেখাচ্ছিল। কোন আবেগ বোধ করছিল না। আমার পরিচয়ে আমি। আমার রক্ত নীল নয়, আমি ভারতবর্ষের মানুষ, গরিব এবং উদ্বাস্তু এসব বলার ইচ্ছা। আমার দেশ ছিল মাটি ছিল, আমার খালের জলে বড় বোয়াল মাছ ভেসে আসত, আমি ভোর হলে মাঠ পার হয়ে তরমুজ খেতে চলে গেছি আর আমাদের ছোট একটা নদী ছিল—দু-পাড়ে বনজঙ্গল ঘাস দেখলে মনে হবে এই যেন সেই নদী এবং আমার ছোট্ট এক বাল্য সখা ছিল—কি নাম তার, আমি তার নাম তোমাকে বলতে পারব না মেয়ে, আর ছিল আমার মা। বাবাকে মনে করতে পারি না।

মনে করতে পাবলেও মা'র মুখ এত বেশি কাছের যে, বাবাকে খুব দূরের মানুষ বলে মনে হয়।

তোমাকে আমি মেয়ে, প্রাণের চেয়ে বেশি মূল্য দিয়ে ভালবেসে ফেলেছি। আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি। আমি বাংলা দেশের মানুষ মারিয়া।

—তবে তুমি স্প্যানিশ নও। কেমন আবেগে মারিয়ার কণ্ঠ রুদ্ধ হতে চাইল।

—আমি ইন্ডিয়ান মারিয়া। কত দিন আমরা সমুদ্রে ছিলাম। যেন আমরা কোনদিন আর তীর পাব না মনে হত। মাটি আমরা আর দেখতে পাব না। মাটিতে আর কোনদিন পা দিতে পারব না। মারিয়া, সে কোমল গলায় ডাকল। এবং মারিয়া চোখ তুলে তাকালে বলল, মাটির লোভ বড় লোভ। মাটির লোভ সামলাতে পারিনি। আমি এক মহান ভারতবর্ষের লোক।

মারিয়া কোথায় এবং কবে যেন এই মহান ভারতবর্ষের নাম শুনেছিল। বার্ডস ইন মাই ইন্ডিয়ান গার্ডেন বইটির কথা মনে আসছে। কত দূর সেই দেশ, কত নদী নালা এবং সমুদ্র পার হলে সেই দেশ—মারিয়ার কল্পনায় তা এল না। সে দেখল ওজালিও মাথা তুলে ওর দিকে তাকাতে পারছে না। মারিয়ার বলার ইচ্ছা যেন তাতে কি হয়েছে, তুমি যে দেশের হও, ওজালিও আমার কাছে তুমি যাদুকরের পালিত পুত্র। তবু মারিয়ার চোখে কেন যে আতঙ্ক।

বার্ট ছুটছে তখন। সে উপরের দিকে ছুটে আসছে। ওকে দেখা যাচ্ছে না। সে শস্যক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে ছুটছে। শুধু এখন তাকালে, গাছগুলো নড়তে দেখা যাচ্ছে। মনে হবে কোন প্রাণী যেন ভয় পেয়ে ছুটছে।

সুমন সব খুলে বলল, আমি একটা বড় রকমের অপরাধ করে ফেলেছি। তোমাকে খুলে বলাই ভাল। তোমার সঙ্গে এত মিশেও কেমন ছোট হয়ে ছিলাম নিজের কাছে। এখন আর নিজেকে ছোট মনে হচ্ছে না। আমি বাদামী মানুষের জাত। রঙটা এমনিতেই উজ্জ্বল ছিল, সমুদ্রে ঘুরে ঘুরে আরও উজ্জ্বল হয়ে গেল। হেনরীটা বুঝলে আমাকে তোমাদের কাছে স্পেনিশ বলে চালিয়ে দিল।

মারিয়া কথা বলছিল না। অথবা কি বলবে ভাবতে পারছিল না। সে কেমন ভিতরে ভিতরে আতঙ্কে কাঁপছে।

—জাহাজ বাঁধার সময় জানতে পারলাম আমরা যারা ভারতবর্ষের লোক তাদের নামতে দেওয়া হবে না। কালো সাদাতে ভীষণ দাঙ্গা। আমরা তোমাদের কাছে কালো মানুষের মতো বলে বুঝি এমন একটা নিষেধ জাহাজে পাচার হয়ে গেল।

মারিয়া কেমন হতাশ চোখে এখন সুমনকে দেখছে। বাজ পোড়া মানুষের মতো মারিয়া স্থির এবং অপলক। সে কেমন পাথর হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

—দিনের পর দিন, আমাদের যারা ইউরোপের লোক, তারা বেশ নেমে যাচ্ছে। আমরা নামতে পারছি না। আমাদের খুব কষ্ট হত। ছুটি হলেই তোমাদের সুন্দর উইচককের পথের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। যেন কেউ আমার জন্য সেখানে অপেক্ষা করে আছে মনে হত। অথবা কেউ আমাকে নিতে আসবে এমন মনে হত। কার জন্য আমার এই প্রতীক্ষা, আমি বুঝতে পারছিলাম না। এক বিকেলে তুমি এলে জাহাজে। হেনরী আমার বন্ধু লোক। আমার দুঃখটা বুঝতে পারত। হেনরী সুযোগ বুঝে আমাকে ওজালিও বলে চালিয়ে দিল।

মারিয়া কিন্তু কোন কথা বলতে পারছে না। সে বুঝি তা হলে এবার যথার্থই পাথর বনে যাবে।

—তুমি কথা বলছ না কেন মারিয়া। তুমি এমন চুপচাপ থাকলে আমার কিন্তু ভয় করে। এই মারিয়া, মারিয়া। সে দু'হাতে ধরে মারিয়াকে ঝাঁকাতে থাকল।—শোন লক্ষ্মী, আমার সোনা, তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না। কতদিন মনে করেছি তোমাকে খুলে বলব। কতদিন মনে হয়েছে, না আর না, বন্দরে আর নামব না। তোমার সঙ্গে মিশব না। মিথ্যা ওজালিওর অভিনয় করব না। কিন্তু সব ভুলে গেছি। তোমার এমন সুন্দর চোখ, সোনালি চুল আমাকে পাগল করে দিয়েছে মারিয়া। মারিয়া প্লিজ কথা বল। এ-ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে আমি সাহস পাচ্ছি না।

বার্ট তেমনি ছুটে আসছে শস্যক্ষেত্রের ভিতর। ঘোড়ার পায়ের শব্দ তেমনি প্রতিধ্বনি তুলে কোথাও খুব কাছে এসে থেমে গেল। চারিদিকে এত ফুল ফল, চারিদিকে এমন সবুজ শস্যক্ষেত্র, আর নদী পাহাড় মিলে এমন নিসর্গ বনভূমি কি করা যায়, মারিয়ার চোখ সাদা দেখাচ্ছে, মারিয়ার উজ্জ্বল

চোখ বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে, বুঝি মূর্ছা যাবে মারিয়া—সুমন তাড়াতাড়ি ধরে ফেলল। এবং বুকের কাছে নিয়ে বলল, আমার কথা ভেবে মূর্ছা যাচ্ছ মারিয়া। তবু তুমি স্পষ্ট শুনে রাখ—আমি লোভে এমন করিনি। তোমার জানা দরকার, আমি ভারতবর্ষের লোক। আমি জাহাজী মানুষ। আমি ওজালিও নই। আমার বংশে কোন ষাঁড় লড়িয়ে ছিল না। তার নাম পর্যন্ত তাঁরা শোনেননি। দেশের একটা ঠিকানা তোমাকে দিতে পারি, কিন্তু কোন লাভ হবে না। সেখানে আমার কেউ নেই, মা নেই, বাবা নেই, সংসারে আমি বড় একা। আত্মীয়টি মায়ের মৃত্যুর পর কোনও সম্পর্ক রাখবেন কি না সন্দেহ আছে। আমার মা'র সঙ্গে ওর কোনও সম্পর্ক ছিল বুঝি। আমার মা'টা মরে গেল। মরে গেল না মেরে ফেলল, কে জানে। বলে, সে সামনের গাছপালার দিকে তাকিয়ে থাকল।

সেই শস্যক্ষেত্রের ভিতর তেমনি বার্ট উঠে আসছে। ও খুব কাছাকাছি এসে গেছে। সে একটা টিবির পাশ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে এল।

সুমন ফের মুখ তুলে নিল মারিয়ার। বলল, আমার মুখের দিকে তাকাও মারিয়া। দ্যাখো, আমি সেই মায়ের পুত্র। আমি আর কতটা ভাল হব। আর তখনই সুমন দেখল বার্ট একটা টিবির পাশ থেকে হামাগুড়ি দিচ্ছে উঠে আসার জন্য।

সুমন যেন এবার যথার্থই সাহস পেয়েছে। সে ডাকল, বার্ট।

বার্ট সেখান থেকেই হাত তুলে দিল। বলল, শিগ্‌গির পালাও সুমন। গুড়ুই ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে। সে খবর দিতে বাড়ির দিকে ছুটছে।

মারিয়া মূর্ছা যাবার আগে সামান্য সময়ের জন্য প্রাণ পেল বুঝি। গুড়ুই ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে। এইসব বনভূমি, সমতল মাঠ এবং নদীনালা পার হয়ে সে বেগে ছুটে যাচ্ছে খবর দিতে। এক খবর—কোথাকার এক কালো আদমী, জাতে বর্ণসংকর এত বড় বংশের নীল রক্তের মর্যাদাকে ধূলায় লুটিয়ে দিয়েছে। দু-পাশে যে অরণ্য রয়েছে সেখানে শুধু সেই ঘোড়ার পায়ের টগবগ শব্দ ক্রমে দূরবর্তী হচ্ছিল। মারিয়ার চোখে এক ভয়ঙ্কর ত্রাস ফুটে উঠছে। বড় বড় সব ডালকুত্তা কতদিন পরে ছাড়া পেয়েছে। লোহার জাল থেকে ছাড়া পেয়ে ওরা যাদুকরের পালিত পুত্রকে খরগোশের মতো পায়ের কাছে ফেলে রেখেছে : মারিয়া পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল, সুমন, মাই ফ্রেন্ড। সে ভাল করে জড়িয়ে ধরল সুমনকে। এবং বার্টকে উদ্দেশ্য করে বলল, আপনি একমাত্র ওকে রক্ষা করতে পারেন। ঈশ্বরের দোহাই, আপনি ওকে নিয়ে যান।

সে তাড়াতাড়ি বার্টের কাছে ছুটে গেল। চারিদিকে বড় বড় গাছের জন্য টিবিটার উপরে উঠে বার্টকে সে দেখতে পেল না। কেবল দূরে দেখতে পেল সমতল ভূমির উপর দিয়ে লম্বা ঘাসের ভিতর গুড়ুই অশ্বারোহী সৈনিকের মতো দ্রুত ছুটছে। এবং মৃত্যুর জন্য বুঝি এক তরুণ যাদুকর প্রস্তুত হচ্ছে। এই পাহাড়ের পাশে অথবা অন্য কোথাও এক ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের ছবি ভেসে বেড়াচ্ছিল আর কুকুরের ছবি—বড় বড় কুকুর যেন ঘোৎ ঘোৎ করছিল এবং চারপাশ থেকে পার্টির সেই যুবকেরা ঘোড়ায় চড়ে উঠে আসছে। কুকুরগুলো সামনে পথ দেখিয়ে চলছে। যে পথেই সুমন ছুটে যাক না, কুকুরগুলো ঠিক সেই সেই পথে ছুটে যাবে।

বার্ট বলল, আমার সঙ্গে তোমাকে পালাতে হবে সুমন।

—কোথায়?

—সামনের দিকে। দু-চোখ যেদিকে যায়। নদী পার হয়ে আমরা চলে যাব।

—অঃ। সুমন যেন কিছুই শুনছে না।—কি সুন্দর এই নদী মারিয়া।

বার্ট ক্ষেপে গেল, সুমন জলদি করো।

মারিয়া বলল, সুমন প্লিজ।

বার্ট বলল, এক্ষুনি পালাতে হবে। দেরি করলে ধরা পড়ে যাব। সামনে নদী। নদী পার হলে বন পাব। তারপর বড় রাস্তা আছে।

—বনের ভিতর আমি তুমি মারিয়া—বেশ হবে।

—সুমন! বার্ট চিৎকার করে উঠল। দেরি করলে কিছুতেই আর রক্ষা করা যাবে না।

সুমন সামান্য হাসল। কথা বলল না। সে যেন আবার নিজের ভিতর ডুবে গেছে। মনেই হয় না, সুমন এখন এক বনের ভিতর, গাছপালা পাখির ভেতর আটকা পড়েছে। কোথাও যেন কারা ঘোড়ায় চড়ে ছুটছে, কেউ যেন এই বনের ভিতর হামাগুড়ি দিচ্ছে। এক বাদামি মানুষকে পাকড়াও করার জন্য। এই অরণ্য কেমন ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। সে সোজাসুজি বলল, আমি ইন্ডিয়ান, মারিয়া।

মারিয়া কি যে করবে ভেবে পাচ্ছে না। ওর শরীর কাঁপছে, হাত-পা কাঁপছে। ওর গলা কাঠ-কাঠ; শুকনো। জল তেষ্টা পাচ্ছে কেবল। সে এমন এক সোজা সরল নাবিকের দিকে তাকাতে পারছে না। তাকালেই বুকের ভিতরে টুপটাপ্ শিশিরের শব্দের মতো কান্না ফোঁটা ফোঁটা হয়ে জমছে। সে কোনরকমে বলল, বার্ট হেলপ্ মি। তুমি ওকে নিয়ে কোথাও চলে যাও। বার্ট এক্ষুনি মিঃ উড্ চলে আসবেন। আমি যে কী করব! গুড্ডই সব জেনে ফেলেছে, সে ঘোড়ায় চড়ে শহরের দিকে ছুটছে।

সুমন মারিয়ার হতাশ চোখ দেখে মজা পাচ্ছে। এই মেয়ে যেন তার কত কালের আত্মীয়া। ওর মা'র কথা মনে পড়ছে। সুমনের মনে হল—এই মেয়ের এখন কিছু ভাল লাগছে না। ঠিক মায়ের মতো এই মেয়ে, সুমনকে রক্ষা করতে চাইছে। ঝড়-ঝাপটা যা কিছু আসবে, সব মারিয়া বুক পেতে নিতে পারবে ভাবতেই সে কেমন আরও মহান হয়ে যেতে চাইল। এর চেয়ে আর কি প্রাপ্য আছে জীবনে, যেন এই জীবন ফুলের মতো; ফুল ফোটাও, তুমি সুমন ভারতবর্ষের মানুষ, তুমি তো সুমন ইচ্ছা করলেই ফুল ফোটাতে পারো। কারা যেন এই ফুল ফোটাবার কথা বলছে। কারা যেন এই বনের ভিতর হাঁকছে ফুল ফোটাও। সে চারিদিকে তাকাতে থাকল। না কেউ হাঁকছে না। মারিয়া ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সে মনে মনে বলল, তুমি মেয়ে কাঁদছ। আমার জন্য কাঁদছ। তবে আর আমার ভয় কিসের। আমি তো আর পালাতে পারি না। আমি পালালে, বলবে বেটা একটা ইন্ডিয়ান পালাচ্ছে; মারিয়া তুমি আমার দিকটা ভেবে দেখছ না। তুমি কেবল নিজের ভালাবাসার দিকটা দেখছ।

বার্ট আর পারছে না। সে চিৎকার করে উঠল, কি হচ্ছে তোমার! ছেলেমানুষির একটা সীমা আছে। গুড্ডই খবর নিয়ে যাচ্ছে। তুমি না পালালে বাঁচবে না।

মারিয়া ওকে নদীর ঢালুতে নিয়ে যাওয়ার জন্য হাত ধরে টানতে থাকলে সুমন বলল, তোমার মা কি ভাববেন! আমি তোমাদের অতিথি। তিনি আমাকে কত বিশ্বাস করে এখানে পাঠিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা না করে গেলে বড় অভদ্রতা হবে।

বার্ট বলল, সুমন ইউ উইল ডাই। আমরা কিছু করতে পারব না।

মৃত্যু! মৃত্যু কথাটা শুনতে ভারি মজা লাগছে। কেন এই মৃত্যু। অসম্ভব।

বার্ট ফের বলল, লিঞ্চিঙ। কুকুর দিয়ে খাওয়ানো হবে। এখনও পালালে তোমাকে আমরা রক্ষা করতে পারি।

—কোথায় পালাব!

—নদীর ওপারে।

—তা হলেই বুঝি পালানো যায়। নদীর ওপারে গেলেই বুঝি পালানো যায়। বলে ফের বালকের মতো হেসে দিল সুমন।

বার্ট বলল, আমরা যদি এই বনের ভিতর দিয়ে হাঁটতে পারি তবে ভোরের দিকে নদীর মোহনাতে লুজান বলে একটা গ্রাম পাব। সেখানে আমার পিসিমার মোটরবোট আছে, বোটে আমি সমুদ্রে পৌঁছে দেব। এরা তোমার নাগাল পাবে না।

মারিয়া বলল, আমি সঙ্গে যাব বার্ট। আপনি আমাকে প্লিজ সঙ্গে নিন।

—পাগল তুমি। বার্ট যেন নিজের কাছেই কৈফিয়ত দিচ্ছে।—তুমি গেলে ব্যাপারটা আরও খারাপ হবে। তুমি লক্ষ্মী মেয়ে, ঘরে ফিরে যাও।

সুমন এবার উপহাসের ভঙ্গিতে বলল, তুমি বেশ মজা দেখতে এসেছ। এই প্রথম সে বার্টকে ঠাট্টার সুরে কথা বলল, আমি বেটা, ইন্ডিয়ান—পালাব, আর তোমরা সারা জীবন গল্প করবে, বেটা এক ইন্ডিয়ান ফল্‌স মেরে প্রেম করে চলে গেল। শালা নদীর পার ধরে পালাচ্ছিল। ওতে নেই বাপু। আমার

আর কি আছে। এসবও ভাবল। মা নেই। আত্মীয়-স্বজন বলতে কেউ নেই। মারিয়াই আমার সব। তাকে ফেলে চোরের মতো পালাব—হয়? সে কেমন বিষণ্ণ চোখে মারিয়ার দিকে তাকাল। ঈশ্বর, কোথাও কোনও এমন নদী নেই, বেলাভূমি নেই অথবা অরণ্য যেখানে, আমি আর মারিয়া হাত ধরাধরি করে চলে যেতে পারি। কেউ আর থাকবে না। কেউ আমাদের হিংসা করবে না। আমাদের অনিষ্ট করবে না। তপোবনের মতো এক আশ্রম করে বসবাস করব। আমি শস্য ফলাব। মারিয়া নদী থেকে জল আনবে।

এ সময় ওরা পাতার ভিতর খস খস শব্দে চমকে উঠল। না কেউ কাছে নেই। একটা উইলো ঝোপের নিচে এক জোড়া খরগোশ উঁকি মেরে ওদের তিনজনকে দেখছে।

সুমন বলল, দ্যাখো দ্যাখো, কি সুন্দর চোখে ওরা আমাদের দেখছে। আহা কি মজা! জানো মারিয়া তুমি সেই রাজপুত্রের গল্প জানো?

মারিয়া বলল, আমি আর কোন রাজপুত্রের গল্প শুনতে চাই না সুমন। আমি পাগল হয়ে যাব। আর সে সুমনকে উৎসাহিত করার জন্য বলল, সুমন আমি তোমার সঙ্গে থাকব। আমি তোমার সঙ্গে যাব সুমন।

অনেকদিন পর বনবাস থেকে ফিরে ভালবাসার মানুষ যে ভাবে চোখ তুলে যুবতীকে দেখে, সুমন তেমনি দেখতে থাকল মারিয়াকে। মারিয়ার এমন সুন্দর মুখ একেবারে ভয়ে নীল হয়ে গেছে। তুমি আমাকে এত ভালবাসো মেয়ে! আমার যে আর কিছু লাগে না। আমি যে এখন কত সহজে মরে যেতে পারি। বড় তুচ্ছ মনে হচ্ছে সব। এমন ভালবাসা পেলে মরেও সুখ। সুমন চিবুক ধরে বলল, তাকাও মারিয়া, আমাকে দ্যাখো। তুমি যুবতী হলে আমার ভারতবর্ষে চলে এসো। আমি তোমাকে নদীর তীরে নিয়ে যাব। শরতে কাশফুল ফুটলে আমি তুমি কাশের বনে হারিয়ে যাব।

মারিয়া কিছুতেই তাকাচ্ছে না। ঝর ঝর করে কাঁদছে। যত কাঁদছে, তত সুমনের সেই এমিলের মতো ফুল ফোটাবার আগ্রহ জন্মাচ্ছে। নদীতে জল নেই। আকাশে মেঘ নেই। সব পাতা ঝরে যাচ্ছে। আমার এই মৃত্যু মারিয়া তোমাকে কালো মানুষের প্রতি সহৃদয় করে তুলবে। আমি ভারতবর্ষ থেকে এসেছিলাম এক সঞ্জীবনী সুধা নিয়ে। তোমাকে আমি তা দিয়ে চলে যাব। ঠিক এমিলের মতো, হাতে সেই চাঁপাফুল। ঝরনার জল। জল ছড়িয়ে দেব গাছে, মাঠে মাঠে, আবার সেই মরুভূমি শস্য-শ্যামলা হয়ে যাবে। আমার মৃত্যু যদি তোমাদের পাষাণ-প্রাচীরে ফুল ফোটায়, সে ফুল ফুটুক না। আমি তো এক সামান্য মানুষ। আমি মরে যেতে পারি, কিন্তু পালাতে পারি না।

বার্ট এবার রাগে দুঃখে ফেটে পড়ল। তুমি কি সুমন আমাদের সবাইকে বিপদে ফেলবে!

বার্টের চিৎকার এইসব বনাঞ্চলে প্রতিধ্বনি তুলছে কেবল। বৃদ্ধ উড্ পর্যন্ত এই চিৎকার দূর থেকে শুনতে পাচ্ছেন। তিনি এখনও ঠাহর করতে পারছেন না, কোথায় এবং কতদূরে মারিয়া এবং ওজালিও। কে এমন নদীর ঢালুতে থেকে থেকে চিৎকার করে উঠছে। উড্ যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি গাছপালার ভিতর দিয়ে হামাগুড়ি দেবার চেষ্টা করছেন।

নফর নিগ্রো যুবকেরা দূরে দূরে রয়েছে। কাছে আসবার তাদের কোন অধিকার নেই। যতক্ষণ মারিয়া কিছু না বলছে ততক্ষণ কেউ কাছে যেতে সাহস পাচ্ছে না। ওরা সেই বার্টের চিৎকার, হে ইন্ডিয়ান, শুনতে পেয়ে মারিয়ার নির্দেশের প্রতীক্ষাতে আছে। পেলেই ছুটে আসবে। বার্ট সুমনকে এতটুকু নড়াতে পারল না। সে বলল, বার্ট আমি তোমার কথা কোনদিন ভুলতে পারব না।

মারিয়ার দিকে তাকালে দেখল, সে কেমন পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

আর কি স্বর্গীয় সুষমা ওজালিওর মুখে। দেবদূতের মতো চোখ-মুখ করে রেখেছে। কোন মালিন্য নেই, মৃত্যুর জন্য শঙ্কা নেই—যেন জীবনে তার নতুন সূর্য উঠছে। সকালের সূর্য গাছ ফুল পাখির ভিতর থেকে উঠে আসছে।

বার্ট আপ্রাণ চেষ্টা করেও কিছু করতে পারছে না। নিশ্চিত বিপদ জেনেও কোন উত্তেজনার চিহ্ন নেই সুমনের মুখে। যেন ওর সামনে এক বড় মাঠ, তাকে এখন এই মাঠ পার হতে হবে। সে অন্য দিকে তাকাচ্ছে না। সোজা খামার বাড়িতে ফেরার জন্য হাঁটছে। বার্ট এই যুবকের এমন দুর্জয় সাহস

দেখে বিস্মিত না হয়ে পারছে না। সে জানে এতক্ষণে হয়ত গুডুই শহরে খবর পৌঁছে দিয়েছে।

দূরে গুডুই তেমনি ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। চার পাশে অশ্ব খুরে প্রতিধ্বনি উঠছে। কখনও দ্রুত, কখনও ধীর, কখনও কারা অরণ্যের অন্য প্রান্তে ঘোড়ায় কদম দিচ্ছে মতো। এই খবর পৌঁছে দেবার জন্য—এক কালো মানুষ এসেছে, গায়ে সাদা রঙ মেখে, দূর দেশ থেকে এসে নীল রক্ত অসম্মানিত করে গেছে। এই অরণ্যের ভিতর সেই মানুষ দ্যাখো কি শান্তশিষ্ট। ভালবাসার চেয়ে বড় আর কি আছে।

বার্ট ভাবল, ভারোদী খবর পাওয়া মাত্র সেই সব পুষে রাখা ডালকুত্তা ছেড়ে দেবে। এ-সব ব্যাপারে পুলিশের হাতে দায়িত্ব দিতে নেই। দিলেই ওদের কাছে মনুষ্যজাতি এক, অপরাধের ব্যাপারে সাদা কালো সব এক, স্থানীয় আইন একটু শক্ত বলে লঘু শাস্তি হতে পারে, নাও হতে পারে—কে কার খবর রাখে তখন। বরং ভালো ভারোদীর ডালকুত্তা ছেড়ে দেওয়া। ওর মাংস, রক্ত হাড় সব চুষে চেটে-পুটে খেয়ে হজম করে বসে থাকবে। পুলিশ যখন খবর পাবে তখন পেটের ভিতর রক্ত মাংস হাড়—সরেজমিনে পুলিশকে অনুসন্ধান করতে হলে কুকুরের পেটে প্রবেশ করতে হবে। সুতরাং এসব কাজ ভারোদী গোপনেই করে থাকে। এত বড় সংস্থার অজস্র এই গুপ্তহত্যা কেউ আজ পর্যন্ত হদিস করতে পারেনি। লাশ শুধু গুম নয়, একেবারে কুকুরের পেটে চালান—হজম শক্তিতে প্রাণী জগতে কুকুরের তুলনা হয় না। মারিয়া তখন কাছে থাকবে না। মারিয়াকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

সুমন হাঁটতে হাঁটতে বলল, মারিয়া এত তুমি ভেঙে পড়ছ কেন? তাকে সব খুলে বললে, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে কিছু বলবেন না। তিনি তো মায়ের জাত। আর তুমি তো জানো আমার মা নেই। কেউ নেই। তোমরাই আমার সব। আমি তোমাকে এ ভাবে ফেলে চলে গেলেও খুব অসম্মানের কথা। একটু থেমে বলল, কারণ কিছু লতাপাতা সরিয়ে পথ করে দিতে দিতে বলছে, তাছাড়া আমি সামান্য এক যুবক। আমি মরে গেলে কিছু আসবে যাবে না। কিন্তু পালিয়ে গেলে, একজন ভারতীয় পালিয়ে গেছে বলা হবে। এত বড় অসম্মানের দায় নিয়ে পালাতে পারি না। এবার সে বার্টের দিকে মুখ ফেরাল। বলল, এমন একটা ব্যাপার তোমার জীবনে ঘটলে তুমিও পালাতে পারতে না বার্ট।

বার্ট বুঝল, ওদের হাতের শেষ তুরুপের তাসটিও গেছে। তবু শেষ চেষ্টা। কারণ মারিয়ার চোখ-মুখ দেখলেই বোঝা যাচ্ছে, যেন বধ্যভূমিতে সুমনকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না, মারিয়াকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এমন একটা হত্যাকাণ্ডে মারিয়া যথার্থই পাগল হয়ে যাবে। বার্ট পর্যন্ত স্থির থাকতে পারছে না। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সুমন বলল, বার্ট তুমি একবার মারিয়ার দিকটা দ্যাখো।

সুমন মারিয়ার দিকে তাকাতেই কেমন ফের বিষণ্ণ হয়ে গেল। সে কোন কথা বলতে পারল না।

মারিয়া সুমনের হাত নিজের হাতে নিয়ে পথ আগলে দাঁড়াল। তাকে আর এগুতে দেওয়া চলে না। সে বলল, সুমন আর দেরি কোরো না। আমাদের সঙ্গে নিচে নেমে এস। এই বলে সে নদীর ঢালু জমিতে চোখ রাখল। নিচে গম যব খেত অথবা অন্য কোন শস্যক্ষেত্র হবে, এত উপর থেকে তা টের পাওয়া যাচ্ছে না। এই সব শস্যক্ষেত্রের ভিতর মারিয়ার অদৃশ্য হবার বাসনা। তারপরে নদী, নদীর জল, উপরে নীল আকাশ এবং ওপারে গভীর বন। কোথাও কোন পাখি করুণ স্বরে ডাকছে। এই ঘাস ফুল মাটি এত বেশি চুপচাপ যে সামান্য কীটপতঙ্গের আওয়াজ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে। এই মাঠের ভিতর দাঁড়িয়ে সহসা কেন জানি, সুমনের মৃত্যুকে বড় সুন্দর মনে হল। সহজ মনে হল। এত বড় জীবন নিয়ে সে কী করবে, তার আর কে আছে! জীবন বড় কঠিন। সুমনের ভিতরে যে সামান্য মৃত্যুভয় ছিল, তাও কেন জানি, সহসা একেবারে উবে গেল। সুমন বলল, মাছ ধরতে এসে সব গণ্ডগোল হয়ে গেল।

বার্ট এবং মারিয়া এমন উদাসীনতা আর সহ্য করতে পারছে না।

সুমন বলল, বেশ হয় বার্ট, আমরা নদীর ও-পারে চলে যাব। বনের ভিতর তুমি, আমি, মারিয়া কুঁড়েঘর তৈরি করে থাকব। মারিয়া আমাদের রেঁধে-বেড়ে খাওয়াবে। যেন সুমনের বলার ইচ্ছা, প্রায় রাম-লক্ষণের মতো সীতাকে নিয়ে বনবাসে চলে যাওয়া। তপোবনে থাকবে। পঞ্চবটি বনে অথবা সরযূনদীর পারে ওরা দাঁড়িয়ে থাকলে দেখতে পাবে, এক হরিণ শিশু ক্রমে বড় হতে হতে সোনার হরিণ হয়ে গেছে। সুমনের চোখ দেখলে মনে হয়, সে এখন সেই সোনার হরিণের সন্ধানে আছে।

এই সরল এবং তাজা প্রাণকে রক্ষা করার জন্য বার্টের যথার্থই শেষ চেষ্টা।—তুমি কিছু নিয়ে পালাচ্ছ না। একে কাপুরুষের মতো পালানো বলে না। অন্যায় ভাবে তোমাকে হত্যা করবে ওরা। তুমি নিরুপায়। অকারণ এই হত্যা। সেজন্য তুমি পালাচ্ছ।

সুমনের কেন জানি অনেক মহান উক্তির কথা মনে পড়ছে। সে ইচ্ছা করলে সে সব বলতে পারত। কিন্তু সে সে-সব না বলে শুধু বলল, তাই পালানোর ভিতর কিছুই সম্মানের থাকে না। পালানোটা পালানোই। ওর বেশি কিছু নয়।

সুমন এবারও মারিয়ার মুখ দেখল। ওর ক্লিষ্ট মুখের দিকে আর যথার্থই তাকানো যাচ্ছে না। অথচ সুমনের ভেতরের মানুষটা, ধূসর প্রান্তরে যেখানে বৃষ্টি হয়নি কতকাল, শস্য ফলে না কত কাল, সব গাছ-গাছালি মরে গেছে কতকাল—সেখানে ফুল ফোটাতে বলছে। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ বড় হাস্যকর মনে হয় তখন। সুমন আর মারিয়ার দিকে তাকাতে পারল না। তাকালে সেও ভেঙে পড়বে। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, এস। আমাদের যাবার সময় হয়ে গেছে।

মিস্টার উড্ও ততক্ষণে পৌঁছে গেছেন। তাঁকে দেখে সুমন বলল, মিস্টার উড্ এবাব আমাদের ফিরতে হবে। আজ আর মাছ ধরা হবে না। গুডুই ঘোড়ায় চড়ে শহরে চলে গেছে। ওকে আমরা একটা জরুরি খবর দিতে শহরে পাঠিয়ে দিয়েছি। আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন। দরকার হলে গাড়ি চালাবেন।

অসহায় মারিয়া মিঃ উড্কে অনুসরণ করল। সুমন আগে হাঁটছে। সে-ই যেন এখন সবাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মিঃ উড্ কোন প্রশ্ন করতে পারছেন না। মাছ না ধরে ফিরে যাওয়া হচ্ছে! কি এমন ঘটনা ঘটল যে মাছ না ধরে ফিরে যাওয়া হচ্ছে—এমন একটা ছুটির দিন, আনন্দের দিন, একেবারে নিরানন্দময় হয়ে গেল কেন এবং মারিয়াই-বা এত বিষণ্ণ কেন, সুমন এত উৎফুল্ল কেন—তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মারিয়া টেলডনের এমন কিছু হয়েছে যা গোপনীয় থাকার কথা—সেজন্য তিনি কোনও প্রশ্ন পর্যন্ত করতে সাহস পাচ্ছেন না। সুতরাং তিনি সুমনের কথা মতো শুধু গাড়ির উদ্দেশে হাঁটতে থাকলেন।

সুমন গাছগাছালির ভিতর অদৃশ্য হবার আগে শেষ বারের মতো পিছনের দিকে তাকাল। হাত তুলে বার্টকে বিদায় জানাল।

বার্ট, সুমন যতক্ষণ না অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ সুমনকে দেখছিল। এক প্রচণ্ড অহমিকা এই তরুণ যুবকের। ভিতরে ভিতরে সে পাথরের মতো শক্ত। হায় যুবক তুমি কি করতে যাচ্ছ, তুমি জানো না, তোমার কি কুৎসিত ভাবে মৃত্যু ঘটবে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন! আমেন!

বার্ট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই ভারতবাসীর জন্য আর কী করা যায়, কী করলে এই তরুণ যুবককে রক্ষা করা যেতে পারে—ভাবতেই মনে হল, একমাত্র উপায় এখন জাহাজে ফিরে যাওয়া। একমাত্র উপায় ক্যাপ্টেনকে দিয়ে এই খবর থানায় লিপিবদ্ধ করা। এ-ছাড়া অন্য উপায়ের কথা তার মনে এল না। সে জানত, এই খবর থানায় লিপিবদ্ধ করলে, কোনও কাজে না আসতে পারে—কারণ কোথায় যেন সব কিছুর ভিতর শ্বেতকায় মানুষের প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা। তবু একমাত্র জাহাজের ক্যাপ্টেন ভরসাস্থল। শেষ চেষ্টা। এবার নদীর ও-পারে উঠে যেতে হবে। নদী পার হতে হবে। তারপর নির্জন বনভূমি পার হয়ে গেলে ছোট গ্রাম কোলন—সেখানে তার মামাতো বোনের বাড়ি। সে মামাতো বোনের বাড়ি বেড়াতে এসেছিল। সকালের দিকে কি করা যায়, একমাত্র নদী থেকে চুরি করে ট্রাউটমাছ ধরা যেতে পারে—সেজন্য সে এসেছিল, নদীর জলে মাছ ধরতে। তারপর এমন বিস্ময়কর পরিস্থিতি। সে এবার হামাগুড়ি দিয়ে ঢালু পাহাড় ধরে নেমে যেতে থাকল। তারপর নদীর ঢালুতে নেমে যেমন এক সিংহশাবক দৌড়োয়, তেমনি সে ছুটতে থাকল। পাথরের পর পাথর সে লাফ দিয়ে পার হল। সে লাফিয়ে লাফিয়ে, কারণ নদীর জলে বড় বড় পাথর, ঠিক যেন ঝরনার জল নেমে যায়, সে সেইসব ঝরনার জল পার হয়ে ও-পারে উঠে গেল। তারপর ছুটতে থাকল গ্রামের দিকে। অনেক দূরে ছোট্ট নিগ্রো পল্লী। তারপর বড় হাইওয়ে। বোনের বাড়িতে মোটর-বাইক। বাইকে একবার চড়ে বসতে পারলে নিমেষে সামনের সব গাছপালা দ্রুত সরে যেতে থাকবে। সে মুহূর্ত বিলম্ব না করে দ্রুত গ্রামে উঠে যাবার জন্য ছুটে চলল।

॥ আঠার ॥

ফেরার পথে সুমন মারিয়াকে ঠিক সেই আগের মতো নানা রকমের দেশ বিদেশের গল্প বলছিল। কখনও পুরাণেব গল্প বলছিল। রামায়ণ মহাভারতের গল্প। এমন বনভূমি দেখলে কেন জানি কেবল সীতার বনবাসের কথা মনে হয়। সরযূনদীর কথা, রাবণ বধের কথা গল্প-প্রসঙ্গে বলল। অথবা যেন এক সোনার হরিণ বনের ভিতবে ছুটে বেড়ায়। সে সোনার হরিণের কথাও উল্লেখ করল। রামায়ণে বর্ণিত সোনার হরিণ, পঞ্চবটি বন সবই যেন চোখের উপর ভাসছে। মারিয়াকে দেখলে এখন সীতার বনবাসের কথাই মনে হবে। সে গল্প বলে মারিয়াকে অন্যমনস্ক করতে চাইল, ফুল ফোটাতে চাইল। মারিয়াব বিষণ্ণ করুণ মুখ দেখতে কষ্ট হচ্ছে।

বৃদ্ধ উড্ চুপচাপ গাড়ি চালাচ্ছেন। সুমন একটু ঝুঁকে মিঃ উড্‌কে প্রশ্ন করল, মনে হয় এতক্ষণে গুড়ুই পৌঁছে গেছে।

উড্ জবাব দিল না। শুধু ঘাড় নেড়ে সায় দিল কথায়।

মুহূর্তে ভারোদীর কঠিন মুখ ভেসে উঠল চোখে। শক্ত গোল গোল চোখ। ভিতরে ভিতরে সে খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সে দ্রুত অন্যমনস্ক হতে চাইল। চাঁপা ফুলগাছটির কথা মনে করার চেষ্টা করছে। এমিলেব কথা ভাবছে। এক মানুষ এমিল, বন্ধ্যা অনুর্বব জমিতে ফুল ফোটানোব জন্য কেবল ছুটছে। জীবনে মাঝে মাঝে এমন হয়। কেমন সব তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে এগিয়ে যাওয়া। সত্যের মুখোমুখি হওয়া। সুমন সেজন্য খুব সহজ থাকতে পারছে। সে নানা রকমের গল্প বলে, যেন সে মারিয়াকে নিয়ে কোন দূব দেশে ভ্রমণে বের হয়েছে, যেন মাবিয়া তাব কত কালের আপনজন, এখন মারিয়া বালিকা নয়, যুবতী প্রায়, সুমনেব দিকে অপলক তাকিয়ে দেখছে। যত দেখছে সুমনকে, তত আতঙ্কে নীল হয়ে যাচ্ছে। এবং এক সময় গাড়ির ভিতর মারিয়াকে খুব পীড়িত মনে হল। মারিয়া গাড়িতে মূর্ছা যাচ্ছে।

সুমন উড্‌কে বলল, আমাদের একটু তাড়াতাড়ি পৌঁছানো দবকার।

- -মিঃ উড এখানে কোন জলাশয় আছে?

উড্ একটা বড় জলাশয়ের পাশে গাড়ি থামাল। সুমন গাড়ি থেকে নেমে কিছু জল নিয়ে এল। মাবিয়ার মাথায় মুখে জল ছিটিয়ে দিল। রুমালে জল ভিজিয়ে মুখের চারপাশটায়, কি নরম ঘাড়, গলা, কি মসৃণ ত্বক এই মেয়ের, কি সুন্দর বড বড় চোখ, যেন ঘুমিয়ে আছে, শিশুর মতো অসহায় সেই মুখের দিকে তাকাতেই আবেগে সুমনের ভিতরটা কেঁপে উঠল।

চোখে মুখে সামান্য জল, একটা ঠাণ্ডা, ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, ঝির ঝিবে এই ঠাণ্ডা বুঝি মেয়ের প্রাণে সামান্য উত্তাপ সঞ্চার করছে, মারিয়া জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে। মূর্ছা এখনও কাটেনি। সুমন মারিযার মাথা কোলে নিয়ে বসে থাকল—আর যত দ্রুত গাড়ি ছুটছে, তত চারপাশে যেন অসংখ্য সীতা, স্বর্ণসীতা হয়ে যাচ্ছে, অসংখ্য নদী মরুভূমিতে হারিয়ে যাচ্ছে। সুমন তার মায়ের জীবনের কথা ভেবেও কষ্ট পাচ্ছিল। এমন সুন্দর লাবণ্যময় সংসারে ঈশ্বর তার জন্য কোন আশ্রয় রাখেনি। মাবিয়া তাব কোলে ঘুমিয়ে আছে মনে হয়।

সদর দরজা দিয়ে গাড়ি ঢোকার মুখে সুমনের বুকটা আবার কেঁপে উঠল। ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে। সে তাড়াতাড়ি মারিয়াকে আব একবার দেখে নিল। এই মুখ দেখলে সব কিছুর বিরুদ্ধে যা কিছু অন্যায় এবং জীবনে যা কিছু শ্রেয়, তার জন্য সে সংগ্রাম করতে পারে। সুমন ফিস ফিস করে বলল, মারিয়া তুমি আমাব পাশে আছ, পাশে থাকলে আমি সাহস পাই। আমার কেন জানি কেবল, কিছুতেই ভয় থাকে না মারিয়া। সে ভাবল, লুকিয়ে একবার চুমু খাবে কি না। কি সুন্দর চোখ, চোখে বাব বার চুমু খেতে ইচ্ছা হল।

প্রাসাদের ঝাড় লুণ্ঠনগুলি তখন দুলছে। ভারোদী গাড়ি-বারান্দায় পায়চারি করছেন। গুড়ুই একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। চাবপাশে বাড়িটার শুধু অন্ধকার। এই গাড়ি-বারান্দায় আজ শুধু আলো। ভিতবে বড় হল ঘবটার সব আলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। গাড়ি বারান্দার নিচে সেই কৃত্রিম পাহাড়।

পাহাড় এবং বারান্দার ভিতর সামান্য পরিসরে গাড়িটা এনে পার্ক করালেন উড্। এখানে সামান্য অন্ধকার আছে বলে গাড়ির ভিতরটা দেখা যায় না।

পার্টির চার-পাঁচ জন সভ্য ঘরের ভিতর মদ্যপান করছে। ভারোদী স্থির থাকতে পারেনি। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে তার ম্যানদের জানিয়েছে—হায় ঈশ্বর আমার কপালে শেষ পর্যন্ত এই ছিল, ফোনে বিস্তারিত জানালে ওরা ওদের আস্তাবলের মাঠ থেকে ঘোড়া নিয়ে ছুটে এসেছে। অন্ধকারে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। গাড়ি-বারান্দার পরে সেই বড় মাঠ, মাঠে যে কিছু ঘোড়া এই রাতেও নরম ঘাস চেটেপুটে খাচ্ছে, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে তা টের পাওয়া যায়। এক ছায়া ছায়া ভাব। ছায়ার মতো অস্পষ্ট ঘোড়াগুলো এখন মাঠে চরছে। ওদের ঘাস খাবার শব্দ এবং কানে মশা মাছি বসলে, কান পত পত করে নাড়ছে—এমন কিছু শব্দে উড্ প্রমাদ গুনছে। কে সেই মানুষ, যাকে পার্টি আজ এই পাষাণ প্রাচীরে নিক্ষেপ করবে! কুকুরগুলো পর্যন্ত অন্ধকারে ছোটাছুটি করছে। কেবল কোথাও থেকে ইশারার অপেক্ষা। কি যেন এক রহস্য এই বাড়ির চারিপাশে, প্রায় ভুতুড়ে বাড়ির মতো চুপচাপ নিঃশব্দ। কোথাও চামচিকের আর্তনাদ, সকলে তখন চকিতে চোখ তুলে দেখল গাড়ি, বারান্দার নিচে এসে থেমে আছে।

যারা মদ খাচ্ছিল তারা সব ফেলে ছুটে এল। একপাশে অন্ধকারে সোজা হয়ে ওরা দাঁড়াল। ওদের গলায় লাল রুমাল। কোমরে কাউ বয়দের মতো বেল্ট, এবং খাপে রিভলবার। কালো রঙের পোশাক ওদের। চুল খুব ছোট করে ছাঁটা। একটা লোক এত বেশি ঢক ঢক করে মদ খেয়েছিল যে পাশে বসে সে এখন বমি করছে। মাথায় ওদের লম্বা নীল রঙের টুপি! দূরে ভারোদী দাঁড়িয়ে সব দেখতে দেখতে গাড়ির দিকে ছুটে গেলেন। মারিয়া ফিরে এসেছে। খবর নিতে হবে, সেই ছোকরা কোন্ দিকে পালিয়েছে। তখন এইসব ম্যানরা ঘোড়া নিয়ে, কুকুর নিয়ে ছুটবে। বনের ভিতর শিকারি, খরগোশের পিছনে যেমন ছোটে তেমনি এই ম্যানরা ছুটবে। নিমেষে, সে দ্রুত যত পালাবার চেষ্টাই করুক ওরা ওকে পাকড়ে ঠিক যেমন কাঁধে এক হরিণ ছানা ঝুলিয়ে নিষাদ ঘরে ফেরে, তেমনি ওরা ফিরবে। সেই জংলি মানুষটার উদ্দেশে খবর নেবার জন্য জানলায় মুখ বাড়াতেই আশ্চর্য, এতটুকু ভয় নেই, শঙ্কা নেই, স্থির প্রায় দেবদূতের মতো শান্ত পুরুষ ধীরে ধীরে গাড়ির দরজা খুলে ধরেছে! মুখে চোখে এতটুকু মালিন্য নেই। হাসি-খুশি, সেই যেন এক বালক বনের ভিতর ফুল তুলতে গিয়ে পথ হারিয়েছে, তেমনি এই তরুণ পথ হারিয়ে আশ্রয়ের নিমিত্ত এই প্রাসাদে এক মূর্ছিত প্রাণ নিয়ে ঢুকে পড়েছে। সে মারিয়াকে কাঁধে ফেলে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে যাচ্ছে। পাশে ভারোদী, যেন অপরিচিত ভারোদীকে সে চেনে না, এই বাড়ি ঘরে সে প্রবাসী মানুষ, দীর্ঘদিন পর ফিরে এসেছে।

ভারোদী আর সহ্য করতে পারল না। সে চিৎকার করে উঠল, ইউ হেল।

সুমন হাসল। বলল সব হবে। আপনি ব্যস্ত হবেন না। মারিয়া ভয়ে মূর্ছা গেছে। এক্ষুণি ভাল হয়ে উঠবে। ওকে রেখে আসতে দিন। এই বলে সে আর দাঁড়াল না। মারিয়ার যে দিকে ঘর, সেদিকে এখন আলো নেভানো, এবার সে ধীরে ধীরে হেঁটে গেলে সব আলো জ্বলে উঠল, আলো জ্বলে উঠলে—সে ফিস ফিস গলায় ডাকল, মারিয়া আমি মরে গেলে তুমি আমার নামে একটা এপিথাপ গড়ে দিয়ো। সেখানে রোজ দুটো ফুল দেবে। একটা মোমবাতি জ্বেলে দিযো। দোহাই তোমার, মাকে বোলো যেন কুকুর দিয়ে আমাকে না খাইয়ে দেয়। সেই যে খামার বাড়িতে গির্জা আছে তোমাদের এবং যেখানে তোমাদের ওপোসামের বাচ্চাটা রাতে চুক চুক করে দুধ খায় তার পাশে কি সবুজ অরণ্য! তার ভিতর আমাকে রেখে দিতে বলো। তুমি বড় হলে, মোমবাতি জ্বালিয়ো। আমার সমুদ্রে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না মারিয়া। এই আমার ভাল। আমি তোমার কাছে থেকে যাব। আমার মা নেই, বাবা নেই। সংসারে আমার তুমি বাদে আর কেউ নেই।

উত্তেজনায় ভারোদীর হাত-পা কাঁপছিল। তিনি ফের চিৎকার করতে গিয়ে কেমন গলায় কাঠ-কাঠ একটা শুকনো ভাব অনুভব করলেন। ভিতরে ভিতরে দুর্বল হয়ে পড়ছেন। বুঝি এমন দৃশ্যে তিনিই মূর্ছা যাবেন। কি অর্বাচীন এই তরুণ! কোথায় প্রাণ রক্ষার্থে পালাবে, বনবাদারে হারিয়ে যাবে, ভয়ে শশকের মতো চোখ করে রাখবে। না, তা না, তাজা প্রাণ বুকে নিয়ে ধীরে ধীরে মারিয়ার ঘরের

উদ্দেশে হেঁটে যাচ্ছে। যেন গর্বের অন্ত নেই, অহমিকার শেষ নেই—দ্যাখো, আমি এক যুবক তোমার এই পাষাণ প্রাচীরে আলো জ্বালাতে এসেছি। তোমার সব ছিল, গাছপালা, রোদ, পাখি, মাঠ এবং অরণ্য কিন্তু ফুল ফুটত না, পাখি ডাকত না। গাছ মৃত, জমি বন্ধ্যা। যাদুকরের পালিত পুত্র আমি—আমার নাম এমিল, আমি এই বনে ফুল ফোটাতে এসেছি। বস্তুত ভারোদী সুমনের এই নিরুদ্বিগ্ন মুখ দেখে আরও বেশি বিচলিত হয়ে পড়লেন; তিনি ছুটে গেলেন। এবং দরজার মুখে বাধা দিলে, সুমন বলল, আর একটু সময় দিন। ওকে রেখে আসি। আমি কথা দিচ্ছি, কোথাও পালাব না।

সুমন মুহূর্ত দেরি করল না। যেদিকে মারিয়ার ঘর, ধীরে ধীরে সেই দিকে আবার হাঁটতে শুরু করল। পরিচারিকা দরজা খুলে দিল। সুমন সন্তর্পণে ওকে বিছানায় শুইয়ে দিল। সাদা মখমলের মতো নরম বিছানা। পা দুটো সোজা করে দিল। চুলগুলি ঠিক করে দিল। একটা নীল রঙের সিল্কের চাদর দিয়ে বুক পর্যন্ত ঢেকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল—তুমি আমাকে রোজ একটা ফুল দেবে মারিয়া। মোমবাতি, সন্ধ্যায় জ্বেলে দেবে। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, আমি যাচ্ছি মারিয়া, আমার সঙ্গে তোমার আর দেখা হবে না। ওরা আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

দরজার কাছে এসে ফের কি যেন মনে পড়ে গেল সুমনের। মারিয়াকে একটা কথা বলা হয়নি। সে এবারে শিয়রে হাঁটু গেড়ে বসল। সোনালি চুলে যেন কত কালের সূর্য অস্ত যায়! যেন কতকাল ধরে ফুল ফোটার জন্য সূর্য কিরণ দিচ্ছে। চুলের ভিতর সব মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। সে মুখ থেকে চুল সরিয়ে বলল, তোমাকে যা বলা হয়নি, তুমি যে অনেক বড় হয়ে গেছ, চুপিচুপি বলে যাচ্ছি মারিয়া তুমি যুবতী হয়ে গেছ।

সে আর দেরি করল না। কারণ সদলবলে ওরা এখন এখানে ছুটে আসবে। কি পবিত্র এই চোখ মুখ। যেন এই পবিত্রতা হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায়। সে কপালে হাত রেখে তা স্পর্শ করতে চাইল।

তখন মনে হল করিডরে কোলাহল শোনা যাচ্ছে। সে দ্রুত দরজা পার হয়ে সেই করিডরে ছুটে গেল, এবং ভারোদীর সামনে দাঁড়াল। স্থির অবিচল। সে ধীরে ধীরে বলল, এতক্ষণে আপনি সব জেনে গেছেন। বলে সে ভারি ক্লান্ত এমন এক মুখ চোখ নিয়ে সামনের সোফাতে বসে পড়ে সকলকে ডাকল, আপনার দাঁড়িয়ে কেন? বসুন।

ভারোদীকে কেমন তোতলামিতে পেয়ে বসেছে। মৃত্যুভয় না থাকলে প্রাণে আসে এক দুর্জয় সাহস, সেই সাহস সকলকে কেমন ভীত করে তুলছে। সুমন বলল, দিনটা ভারি চমৎকার ছিল। মাছ আমরা ঠিক ধরতাম। কিন্তু বার্ট যত নষ্টের গোড়া, সে বলল, তুমি ইন্ডিয়ান, তুমি এটা কী করেছ! আচ্ছা বলুন, আমরা জাহাজী মানুষ। কতকাল পরে মাটি পেয়েছি! কি সুন্দর দিন, আপনাদের ওপোসামের বাচ্চাটা কি চুকচুক করে দুধ খায়! আশ্চর্য! জানেন, জায়গাটা আমার কেন জানি, আমাদের রামায়ণে বর্ণিত পঞ্চবটির বনের মতো মনে হয়েছে। আপনি রামায়ণের নাম শোনেননি। কি সুন্দর বই। আমাদের মহাকাব্য। আবার এলে সঙ্গে নিয়ে আসতে পারতাম। আমার মা যখন পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সব প্রেরণা হারিয়েছিলেন, তখন দেখেছি এই কাব্য মাকে কি অনুপ্রাণিত করেছে' বিকেল হলেই সুর ধরে রামায়ণ পাঠ আমার অভ্যাস ছিল। যেমন এই ধরুন বাইবেল...।

একি পাগল না আর কিছু! ভারোদী আশ্চর্য হয়ে দেখছে। একনাগাড়ে কি সব বকে যাচ্ছে। যার, কিছু অর্থ ধরতে পারছে—কিছু পারছে না। সবই কেমন তার অনায়াসলব্ধ। সরল বালকের মতো মুখ তুলে ভারতবর্ষের গল্প বলছে।

—বুঝলেন, মারিয়া বড় হলে একবার ইন্ডিয়ায় যাবে বলেছে। আমি তো তখন আরও বড় হয়ে যাব। আমি ওকে বলেছি আমাদের একটা নদী আছে, নাম—গঙ্গা নদী। নদীর পাড়ে বসে আমরা হাওয়া খাব। নানারকমের গল্প করব।

কিন্তু ভারোদী কোন কথা বলছে না। আচ্ছা আপনি গোমড়া মুখ করে রেখেছেন কেন? আমাকে কি এক্ষুনি উঠতে হবে? আমার যে কি অপরাধ আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে চলুন। কিন্তু সুমন দেখল, শুধুই নিষ্পলক। ভারোদীর চক্ষু স্থির। আর ভারোদীর দলটা সেই থেকে মদ্যপান করে চলেছে।

—যদি তাড়াহুড়া না থাকে তবে শুনুন। বার্ট কি বলে জানেন—বলে, আমি কালো মানুষ। কালো মানুষ বলে পালাতে বলছে। আচ্ছা, কালো মানুষদের কি কোন অধিকার নেই, এই যেমন ধরুন ভালবাসার অধিকার। আপনি তো মা, মায়েরা এ সব ভালো বলতে পারে। মায়ের প্রাণ কি কখনও কঠিন হয়। আমার মা তো কারও দুঃখ দেখলেই কেঁদে ফেলতেন। মায়েরা তো সন্তানের দুঃখে শুধু কাঁদে জানি। আপনি মারিয়ার জন্য, অথবা এই যে আমি চলে যাব জাহাজে, আর হয়ত কোনদিন দেখা হবে না, অথচ দেখুন যতদিন এখানে ছিলাম একবারও মনে হয়নি—আমি এখানে আগন্তুক। আপনার বাৎসল্য আমাকে মায়ের দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছিল। বার্ট বলল, পালাতে। পালালে আপনি কষ্ট পেতেন না? আপনি বলুন! একি! আপনি কোন উত্তর দিচ্ছেন না কেন। আমার সত্যি এখন খারাপ লাগছে।

—আর কোথায় পালাব বলুন। বলে সুমন উঠে দাঁড়াল। ভারোদীর কঠিন মুখ, ওকে এতটুকু ঘাবড়ে দিচ্ছে না। যেন সে অনেকদিন পর তার আত্মীয়-স্বজনের কাছে ফিরে এসেছে। তাদের সঙ্গে দেশ-বিদেশের গল্প করছে।

গুডুই এসে আপনাদের কখন খবর দিল যে, আমি স্প্যানিশ নই। আমি ভারতীয়, বাঙালি। আপনার কাছে নিগ্রোদের সামিল। কখন বলল?

ভারোদী সুমনের এমন সব কথায়, ভিতরে দুর্বল হয়ে পড়েছে। সে নিজেকে কঠিন রাখার নিমিত্ত খুব সহজ গলায় বলার চেষ্টা করল, ওজালিও ইউ মাস্ট ডাই। কিন্তু গলাটা কাঁপছে বলতে। একি হল তাঁর। কথা বলতে গিয়ে কেমন আটকে যাচ্ছিল।

গুডুই বিস্মিত।

—আপনি উত্তেজিত হবেন না ভারোদী। আপনার শরীর খারাপ করবে। বলে কাছে এগিয়ে গেল। এবং পায়চারি করার ভঙ্গিতে ভারোদীর চারপাশে ঘুরতে থাকল। বলতে থাকল, লুজান বলে একটা গ্রাম আছে। বার্ট এবং মারিয়া ইচ্ছা করলেই সেখানে আমাকে পৌঁছে দিতে পারত। ভাবতে খারাপ লাগল। জানেন, আমার কেন জানি কেবল জলতেষ্টা পাচ্ছে। আমি জল খাব। এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল হলেই হবে।

সে জল খেল। তারপর একটু থেমে বলল, জানেন আজই কেন জানি আমার মনে হল, আমার মা আত্মহত্যা করেননি, মাকে আমার আত্মীয়টি মেরে ফেলেছেন। রাস্তায় আমি যখন মারিয়ার চোখে-মুখে জল দিচ্ছিলাম, তখন কেবল আমার মায়ের কথা মনে পড়েছে। মা'র জন্য আমি আজ যেভাবে কেঁদেছি, কোনদিন এমন করে কাঁদতে পারিনি। আপনাকেই আমি এসব বলতে পারি। আমার আর কে আছে বলুন! বলে, কেমন নদীর মতো প্রবহমান এক স্রোতে সে গা ভাসিয়ে দিল। তার আর কিছু চাইবার নেই। জাহাজে ফিরে যেতে ইচ্ছে নেই। কোথায় যাব! এই ভাল হল, কি বলেন। এখানে, আপানদের মাটিতেই থেকে গেলাম।

—পালানোকে আমি খুবই অসম্মানজনক ভাবি। মৃত্যুভয় সকলেরই কম বেশি থাকে। আমারও আছে। যখনই মৃত্যুভয় আমাকে গ্রাস করতে আসছে—ঠিক তখনই সেই যাদুকরের পালিত পুত্রের মুখ স্মরণ করার চেষ্টা করি। আমি সাহস ফিরে পাই। আমার আর ভয় থাকে না। গাছটা থেকে ফুলটা তুলে আনাই আসল কথা। এমিল নামক এক বালক গাছে গাছে, মাঠে মাঠে কেবল ফুল ফুটিয়ে যাচ্ছে। আমার ইচ্ছা—এই যে আপনার হাতে তৈরি কঠিন প্রাচীর, যেখানে কতকাল শ্যাওলা জমে আছে—সেখানে সামান্য অন্তত ফুল ফুটুক। সামান্য, এই ধরুন শ্যাওলা জাতীয় ফুল ফুটলেই আমি খুশি। আমার মৃত্যুটা মারিয়ার প্রাণে খুব বড় হয়ে ফুটে থাকবে তবে।

সুমন এবার নিজের দিকে তাকাল—এই যে সে, এমন সব কথা বলে যাচ্ছে—এমন দামী এবং মূল্যবান জহরতের মতো কথা—কে বলাচ্ছে তাকে দিয়ে এসব! বার্ট! সামাদ না সুচারু! না মারিয়া! সে বলল, এবার আপনি ইচ্ছা করলে আপনার লোকদের ডাকতে পারেন। তারা আমাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারে এখন। আমি সবটুকু—আশা করি আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পেরেছি। এর চেয়ে বেশি ভাল করে বোঝাতে পারব না। কারণ আমি জাহাজী মানুষ। বোধ বুদ্ধি এমনিতেই মাটি পেলে আমাদের কমে যায়। বলে, সুমন সজল এবং অকপট চোখ করে ফেলল, নির্বোধ ভারোদীর অন্তরাত্মা

সেই সজল এবং অকপট চোখ দেখে স্থির থাকতে পারল না। শুধু দুটো হাত প্রসারিত করে দিলেন। সামান্য এই তরুণ নাবিক সমুদ্র থেকে কি এক সঞ্জীবনী সুধা আহরণ করে এনেছে। মৃত্যুকে এমন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য! তিনি কিছুতেই স্থির থাকতে পারছিলেন না। মৃত্যুকে এত বড় করে ভাবা যায় ভারোদি আগে জানতেন না। আর কিছু না হোক মারিয়া তো তাকে ভুলতে পারবে না। তিনি ভিতরে ভিতরে সন্তান বাৎসল্যে পীড়িত হচ্ছিলেন। এই ঘুরে ফিরে কথা, রামায়ণ গানের মতো সরল বাক্য ভারোদীর কঠিন আত্মাকে কোমল এবং প্রবহমান নদীর স্রোতের মতো আবেগ-বিহ্বল করে তুলল। তিনি পাগলের মতো ডাকলেন, গুড়ুই গুড়ুই। গুড়ুই কাছে এলে বললেন, এই নিষ্ঠুর নাবিকটিকে জাহাজে পৌঁছে দাও। আর ওকে বলে দাও সে যেন আর এখানে না আসে। বলে বোধ হয় তিনিও মূর্ছা যাচ্ছিলেন। সুমন ধরে ফেলল এবং সোফাতে বসিয়ে দিয়ে বলল, যদি অনুমতি করেন, যাবার আগে একবার মারিয়াকে দেখে যাব।

সুমনের দিকে শুধু তাকিয়ে থাকলেন। কিছু বললেন না। শুধু হাত তুলে অনুমতি দিলেন যাবার। সুমন লাফিয়ে লাফিয়ে মারিয়ার ঘরের দিকে ছুটছে। এই প্রথম সে একেবারে আপন জনের মতো এই প্রাসাদের অলিন্দে ছুটে বেড়াতে থাকল, ঘুরে বেড়াতে থাকল। মারিয়ার ঘরে ঢুকে দুষ্টু বালকের মতো মারিয়াকে সুড়সুড়ি দিল। মারিয়া সহসা চোখ মেলে তাকাল। বিশ্বাস করতে পারছে না ওজালিও তাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরতে পারে! সে স্বপ্নের ভিতরে ফের ডুবে গেল। সুমন আর স্থির থাকতে পারল না। সে এই প্রথম আবেগে জড়িয়ে ধরল মারিয়াকে, তারপর মূর্ছিত কোমল প্রাণের ঠোঁটে খুব আস্তে চুমু খেল এবং বলল, মারিয়া, মাই বিলাভেড্। মাই ডিয়ার লেডি, সে ওকে ধীরে ধীরে জড়িয়ে ধরল। মনে হয় দেখে, মেয়ে ভীষণ ঘুমোচ্ছে। যেন এক রাজকন্যা সোনার কাঠি রূপার কাঠি মাথায় পায়ে রেখে ঘুমোচ্ছে। সুমন মারিয়াকে জাগাবার চেষ্টা করল না। ধীরে ধীরে বের হয়ে এল। মারিয়ার পরিচারিকা সুমনকে হলঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে। সুমনের মনে হল এই সেই বাড়ি আর বড় পাথরের পাঁচিল, পাথরের ঘরে বড় বড় সব কুকুর এবং এই সেই প্রাসাদ—একদা এখানে পারিবারিক দাস-ব্যবসা ছিল, পাথরের ঘরে নিগ্রো যুবতীরা ডিম পাড়ার মতো সন্তান প্রসব করে চলে যেত—এইসব সন্তানের বিক্রিতে হাজার হাজার ডলার—ভারোদীর প্রাসাদের মতো বাড়ি, ঝাড়-লণ্ঠন এবং শোবার ঘরে জর্জিয়ান আয়না তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। বাইরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। পপলার গাছে শব্দ এবং বসন্তের রঙিন ফুল উড়ে উড়ে কোনও নিরুদ্দেশে চলে যাচ্ছে। রাত হয়ে গেছে বলে ফুল দেখা যাচ্ছে না। দুটো একটা পাপড়ি সুমনের মাথায় উড়ে এসে পড়ছে। সদর দরজায় পৌঁছাতেই সে সব ফুলের সৌরভ তাকে কেমন আকুল করে তুলল। আর গুড়ুই এই প্রথম সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলল, আপনার জন্য স্যার, গাড়ি প্রস্তুত।

সুমন হাত নেড়ে গুড়ুইকে ধন্যবাদ জানাল।—শহরের সব চেনা হয়ে গেছে গুড়ুই। একা হেঁটে চলে যেতে পারব। তুমি যেতে পার। এই বলে সে অদ্ভুত কায়দায় হাত নাড়তে নাড়তে বস্তুত এই বাড়িকে উদ্দেশ করে বিদায় জানাল। কাল জাহাজ ছেড়ে দিচ্ছে। কাল রাতে তাদের জাহাজ সমুদ্রে নেমে যাবে। তারপর সেই অসহায় যাত্রা। নীলজল এবং নীল আকাশ। মাঝে মাঝে ঝড়। কোনও কোনও সময় টাইফুন এবং তিমি মাছের আর্তনাদ অথবা কেবল স্বপ্নের ভিতর এক মুখ, প্রিয় ভালবাসার মুখ মাঝে মাঝে চোখের উপর ভেসে উঠলে, সুমন বড় অন্যমনস্ক হয়ে পড়বে। ক্রমে সব চোখের উপর থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে। জানালাতে প্রিয় মারিয়া অন্যমনস্ক হলে বুকের ভিতর এক অসীম ব্যথা সময়ে অসময়ে টের পাবে।

সুমন হাঁটতে হাঁটতে উইচ্ককের পথে নেমে এল। কত সব বিচিত্র কথা, মারিয়ার সানপাখির কথা—এমন গল্প বুঝি হয় না, পৃথিবীর কোন প্রান্তে হয়ত মারিয়ার সানপাখিরা এখনও বসবাস করছে। সে যেন ইচ্ছা করলে এই সব পাখি, জীবন বিপন্ন করে এখন ধরে আনতে পারে। সে উইচ্ককের পথে নেমে যাবার সময় দেখল শহরের সর্বত্র আলো গান এবং স্কাইলার্ক ফুলের সমারোহ। সে ক্লান্ত এবং অবসন্ন। এখন কোনরকমে জাহাজে উঠে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়া।

ঠিক বন্দরের মুখে মনে হল কে ওকে অনুসরণ করে আসছে। পেছনে সে কার গলা পেয়ে অবাক

হল।—স্যার, আমি যাচ্ছি। সুমন পিছন ফিরে তাকাল। দেখল গুড়ুই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। গুড়ুই নিঃশব্দে ওর সঙ্গে এতটা পথ অনুসরণ করেছে। সে ফের বলল, আপনার আর কোন ভয় নেই স্যার। আমি এখানে দাঁড়িয়ে পাহারায় থাকছি। আপনি তাড়াতাড়ি জাহাজে উঠে পড়ুন ।

সুমন ক্লান্ত এবং অবসন্ন। সুমনের প্রাণে বিদ্যুৎ খেলে গেল। সে যেন এখন তাজা এক প্রাণ। সে উজ্জ্বল সুমন। সে বলল, গুড়ুই তুমি! বলে হাত চেপে ধরল, তুমি আমার রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে এতটা পথ হেঁটে এসেছ!

গুড়ুই বলল, স্যার মাদাম আমাকে অনুসরণ করতে বললেন।

সুমন সেই ম্যানদের মুখ দেখতে পেল। যারা ন্যাশনাল পার্টির সভ্য। ভারোদীর এই দুর্বলতায় ওরা নিশ্চয় মনে মনে হিংস্র হয়ে উঠেছে। সুমনকে পথে একা ছেড়ে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। সুমন এবার গুড়ুইর হাত ছেড়ে দিল। বলল, বিদায় বন্ধু।

গুড়ুই দাঁড়িয়ে থাকল, সুমন আস্তে আস্তে বন্দর-পথে নেমে যেতে থাকল। দূরে অশ্বশালার পাঁচিলে হয়ত এখন কোনও ফুল ফুটছে। কোন গির্জায় হয়ত ঘণ্টা বাজছিল। কিছু হেরণপাখি হয়ত রাতের আকাশে উড়ে যাচ্ছে। ওরা সমুদ্রে অথবা মোহনায় চলে যাবে। সুমন মাথার উপর সেই সব পাখির শব্দ শুনতে পেল। দু-পাশে জাহাজ সারি সারি। চিমনিতে ধোঁয়া উঠছে। ক্রেনের নিচে অস্পষ্ট অন্ধকারের ভিতর সুমন হেঁটে যাচ্ছিল। সে জাহাজে ওঠার সময় পায়ে কোন শক্তি পাচ্ছে না। কি যেন সে রেখে এসেছে সেই প্রাসাদের মতো বাড়িতে প্রাণের চেয়ে মূল্য যার অধিক, নরম কোমল এক ভালোবাসা সে ফেলে এসেছে পিছনে। সে তার বেদনা ভুলে থাকার জন্য চারিদিকে চোখ মেলে আকাশ নক্ষত্র এবং দূরের বনাঞ্চলে সেই গির্জার ক্রস আবিষ্কারের আশায় রেলিঙে মাথা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। কিন্তু কিছুতেই সেই ভালাবাসার মুখ সে ভুলে থাকতে পারছে না। হয়ত মারিয়া জেগে গুপ্তহত্যার কথা ভেবে ফের মূর্ছা যাবে। গুড়ুইকে অন্তত বলে দেওয়া উচিত ছিল মূর্ছা ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বচরাচরের সর্বত্র যে শুভ-বার্তা আছে, সেই শুভ-বার্তার কথা যেন বলা হয়, মারিয়াকে যেন বলা হয় ঘাস, ফুল, মাটির মতো অথবা পরস্পর আমাদের ভালবাসার মতো আর বড় কিছু নেই, মহৎ কিছু নেই।

জাহাজ-ডেকে কোনও জাহাজী ছিল না সমুদ্র থেকে এখন আর কোনও ঠাণ্ডা বাতাসও উঠে আসছে না। সুতরাং স্থির আলোর ভিতর জাহাজ-ডেকে নিঃসঙ্গতা শুধু। ঝিঁঝি পোকার শব্দের মতো ক্রমান্বয় এক দ্রুত শব্দ ইঞ্জিন রুম থেকে উঠে আসছে। কোন মানুষের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। হেনরীর পোর্টহোলে পর্যন্ত অন্ধকার। সে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে। কেবল এখন মেজ ম্যালোমের কেবিনে আলো জ্বলছে। তিনি হয়ত মদ গিলছেন আর একাই তাস খেলছেন। ফল্কার কাঠ সব পেতে দেওয়া হয়েছে—ওপরে ত্রিপল এবং কিল আঁটা। জাহাজ বোঝাই হয়ে গেছে বলে গ্যাঙওয়ের সিঁড়িটা এখন তত খাড়া নয়। কোয়ার্টার মাস্টার উইংসের আলো জ্বেলে দিতে বোধহয় ভুলে গেছেন, টুইন ডেকের উপর সেজন্য আবছা অন্ধকার। এবং সেই অন্ধকারের ভিতর যেন একটা লোক ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

সুমন পিছিলের দিকে উঠে যাবার সময় সহসা মানুষটার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। মানুষটাকে দেখলে মনে হবে বাজপোড়া মানুষ। এত স্থির এবং অপলক যে বোঝা দায় মানুষ না মানুষের ছায়া অন্ধকারে মিশে আছে। মানুষটা যে শ্বাসপ্রশ্বাস নিচ্ছে তা পর্যন্ত টের পাওয়া যাচ্ছে না।

সুমন ক্লান্ত এবং ক্লিষ্ট। সুমন নানা কারণে আজ বিপর্যস্ত। অথবা যে বিজয় সে করে এসেছে—যে অলৌকিক শক্তি তাকে ভিতরে সাহস যোগাচ্ছিল—এখন সব মনে হলে তা মূর্ছা যাবার মতো অথবা মূর্ছিত এক প্রাণ সে এবং সারাদিনের অভিযান আর দুঃসহ যাত্রা—কি হয়, কি না হয় আর সে নিজের সঙ্গে সংগ্রামে নিজেই লিপ্ত, বিপর্যস্ত মানুষ—সে কিছুতেই আর দাঁড়াতে পারছিল না ডেকের উপর। সে টলছিল। এমন সময়ে এই অন্ধকারের অস্বস্তিকর ছায়াটা নড়ছে না, ওকে দেখে কথা বলছে না, একা একা তীরের দিকে তাকিয়ে পপলারের শাখা-প্রশাখার শব্দ শুনছে কি কাঁদছে, কি ভৌতিক কিছু দেখে পাথর হয়ে গেছে বোঝা দায়। সুতরাং সে চিৎকার না করে পারল না, তুমি কে? অন্ধকারে কে তুমি।

—আমি সামাদ। ঠাণ্ডা গলায় অন্ধকার থেকে মানুষটা জবাব দিল।
—এত রাতে তুই এখানে একা। এখনও তুই ডেকে জেগে আছিস।
সামাদ জবাব দিল না। যে-ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে থাকল।
সুমন পাশে দাঁড়াল, কি দেখছিস?
—কিছু না।
—চিঠি এল দেশ থেকে?
সামাদ জবাব দিল না।
—আমি যা বলছি, শুনতে পাচ্ছিস?
—আমাকে?
—তবে আর কাকে!
—বল্।
—বলছি, এবারে নিচে চল্, রাত তো অনেক হল।
—তুই এতক্ষণে মারিয়ার কাছ থেকে ফিরলি?
—দেখে কি মনে হচ্ছে?
—মনে হচ্ছে একটা স্বপ্ন থেকে উঠে এসেছিস।
—তাই। নিচে আয়। স্বপ্নটার কথা বলা যাবে।
—তুই যা। আমি পরে নামছি।

সুমন নেমে গেল। সামাদ নামল না। সে ঘাড় গুঁজে যেমন দাঁড়িয়েছিল ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে থাকল। কোনও কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছে না। কেবল কি যেন মনে খেলা করে বেড়াচ্ছে। এক নিদারুণ ঘটনা ঘটে যাবে জাহাজে। সকলে বিস্মিত হবে জেনে, টিন্ডাল রহমান ওর বিরুদ্ধে তবে এমনভাবে জাল বিছিয়েছে। তুমি রহমান মিথ্যা তালাকনামা আমার হস্তাক্ষরের উপর লিখে সালিমার বাপকে জমি জিরাত দিয়ে হাত করবে ভাবছ—মিঞা, আমার নাম সামাদ। দু-হাত কচলে ছুঁড়ে-ফুবে দিতে চাইল যেন। তারপর কি দেখে চিৎকার করে বলল, কলজে উপড়ে নেব। ওর হাত-পা শক্ত হয়ে আসছিল। ডেকে সে একা, এনজিনের শব্দ ভেসে আসছে, দূরে সমুদ্রে থেকে হাওয়া ওঠায় গাছে গাছে শন শন শব্দ। ওর ঐ চিৎকার কেউ শুনতে পেল না। সে এখন এই ডেকের উপর কেন এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে বোঝা দায়। কেন এমন ভাবে তাকাচ্ছে বোঝা দায়। সে নিজের গলা টিপে ধরল, গলা টিপে যেন পরখ করল কতটা টিপলে টিন্ডাল চিৎকার করতে পারবে না, তারপর টিন্ডাল রহমানের মৃত চোখের দৃশ্য দেখতে পেয়ে কেমন উল্লাসে ফেটে পড়ল।

অথচ সারাদিন এই হারমাদ মানুষ সামাদ কোন উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করেনি। সে যত দিন যাচ্ছে জাহাজে তত সকলের সঙ্গে হাসি মসকরা কম করছে। কথা কম বলছে। তত সে নামাজের ব্যাপারে আচার নিয়ম রক্ষা করে যাচ্ছে। সে এখন আর বাথরুমে উলঙ্গ হয়ে স্নান করে না। বরং টিন্ডাল রহমান যদি দশ মিনিট মোলাকাত করার ভঙ্গিতে বসে থাকে, সে থাকে কুড়ি মিনিট। সে ধীর স্থির এবং সুবোধ বালক যেন। এমন কি নবির চিঠি পাবার পরও সে উত্তেজিত হয়নি। সুচারু জানতে চেয়েছিল—চিঠিতে কি লিখা আছে। সামাদ সুচারুর কথার জবাব সব সময় এড়িয়ে গেছে। এমন অসম্মানের কথা সে খুলে বলতে পারেনি। সে যেন সহসা বড় সরল অকপট মানুষ হয়ে গেছে। অর্থাৎ সেই তাণ্ডব, ভয়ঙ্কর তাণ্ডবের সম্মুখীন হবার আগে যেমন গাছপালা স্থির এবং অচঞ্চল থাকে, সামাদ তেমনি অচঞ্চল। শুধু একা থাকলে বোঝা যায় সামাদ ভিতরে কত অস্থির হয়ে পড়েছে, কত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। সে জ্বলে পুড়ে খাক হচ্ছিল। সে ক্রমাগত এক প্রতিহিংসাপরায়ণ চোখ অন্ধকারে বুলিয়ে আসছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের মতো ওর চোখ ঝলকাচ্ছিল। সময় এবং সুযোগ বুঝে আহত জন্তুর মতো লাফিয়ে পড়বে।

সামাদকে ফিরতে না দেখে ফের সিঁড়ি ধরে ডেকে উঠে এল। বলল, কি রে, কতক্ষণ দরজা খুলে রাখব? আমাদের ঘুম পায় না।

সামাদ বলল, যাচ্ছি।

সুচারু দাঁড়িয়ে থাকল।

—তুই যা না!

—তুই না নামলে আমি নামছি না। সুমন তো আবার বন্দরে কি সব ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে।

—তাই বুঝি! চলত ও কি বলে শুনি। যেন ওর ভিতরের আগুনটা সহসা নিভে গেছে এমন এক ভাব দেখাল—অথবা বলা যায় সামাদের চোখে যে আগুনটা লুকিয়ে আছে, ইচ্ছা করেই সে আগুনের উপর সামান্য সময়ের জন্য জল ছিটিয়ে দিল। সামাদ নিচে নেমে গেল এবং ফোকসালে ঢুকে বলল, কিরে ধরা পড়ে গেলি!

সুমন হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। সে কাত হল এবং বলল, ধরা পড়ে গেলাম।

—তারপর?

সুমন বলল, বাকিটা কাল বলব বলে সে ঘুমের জন্য হাই তুলতে থাকল।

—খুব ঘুম পাচ্ছে?

—খুউব। সুমন হাত পা গুটিয়ে চোখ বুজল।

সুতরাং সামাদ উপরের বাংকে উঠে শুয়ে পড়ল। সুচারু একটা বই হাতে নিয়ে শুয়েছে। বই পড়তে পড়তেই ওর ঘুমোবার অভ্যাস। সুচারু ঘুমোলে সামাদ বাতি নেভাবে। সুমন ফের পাশ ফিরে শুল এবং পাশ ফিরতেই সারাদিনের সব নাটকীয় ঘটনা বন্দরে এক এক করে মনে পড়তে থাকলে মনে হল আসলে তার উপর এমিল ভর করেছিল। সে সুমন ছিল না। সে ভিতরে ভিতরে কেমন শিহরণ অনুভব করল। এই সুমন যেন মারিয়ার চোখের উপর, ওর মায়ের চোখের উপর প্রতীকী মানুষ হয়ে যাদুকরের পালিত পুত্রের অভিনয় করে এল। সে এখন বুঝতেই পারছে না কি করে এত বড় একটা দুর্ঘটনা থেকে নিজেকে রক্ষা করল। বুঝি অন্য কোনও শক্তি এবং সাহস, অথবা ভালবাসার নিদর্শন রেখে যাবার জন্য সে সহসা এক মহান নায়ক, সে সহসা নদীর উৎসে ঝরনার মতো নির্মল এবং অলৌকিক কিছু করে ফেলেছে। সে এবার চোখ বুজল। চোখ বুজলেই এক কোমল মুখ, ফুলঝুরির মতো চার পাশে ফুটে উঠতে থাকল যেন। মারিয়া ওর সামনে শত সহস্র মুখ হয়ে গেছে। বলছে, তুমি আমায় নিয়ে চল, সামনের বনে হারিয়ে গিয়ে তপোবন সৃষ্টি করি।

সামাদ এবার উঁকি দিল নিচে। সুচারু ঘুমিয়ে পড়েছে। সুমন চোখ বুজে পড়ে আছে। সে নবির চিঠিটা খুলল। নিচে কাঁপা হস্তাক্ষরে গোটা তিন লাইন লিখেছে সালিমা। বড় অসহায় সেই হস্তাক্ষর—যেমন বলির পাঁঠা ফুলের মালা পরে হাড়কাঠে বাঁধা থাকে তেমন এক মুখ সালিমার ভেসে উঠল, হস্তাক্ষরের ভিতর সামাদ সালিমার সেই করুণ মুখ দেখে—হায় আল্লা এবং পারলে যেন ধরণী, গাছপালা, বৃক্ষ এবং জাহাজের মাস্তুল সে ভেঙে দেয় অথবা অন্ধকারে কেমন চিৎকার করার বাসনা। কারণ সালিমার হস্তাক্ষরে দূরবর্তী কোনও বাতিঘরের মতো আলো নেই, বড় টিন্ডাল রহমান এক অতিকায় ঝড় হয়ে গেছে এবং বাতিঘরের সব কলকজা নষ্ট করে দিচ্ছে। বাতিঘরে শুধু অন্ধকার। যদি কখনও জ্যোৎস্না ওঠে, তবে মনে হবে বাতিঘর একা, এক ভূতুড়ে অবয়ব নিয়ে বেঁচে আছে। তার দূরবর্তী জন্মভূমিতে এখন সালিমার অস্তিত্ব এক ভূতুড়ে অবয়ব শুধু, স্বামী তাকে তালাক দিয়েছে। সালিমা কি করবে, কোথায় যাবে, পানিতে ডুবে মরেও যেতে পারে। বড় টিন্ডাল রহমান সালিমার বাপকে লিখেছে সামাদ তালাকনামা করেছে। সাক্ষী, সাবুদ আছে। ওর হস্তাক্ষরে সই আছে। তালাকনামা রহমানের কাছে রয়েছে। দেশে ফিরলেই সালিমার বাপের হাতে সেই তালাকনামা তুলে দেবে। নবি আরও লিখেছে, সালিমার বাপ চোখে-মুখে অন্ধকার দেখত, যদি না বড় টিন্ডাল লিখত, আল্লার কুদরতে সব হবে মিঞা! ডর নাই। সালিমার কষ্ট হয় এমন দুনিয়া আল্লা সৃষ্টি করে নাই। আমার যা কিছু আছে সবই তার, জানিবা। সালিমাকে চিঠিপত্র লিখতে বারণ করিবা। শয়তানের কাছে কোন চিঠি দিতে নাই, চিঠি লিখলেই গুণাগার হইতে হইবে জানিবা।

সুতরাং সামাদের সব চিঠি সালিমার বাপ নষ্ট করে দিয়েছে। সালিমাকে ঘর থেকে বের হতে দেয়নি। চিঠি লিখতে দেয়নি। দূরে পোস্টাফিস। সপ্তাহে একদিন ডাক আসে। সালিমার বাপ ডাক

আসার দিন বাড়িতে বসে পাহারা দিত, সামাদের চিঠি এলে নষ্ট করে ফেলত। সালিমার বাপ অজ্ঞ মানুষ, কি লেখা থাকে ওর জানা নেই! সালিমা প্রিয়জনের খত না পেয়ে ক্রমে আকুল হতে থাকে। মানুষটা তাকে তালাক দিয়েছে—মিথ্যা কথা। ফসল যদি না ফলত, নদীর জল যদি শুকিয়ে যেত এবং শীতকালে যদি ওলাওঠা হয় অর্থাৎ দুর্বৎসর হলে, যুবতী গাভীর বাচ্চা না হলে, এমন সব অলক্ষুণে ঘটনা ঘটলে সে বিশ্বাস করতে পারত—এ-সালে তার নামে তালাকনামা লেখা আছে। কিন্তু কি যব গমের ফসল, নদীতে কি নির্মল জল এবং পরবের দিনে কত বড় উৎসব, হাটে-মাঠে এবং গ্রামে গ্রামে—তেমন সময়ে মিঞা আমারে তালাক দিলা! কি কসুর আছে কও? দুবেলা আঁখিতে পানি ঝরে তোমার জন্য—আমার যদি এই কসুর হয়, তবে মিঞা বলছি, তোমার জন্য আঁখি আমার কাঠ হয়ে যাবে। পদ্ম হয়ে পানিতে আর ফুটে উঠবে না।

সামাদ আর স্থির থাকতে পারল না। সফরে সফরে রহমান যেমন তালাক দিয়ে এসেছে, এ সালেও সেই তালাক এবং এ-সালে তবে যথার্থই ইতর মানুষটা তার বিবির দিকে হাত বাড়িয়েছে। এত দিনের সংশয় তবে যথার্থই সত্য হয়ে উঠেছে। সাদা কাগজটা তবে সে যত্ন করে রেখে দিয়েছে। বদ, ইতর, ভণ্ড রহমানকে সে গলা টিপে ধরার জন্য দু-লাফে দরজা পার হয়ে সিঁড়িতে উঠে গেল। সিঁড়ির মুখে টিন্ডালের ফোকসাল। সে দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁকল, দরজা খোল! তারপর কে কার দরজা খোলে! কে কার তাণ্ডব দেখে। দরজার উপরে সামাদ লাথি মারতে থাকল। হারমাদ মানুষ এই সামাদ। লাথিতে লাথিতে দরজা ভেঙে ফেলল। হারমাদ সামাদ একটা গোটা দৈত্য হয়ে গেছে। যে মানুষটা সফরে সফরে তালাক দিয়ে নূতন বিবি ঘরে আনে—যার কচি-কাঁচা যুবতী পেলে মাথা ঠিক থাকে না, সেই টিন্ডাল, বড় টিন্ডাল সালিমার দিকে হাত বাড়িয়েছে। তুমি জান না মিঞা বলে, সামাদ যেমন পলো থেকে শোল মাছ তুলে আনে, তেমনি দু-হাতে টিন্ডালের গলা টিপে ধরে হাওয়ায় ঝোলাতে থাকল আর চিৎকার করতে থাকল, আমার কাগজ কোথায় মিঞা। আমার সই করা সাদা কাগজটা কোন্‌খানে কও। তুমি কি লিখে রেখেছ কও। ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো শরীরটাকে দোলাচ্ছে, আর বলছে সামাদ, কি লিখছ সেখানে। সালিমার বাপকে জমি জিরাতের লোভ দেখাও হারামি, ইতর। শুয়োরের বাচ্চা, ইবারে ক তুই, তর কেমন লাগে।

ইদ্রিশ দেখল সামাদের দু-হাতের ভিতর একটা বড় শোলমাছের মতো কালো-জীব দুলছে। সে ভেউ-ভেউ করে কেঁদে ফেলল।—তোমার কে কোন্‌খানে আছ রে মিঞা, দ্যাখ আইসা দরিয়ার পানীতে একটা খুন খারাবি হৈয়া গ্যাল। হায় হায় কেউ আসে নাবে! আমি কি করমুরে!

গভীর রাত। জাহাজীরা যে যার ফোকসালে ঘুমিয়ে আছে। শুধু ইনজিনের একটানা শব্দটা ক্রমান্বয় ভেসে আসছিল। আর কোন শব্দ ছিল না। তারপর সহসা এই কাণ্ড। জাহাজীরা সকলে ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিল। সামাদ বড় টিন্ডালকে টেনে হিঁচড়ে উপরে নিয়ে ডেকে আছড়ে ফেলল—পয়সার এত গরম মিঞা! দে শালা বেজন্মার বাচ্চা, আমার কাগজটা দে।

ডেকের উপর এবার লড়াইটা জমে উঠেছে। দিন দিন এই জাহাজে বড় টিন্ডাল রহমানের সঙ্গে সাধারণ ডেক-জাহাজী সামাদের যে আক্রোশ ছিল, জাহাজ ছাড়ার আগে যেন সেই আক্রোশ তাণ্ডব হয়ে দেখা দিয়েছে। কারণ রহমান ঘুমের চোখে কিছু বুঝতে না পারায় সামাদ যতটা তাড়াতাড়ি ওকে কাবু করে ফেলেছিল, ডেকের উপর উঠে তত সহজে কাবু করতে পারছে না। কারণ রহমান—যদিও তার বয়স তিনকুড়ি হবে, সে তুলনায় সামাদের আর কত বয়স—এই বিশ হতে পারে, বাইশ হতে পারে, আবার বত্রিশও হতে পারে, সেই সামাদ শক্তসামর্থ মানুষ রহমানের সঙ্গে খুব সহজে যুঝে উঠতে পারছে না। তবু এক সময় পাগল-প্রায় হুঙ্কার দিল, সে যথার্থই এবার মেরে ফেলবে রহমানকে! ডেকের উপর আলোগুলি জ্বলে উঠেছে। জাহাজীরা সকলে ছুটোছুটি করছে ডেকে। ইদ্রিশ চিৎকার করছে। ইনজিনসারেঙ ছুটে গেছে বড় মিস্ত্রির কাছে। বড় মালোম, মেজ মালোম ছুটে এসেছেন। হেনরী ছুটে এসেছে। সুচারু কি করবে বুঝতে পারছিল না। সে নিচে গিয়ে সুমনকে তুলল। শিগ্‌গীর আয় সুমন! সামাদ বড় টিন্ডালকে মেরেই ফেলবে বুঝি। ওকে নিরস্ত করা যাচ্ছে না।

সুমন ধড়ফড় করে উঠে বসল। সামাদের এই প্রচণ্ড উন্মত্ততায় সে বিরক্ত হয়ে বলল, বেশ ভাল

ছিল ক'দিন, আবার কি হল।

—দেরি করলে খুন হয়ে যাবে বড় টিন্ডাল।

সুমন ছুটে বের হয়ে গেল। সুচারু পিছনে। সকলে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কাছে যেতে সাহস পাচ্ছে না। সামাদ একটা ধারালো স্লাইস ঘোরাচ্ছে মাথার উপর। সে চিৎকার করছে, তাব সামনে এখন যে যাবে তার মৃত্যু যেন অনিবার্য। সে রহমানকে আধমরা করে পায়ের নিচে ফেলে রেখেছে। এ-সময় কাপ্তান পর্যন্ত কোন নির্দেশ দিতে পারছেন না। একমাত্র সুমন এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে অথবা সুচারু। ওরা একই ফোকসালে থাকে,—সুতরাং সকলে ওদের আশায় থাকলে দেখা গেল সুচারু ছুটে যাচ্ছে। সেই অনিবার্য মৃত্যুর দিকে ছুটে যাচ্ছে—কারণ সামাদ এত দ্রুত ঘুরাচ্ছিল স্লাইস যে মনে হয় সে একটা বড় থাম হাতে নিয়ে অবলীলাক্রমে খেলা করে বেড়াচ্ছে। সুমন একটু নিচু হয়ে ওর পায়ের কাছে বসে পড়ল। স্লাইসটা তখনও মাথার উপর বন্ বন্ করে ঘুরছে। সুচারু সহসা একটা হাত ধরতেই স্লাইসটা ছিটকে গিয়ে দূরে গড়িয়ে পড়ল। তারপর হুড়মুড় করে এগিয়ে যাওয়া—সামাদ পাগল-প্রায় স্লাইস ঘোরাচ্ছিল। সে এখন নিস্তেজ। ওকে সকলে ঘিরে ফেলেছে। জাহাজীরা ভাবছিল, দীর্ঘদিনের সমুদ্রযাত্রা সামাদকে পাগল করে দিয়েছে, অথবা অন্য কিছু, সুতরাং ওকে আর একা এ-ভাবে রাখা যায় না। দড়ি দড়া দিয়ে যেমন বন্দরে জাহাজ এলে বেঁধে ফেলা হয়, ঠিক সেভাবে ওকে সকলে বেঁধে ফেলতে চাইল।

সুমন চিৎকার করে উঠল, সামাদ!

সুচারু পিছন থেকে বলল, আমাদের তুই মেরে ফেলবি, সামাদ! তুই কি পাগল হলি!

—পাগল! সামাদ শুধু হাতে রুখে দাঁড়াল।

সুমন বলল, টিন্ডাল চাচা ওঠেন।

—খবরদার। সে পা দিয়ে চেপে রেখেছে টিন্ডালের গলা।

কিন্তু উঠবে কে! ওর মাজা প্রায় ভেঙে দিয়েছে সামাদ। কিছু জাহাজী এবার পিছন থেকে ছুটে এসে সামাদকে ধরে ফেলল। ওরা রহমানের পক্ষে বলে দড়ি দড়া যেন ওদের হাতে ঠিক করা ছিল। জন্তু জানোয়ার যেমন খাঁচায় পড়লে লাফাতে থাকে এবং ছুটতে থাকে সব ফেলে সামাদ তেমনি লাফাতে অথবা ছুটতে চাইল। কোথায় ছুটবে সামাদ। জন্তু জানোয়ারের মতো জোরজার করে বেঁধে ফেলল। বলল, পাগলামী করবার জায়গা পেলে না মিঞা।

সুমন বলল, ওকে নিয়ে আপনারা কি করছেন!

সুচারু ক্ষেপে গেল, কি হচ্ছে এটা!

ডেক-সারেঙ বলল, এই হবে।

—কেন হবে।

—জাহাজটা মানুষের জন্য, পাগলের জন্য নয়।

সে এবার বড় মালেমার দিকে তাকাল। বড় মালোম পর্যন্ত ডেক-সারেঙের কথায় যেন সায় দিচ্ছেন! সুচারু সামাদ কেমন গুম হয়ে গেল।

টিন্ডাল যেন এতক্ষণে শ্বাস ফেলতে পেরে ডেকের উপর ইদ্রিশের কাঁধে ভর করে দাঁড়াল। বলল, শালার বাপ পাগল, বেটা পাগল হৈব নাত, কি হৈব। সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাঁটতে থাকল। টিন্ডালের ক্ষতস্থান থেকে এখন ইদ্রিশ আলি রক্ত ধুয়ে দিচ্ছে।

সামাদ কেমন অসহায় বোধ করে একেবারে বোবা বনে গেল। ওর চোখ দেখলে মনে হয় সে দূরের কোন জলাশয়ে তার প্রাণপাখিকে ডুবে মরতে দেখছে। সে কথা বলছে না—প্রায় মৃতের মতো ডেকের উপর পড়ে আছে। কিছু লোক ধরাধরি করে ওকে নিচে নিয়ে গেল। যেন ওর মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। সামাদ চোখ বুজে ছিল। ওর হুঁস ছিল না।

—কি করুণ এই দৃশ্য! সুমন এবং সুচারুর মনে হল, কি এক নিদারুণ রহস্য জড়িয়ে আছে গোটা ব্যাপারটাতে। কেন এমন সব তাণ্ডব সামাদ জাহাজে বাধাচ্ছে, কেন সে সহসা হারমাদ মানুষের মতো জ্ঞানগম্যি হারিয়ে ফেলে, বোঝা দায়। সে কিছুই খুলে বলছে না, কেবল আমার সাদা কাগজটা টিন্ডাল,

এই উচ্চারণ করছে। কি সে কাগজ! কি এমন অমূল্য ধন সেই সাদা একটুকরো কাগজ; বড় টিন্ডাল লুকিয়ে রেখেছে, বোঝা যাচ্ছে না।

কাপ্তান এখন বোট-ডেকে উঠে যাচ্ছেন। দীর্ঘদিনের সমুদ্রযাত্রা তার। এই সব সমুদ্র যাত্রায় তিনি কত ঘটনার সাক্ষী থেকেছেন; জাহাজ চলছে চলছে, ঝড় নেই, কোন দেওয়ানি নেই, দুদিন বাদে বন্দর অথচ সহসা খবর রটে গেল, কশপের ঘরে একুশ টাকার নাবিক আত্মহত্যা করেছে। কেন এই আত্মহত্যা? রহস্যটা কেউ ধরতে পারল না। জাহাজ বন্দরে বাঁধা। আলো সব জ্বেলে দেওয়া হয়েছে ডেকে। বন্দরে হয়ত কোনও উৎসবের দিন তখন। অথচ জাহাজীরা বোট-ডেকে ছুটে এসেছে—মেজ মালোম জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। আবার হয়ত জাহাজ দেশে ফিরছে। জাহাজীরা পেটি বদনা ঠিক করে ফেলছে, বন্দর এলেই নেমে পড়বে—বিবির জন্য সওদা, খুসবু আতর, মরিসাসের কাঠের হাতি, বুনো সাইরিসের কম্বল শীতের দিনের মনোরম কামিজ—এমন সময় কিনা এক জাহাজী মাস্তুলে ওঠে, রঙ লাগাতে গিয়ে পাখি হয়ে উড়াল দিল মাস্তুল থেকে। তারপর নিচে, একেবারে নিচে ফল্কার ভিতর মানুষটা ছাতু হয়ে গেল। এমন সব কত ঘটনার তিনি সাক্ষী। সুতরাং কাপ্তান যখন সারেঙের মুখ থেকে শুনতে পেলেন—সামাদ তার উপরওয়ালার সঙ্গে জাহাজে উঠেই বিবাদ, শুধু বিবাদ নয়—এক ধরনের অশ্লীল সব ছবি লুকিয়ে রাখত, টিন্ডালকে বিব্রত করার জন্য অহেতুক বচসা করত, একটা সাদা কাগজের কথা বলত, তখন থেকেই মনে হচ্ছিল, সামান্য গোলমাল আছে মাথায়। কি সাদা কাগজ, সামান্য সাদা কাগজের জন্য সেই যে বন্দর থেকে বন্দরে টিন্ডালের পিছনে লেগে আসছে—কিছুতেই থামছে না। তাছাড়া ইদানীং অন্ধকারে দাঁড়িয়ে একা একা কথা বলত, এমন দৃশ্য জাহাজীরা কেউ কেউ দেখেছে। যে মানুষ এমন হয়ে গেছে তাকে আর খোলামেলা রাখা যায় না। এখন শুধু বেঁধে ফোকসালে ফেলে রাখা আর সময় এবং সুযোগমতো দেশে পাঠিয়ে দেওয়া।

ওর দেশ থেকে একটা চিঠি এসেছে। চিঠিটা আসার পরই ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে সামাদ। সুমন, সুচারু নিচে নেমে দ্রুত সেই চিঠি খুঁজতে থাকল। কারণ চিঠিটাতে কোন রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে। চিঠিটা ওরা বেশি সময় নিয়ে খুঁজল না—কারণ দেখল চিঠিটা সামাদের বাংক থেকে উড়ে এসে নিচে পড়ে আছে। এবার ওরা দুজনে সন্তর্পণে চিঠিটা পড়ল। খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ল। বিবির চিঠিটাতে স্পষ্ট এমন সব কথা লেখা আছে। দেশে রহমান টিন্ডাল সালিমার বাপকে জানিয়েছে সামাদ তালাকনামা করেছে। আর সেই তালাকনামা রহমানের কাছে আছে। অবাক। তালাকনামা কেন। প্রাণের চেয়ে যে যুবতীর স্মৃতি অধিক—যে সালিমার নাকে নথ, পায়ে মল এবং চোখে যার স্বপ্ন ভাসে তার নামে তালাকনামা! তারা আবার নিচেরটুকু পড়ল। লেখা আছে তালাকনামা রহমান দেশে ফিরলে সালিমার বাপের হাতে পৌঁছে দেবে। রহস্যটা এবার আরও জট পাকাল! সুচারু নিবিষ্ট মনে কেবল চিঠি থেকে কি যেন উদ্ধার করতে চাইছে! সাদা কাগজে কি আছে! সামাদের হস্তাক্ষরে দস্তখত আছে। কেন এই দস্তখত! তবে কি সেই দস্তখত করা কাগজে রহমান মিথ্যা তালাকনামা করে সামাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। সালিমার বাপকে জমিজিরাতের লোভ দেখিয়ে সালিমাকে শেষ বয়সে সাদি করতে চাইছে। কিন্তু বড় টিন্ডাল বয়সে বুড়ো—তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। সমুদ্রে বোধ হয় এই শেষ সফর। তাছাড়া এমন একটা ঘটনা, সামাদই বা এত চেপে যাচ্ছে কেন। জীবনমরণ প্রশ্নের সামিল—সামাদ এত কথা বলে বিবি সম্পর্কে—কি অসুবিধা বাকিটুকু বলতে!

পাশের ফোকসালে সামাদকে রাখা হয়েছে, ওরা শেকল খুলে ভিতরে ঢুকে গেল। সুমন শিয়রে বসে বলল, তোর চিঠিটা পড়লাম।

সামাদ বড় বড় চোখে তাকাল। চিঠিটা পড়াতে ওর যেন কি সর্বনাশ হয়ে গেছে।—তোরা কেন পড়লি। তোদের কি দরকার ছিল পড়ার। তোরা আমার এত বড় সর্বনাশ করলি কেন?

—আমরা দেখেছি বলে তোর কি হয়েছে?

সামাদ সেই বন্ধ অবস্থায়ও কেমন ছটফট করতে থাকল।—আমি সালিমাকে তালাকনামা দেইনি। রহমান মিথ্যা করে আমার দস্তখত করা কাগজে তালাকনামা লিখে ফেলেছে। তোরা দেখে ফেলেছিস,

জানাজানি হয়ে গেল। আমার কি হবে? আমি মরে যাব সুচারু! আমি আমি...।—এটা কি করছিস!

তুই মাথা ঠাণ্ডা কর, সামাদ। তুই কেন দস্তখত করা সাদা কাগজ দিতে গেলি।

সে তার কলকাতার অসুখের কথা বলল। দেশের বড় টিণ্ডাল রহমানের তখন একেবারে রহমান রহিম চেহারা। সবটা সে খুলে বলল। অসুখে রহমান অনেক টাকা দিয়ে ফেলেছিল। সামাদ বড় দুর্বল ছিল, সাদা কাগজে দস্তখত দিয়ে বলেছিল বাকিটা লিখে নেন বড় টিণ্ডাল। লেখার লোক ছিল না কাছে, সময়মতো লিখে নেবার কথা থাকল—তারপর মনে হলে সামাদ বার বার এক কথা বলে এসেছে—আমার সাদা কাগজ মিঞা, বড় টিণ্ডাল এক কথা বলে এসেছে, ওটা নাকি ওর হারিয়ে গেছে। সন্দেহ, ক্রমে সংশয় এবং নবির এই চিঠি। তালাকনামা জানাজানি হয়ে গেলে সব গেল। সামাদ সন্তর্পণে কাগজটা উদ্ধার করতে গিয়ে কেমন মাথা গরম করে ফেলল। সামাদ কাটা কাটা কথা বলছিল, সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বুকটা উপরের দিকে ঠেলে তুলছে। সব কথা একসঙ্গে বলতে পারছিল না। ওরা ওর সেই অস্পষ্ট কথা থেকে প্রায় মোটামুটি ধারণা করে ফেলল। সামাদ এখন অসহায় জন্তুর মতো পড়ে পড়ে আর্তনাদ করছে। ওর সালিমার সেই কাতর চোখ ওকে ভিতরে ভিতরে পাগল করে দিচ্ছে।

সামাদ বলল, দোহাই তোদের, তোরা আমার হাত-পায়ের গিঁট খুলে দে।

—একটু চুপচাপ থাক। সুচারু বলল।

—আমি কি করব? হায় হায় করে উঠল সামাদ।

—তোকে কিছু করতে হবে না। বাকিটা আমরা করছি।

ডেকে উঠে সুমন বলল, কাউকে কিছু বলা যাবে না।

—কি বলা যাবে না?

—এই তালাকনামার কথা। অথচ সাদা কাগজটা বড় টিণ্ডালের কাছে ঠিক আছে। ওটা বের করতে হবে।

—বলা যাবে না কেন? সারেঙকে সব খুলে বলতে হয়।

—শরিয়তি মতে একবার লেখা হয়ে গেলে, লেখা হয়ে গেলে কিরে—যদি রাগ করে বিবিকে, যা শালী তোকে এক তালাক, দু-তালাক, তিন তালাক বাইন তালাক বলে ফেলে তবে বাস, তালাক হয়ে গেল! আর এতে সামাদের দস্তখতের উপর শালা বড় টিণ্ডাল খুব সুন্দর করে তালাকনামা লিখে নিয়েছে। যদি সারেঙ কিংবা অন্য জাতভাই ব্যাপারটা জেনে ফেলে আর কিছু করার থাকবে না। সালিমা ওর বিবি থাকবে না।

—কিন্তু ইদ্রিশ আলি তো জানে ব্যাপারটা।

—সে জানে, সেও ব্যাপারটাকে গোপন রেখেছে! কেবল বড় টিণ্ডাল আর ইদ্রিশ আলি এটা করেছে—এটা যে ষড়যন্ত্র, ধরা পড়বে ভয়ে ওরা চুপচাপ।

সুচারু বলল, শালা বুড়ো বয়সে লবেজান বিবির জন্য...।

—শোন মাথা ঠাণ্ডা রেখে আমাদেরও এগুতে হবে।

—তা হলে কি করা যাবে এখন!

—চল হেনরীর কাছে। ওকে সব খুলে বলা যাক।

সুমন যেতে যেতে বলল, এজন্য সামাদ গোপনে কাগজটা উদ্ধারের আশায় ছিল। ওর মনে একটা সংশয় ছিল, কিন্তু সে সংশয়ের কথা কাউকে খুলে বলেনি। এতদিন পর নবির চিঠিতে ওর সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। ওরা এবার উভয়ে হেনরীর কেবিনে ছুটে গেল। হেনরী অফিসার মানুষ। ওদের আপনজন. ওকে খুলে বলতে পারলে বাকিটা সে নিশ্চয়ই করবে। সুমন হেনরীকে সব খুলে বলল—বুঝল হেনরী, এ নিয়ে পিছিলে হৈ-চৈ করা যাবে না। জানাজানি হয়ে গেলে সামাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। টিণ্ডালের কাছ থেকে গোপনে কাগজটা উদ্ধার করতে হবে। ওকে যদি ধরে চ্যাঙদোলা করে আজ রাতে তোমার ঘরে তুলে এনে কুপিয়ে কাটার ভয় দেখাই, অথবা এই ধর ওকে যদি আমরা সমুদ্রে গেলে বোট-ডেকে চেপে ধরি—অন্ধকার সমুদ্রে ফেলে দেব, ভয় দেখাই তবে কেমন হয়!

সুচারুর মাথায় এখন কিছুই আসছিল না। ওর মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। সামাদের চোখে এখন একটা মাত্র মুখ নক্ষত্রের মতো জ্বলছে! সে মুখ সালিমার। তার ফের মনে হল, এই একটিমাত্র মুখই সামাদের বাতিঘর। সে স্থির থাকতে পারছে না, পায়চারি করছে। কি করা যায় তিন বন্ধুতে ভাবছে। লিজার মুখ কেবল এ-সময় মনে পড়ছিল। লিজা, তার লিজা, কতদিন ধরে সেই লিজাকে ফেলে দূর দূর দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, রবার্ট সুচারু যেন লিজার মুখেই সালিমাকে আবিষ্কার করে বিষণ্ণ হয়ে গেল। আমাদের এক প্রাণ আছে—ভালবাসার প্রাণ, সংসার সমুদ্রে সেই প্রাণ ডুবে মরলে আর কি থাকে, এখন আর কি করণীয়, কিছুতেই ভেবে উঠতে পারল না!

হেনরী কিছুক্ষণ চিন্তিত মুখে বসে থাকল। তারপর পোর্টহোল খুলে দিয়ে বলল, কিন্তু ইদ্রিশ আলি জানে ব্যাপারটা। সে তো সেখানে সাক্ষী হিসাবে সই করতে পারে। সে দেশে গিয়ে ওর জাত ভাইদের বলে দিলে...।

—একটা লোক ইচ্ছা করলে মিথ্যা বলতে পারে হেনরী। কাগজটা উদ্ধার করতে পারলে কে তার তোয়াক্কা রাখে। একশ লোক বললেও সেটা মিথ্যা প্রমাণিত হবে।

হেনরী বলল, এত বড় কাজ আমরা তিনজনে পারব না। এস মেজ মালোমকে বলি, বড় মালোমকে সব খুলে বলি। এই বলে হেনরী মেজ মালোমকে ডেকে তুলল। বলল, বড় টিন্ডালের ফাঁসি হওয়া উচিত।

ঘটনা সব শুনে বড় মালোম, মেজ মালোম ছুটলেন কাপ্তানের কাছে। মাস্টার, আপনার কাছে নালিশ আছে।

--এত রাতে নালিশ।

--সামাদকে বেঁধে রাখলে স্যার অন্যায় করা হবে। এবং সব খুলে বললে, তিনি ক্ষোভে ফেটে পড়লেন—স্কাউন্ড্রেল!

--কি করা যায় ভাবছি! বড় মালোম চিন্তিত মুখে বললেন।

—সারেঙকে ডাকাও।

সারেঙকে ডাকালে সব ফাঁস হয়ে যাবে। ওর জাতভাইরা জানবে; তালাকনামা তবে টিকে যাবে।

—তবে তোমরা কি করতে চাও? স্মিথ, জন—তোমরা বল কি করতে চাও?

ভোর হলে আপনি টিন্ডালকে ডাকবেন। বলবেন কাগজটা ওর কাছে আছে, কাগজটা না দিলে রাতের অন্ধকারে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হবে। টিন্ডাল ভীতু মানুষ, ভয়ে দিয়ে দিতে পারে। বড় মালোম এসব বললেন।

—আরে না, অত ভীতু মানুষ তোমরা ভাবছ কেন? ভীতু মানুষ হলে অত বড় স্কাউন্ড্রেল হয় না। তা ছাড়া ভোরের জন্য বসে থাকা যায় না। সামাদের হাত-পা খুলে দাও। টিন্ডালকে ডাইনিং রুমে ডাকাও। আমি নিচে এক্ষুনি নেমে যাচ্ছি।

জাহাজে হৈ-চৈ পড়ে গেল ফের। জাহাজীদের ছুটোছুটি আরম্ভ হয়ে গেল। ডেক-সারেঙ এবং ইনজিন-সারেঙকে ভীত দেখাচ্ছে খুব। এই রাত দুপুরে এ-সব কি কাণ্ড জাহাজে। কি হয়, কি না হয়—কাপ্তানকে সকলের যমের মতো ভয়। কাপ্তান ডেকেছে শুনে, টিন্ডাল রহমান আবগারী দারোগার মতো মুখ করে ফেলল। সে যেন এখন সামনে সব ভূত দেখতে পাচ্ছে। সে দাঁড়াতে গেলে তার হাঁটু কাঁপছে। এক ফোকসালে নিবাস ইদ্রিশ আলির, সে তাকে বলল, হারে ইদ্রিশ—কাপ্তান আমাকে ডাকল ক্যান?

সুচারু দরজায় দাঁড়িয়েছিল। বলল, যান, গেলেই জানতে পারবেন।

সুমনের দিকে বড় বড় চোখে কটমট করে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। এই এতসব করিয়েছে। পারলে যেন সে এখন সুমনের গলা কামড়ে ধরতে চায়।

সারেঙ এসে এক ধমক লাগাল, এখনও বসে আছ তুমি।

—আমি কি করুমরে সারেঙসাব। আমার ডর করতাছে।

এতরাতে এইসব কাণ্ড কারখানা দেখে জাহাজীরা সকলে তাজ্জব বনে গেছে। হাত-পা খুলে

দেওয়া হয়েছে সামাদের। সামাদকে এবার ফোকসালে নিয়ে গেল সুমন। দরজা বন্ধ করে দিল। সামাদকে শান্ত রাখার জন্য সে নানাভাবে—সেই যেমন পিতা সন্তানকে সমুদ্রে, হয়ত ঝড় হবে, তাণ্ডব হতে পারে, যে তাণ্ডবে জাহাজডুবি হলে পিতা পুত্র সাঁতার কাটতে কাটতে দূরের কোন পাহাড়ের উপর আলো জ্বলতে দেখে, যেমন পিতা পুত্রকে বেঁচে থাকার জন্য নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করে, সুমন সামাদকে নানাভাবে—কি ভাবে বলা যায়—যেন কত ভাবে, সে যেন সেই এক গল্পের এমিল, যার ফুল ফোটানো কাজ, পাহাড়ে বন্দরে ফুল ফোটানোর কাজ, যাদুকরের পালিত পুত্র এমিলেব মতো সে এবার সামাদের জীবনে ফুল ফোটাতে চাইল। নানা কথায়, সালিমার নানা প্রসঙ্গে যেমন যব-গম গাছ দেখলে সালিমা ছুটতে ভালবাসত, তেমনি সব গল্প বলে সামাদের জীবনে ফুল ফোটাতে চাইল।

টিন্ডাল ডেকের উপর ওঠার সময় চেঁচামেচি করছে। সুমন সম্পর্কে সে খিস্তি করছে। সকলে মিলে ছোড়াটার মাথা খাচ্ছে। কি এক সামান্য ঘটনা নিয়ে সে কাপ্তানকে পর্যন্ত নালিশ দিতে সাহস পাচ্ছে। সারেঙও সুমনের উপর এখন সন্তুষ্ট নয়। কারণ সুমন রহমান সম্পর্কে সারেঙকে নালিশ দিতে পারত, তা না একেবারে কাপ্তানের কাছে হাজির। সে নিজের দল ভারী করার জন্য ডেক-সাবেঙকে সঙ্গে ডেকে নিল। কশপ্ গেল সঙ্গে। ওরা রহমানের হয়ে বলবে।

কিন্তু ডাইনিং রুমের দরজায় সেই কাপ্তান—সারেঙ, কশপ্ এবং ডেক-সারেঙকে দেখতে পেলেন—তিনি তেড়ে গেলেন তাদের। বড় মালোম ওদের চলে যেতে বললেন। কারণ সংগোপনে কাজটা সারতে হবে। এলওয়েতে এমন কি একজন পাহারাদার রেখে দেওয়া হল—যেন এ সব কথা দু-কান না হয়। মেজ মালোম বাইরে পায়চারি কবতে থাকলেন। রহমানের চোখমুখ, এখন শুকনো দেখাচ্ছে। মানুষটা শয়তানের বাচ্চা—ইতর এবং নোংরা। সে ভিতরে দাঁড়িয়ে প্রায় কাঁপতে থাকল। কারণ টিন্ডাল জেনে ফেলেছে কাপ্তান এখন তাকে কি বলবে। কাপ্তান ওর চোখ মুখ শক্ত করে রেখেছেন। শক্ত চোখে মুখে রহমানকে দেখছেন। কাপ্তানের ক্ষুব্ধ দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে রহমান কেঁদে উঠল—সাব, আমার কোন কসুর নাই।

বড় মালোম দৃঢ়গলায় প্রশ্ন করলেন, কাগজটা কোথায় রেখেছ?

—কাগজটা কোথায় হারিয়ে গেছে স্যার।

—স্কাউন্ড্রেল। কাপ্তান শক্ত গলায় বললেন। জাহাজের অতি তুচ্ছ ঘটনার মতো শেষে বলেছিলেন, ভেবেছি, জাহাজ সমুদ্রে গেলে তোমাকে হারিয়ে কবে দেব।

কাপ্তানের অনেক দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প টিন্ডাল শুনেছে। কাপ্তান জাহাজে দুবার মধ্য-সমুদ্রে নাবিকদের বিদ্রোহ দমন করেছেন। আর এ তো সামান্য একজন নাবিকেব অসদাচরণ।—অন্ধকার রাতে দু-চারজন মিলে সকলের অলক্ষ্যে জলে ফেলে দেওয়া। সে এবার বসে পড়ল। সাব, আমি কিছু জানি না।

বোধ হয় রাগে দুঃখে বড় মালোম পাছাতে লাথি মেরেই বসতেন, কিন্তু সুমন উঠে গেল বলে, যেন সামান্য সময় পেলেন—দেখি কি হয় ভাব এবং তিনি টিন্ডালকে সময় দিলেন, যদি সুমন বুঝিয়ে সুজিয়ে হাত করতে পারে। সুমন কাছে গিয়ে বলল, চাচা বাড়িয়ালা খুব ক্ষেপে গেছে। আর দেরি করলে সত্যি আপনাকে বাঁচানো যাবে না। আপনি দেশের কথা মনে করুন, আপনার কত ফসলের জমি, আপনার কত প্রতিপত্তি। সামান্য একটা কাগজের জন্য দরিয়ার জলে ভাসিয়ে দেবে সে কেমন কথা। সালিমা আপনার নাতনীর বয়সী। ভেবে নেন না নাতিনকে নিয়ে একটু রঙ্গরস করেছেন। সামাদটা পাজি, বোকা। আপনার বঙ্গরসের কথা সে বুঝতে না পেরে হৈ-চৈ করত। আপনি যে রঙ্গরস করার জন্য তালাকনামা লিখে ফেলেছেন সে কথা জাহাজে আমরা ছাড়া আর কেউ জানে না। কাগজটা দিলে সামাদকে ডেকে এক্ষুনি ছিঁড়ে ফেলা হবে।

টিন্ডালের চোখ থেকে সেই দুরারোগ্য ব্যাধির মতো স্বপ্নটা ক্রমে ক্রমে মরে আসছে। প্রায় সব কিছু হয়ে গিয়েছিল, পাগল প্রতিপন্ন করতে পারলে বড় সহজে সে সালিমাকে ঘরে তুলে আনতে পারত—কিন্তু যা তেজী মেয়ে—বাপকে ভয় দেখিয়েছে, কিছু হলেই নদীর জলে ডুবে মরবে। কাপ্তান ক্রমে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলেন। তিনি ডাইনিং হলে পায়চারি করছেন—যেন যথার্থই দেরি করলে আর

রক্ষা নেই। কাপ্তান এবার আহত বাঘ যেমন, সহসা দু-পা উপরে তুলে আক্রমণের আগে হাওয়া আঁকড়ে ধরে, তেমনি দু-হাত উপরে তুলে প্রায় যেন ছুটে আসছেন—

সঙ্গে সঙ্গে টিন্ডাল বলে উঠল—সাব, দিচ্ছি। বলে সে তার নীল পাজামা পাগলের মতো খুলে ফেলল, নিচে কোমরে বাঁধা ছোট্ট লাল রঙের কাপড়ের ব্যাগ—ব্যাগের ভিতর রুপোর কৌটো এবং সে কৌটোয় সামাদের প্রাণপাখি বন্দি করে রেখেছে। কাগজটা যথার্থই যেন সামাদের প্রাণ, সে প্রাণ টিন্ডাল এতদিন রুপোর কৌটায় লুকিয়ে রেখেছিল। সুমন দেখল, উপরে লেখা তিন তালাকের কথা। নিচে সাক্ষী হিসাবে ইদ্রিশ আলির সই এবং আরও নিচে, সামাদের হস্তাক্ষরে সই।

সুমন হেনরীকে বলল, সামাদকে এখানে নিয়ে আসছি। ওর সামনে কাগজটা ছিঁড়ে ফেলছি।

টিন্ডাল পাজামা খুলে পাগলের মতো হাত-পা ছড়িয়ে মেঝেতে বসে পড়ল। ওর সেই দুরারোগ্য ব্যাধি কিছুতেই চোখ মুখ থেকে মুছে যাচ্ছে না। সে অসহায়। ঝড়ে আহত পশুর মতো মুখ করে বসে আছে। কাপ্তান না বললে. সে যেন যেতে পারছে না।

সুচারু এল। সামাদ এল। সামাদকে একদিনেই বড় পাংশু দেখাচ্ছে। সে কোনদিকে তাকাচ্ছে না। ওর চোখে আর কোন আলো নেই—সে যেন প্রায় অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সুচারু ওকে ধরে ধরে নিয়ে আসছে।

সুমন ডাকল—সামাদ, দ্যাখ্ তো এই তোর সেই সই করা কাগজটা কি না?

সামাদ উবু হয়ে বসল। তারপরে নুয়ে থাকল কিছুক্ষণ কাগজটার উপর। সে আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না; সে চোখের কাছে নিয়ে একেবারে চোখের সামনে—পারলে যেন লেখাটা গিলে খায়, সামাদ অন্ধের মতো কাগজের উপর দৃষ্টি বুলাতে থাকল। তারপর সরল বালকের মতো ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল সামাদ। কাগজটা সে-হাতে নিয়ে সরল অকপট মানুষের মতো বসে থাকল। তারপর ধীরে ধীরে ফের তার সেই প্রিয় গ্রাম ছবি চোখের উপর ভেসে উঠল—মাঠ পার হলে বড় এক অশ্বত্থ গাছ। গাছের নিচে ছোট নদী। নদীতে এখন তার কত জল ! নদীর ওপারে ঘর। কালবৈশাখী উঠলে সালিমা ওর ঘরে গোরু বাছুর নিয়ে যাবার জন্য নদী পার হয়ে—যেন ছোট নদীটি পার হচ্ছে, ছোট এক বালিকার মতো নদী পার হয়ে মাঠে ওর সেই গাভী সকলকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তারপর ঝড়, কি ঝড়? সেই ঝড়ের ভিতর পড়ে সে পথ হারিয়ে অশ্বত্থগাছের নিচে দাঁড়িয়ে তার প্রিয় যুবকের জন্য অপেক্ষায় আছে। ঝড় থামলেই সেই যুবক নদী ধরে নৌকোয় উঠে আসবে।

সামাদ চোখ বুজে বলল, আমি নদী সমুদ্র পার হয়ে আজ হোক কাল হোক তোর কাছে পৌঁছবই সালিমা। পাণপাখিটা আমি আবার ফিরে পেয়েছি!

সামাদ চোখের জল মুছে ফেলল। কাগজটা সুমনকে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সুমন কাগজটা ছিঁড়ে উত্তরের হাওয়ায় ছেড়ে দিতেই সেই কাগজ চক্রাকারে বকের মতো পাখা মেলে রাতের নিস্তব্ধ অন্ধকারে মিশে গেল। যেই না মিশে যাওয়া যেই না হৈ-চৈ করে ছুটে-যাওয়া ফোকসালের দিকে, তখন এক অলৌকিক মানুষ জাহাজে উঠে এসেছে—আপনারা কে আছেন, কোথায় আছেন, একবার জলদি আসুন। এই শহর থেকে দূরে, অনেক দূরে দৌড়ে গেলে প্রায় রাত কাবার—মোটরে গেলে দু-ঘণ্টার মতো, এক বনের ভিতর নৃশংস এব ঘটনা ঘটছে। সেই ঘৃণা। মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা। ক্ষত-বিক্ষত। এক পাগল ছেলে সেই ঘৃণাকে উপেক্ষা করে—কি কঠিন সাহস কি অবলীলাক্রমে সে সব কিছু উপেক্ষা করে সমস্ত জাতির সম্মানের জন্য লড়ছে। সেই প্রাণকে উপেক্ষা করা যায় না। সকলে এক যোগে আমাদের লড়তে হবে। যা সত্য এবং যা ধর্ম তাই আমাদের সকলকে অকপট করবে—সুমনকে বোধ হয় এতক্ষণে ক্ষত-বিক্ষত করে সেই সব নৃশংস কুকুর চেটেপুটে খাচ্ছে। কোনও পুলিশ কেন, গোটা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষমতা নেই সেই হত্যার কোন হদিস খুঁজে বার করে। আমরা ইচ্ছা করলে এখনও কিছু করতে পারি। কুকুরের মুখ শুঁকলে তাজা মানুষের রক্তের গন্ধ পাওয়া যাবে। কালো মানুষের রক্ত কি মূল্যহীন। কি অধার্মিক এই যুক্তি। কুকুরের ভোজে একমাত্র সে রক্ত পানীয়ের মতো ব্যবহার হতে পারে।

জাহাজের যে যেখানে ছিল, ডেকে ছুটে এসেছে। চারপাশে গোল হয়ে শুনছে। কোন ধর্মযাজক যেন একনাগাড়ে বক্তৃতা করে যাচ্ছে। কাপ্তান বোট ডেকে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। বার্ট বলছে, বন থেকে ওরা সুমনকে ধরে নিয়ে গেছে।

বার্ট ফের বলল, আপনারা যদি এক্ষুনি কোন ব্যবস্থা না করেন, আমাদের সেই যাদুকরের পুত্রকে আর পাওয়া যাবে না।

সুচারু ভিতর থেকে চিৎকার করে উঠল, যাদুকরের পুত্র এখানে। বলে সামাদ এবং সুচারু সুমনকে কাঁধে তুলে নিল—এই এখানে বার্ট।

বার্ট দেখল প্রায় যাদুর সামিল, ওদের ভিতর সুমন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। সে বিশ্বাস করতে পারছে না। চোখ-মুখ মুছে প্রথম চারিদিকে তাকাল—সারাটা পথ ছুটে এসে ওর সংজ্ঞা হারানোর কথা—কিন্তু সেই তরুণ যুবকের নির্ভীক মুখ এতটা পথের কষ্ট যীশুর জলপানের মতো আন্তরিক রেখেছে। সে ডেকের উপর উঠে সারাটা পথের উত্তেজনা প্রকাশ করার জন্য প্রায় চিৎকার করে ডেকময় ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছিল—আর যখন যথার্থই সুমন ডেকে প্রায় যাদুর খেলা দেখিয়ে দিল তখন কেমন যেন সে সব কিছুর ভিতরই ঈশ্বরের এক অপর মহিমার প্রকাশ দেখতে পেল। কি এমন গুণ, কি এমন সাহস, কি এমন ভালবাসা, যা সেই নৃশংস পরিবারের রোষ থেকে তাকে রক্ষা করেছে। প্রায় এক রাজপুত্র বুঝি—সব পাথর হয়ে গেছে। হাতে তার সোনার কাঠি। সে কাঠির স্পর্শে সব পাথরে প্রাণ দান করছে। সে এবার চিৎকার করে, বলল, সুমন সে সোনার কাঠি আমরা কোথায় খুঁজে পাব?

সুমন বললে, আমার ফোকসালে এস। বলে সে বার্টকে তাদের সেই ছোট ফোকসালে নিয়ে গিয়ে বলল, এখানে সেই সোনার কাঠি। বলে সে বার্টের বুকে হাত রাখল।

—হিয়ার! বার্ট তার বুকে হাত রাখল।

—ইয়েস মাই ফ্রেন্ড। আমাকে দেখে ভারোদীর পর্যন্ত মূর্ছা যাবার উপক্রম। সে সবটা খুলে বলল:

—সত্যি! বার্ট বড় বড় চোখে সুমনকে দেখতে থাকল। তারপর কেমন আবেগে সে সুমনের গলা জড়িয়ে ধরল। বলল, আমাদের একজন ঠিক তোমাদের মহাত্মার মতো নেতা গড়ে উঠছেন। বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন। তিনি হয়ত তোমার সেই এমিলের মতো মরুভূমিতে ফুল ফোটাতে চলে গেছেন। আমার স্ত্রীর কাছে আমি চলে যাব। আমাদের ইচ্ছা—দেখি না, আমরা তো সামান্য মানুষ, আমাদের ক্ষমতা সামান্য সুমন, আর আমরা কিই-বা করতে পারি। তবু সেই মহীয়সী মহিলার সঙ্গে যদি যাদুকরের পুত্রের কাছে চলে যেতে পারি—কখনও যদি আমাদের মতো সামান্য মানুষের তাঁর বিন্দুমাত্র দরকার হয়। ফুল ফোটানোর কাজে লেগে যেতে পারলে জীবন সার্থক—কি বল সুচারু! সে সুচারুর দিকে সমর্থনের আশায় তাকাল।

সুচারু বলল, বোস। চা করে আনছি।

বার্ট কোথায় যেন এক ফল্গুনদী আবিষ্কার করেছে। সাহসের সে নদী তার অন্তরে ঝড় তুলেছে। সে এই ফোকসালে ধর্মযাজকের মতো প্রীচ্ করছিল যেন। সে বলল, এই যে অহিংসা কথাটা—কথাটার ভিতরে যেন কেমন এক যাদু আছে। কি বল সুমন। আমি অত্যাচার সব সহ্য করব কিন্তু আঘাত করব না। আমার মহিয়সী মহিলা আমাকে চিঠিতে বার বার লিখেছেন— বার্ট আমরা কেবল পথ হাঁটছি। আমরা আলবামা রাজ্য থেকে একদা এক শান্তির মিছিল নিয়ে পায়ে হেঁটে ওয়াশিংটনে চলে যাব। সেই মিছিলে শুধু কালো মানুষ থাকবে না—মানুষের অধিকার রক্ষার্থে সাদা মানুষেরা পর্যন্ত সেই মিছিলে যোগদান করবে। চিঠিতে কত সুন্দর সুন্দর আশার কথা লিখেছে। লিখেছে, তুমিও চলে এস। আমাদের এই মহৎ উৎসবে জীবন উৎসর্গ কর। মানুষের অসম্মান আমরা এই কালো মানুষেরা, আর বয়ে বেড়াব না।

সুচারু চা করে দিলে সকলে চুপচাপ চা-টুকু খেল। তারপর বার্ট সকলের উদ্দেশ্যে হাত তুলে দিল মাথার উপর, হাত তুলে সকলের শুভ হোক, মঙ্গল হোক এমন কথা বলতে চাইল। তারপর ওরা তিনজন গ্যাঙওয়ে পর্যন্ত হেঁটে এলে বার্ট বলল, ভোরে জাহাজ ছেড়ে দিচ্ছে।

সামাদ বলল, দিচ্ছে।

বার্ট এবার নেমে গেল। ক্রমে বন্দরের অন্ধকারে বার্ট অদৃশ্য হয়ে গেল, ওরা পরস্পর পরস্পরকে দেখল—দেখতে পেল ভুবনময় এক আলো, আলোর উৎস চোখের ভিতর। হৃদয়ের ভিতর। এখন ওরা এত কাছাকাছি যে শরীরের উত্তাপ পর্যন্ত টের পাওয়া যাচ্ছে। দূরে শুধু পপলার বৃক্ষসকল মর্মর শব্দ তুলছে আর মনে হয় কোন গভীর বনে একটা ওপোসামের বাচ্চা সারারাত ধরে দুধ খাচ্ছে। আকাশে কত নক্ষত্র অথবা অদৃশ্য এক জগতে দুর্জ্ঞেয় রহস্যভরা লক্ষ্য কোটি মানুষ নিরন্তর আপন বৃন্তে ফুটে উঠছে। ওরা তিনজনই সেই রহস্যভরা ভুবনে টিন্ডাল, চটকলের বড় সাহেব এবং সুমনের সেই আত্মীয়টির মুখে যেন নিদারুণ ক্লেশ ফুটে উঠেছে দেখতে পেল। নির্মল জল সেখানেও প্রয়োজন। সুমনের বলার ইচ্ছা হল, এমিল, তুমি একবার সেখানেও জল বহন করে নিয়ে চল।

॥ উনিশ ॥

পরবর্তী ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত।

জাহাজ তখন সমুদ্রে। যখন রাত হয়, ডেকে যখন জ্যোৎস্না থাকে তখন এক মানুষ রেলিঙে এসে চুপি চুপি দাঁড়ায়। চারিদিকে শুধু সমুদ্রের গর্জন, ঢেউ। কখনও কখনও নিরিবিলি শান্ত সমুদ্র। জলের ভিতর ফসফরাস মাঝে মাঝে যেন এক অলৌকিক রহস্য বয়ে আনে—তার আলোর ভিতর দূরের এক দুর্গ ভেসে উঠলেই জানালায় সেই বিষণ্ণ মুখ, আকাশের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রে মারিয়া যেন কি খুঁজছে। সুমন কিছুতেই সেই মুখ, বড় বড় চোখ এবং সোনালি চুলে সূর্যাস্ত ভুলতে পারে না। একা একা দাঁড়িয়ে সাদা জ্যোৎস্নায় বার বার অসীম সমুদ্র আকাশ, এবং নক্ষত্র দেখতে দেখতে কেমন পাগলের মতো হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। রাত গভীর হলে কখনও সুচারু আসে, সামাদ আসে এবং দেখতে পায় দূরে কি যেন দেখার চেষ্টা করছে সুমন। অথবা সে যেন আকাশের কোন পরিচিত নক্ষত্র দেখতে দেখতে আকুল। ওর সেই আকুল চোখ দেখলে সুচারু সামাদের কান্না পায়। ওরা পাশে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ, কিছু বলে না। কোনও কোনও রাতে হেনরী এসে বলে, সুমন রাত হয়েছে অনেক। এবার গিয়ে শুয়ে পড। ওরা ওর হাত ধরে ফোকসালে নিয়ে আসে। চুপচাপ মুখোমুখি বসে থাকে। রাত গভীর হয়। ক্বচিৎ কোথাও সমুদ্র পাখির আর্ত চিৎকার, ইনজিনের শব্দ, আর মাঝে মাঝে ঝোড়ো হাওয়া। তখনই ওর মনে হয় মারিয়া সহসা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছে। জানালার কাচ খুলে আকাশের নক্ষত্র দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। তার জাহাজী মানুষটি এখন কোন্ সাগরে আছে কে জানে। সুমন আর স্থির থাকতে পারে না। ভিতরে ভিতরে সব কেমন গোলমাল হয়ে যায়। তারপর কেন জানি মনে হয় কোন-না-কোন দিন, পৃথিবীর যে প্রান্তেই সে থাকুক, মারিয়া তার ফুল ফল নিয়ে চলে আসবে। সে শুয়ে পড়বার আগে আলো নিভিয়ে দেয়।

॥ বিশ ॥

আরও খবর, বার্ট লংমার্চের দিনে বড় সড়কে হাজার লক্ষ সাদা কালো নারী-পুরুষের ভিতর ভারোদী ট্যালডনকে দেখেছে। পিছনে মারিয়া। মারিয়া ট্যালডন যুবতী। যেন গির্জায় যাচ্ছে এমন চোখ মুখ তার। বার্ট হাঁটতে হাঁটতে বলেছিল, সে তোমাকে কোন চিঠি দেয়?

মারিয়া ধীরে ধীরে বলেছে, না।

—তুমি ওর কোন খবর রাখ না?

—না।

—সে পাগল হয়ে গিয়েছে। দেশে ফিরে যায়নি।

মারিয়া কিছু বলল না। শুধু বিশাল জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—জাহাজ থেকে আফ্রিকার কোনও এক বন্দরে সে নেমে গেছে! কেউ কিছু জানে না, খবর রাখে না।

বার্ট কথা বলতে বলতে এগুচ্ছে। লংমার্চ এবার একটা বড় নদী পার হয়ে যাচ্ছে। হাজার হাজার ফেস্টুন উড়ছিল।

আপনি যদি কোনদিন আফ্রিকার কোনও বন্দরে যান অথবা কোনও গভীর বনাঞ্চলে, যদি দেখেন কোনও সোনালি চুলের সন্ন্যাসিনী গভীর বনের ভিতর, কোন উপজাতির মধ্যে অথবা যদি ভারতবর্ষের কোন উলঙ্গ শহরে মানসিক হাসপাতালের করিডোরে, শান্ত এক জোড়া চোখ দেখেন, এ-ঘটনা জানা থাকলে, আপনার এক পলকে মারিয়ার কথা মনে হবেই। কারণ আপনাদের অবগতির জন্য জানিয়ে রাখি মারিয়া উৎসর্গীকৃত প্রাণ। পিসকোরে সে সেদিনও বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছে। আর্তকে সেবা করেছে। আর একটা কথা বলে রাখা ভাল, সে ভুল ভাল বাংলা বলতে পারে। বাংলা ভাষাটা প্রায় মাতৃভাষা করে ফেলেছে। কেউ ওকে যদি জিজ্ঞাসা করে, তুমি এসব জায়গায় পড়ে থাক কেন—মারিয়া খিল খিল করে হাসে। সে কিছুতেই বলে না সুমন নামক এক অলৌকিক মানুষকে দেশে দেশে খুঁজে বেড়াচ্ছি। শুধু সে বলে, এমন যে দেশ, বাংলাদেশ, এসেছি তাঁর দেশে...আরও কি বলতে গিয়ে থেমে যায়। চোখ দুটো কেবল ছলছল করতে থাকে। সে চোখ দেখলে আপনারও খুব মায়া হবে বলতে পারি।

বিদেশিনী

সমুদ্রযাত্রা

॥ দুই ॥

আশঙ্কা সত্যি হলে যা হয়—সবাই মুষড়ে পড়ল। সবাই বলতে ডিনা ব্যাঙ্কের সব জাহাজিরা।

এস. এম. ডিনা ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্ক লাইনের লজঝড়ে জাহাজ। জাহাজটার অপবাদেরও শেষ নেই। নানা গুজব। ফলে নানা অশুভ আতঙ্ক জাহাজিদের মনে ওড়াওড়ি করতেই পারে। কলকাতার ঘাটে জাহাজ ভিড়লেই সোরগোল—এসে গেছে! মাস্তারে কেউ দাঁড়ায় না। জাহাজটা শয়তান, মাথা খারাপ—কোথায় কোন্ সমুদ্রে নিখোঁজ হয়ে থাকবে কেউ বলতে পারে না। তখন কাপ্তান, চিফ অফিসার, রেডিও অফিসার পর্যন্ত বেকুফ। সবই তো ঠিক আছে—চার্ট, কোর্স লে, কম্পাসের কাঁটা—তবু এত বড় গোলমাল! মাথায় হাত।

সেই জাহাজ যাচ্ছে মাটি টানার কাজে। কোথায় কোন্ অজানা সমুদ্রে যাচ্ছে জাহাজিরা ঠিক জানে না। মাটি টানার কাজে জাহাজটা কোন্ সমুদ্রে যাবে তারা সঠিক কিছু বুঝতে পারছে না।

আশা ছিল, তারা এবার দেশে ফিরতে পারবে। বিশ বাইশ মাসের সফর—খুবই লম্বা সফর, জাহাজ দেশে ফিরে যাবারই কথা। অথচ কি যে হল, জাহাজ আবার মাটি টানার কাজ নিয়ে বসল। মন খারাপ হতেই পারে।

সুহাস পিকাকোরা পার্ক থেকে ফিরে খবরটা পেল। ইদানীং চার্লিকে নিয়ে, জাহাজ ঘাটে ভিড়লেই সে জেটিতে নেমে যায়। চার্লিকে নিয়ে পিকাকোরা পার্কে বেড়াতে গেছে—ফিরতে একটু রাতই হয়েছে—জাহাজে উঠেই খবরটা শুনে সেও বেশ দমে গেল।

আসলে চার্লির যে কি হয়েছে সে ঠিক বোঝে না। এক দণ্ড তার কাছ ছাড়া হতে চায় না। চার পাঁচ মাস ধরেই সে এটা লক্ষ করছে। চার্লির তাড়াতেই তাকে বের হতে হয়।

এক সময় তো চার্লি ছিল দুরন্ত এবং খুবই চঞ্চল। ইদানীং চার্লি এত শান্ত স্বভাবেরই বা হয়ে যাচ্ছে কেন সুহাস ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। খুবই অনুগত তার। বিশ বাইশ মাসে চার্লি জাহাজেই অনেক লম্বা হয়ে গেছে। কাপ্তানের পুত্র চার্লিকে বালকই বলা চলে। সুহাসও জাহাজে উঠে এসেছে, দাড়ি গোঁফের আভাস ফুটে ওঠার মুখে। চার্লির সঙ্গে বন্ধুত্ব—খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। প্রায় সমবয়সী ছেলেটি তার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করতেই পারে।

জাহাজে একসঙ্গে থাকার ফলে চার্লির কিছু বাজে স্বভাবও গড়ে উঠেছে। যখন তখন তাকে দাঁড়াতে বলবে। চার্লি কতটা লম্বা হয়েছে, তার পাশে দাঁড়িয়ে মাপবে। দাঁড়াতে বললে, না দাঁড়িয়েও উপায় থাকে না। শত হলেও কাপ্তানের পুত্র। আগে ছিল এক ধরনের উপদ্রব, এখন আর এক ধরনের। সবই সহ্য করতে হয় মুখ বুজে। পিকাকোরা পার্কে এক দু-দিন যাওয়া যায়—তাই বলে রোজ রোজ জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে কার ভাল লাগে। কিন্তু চার্লি নাছোড়বান্দা। কত রকমের বুনো ফুলের নাম যে সে জানে। বুনো ডেইজি ফুল খুঁজে দেখার বাতিক। সঙ্গে না গিয়েও উপায় থাকে না। বারবার বুঝিয়েছে, দ্যাখ চার্লি, আমি একজন সামান্য নাবিক, তোমার এটা উচিত কাজ হচ্ছে না। তার উপর নেটিভদের খুব যে ভাল চোখে দেখা হয় না, তাও বুঝতে চেষ্টা কর। অফিসার ইনজিনিয়ারদের চোখে লাগতেই পারে। তোমার বাবা পছন্দ নাও করতে পারে।

কে শোনে কার কথা।

দেখা মাত্র, চিৎকার, হাই।

সে হাই করতে পারে না। খুব সতর্ক পায়ে হেঁটে যাবার স্বভাব সুহাসের।

ইনজিন সারেঙও বার বার সতর্ক করে দিয়েছেন, বাপু তোমার বয়েসটা ভাল না। কেন যে মরতে এলে জাহাজে। তিন নম্বর সুখানি, মুখার্জিদা তো চটে লাল। আবার গেলি। মরবি বলে দিলাম। বড়লোকের বাচ্চা বাঁদর হয় জানিস। ডাকলেই যেতে হবে! কোথায় যাস? কিছু বলে যাস না!

তা তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করতেই পারেন। ভাল করে দাড়ি গোঁফ না গজাতেই জাহাজে উঠে এলে তো ভয়ের। নাবালক না হোক, সাবালক হয়ে গেছে বলেই কি সবাইকে অগ্রাহ্য করা যায়! নতুন

সফর—জাহাজ তো ভাল জায়গা না, কিনার আরও খারাপ জায়গা। চার্লির সঙ্গে সুহাসের মেলামেশার ব্যাপারে তারা আগে বেশ ত্রাসে পড়ে যেতেন। ইদানীং আর যেন তাঁরাও কিছু মনে করেন না। কাপ্তানেরও সায় থাকতে পারে। সে যাই হোক, জাহাজ অজানা সমুদ্রে যাচ্ছে শুনে চার্লিও কেমন যেন বিপাকে পড়ে গেল।

ইনজিন-সারেঙ কলকাতার ঘাটে জাহাজে ওঠার সময় বারবার বলেছেন, দ্যাখ পারবি তো! শেষে কোথাও ভেগে যাবি না তো। সে বলেছে, পারবে। বলেছে, কোথাও ভেগে যাবার তার ইচ্ছে নেই। তার মাসোহারা পেলে, বাবা মা ভাই বোনদের অন্নজলের সংস্থান হবে। এবং সে যে কাজকর্ম ভালই পারছে সারেঙসাবের বুঝতে সময় লাগেনি। বিশ বাইশ মাসে সারেঙ সাব তা ভালই টের পেয়েছেন। তাকে না হলে তো এখন ফাইভারের এক দণ্ড চলে না। উইনচ মেরামতে সে ওস্তাদ হয়ে গেছে।

আজ পিকাকোরা পার্ক থেকে ফেরার সময়ই সুহাস কেমন যেন বিপদের সংকেত পেয়েছিল। সিম্যান মিশন থেকে কিছুটা এগোলেই জেটি। পর পর চার পাঁচটা জাহাজ ভিড়ে আছে। জেটির আলো বেশ ম্রিয়মাণ। চিমনির রং দেখে কোন্ কোম্পানির জাহাজ চিনতে অসুবিধা হয় না। সে আর চার্লি পাশাপাশি হাঁটছিল। ছায়া তাদের ক্রমে লম্বা হয়ে আবার কখনও খাটো হয়ে কখনও মিলিয়ে যাচ্ছিল। চার্লির মন ভাল নেই। কি দেখে চার্লি এতটা ত্রাসে পড়ে গেছে সে বুঝতে পারছে না।

সে তো তেমন কিছু দেখেনি! অথচ চার্লির আর্ত চিৎকারে সে পিকাকোরা পার্কে কিছুটা বিভ্রমে পড়ে গেছিল। চার্লির যে মাঝে মাঝে কি হয়!

গোটা জেটি খাঁ খাঁ করছে। ডিনা ব্যাঙ্ক একটা বিশাল তিমি মাছের মতো ভেসে আছে জেটির পাশে। জাহাজটার দীর্ঘশ্বাসও যেন সুহাস শুনতে পেয়েছে। মাল টেনে টেনে আর পারছে না। ক্লান্ত। জেটিতে পড়ে থেকে যেন হাঁসফাঁস করছে। তার এত গা ঘেঁষে হাঁটছিল যে মনে হয় সেই অদৃশ্য আতঙ্ক চার্লিকে তখনও অনুসরণ করছে। তারা কেউ কোনও কথা বলতে পারছিল না। জাহাজের সিঁড়ির কাছে প্রায় তারা দৌড়ে গেছে। জাহাজে উঠে হাঁপাচ্ছিল চার্লি।

অবশ্য আর্ত চিৎকারে সুহাস লক্ষ করেছিল, দূরে গাছের আড়ালে একটা ছায়া অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তখন পিকাকোরা পার্কে ভ্রমণার্থীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথাও জটলা, কোথাও ছবি তোলার হিড়িক। বনজঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে বিশাল সব মহীরূহ। যত্রতত্র আলোর ভিতর জঙ্গলে মায়া কাননের আভাস। মুগ্ধ বিস্ময়ে সে কিছুটা ছিল অন্যমনস্ক।

'কি হল? কি হল চার্লি? পালাচ্ছ কেন?'

'দেখছ না! দেখতে পেলে না! লোকটা ফের আমাদের পিছু নিয়েছে।'

'আরে কত লোক বেড়াতে আসে! আড়াল থেকে আমাদের অনুসরণ করার কি আছে বুঝি না!''

'তুমি বুঝবে না সুহাস। তোমাকে বলেও লাভ নেই। চল উঠি।'

প্রায় তার হাত টেনে বনজঙ্গলের ভিতর ছুটতে চেয়েছিল চার্লি।

সুহাস না বলে পারেনি, 'কেউ আমাদের অনুসরণ করছে ভাবছ?'

'জানি না। যাবে, না দাঁড়িয়ে থাকবে।'

'এই তোমার মন্দ স্বভাব চার্লি। মাথায় কিছু ঢুকলেই হল। আরে এখানে কে আমাদের অনুসরণ করতে পারে। আমরা বেড়াতে আসি। আমাদের কাছে গুচ্ছের টাকা পয়সাও নেই—আর লোক পেল না তোমাকে অনুসরণ করছে'

'জান লোকটার লম্বা গোঁফ দাড়ি বাবরি চুল, আর পাথরের মতো হিমশীতল মুখ। দূর থেকে আবছা মতো—তবু বুঝতে কষ্ট হয় না, সে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে।'

'কচু ঘুরছে।'

সুহাস ফের বলেছিল, 'গোঁফ থাকলে, পাকা বাবরি চুল থাকলে বুঝি বেড়াবার শখ থাকে না!'

'সুহাস!' সেই এক আর্ত চোখ চার্লির। সুহাস কেন যে আর না উঠে পারেনি!

চার্লি খুব হতাশ হয়ে পড়েছিল সুহাসের কথা শুনে। সে ঠিক বুঝিয়ে বলতেও পারছে না। সুহাস তাকে পাত্তা দিতে না-ই পারে। সুহাস জানেই না, এই লোকটাই পার্লহারবারে, পোর্ট অফ

সালফাব-এ তাকে আড়াল থেকে লক্ষ করছে। শরীর দেখা যায় না। শুধু কোনও কিছুর আড়ালে মুখটা বের করে রাখে। আগে সে এতটা গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু পর পর তিনবার তিন বন্দরে লোকটাকে সে আবছা অন্ধকারে লক্ষ করেছে যেন। চকিতে মুখটা ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেছে।

কৌরিপাইন গাছ এত দীর্ঘজীবী হয় আগে সুহাস জানত না। এই দুর্লভ গাছ দেখার জন্য দেশ বিদেশ থেকে বহু পর্যটকও আসে। তাদের কেউ হতে পারে। তারাও এই গাছ দেখার লোভে পিকাকোরা পার্কে আসে। তা ছাড়া বিশ বাইশ দিন হল তাদের জাহাজ নিউপ্লিমাউথ বন্দরে নোঙর ফেলেছে।

সালফার বোঝাই জাহাজ, খালি করতে সময় একটু বেশি লাগে। সালফারের উগ্র ঝাঁজে নাক চোখ জ্বালা করত; সারা ডেকময় সালফার উড়েছে! প্রায় কুয়াশার মতো বাতাসে ঝুলে থাকত সালফারের গুঁড়ো। এ-জন্যও চার্লি সুহাসকে নিয়ে কিনারায় নেমে যেত। কাজ কাম শেষ হলেই চার্লি সুহাসকে নিয়ে কিনারায় নেমে যাবার জন্য ছটফট করত।

সব সাফসোফ করে জাহাজ তকতকে এখন। আবার নোঙর তোলার সময়—যে কোনওদিন ২৪ ঘণ্টার ফ্ল্যাগ উড়তে পারে। জাহাজ কোথায় ভেসে পড়বে কেউ জানে না। কাপ্তানও না। এজেন্ট অফিস থেকেই নোটিস আসবে—সুতরাং জাহাজ কোথায় যাবে কাপ্তান না-ই জানতে পারেন। জানতে পারলে চার্লিই খবরটা আগে পেত। সে দু একবার যে চার্লিকে বলেনি তাও নয়। চার্লির সাফ কথা, সে কিছুই জানে না। সারেঙ থেকে কোলবয়—সবাই সুহাসকে ধরত। তাদের ধারণা, চার্লির সঙ্গে যখন এত ভাব, তখন সে-ই সবার আগে খবরটা দিতে পারবে। কারণ সবারই ওই এক আতঙ্ক, জাহাজটাকে কোম্পানি না আবার দক্ষিণ সমুদ্রেই ফেলে রাখে।

দক্ষিণ সমুদ্রে ফেলে রাখলে, কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা কেন যে এত স্বস্তি পায়, সুহাস ঠিক ভাল জানে না—উড়ো খবর যে কিছু তার কাছে না আছে তা নয়—জাহাজটার অশুভ প্রভাব থেকে আত্মরক্ষার জন্যই দক্ষিণ সমুদ্রে ফেলে রাখা। সুহাসের তখন হাসি পেত। জাহাজের আবার কোনও অশুভ প্রভাব থাকে সে বিশ্বাস করতে পারত না। গুজব আসলে। গুজবে সে কান দেয়নি—এই যে গুজব, জাহাজটাকে কিছুতেই হোমের দিকে উঠতে দেবে না, দক্ষিণ সমুদ্রেই ফেলে রাখা হবে, যে কোনও উপায়ে—মাটি টানার কাজ তাই সই। ফসফেট বোঝাই করে অস্ট্রেলিয়ার নানা বন্দরে খালাস করার কাজ—সেটা ক'মাসের জন্য তাও সে ঠিক জানে না। সিঁড়ি ভেঙে জাহাজে ওঠার মুখে সুখানিই খবরটা দিয়েছে।

'কে বাপজান? সুহাস!

চার্লি তাব সঙ্গে। চার্লিকে দেখে সুখানি উঠে দাঁড়িয়েছে। সালাম জানিয়েছে। তারপর তার দিকে তাকিয়ে বলেছে, 'আল্লা মেহেরবান। জাহাজ মাটি টানতে যাচ্ছে। হয়ে গেল!' কেমন হতাশ গলায় সুখানি আমজাদ কথাটা বলে তার দিকে তাকিয়ে থাকল।

চার্লি এদের কথা বুঝতে পারে না। সে সুহাসের দিকে তাকিয়ে আছে। কি বলছে সুখানি! জাহাজের কি কোনও খারাপ খবর আছে? সুখানির মুখে কেমন আতঙ্ক—চার্লিও টের পেয়েছিল।

টের পেতেই পারে। চার্লির ভাল নেই। চার্লি গুম মেরে আছে সেই কখন থেকে। চার্লি আগেও গুম মেরে যেত। পার্ল হারবারে, পোর্ট অফ সালফারে সে তা লক্ষ করেছে। কিন্তু তাকে কখনও বলেনি. দ্যাখো দ্যাখো—ওই দ্যাখো—তারপর চার্লির কথাবার্তা কেমন অসংলগ্ন ঠেকছিল।

কৌরিপাইনের ছায়ায় তারা বসে। সেই হাজার হাজার বছর আগের কোনও সভ্যতার কথা ভাবা, যেমন, তিন চার হাজার বছর আগেকার গাছ হলে মনে তো হবেই, তখন কুন্তী-দময়ন্তী মন্দোদরীরা যুবতী ছিল—তখনকার সেই সব মানুষ, রথ, ঘোড়া, অশ্বমেধ-যজ্ঞ, সত্যবতীর কথাও মনে হত। প্রাচীন গাছের বয়সের সঙ্গে তার নিজের দেশের কথা মনে হত—গাছটা তখন চারা গাছ, এবং কোনও নদীতে ধীবরের নৌকায় সম্রাটের উপগত হবার বাসনা জাগছে এসব মনে হত তার। কারণ এই গাছ যেন রামায়ণ-মহাভারতের সময়কার গাছ। গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে বসে থাকার মধ্যেও মজা। সে গাছগুলির কাণ্ডে হাত বুলিয়ে দিত—গাছগুলোর এত বয়েস হয় কি করে এমনও মনে

হত—তবে যা বিশাল, আর এই মহীরুহ এত সব ডালপালা মেলে এগ্‌মন্ট পাহাড়ের নিচে দাঁড়িয়ে আছে যে অবিশ্বাসও করতে পারত না।

গাছের বয়েস কীভাবে নিরূপণ করা যায় তাও সে জানে না। অবিশ্বাস করবে কিসের ভিত্তিতে! এক একটা শেকড় তিমি মাছের পিঠের মতো উঁচু হয়ে আছে। গাছের কাণ্ডে প্লেট ঝোলানো—গাছ একটা প্রাণ, সেখানেই সে এটা টের পেয়েছিল। নিউজিলেন্ডারদের গাছের প্রতি বোধহয় মায়া মমতা একটু বেশি। কি যত্ন গাছের! পিকাকোরা পার্কের কৃত্রিম খালে নৌকায় ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে চার্লির সঙ্গে গাছের নিচে বসে থাকা ছিল অধিক মনোরম। চার্লিও চুপচাপ বসে থাকত। কখনও সে তার দেশবাড়ির গল্প করত। তাদের বাড়িটার পাশে যে নানা বুনো ফুল ফুটে থাকে তাও সে বলত। অথচ আজ চার্লি লোকটাকে দেখার পরই বলেছে, জাহাজে চল সুহাস। আমার কিছু ভাল লাগছে না।

পিকাকোবা পার্কে তারা রোজই বেড়াতে যায়। কাজ কাম হয়ে গেলে ছুটি। জাহাজ বন্দর ধরলে, কাম কাজের চাপও কম থাকে। সমুদ্রেই মেরামতির কাজগুলো সেরে ফেলতে হয়। বিশেষ করে উইনচ্ মেসিন—জাহাজ ঘাটে ভিড়লেই উইনচ্‌গুলির উপর বেশি চাপ পড়ে। পুরনো জাহাজ, আর তার উইনচ্ মেসিন কতটা ভাল হতে পারে। ঝড়ের সমুদ্রে ঢেউ আছড়ে পড়লে নোনাজলে সব চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ডেক—স্টিম-পাইপ থেকে স্ট্র্যাপার নোনা জলে ক্ষতবিক্ষত। নাট-বল্টু জ্যাম হয়ে থাকে। কাজেই উইন্‌চে মেরামতির কাজ সারা সফর লেগেই থাকে—এই কাজটা করে করে এত হাত পেকে গেছে যে সে নিজেও ইচ্ছে করলে একাই পারে উইন্‌চ মেরামতির কাজ সামলাতে। ঘাটে জাহাজ ভিড়লে শুধু দেখা, কোনও মেসিন গড়বড় করছে কি না। এবারে তাব কপাল ভালই বলতে হবে, ডেরিকে মাল নামানোর সময় একটা উইন্‌চও গড়বড় করেনি। সে কাজ থেকে বেশ তাড়াতাড়ি ছুটি পেয়ে যেত। আর সব লক্ষ রাখত চার্লি? কাজ শেষ হলেই সে হাজির। তার তাড়াতেই স্নানটান সেরে সেজেগুজে বের হয়ে যেত। বেশ শীত, সকালের দিকে কখনও কুয়াশা থাকে। বিকেলের দিকে আকাশ পরিষ্কার—এবং পাহাড়ি শহরটার নানা উপত্যকায় যেমন কাঠের লাল নীল রঙের বাড়ি আছে, তেমনি আছে অজস্র আপেলের বাগান। তারা কখনও পাহাড়ের চড়াই-উতরাই পার হয়ে আপেল বাগানেও গিয়ে বসে থাকত।

সুহাস দেখল, চার্লি দাঁড়িয়েই আছে। যাচ্ছে না। সুখানির মুখ ব্যাজার। কি কারণ মুখ ব্যাজার করে থাকার। সে অগত্যা বলল, 'জাহাজ দক্ষিণ সমুদ্রেই শেষে মাটি টানার কাজ নিল। কালই জাহাজ ছাড়ছে?'

চার্লি যেন অন্য কোনও দুঃসংবাদের আশা করেছিল। হোমে ফেরার জন্য চার্লি যে উদ্‌গ্রীব হয়ে নেই বোঝা যায়। তার তো বাবা ছাড়া কেউ নেই। সে জাহাজে ভেসে বেড়ালেও যা, হোমে ফিরলেও তাই। জাহাজটাকে দক্ষিণ সমুদ্রে ফেলে রাখা হবে—এতে এত বিচলিত হবার কি আছে চার্লি বুঝতে পারছে না। অথবা এও হতে পারে, সেই ত্রাস তাকে তাড়া করছে—'দ্যাখো দ্যাখো সুহাস' সে তো দেখেছে, তিমি মাছের মতো উঁচু ঢিবির আড়ালে লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

চার্লির কেবিন ঠিক অ্যাকমডেশান ল্যাডারের নিচে। ব্রিজে ওঠার মুখে উইংসের তলায়। পর পর দুটো কেবিন—একটায় সে থাকে। পাশেরটায় তার বাবা বুড়ো কাপ্তান মিলার থাকেন। তিনি হয়তো ব্রিজ থেকেই দেখেছেন—চার্লি ফিরছে। সঙ্গে সেই ভারতীয় নাবিকটি। প্রায় তারা সমবয়সী বলে, তিনি তার সঙ্গে চার্লির ঘোরাফেরা মেনে নিয়েছেন। তাকে তিনি মাঝে মাঝে লক্ষও করেন—কিংবা সারেঙসাবই হয়তো বলেছে, ছেলেমানুষ সাব, চার্লির সঙ্গে না আবার মারামারি শুরু হয়ে যায়। চার্লি নিজেও তো সুবোধ বালক নয়। যখন তখন এর ওর পেছনে লাগার স্বভাব। যদি কিছু হয়ে যায়, নিজগুণে ছেলেটাকে ক্ষমা করে দেবেন।

চার্লি যাচ্ছে না দেখে সুহাস বলল, 'যাও। দাঁড়িয়ে থাকলে কেন? মনে হয় তোমার বাবা উপরে অপেক্ষা করছেন।'

চার্লি ইতস্তত করছিল—তারপর কি ভেবে সুহাসের দিকে তাকাল। শেষে বলল, 'কেবিনে পৌঁছে দাও সুহাস।'

আরে বলছে কি!

পোর্ট-সাইড ধরে কয়েক গজ গেলে অফিসার্স গ্যালি। গ্যালির মুখেই এলিওয়ে। ওতে ঢুকে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেলেই চার্লির কেবিন। এটুকু রাস্তা একা যেতে ভয় পাচ্ছে চার্লি! এমন কি হল! এর আগেও দু-একবার যে চার্লিকে কেবিনের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়নি তা নয়। যেমন পার্লহারবারে এবং লস এঞ্জেলসেও চার্লিকে দু-একবার পৌঁছে দিয়েছে। অবশ্য তখন চার্লি তাকে কখনও বলেনি, লোকটা আমার পিছু নিয়েছে। মরতে একটা লোক চার্লির পেছনে লাগবে কেন। চার্লি তো কারও পাকা ধানে মই দেয়নি—অবশ্য জাহাজে উঠে চার্লি তাকে বিপাকে ফেলার যে চেষ্টা করেনি তাও নয়। উইনচের গোড়ায় তেলজুট রেখে সে কাজে ঝুঁকে পড়েছে, আর তখনই দেখেছে, তার যে সামান দরকার সেটাই টবে নেই। হাতুড়ি বাটালি উধাও। আরে গেল কোথায়! হারালে কশপ তার মাথা ভাঙবে। সে হন্যে হয়ে খুঁজতে গিয়ে দেখেছে, বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে চার্লি তার দিকে তাকিয়ে মজা উপভোগ করছে। চার্লির সঙ্গে তখন তার কথা বলারই সাহস ছিল না, অথচ গায়ে পড়ে ভাব। ছেলেটা তার এটা-ওটা নিয়ে লুকিয়ে ফেলছে! চার্লি অবশ্য পরে বলত, 'তুমি আমাকে দেখলে পালাও কেন বলত!'

পালাত কি আর সাধে। ইনজিন-সারেঙ পই পই করে বলেছেন, সাবধান, কাপ্তানের ব্যাটার পাল্লায় পড়ে যাস না। জান খতড়া করে দেবে। তা যে পারে জাহাজে উঠেই টের পেয়েছিল। জাহাজেই যেন চার্লি লম্বা হয়ে গেল। বড় হয়ে গেল। অনায়াসে বোট-ডেক থেকে দড়ি দড়ায় ঝুলে ফক্কায় লাফিয়ে নেমে যেত চার্লি। অনায়াসে দক্ষ জাহাজির মতো দড়ি দড়ায় ঝুলে মাস্তুলের ডগায় উঠে যেতে পারত। একবার তো দড়ি দড়ায় ঝুলে পলকে তার কাঁধে পা রেখে উড়ে গেল সামনে। তারপর রেলিং টপকে কোথায় যে পালাল। চার্লির উপর রাগ করতেও পারে না। সামান্য জাহাজির কোনও রাগ অভিমান থাকলে চলবে কেন। তাই যতটা পারত এড়িয়ে চলত। ঝড়ের সমুদ্রে একদিন তো দেখল হিবিংলাইনের উপর দিয়ে তারের খেলা দেখাবার মতো হেঁটে যাচ্ছে। তাকে দেখলেই সাপের পাঁচ পা যেন দেখত চার্লি। মাস্তুলের ডগায় উঠে ক্রোজনেস্টে দাঁড়িয়ে থাকতেও দেখেছে। যেন এ-সব দেখিয়ে চার্লি বাহবা পেতে চাইত। কিন্তু সুহাস সাড়া দিতে পারত না। সামান্য একজন জাহাজির পক্ষে চার্লিকে বাহবা দিলেও অপমান করা হতে পারে। সেই চার্লি ইদানীং এত শান্ত স্বভাবের হয়ে যায় কি করে সুহাস বুঝতে পারে না।

চার্লি প্রায়ই এখন বোট-ডেকে অবসর সময়ে হয় আপন মনে ইজেলে ছবি আঁকে, নয় ডেকচেয়ারে বসে বই পড়ে। কখনও এত গম্ভীর হয়ে যায় যে সুহাস কাছে ভিড়তেই সাহস পায় না।

কখনও তার মনে হয় দুরন্ত ছেলেটা চোখের সামনে কত দ্রুত নির্জীব হয়ে গেল! তার আফসোস—এই তো সিঁড়ি ধরে বোট-ডেকে উঠে গেলেই চার্লির কেবিন। রাতও খুব একটা বেশি হয়নি, তা ছাড়া জাহাজে উঠে আসার পর তো কোনও ভয় থাকারও কথা না। অথচ কেবিনের দরজা পর্যন্ত তাকে এগিয়ে না দিলে সে যেতে পারছে না। এখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে। ধুস ভাল লাগে।

অগত্যা সুহাস আর কি করে। ভাবল কেবিনের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে সে পিছিলে চলে যাবে।

তারপরই সে টের পেল, ডেকে একমাত্র সুখানি ছাড়া আর কেউ নেই। জাহাজিরা যে যার মতো ফোকসালে ঘাপটি মেরে আছে। একজনও উপরে নেই। জাহাজ মাটি টানার কাজে যাচ্ছে বলে যেন গোটা জাহাজটার মাথায় বাজ পড়েছে।

সুহাস কিছুটা বিচলিত গলায় বলল, 'সুখানিসাব, আমরা তো দক্ষিণ সমুদ্রেই আছি।'

সুখানিসাব কেমন ক্ষোভের গলায় বললেন, 'আরে বাপজান, দক্ষিণ সমুদ্র কি এতটুকুনি জায়গা—পুকুর ডোবা! দুনিয়ার কোনাখামচিতে কত কিসিমের দরিয়া ঘাপটি মেরে আছে তার খবর রাখ?'

সে সত্যি খবর রাখে না। জাহাজের পয়লা সফরে এত খবর রাখাও যায় না, জায়গায় জায়গায় সমুদ্রের নানা কিসিমের নাম! নাম না জানা থাকলে অজানা সমুদ্র হয়ে যায়। অবশ্য জাহাজিদেরও

এই আশঙ্কা ছিল, জাহাজ দেশে না ফিরে মাটি টানার কাজে লেগে যেতে পারে। মাটি টানার কাজ থেকে নিষ্কৃতি কবে মিলবে তাও কেউ জানে না। ইচ্ছে করলেই বিদ্রোহ করা যায় না। জাহাজে সাইন করার পর, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। কাপ্তানের মর্জি, কোম্পানির মর্জি। কোম্পানি ইচ্ছে করলে সব পারে, সমুদ্রে ফেলে রাখতে পারে, দেশে ফিরিয়ে নিতে পারে। জোর জুলুম করবে! করলেই সি ডি সি চৌপাট—লাল দাগ পড়ে যাবে। ব্যাংক লাইনের জাহাজ তো মিলবেই না—অন্য কোম্পানিগুলিও সি ডি সি দেখলে আঁতকে উঠবে। হুজ্জোতি করে জাহাজ থেকে নেমে গেছে—আর কেউ নেয়! যা পরিস্থিতি, জাহাজ এমনিতেই পাওয়া কঠিন—দেশে ফিরলে পাঁচ সাত মাস লেগে যায় ফের জাহাজ পেতে। জাহাজে বিদ্রোহ করলে রক্ষা আছে! মেজাজ যে ভাল নেই কারও, ডেক খালি দেখেই সুহাস টের পেল। চার্লিও গ্যাংওয়ে থেকে নড়ছে না। তাকে কেবিনের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে না দিলে কিছুতেই যাবে না! কি যে বিপাকে পড়া গেল: সে খেপে গিয়ে বলল, 'আরে কেবল দক্ষিণ সমুদ্র বলছেন, সেটা কোথায় জানেন না! জাহাজে সফর করতে করতে চুল পেকে গেল!' কেমন অধৈর্য হয়ে পড়েছে সুহাস।

'বলে তো বিশমার্ক সি। নেরুদ্বীপে জাহাজ যাচ্ছে।'

সুহাস বিশমার্ক সি কোথায় জানে না। সেখানে যেতে কতদিন লাগবে তাও জানে না। জাহাজিরা দেশে ফেরার জন্য আকুল। নিজের অভিজ্ঞতায় সে তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। তবে জাহাজে চার্লি থাকায় তার সময় কেটে যায়। খুবই দরাজ দিল। মুখ ব্যাজার করে রাখলে এখনও চার্লি তাকে নানা মজার খেলা দেখায়। তার সঙ্গে কিনারায় যেতে না চাইলে, মাস্তুলের ডগায় উঠে ভয় দেখায়—দেব ঝাঁপ! সে ক্রোজনেস্টে দাঁড়িয়ে ঝাঁপ দেবার অঙ্গভঙ্গি করে। এটা চার্লির কাছে খেলা হতে পারে, তবে তার কাছে এটা কোনও জীবন সংশয়ের ব্যাপার মনে হয়। অগত্যা বলতেই হয় চিৎকার করে, 'ঠিক আছে, যাব! তোমার সঙ্গেই কিনারায় নামব। এখন লক্ষ্মী ছেলের মতো নেমে এস তো!'

চার্লিও টের পায় তার জন্য সুহাসের টান গড়ে উঠেছে। সে নেমে এলে সত্যি দেখতে পায় ফক্সায় বসে সুহাস সমুদ্র দেখছে। সমুদ্র আর তার অনন্ত জলরাশি সুহাসকে কেমন অন্যমনস্ক করে দিয়েছে।

চার্লির দুষ্টুমি তখন, 'গার্ল ফ্রেন্ডের জন্য মন খারাপ!'

'আমার কোনও গার্ল ফ্রেন্ড নেই চার্লি।'

'সত্যি বলছ?'

'সত্যি। তোমাকে মিথ্যা কথা বলে আমার কি লাভ!'

এতে চার্লি কেমন খুশি হয়। চার্লি তার দিকে তাকিয়ে থাকে। সেও! নীলচোখ ছেলেটার চুল ছোট করে ছাঁটা, মোটা টুইলের অদ্ভুত ঢোলা শার্ট ঢোলা প্যান্ট পরনে। চার্লি এত ঢোলা জামা প্যান্ট পরে কেন সে বোঝে না।—পায়ে কেডস জুতো। মোজা সাদা রঙের। লম্বা ঢ্যাঙা, আর একটু মাংস লাগলে চার্লিকে বড় সুন্দর মানাত।

সেই চার্লি দাঁড়িয়ে আছে। সে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে না দিলে কেবিনে কিছুতেই ঢুকবে না। কেমন আতঙ্ক চোখে মুখে। কি যে ব্যাপার সে বুঝছে না। চিফ অফিসার এদিকে আসছেন। বোধহয় চার্লির দেরি দেখে, চিফ অফিসারকে কাপ্তান নিচে পাঠিয়েছেন। তা জাহাজে ফিরতে একটু দেরি হয়ে গেছে। পিকাকোরা পার্ক থেকে ফিরে আসতে হলে ট্রামে ফিরে আসতে হয়। কোথায় ট্রাম বেলাইন হয়ে যাওয়ায় ঘণ্টাখানেক প্রায় তাদের দেরি হয়ে গেছে। বাপের মন মানবে কেন!

চিফ অফিসার এসে বললেন, 'এত দেরি ফিরতে?'

চার্লি বলল, 'তা একটু দেরি হয়েছে।'

আর কিছু বলল না চার্লি।

চার্লি ইচ্ছে করলে চিফ অফিসারের সঙ্গে কেবিনে ঢুকে যেতে পারে। তাছাড়া চিফ অফিসার সুহাসকে পাত্তা দেন না। চার্লির সঙ্গে এত লেগে থাকাও তিনি বোধহয় পছন্দ করেন না। একজন নেটিভ ছেলেকে কে আর পছন্দ করে। চার্লি যে করছে, কিংবা চার্লি যে তার সঙ্গে মেলামেশা করছে—একসঙ্গে জাহাজঘাটায় নামছে, উঠে আসছে এই নিয়েও অফিসার মহলে, ইনজিনিয়ার মহলে কথা উঠতে পারে—তবে বোধহয় চার্লির এ ব্যাপারে নিজস্ব পছন্দ, অপছন্দ আছে। কাপ্তান মিলারও

জানেন, চার্লিকে খেপিয়ে দিলে রক্ষা নেই—জাহাজে তো কাজের শেষ নেই, তার উপর ছদ্মবেশী ছেলের নানা হুজ্জোতির বিড়ম্বনায় জড়িয়ে পড়তে কে চায়। শাসনও করে থাকতে পারেন। তবে চার্লি যদি বলে, জাহাজের এই ছেলেটি আমার কাছে সবচেয়ে বিশ্বস্ত। আমাব কোনও ক্ষতি হয় সে এমন কাজ কখনই করতে পারে না। তাকে তোমরা অযথা হেনস্থা করলে জাহাজ ছেড়ে চলে যাব।

এ-সব অবশ্য সুহাসের নিজস্ব ধারণা। চার্লি তার সঙ্গে জাহাজ ঘাটে লাগলে কিনারায ঘুবে বেড়ায়—এটাই তার কাছে বড় অহঙ্কার। আর এর জন্য সব জাহাজীরাই তাকে সমীহ করে। সে পড়াশোনায়ালা আদমি। তার রুচিবোধ আছে, জাহাজিরা এমন ভাবতেই পারে। তার সহকর্মীরা কিংবা তার ওপরয়ালা সারেঙ টিন্ডালও প্রায় সময়ই তার ফোকসালে হাজিব হয়।— 'দে বাপজান, খতটা লিখে দে। দে বাপজান, খতটা পড়ে দে।' দেশ থেকে চিঠির বান্ডিল জাহাজঘাটায় এলে সে নাম ধবে সবাইকে ডাকে। 'রহমতুল্লা খান—এই নিন আপনার চিঠি।' এই করে চিঠি বিলি থেকে, পড়ে দেওয়ার কাজটা তার। চিঠির জবাবও সে লিখে দেয়। তার জাতভাই হরেকিষ্ট, অধীর, সুরঞ্জনবা অবশ্য তাব এতটা প্রভাবে ক্ষুব্ধ হতে পাবত—তবে সে চার্লির প্রিয়জন; ক্ষুব্ধ হয়ে লাভ নেই। তাবাও তাকে এ-জন্য হয়তো পছন্দ করে।

সুহাস বলল, 'চার্লি তুমি বড়মালোমের সঙ্গে চলে যাও। আমি যাচ্ছি।'

'না।'

রাগে ক্ষোভে সুহাসের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে। কি ছেলে রে বাবা। জাহাজে উঠেও আতঙ্ক। আতঙ্ক না জেদ! তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে না দিলে, চার্লি যেন গ্যাঙওয়েতেই সাবারাত দাঁড়িয়ে থাকবে। মাথা গরম হয়ে যায় না!

সে অগত্যা চার্লিকে তাব কেবিনের দরজায় পৌঁছে দিল। চার্লি লক খুলে দরজা ঠেলে দিল। কিন্তু ভিতরে ঢুকল না। উঁকি দিয়ে কি দেখল। তারপর দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। কি ভেবে চোখ তুলে বলল, 'যাও।'

চার্লির চোখে যেন কি আছে। স্বাভাবিক মনে হয় না। টানা টানা চোখ। চোখে ধার আছে। কুহকও বলা যায়। কি যে আকর্ষণ চোখের চাউনিতে—সুহাস স্থির থাকতে পারে না। কিছুটা করুণ মুখ করে তাকিয়ে থাকলে কার না খারাপ লাগে। বড় ধূসর দূরবর্তী ছবি ভেসে ওঠে চোখে। সুহাস তখন কিছুটা চার্লির জন্য অস্থির বোধ করতে থাকে।

সুহাস বোট-ডেক পার হয়ে সিঁড়ি ধরে নিচে নামল। টুইন ডেক পার হয়ে পিছলে উঠে দেখল, দূরে কেবিনের দরজায় চার্লি তখনও দাঁড়িয়ে আছে। নির্বিঘ্নে ডেক পাব হয়ে আসতে পাবল কি না সুহাস, যেন, দূরে দাঁড়িয়ে চার্লি তাই লক্ষ কবছে।

এটা সুহাসের নিজস্ব এলাকা। ডেকের নিচে সিঁড়ি ধরে নেমে গেল, পর পর সব ফোকসাল। সিঁড়ি ধরে নেমে গেলে পোর্ট-সাইডের ফোকসালগুলিতে থাকে ইনজিন-জাহাজিরা। স্টারবোর্ড-সাইডের ফোকসালগুলিতে থাকে ডেক-জাহাজিরা। পিছিলে উঠে এলে সুহাস নিরাপদ, এমন ভাবতেই পারে চার্লি। এখানেই সুহাসেব জাতভাইরা থাকে, তার দেশের জাহাজিরা থাকে—এই এলাকায় সুহাসের কেউ ক্ষতি করতে সাহস পাবে না ভেবেই বোধহয় চার্লি কেবিনের ভিতর ঢুকে গেল। চার্লি কি জাহাজে কোনও খুন-খারাপি হতে পারে এমন আশঙ্কা করছে। তার কেমন ভয় ধবে গেল। সে দ্রুত সিঁড়ি ধরে নিচে নামার সময় দেখল—প্রায় সব ফোকসালের দরজা বন্ধ। কেমন একটা দম বন্ধ অন্ধকার—কারও সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। প্রচণ্ড শীতের কামড় থেকে আত্মরক্ষার জন্যও দরজা বন্ধ করে রাখতে পারে। ফোকসালের সিঁড়িতেই টের পেল শীতে সে নিজেও ঠক ঠক করে কাঁপছে। শীতে না আতঙ্কে বুঝতে পারছে না। আর তখনই দেখল একটা ছায়া মতো লম্বা মানুষ ওভারকোট গায়ে সিঁড়ি ধরে ডেক জাহাজিদের ফোকসালের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। এত রাতে কে ফিরল কিনার থেকে সে বুঝতে পারল না।

রাতে সুহাসের ভাল ঘুম হল না। সারাটা রাতই সে বিছানায় এপাশ ওপাশ করেছে। জাহাজ বিশমার্ক সি-তে যাচ্ছে বলে, সবাই ক্ষুব্ধ। হতাশ। বংশীকে নিয়ে সব চেয়ে বেশি ভাবনা। সুহাস রাতে ফিরে টের পেয়েছিল, পিছিলে বেশ একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেছে। সিঁড়ির রেলিঙ ভেঙে ফেলেছে কেউ। লাথি মেরে ইনজিন সারেঙের দরজা আলগা করে দিয়েছে। জংলি উন্মাদের মতো আচরণ করেছে। রাতে দু-একজন জাহাজি চুপি চুপি তার সঙ্গে দেখাও করে গেছে। সে হুঁ হাঁ কিচ্ছু বলেনি। কেবল তাদের অভিযোগ শুনেছে। আসলে চার্লির সঙ্গে তার বেশ দহরম মহরম আছে ভেবেই তারা এসেছিল। সে তাদের সঠিক খবর দিতে পারবে। চার্লি তাকে যে কোনও খবব দেয়নি তারা তা বিশ্বাস করতে পারেনি। নেরু দ্বীপ কোথায় এটাও তাবা সঠিক জানে না। বিশমার্ক সি-তে অসংখ্য প্রবাল দ্বীপের ছড়াছড়ি। একমাত্র নিউগিনি, নিউব্রিটেন, সলোমনদ্বীপপুঞ্জ ছাড়া তারা অন্য কোনও দ্বীপের নামও জানে না। তাবই কাছাকাছি কোনও দ্বীপ-টিপ নেরু দ্বীপ হবে এমনই তারা ভেবেছে। অস্ট্রেলিয়ার উত্তরে জিরো ডিগ্রি থেকে বিশ ডিগ্রির মধ্যে অসংখ্য এমন দ্বীপ আছে। ডেক টিন্ডাল বলে গেছে, সে গত সফবে রাবাউল এবং গ্রিন আয়র্ল্যান্ড গেছে। বিশমার্ক সি-তেই যে এই দ্বীপগুলি আছে তারা না বললে সুহাস জানতে পাবত না। কিন্তু তাবা কেউ নেরু দ্বীপের নাম শোনেনি। নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোনও দ্বীপ-টিপ হবে। প্রায় বিশ হাজার বর্গমাইল জুড়ে বিশমার্ক সমুদ্র। এত অসংখ্য দ্বীপ যে অধিকাংশ মানচিত্রেই তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না। নিউগিনি দ্বীপটা অবশ্য বিশাল। ডেক টিন্ডাল বলেছে— প্রায় বোর্নিও সুমাত্রা দ্বীপেব সমগোত্র।

সুহাস সমুদ্রের প্রায় কিছুই জানে না। তবে সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও দ্বীপেব নাম সে জানে। থাইল্যান্ডেব কাছাকাছি দ্বীপগুলি। সে স্কুলের শেষ পরীক্ষায পাশ টাস কবে জাহাজে উঠেছে বলে নামগুলি তাব চেনা। নিউপ্লিমাউথ থেকে কত দূরে এই দ্বীপগুলি তার জানা নেই। এক দু হপ্তা কিংবা তাব বেশি —তবে জাহাজ সেখানে না পৌঁছানো পর্যন্ত বলা যাবে না কত দিনের রাস্তা। কেউ বলছে দশ বারোদিন লেগে যাবে। আবার কেউ বলছে, জাহাজের মর্জি—তেনার মর্জি না হলে সেখানে যাওযা খুবই কঠিন। তিনি যেতে পারেন। নাও যেতে পাবেন। বিশমার্ক সি-তে ঘুরিয়েও মারতে পারেন। অজানা সমুদ্র পেলে জাহাজটা নাকি দুবন্ত স্বভাবের হয়ে যায়। মজা পেয়ে যায়। তার এই স্বভাবেব কথা কম বেশি সব জাহাজিবাই বিশ্বাস করে। ডিনা ব্যাঙ্ক আবার খেপে গেছে এমনও রব উঠে যায় জাহাজে।

কাজেই জাহাজ দেশে না ফিবে অজানা সমুদ্রে ভেসে গেলে কে আর মাথা ঠিক রাখতে পারে! বংশী উন্মাদের মতো আচরণ করতেই পারে। তা ছাড়া জাহাজিরা দেশে ফেরার জন্য উন্মুখ। বন্দরে কেউ কেউ চিঠিও লিখেছে, সম্ভবত ফ্রিম্যান্টাল থেকে গম বোঝাই হয়ে জাহাজ দেশে ফিরবে। মানুষের বাড়িঘর কত প্রিয়, চিঠি লিখে দেবার সময় সুহাস হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। এত দীর্ঘ সফর, মনে হয় কোন্ অতীতে তারা জাহাজে উঠে এসেছিল, কোন্ অতীতে তারা পরিবার পরিজনের সান্নিধ্য পেয়েছে—আবার কবে পাবে, কিংবা কে জানে জাহাজটা আর আদৌ ফিরবে কি না, জাহাজটা সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়, কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। লোহা-লক্কড়ের দামে জাহাজ বিক্রি করা গেল না—জাহাজ স্ক্র্যাপ করা গেল না—জাহাজটাকে স্ক্র্যাপ করার কথা উঠলেই বিপাকে পড়ে যেতে হয়। কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা বিপাকে পড়ে যায়—এমনকি দু-দু'বার দৈব দুর্ঘটনারও শিকার হয়েছে তারা। অপমৃত্যু থেকে অগ্নিদগ্ধ হওয়া কিছুই বাদ যায় না।

সুহাস বাঙ্ক থেকে উঠে পড়ল। অধীর কখন থেকে ডাকছে, 'এই ওঠ্। চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কি পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছিস।'

অধীব, বংশীদা আর সে একই ফোকসালে থাকে। বিশ বাইশ মাস একসঙ্গে থাকলে মায়া জন্মে যায়। বংশীদার কথা ভেবে তার খারাপ লাগছিল। সবে বিয়ে করে সফর করতে বের হয়েছে। বউয়ের

কথা ভেবে ভেবে মাথা খারাপ হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। তার দোষও দেওয়া যায় না।

রাতে সে দু-একবার যে বংশীদাকে লক্ষ না করেছে তা নয়। কিন্তু বংশীদা কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে আছে চিত হয়ে। মুখ মাথাও কম্বলে ঢাকা। জিরো পাওয়ারের বাল্‌ব জ্বালা। অস্পষ্ট হয়ে আছে সব। এমনও মনে হয়েছে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস পড়ছে তো! মরার মতো কেউ এ-ভাবে পড়ে থাকলে ভয় হবার কথা। সে সতর্ক পা ফেলে বাঙ্কের কাছে ঝুঁকে দেখতে গিয়ে অবাক। ঠিক টের পেয়েছে। মুখ থেকে কম্বল সরিয়ে বলেছে, কি হল, কি দেখছিস!

সে কিছু বলতে পারেনি। এ-ভাবে সামান্য কারণেই কেন যে সে আতঙ্কে পড়ে যায় কে জানে, যদি বংশীদা তার নিরুপায় অবস্থার কথা ভেবে কিছু করে বসে! যেমন সে চার্লিকে কেবিনে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসার সময়ও আতঙ্কে টেরই পায়নি শীতের কামড় কত তীব্র।

এত ঠাণ্ডা যে কম্বল ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল না। তবু সে ভোরে উঠে দেখল, বংশীদার বাঙ্ক খালি। না উঠেও উপায় নেই। ডেকে মেলা কাজ। অধীর চায়ের কাপ এগিয়ে দেবার সময় বলল, রাতে আর কোনও গণ্ডগোল করেনি। তুই তো ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমাচ্ছিলি। সারেঙ সাব দরজা ফাঁক করে একবার দেখে গেছেন। তুই ঘুমিয়ে পড়েছিস ভেবে ডাকেননি।

সুহাস তাড়াতাড়ি চা-টুকু শেষ করে বাঙ্ক থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল। নিচের বাঙ্কে পা রেখে পায়ে চটি গলাল। একটা কম্বল টেনে গায়ে দিল—তারপর সারেঙের ফোকসালে উঠে গেল। কেন তিনি এসেছিলেন জানা দরকার। কে জানে ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে তিনি যদি কাপ্তানের কাছে চলে যান, তবে আর এক কেলেঙ্কারি। বংশীদাকে নিয়ে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হবে। বংশীদা লাথি মেরে সারেঙের দরজা আলগা করে দিয়েছে। অজানা সমুদ্রে জাহাজ যাচ্ছে শুনে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারেনি। তোয়াজ করলে তিনি তুষ্ট হন। দরকারে বংশীদাকে ধরে নিয়ে যাবে। বংশীদা বললেই হল, মাথা ঠিক রাখতে পারিনি, আর হবে না। বংশীদাই বা কোথায়। সারেঙ সাবের ফোকসালের দরজাও বাইরে থেকে বন্ধ। স্টারবোর্ড-সাইডের ফোকসালগুলিতে থাকে ডেকসারেঙ এবং ডেকজাহাজিরা। যদি ডেকসারেঙের ঘরে থাকেন। উঁকি দিয়ে দেখল, না ডেকসারেঙ, না ইনজিনসারেঙ। সে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল। আবার বচসা শুরু হয়েছে। সারেঙসাব চুপচাপ বসে আছেন। কোনও কথার জবাব দিচ্ছেন না। শুধু বলছেন, 'আমি কি করব। আমি কি বাড়িয়ালা? সব বাড়িয়ালার মর্জি। মাস্তার দিতে হয় তাঁর কাছে দাও।'

একই ভাঙা রেকর্ড শুধু বাজছে।

কেউ বলছে, 'আপনি জানেন, জাহাজটা নিজের কবরখানায় যাচ্ছে?'

তিনি চুপ।

'আপনি জানেন, বিশমার্ক সি-তে কত জাহাজের কঙ্কাল সমুদ্রের তলায় পড়ে আছে?'

তিনি চুপ।

'আপনি বলুন, জাহাজে মেয়েমানুষ আসে কোত্থেকে!'

'এই তো সুহাস, ওকে বলুন না, সেও দেখেছে, মধ্যরাতে বোট-ডেকে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।'

সুহাস সারেঙের পক্ষ নিয়ে বলল, 'বাজে কথা। আমি কিচ্ছু দেখিনি।'

'আবার মিছে কথা।' গ্যালি থেকে ভাণ্ডারি চিৎকার করতে করতে ছুটে এল।

সারেঙ সাব খুবই একা পড়ে গেছেন। সব জাহাজিরাই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। একা বংশীদাকে দায়ী করতে পারবেন না। সে কিছুটা যেন আশ্বস্ত গলায় বলল, 'চোখের ভুলও তো হতে পারে।'

'এখন চোখের ভুল বলছিস সুহাস! তুই ভয়ে বোট-ডেক থেকে নেমে এসেছিলি না, হাঁপাচ্ছিলি না।'

সে বলল, 'আসলে, মাথা ঠিক ছিল না। কি ঝড়! দাঁড়াতে পারছিলাম না। বোট ডেক পর্যন্ত ভাসিয়ে দিচ্ছে। ঢেউ না আবার ভাসিয়ে নিয়ে যায় এই ত্রাসে ছুটছি। গভীর রাতে কত শুনশান থাকে বোট-ডেক তোমরা তো জানই। চোখের ভুলে দেখতেই পারি। আর দেখলেই দোষের কি আছে। তার জন্য চাচাকে দুষছ কেন?'

'জাহাজটা ভাল না।' লতু মিঞা হাত তুলে চেঁচাচ্ছে। 'জাহাজটা ইবলিশ, জাহাজটা জিন পরীর

আখড়া। ভাগাড়ে যাবার আগে মিঞাবিবি তামাসা দেখাচ্ছে। মিঞা এতদিন একলা জাহাজিদের তাড়া করেছে এবারে বিবি হাজির। হয়ে গেল!'

সুহাস লতু মিঞাকে বলল, 'কি আজে বাজে বকছ চাচা। তোমার কি মাথা খারাপ।'

'মাথা খারাপ না হলে শালা কোন্ বেজন্মার বাচ্চা এ-জাহাজে সফর দেয়। ডেক-কশপ লতু মিঞা বেশি কথা বললে, থুথু ছিটায়। কাছে দাঁড়ানো যায় না। সুহাসের মুখেও এসে পড়েছে। সে বাথরুমে ঢুকে মুখে জল দিল। বংশীদা কোথায়। জাহাজের এক নম্বর গ্রিজার বংশীদা কি সুরঞ্জনের ফোকসালে গিয়ে বসে আছে। কিংবা সুরঞ্জন মাথা ঠাণ্ডা রাখার পরামর্শ দেওয়ায় উপরে উঠে আসেনি।

গ্যালি থেকে হাতে দা নিয়ে বের হয়ে এল ভাণ্ডারি ইমতাজ। যা মাথা গরম কি না করে বসে। সে এগিয়ে গিয়ে দেখল, কাঠও বের করছে ভাণ্ডারি। ডেকে গোস্ত কাটতে বসবে। সে হাঁড়িতে ডাল সেদ্ধ বসিয়ে হাতের কাজ সেরে নিচ্ছে। আর গজ গজ করছে। সুহাস বুঝতে পারছে, রাতের জের এখনও মেটেনি। সে লতু মিঞার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মিঞা বিবিকে এত ভয় কেন চাচা? সবাইকে গোরে যেতে হয়।'

লতু মিঞা কেমন মিইয়ে গেল কথাটাতে। বলল, আরে বাবু জিন ফেরেস্তা বলে কথা। ভাঙা জাহাজে ফেরেস্তা আসে না—জিনেরাই ঘোরাফেরা করে। বরফ ঘরে গরু বাছুরের গোস্ত ঝুলছে। দু-ফালা করে রেখেছে গরু ভেড়া। সেখানে মরা মেয়েমানুষ আসে কোত্থেকে বল।

সুহাস কিঞ্চিৎ বিভ্রমে পড়ে গেল। মরা মানুষ তো গরু ভেড়ার সঙ্গে ঝোলে না। ঘোরে না পড়লে এমন দেখাও যায় না। ঘোরে পড়েই দেখেছে কিছুতেই বোঝানো গেল না। বটলার আহামদ ডারবানের ঘাটে পালাল। ঠিক পালাল বলা চলে না, কি যে দেখল বরফ ঘরে সেই জানে, রসদ নিতে গেলেই আহামদ বলে, 'ওরে বাপজান, ওদিকে যাস না। মরা মেয়েমানুষ ঝুলতাছে।' সে নিজেও যায় না। কাউকে ঢুকতেও দেয় না। তারপর কাপ্তানের ধমক খেয়ে সে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেছিল—'সাহাব, আমার কসুর নাই। মেমসাব বরফ ঘরে উলঙ্গ হয়ে ঝুলতাছে। দু-পায়ে হুক গেঁথে বরফ ঘরে ঝুলে আছে। মাথাটা নিচে, পা উপরে। হুকে উনি মেহেরবানি করে ঝুলতাছেন। আমারে কয়, কি কেমন আছ, মিঞা? ডর নাই, গোস্ত যা লাগে নাও—আমি তো থাকলাম।'

আসলে জাহাজে থাকলে নানা কুসংস্কারে এমনিতেই ভুগতে হয়। লজঝরে জাহাজ হলে তো কথাই নেই। কাপ্তান পর্যন্ত খেপে গিয়ে নিচে নেমে এসেছিলেন। রসদ ঘরের চারপাশে সবাই হামলে পড়েছিল। সুহাসও উইনচ মেসিন ফেলে ছুটে গিয়েছিল—কিছুতেই বরফ ঘরের চাবি আহামদ কাউকে দেবে না। রসদ ঘরের নিচে সিঁড়ি ধরে নেমে যেতে হয় বরফ ঘরে—উপরের ঘরটায় নানা কিসিমের র‍্যাক—র‍্যাকে জ্যাম জেলি আপেল কলা টমেটো সস থরে থরে সাজানো। চাল ডাল ময়দার বস্তা। তেলের টিন—চা চিনি টোবাকো আর নিচে নেমে গেলে সবজির পাহাড়—বাঁধাকপি ফুলকপি—ভ্যাপসা পচা গন্ধ—ডাঁই মেরে ফেলে রাখা হয়েছে। তার সামনে বরফ ঘরের লম্বা দরজা। সাদা রং বার্নিসে চকচক করছে। খুললে ছালচামড়া ছাড়ানো গরু ভেড়ার লাশ।

সুহাসও দেখেছিল। গরুভেড়ার লাশ ছাড়া কিছু সে দেখতে পায়নি। কাপ্তান সবাইকে ডেকে বলেছিলেন, 'কোথায় কে ঝুলছে। আহামদকে ডাক।'

সবাই একে একে উঠে আসছিল—বরফ ঘরে ছালচামড়া ছাড়ানো ঝুলন্ত সব গরু ভেড়া মুরগি দেখে সুহাসের মাথা ঘুরে গিয়েছিল—তবু সে দেখেনি কোনও নারীর সাদা পাণ্ডুর লাশ সেখানে ঝুলছে। আহামদ ডারবানের ঘাটে সত্যি পাগল হয়ে গেল। সে কিছুতেই আর বরফ ঘরে নামত না। কাউকে রেশনের গোস্ত বিলি করত না। অগত্যা চিফ কুকের উপর ভার। চিফ কুক কাজটা করত ঠিক—তবে সে একা বরফ ঘরে ঢুকত না। গণ্ডায় গণ্ডায় ছাল চামড়া ছাড়ানো আস্ত গরু ভেড়া ঝুলতে থাকলে কে না অস্বস্তিতে পড়ে যায়! সেকেন্ড কুককে সঙ্গে নিত। আর জাহাজ দুলতে থাকলে সমুদ্রে তারাও বেশ দোল খায়। শক্ত আংটায় গেঁথে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কপিকলে টেনে তোলা হয়েছে। ওজন মেপে রেশন দেওয়ার কাজটা চিফ কুকের উপরই বর্তে গেল। আহামদকে কিছুতেই আর বরফ ঘরে পাঠানো গেল না। সে গেলেই নাকি দেখতে পায় কোনও নগ্ন নারীর সাদা পাণ্ডুর শরীর গরু

ভেড়ার সঙ্গে ঝুলছে। চুল সোনালি, মাথা নিচের দিকে। এ-সব খুব কাছে না গেলে নাকি বোঝা যায় না। এমনিতে চোখে পড়ার কথা না। কারও দেখারও কথা না। এত ছাল চামড়া ছাড়ানো গরু ভেড়ার মধ্যে একজন উলঙ্গ মেমসাবকে আবিষ্কারও করা যায় না। মাংসের রং এক রকমের। এমনকি নিতম্ব এবং পা সবই মুরগির পেটের মতো অথবা ঠ্যাং-এর কাছাকাছি। এ-সব বর্ণনা আহামদেরই। আর কেউ তো কিছু দেখেনি।

সুহাস ডেক ধরে ছুটে আসছিল, এমন আজগুবি কথা সে বিশ্বাস করতে পারেনি। সবাই তো গেছে বরফ ঘরে, কেউ তো উঠে এসে বলেনি, না আছে। থাকবে কোত্থেকে। কার দায় পড়েছে, গরু ভেড়ার সঙ্গে নারীর লাশ ঢুকিয়ে দেবার। সেও বলেছে, আহামদ পাগল হয়ে গেছে। সে ডেক ধরে ছুটে যাবার সময় বলেছে, শিগগির যাও, দেখোগে বাটলার পাগল হয়ে গেছে। বরফ ঘরে কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না। কাপ্তান জোরজার করে ওর কেবিনে আটকে রেখেছে।

আর তখনই শুনেছিল, কেউ ডাকে।

কে?

সে দেখল এক নম্বর ফল্কায় বসে বসে দাঁত খুঁটছে তিন নম্বর সুখানি। সুহাস মানুষটাকে শ্রদ্ধা করে—কারণ জাহাজে সুখানির কাজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্রিজে কাপ্তান, চিফ অফিসারদের সঙ্গে তাঁর ডিউটি। তিন নম্বর সুখানিই বলতে গেলে মুরুব্বি তাদের। তিনি তাকে ডাকছেন, সুহাস শোন।

সুখানি অর্থাৎ মুখার্জিদা তার দিকে তাকিয়ে আছেন।

সবাই নেমে বরফ ঘর দেখে এলেও তিনি নামেননি। যেন এটা তাঁর কাছে কোনও খবরই নয়। এই জাহাজ ছাড়া তিনি অন্য জাহাজে সফরও করেন না। জাহাজের পুরো হাল হকিকত দু-জন জানে---একজন ইনজিন সারেঙ, অন্যজন তার এই মুখার্জিদা।

সে কাছে গেলে বলেছিলেন, 'কে পাগল হয়ে গেছে?'

'আহামদ বাটলার। নিচে গেলে না! কাপ্তান তো সবাইকে বলেছেন, দেখে এস বরফ ঘরে কি আছে? কে কি আবিষ্কার করতে পারো চেষ্টা করে দেখ। বাটলার বললেই বিশ্বাস করতে হবে কেন। তোমাদের নিজেদের চোখ আছে, দৃষ্টি আছে, অনুভূতি আছে—দেখ যদি আহামদ সত্যি ঠিক কিছু বলে থাকে।'

মুখার্জিদা বললেন, 'তিনি প্রাজ্ঞ মানুষ, বলতেই পারেন।' তারপর সহসা তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'তুই কি দেখলি!'

'ধুস। দেখা যায়! আমার তো মাথা ঘুরছিল। বরফ ঘরে উঁকি দিয়েই দৌড়।'

মুখার্জিদা ফের প্রশ্ন করেছিলেন, 'তবে বুঝলি কি করে আহামদ বাটলার পাগল হয়ে গেছে। সে মিথ্যে কথা বলেছে!'

'কাপ্তান যে বললেন।'

'তিনি বলতেই পারেন। তাঁকে তো জাহাজটা নিয়ে সমুদ্রে চষে বেড়াতে হয়! বাটলারের কথা সত্য হলে কেউ বরফ ঘরের মাংস খাবে! মেয়েছেলে লাশ হয়ে থাকলে বরফ ঘরের গোস্ত কেউ খেতে পারে!'

'কি বকছ মুখার্জিদা! ওখানে মেয়েমানুষ আসতে পারে বল! লাশ হয়ে মাথা নিচে রেখে ঝুলে থাকতে পারে! কেউ তো দেখল না। কার মুরোদ আছে মেয়েমানুষের লাশ ওখানে গুঁজে দেয়!'

'কেন দেখল না বুঝিস না। ভিতরে ঢুকতে কারও সাহসই হয়নি।'

তা নাও হতে পারে, দরজায় উঁকি দিলেই দেখা যাবে তাও ঠিক না। প্রায় দশ বারো গণ্ডা গরু ভেড়া ঘরটায় গোস্ত হয়ে ঝুলছে। গরু ভেড়ার কবন্ধ বলা যায়। বীভৎস দেখতে। উৎকট ভ্যাপসা গন্ধ। মাসখানেকের রসদ একসঙ্গে তোলা হয়েছে—মাসখানেক বাদে আবার রসদ উঠবে। বরফ ঘরের বাসি গোস্ত সবার জন্য বরাদ্দ। যে যা খায়। মটন খেলে মটন। বিফ খেলে বিফ। এত লাশের মধ্যে আর একটা লাশ খুঁজে পাওয়া যে সহজ না তাও সে বিশ্বাস করে। কিন্তু কাপ্তান ছাড়ার পাত্র নন। তিনি সব গরু ভেড়া মুরগি বরফ ঘর থেকে টেনে বাইরে এনে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছিলেন—'কোথায়

লাশ বলো?' বলেছিলেন সবাইকে। আহামদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তাকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া দরকাব। তিনি এমনও বলেছিলেন।

সব শুনে মুখার্জিদা বলেছিলেন, 'সে সত্যি তবে জাহাজে আছে। ভাবতে ভালই লাগছে। জাহাজ ছেড়ে যেতে চাইছে না? কেউ দেখতে পায়, কেউ পায় না। কি মজা।'

কেমন বালকের মতো মুখার্জিদা হাসছিলেন। মুখার্জিদার কথাবার্তায় সে কিছুটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল।

'কি বলছ। মুখার্জিদা তুমি হাসছ। এসব বিশ্বাস কব।'

'দেখ সুহাস, জাহাজে সবে সফরে বের হয়েছিস। জাহাজ বড় খারাপ জায়গা। কিনার আরও খাবাপ জায়গা। কোথায় কে কি দেখে ফেলবে কেউ বলতে পারে না। আহামদ যা দেখেছে—আজগুবি বলে উড়িয়ে দিস না। আহামদ দেখতেই পারে। এককালে বরফ ঘরে একটা মেয়েব লাশ সত্যিই ঝুলিয়ে বাখা হয়েছিল। আমি তো আজকের না। এই জাহাজেই আমাব বারো চোদ্দ সফর হয়ে গেল। আমি জানি বলেই বললাম।'

সে কেমন বিচলিত বোধ করছিল। মুখার্জিদা টোবাকো জড়াচ্ছেন মনোযোগ দিয়ে। এত বড় একটা কাণ্ড হয়ে গেল, তিনি সেখানে গেলেনই না। তিনি তাঁব মতো মনোযোগ দিয়ে সাদা কাগজে টোবাকো জড়িয়ে জিভে লেপটে দিলেন। তাবপর দু-আঙুলে টিপে টিপে সোজা সরল সিগারেট মুখে পুবে লাইটার। আগুন ধরালেন। ঘস করে টেনে চোখ বুজে ফেললেন।

'তুমি জান, বরফ ঘরে লাশ ছিল কখনও।'

'ছিল। আমি জানি বলেই বললাম।'

'কি করে সম্ভব!'

'অসম্ভবই বা কি করে হতে পারে বুঝি না। টানা দেড় মাস সমুদ্রে। মন্ট্রিলে জাহাজ। তুষার ঝড়। জাহাজের চিফ ইঞ্জিনিয়ার হন্যে হয়ে আছেন, তাঁব বান্ধবী এলেই শরীর গরম কবা যাবে। তুষাব বন্দরে পাইন গাছের একটা পাতাও ছিল না। সে অনেক কথা। যা এখন। কিছুই অবিশ্বাস করতে নেই। সেইজন্যে উঠেছিল, জাহাজির মতো অদৃষ্টকে মেনে নে। আহামদের এটা অদৃষ্ট। পাঁচ সাত বছর বাদে সেই লাশকে আহামদ ঠিক আবিষ্কার করে ফেলেছে। আমবা তো ভেবেছিলাম, যাক, সমুদ্রে যখন ওখানে ফেলে দেওয়া গেল, তখন আর ভাবনাব কি! অথচ দ্যাখ সে ফিরে ফিরে জাহাজে আসে। ঠিক জায়গায় ঝুলে থাকে। বেতাল পঞ্চবিংশতি পড়া আছে তোর? বিক্রমাদিত্য রাজার কথা মনে আছে। ঐ আব কি! গল্প তো এমনিতেই তৈবি হয় না। কিছু না কিছু সত্য থেকেই যায়।'

লতু মিএগ্রাব মুখে বরফ ঘরে লাশেব কথা শুনে সেই মুখার্জিদাও উপরে উঠে এসেছেন। তাঁকে বেশ তাজা লাগছিল, তিনি ভিড়েব মধ্যে থাকেন না, গণ্ডগোলেও থাকেন না। ডারবানের ঘাটেই তাঁকে দেখে এটা সুহাস টেব পেয়েছিল। বরফ ঘরে গিয়ে সবাই উঁকি দিলেও তিনি উঁকি দেননি। তাঁর বিশ্বাস—আহামদ দেখতেই পাবে। লতু মিএগ্রার কথায়ও তাঁর সায় আছে। তবে সায় থাকলেও এসব নিয়ে কোনও উত্তেজনা তিনি পছন্দ করেন না।

তিনি ভিড়েব মধ্যে ঢুকে বললেন, 'একদম গণ্ডগোল না। সারেঙকে ভাল মানুষ পেয়ে কাল থেকে হুজ্জোতি চলছে। মিএগ্রাবিবিকে নিয়ে পড়লে লতু মিএগ্রা! কাজ কাম নেই! সারেঙ সাব, আপনি ওদের কাজে যেতে বলুন। ঘোঁট পাকাচ্ছে। এই সুহাস, তুই সত্যি বোট-ডেকে মেয়েমানুষ দেখেছিস?'

সে বলল, 'না, আমি কিছু দেখিনি।'

'দেখলেই দোষ কোথায়। যে যার মতো থাকে। কেউ তো ক্ষতি করেনি।'

এত দিন জাহাজে লুকেনাবের প্রেতাত্মা একাই বিরাজ করত। জাহাজে উঠলে নানা গুজব এমনিতেই ওড়াউড়ি করে। জাহাজটা প্রথম মহাযুদ্ধেব আগেকার। লুকেনার সাহেবের জাহাজ—তাঁর নৌবহরের তিনটি জাহাজেব এটি একটি। তিনি জলদস্যু ছিলেন, এবং লুণ্ঠন গৃহদাহ ধর্ষণ কিছুই বাদ ছিল না তাঁর। দরকাবে কোরাল সি-তে আত্মগোপন করে থাকতেন। পর্তুগিজরা যা করত একসময়। তাঁর দাপটে কোরাল সি কিংবা বিশমার্ক সি-তে কোনও জাহাজ ঢুকতে সাহস পেত না।

জাহাজিদের বিশ্বাস, সেই জলদস্যু লুকেনার সাহেবের হাড় প্রোথিত আছে এই জাহাজে। মাঝে মাঝে তাঁকে গভীর রাতে ফরোয়ার্ড পিকে দাঁড়িয়ে থাকতেও দেখা গেছে। প্রাচীন নাবিকেরা লুকেনার সাবের প্রেতাত্মার কবলে পড়লে কারও যে রক্ষা থাকে না, এমন গুজবও ছড়াতে কসুর করে না। তিনি এতদিন একা ছিলেন, কেউ কেউ এবারকার সফরে মধ্যরাতে কোনও নারীকে দেখে ফেলায়—তিনি আর একা নন এমন ভাবতেই পারে। লতু মিঞা ভাবতেই পারে এবারে মিঞাবিবি একসঙ্গে সফর করছেন।

মুখার্জিদা উপরে উঠে আসায় লতু মিঞা কিঞ্চিৎ মিইয়ে গেছে। কারণ মানুষটা একটু ভিন্ন গোত্রের। সবাই মিলে মিশেই থাকে। মানুষ থাকবে, ভূত থাকবে না তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না। বেঁচে থাকার এই একটা মজা। গোরে গেলে মানুষও থাকে না ভূতও থাকে না। তা আছে যখন থাক। তাই নিয়ে এত হুজ্জোতির কি আছে! জাহাজ তো একদিন ঘাটে লাগবেই—তখন যে যার মতো নেমে পড়বে। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা হাতে যখন আসবে, কেউ কি সারেঙ সাবকে ভাগ দেবে।

মুখার্জিদা বললেন, 'বংশীকে দেখছি না!'

কে যেন বলল, 'ও নিচে শুয়ে আছে।'

'কাজে যাবে না?'

'কে জানে!'

তখনই বংশীর গলা পাওয়া গেল—'এই যে আমি। কিছু দরকার আছে?'

মুখার্জিদা বললেন, 'মাথা গরম করিস না। যা কাজে যা। সারেঙ সাবকে নিয়ে পড়েছিস কেন! তিনি কি করবেন। কাপ্তানেরও কিছু করার নেই। আমরা কোম্পানির গোলাম। সাইন করার সময় সেটা তো ভাবনি। ব্যাঙ্ক লাইনের সফর, লম্বা সফর, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। কত কিছু তো জাহাজে ওঠার সময় মনে হয়েছে। এখন জাহাজের নামে অপবাদ ছড়াচ্ছ, লজ্জা করে না!'

আরে বলে কি!

'অপবাদ ছড়াবার কি হল।'

মুখার্জিদার মুখে এমন কথা শুনে সুহাস তাজ্জব। যেন বরফ ঘরে মেয়েছেলের লাশ ঝুলে থাকতেই পারে, বোট ডেকে মধ্যরাতে তিনি একটু হাওয়া খাওয়ার জন্য উঠেও আসতে পারেন, লুকেনার সাব মাঝে মাঝে জাহাজের মায়া কাটাতে না পেরে জ্যোৎস্না রাতে ফরোয়ার্ড পিকে দাঁড়িয়ে থাকতেও পারেন—সে জন্য জাহাজটার নামে অপবাদ ছড়ানো কেন! জাহাজেরও মেজাজ মর্জি বুঝতে হবে। তবে তো একজন পাক্কা জাহাজি।

নাও হয়ে গেল।

কেউ আর কথা বলতে পারছে না।

ভাণ্ডারি দা দিয়ে গোস্ত কোপাচ্ছে। সে শুনছিল সব। সে বোধ হয় আর পারল না, সে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'মুখার্জিবাবু, জাহাজ তার নিজের গোরে যাচ্ছে—দেখে নেবেন।

'এ কথা বলছ কেন?'

'জাহাজটা তো ওখানেই বিচরণ করত। সরকার বাহাদুর লুকেনার সাবকে আটক করার চেষ্টা করলে, ঐ দরিয়াতে আত্মগোপন করে থাকত—এটা কি জানেন!'

মুখার্জি বললেন, 'জানি!'

'তবে!'

ভাণ্ডারি ফের বসে পড়ল। গ্যালিতে দুটো উনুন জ্বলছে। জাহাজিরা যে যার রেশন থেকে চা চিনি কনডেনস মিল্ক বের করে চা বানিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। কেউ কেউ কাজে যাবার জন্য পোশাক পালটে উঠে আসছে। তারা জানে, কিছু করার নেই। সুরঞ্জন জাহাজের ফায়ারম্যান। সে চা করে দু কাপ চা মুখার্জি এবং সুহাসকে দিল। হিমেল ঠাণ্ডা উঠে আসছে সমুদ্র থেকে। কম্বলেও শীত যাচ্ছে না সুহাসের। চায়ের কাপ কম্বলের তলায় নিয়ে শরীর গরম করছে। একটু বেশি শীতকাতুরে হলে যা হয়। তারও যে বাড়িঘরে ফেরার জন্য মন খারাপ বুঝতে দিচ্ছে না। জাহাজটা গোরে যাচ্ছে বলায়, শীতটা যেন আরও বেশি কামড় বসাচ্ছে শরীরে। জাহাজ যাচ্ছে সেই সমুদ্রে, যেখানে ভয়ংকর জলদস্যু লুকেনার

আত্মগোপন করে থাকতেন।

মুখার্জিদা ফের বললেন, 'যেখানেই যাক আমাদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। আর অদৃষ্টে থাকলে দেশে ফিরেই গোরে যেতে পার মিএগ্র। কে আটকাবে। শেষ পর্যন্ত গোরে যেতে হয় না এমন কেউ আছে! আসলে তোমরা দেশে ফেরার জন্য নানা অজুহাত সৃষ্টি করছ। পয়গম্বরের মতো কথা বলছ মিএগ্র। সব জেনে বসে আছ।'

ভাণ্ডারি চুপ।

সে গ্যালিতে ঢুকে গেল। জাহাজিরা কাজ সেরে আটটায় ফিরে আসবে। চর্বি ভাজা রুটি খাবে। সে ময়দা মাখতে বসে গেল।

মুখার্জিদার কথায় কাজ হয়েছে।

এত উচাটনে থাকা ঠিক না। মনমেজাজ খারাপ হতেই পারে। তাই বলে, ডিনা ব্যাঙ্ক গোরে রওনা হয়েছে কথাটা কারও ভাল লাগল না। কেউ বলতেও পারে না, জাহাজের পরিণতির কথা। অযথা উত্তেজনা সৃষ্টি করা হচ্ছে। আহামদ বাটলার আতঙ্কে দেখে থাকতে পারে লাশ, এবং সে যে দেশে পালাবার জন্য অজুহাত সৃষ্টি করেনি তাই বা কে বলতে পারে। কার কি পরিণতি কেউ বলতে পারে না। পিছিলে ধীরে ধীরে গুঞ্জন থেমে গেল। সুহাস কাজের পোশাক পরে উঠে দেখল যে যার কাজে বের হয়ে যাচ্ছে। তার উইনচে কাজ। কশপের ঘরে তেল জুট হাতুড়ি বাটালি নিতে চলে গেল।

জাহাজে জল মারা হচ্ছে। ডেক ধোয়া-মোছার কাজ চলছে। ফল্কার কাঠ তুলে দেওয়া হচ্ছে। ত্রিপলে ঢেকে কিল এঁটে দেওয়া হচ্ছে। বড় টিন্ডাল ওয়াচে নেমে গেলেন। সঙ্গে তিনজন ফায়ারম্যান, দুজন কোলবয়।

জাহাজের দুটো বয়লারে নতুন করে আগুন দিতে হবে। স্টিম তুলতে হবে। তাদের ব্যস্ততার শেষ নেই।

সুহাস দেখল, ব্রিজে দাঁড়িয়ে আছেন কাপ্তান। সঙ্গে চিফ-অফিসার। তাঁরা সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে আসছেন। সারা জাহাজ ঘুরে দেখবেন। ডেরিক ফল্কা, হাসিল ঠিকঠাক আছে কিনা, বাঁধাছাদার কাজে কোনও ত্রুটি থাকল কিনা—কিংবা ডেকে কোনও ময়লা জমে আছে কিনা, দেয়ালে কোথায় রং চটে গেছে, সব দেখে উঠে যাবেন।

সুহাস তাড়াতাড়ি উইনচে ঝুঁকে পড়ল। পাঁচ নম্বর সাব তার কাছে নাট খোলার জন্য হাতুড়ি বাটালি চাইছেন। সে ঝুঁকে হাতুড়ি এগিয়ে দেবার সময় শুনতে পেল, ফাইভার বলছে, 'তোমাদের ওদিকটাতে শুনলাম খুব গণ্ডগোল। এক নম্বর গ্রিজার নাকি সারেঙকে মারতে গিয়েছিল!'

সে বলল, 'বাজে কথা।'

'বাজে কথা! হতে পারে। বাজে কথা হলেই ভাল। শুনলাম, তুমি নাকি মধ্যরাতে জাহাজে মেয়েমানুষ দেখতে পাও! তা দেখতেই পার। সবাই দেখে। সমুদ্রে এলে রোগটা বাড়ে। যখন তখন মাথায় মেয়েমানুষ পেরেক পুঁতে দেয়। যা জাহাজ—'

সুহাস কি যে বলে! তা দেখেছে, একবারই—তখন জাহাজ লৌহ আকরিক বোঝাই হয়ে ক্যারেবিয়ান সি-তে। সাইক্লোন—ডেক ধরে ফোকসালে যাওয়া মানা। টানেল-পথ খুলে দেওয়া হয়েছে—তখন, সেই একবার, বোট-ডেক ধরে নামতে গিয়ে প্রায় ঢেউয়ের তোড়ে সুহাস উড়ে যাচ্ছিল। তখনই মনে হয়েছিল, অন্ধকারে বজ্রপাত। কোনও নারী বোট-ডেকে ছুটে বের হয়ে এসেছে। কড় কড় করে আকাশ চিরে ফালা ফালা বিদ্যুতের ফণা। এমন বিক্ষুব্ধ ঝড়ের রজনীতে কে যায় বোটডেক পার হয়ে! কার এত সাহস!

সে ঢোক গিলে বলল, 'আচ্ছা ফাইভার, লুকেনারকে তুমি কখনও দেখেছ? তোমারও তো তিন চার সফর।'

'লুকেনার! মানে, সি-ডেভিল লুকেনার! সে-তো কবে মরে ভূত হয়ে গেছে। সে তো প্রথম মহাযুদ্ধের আগেকার কথা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ গেল, তোমরা এখন স্বাধীন—সে এখনও আছে নাকি!'

'জাহাজিরা যে বলে অনেকেই তাকে দেখতে পায়।'

'তা পেতে পারে। লুকেনারের গুপ্তধনও পেয়ে যেতে পারে তারা। যে যেমন ভাবে। কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা এই গুপ্তধনের লোভেই তো জাহাজটা কিনেছিল।'

'কি বলছ?'

'তাই তো গুজব।'

'কোথায় সেই গুপ্তধন?'

'তোমাকে বলব কেন?'

'না মানে!'

'আরে বোঝো না, জাহাজের খোলে কত রিপিট মারা! ইস্পাতের চাদর কত জায়গায় কাটা দেখেছ, কাটে আর জোড়া লাগায়। রিপিট মেরে দেওয়া হয়। গ্যাস কাটার দিয়ে কেবল কাটা ছেঁড়া করা হচ্ছে। কিসের খোঁজে?'

'কে করছে?'

'কে করছে জানব কি করে! খোলে নামলে বুঝতে পার না কত তাপ্পি মারা। তাপ্পি মারতে মারতে আসল জাহাজটা আর নেই। হাড় ক'খানা আছে। হাড়ের ভিতর যদি গুপ্তধন থাকে। তা থাকতেই পারে! তিনি এবং তাঁর গুপ্তধন—ভাবা যায় না।'

সুহাস জানে, ইস্পাতের চাদরে জং ধরে যায়। সমুদ্রের নোনাজলে চাদর খয়ে যায়। ফুটো ফাটা হয়ে যেতে পারে। ড্রাইডকে মেরামতির কাজ চলে। ইস্পাতের চাদর নতুন বসিয়ে দেওয়া হয়, রিপিট করা হয়। জাহাজ পুরনো হয়ে গেলে এসব করতেই হয়—তবে এই লক্করমার্কা জাহাজ এত পুরনো যে মেরামত করতে গিয়ে তাপ্পিমারা ছাড়া আর উপায় কি। জাহাজটা বড় বন্দরও ধরতে পারে না। ধরতে পারে না, না ধরতে দেওয়া হয় না। যেন পালিয়ে পালিয়ে ঢোকে, পালিয়ে পালিয়ে বের হয়ে যায়। জাহাজি আইনে এমন পুরনো জাহাজ তো কবেই বাতিলের পর্যায়ে পড়ে যাবার কথা—কেন যে বাতিল হচ্ছে না, তাও বোঝে না। বড় রহস্য।

আর তখনই দেখল, চার্লি বোট-ডেক থেকে তরতর করে নেমে আসছে। এখন আর তাকে অবাক করে দেবার জন্য জাহাজের দড়িদড়া ধরে একেবারে বোট-ডেক থেকে লাফিয়ে ফল্কায় নেমে আসে না। চার্লি এখন সিঁড়ি ধরেই নেমে আসে। তাকে উইনচে দেখতে পেয়েই হয়তো ছুটে এসেছে। পরনে সেই বয়লার সুট, হাতে দস্তানা চামড়ার। পায়ে কেডস জুতো এবং তার সর্বাঙ্গ বড় বেশি ঢাকা। এই ঠাণ্ডায় সে কাবু হলেও চার্লি বিন্দুমাত্র কাবু নয়। সাদা টুইলের বয়লার সুট চামড়ার মতো ঘাড় গলা শরীর ঢাকা।

সে এসেই হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'জানো কাল না, আর এক কাণ্ড। ম্যাককে কে সিঁড়ির মুখে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। ভাগ্যিস লাগেনি। কিছু একটা হলে কি যে হত!'

'কখন।'

'রাতে।'

'কে ঠেলে ফেলে দিল!'

'সেই তো, কে যে ঠেলে ফেলে দিল!'

ম্যাক চুপচাপ। সে হাঁ হুঁ কিছু বলছে না। সে উইনচের ভিতর মাথা গলিয়ে দিচ্ছে। উইনচের আড়ালে ফাইভার অর্থাৎ ম্যাক যে আড়ালে লুকিয়ে শুনছে চার্লি বিন্দুমাত্র তা টের পেল না।

জাহাজ ছাড়তে ছাড়তে সাঁঝ লেগে যাবে।

নিউপ্লিমাউথ বন্দরে চার পাঁচটি জাহাজ জেটিতে ভিড়তে পারে, জেটি না পেলে বয়াতে বাঁধা থাকে জাহাজ। জেটি খালি হলেই বয়াতে বাঁধা জাহাজটা জেটিতে ভিড়বে।

বন্দরটা দেখতে কিছুটা হ্রদের মতো, দু-দিকে তার বালিয়াড়ি এবং পাহাড়—পিছনের দিকে বড়

বড় বোলডার ফেলে সমুদ্র থেকে আলগা করে নেওয়া হয়েছে—সমুদ্রের ঢেউ সেই সব বোলডারে এসে আছড়ে পড়ছে—ভিতরে ঢেউয়ের কোনও তাণ্ডব নেই। আসলে বোলডার ফেলে কৃত্রিম বাঁধের সৃষ্টি করে এই বন্দরটি গড়ে তোলা হয়েছে। ডেকে দাঁড়ালে সামনে জেটি। জেটি পার হয়ে একদিকে নির্জন বালিয়াড়ি, জেটি ধরে কিছুদূর হেঁটে গেলে সিম্যান মিশন। মিশন পার হয়ে ট্রাম ডিপো। শহরটা পাহাড়ের উপত্যকাতে—অধিকাংশই কাঠের বাড়ি লাল নীল রঙের। সামনে ফুলের বাগান। বড় বড় গোলাপ এবং তুচ্ছ করার মতো ডেইজি ফুল।

চার্লির খুব ইচ্ছে ছিল, বুনো ডেইজি ফুল সুহাসকে দেখায়। বুনো ফুল যে এই সব দামি গোলাপ কিংবা ডেইজি ফুলের চেয়ে অনেক বেশি মহার্ঘ সুহাসকে না দেখাতে পারলে শান্তি পাচ্ছিল না। সে জাহাজে উঠে এসে সুহাসকে নানা বর্ণের বুনো ফুলের খবর দিয়েছে। চার্লির এই সব বুনো ফুলের প্রতি কেন যে এত আগ্রহ সুহাস বুঝতে পারে না। পিকাকোরা পার্কে নানা কিসিমের বুনো ফুলও আছে—যেমন গ্রেপেডেড কৌরি ফুলের খোঁজ পেয়েছে এখানে। রাফ ব্লেজিং স্টার দেখে তো সুহাস সত্যি অবাক। গাছগুলি পাট গাছের মতো, তবে বেশ লম্বা পাতা, ঠিক সবুজ রঙের নয়, নীল রঙের। ফুল হলুদ রঙের। সূর্যমুখী ফুলের মতো দেখতে। তবে সূর্যমুখীর অনেক পাপড়ি—এতে এত পাপড়ি নেই—কিছুটা হালকা আর নরম—সুহাস হাত দিয়ে দেখতে গেলেই হা হা করে উঠেছে চার্লি—'আরে করছ কি। হাত দিলেই পাপড়ি সব ঝরে যাবে। বড় সোহাগি ফুল। ধোরো না। ফুল দেখতে হয়, ছোঁওয়ার যে এত কি দরকার তোমার বুঝি না বাপু।'

পিকাকোরা পার্কে ঢুকলেই জঙ্গল এবং রাস্তা। দু-পাশে রাজ্যের সব বুনো ফুলের চাষ, মাঝে মাঝে সবুজ ঘাসের চত্বর—সবুজ ঘাস—তবে চার্লি বলেছে, 'এগুলি ঘাস মনে করার কোনও কারণ নেই, এও এক ধরনের বুনো ফুল। বোতাম ফুলের মতো গুচ্ছ গুচ্ছ—এবং চত্বর জুড়ে তার চাষ। সহজেই গিয়ে বসা যায়—মখমলের গদির মতো বসলে দেবে যেতে হয়। সে দেখেছে চার্লি তাকে নিয়ে পার্কের এ-মাথা ও-মাথা ঘুরেছে, কতরকমের বুনো ফুল আছে তাও বলেছে—দু হাজার রকমের তো বটেই। তার ঠাকুরদা সামান্য একজন চাষি থেকে এই বুনো ফুলের ব্যবসা করে প্রায় ছোটখাটো ধনকুবের হয়ে গিয়েছিলেন তাও সুযোগ পেলে বলেছে।

একদিন তো অবাক। আরে সামনে যেন আগুন ধরে গেছে এমন মনে হয়েছিল—অন্তত কাছে না গেলে সে টেরই পেত না, আগুন নয়, ফুল।

চার্লি বলেছিল, 'টল ব্লেজিং স্টার।' কিছুটা ঝুলঝাড়ার বাঁশের মতো লম্বা। তবে বাঁশের শুধু ডগায় নয়, গোটা গায়েই গুচ্ছ গুচ্ছ পাটের লাছি রং করে যেন বেঁধে রাখা হয়েছে। হাওয়া দিলে নুয়ে পড়ে। তিন চার একর জুড়ে এই ফুলের সমারোহ দেখলে প্রথমে মনে হতেই পারে সারা মাঠ জুড়ে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে।

চার্লি নানা বন্দরে পাহাড়-টাহাড় পেলেই উঠে যেত তাকে নিয়ে। বুনো ফুল দেখাবার এত আগ্রহ কেন চার্লির সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। চার্লি কি মনে করে সে যা ভালবাসে, সে যাতে আগ্রহ বোধ করে সুহাসও তাই ভালবাসবে, আগ্রহ বোধ করবে। সে কোনও বুনো ফুল দেখে আগ্রহ প্রকাশ করলে চার্লি বাচ্চার মতো তার হাত টেনে বলবে, 'আরে তোমাকে বুনো ডেইজি দেখাতেই পারলাম না। কি যে খারাপ লাগছে।'

তারা কৌরিপাইন গাছগুলির নিচে বসে ঠিক করত—কোনদিকে যাওয়া যাবে—অর্থাৎ পার্কটার নানা পাথর, এবং গভীর বনজঙ্গলে যেন ফুলটা লুকিয়ে আছে। ফুলটা ফুটে আছে কোথাও, তবে কোথায়, তারা ঠিক খুঁজে পাচ্ছে না। চার্লি বিশ্বাসই করতে পারত না, এত বুনো ফুলের সংগ্রহ আছে পার্কটায় অথচ বুনো ডেইজি নেই কেন। চারপাশে আলোর ছড়াছড়ি—মানুষজনেরও ভিড়। ইতস্তত সব রেস্তোরাঁ পাব, ফল বিক্রির দোকান, জুয়া খেলার ব্যবস্থা সবই আছে। বুনো ডেইজি ফুল খুঁজতে গিয়ে একটু বেশি রাতই হয়ে গিয়েছিল। বাবা জানেন, সুহাস সঙ্গে আছে। সুহাস সম্পর্কে বাবার কি ধারণা সে ঠিক বুঝতে পারছে না। নেটিভ ছেলেটির তিনি খোঁজখবরও নিয়েছেন। এমনকি ফাইভারকে ডেকেও সুহাস সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছেন। সারেঙও বলেছে, খুবই মাথাঠাণ্ডা ছেলে। কাজকর্মে

আগ্রহ আছে খুব। তবে মনে হয় ভীতু স্বভাবের। একা বন্দরে নেমে যেতে সাহস পায় না। তা ছেলেমানুষ, সাহস না পেতেই পারে।

চার্লি যে খুব শান্তস্বভাবের নয়, এবং পারিবারিক রুচিবোধ চার্লিকে কিছুটা অহংকারী করে রেখেছে বাবা ভালই জানেন। দেরি হয়ে যাওয়ায় খুব চিন্তার কারণ হতে পারে চার্লির মনেই হয়নি। কিন্তু কে যে তাকে অনুসরণ করছে তাই সে বুঝতে পারছে না। কেন এই অনুসরণ—যদি তার ছদ্মবেশ কেউ খুলে দিতে পারে এ জন্য যে তার পরিবারের লোকজন কোনও ষড়যন্ত্র করছে না, তাও সে সঠিক জানে না! সে সারারাত এ-সবই ভাবছিল। অনুসরণকারী কখনই খুব কাছে আসে না, দূরে থাকে। এবং রাত হয়ে গেলেই তাকে দেখতে পায়, অস্পষ্ট আলো আঁধারে সে উঁকি দেয়, এবং সুযোগ বুঝে অদৃশ্য হয়ে যায়। বুনো ডেইজি ফুল খুঁজতে গিয়ে এটা তার মনে হয়েছে, তাড়াতাড়ি ফিরে আসা উচিত ছিল জাহাজে। কিন্তু সময় পাবে না, তারপর তারা কোথায় যাবে তাও জানে না। পিকাকোরা পার্কের গাছগাছালি সম্পর্কে একটি বইও সে কিনেছে, তাতে বিস্তারিতভাবে লেখা আছে সব। বুনো ডেইজি ফুলও দেখা যায়—তবে খুব কালেভদ্রে। এখানকার জল হাওয়া ঠিক সহ্য হয় না বলে গাছ বাঁচিয়ে রাখা যায় না।

আসলে সেই বন্দর শৈশব এবং পারিবারিক গির্জা এবং সমাধিক্ষেত্রটি তার খুবই প্রিয়। বিশাল এক পাহাড় এলাকা কিনে ঠাকুরদা নিজের পছন্দমতো বুনো ফুলের চাষ করে গেছেন। সকালে বিকেলে—সেই বনভূমিতেই অধিকাংশ সময় তার কেটে গেছে। সে লাফিয়ে পার হয়ে যেত বৃষ্টির জমা জল কিংবা কাঁটা গাছ। সে ফুল তুলতেও ভালবাসত। বেটসি দূরে বসে তাকে সব সময় পাহারা দিতেন। বেটসি ছিলেন পরিবারের সবচেয়ে বিশ্বস্ত পরিচারিকা।

রাফ ব্লেজিং স্টার ফুলের সঙ্গে টল ব্লেজিং স্টার ফুলের তফাত কত তাও সে বুঝিয়েছে সুহাসকে। সুহাসের মাঝে মাঝে ধৈর্যচ্যুতি যে না ঘটত তা নয়—বিরক্ত হত। ভাবত হয়ত চার্লি বুনো ফুলের নামে পাগল, শহরটার কোথাও ঘুরে দেখাই হল না। বংশীদা, মুখার্জিদারা সিম্যান মিশনেই পড়ে থাকত। কাঁড়ি কাঁড়ি বিয়ার গিলত, আর যে যেমন পারে—যেমন মুখার্জিদা ভাল মাউথ অর্গান বাজায়, সুবঞ্জন বাউল গান গাইতে পারে, তারা দুজন তো ডায়াসে উঠে নেচে গেয়ে নাবিকদের আমোদ-আহ্লাদেরও সঙ্গী হয়েছে। চার্লিকে নিয়ে একদিনই গিয়েছিল মিশনে। চার্লির একদম ইচ্ছে নেই, তবু সুহাস জোরজার করলে না গিয়ে পারেনি। সেদিন একটা লোক অদ্ভুত সব ভেল্কি দেখাচ্ছিল—সে বলছে, আর কে আসতে চান। আসুন, উঠে আসুন। বোধহয় চার্লি এবং সে দুজনই প্রায় বলতে গেলে বাচ্চা নাবিক জাহাজের। নজর এড়ানো কঠিন। লোকটার ভেল্কি দেখানো শেষ, সে কখনও রুমাল থেকে আট দশটা কবুতর উড়িয়ে দিচ্ছে, কখনও দু-জগ জল খেয়ে সবটা আবার উগরে দিচ্ছে—এই সব খেলা থেকে একসময় একজন নাবিককে ডেকে তুলে নিয়ে গিয়ে যা নাস্তানাবুদ করল—এতে চার্লি কোনও বিপদের গন্ধ পেতে পারে—চার্লি বলেছিল, লোকটা হিপনোটাইজ করতে পারে। তোমাকে ডাকলে কিন্তু যাবে না।

সুহাস যাবে না ঠিক করেছিল, কিন্তু যখন একজন নাবিককে যা খুশি তাই করাচ্ছে, কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে বললে তাই করছে, শিস দিতে বললে শিস দিচ্ছে, নিলডাউন হতে বললে নিলডাউন হচ্ছে, তখন সুহাসের মনে হয়েছিল, নাবিকটি আসলে লোকটিরই কোনও সাকরেদ হবে। একই জাহাজে কাজ করে হয়তো। শিখিয়ে পড়িয়ে না নিলে কেউ এমন তামাসা দেখাতে পারে বিশ্বাস হয় না। কান ধরে জিভ বার করে ডায়াস থেকে নেমে দর্শক আসনগুলি পার হয়ে আবার উঠে এলে হাসির ফোয়ারা! এতে সুহাস অপমান বোধ করেছিল, এবং সেও উত্তেজিত হয়ে ডায়াসে উঠে যাবার সময় দেখেছিল চার্লি তার হাত চেপে ধরেছে। বলেছে, 'একদম যাবে না। চল বলছি। হাসির খোরাক হতে খুব ভাল লাগে বুঝি।' সেই একদিনই মিশনে, আর তার যাওয়া হয়নি।

চার্লি রাস্তায় বলেছিল, 'লোকটাকে যেন কোথায় দেখেছি?'

'কোথায় দেখেছ মনে করতে পারছ না। তোমার কি হয়েছে বল তো। কেমন মাঝে মাঝে চুপসে যাও। সিম্যান মিশন থেকে বের হয়ে কোথায় যাবে ঠিক করতে পারছ না।'

'আরে না, ভাবছিলাম, ভাগ্যিস লোকটার পাল্লায় পড়িনি।'

'পড়লে কি হত?'

'পড়লে কান ধরে নিলডাউন হতে হত। তোমার সত্তাকে গিলে ফেলত। হিপনোটাইজ সাংঘাতিক কিছু তা জান। দেখলে না, লোকটাকে যেই বলল, গায়ে জামা কেন?'

সুহাস বলল, 'দিলে না তো যেতে। আসলে লোকটাকে সে জাহাজ থেকেই ধরে এনেছে। শিখিয়ে পড়িয়ে তামাসা দেখিয়ে গেল। সবাইকে বোকা বানিয়ে গেল। কাল একবার আসবে নাকি?'

'না। আমার ভাল লাগছে না। দেখলে না, জামা গায়ে কেন, কি গরম। জামা গায়ে রাখা যায়! সঙ্গে সঙ্গে দেখলে না নাবিকটি এই ঠাণ্ডায় জামা খুলে ফেলে ওর পায়ের কাছে রেখে দিল। হিপনোটাইজড না হলে এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কেউ জামা খুলে ফেলতে পারে!'

সুহাস ট্রাম রাস্তার দিকে হাঁটছিল। কিন্তু চার্লি আর এগুতে সাহস পায়নি। বলেছিল, 'চল জাহাজে ফিরে যাই।'

সুহাস বাধ্য হয়েছিল বলতে, 'তুমি না হয় ছবি আঁকতে বসবে। তোমার অকুপেশান যে কতরকমের ভাবতে গেলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। সারাদিন ছবি এঁকেই সময় কাটিতে দিতে পার। আমি কি করব।'

'দেখবে বসে বসে।'

অগত্যা সে শেষে চার্লির সঙ্গে জাহাজেই ফিরে এসেছিল আব আসার সময় রাস্তায় সহসা চার্লি যে কেন এমন বিদ্‌ঘুটে কথা বলল, সে বুঝল না।

'সুহাস জামা খুলতে বললে তুমি খুলতে?'

'কেন খুলতে যাব। জামা খুলে ফেললে আমার ওস্তাদি থাকল কোথায়। তবে তো আমিও তাব অনুগত দাস হয়ে যেতাম। হিপনোটাইজড হয়ে যেতাম। অত সোজা না বুঝলে।'

'ঠিক খুলিয়ে ছাড়ত! ভাগ্যিস যেতে দিইনি। কে জানে—তোমার হেনস্থা দেখে আমিও না ডায়াসে উঠে যেতাম।'

চার্লির মুখে আশ্চর্য হতাশা ফুটে উঠেছে কথাগুলি বলতে গিয়ে।

'কি হত তা হলে। চণ্ডীপাঠ অশুদ্ধ হয়ে যেত।'

'কি হত তোমাকে বোঝাব কি করে। কি হত না তাই বল।'

'কি করবে জাহাজে ফিরে। চল বেলাভূমিতে গিয়ে বসি। কাছেই তো জাহাজ। এত ভয় পাও কেন বুঝি না।'

'আমার কিছু ভাল লাগছে না।'

চার্লি হাঁটছিল জাহাজের দিকে। সিম্যান মিশন থেকে বের হবার সময় তারা দুটো আপেল কিনেছিল। সুহাস দাঁতে কামড়ে আপেল ভেঙে নিচ্ছে। চার্লির যেন খেয়ালই নেই—সে আপেল খাচ্ছে না, এক হাত পকেটে। চার্লির মিষ্টি মুখ ব্যাজার হয়ে গেলে বড় খারাপ লাগে। তার দিকে মাঝে মাঝে চার্লি এমন অপলক তাকিয়ে থাকে যে কেমন বিব্রত বোধ করে সুহাস। লোকটাকে খুবই চেনা লাগছে চার্লির। কেন লাগছে, লাগলে চিনতে পারছে না কেন। জাহাজের নাবিকরা বিকেল হলেই নেমে যায়। জাহাজ আসছে, ভিড়ছে, মাল খালাস করছে, জাহাজ আবার চলে যাচ্ছে। জেটিতে নামলে তো লোকারণ্য। রাস্তায় দেখা কোনও লোক হতে পারে—আর এই নিয়ে এত দুশ্চিন্তারই বা কি আছে। সেও মনে করার চেষ্টা করল, কোনও গুঁফো লোকের কথা মনে করতে পারে কি না। গোঁফ-জোড়া এত বিশাল যে দু-দিকে দুটো সরীসৃপের লেজ যেন ঝুলে পড়েছে। সে শত চেষ্টা করেও কারও সঙ্গে লোকটার মিল খুঁজে পেল না। পিকাকোরা পার্কের ক'জন প্রহরী গোঁফ রাখে—জাহাজের মেসরুম মেট গোঁফ রাখে, মাউরি উপজাতীয় দুজন যুবক, এই জেটি থেকে মাছ ধরতে যায়, তাদেরও লম্বা গোঁফ আছে। তা গোঁফ থাকলেই চেনা চেনা মনে হবে কেন—চেনা চেনা মনে হলে চিনতে পারছে না কেন, এ-ভাবে কাঁহাতক চুপচাপ হাঁটা যাবে। সে রেগে গিয়ে বলেছিল, 'চার্লি, তোমাকে নিয়ে আর পারা যাবে না।'

সেদিনই কেবিনে চার্লি বলেছিল, 'এস, তোমাকে বুনো ডেইজি ফুল দেখতে কেমন, ছবি এঁকে দেখাই।' চার্লির ছবি আঁকার হাত সত্যি ভাল।:কিন্তু ছবি আঁকতে গিয়ে সে সেই ওস্তাদ গুঁফো লোকটির মুখ এঁকে ফেলল। হুবহু এক। তারপর গোঁফের উপর সাদা রং বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'চিনতে পারছ?'

'এ তো তোমার বাবার মুখ মনে হচ্ছে!'

চার্লি খেপে গেল। 'আমার বাবার মুখ!'

'না মানে কপালের দিকটা তোমার বাবার মতো, চোখের নিচেটা সেকেন্ড ইনজিনিয়ার ববের মতো।'

চার্লি কেবিনের দরজা ঠাস করে খুলে চিৎকার করে উঠেছিল, 'বের হয়ে যাও। বের হয়ে যাও বলছি। ইয়ারকি মারা হচ্ছে।'

সুহাস দু-কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছিল, 'ঠিক আছে যাচ্ছি। আমি নিচে নেমে গেলাম। দেখি কাউকে যদি সঙ্গে পাই—জাহাজে বসে থেকে কি হবে? আমার খোঁজে কিন্তু আবার ফোকসালে ছুটবে না। গেলে পাবে না। সারেঙ শুনলে গোলমালে পড়ে যাবেন, ছেলেটা একা একা কোথায় বের হয়ে গেল! তুমি বা অন্য কেউ সঙ্গে না থাকলে তার ধারণা, রাস্তা চিনে ফিরতে পারব না। বুড়ো মানুষটাকে চিন্তায় ফেলে দেবে না।'

'নামবে না। জাহাজ থেকে নামবে না।' কড়া হুকুম চার্লির।

সে যে কি করে। আসলে সে চার্লির মর্জি না হলে, জাহাজ থেকে নেমেও যেতে পারবে না। ফোকসালে গিয়ে কি করবে! একা একা কাঁহাতক ভাল লাগে।

সে খেপে গিয়ে বলেছিল, 'আঁকতে গেলে বুনো ডেইজি ফুল, এঁকে ফেললে একটা গুঁফো লোক। চমৎকার হাত তোমার মাইরি।'

চার্লি কেন যে রাগে ফুঁসছে বুঝতে পারছে না। সে তো চার্লির বাবাকে অপমান করতে চায়নি। যা মনে এসেছে, অকপটে বলেছে। তবে থুতনির দিকটা না ববের মতো না কাপ্তানের মতো। সে শুধু বলল, 'কোথাও গোঁজামিল আছে তোমার ছবিটাতে। সে যাই হোক আমি ইচ্ছে করে তোমার বাবাকে অপমান করিনি। অকপটে বলছি, আমার মনে হয়েছে কোথায় যেন কপালের দিকটা তোমার বাবার মতো। ম্যাককে ডেকে জিজ্ঞেস করতে পার—সবার চোখ সমান নয়, কে কি দেখে ফেলবে, আবিষ্কার করে ফেলবে বলা কঠিন। চোখের দোষও হতে পারে। আমি ঠিক নাও বলতে পারি।'

তারপরই সুহাস বলেছিল, 'দেখি ম্যাক, আছে কি না।'

চার্লি আর পারল না। রেগে মেগে সুহাসকে কেবিনের ভিতর টেনে নিয়ে গেল। দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে থাকল।

'আমাকে নিয়ে সবাই মজা করতে চায়। আমাকে কেউ মানুষ ভাবে না। আমি মরে যাব দেখো।'

আরে এসব আবোল-তাবোল কি বকছে চার্লি! সুহাস পড়ে গেল মহাফাঁপরে। সে মজা করবে কেন। ম্যাক মানে ফাইভারকে ডেকে দেখালে, সে বলে দিতে পারত হয়তো আঁকা ছবির মুখটা কার মতো দেখতে। সে মজাও করেনি, ইয়ার্কিও মারেনি। তারপরেই মনে হল, অসময়ে ম্যাক তার কেবিনে থাকবে কেন। তার বুক পকেটে যতই গির্জার ছবি থাকুক, তার স্ত্রীর ছবি থাকুক, সে তার বন্দরের বান্ধবীকে নিয়ে যে মজা লুটতে বের হয়ে গেছে তাতে কোনও সংশয়ের অবকাশ নেই। সে অগত্যা বসে থাকল।

চার্লি ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কাঁদল কিছুক্ষণ। তার অনুযোগ, তাকে কেউ বুঝতে চায় না। কেউ তাকে ঠিক বোঝে না। সে বুনো ডেইজি ফুল এঁকে দেখাতে পারত, কিন্তু লোকটাকে চেনা চেনা মনে হওয়ায় একবার এঁকে দেখল, সে কে, হুবহু এই এঁকে ফেলার যে জন্মগত প্রতিভা চার্লির আছে ছবিটা দেখলে অবিশ্বাস করার কারণ নেই। তারপর গোঁফ জোড়া মুছে দিতেই, মুখটা এমন গোঁজামিল হয়ে যেতে পারে সুহাসও ভাবতে পারেনি। আসলে কিছুক্ষণের দেখা কোনও মানুষকে হুবহু মনে রাখারও কারণ নেই। আর এই নিয়ে এত অশান্তি হবে জানলে, কিছুতেই চার্লির কেবিনে ঢুকত না।

চার্লি নিজেই পরে উঠে গেছিল। বেসিনে মুখ ধুয়ে তোয়ালে নিয়ে মুখ মুছেছিল। বড় সন্তর্পণে সে তার তোয়ালে দিয়ে কিছুক্ষণ মুখ ঢেকে রেখেছিল—ভিতরে চার্লির এত কি কষ্ট সুহাস বুঝতে পারে না। পলকে হাসতে পারে, কাঁদতে পারে এটা সে আগেও টের পেয়েছে। কিন্তু লোকটাকে নিয়ে এত মাথা খারাপ করার কি হেতু থাকতে পারে সে কিছুতেই বুঝতে পারছিল না।

তোয়ালেটা মুখ থেকে সরাতেই সুহাস দেখল, চার্লি হেসে ফেলেছে। তবে কি এই কান্না তার মায়া কান্না। এও তো আর এক বিভ্রম।

সে বলল, 'আমি উঠছি চার্লি।'

'বোস না।'

'না যাই।'

চার্লি সার্ভিস রুমে রিঙ করছে। তার মানে এখুনি কাপ্তানবয় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসবে।

এলও।

চার্লি বলেছিল, 'দু-কাপ কফি।' তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'কিছু খাবে?'

সে ঘাড় নেড়েছে।

চার্লি রং তুলি দিয়ে ছবিটা মুছে দিল। বলল, 'আমার যে কি হয়। লোকটাকে কেন এত ভয় পেলাম—সে তো সত্যি খেলা দেখাতে পারে। সত্যি হিপনোটাইজ করতে পারে। মজার খেলা। অথচ লোকটাকে নিয়ে আমার দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না। নির্দোষও হতে পারে। তোমাকেও কষ্ট দিলাম।'

'এই দ্যাখ', বলে সে আর একটা কাগজ লকার থেকে বের করে ইজেলে লটকে দিল। পিন পুঁতে দিল—তারপর বলল. 'বুনো ডেইজি ফুল আঁকছি না। মাথাটা পরিষ্কার নেই। ঠিক আঁকতে না পারলে ফুলটাকে অসম্মান করা হবে। বরং দেখ,' বলে সে কয়েকটা আঁচড় বুলিয়ে দিল তুলিতে। জল রং। বড় সবুজ একটা গোল কুমড়োর মতো কি আঁকছে। কুমড়োর গায়ে শুঁয়ো পোকার মতো লোম এঁকে দিচ্ছে—সবুজ নীল এবং ব্রাউন কালার দিয়ে সে যে একটা ক্যাকটাস আঁকছে সুহাসের বুঝতে কষ্ট হল না। তারপর তুলি জলে ভিজিয়ে লাল রং দিয়ে কুমড়োটার মাথায় লাল হলুদ মেশানো একটা পদ্ম ফুল এঁকে ফেলল। তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ব্যারেল ক্যাকটাস।'

'বাঃ দারুণ তো দেখতে।' সুহাস সত্যি অবাক হয়ে গেছে ক্যাকটাসটা দেখে।

চার্লি বলল, 'বড় দুর্লভ জাতের ক্যাকটাস। বড়লোকদের কাছে আমার ঠাকুরদা শুধু এই ক্যাকটাস বিক্রি করে লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়েছেন। আন্তরিকতা থাকলে জান সুহাস, মানুষ সব পারে। সামান্য খামার তার—গরু মোষ ভেড়া খামারে, কিছু টিলার মালিক তিনি—এলাকাটা ঊষর বলে শুধু ঘাস জন্মায়। ফসল ফলে না—টিবিগুলো বছরের অধিকাংশ সময় পাথর আর বুনো লতাপাতায় ঢাকা। তাঁর কি মনে হত কে জানে, ঘোড়ায় চড়ে কখনও তিনি দূর দূর পাহাড় অঞ্চলে চলে যেতেন—যেখানে যে দুর্লভ ফুল খুঁজে পেয়েছেন, সংগ্রহ করেছেন। ফুল ফুটিয়েছেন—ফুল থেকে ফল, ফল থেকে বীজ, টিবিগুলিতে সেই বীজ ছড়িয়ে দিয়ে এমন এক আশ্চর্য বনভূমি গড়ে তুলেছিলেন, দেখলে দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে না যাওয়ার উপায় নেই। এবং এই করে তাঁর বুনো ফুল আর ক্যাকটাসের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ছিল। তখন জানো, যুদ্ধ চলছে। নিষ্ঠুর যুদ্ধ সারা পৃথিবীকে গ্রাস করছে। মিত্রপক্ষের সেনারা হটছে। মার খাচ্ছে। সলোমন দ্বীপপুঞ্জ থেকে নিউগিনির সব দ্বীপগুলি জাপানিরা দখল করে নিয়েছে। আর আমার ঠাকুরদা খুঁজে বেড়াচ্ছেন—কোথায় স্নো বাটার কাপ ফুল পাওয়া যেতে পারে। কোথায় স্মুদ অ্যাসটার জন্মায়—কোথায় পাওয়া যাবে প্রেইরি ওয়াইলড রোজ, কোথায় পাওয়া যাবে ডেজার্ট স্পুন। আরিজোনা অঞ্চলে তিনি ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। মানুষটা যখন তাঁর পাহাড়, টিলাকে সাজিয়ে ফেলছেন—যুদ্ধ তখন টোকা মারছে ঘরের দরজায়। মানুষটার হুঁশ নেই।'

সুহাস অবাক হয়ে শুনছিল। এই এক স্বভাব চার্লির, কথা বলতে শুরু করলে থামতে জানে না। কে বলবে চার্লি পলকে কাঁদতে পারে হাসতে পারে। তাকে খুবই গম্ভীর দেখাচ্ছিল। তার ঠাকুরদার গল্প বলার সময় সে কি যে ভাবত, বোধ হয় আরও কিছু মনে করার চেষ্টা করত।

'বেটসি আমাকে ঠাকুরদার গল্প বলত, কত গল্প তাঁর। একবার আলপাইন অঞ্চলের দুর্লভ জাতের

কচ্ছপ সংগ্রহ করতে গিয়ে জীবন বিপন্ন করে তুলেছিলেন। মানুষ এই করে একজন ছোটখাটো ধনকুবের হয়ে যেতে পারে ভাবা যায় না। দুর্লভ জাতের এই বুনো ফুলের চাষ তুমি আমাদের দেশের উষর অঞ্চলগুলি ঘুরে বেড়ালেই টের পাবে সুহাস। গাড়ি ছুটিয়ে টেকসাসেব গ্রামাঞ্চল পার হয়ে যাবার সময় দেখতে পাবে ব্ল্যাক-আইড সুসান ফুলের ছড়াছড়ি। তোমাকে তারা দুলে দুলে অভিবাদন জানাচ্ছে। কী যে মজা লাগে না। ঠাকুরদার কথা ভেবে তখন আমার চোখে কেন যে জল চলে আসে। আমি কি বোকা না, সুহাস! কত অকারণে কাঁদতে পারি।'

'না না, অকারণে কারও কান্না পায় না। আমি তা ভাবি না। তোমার ঠাকুরদা সত্যি গ্রেটম্যান বলব।'

চার্লি তুলি জলে ভিজিয়ে খুব যত্নের সঙ্গে শুকিয়ে নিচ্ছে। সে তার ইজেল ভাঁজ কবে দেয়ালেব হুকে সেঁটে দিচ্ছে। কাজগুলি এত যত্নের সঙ্গে করে যে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। তারই ফাঁকে ফাঁকে সে ঠাকুরদার গল্প করছিল। গ্রেটম্যান বলায় সে খুবই খুশী। আর জাহাজে কে আছে, চার্লিব এত কথা মন দিয়ে শুনবে! সুহাস টের পায়, এ-জন্যই চার্লি তাকে এত পছন্দ করে। নিজের সুবিধা অসুবিধার কথাও বলে ফেলে। জাহাজে কাকে পছন্দ করে, কাকে করে না তাও অনায়াসে বসে ফেলতে পারে।

সেই চার্লি ঠাকুরদার গল্প বলতে শুরু করলে থামতে চায় না।

'তোমার ঠাকুরদার তখন কত বয়েস?'

'তা অনেক, আমি ঠিক জানি না।'

'তোমার বাবা তখন কোথায়?'

'বাবা কাকাকে ঠাকুরদা একদম পছন্দ করতেন না।' তারপর চার্লি কি ভাবল কে জানে! তার দিকে এক পলক তাকিয়ে কি বুঝল কে জানে। পারিবারিক কথা একজন নেটিভ ছোকরাকে বলা ঠিক হবে কি না তাও ভাবতে পারে। কিন্তু সুহাস জানে, চার্লির কোনও দ্বিধা থাকার কথা না। বিশ বাইশ মাসে তার অনেক প্রমাণ সে পেয়েছে। অত্যাচারও কম করেনি। সে কথা বলত না বলে রাগে ফুঁসত। একজন সাহেব ছোকবার সঙ্গে সে কি কথা বলবে! তা ছাড়া কাপ্তানের পুত্র—এমনিতেই নানা আতঙ্ক—পান থেকে চুন খসলেও বিপদ—কে চায় আগ বাড়িয়ে বিপদ ডেকে আনতে।

'জান, আমাব বাবা কাকা ঠাকুরদার দুঃখ বুঝল না। ক্যাথলিকরা একটু বেশি পিউরিটান হয। তাঁব নিজস্ব গির্জা, সমাধিক্ষেত্র সব কলুষিত হোক চাইতেন না।'

'ধর্মস্থান কেউ কখনও কলুষিত করতে পারে! কি জানি, কি-ভাবে করতে পারে জানি না। ঈশ্বরকে কেউ ছোট করতে পারে!'

চার্লি মাথা নিচু করে বলেছিল,—'বাবা কাকা দুজনেই ডিভোর্সি বিয়ে করেন। তোমাকে বলা ঠিক হল কি না জানি না। কিন্তু সুহাস, তোমাকে ছাড়া কাউকে বলতেও পারব না।'

'আরে না না।' সুহাস উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল, 'চল বাইরে গিয়ে বসি। গুঁফো লোকটাকে দেখে তোমার মন ভাল নেই।'

'বাবা কাকাকে ঠাকুরদা অধার্মিক ভাবতেন।'

সুহাস দরজা খুলে বের হবার মুখে বলল, 'ডিভোর্সি বিয়ে করলে ভাবতেই পাবেন। পিউরিটানদের এই একটা দোষ বুঝলে! তাঁরা সহজে কিছু মেনে নিতে পারেন না। আমার পিসিকেও দেখেছি—কিছুতেই স্বপাক ছাড়া খাবেন না। বিধবা মানুষ। অসুস্থ। তবু তিনি তিনবার স্নান কববেন। সব সময় অশুচিভাব। দরজার বাইরে যেন তাঁকে অশুচি করার জন্য সব মানুষজন উঠে পড়ে লেগেছে।'

চার্লি বোধ হয় এতে কিছুটা মর্মাহত। সে যে ঠাকুরদাকে কিছুতেই ছোট করতে চায় না। সে হঠাৎ বলে বসল. 'তাই বলে এক গাদা ছেলেমেয়ে নিয়ে হাজির হলে ঠাকুরদার মনে হবে না, তার সুপুত্র দুটি ডাইনির পাল্লায় পড়েছে!'

'তোমার ঠাকুরদা তাই বুঝি ভাবতেন!'

'ভাববেন না, তাঁর এত যত্নে গড়ে তোলা স্বপ্ন—দুটি ছেলেই তছনছ করে দিলেন! বাবা তো রেগে

চলেই গেলেন ওয়েলসে! বউ ছেলেপিলে পড়ে থাকল দেশে।'

'তুমি তখন কোথায়?'

আকাশের দিকে আঙুল তুলে বলেছিল, 'বোধহয় ওখানে।'

সুহাস বোট-ডেকে এসে পা ছড়িয়ে বসেছিল। বোটের আড়ালে বসায় সমুদ্রের ঠাণ্ডা হাওয়া সরাসরি তার গায়ে লাগছে না। চার্লি তার পাশে বসে আকাশ দেখছে। একটাও কথা বলছিল না। আকাশে নক্ষত্রমালা। আর শহরের বাড়িঘরের আলো দুজনকেই বড় বেশি অন্যমনস্ক করে দিয়েছিল।

চার্লি সহসা নির্জনতা ভেঙে দিয়ে বলেছিল, আমার কেউ নেই সুহাস। রেগে মেগে কিছু বলে ফেললে তুমি কিন্তু রাগ কোরো না।'

'কেন তোমার মা!'

'না, তিনি বেঁচে নেই। জন্মাবার দু-বছরের মধ্যেই তাঁকে হারিয়েছি। বাবা কার্ডিফে এলেন, মা আসতে রাজি হলেন না। তিনি ইস্ট টেকসাসে ক্যাডো লেকের এক বাগানবাড়িতে থেকে গেলেন। সেখানে বেটসি আমি আর মা। আমার বৈমাত্রেয় দিদিরা দাদারা নিজেব দিদিরা কোথায় যে কে ছিটকে পড়ল—কিছুই জানি না সুহাস!'

ধীরে ধীরে সুহাস টের পাচ্ছিল, চার্লির মধ্যে গোপন কষ্টের শেষ নেই। এবং এই সব দুঃখ কষ্ট সে একদম সহ্য করতে পারে না। যার এত প্রভূত সম্পত্তি সে কেন জাহাজে ঘুরে বেড়ায় তাও মাথায় আসে না। কিংবা কাপ্তান কেন দু-সফরেই তাকে সঙ্গে নিয়ে উঠেছেন তাও সে জানে না। চার্লির তো এখন লেখাপড়ার সময়—স্কুল, খেলাধূলা, ঘোড়ায় চড়া, গাড়ি করে হুসহাস বের হয়ে পড়া কত কিছুই যে চার্লির শোভা পেত—সে তা না করে জলে জলে ভেসে বেড়াচ্ছে।

শেষে যা বলল, তাতে সুহাস স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

চার্লি অত্যন্ত ক্লান্ত গলায় বলল, 'নিজের বলতে বেটসিকে জানতাম। জাহাজে আসার আগে তিনিও মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। তবে দুর্ঘটনা না খুন এটা এখনও আমার মাথায় আসছে না।'

সুহাস বলতে পারল না, খুন যদি হয়, কে খুন করেছে। তোমাদের দেশের আইন তো খুব জোরালো —পুলিশও খুব বিশ্বস্ত। তারা এই দুর্ঘটনার কোনও কিনারা করতে পারেনি!

কিন্তু সে কিছুই বলতে পারেনি।

আজ আবাব তাকে ডেকে নিয়ে চার্লি বলছে, ম্যাককে কে ঠেলে ফেলে দিয়েছে।

সুহাস যে কি কববে! সে তো একা এই জাহাজে। এমনিতেই কত উপদ্রব। তার উপর চার্লির বাড়তি সংশয় তাকে খুবই আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছে। তবু কেন যে, ভাবল, ম্যাকের কেবিনে তার যাওয়া দরকার।

সকালে ম্যাকের কেবিন খালি। ম্যাক নেই। বাইরে থেকে দরজা লক করা। ম্যাক নাও থাকতে পারে। তবে চার্লির ধারণা ছিল, ম্যাক সকালে উঠে হাঁটতে পারবে না। পায়ে জোর লেগেছে। হয়তো কেবিনেই শুয়ে আছে। সে যে পড়ে গেছে সিঁড়ি ধরে কেউ জানে না। সুহাসের ধারণা, তার পড়ে যাওয়াটা বিচিত্র নয়। মদ খেলে হুঁশ থাকে না। রোজই তো প্রায় ধরতে গেলে এক কাণ্ড। সেজেগুজে বিকেলে নেমে যায়। ফেরে অনেক রাতে। এসেই জাহাজের সিঁড়ির নিচে চিল্লাতে থাকবে—হাই কোয়ার্টার মাস্টার। হাই সুখানি।

কোয়ার্টার মাস্টার অর্থাৎ সুখানি যিনিই গ্যাঙওয়েতে পাহারায় থাকুন, ঠিক টের পান মক্কেল হাজির। তাকে তখন ধরে তুলে আনতে হবে। ধরে তুলে না আনলে সিঁড়ির নিচে জেটিতে দাঁড়িয়ে থাকবে। নয় ঘুরঘুর করবে। সিগারেট খাবে। আর যত জাহাজি খিস্তি আছে আওড়াবে। আর মাঝে মাঝেই হল্লা, হাই সুখানি। হাই কোয়ার্টার মাস্টার। তারপর যখন তাকে হাত ধরে তুলে আনা হবে, টলতে টলতে হ্যান্ডসেক করবে। বলবে, থ্যাঙ্ক ইয়ো গুডম্যান। ভেরি গুডম্যান। কিছুক্ষণ আগে

সুখানির বাপ মা উদ্ধার করেছে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে কে বলবে। তারপর কেবিনের দেয়াল ধরে ধরে দরজাটি খুলে ইঁদুরের মতো নিজের গর্তে লুকিয়ে পড়বে। এত গেলে যে সিঁড়ি ধবে উঠে আসার ক্ষমতা থাকে না। ইচ্ছে করলে যে পারে না তাও নয়, তবে আতঙ্কিত। যদি পড়ে যায়। সিঁড়ি থেকে পড়ে গেলে জাহাজের তলায়। যতই আষ্টেপৃষ্ঠে গিলুক—সে খেয়ালটি বাবুর ষোল আনা। সুহাস সকালে কাজে বের হয়ে এমন সাত পাঁচ ভাবছিল। ম্যাককে কেবিনে পাওয়া গেল না। সুহাস কি ভেবে বলল, মাতাল লোক পড়ে যেতেই পারে।

ম্যাকের কেবিনের দরজায় দাঁড়িয়ে সুহাসেব আরও মনে হল, ম্যাক হয়তো ফিরেই চার্লির কেবিনে ঢুকতে চেয়েছিল—মাতালদের স্বভাব সে জাহাজে উঠে ভালই টের পেয়েছে। তাকে ঠেলে কেউ ফেলে দিয়েছে খুবই অবান্তর কথা। চার্লিরও এটা বোঝা উচিত ছিল। থার্ড কিংবা ফোর্থ ইনর্জিনিয়ারেব ঘবে ঢুকেও মাতলামি করতে পারত। দরজা বন্ধ দেখে হয়তো বোট-ডেকে উঠে গেছে।

সে বলল, 'ম্যাক সুস্থ ছিল তো।'

চার্লি পকেট থেকে চিপিং করার হাতুড়ি বের করে নিচে ঠুকছিল। হাতুড়িটা একটু ভাব আলগা হয়ে গেছে। সে সুহাসের কথা যেন বুঝতে পারেনি।

'না, বলছিলাম, সুস্থ ছিল তো?'

'সুস্থ থাকবে না কেন।'

'তুমি দেখছি চার্লি জাহাজে থাক না। কিচ্ছু জান না মতো কথা বলছ।'

'আরে কাল ম্যাকের জন্মদিন গেছে। জন্মদিনে সে কিছু খায় না। সকালেই তো বলল, আজ আর বের হচ্ছি না। সারাদিন বাইবেল পড়ব। কত সুন্দর সুন্দর কথা বলল। বলল, গড ইজ নেভার উইকেড অর আনজাস্ট। দেখবে আমরা শিগগিরই হোমে ফিরে যাব।'

'তা হলে বলছ, কাল ম্যাক জাহাজ থেকে নামেনি!'

'তাইতো মনে হচ্ছে। মুখে গন্ধ টন্ধ পেতাম না।'

'যা চিজ, নেশা না করে থাকার পাত্র!'

চার্লির এই এক দোষ, তার কথায় সায় না দিলেই গুম হয়ে যায়। ম্যাক জন্মদিন পালন করেছে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে। সারাদিন ঘরে স্ত্রী ছেলেমেয়েদের ছবি সামনে রেখে বসে ছিল। সে জাহাজে, জন্মদিন এ-ভাবেই পালন করে থাকে। দেশেও। সেদিন সে সব ব্যাপারেই সাত্ত্বিক, সুহাসকে বিশ্বাস করতেই হবে।

'আর কি বলল?'

'বলল, লুক আপ দেয়ার ইনটু দ্য স্কাই, হাই এভার ইয়ো। বলল, গড ইজ অলমাইটি অ্যান্ড ইয়েট ডাজ নট ডেসপাইজ এনিওয়ান।'

'ম্যাক তো দেখছি সাধু সন্ন্যাসীদের মতো কথা বলছে। তাকে আমরা অপছন্দ করব কেন! একটু বেশি মাতাল ছিল না তো!'

'তার মানে!'

'মানুষ বেশি হতাশ হলে এ-সব কথা বলে। তখন মাথায় ঈশ্বরচিন্তা আসে। কিছু তো করার থাকে না। কিন্তু গেল কোথায়!'

'জানি না!'

'রাগ করছ কেন? এলে তাকে দেখতে, সেই নেই। নিচে নেমে যায়নি তো!'

তারপরই মনে হল, ওয়াচ ভাগ হয়ে গেছে। যে যার ওয়াচে হয়তো নেমে গেছে। জাহাজ বন্দরে ভিড়লে ওয়াচ ভেঙে দেওয়া হয়। জাহাজ সমুদ্রে ভেসে গেলে ওয়াচ শুরু হয়। অন্তত ইনজিন-জাহাজিদের ক্ষেত্রে এটাই নিয়ম। আটটা-বারোটায় ওয়াচ দিতে যদি নেমে যায় ইনজিন-রুমে! সে পোর্ট-সাইডের দরজা খুলে সিঁড়ির মুখে ইনজিন-রুমে ঝুঁকে দেখল। ম্যাককে দেখতে পেল না। সিঁড়ির নিচে বিশাল এলাকা জুড়ে ইনজিন সিলিন্ডার। অতিকায় দানবের মতো সিলিন্ডার। তার পেটের ভিতর থেকে থামের মতো বিশাল তিনটা পিস্টন রড নেমে গেছে। গ্রিজার রহমত তেল দিচ্ছে। কিন্তু ম্যাককে

দেখা গেল না। সে সিঁড়ির আর দু-ধাপ নিচে ঝুঁকে দেখল, সিলিন্ডার কলামে হেলান দিয়ে ম্যাক চোখ বুজে দাঁড়িয়ে আছে।

তারপরই মনে হল, ম্যাকের তো ইনজিন রুমে নামার কথা নয়। ওয়াচ ভাগ হলেও নিচে তার ডিউটি পড়ে না। তবে কারও হয়ে যদি ওযাচ দেয়। সুহাস দৌড়ে উঠে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ম্যাক এখনও ভগবত চিন্তা করছে। ওকে ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। ঈশ্বর চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটানো ঠিক হবে না। আমি যাচ্ছি।'

চার্লি দাঁড়িয়ে থাকল।

এটা চার্লির স্বভাব। চার্লি তার কথা ঠিক বুঝতে পারে না, নাকি, ঠিকই সব বোঝে। সে যে বিদ্রূপ করছে ম্যাকের ঈশ্বরচিন্তার ব্যাপারে ঠিকই টের পেয়েছে। ঈশ্বরের প্রতি দুর্বলতা কম বেশি সবারই থাকে। চার্লিরও আছে। জাহাজ যাচ্ছে মাটি টানার কাজে। মাটি মানে ফসফেট। অজস্র পাহাড়, দ্বীপ এবং লেগুনের ছড়াছড়ি কোরাল সি-তে। সমুদ্রটা নাকি কত জাহাজের কবরভূমি—অন্তত বিশাল এই এলাকায়, অর্থাৎ বিশমার্ক সি এবং কোরাল সি-তে শত শত জাহাজ সমুদ্রের অতলে হারিয়ে গেছে। নিখোঁজ হয়ে গেছে। হাড়গোড় ছাড়া তাদের আর কোনও অস্তিত্ব নেই। সামুদ্রিক মাছেরা ঘোরাফেরা করছে চারপাশে। নানা রঙের মাছেরা দাঁত সাফসোফ করছে—মাছেদের ক্লিনিং সেন্টার হয়ে গেছে জাহাজগুলি। অতিকায় বান মাছের আড্ডা। কুমিরের মতো মুখ দেখতে সব হাজার হাজার বান মাছ কিলবিল করছে জাহাজের ফল্কায় কিংবা ইনজিন-রুমে। আর তখন কি না, ঈশ্বর নিয়ে ঠাট্টা। বিসমার্ক সি-কে তো জাহাজের গণকবর বলা হয়। অবশ্য গণকবর বলা যাবে কি করে। তা বলাও যেতে পারে। জাহাজ ডুবলে মানুষও ডুববে। পাঁচ সাত হাজার করে সেনা জাহাজে—মাইন বিস্ফোরণে উড়ে গেছে। সুতরাং গণকবরও বলা যায়। নিষ্ঠুর যুদ্ধ এই রকমেরই হয়ে থাকে। দ্বীপের দখল নিয়ে লড়াই—ফ্লাইংবোট থেকে এয়ার ক্যারিয়ার—কি না ডুবেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে বোমারু বিমান গোঁত্তা খেয়ে পড়েছে সমুদ্রে—তারপর বুড়বুড়ি তুলে ডুবে গেছে। এত কথা সুহাসের জানার কথা নয়—রাতে এই নিয়েই বায়ুগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল জাহাজিরা। ছোটখাটো বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল—তবে দমন করা গেছে। ইনজিন সাবেও খুবই ঠাণ্ডা মাথার লোক। তিনি বেইজ্জত হয়েও মাথা গরম করেননি। জাহাজ যাচ্ছে বিশমার্ক সি-তে জনকবরে কিংবা গণকবরে। জাহাজের কবরভূমিকে জনকবর আর লোকজনের কবরভূমিকে গণকবর বলাই সমীচীন ভাবল। অন্তত জাহাজিদের মাথা ব্যথার কারণ এটাই। তখন ঈশ্বরই একমাত্র রক্ষাকর্তা। সেই ঈশ্বর নিয়ে ঠাট্টা চার্লি সহ্য করবে কেন। তা ছাড়া চার্লির ত্রাসও কম না—কেন এই ত্রাস সে জানে না। কে তাকে অনুসরণ করতে পারে সুহাস বোঝে না। চার্লি চুপি চুপি তাকে ডেকে এনেছিল, জিজ্ঞাসাবাদ করে যদি জানা যায়, ম্যাক কোনও অনুসরণকারীকে দেখেছে কি না। কিংবা সেই অনুসরণকারী যদি হয়। পিকাকোরা পার্কে দেখা লোকটা সেই কি না! কিংবা সিম্যান মিশনের সেই গোঁফওয়ালা লোকটা কে, সে যদি চেনে।

অবশ্য চার্লি তাকে কিছুই খুলে বলেনি। ম্যাক পড়ে যেতেই পারে, পা ফসকেও পড়ে যেতে পারে—কিন্তু এত নিশ্চিন্ত কি করে, যে সে পা ফসকে পড়ে যায়নি—কেউ তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। কার এত দায় পড়েছে ঠেলে ফেলে দেবার জন্য। জাহাজ নিজেই যখন ডুবতে যাচ্ছে—অন্তত জাহাজিদের কথাবার্তায় এমনই মনে হয়েছে তার—তখন আগ বাড়িয়ে একজনকে ঠেলে ফেলে দেবার কি দরকার—জাহাজ তো যাচ্ছে বিশমার্ক সি-তে—তার জনকবরে। এমনিতেই ডুববে।

গড ইজ নেভার উইকেড অর আনজাস্ট—এমন দৃঢ় বিশ্বাস থাকলে ত্রাসের কি থাকতে পারে। সুহাস অবশ্য প্রবলভাবে ঠাকুরদেবতা বিশ্বাস করে না। তাই বলে এই নয় যে সে রাতে একা বরফ-ঘরে নেমে যেতে পারবে। কারণ ওটাও একটা জীবজন্তুর কবরখানা। কিংবা মানুষের ক্ষুধা কত প্রবল। হাজার লক্ষ গরু বাছুর মুরগি হজম করে দিচ্ছে প্রতিদিন—এই শরীরের দিকে তাকালেও মনে হয় জীবজন্তুর কবরখানা। তা সে বিশ বাইশ মাসে গোটা দশেক আস্ত ছাগল তো হজম করেছেই। দৈনিক রেশনে এক পোয়া মটন পেলে, বিশ বাইশ মাসে কটা ছাগল লাগতে পারে। অন্তত সে চার্লিকে এটুকু বোঝাতে পারলেও আশ্বস্ত হতে পারত। গণকবর বল, জনকবর বল সব জায়গাতেই আছে। পিছু

ধাওয়া করলেও শেষ পর্যন্ত কবরের দিকেই মানুষ ধাওয়া করে। ঘাবড়াবার কি আছে?

চার্লি কথাই বলছে না।

ধুস ভাল লাগে।

সে হাঁটা দিল।

'যাবে না বলছি।'

সুহাস ফিরে তাকাল।

আর তখনই দেখল সেকেন্ড ইনজিনিয়ার বব এদিকটায় আসছেন। খুবই কড়া ধাতের মানুষ। এক ধমকে ফাইভার জামা প্যান্ট খারাপ করে ফেলে। চোখ ভাটার মতো—বেঁটেখাটো মানুষ, সব সময় তেলে বেগুনে ফুটছে। একজন সাধারণ নেটিভ জাহাজিব ঔদ্ধত্য তিনি পছন্দ নাও করতে পারেন। অফিসার্স কেবিনের এলিওয়েতে কেন। বেয়াদপির সীমা থাকা উচিত। তাঁকে দেখলে কেন যে সুহাসেরও হৃদকম্প উপস্থিত হয় সে জানে না। চুরুট নিভে গেছে বলে তিনি দাঁড়ালেন, চুরুট ধরিয়ে নেবার জন্য লাইটার জ্বাললেন না, কাজকর্ম ফেলে চার্লির সঙ্গে বেয়াদপ ছোকরা কি করছে, করতে পারে দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে তা আঁচ করতে চাইলেন। সে কিছুই বুঝল না। মানুষটি সারেঙের প্রায় ধর্মাবতার। সারেঙ তার ধর্মাবতার। সুতরাং ফল ভোগ করতে হতে পারে ভেবেই সে আরও দ্রুত হেঁটে উইনচে যাবার জন্য পা বাড়াল। আর তখনই চার্লি যা করে—ছুটে এসে হাত টেনে ধরল। বলল, 'কোথায় যাচ্ছ।'

সে এলিওয়ের দিকে না তাকিয়েই বলল, 'উইনচে।' তবু হাত ছাড়ছে না চার্লি। সে বিরক্ত হয়ে বলল, 'সেকেন্ড দেখছে।'

কি ভেবে হাত ছেড়ে দিল চার্লি। সুহাস দেখল, সেকেন্ড ইনজিন রুমে নেমে যাচ্ছেন। এলিওয়েতে কাউকে আর দেখা যাচ্ছে না। শুধু চার্লির উপস্থিতি ছাড়া আর কিছু নেই। মাথা দেয়ালে কাত করে দিয়েছে। ভঙ্গিটা যিশুর ক্রুশবিদ্ধ ছবির মতো। চার্লি এত সুন্দর দেখতে, আরও বড় হলে সোনালি দাড়ি গোঁফ গজিয়ে গেলে যিশুর প্রায় যেন প্রতিচ্ছবি হয়ে যাবে। সে ওয়ারপিনড্রামে ঝুঁকে পড়ল।

জাহাজ ছেড়ে দেবে। তীর্থযাত্রীর মতো সবাই যে যার সামান ঠিক করে নিচ্ছে। কত দূরের যাত্রা। কারপেন্টার ঘুরছে ডেকে। হাতে পেতলের জল মাপার স্টিক। সে নোট নিচ্ছে, কতটা আর জলের প্রয়োজন। জলের ট্যাঙ্কগুলি সবই প্রায় ইনজিন-রুমের খোলের ভিতর। সে জলের পরিমাপ টুকে নিচ্ছে।

কেউ বসে নেই। ডেরিক নামানো হয়ে গেছে। ডেক-জাহাজিরা মাস্তুলে উঠে গেছে। কেউ ফলঞ্চা বেঁধে জাহাজের কিনারায় ঝুলে পড়েছে। বারোটা চারটা ওয়াচেই জাহাজ ছাড়বে। চারটা বাজতে না বাজতেই সাঁজ লেগে যাবে। সেকেন্ড নেমে গেল ইনজিন-রুমে। চিফ ইনজিনিয়ারও নেমে যেতে পারেন। জাহাজ ছাড়ার আগে সব একবার ভাল করে দেখে নেওয়া' জল এবং জ্বালানি দুটোই জাহাজের প্রাণ! সুহাস বিশ বাইশ মাসের সফরে এটা ভালই টের পেয়েছে। মাঝদরিয়ায় জল নেই, কয়লা নেই ভাবাই যায় না।

খালি জাহাজ। ফল্কা, স্টিক ব্রুম দিয়ে সাফ করে নেওয়া হয়েছে। প্রায় ঝকঝকে তকতকে জাহাজ। যেখানটায় রং চটে গেছে, সেখানে রং লাগানোর কাজ থেকে যায়। সারা সফরে সে দেখেছে, ডেক-জাহাজিরা রং করেই যাচ্ছে, একদিকে করছে অন্যদিকে রং চটে যাচ্ছে। নোনা হাওয়ায় রং বড় তাড়াতাড়ি খেয়ে যায়। সারাদিন চিপিং চলছে, তেলজুট দিয়ে লোহার পাত মোছা হচ্ছে। কেরোসিন তেলে সিরিশ কাগজ ডুবিয়ে রেলিং ঘষা হচ্ছে। দু-চার হপ্তা যেতে না যেতেই রেলিং নোনা হাওয়ায় জং ধরে যায়। জাহাজে কাজের অন্ত থাকে না।

এই এক মুশকিল। বন্দর ছেড়ে যাবার আগে জাহাজিরা চায়, আর একবার ডাঙায় নেমে যদি ঘুরে আসা যেত। ডাঙা যে কত প্রিয় নাবিকদের। বন্দর ছেড়ে যাবার সময় প্রায় সবাই উঠে আসবে ডেকে। যতক্ষণ বন্দর দেখা যাবে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে। ক'দিনেই ডাঙার মানুষজনের সঙ্গে দোস্তি হয়ে যায়। কোথায় কতদূরে এই সব দেশ, মানুষজন, পাহাড়, সমতল ভূমি এবং কত সব বিচিত্র গাছপালা,

ফুল ফল পাখি, মানুষের কাছে কত প্রিয় ডাঙা ছেড়ে না গেলে বোঝা যায় না। যে যার মতো সামান্য আশ্রয় খোঁজে। ঘরবাড়ির মতো বাঁচতে চায়। ফুলফলের দোকানে ঢুকলে সুন্দরীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। শারীরিক সম্পর্কই বড় কথা নয়, একটুখানি বসে যাওয়া, একটু অন্তরঙ্গ আলাপ, এবং মানুষজন যদি কেউ দেশবাড়ির খবর নিতে চায় অকপটে তারা সব বলে ফেলে। কখনও উপহার দেয়, কখনও উপহার তারাও পায়। ম্যাক তো বন্ধুত্ব হলেই একটি মুখোস উপহার দেয়। কেউ ভাল টোবাকো দেয়। কিছু স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে আসা, কিছু রেখে আসা।

সুহাস টের পেল, সেও এই টানে উপরে উঠে এসেছে। প্রপেলার নড়ে উঠলেই সে ফোকসাল থেকে দৌড়ে উপরে উঠে এসেছিল। জাহাজের নোঙর তোলা হচ্ছে—জাহাজের আগিলে চিফ-অফিসার দাঁড়িয়ে আছেন। পিছিলে সেকেন্ড অফিসার। জাহাজ বাঁধাছাদার কাজ যেমন কঠিন, জাহাজ নোঙর তুলে ফের ভেসে পড়ার কাজটাও কম কঠিন না। ডেক-জাহাজিরা দুটো দল হয়ে গেছে। ডেক-সারেঙ পিছিলে, ডেক-টিন্ডাল আগিলে। বন্দর থেকে হাসিল আলগা করে দেওয়া হচ্ছে—সব সাংকেতিক কথাবার্তা। হাত তুলে দিলে হাসিল ঢিল দেওয়া হচ্ছে। নামিয়ে দিলে হাসিল গুটিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ইস্পাতের কাছিগুলিও গুটিয়ে রাখা হল। প্রপেলার ঘুরছে। স্টিয়ারিঙ ইনজিনের কক কক শব্দ। জাহাজটা ভেসে পড়ল। জাহাজটা ক্রমে দূরত্ব সৃষ্টি করছে। লায়ন রকের পাশ দিয়ে জাহাজ যখন গভীর সমুদ্রে নেমে এল, তখনও দূরের শহরটা মরীচিকার মতো মনে হচ্ছে। দিগন্তে অজস্র নক্ষত্র ফুটে আছে। মনে হয় আশ্চর্য এক দেশ পেছনে ফেলে তারা সমুদ্রে নেমে গেল। সহসা সজাগ হয়ে যাওয়ার মতো, সুহাস টের পেল, চার্লি চুপচাপ তার পাশে জাহাজের একটা বিটে বসে আছে। কখন এসে সে বসল টেরই পায়নি। চার্লি কথা না বলে থাকার পাত্র না। এতক্ষণ চুপচাপ তার পাশে বসে আছে, সে খেয়ালও করেনি। সবার মতো বন্দরের জন্য যে টান গড়ে ওঠে, বন্দর ছেড়ে গেলে, যে বিচ্ছেদ গড়ে ওঠে তারই তাড়নাতে, সেও কেমন মগ্ন ছিল। এ-ভাবে সে কত বন্দর ফেলে এসেছে পিছনে—সামনে আরও কত বন্দব পাবে—কিংবা মাটি টানার কাজে যেখানেই সে যাক, ডাঙার খোঁজ পাবেই। চার্লি কি তার উপর এখনও রাগ পুষে রেখেছে। অথবা রাগ দেখাবার জন্যেই তার পাশে এসে বসেছে, অথচ একবারও বলেনি, সুহাস তোমার ঠাণ্ডা লাগছে না! কনকনে শীতে একটা সোয়েটার গায়ে দিয়ে থাকলে ঠাণ্ডায় কষ্ট পাবাব কথা। সে এটা ভালই বোঝে। আসলে সে ঠাণ্ডায় উপরে উঠলে, সবসময় কম্বল গায়ে দেয়। শুধু কাজের সময় সে জাহাজি পোশাক পবে বের হয়। কিনারায় গেলে সে গরম কোট-প্যান্ট পরে। তার মাত্র একটাই গরম প্যান্ট গবম কোট। তাও কার্ডিফের সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেট থেকে কেনা। খুব সস্তায় পেয়ে কিনে ফেলেছিল। তাকে নাকি কোট প্যান্ট পরলে খুব সুন্দর লাগে দেখতে।

এত শীত যে, চার্লিও গবম পুলওভাব, তার উপর জ্যাকেট গায়ে দিয়েছে। পায়ে গরম মোজা এবং শীত থেকে আত্মরক্ষার জন্য সে আজ যথেষ্ট জামাকাপড় গায়ে রেখেছে। রাগ যে পুষে রেখেছে, এতেই সে আরও বেশি টেব পায়। সুহাস শীতে কষ্ট পেলেও তার কিছু যেন আসে যায় না। রাগ না থাকলে, ঠিক বলত, আরে তুমি মানুষ না! এই ঠাণ্ডায় গায়ে কিছু না দিয়ে দাঁড়িয়ে আছ ডেকে। যখন তখন তার উপর এত অভিমান কেন পুষে রাখে চার্লি সুহাস কিছুতেই ভেবে পায় না।

এত ঠাণ্ডা যে সামান্য সোয়েটারে শীত যাবার কথা না। সেও চার্লিকে দেখে না দেখার ভান করল। ডেকের সর্বত্র আলো জ্বালা। মাস্তুলের দু-দিকে দুটো বড় আলো জ্বলছে। চিফ কুকের গ্যালির মুখে আলো। বোট-ডেকে, উইংস, এলিওয়েতে আলো। পোর্ট-সাইডের ছাদের নিচে সার সার আলো। অন্ধকার নয় যে সে চার্লিকে দেখতে পাবে না। অন্ধকার নয় যে চার্লি সুহাসকে দেখতে পাবে না। দুজনই দেখেছে দুজনকে। অথচ নিরুত্তাপ।

শহর আর দেখা যাচ্ছে না।

জাহাজ দুলছে। জাহাজ ধেয়ে চলেছে। উপর নিচে যেদিকে চোখ যায়—কিছুই দেখা যায় না। কেমন আচ্ছন্ন এক আধিভৌতিক সমুদ্রে তারা যেন যাত্রা করেছে। আকাশ কিছু নক্ষত্র নিয়ে বিরাজ করছে ঠিক, মাস্তুলের মাথা পার হয়ে অনেক উপরে সেই সব নক্ষত্র নড়াচড়া করছে তাও ঠিক। তবু

মনে হয় না তখন জাহাজে পিচিং শুরু হয়েছে বলে, এই আকাশ এবং নক্ষত্রমালা স্থির থাকতে পারছে না। চার্লি উঠে দাঁড়াল। হাঁটতে থাকল। সে বোধহয় তার কেবিনে উঠে যাচ্ছে। চার্লির এই অবোধ অভিমানে মাঝে মাঝে সে ক্ষিপ্ত হয়ে যায়—তার কি দোষ, সেকেন্ড তাকে পছন্দ করে না। সেকেন্ড সারেঙকে ডেকে অভিযোগ করলে, তখন কি হত! অভিযোগ করতেই পারেন, কাজ ফেলে চার্লির সঙ্গে আড্ডা—জাহাজে কি এ-জন্য রাখা হয়েছে। চার্লিব পক্ষে যা শোভন তার পক্ষে তা কত অশোভন বুঝতে শিখবে না। রাগ করলেই হল!

সে কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না।

তারপর ভাবল, শত হলেও চার্লি কাপ্তানের পুত্র। তার ঠাকুরদা ছোটখাটো ধনকুবেব। সে একজন সামান্য মাইনের ইনজিন-রুমের কর্মী। তাব কথা ছিল কয়লা টানাব। ভাগ্য সুপ্রসন্ন না হলে, তাকে উইনচ মেরামতের কাজে রাখা হত না। ফাইভারের হেলপার। এখন তো সে নিজেই উইনচের যন্ত্রপাতি খুলে মেরামত কবতে পারে। দরকারে ফাইভার তাকে দিয়ে আরও সব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করায়। সফর শেষে কাপ্তান যদি কোনও প্রশংসাপত্র দেন, তবে সে অন্য জাহাজেও কাজটা পেয়ে যেতে পারে। বছর পাঁচেকের অভিজ্ঞতার পর সে পরীক্ষায় বসলে, জাহাজে সে ফাইভার হয়ে যোগ দিতে পারবে তাও জানে। অন্তত নিজের আখেরের কথা ভেবেই তোযাজ করছে চার্লিকে। চার্লি না থাকলে, তাকে সারা সফব কয়লা টেনেই মরতে হত। কোনও অদৃশ্য হাত অন্তরালে কাজ কবছে —এবং সে যে চার্লি ছাড়া কেউ নয় এটাও সে বোঝে! নিজেব গরজেই চার্লিকে তোষামোদ করে চলা দরকার। সুযোগ জীবনে বেশি আসে না এও সে বোঝে।

চার্লিকে ধরার জন্যে সে ছুটে গেল। হালকা পাতলা চার্লি যেন বাতাসে ভর করে হেঁটে যাচ্ছিল। তাকে দেখলে মনে হয়, সে ভাল নেই। কোনও অশুভ আত্মার প্রকোপে পড়ে গেছে। অন্তত হাঁটার ভঙ্গি দেখে তাই মনে হয়। কাকে দেখে সে এত ভয় পায় বোঝে না। কত লোকই তো পিকাকোরা পার্কে বেড়াতে আসে। তাকে আড়াল থেকে লক্ষ কবছে টের পায় কি করে! না কি কোনও মানসিক বিকার—চার্লির হাঁটার ধবন একদম পছন্দ হচ্ছিল না। ভাগিস চিফ কুকের গলা পাওয়া যাচ্ছে। চিফকুকের গ্যালির পাশে সিঁড়ি। সিঁড়ি ধবে বোট-ডেকে উঠে যাওয়া যায়, আবার নিচে এলিওয়েতে ঢুকেও কিছুটা হেঁটে ওপরে ওঠার সিঁড়ি পাওয়া যায়। চার্লি এলিওয়েতে ঢুকে যাবে, না চিফকুকেব গ্যালি পার হয়ে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে যাবে বুঝতে পাবল না।

সে ডাকল, 'চার্লি।'

চার্লি যেন ঘোরে পড়ে হাঁটছে।

সে ফের ডাকল, 'চার্লি।'

হুঁশ ফিরে আসাব মতো তার দিকে চার্লি ঘুবে দাঁড়াল।

'কিছু বলবে?' সুহাস বলল।

'না।'

সুহাস এবার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'কখন এসে বিটে বসে থাকলে টেরই পাইনি।'

'পাওনি ভাল।'

চার্লি আর কথা বলার বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করল না।

সুহাস বলল, 'সত্যি তোমাকে আমি দেখতে পাইনি। ম্যাক কিছু বলল?'

'কি বলবে?'

'সে দেখেছে কি না, কে তাকে ঠেলে ফেলে দিল! সে মনে করতে পারছে কি না? সেকেন্ড তাড়া না করলে আমি যেতাম। তুমি তো তার সঙ্গে দেখা করতে পারতে! ওর কি পা ভেঙেছে?'

'জানি না।'

'দেখা হয়নি তার সঙ্গে?'

'না!'

কাটা কাটা কথা শুনতে কাঁহাতক ভাল লাগে। চার্লির এই স্বভাব। সে যে তার উপর ক্ষোভ পুষে রেখেছে কথাবার্তার ধরন দেখেই টের পাচ্ছে। তবু আখেরের কথা ভেবে যতটা পারা যায় তোয়াজ করা।

'যাবে ম্যাকের কেবিনে!'

'বাবা পছন্দ করেন না, যখন তখন যার তার কেবিনে ঢুকি।'

'অঃ।' সে আর কি বলবে।

'আমি যাব! জিজ্ঞেস করব? কে তাকে ফেলে দিল, সে দেখেছে কি না, মনে করতে পারছে কি না?'

'না। তোমাকে আর জড়াতে চাই না।'

'...আমাকে জড়াতে চাও না মানে! কিছু বুঝছি না!'

চার্লি এই বাচ্চা নাবিকটির চোখমুখে দুশ্চিন্তার ছাপ দেখে কিছুটা যেন ঠাণ্ডা মেরে গেল। বলল, 'ভাল গরম পোশাকও নেই তোমার। কী যে খারাপ লাগে! ঠাণ্ডা লাগিয়ে অসুখে পড়লে কে দেখবে! ডেকে দাঁড়াবে না। কী শীত!' বলে চার্লি সিঁড়িতে উঠে গেলে সে বোকার মতো নিচে দাঁড়িয়ে থাকল।

চার্লি বোট-ডেকে উঠে তার জ্যাকেট ছুঁড়ে দিল নিচে। বলল, এটা পরবে। কখনও যদি দেখি ঠাণ্ডায় ডেকে উঠে এসেছ কম্বল গায়ে দিয়ে রক্ষা থাকবে না কিন্তু। কি বিশ্রী লাগে। গায়ে আজ তাও নেই।'

সে যেন সাহস পেয়ে গেল। কিন্তু মুশকিল, বোট-ডেকে উঠলেই ব্রিজ থেকে সব দেখা যায়। সেখানে যে কাচের ঘরে সুখানি কিংবা চিফ-অফিসারের পাশে তিনি দাঁড়িয়ে নেই কে বলবে! রাত খুব একটা হয়নি, তবু কাপ্তান কিছু মনে করতে পারেন। ডাইনিং হলে নিশ্চয় মিউজিক শুরু হয়ে গেছে। মিউজিক বেজে উঠলেই যে যার মতো ডাইনিং হলে রাতের আহার পর্ব সারতে যায়। চার্লিও যাবে। তাকে এ সময় বিরক্ত করা আর ঠিক হবে না হয়তো। সে নিচে থেকেই জ্যাকেটটা ছুঁড়ে দিয়েই বলল, আর কটা তো দিন। তারপর তো গরম পড়ে যাবে। ইকুয়েডরের কাছাকাছি জাহাজ ঘোরাঘুরি করবে। দরকারে না হয় কিনে নেব।

চার্লি আর বিন্দুমাত্র ক্ষোভ পুষে রাখতে পারল না। সে নিচে নেমে এল। এই নাবিকটির এত আত্মমর্যাদা সে যেন কখনও টের পায়নি। তার পুরনো পোশাক দুটো একটা কাউকে দিলে বাবা খুশিই হবেন। তার মায়া দয়া আছে ভাবতে পারেন। মানুষের মায়া-দয়া থাকা দরকার—অন্তত বাবা তাকে তাঁর ঈশ্বরের কথা বলতে গিয়ে এমনই বলেন—তিনি নির্যাতীতদের কথা বলতে গিয়েও তাই বলেন। কিন্তু সুহাস যে জ্যাকেটটা ফিরিয়ে দিল তাকে।

তারপর মনে হল চার্লির জ্যাকেটটা ছুঁড়ে দিয়ে সত্যি অপমান করেছে সুহাসকে। আসলে ক্ষোভ থেকে। তুমি সুহাস টানা সেই থেকে ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে আছ, কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছু কি নেই। এও হতে পারে, ঠাণ্ডা সম্পর্কে সুহাসের নির্বুদ্ধিতাকে ধিক্কার জানাবার জন্যেই জ্যাকেট খুলে ছুঁড়ে দিয়েছে। তারপর খেয়াল হয়েছে, কাউকে এ-ভাবে অপমান করা যায় না। না কি সে সকালের ক্ষোভ এই রাতে সুযোগ পেয়ে মিটিয়ে নিল! আর চুপ করে থাকতে পারে!

চার্লি ফের সিঁড়ি ধরে নেমে এল। সুহাস বুঝতে পারল না, চার্লি নেমে আসছে কেন। তার তো কেবিনে ফিরে যাওয়ার কথা। ডাইনিং হলে যাওয়ার কথা। কিন্তু সে তার সামনে লাফ দিয়ে নামল। তারপর কেন যে বলল, প্লিজ আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দাও সুহাস। আমার ভয় করে।

বোট-ডেক এলাকাটা ক্রমে বিভীষিকাময় হয়ে উঠছে। রাতে তারও বোট-ডেকে উঠলে গা শির শির করে। বোট-ডেকে একা সে ঘুরে বেড়াতে সাহস পায় না। আসলে, এখানেই কেউ কেউ গভীর রাতে দেখেছে, এক নারী চুপচাপ বোটের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে। সেও দেখেছে ঝড়ের রাতে। বরফঘরে আহাম্মদ বাটলার তাকে ঝুলতে দ্যাখে। কেউ দেখেছে, ডেকে তাকে রাখা হয়েছে। মাথায় এবং পায়ের কাছে লাল গুচ্ছ ফুল। কফিনে সে শুয়ে আছে। বয়লার রুমে কেউ আর একা নেমে যায় না। রাতে দল বেঁধে নামে। বোট-ডেক পার হয়ে ফানেলের গুঁড়ি ধরে চিমনি নেমে গেছে। কেউ একা চিমনির গোড়ায় উঠে বসে থাকে না। বয়লার রুম থেকে সবাই উঠে না এলে বোট-ডেক পার হয়ে

যায় না। চার্লি ভয় পেতেই পারে। অশরীরী আত্মার ঘোরাফেরাকে সবাই ভয় পায়।

সে বলল, 'চল।'

উপরে উঠে চার্লি হেঁটে গেল। সেও হেঁটে গেল। চার্লি দরজা খুলে প্রথমে উঁকি দিয়ে কি দেখল। যেন কেউ বসে থাকতে পারে ভিতরে।

সুহাস বাহবা নেবার জন্য বলল, 'আরে কেউ নেই। ঢুকতে ভয় পাচ্ছ কেন? এই দ্যাখ। এস, এস না। কই, কোথায় কি আছে! দরজায় দাঁড়িয়ে নিজের কেবিন এ-ভাবে কেউ দ্যাখে! তুমি যে কি! যেন চোর টোর ভিতরে লুকিয়ে আছে।'

চার্লি আর পারল না, বলল, 'সুহাস, লোকটা জাহাজে উঠে এসেছে।'

'কোন্ লোকটা?'

'সেই অনুসরণকারী।'

'কোথায় দেখলে?'

'পোর্ট-হোলে। আবছা অন্ধকারে দেখলাম। ধারালো হিংস্র চোখ। সাদা বাবরি চুল। দাড়ি গোঁফে মুখ ঢাকা। সেই একরকম। শুধু মুখটাই দেখা যায়।' কেমন হতাশ গলায় কথাগুলি বলতে গিয়ে চার্লি কান্নায় ভেঙে পড়ল।

মেসরুমে খেতে বসে, সুহাস খেতে পারল না। মুখার্জিদা, বংশী, অধীর, সুবঞ্জন আর সে মিলে এক 'বিশু'। যদিও জাহাজে সে কোনও ওয়াচ দেয় না, যে যার ওয়াচ মতো 'বিশু' ভাগ করে নেয়—বাঙালিবাবুদের এক 'বিশু' হবে, জানা কথা—ওয়াচ আলাদা হলেও। 'বিশু'র গোস্ত ডাল ভাত সবজি ভাণ্ডারি আলাদা ভাগ করে রাখে। বাঙালিবাবুরা এক সঙ্গে খেতে উপরে উঠলেই 'বিশু'র ভাগ করা খাবার গ্যালি থেকে ভাণ্ডারি ঠেলে দেবে। মুখার্জিদা সবার ডিসে ভাত ডাল সবজি এবং মাংস যা লাগে দেন। নিজেরটাও নেন। তারপর মেসরুমে খাবার পর্ব শুরু হয়ে যায়। সুহাস না খেয়ে উঠে যাওয়ায় মুখার্জিদা বললেন, 'কিরে খেলি না? কি হয়েছে তোর?'

'খেতে ইচ্ছে করছে না।'

মুখার্জিদা বললেন, 'কি হয়েছে বলবি তো!'

সুহাস সবার সামনে কথাটা বলা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারল না। সে কি ভেবে বলল, 'তুমি কি এখনি নিচে গিয়ে শুয়ে পড়বে?'

'শুয়ে পড়ব। কেন।'

'না এমনি!'

মুখার্জিদা বললেন, 'তোর শরীর কি খারাপ!'

'না, ঠিকই আছে। খেতে ইচ্ছে করছে না। তোমরা খাও। বলে সে তার ডিস ধুয়ে নিচে নেমে গেল। তাড়াতাড়ি কম্বলে মুখ ঢেকে শুয়ে পড়ল। আহামদ বাটলার বরফঘরে কেন যে দেখল একটা মেয়েমানুষের লাশ ঝুলছে! সেই থেকেই তো জাহাজে যত ঝামেলা। বোট-ডেকে সেও দেখে ফেলে, এক নারী দাঁড়িয়ে আছে। আসলে ঘোর থেকে দেখেছে। সব সময় ভৌতিক আতঙ্ক তাড়া করলে, রাতে সে কোনও ঘোরে পড়ে দেখে ফেলতেই পারে। মুখার্জিদা তো বললেন, তুষারঝড়ে কোন্ এক নারী বন্দর এলাকায় আটকা পড়ে গিয়েছিল। গাছের পাতা ঝরে গেছে। শীতের কামড়ে নারী একা নির্জন বন্দরে খোঁজাখুজি করেছে কোনও নাবিকের। নাবিকেরা যে যার জাহাজে উঠে গেছে। তুষার ঝড়ে বন্দর এলাকা মৃতপ্রায়। জনপ্রাণীর সাড়া নেই। সুখানিও ফিরছে জাহাজে। ডিনা স্যাঙ্কের সুখানি।

সেই সুখানি কি মুখার্জিদা নিজে। না অন্য কেউ।

মুখার্জিদাকে সে বেশ শ্রদ্ধা ভক্তি করে। এত দীর্ঘ সফরেও বিন্দুমাত্র বেচাল হননি। জাহাজ থেকে নেমে দরকারে কেনাকাটা করেছেন, আবার জাহাজে উঠে এসেছেন। তিনি তাদের অভিভাবকের

মতো। কেউ বেচাল হলেও তিনি তাকে রেয়াত করেন না। জাহাজি বলে কি তোদের ইজ্জত নেই। যা খুশি তাই করে বেড়াবি। দেশের ইজ্জত নেই। তোরা তো দেশের নাম ডোবাবি দেখছি।

ডারবানের ঘাটে মুখার্জিদা তবে কেন বললেন, না আহামদ ঠিকই দেখেছে। বরফ ঘরে লাশ দেখা বিচিত্র নয়। আহামদ পাগল হবে কেন! সে যদি দেখে ফেলে কি করতে পারে। আহামদ ভীতু স্বভাবেরও নয়।

মুখার্জিদাকে শুধু বলবে, সত্যি করে বল, কেন দেখে ফেলতে পারে। যা নেই, তা নিয়ে আমরা ভাবি না। ভূতটুতও দেখি না। শ্মশানে গেলে ভয়, কারণ শ্মশানে মানুষ পোড়ানো হয়। গাছের নিচে কেউ দাঁড়িয়ে থাকে রাতে, কারণ গাছে কেউ ঝুলে পড়েছিল বলে। সব ভূতেরই একটা পূর্ব ইতিহাস থাকে। বরফ-ঘরে লাশ আহামদ বাটলার দেখে কি করে। সে কি জানে, লাশ সেখানে কোনও কালে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। না জানলে দেখবে কেন। দেখতেই পারে বলছ। তুষার ঝড়, বন্দর এলাকা নির্জন, জাহাজিরা দীর্ঘ সফরের পর বন্দর পেয়েছে! বেচাল হতেই পারে। বন্দরে মেয়েমানুষ না পেলে, নিঃস্ব বোধ করতেই পারে। সুখানির কপাল ভাল—তুষার ঝড়েও সে টের পেয়েছিল, লোহালক্কড়ের গুদাম পার হয়ে সেডের নিচে এক নারী শীতে কাঁপছে। বাড়ি ফেরার কোনও সুযোগ নেই তার। তারপর...

তারপর ধরা যাক, মুখার্জিদা তাকে তার নিজের কেবিনে এনে ওম দিয়েছে। তারপর ধরা যাক, মেয়েটির খবর পেয়ে জাহাজের বড় মিস্ত্রিও হাজির। আর কে? আর কে ঢুকেছিল। মুখার্জিদা সেই যে চুপ মেরে গেল আর রা করছে না।

সেটা কে?

সে কি বাটলার নিজে। বরফঘর, রসদঘর, বাটলারের এক্তিয়ারে। বাটলার সঙ্গে না থাকলে লাশ বরফঘরে ফেলে রাখা মুশকিল। সুহাস নিজের সঙ্গেই বকাবকি করছে।

আমি কিছু ঠিক বুঝতে পারছি না মুখার্জিদা। চার্লিকে কে অনুসরণ করছে, সে কে। চার্লির চোখ মুখ হতাশ। সে তো তার বাবাকে সব খুলে বলতে পারে। বলছে না কেন বুঝছি না। চার্লি কতটা ভেঙে পড়েছে, জান না। কিছু বলাও গেল না? সে কেবল বলছে, তুমি যাও; আমার জন্য তোমার কোনও বিপদ হয় চাই না। যাও বলছি।

তারপর আর থাকা যায়!

এ সব সাত পাঁচ চিন্তায় সে ঘুমোতে পারছিল না। চালু জাহাজে শুধু প্রপেলারের শব্দ ভেসে থাকে। কেমন গুম গুম আওয়াজ। জাহাজ ওঠা নামা করছে। এবং সে জানে উপরে উঠলে ধূসর এক অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দৃশ্যমান নয়। সে যদি গভীর রাতে ডেকে উঠে যায়, তবে কি অনুসরণকারী টের পাবে, চার্লির কেবিন পাহারা দিতে যাচ্ছে। এটা কি ঠিক হবে। তার তা ছাড়া কি করণীয়। চার্লির ঠাকুরদা তার বাবা-কাকাকে পছন্দ করত না। এটুকু জানে। চার্লির মা নেই। বেটসি মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছে! দুর্ঘটনা না খুন। চার্লির সন্দেহ খুন। বেটসিকে খুন করে আততায়ীর কি লাভ। সে জাহাজেই বা উঠে আসবে কেন। ভূতুড়ে আতঙ্ক থেকেও চার্লি যে ঘোরে পড়ে যায়নি কে বলবে। একের পর এক সব গুজব জাহাজটায় ভেসে বেড়াচ্ছে। মালবাহী জাহাজে বোট-ডেকে মেয়ে উঠে আসবে কি করে?

তারপর কখন চোখ লেগে আসছিল, টের পায়নি সুহাস। সহসা মনে হল বাঙ্কে কেউ হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। মুখ থেকে কম্বল সরিয়ে দিচ্ছে। সে আর্তনাদ করে উঠতে গিয়ে দেখল, মুখার্জিদা ফোকসালে তার শিয়রে দাঁড়িয়ে আছেন। ইশারায় তাকে উপরে যেতে বলছেন। সে তাড়াতাড়ি উঠে বসল। চোখ ঘষে কম্বল সরিয়ে বাংক থেকে নিচে নেমে গেল। তারপর সিঁড়ি ধরে অনুসরণ। মুখার্জিদা আগে। সে পেছনে। গভীর রাত। বারোটা-চারটার ওয়াচ দিতে যাবেন মুখার্জিদা। গ্যালির পাশে পিছিলের বেঞ্চিতে বসে বললেন, তোর কি হয়েছে বল্ তো?

সে তার সংশয়ের কথা বলল।

'তুমিই বল, আহামদ বাটলার বরফঘরে লাশ কি করে দেখতে পায়। সেখানে কোনও লাশ দেখা

গেছে, কিংবা ছিল এমন গুজবের শিকার হতে পারে সে। ভূতপ্রেতে আমার বিশ্বাস নেই মুখার্জিদা। মানুষ মরে গেলে কিছুই থাকে না। তাই বলে, আমি তেমন সাহসীও নই। ভূতের ভয় আমারও আছে। বোট-ডেকে এত রাতে একা যেতে বললে, হাত পা আমার অসাড় হয়ে যাবে। তুমি তো বোট-ডেক ধরেই যাবে। তোমার ভয় করে না?

'না।'

'তবে তুমি কেন বললে, দেখতেই পারে।'

'শোন সুহাস, জাহাজে কাজ করতে উঠলে, নানা সংস্কারে ভুগতে হয়। প্রাচীন নাবিকেরা একটু বেশিই সংস্কারে ভোগে। এটাই তাদের রোগ বলতে পারিস। তুই হঠাৎ এ-সব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস কেন বুঝি না। ভয় করলে, রাতে একা ওদিকটায় যাবি না। তোর তো ওয়াচও নেই যে বয়লার রুমে নেমে যেতে হবে কিংবা ব্রিজে উঠে যেতে হবে। রাতে ফোকসাল ছেড়ে যাবারই বা কি দরকার। তুই এত ঘাবড়ে গেলি কেন বুঝি না।'

'না, তুমি বল, কেন আহামদ বাটলার দেখতেই পারে বললে। তুমি কেন এ-কথা বললে।'

মুখার্জিদা শেষে যা বললেন, তাতে সুহাসের মনে হল মানুষটিকে সে যেন নতুন করে আবিষ্কার করেছে। বললেন, আমিই সেই সুখানি। আমিই খবর দিয়েছিলাম বড় মিস্ত্রিকে। বড় মিস্ত্রির বান্ধবী না আসায় মুষড়ে পড়েছিলেন। বার বার খবব নিচ্ছিলেন তাঁর বান্ধবী এসেছিল কি না। এলে যেন তাঁর কেবিন দেখিয়ে দেওয়া হয়। বার বার খবর নিচ্ছিলেন, অন্য কারও কেবিনে কেউ এসেছে কি না।

'বলেছিলাম, সাব বাটলারের ঘরে একজন এসেছে।'

'আহামদ বাটলার।' সুহাস না বলে পারল না।

'না আহামদ নয়। অন্য বাটলার। নামটা নাই জানলি। বড় মিস্ত্রি ছিলেন অবনীভূষণ। বাঙালি। বাঙালি বড় মিস্ত্রির সঙ্গে সেই প্রথম এবং শেষ সফর। বাঙালি বড় মিস্ত্রি জাহাজে ক'টা আছে বল্। বাঙালি বলেই তার সঙ্গে আমাদের দোস্তি ছিল।'

বড় মিস্ত্রি বললেন, 'চল তো দেখি, বাটলার কেমন মাল তুলে এনেছে। বললাম, সাব, রোগা, শীতে কাতর। চোখমুখ বসা। খদ্দের পায়নি। বন্দরে বোধ হয় আটকা পড়ে গেছে। আমি তুলে আনি নি। বাটলার তুলে এনেছে। দেখার কি দরকার আছে?'

'তুমি মানুষ না সুখানি। বসে থাকতে পারছ। দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে না! তোমার কি মাথা খারাপ আছে? আমাকে এক ধমক বড় মিস্ত্রির। এরপর আর থাকা যায় বল্। সঙ্গে গেলাম। তুষার ঝড় বইছে বলে, এলিওয়ের সব দরজা বন্ধ। যে যার কেবিনে পড়ে ঘুমাচ্ছে। নয় মদ খাচ্ছে। মাঝে মাঝে পোর্টহোল খুলে বাইবের তুষার ঝড় দেখার চেষ্টা করছে। এলিওয়ের ভিতর কোনও মানুষের সাড়াশব্দ নেই। প্রায় বলতে পারিস ভুতুড়ে নৈঃশব্দ্য। জাহাজে আমরা ছাড়া কেউ জেগে নেই। ইর্নজিন রুমে শুধু একজন ফায়ারম্যান। আর কেউ না। বয়লার একটা চালু রাখতেই হয়। জেনারেটর চালু রাখতে গেলে বয়লার চালু না রেখে উপায়ই বা কি। কেবিনগুলো না হলে গরম থাকবে কি করে। ডাইনিং হল পার হয়ে গেলাম। একটা টুলে উঠে বাটলারের পোর্টহোলে উঁকি দিলাম।'

মুখার্জিদা থামলেন। একটা সিগারেট ধরালেন—'আসলে মানুষ কখন কি করে বসবে এক দণ্ড আগেও সে তা জানে না। তা না হলে আমার কি দরকার ছিল একটা ঘুলঘুলি খোঁজার। ছিলাম বেশ—গ্যাংওয়েতে বসেছিলাম—মাথায় গরম টুপি—ওভারকোট গায়ে বসেছিলাম। কেন মরণ হবে বল, বড় মিস্ত্রি বলল, আর উঠে চলে গেলাম? বড় মিস্ত্রি পাগলের মতো বলছেন কি দেখতে পাচ্ছ সুখানি?'

'শুধু কম্বল সার।'

'আর কিছু না?'

'না।'

'মেয়েটা কি করছে?'

'কম্বলের নিচে শুয়ে আছে।'

'বাটলার কি করছে?'

'বাটলার মেয়েটাকে জড়িয়ে শুয়ে আছে। ওম দিচ্ছে।'

'এখনও ওম দিচ্ছে। ডিম ফুটবে কখন?'

'শীতের রাত সাব। ডিম ফুটতে সময় তো লাগবেই।'

'ইয়ারকি। আমরা জলে ভেসে এসেছি। ডাক শুয়োরের বাচ্চাকে। বল, বড় মিস্ত্রি এসেছে।'

'সাব এটা কি ভাল দেখাবে!'

'আরে তুমি তো ডাঙার মানুষের মতো কথা বলছ। তুমি মানুষ না সুখানি। সর।'

'কি বলব সুহাস, প্রায় পা টেনে বড়মিস্ত্রি আমাকে নামিয়ে আনলেন। আমি আর কি করি। টুলের উপর উঠে তিনি ঘুলঘুলিতে কি দেখলেন, না দেখতে পেলেন না জানি না, বেঁটেখাটো মানুষ, তার উপর বিরাট বপু, কিছু না দেখারই সম্ভাবনা – তারপর প্রায় টলতে টলতে নেমে গেলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, সুখানি, ডাক বাটলারকে। শালা ছোটলোক।'

'সাব এটা কি ঠিক হবে। আপনি বড় মিস্ত্রি বলে যা খুশি করতে পারেন না। আসলে জানিস সুহাস বড় মিস্ত্রিরও হুঁশ ছিল না। মাতাল হয়ে আছে। বান্ধবী না আসায় খেপে আছে ষাঁড়ের মতো। কথা নেই বার্তা নেই দরজায় লাথি। এবং বিশাল বপু নিয়ে ঢুকে গেল। চোরের মতো আমি পেছনে। বাটলার আমতা আমতা করছে। মেয়েটা অসুস্থ বলছে। কে শোনে কার কথা। কাতর প্রার্থনা মেয়েটার, ম্যান আমি সকালেই চলে যাব। আমাকে টানাহ্যাঁচড়া করবেন না। বাটলারও বলল, স্যার ওর শরীর সত্যি ভাল নেই। চোখ মুখ দেখছেন না।'

সুহাসের দিকে তাকিয়ে মুখার্জি বললেন, 'ডিম ফোটা পাখির বাচ্চার মতো। রোঁয়া ওঠা। চিঁ চিঁ করছে।'

'বড় মিস্ত্রি তারপর আমি। আমরা তিনজন —তারপর সব চুপ। মেয়েটার মুখ থেকে লালা ঝরছে। তোকে বললাম, বড় কষ্ট আছে ভিতরে। দেখছিস তো আমি জাহাজ থেকে নেমে যেতে পারি না। নামলেও বেশিক্ষণ বন্দরে ঘুরতে পারি না। রাতে সে আমাকে আজও তাড়া করে। তবে কাউকে বলতে যাস না। বললে, আমি স্বীকার করব না। যদি বলিস, এটাও তো খুন। এটা তো ধর্ষণ। সব স্বীকার করব। জাহাজে উঠে যাবা উল্কি পরে তাদের ধারণা জাহাজের ভূতপ্রেত তাদের তাড়া করে না। আমার ধারণা একটু অন্য রকম। বলতে পারলে কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হয় এমন ভাবি। মন হালকা হয়। ভূতপ্রেতের ভয় থাকে না।'

'ভূতপ্রেতের ভয় না থাকতে পারে। মানুষের ভয় তো থেকেই যায়। ধরা পড়লে না। লাশ গায়েব করলে কি করে?' সুহাস প্রশ্ন করল।

'সে এক ঝামেলা।'

'যাই রে সময় হয়ে গেছে।' বলেই তিনি উঠলেন। ডেকে নেমে গেলেন।

সুহাস পাবে। সে বলল, 'খুন জখম করে রক্ষা পেলে কি করে।'

'আমরা কি খুন করতে চেয়েছি বল্। তুই আসছিস কেন।'

'বলবে তো কি করলে?'

মুখার্জিদা হাঁটছেন ডেক ধরে। এত রাতে ডেকে হেঁটে গেলে বুটের শব্দ ওঠে। কিন্তু ইনজিন রুমের ঝকর ঝকর শব্দে সব ঢেকে গেছে। সুহাস বোট-ডেকে ওঠার মুখে সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে গেল। বোট-ডেকে উঠতে চায় না। কারণ, এত রাতে বোট-ডেক পার হয়ে একা টুইন-ডেকে নেমে যাওয়া তার পক্ষে কঠিন।

মুখার্জিদা বললেন, 'জানতাম ধরা পড়ব। হুঁশ ফিরে এসেছে। আমরা কি আর করি। কী যে এক বিপদে পড়ে গেলাম। আমরা ভাগতে চেয়েছিলাম। বাটলার বুঝুক। সে ছাড়বে কেন। যেখানেই ফেলে রাখি ধরা পড়ে যাব।'

'দাঁতের কামড়!'

'কার দাঁতের কামড়?'

'নখের আঁচড়! কার নখের আঁচড়! টের পেলাম কেউ রক্ষা পাব না। জলে ফেলে দিলে দু-দিন বাদে ভেসে উঠবে। কি করি! বাটলারকেই বললাম, তোমার বরফঘরে ঝুলিয়ে রাখ। আমরা সাহায্য করলাম। লাশ রসদঘরে টেনে নিয়ে গেলাম। তারপর বরফঘরে হুকে পা গেঁথে ঝুলিয়ে দিলাম। গরু ভেড়ার লাশের মধ্যে মেয়েটা হারিয়ে গেল। কুয়াশার মধ্যে কিছুই দেখা যায় না। বরফঘর খুললে, কি কুয়াশা ভিতরে জানিস তো। বাটলারকে দেখালাম, দ্যাখ সব কবন্ধ। মেয়েটাও কবন্ধ হয়ে গেছে। জীবনে এত নিষ্ঠুর কাজ করেছে তোর মুখার্জিদাকে দেখে মনে হয়! ভাল মন্দ জানি না, যা মাথায় এসেছিল তাই করেছি। জাহাজ সমুদ্রে ভেসে গেলে মধ্য রাতে কফিনে পুরে, কিনার থেকে ফুল কিনে একেবারে সাজিয়ে তিনজনে কফিনটা ঠেলে সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়েছিলাম।'

সুহাস বিশ্বাস করতে পারছে না। মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করছে। মুখার্জিদা কত অকারণে বকাঝকা করেন, তারা কিছু মনে করে না। অকপট স্বভাবের। তাই বলে জীবনের এমন গোপন খবর ফাঁস করে দেয়। না কি বানানো গল্প। এমনও হতে পারে গল্পটা তার শোনা—নিজের নামে চালিয়ে দিলেন। এতে তো বাহবা দেওয়া যায় না—না কি তিনি বুঝিয়ে দিলেন, ভাববার কি আছে, তোর মুখার্জিদা তো থাকলই। সুবিধা অসুবিধার কথা বলবি। মুখার্জিদাকে খুব ভাল মানুষ ভাববার কারণ নেই।

মুখার্জিদা বললেন, 'কি রে দাঁড়িয়ে থাকলি কেন? যা। একা যেতে পারবি? না পিছিলে দিয়ে আসব।'

'তুমি কি আহামদকে বলেছিলে?' সুহাস সিঁড়ির রেলিঙে ঝুঁকে জানতে চাইল।

'কি বলেছিলাম।'

'এই মানে মেয়েটার কথা।'

'আর বলিস না, আহামদ জাহাজে উঠে এত রোয়াবি করত, কি বলব রাগ ধরে গেল। জিন পরি আবার কি। সব নাকি গুজব। সে এ-সব নাকি বিশ্বাসই করে না। লুকেনারের কথাও না। জাহাজটার যে কখনও কখনও মাথা খারাপ হয়ে যায় তাও বিশ্বাস করে না। সি ডেভিল লুকেনারকে সে পাত্তাই দিল না। আরে যার যা, ভাবলে অপবাদ, না ভাবলে অলঙ্কার। ডিনা ব্যাঙ্কের নাম শুনলে কার না কলজে চমকায়? ডিনা ব্যাঙ্কের জাহাজি। সোজা কথা। ডিনা ব্যাঙ্কে সফর করেছ' তা হলে তো আর আটকানো যাবে না। 'নলি' যত খারাপ হোক, নিয়ে নেবে। এটা জাহাজের যশ বলতে পারিস। জাহাজ নিজের মর্জিমতো চলে বলতেই আহামদ খেপে গেল। হাতে উল্কি আমার—হরে কৃষ্ণ লেখা, উল্কি নিয়ে রসিকতা করল। আমাকে কি বলল জানিস, না হলে সুখানি। সারা জীবন হুইল ঘুরিয়ে মাথাটা নাকি আমার খারাপ হয়ে গেছে। দিলাম ডোজ।'

'কি বললে তাকে।'

'বললাম, আহামদ, রোয়াব দেখাবে না। তোমার কেবিনে মেয়েমানুষের লাশ পড়েছিল। বরফঘরে লাশ গায়েব করে রাখা হয়েছিল। বেশি রোয়াবি করলে ডিনা ব্যাঙ্ক সহ্য করবে না। সে তোমার ঘরে লাশ হয়ে পড়ে থাকতে পারে, বরফঘরে ঝুলেও থাকতে পারে। ঘাড় যখন মটকাবে বুঝতে পারবে। হয়ে গেল।'

'মুখার্জিদা!'

'বল্।'

'জাহাজে তবে কিছু একটা আছে বলছ।'

'থাকতেও পারে, নাও পারে। মনে করলে আছে, মনে করলে নেই। যে যেমন বিশ্বাস করে। যা, দাঁড়িয়ে থাকিস না। ভয়ের কিচ্ছু নেই, আমি গেলাম। আতঙ্কে মানুষের কি হয় আহামদকে দিয়ে বুঝেছিস! অযথা আতঙ্কে পড়ে যাস না।'

সে আর না বলে পারল না, 'জান চার্লিকে কে অনুসরণ করছে। পোর্টহোলে লোকটা নাকি দাঁড়িয়েছিল।'

'চার্লি!'

'আরে কাপ্তানের পুত্র!' চার্লি নামটা তার কাছে যত চেনা, মুখার্জিদার কাছে তত চেনা নয়। সবাই কাপ্তানের ব্যাটা বলে, কেউ কেউ ছোটসাব বলে। জাহাজে নামে কেউ কাউকে বড় চেনে না। যে যা কাজ করে সেই নামে চেনে। কাপ্তান, সেকেন্ডমেট, চিফমেট, ডেক সারেঙ, ইনজিন সারেঙ এমন কত কিসিমের কাজ যে জাহাজে থাকে। মুখার্জিদা জাহাজের তিন নম্বর সুখানি। তারাই ক'জন হিন্দু নাবিক মুখার্জিদা, মুখার্জিদা করে। চার্লি বলায় মুখার্জিদা প্রথমে ধরতে পারেননি, কার কথা বলছে! কাপ্তানের পুত্র বলায় নামটা মনে পড়ে থাকতে পারে। তিনি কিঞ্চিৎ অস্বস্তি গলায় বললেন, 'তা চার্লিকে অনুসরণ করতে জাহাজে উঠে এল! তুই জানলি কি করে। জাহাজে আমরা ছাড়া আর কে আছে? গোনাগুনতি লোক, সবাই সবাইকে চেনে—বাইরের লোক জাহাজে উঠে আসবে কি করে? কোথায় লুকিয়ে থাকবে?'

'চার্লি তো বলল।'

'চোখের ভুল।'

'জান পিকাকোরা পার্কে একদিন চার্লি লোকটাকে দেখেছে।'

'ধুস যত্ত আজগুবি কথা। যা, কেন যে মরতে এরা জাহাজে উঠে আসে। চার্লি আর লোক পেল না, তোকে বলতে গেল। জাহাজে ওর বাবা আছেন, তাঁকে বলুক, কে তাকে অনুসরণ করছে তিনি খোঁজ করুন। তোর কি দায়। আর তোকে বলে কি লাভ। ওটা ব্যাটাছেলে না মেয়েছেলে তাও বুঝি না। মেয়েদের মতো চিঁ চিঁ করে কথা বলে। কেন যে ওটার পেছনে ঘুর ঘুর করিস তাও বুঝি না!'

সুহাস বুঝল, এতে তো হিতে বিপরীত হয়ে গেল। চার্লিকে মেয়েছেলে বলতেও মুখে আটকাল না। তার ঘুর ঘুর করাও মুখার্জিদার পছন্দ নয়। সে যে কি করে! চার্লি যদি জানতে পারে মেয়েছেলে বলে তাকে মুখার্জি ঠাট্টা করেছে, তবে আর রক্ষা আছে! চার্লি ক্ষেপে গেলে সব করতে পারে। মুখার্জিদা না আবাব সকালে ঝামেলা পাকান। আরে শুনছ মিঞারা, ওরে শুনছিস বাঙালিবাবুরা, জাহাজে নতুন মেমান হাজির। চার্লি দেখেছে, মেমান ঘোরাফেরা করছে। রাত হলেই মেমান হাজির হবে। আহামদ বাটলারের পর চার্লির পালা। তার পোর্টহোলে নাকি মেমান উঁকি দিয়েছে।

সুহাস কিছুটা বিব্রত গলায় বলল, 'কাউকে কিন্তু বোলো না।'

'বললে কি হবে।'

'উপহাসের পাত্র হয়ে যাবে চার্লি। কি দেখতে কি দেখেছে—আর সে খবর জাহাজে ওড়াউড়ি শুরু করলে, কেউ মাথা ঠিক রাখতে পারবে! ডিনা ব্যাঙ্কে আবার গণ্ডগোল সৃষ্টি হবে না! মাঝ সমুদ্রে জাহাজিরা বেগড়বাই করলে কাপ্তান খেপে যাবেন না!'

'তা অবশ্য ঠিক।' বলে মাথা নাড়লেন মুখার্জিদা। মুখার্জিদাকে কিছুটা এখন সন্ত মানুষের মতো মনে হচ্ছে। নীল কম্বলের গরম প্যান্ট, হাতে উলের দস্তানা, গায়ে লম্বা কম্বলের ওভারকোট, মাথায় ফ্লানেলের টুপি। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝড় উঠে আসছে সমুদ্র থেকে—এবং অস্পষ্ট আলোতেও বোঝা যায় সমুদ্র তার অজস্র ঢেউয়ের ফণা নিয়ে পাক খাচ্ছে। গোঙাচ্ছে। যেন অতলে, অসীম অনন্ত জলরাশি দ্রুত পাক খেতে খেতে উপরে উঠে আসছে—আবার তলিয়ে যাচ্ছে। টোপ গেলার মতো জাহাজটাকে অনায়াসে গিলে ফেলতে পারে। কিন্তু পারছে না, রুচিতে বাধছে বলে। পুরনো লঝঝড়ে জাহাজ, তার সঙ্গে এত সব অপদেবতা জাহাজে, গিলে কতটা হজম করতে পারবে, সেই ভয়ও থাকতে পারে।

অদ্ভুত অদ্ভুত চিন্তা কেন যে সুহাসের মগজে কামড় বসায় বোঝে না। হাওয়ায় জলকণা উড়ে আসছে। দিগন্তে কিংবা মাথার উপর নীল অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দৃশ্যমান নয়। সমুদ্রে বিচরণকারী এই নিঃসঙ্গ জাহাজটির জন্যও তার মায়া হয় কেন বোঝে না। সমুদ্রের সঙ্গে জাহাজটার লড়ালড়ি চলছে সেই কবে থেকে। দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সমুদ্র। গভীর সমুদ্রে এলে সুহাস এটা বেশি টের পায়। অনন্ত এক বিশ্বের মতো নানা রহস্যে এই জাহাজ এখন টালমাটাল। কি হবে কে জানে!

'আমি যাই দাদা।'

'যা।'

সুহাস হাঁটা দিলে ফের ডাকলেন মুখার্জিদা।
'শোন।'
সে দাঁড়াল।
মুখার্জিদাই তার কাছে এগিয়ে এলেন।
বললেন, 'লোকটাকে চার্লি দেখেছে! তুই দেখিসনি তো?'
'না।'
'তবে এমন আতঙ্কে পড়ে গেলি কেন। কিছু খেলি না!'

সুহাস কি করে বোঝাবে, চার্লি হতাশায় কতটা ভেঙে পড়েছে! চার্লি তাকে প্রায় ঠেলে কেবিন থেকে বের করে দিয়েছে। চার্লি কোনও বিপদের গন্ধ পাচ্ছে, এবং তা কেন সে কিছু জানে না। সে জড়িয়ে পড়ুক চার্লি এটাও চায় না। বিশ বাইশ মাসে চার্লির গভীর এক বন্ধুত্ব জন্মে গেছে তার প্রতি সে বোঝে। নিজের সুবিধা অসুবিধার কথা যত সহজে তাকে বলতে পারে, চার্লি তার নিজের বাবাকেও তত সহজে বলতে পারে না। ম্যাককে কে ঠেলে ফেলে দিয়েছে? সে কে? কেন ম্যাককে ঠেলে ফেলে দিল! ম্যাকের কি অপরাধ! গভীর কোনও ষড়যন্ত্র হচ্ছে না সে বুঝবে কি করে। ম্যাকের উপর ষড়যন্ত্রকারী এত হিংস্র হয়ে উঠছে কেন! নির্বিরোধ নির্ভেজাল মানুষ। অবসর সময়ে সে ছাঁচ বানায়, কাগজের মণ্ড দিয়ে মুখোস বানায়। জীবজন্তু থেকে মানুষেব মুখ কিছুই বাদ যায় না। বন্দরে বন্দরে সে মুখোস বিক্রি কবে। কখনও উপহার দেয়। তাকে সবাই যেন মনে রাখে এটা সে চায়। এমন কি সে তার বান্ধবীদের ঘরেও একটা করে মুখোস রেখে আসে। উপহার দেয়। আর অবসর সময়ে বোট ডেকে বসে সে চার্লির সঙ্গে দাবা খেলে। তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে আততায়ী খুন করতে চায়নি, কে বলবে!

সুহাস জানে ম্যাকের কথা বলে লাভ নেই। মুখার্জিদা সঙ্গে সঙ্গে ফুৎকারে উড়িয়ে দেবেন তাব সংশয়ের কথা। কারণ ম্যাক বন্দর থেকে ঘোব মাতাল হয়ে ফেরে। সে পা ফসকে পড়ে যেতেই পারে। এই নিয়ে তার সংশয়ের কথা শুনলে মুখার্জিদা হাসাহাসি করতে পারেন। সে ফের বলল, 'আমি যাই।'
'যা।'

সুহাস পিছিলে উঠে এল। আর তার কেবলই মনে হচ্ছিল, অন্ধকারে কেউ তাকে অনুসবণ করছে। সে দু-বার পেছনে তাকাল। দেখছে, মুখার্জিদা দূরে বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে আছেন। লক্ষ রাখছেন সে ঠিকমতো পিছিলে উঠে যেতে পারছে কি না। পিছনে তাকিয়ে কোনও অনুসরণকারীকে খোঁজার সে চেষ্টা কবছে মুখার্জিদা না আবার টের পান! তার কোনও ক্ষতি হতে পারে এমন কিছু কি ভেবে তিনি বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে আছেন! কেউ নেই। শুধু মাস্তুলের আলো, গ্যালির আলো ওঠানামা করা ছাড়া আর কিছুই হচ্ছে না। এমন কি ফল্কার উপরেও কেউ দাঁড়িয়ে নেই। তবে মনে হয় কেন, অদৃশ্য সেই শত্রুর নিঃশ্বাস প্রশ্বাসেরও শব্দ যেন গায়ে লাগছে। এটা যে আতঙ্ক থেকে হচ্ছে টের পেতেই গা ঝাড়া দিয়ে লাফিয়ে উঠে গেল পিছিলে।

আর তখনই মনে হল উইন্ডসহোলের আড়ালে কে যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। জাহাজের এখানে সেখানে উইন্ডসহোলগুলো প্রশ্নচিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার যে কোনও একটার আড়ালে একজন মানুষ অনায়াসে লুকিয়ে পড়তে পারে। যদি ইনজিন-রুম কিংবা বয়লার রুম থেকে কেউ উঠে আসে—আসতেই পারে, গ্যালি থেকে চা বানিয়ে নিয়ে যেতে পারে—এবং সে কেন এ-ভাবে উইন্ডসহোলের আড়ালে লুকিয়ে পড়বে! কে সে! কি যে হয়, তার দেখার বাসনা কে সে?'

সে ফল্কার উপর দিয়ে যমুনাবাজুর দিকে ছুটে গেল। যেন যে কোনও উপায়ে দেখা দরকার, কেউ সত্যি সেখানে গোপনে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ করছে কি না। অবাক, কেউ নেই! তার শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত ওঠা নামা করছে। কেউ নেই। শুধু কোনও জাহাজির পরিত্যক্ত একটি রঙের টব দেখতে পেল। চোখের ভুল কি না, বোঝার জন্য আগের জায়গায় সে ফিরে এসে বুঝল খুবই ঠকে গেছে। ঢেউয়ে জাহাজ দুলছে, জাহাজ দুললে সবই দোদুল্যমান। ছায়া লম্বা হয়ে যায়। ছায়া অদৃশ্যও হয়। রঙের টবটি সেই কুহক সৃষ্টি করছে। টবটি সরিয়ে নিয়ে অন্যত্র রেখে দিল সুহাস। ছায়া লম্বা হয়ে গেলে জেগে ওঠে, কিংবা ছায়া অদৃশ্য হলে যে ভুতুড়ে ব্যাপার সৃষ্টি হতে পারে এটা সে ভালই টের পেল। নিজের

এই বোকামির জন্য কিছুটা লজ্জিত। আর তখনই মুখার্জিদা হাজির—'হ্যাঁরে, তুই ছুটে গেলি কেন? কি খুঁজছিস।' সে বলল, 'না কিছু না। রঙের টবটা কে যে রেখে গেল! অন্ধকারে হোঁচট খেলে কি যে হত? ফল্কাব দুটো কাঠই খোলা।'

সকালে চার্লি তার বয়লার সুট পরে ডেকে বের হয়ে এল। হাতে আপেল। কামড়ে খাচ্ছে। লোকটাকে খোঁজা দরকার। সে এলিওয়েতে নেমে এল। যাব সঙ্গে দেখা, তাকেই গুডমর্নিং বলে লাফিয়ে ডেকে নেমে গেল। এবং সে জানে সুহাস উইনচে চলে আসবে—সে এ-জন্য কশপের ঘরে ঢুকে গেল। তার কাজ-কাম বিশেষ ভাগ করা থাকে না। সে খুশিমতো কাজ করে, তাকে কিছু করতে দেখলে সবাই খুশি হয়। সে উইনচে চলে যাবে, এবং সেখানে সে সুহাসকে পাবে।

তা-ছাড়া রাতে তাকে যে অবস্থায় দেখে গেছে তাতে সুহাসের দুশ্চিন্তা হবারই কথা। এখন দেখলে কেউ বিশ্বাসই করবে না, রাতে সে এত ভেঙে পড়েছিল। তার কেন যে মনে হল, সুহাসকে সব খুলে বলা দরকার। কিন্তু সুহাস কি-ভাবে নেবে কে জানে! এমনিতেই সেই হিমশীতল কঠিন মুখের কথা শুনে সুহাস কিছুটা ঘাবড়ে গেছে। দু-দিন হল সুহাসকেও সে স্বাভাবিক দেখছে না। কেমন গুম মেরে গেছে। শুধু যে সুহাস একা গুম মেবে গেছে তাও নয়—প্রায় সব জাহাজিরা। বিশমার্ক সি র নামেও কম অপবাদ নেই। 'প্রেসিডেন্ট কলিজ' জাহাজও সেই সমুদ্রে ডুবে গেছে। এমন সুরক্ষিত জাহাজ ভুল করে মিত্রপক্ষের মাইন ফিল্ডের উপব গিয়ে পড়বে কেউ ভাবেইনি। কারণ প্রেসিডেন্ট কলিজ জাহাজটা তো মিত্রপক্ষের সেনা নিয়ে লস এনজেলস থেকে যাত্রা করে ছিল। তারিখটাও তার মনে আছে। বিশমার্ক সি-র সে কিছু মানচিত্র দেখেছে চার্টরুমে। প্রেসিডেন্ট কলিজের নাড়ি-নক্ষত্রও লেখা আছে। আসলে জাহাজটা ছিল লাক্সারি জাহাজ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাহাজটাকে যুদ্ধের কাজে লাগানো হয়। জাহাজটা রওনা হয়েছিল ২৬ অক্টোবব ১৯৪২। নিউ হেব্রিডস দ্বীপপুঞ্জ মালার এসপিবিতো সান্তু দ্বীপের সামবিক বন্দবে ভিড়বার কথা। জাহাজটা ঘায়েল হল মার্কিন সেনাদের পুঁতে বাখা মাইনসে। কি করে এটা হল, মার্কিন সেনাধ্যক্ষরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলেন না—কারণ তাদের নির্দেশেই জাহাজ তার গতিপথ স্থির করে নিচ্ছিল। এটা অন্তর্ঘাতমূলক কাজও নয়—কোথায় কি আত্মরক্ষার্থে পেতে রাখা হয়েছে তাও তাদের নখদর্পণে। কোনও অদৃশ্য অশুভ প্রভাবেই জাহাজটা ডুবে গেল সমুদ্রে। মার্কিন সেনাধ্যক্ষরাও এমন বিশ্বাস করতেন সে সময়ে।

সেই সমুদ্রে তাবা মাটি টানার কাজে যাচ্ছে। জাহাজিদের মন ভাল না থাকারই কথা। 'প্রেসিডেন্ট কলিজ' জলের তলায় ডুবে আছে তারা জানে না। তবে তারা জানে অসংখ্য জাহাজ এবং সামরিক বিমানের কবরভূমি সেই সমুদ্র। 'কলিজ তো হাববার থেকে বেশি দূরেও ছিল না।' যে ক'জন প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন তাঁদের সাক্ষাৎকারের বিবরণও দেওয়া আছে। এঁদের মধ্যে ফার্স্ট-লেফটেন্যান্ট ওযেব থমপসনও ছিলেন। তিনি বলেছেন—সহসা তীরের কাছে ছোট্ট আলোর ঝলকানি দেখতে পেলাম। আমাদের সংকেত পাঠানো হচ্ছে—ডেনজার অ্যাহেড। অর্থাৎ আমরা বিপজ্জনক এলাকায ঢুকে যাচ্ছি। ভাল কবে সংকেত বুঝতে না বুঝতেই মনে হল সমুদ্র আমাদের সেদিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ক্রুদের কিছু করণীয় ছিল না। জাহাজ যেন নিজেব খুশিমতো ধেয়ে যাচ্ছে। ওটা যে মিত্রপক্ষের মাইনফিল্ড আমাদেরও জানা ছিল। তবু জাহাজের উপর আমাদের কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না। তারপরই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। প্রায় পাঁচ হাজার সেনা নিয়ে জাহাজটা সমুদ্রের অতলে চোখের সামনে ডুবে গেল। লাইফ জ্যাকেটও পরার সময় পাওয়া যায়নি। বাবার ডাইরিতে খুবই সুরক্ষিত অবস্থায় রাখা মানচিত্র থেকেই সে এ-তথ্য উদ্ধার করেছে। ডাইরিটা বাবা চার্টরুমে নিজের লকারে রেখেছেন। কেন রেখেছেন সে অবশ্য তার কিছুই জানে না। এত যত্ন কেন তাও সে জানে না।

জাহাজ মাটি টানার কাজে যাচ্ছে শুনে জাহাজিরা ভাল নাই থাকতে পারে। সুহাসকে সে 'কলিজের' খবর দেয়নি। কে জানে সে যদি জাহাজিদের 'কলিজ' নিয়ে গল্প করে তবে নিশ্চিত যে তারা আরও

বেশি ভেঙে পড়বে। জাহাজে একটা বড় রকমের গোলমাল হয়ে গেছে। ফলে জাহাজিরা খুবই নিষ্প্রাণ। সে ডেকে নেমে এটা আজ আরও বেশি টের পেল। এত উৎপাত কার ভাল লাগে।

কশপের ঘর থেকে সে চিজেল নিল। ছোট্ট হাতুড়ি নিল। কিছুটা রং বার্নিশ। সে চিপিং করবে কোথাও। বসে গেলেই হল। জাহাজের ছাল চামড়া নোনা হাওয়ায় নোনা ঢেউয়ে অনবরত ছাড়িয়ে নিচ্ছে—চিপিং করে যেখানে খুশি রং বার্নিশ লাগানো যায়। কশপ তাকে দেখলে কিছুটা ঘাবড়ে যায়। বাশি রাশি চিজেল হাতুড়ি র‍্যাক থেকে টেনে নামাতে থাকে। তখন তার খুব হাসি পায়। এরা বড়ই ভীতু স্বভাবেব। না হলে এভাবে জাহাজ মাটি টানার কাজেও যেতে পারত না। কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরাও খুশিমতো জাহাজটাকে আঘাটায় ফেলে রাখতে পারত না। এবা আছে বলেই পাবছে।

সহসা কোথা থেকে ঘন কুয়াশা ধেয়ে এল। আবছামতো হয়ে আছে সব। এটা হয়—সে মাঝে মাঝে শীতেব সমুদ্রে এমন হতে দেখেছে। চারপাশে জলরাশি ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব নেই। দু-তিন জোড়া অ্যালবাট্রস পাখি জাহাজেব পেছনে উড়ছে। জাহাজ বন্দর ছাড়লেই পাখিগুলি উড়তে শুরু করে। জাহাজের সঙ্গে পাখির যেন কোনও যোগসূত্র আছে। কুয়াশায় ঢেকে যাওয়ায় পাখি এবং নীল জলরাশি আর দেখা গেল না। সব অদৃশ্য হয়ে গেল মুহূর্তে! চার্লি কশপের ঘর থেকে উঠে ইনজিন রুম পাব হয়ে চলে গেল উপরে। কোথায় কোন্ উইনচে সুহাসেব কাজ সে জানে না। বোট ডেকে উঠে গেলে বোঝা যাবে। ফবোয়ার্ড ডেকেও থাকতে পাবে আবার আফটার ডেকেও থাকতে পারে। চার্লি বোট-ডেকে উঠে দেখল সামনে পেছনে কেউ নেই। ঘড়ি দেখে বুঝল, সে আজ খুব সকাল সকাল কাজে বেব হয়ে গেছে। পিছিলে নাবিকদের জটলার মধ্যে দেখল সুহাস বসে আছে। নীল জামা, নীল প্যান্ট পরনে। শীতেব কামড় কমে আসছে বোঝা যায়। জাহাজ যাচ্ছে নর্থ নর্থ ওয়েসটে। যত উপবে উঠে যাবে জাহাজ তত শীত কমে আসবে। আর চাব পাঁচদিন, বেশি হলে এক হপ্তা শীত থাকবে—তাবপর উষ্ণ সমুদ্রে জাহাজ ঢুকে গেলেই হাই ফাই কবতে শুরু করবে সবাই। রোদে ডেক তেতে থাকবে, কখনও ঘূর্ণিঝড়ে পড়ে যাবে জাহাজ—অথবা জ্যোৎস্নারাতে দেখতে পাবে, ফল্কায নাবিকরা মাদুব পেতে বসে আছে। রঙের টব বাজিযে কেউ নেচে নেচে গান করছে।

চার্লি নাবিকদের ভিড়ে দৌড়ে যেতে পারত। কিন্তু আজ কেমন তার সঙ্কোচ হল। সুহাসটা যে কি, সে তো দেখতে পাচ্ছে বোট-ডেকে সে দাঁড়িযে আছে। সুহাসেব তো উচিত, তাকে দেখেই ছুটে চলে আসা। কেন যে আসছে না। সে হাই কবে আজ ডাকতেও পাবল না।

সুহাস এদিকেই উঠে আসছে। চা-চাপাটি খেয়ে কাজে বের হয়ে পড়ারই সময় এটা। ছুটি সেই বারোটায়। জামার আস্তিনে মুখ মুছতে মুছতে বোট-ডেকের নিচে এসে হাত তুলে দিল। তারপব বলল, 'জান সুহাস, আমি ভাবছি লোকটাকে খুঁজে দেখব। আমার সঙ্গে আসবে। লোকটা এই জাহাজেই কোথাও ঘাপটি মেরে আছে মনে হয়।'

'চোখের ভুল চার্লি, কাল এটা টের পেলাম।'

'চোখের ভুল বলছ' তার মানে! তুমি আমাকে কি খুব বোকা ভাবছ।'

'মনে হয়। না হলে উইন্ডসহোলের পাশে কে অদৃশ্য হয়ে গেল দেখতে পাব কেন। গিয়ে দেখি বঙের টব। তারপর কেমন উত্তেজিত হয়ে বলল, মাথায় তোমার পোকা ঢুকে গেছে চার্লি। তোমাকে কেউ অনুসরণ করছে। ডাঙায় তবু বিশ্বাস করা যায়—জাহাজে উঠে আসতে পারে কখনও। ধরা পড়বে না!'

চার্লি বলল, 'আমাদের কেউ নয় তো!'

সুহাস কিছুটা বিব্রত গলায় বলল, 'কার দায় পড়েছে, বুঝি না। কেন করবে বল? আমরা জাহাজে কাজ করতে এসেছি—কেউ তো গোয়েন্দাগিরি করতে আসিনি। যদি ধর উঠেই আসত—সে কেন এতদিন গোয়েন্দাগিরি করল না। তা-ছাড়া আমি বুঝিও না, তোমার পেছনে লেগে কি লাভ। সব কিছুর তো যুক্তি থাকবে। মুখার্জিদা তো বলল, মানুষ ভয় পেলে অনেক কিছু দেখে ফেলে। বনের বাঘে খায় না জান, মনের বাঘেই খায়। আহামদ বাটলার না হলে দেখে ফেলে, বরফঘরে লাশ ঝুলছে! লোকটা তো ত্রাসে পড়ে উন্মাদই হয়ে গেল।

চার্লি সুহাসের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছে। ওরা ফরোয়ার্ড ডেকে নেমে গেল। সুহাস জানে মুখার্জিদা জাহাজে অনেক সফর দিয়েছেন। অভিজ্ঞ মানুষ। তাঁর কথার দাম আছে। তা ছাড়া আহামদ বাটলারকে ভয় না পাইয়ে দিলে বরফঘরে লাশ ঝুলছে কখনই দেখতে পেত না।

সুহাস ঠাট্টা করে বলল, 'তুমি উল্কি পরলে পারতে।'

'উল্কি!' চার্লি সহসা ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল।

'বারে দেখছ না, জাহাজে বুকে পিঠে হাতে উল্কি নিয়ে কত জাহাজি ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের মুখার্জিদার হাতেও উল্কি আছে জান। হরে কৃষ্ণ, হরে রাম হাতে লিখে রেখেছে। তিনি কখনই বিশ্বাস করেন না, কোনও অপদেবতা তাকে কাবু করতে পারে। ছুঁতেই তাকে ভয় পায়। তাকে দেখলে ত্রিসীমানায় অপদেবতারা আসে না। আমার আর কোনও ভয় নেই।'

'তোমার কোনও ভয় নেই!'

'না।'

হাত ঝেড়ে সুহাস যেন সাফসুফ হয়ে গেল!

চার্লি পকেটে হাত দিয়ে রেলিঙে হেলান দিয়ে আছে। সুহাসের কথা বোঝার চেষ্টা করছে। সে কি বলতে চায়, আসলে ঘোরে পড়ে দেখে একটা হিমশীতল পাথরের মতো মুখ তাকে অনুসরণ করছে। তাকে কি সাহস জোগাচ্ছে। মন থেকে হাবিজাবি চিন্তা দূর করে দিতে বলছে?

'মুখার্জি জানে?'

'কি জানে!'

'এই জাহাজেও সে উঠে এসেছে!'

'জানে।'

'ম্যাককে কেউ ঠেলে ফেলে দিয়েছে জানে?'

'না, জানে না। কেউ উঠে এসেছে শুনেই এমন মজা করতে শুরু করলেন, আর বলি! আমার খেয়েদেয়ে কাজ নেই! সবার সামনে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা শুরু করবে। জান মুখার্জিদাই কিন্তু ডারবান বন্দরে বলেছিল পারে, আহামদ বাটলার লাশ দেখতেই পারে। আবার সেই মানুষটাই বলছে, সব ঘোরে পড়ে হয়। কি যে কখন বলে! তবে উইন্ডসহোলের পাশে ছুটে না গেলে বুঝতে পারতাম না, ভয় মানুষকে কতটা কাবু করে রাখে। গভীর রাতে বোট-ডেক থেকে নেমে আসার সময় মনে হচ্ছিল, অনুসবণকারী আমাকেও অনুসরণ করছে। কি আতঙ্ক, ভাগ্যিস মুখার্জিদা বোট-ডেকে দাঁড়িয়েছিলেন। ভাগ্যিস আমাকে ছুটে যেতে দেখে তিনিও ছুটে এসেছিলেন। না হলে কি যে হত!'

চার্লি বলল, 'উল্কি পরলেও রেহাই পাব না। আমি জানি সে আছে। সে জাহাজেই উঠে এসেছে। আচ্ছা সুহাস তুমিই বল, জাহাজ ছেড়ে দেবার আগে দেখলেও না হয় কথা ছিল। লায়ন রকের পাশ দিয়ে যাচ্ছে জাহাজ। পোর্টহোল খুলে রকটা দেখছি। সমুদ্রের শেষ ডাঙা। তুমিও নিশ্চয় দেখছিলে। সবারই তো শেষ ডাঙা দেখাব কৌতূহল থাকে। কি থাকে কি না বল!'

'থাকে।'

'ডাঙা দেখা কি অপরাধ?'

'অপরাধ হবে কেন?'

'অপরাধ নয় যখন চুরি করে দেখছিলাম না! মানে আমি বলতে চাইছি, লুকোচুরি খেলছি না। মনে কোনও আতঙ্কও ছিল না। আতঙ্কে কোনও ঘোরেও পড়ে যাবার কথা না। মগজ আমার যথেষ্ট তাজা ছিল। চোখ খারাপ না। তখন যদি দেখি পোর্টহোলে পাথরের মতো নিষ্ঠুর চোখ, তুমি স্থির থাকতে পারতে!'

'না পারতাম না। দেখলে সত্যি পারতাম না। আচ্ছা চার্লি সে ব্যাটা জাহাজে থাকবে কি করে? কোথায় পালিয়ে থাকবে?'

'আমিও তো তাই ভাবছি।'

'আমাদের কেউ হলে চিনতে পারতে!'

'সেই তো! মাথায় আসছে না। দাড়ি গোঁফ বাবরি চুল কার আছে? সারেঙের দাড়ি-গোঁফ আছে। পাকা দাড়ি-গোঁফ। চুলও সাদা। তিনি কেন আমার পোর্টহোলে উঁকি দেবেন! তা ছাড়া তাঁর তো বাববি চুল নেই। দাড়িও কোঁকড়ানো নয়। লোকটা যে কে? মুখ দেখে লোকটা কে বুঝতে পারছি না। আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকলে বোঝাও কঠিন।'

মালবাহী জাহাজে বাইরের কোনও লোক থাকার কথা না। সেই ডেকসারেঙ, ইনজিন সারেঙ, ডেকটিন্ডাল, ইনজিনটিন্ডাল, সুখানি, গ্রিজার, আব সব সাধারণ জাহাজি। আর আছে বাটলার, মেসরুম-বয়, মেসরুমমেট, কাপ্তানবয়, চিফকুক। এ-ছাড়া রেডিও অফিসার, কার্পেন্টাব চিফমেট সেকেন্ডমেট থার্ডমেট, পাঁচজন ইনজিনিয়ার। ফাইভার ম্যাক আর সেকেন্ড ইঞ্জিনিয়ার কিছুটা কমবয়সী। পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছরের তারা। আব তো জাহাজে সব বুড়ো হাবড়ার দল।

ফাইভার উইনচে চলে এসেছে। সুহাসও উইনচের পাশে দাঁড়িয়ে বলল, 'কি করি বল তো?'

'আমার সঙ্গে এস।'

'ফাইভারকে বলে নাও। রাগ করতে পারে।'

চার্লি ছুটে ফাইভারের কাছে চলে গেল। বলল, 'সুহাসকে নিয়ে নিচে যাচ্ছি। যদি ছেড়ে দাও।'

ফাইভারের বিগলিত মুখ! সে বলল, 'নিশ্চয় যাবে। কেন যেতে চাইছে না?'

'তুমি না বললে যাবে না বলছে।'

ফাইভার হেসে দিল। বলল, 'খুব অনুগত দেখছি আমার। এই ছোকরা, যাও। চার্লি কি বলছে, শোনো।'

তারপর তারা দুজনেই ছুটে কয়লার বাঙ্কারে নেমে গেল। সিঁড়িতে লাফিয়ে নামছে, লাফিয়ে উঠে আসছে। কয়লার বাঙ্কারে কয়লা টানছে হাফিজ। পোর্টসাইড বাঙ্কারে কয়লা টানছে আবেদালি।

তারা লম্ফ তুলে ক্রস বাঙ্কাবও খুঁজল। কয়লার পাহাড়। নিচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কয়লার বেলচা এবং হাতে ঠেলা গাড়ি। কেউ নেই। হাফিজ আবেদালি দুজনই অবাক, সুহাস কাপ্তানের ব্যাটাকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে কেন? সিঁড়িতে ওঠার সময় সুহাস বলল, 'নেই। আমাব মনে হয়—লায়ন রকে নেমে গেছে। তোমাকে শেষবারের মতো দেখে গেল।'

'ঠাট্টা করছ!'

'ঠাট্টার কি হল!'

'জাহাজ থেকে লাফিয়ে সমুদ্রে কেউ পড়তে পারে? পড়লে প্রপেলার টেনে নেবে না।'

'শোনো আমি কোনও মানে খুঁজে পাচ্ছি না, সত্যি তুমি বল, কেন একটা অচেনা ভুতুড়ে লোক তোমাব পোর্টহোলে উঁকি দেবে। কি কারণ থাকতে পারে। জাহাজে এত লোক থাকতে বেছে বেছে তোমার পোর্টহোলেই দাঁড়াল! পিকাকোরা পার্কে তোমাকেই দেখল! কি জানি মাথায় আমার কিছু আসছে না।'

'সুহাস, লোকটা আমাকে লসএনজেলস থেকে অনুসরণ করছে। আবছা অন্ধকাবে ভেসে ওঠে। আবার মিলিয়ে যায়! কেন যায় বল!'

'লস এনজেলস থেকে বলছ! কই আগে তো বলনি!'

চার্লি কেমন আর জোর পাচ্ছে না। সে বলল, 'ফক্কার ভিতর বসে থাকতে পারে। টানেল-পথে যদি থাকে। যেন আছেই। অন্তত যে-ভাবে হাঁটছে চার্লি এবং খুঁজছে তাতে সংশয়েরও কারণ থাকতে পারে না। অগত্যা সে না বলে পারল না, তোমার বাবাকে বলছ না কেন? তিনি তো এক দণ্ডে সব ফয়সালা করে দিতে পারেন, আছে কি নেই দেখতে পারেন। সবাইকে মাস্তারে দাঁড়াতে বলতে পারেন। খুঁজে দেখতেও বলতে পারেন। তাঁকে তুমি কেন যে বলছ না, বুঝছি না।'

চার্লি ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। বলল, 'যাও, যাও বলছি। তোমাকে খুঁজতে হবে না। একাই খুঁজব, একাই খুঁজে বের করব। বাবাকে কেন বলছি না, কৈফিয়ত দিতে হবে!'

সে চলে যাচ্ছিল। ফের ডাকল চার্লি—'ঘূণাক্ষরেও যেন কেউ জানতে না পারে আমরা তাকে খুঁজছি।'

আর তখনই ডেকে হল্লা। কে ডেরিক চাপা পড়ে থেঁতলে গেছে। বংশী চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে আসছে। 'সব ভাঙবে। সব যাবে। আমাদের রেহাই নেই। বাঁচতে চাও তো, জাহাজে আগুন ধরিয়ে দাও। পুড়িয়ে দাও, নইলে কেউ রক্ষা পাবে না। জাহাজ আমাদের শেষ করে দেবে। ঝড় নেই ঝাপটা নেই, ডেরিক কে ভাঙে! বোঝো না মিঞারা। মরবে, সব শালারা মরবে। জাহাজে কাউকে রেহাই দেবে না। সমুদ্রের শয়তান জাহাজে উঠে এসেছে।'

পাগলের মতো ফল্কার উপর দাঁড়িয়ে বংশী চিৎকার করছে। মুখার্জিদা ছুটে গেছেন তাকে সামলাতে। আর সবাই ছুটে যাচ্ছে ফরোয়ার্ড পিকে। ডেরিক কি ফাইভারের মাথায় ভেঙে পড়ল। সুহাসও ছুটতে থাকল।

দেখা যায় না।

ডেরিক, ওয়ারপিন ড্রামের উপর ভেঙে পড়েছে। ফাইভার থেঁতলে গেছে পুরোপুরি। ড্রামটার উপর ফাইভার ঝুলে আছে। হাত পা অসাড়। মাথা থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে।

কাপ্তান থেকে সব অফিসার ইনজিনিয়ারবা ঘিরে রেখেছেন জায়গাটা। ডেকসারেঙ ইনজিনসারেঙ অপেক্ষা করছেন, কখন তাঁদের তলব হবে।

কাপ্তান, ডেরিক খসে পড়ল কি করে, বোধ হয় ভেবে পাচ্ছেন না। তাঁকে গম্ভীর দেখাচ্ছে।

জটলার মধ্যে সুহাস দাঁড়িয়েছিল। মর্মান্তিক দৃশ্য সে সহ্য করতে পারে না। একবারই উঁকি দিয়ে দেখেছে—তারপর আর পারেনি। শরীর গোলাচ্ছে। সে চার্লিকে খুঁজল। চার্লি কোথাও নেই। যদি বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে থাকে—সেখানেও দেখল নেই। চার্লি কি তার নিজের কেবিনে হতাশ হয়ে গিয়ে শুয়ে পড়ল! মাত্র কিছুক্ষণ আগে তারা এখানে ছিল। সে ওয়ারপিন ড্রামের উপর ঝুঁকে ফাইভারের কাছে অনুমতি নিয়েছে। তখন ডেরিক ভেঙে পড়লে—ফাইভারের মতো তার অবস্থা হত। অথবা চার্লি যদি তাকে ডেকে নিয়ে না যেত, তার কি হত ভাবতে গিয়ে মাথা খারাপ হবার মতো অবস্থা। যেন অল্পের জন্য সে প্রাণে বেঁচে গেছে। ভাগ্যিস চার্লি তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল—সে আর চার্লি জাহাজের সর্বত্র লোকটাকে খুঁজছে। ইনজিন-রুমে সেকেন্ডের ওয়াচ—চার্লির সঙ্গে নিচে নেমে আসায় তিনি খুবই বিরক্ত। ভয়ে ভয়ে ইনজিন-রুম সে পার হয়ে গেছে। চার্লি পকেটে টর্চও নিয়েছিল। এমনকি যা মাথা খারাপ অবস্থা চার্লির তাতে চার্লি যদি বিল্‌জে নেমে যেত, জলের ট্যাঙ্কগুলির ভিতর ঢুকে যেত তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না। তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। মাঝে মাঝে সে বিরক্ত হয়ে বলেছিল, তোমার মাথা খারাপ চার্লি। জাহাজে এ-ভাবে কেউ পালিয়ে থাকতে পারে—না, সাহস পায়।

এখন মনে হচ্ছে, চার্লি তাকে প্রাণে বাঁচিয়েছে। সে ডেকে না নিলে খতম। চার্লির প্রতি এ-কারণে কৃতজ্ঞতাও কম নেই।

'দেখলি।' মুখার্জিদা ফিরে এসে বললেন।

'দেখলাম।' কেমন হতাশ গলায় সুহাস উত্তর দিল।

বয়লার রুম থেকেও লোকজন ছুটে চলে এসেছে। কাজ ফেলে আসা খুবই অনুচিত কাজ। ইনজিনসারেঙ ধমক দিলেন ছোট টিন্ডালকে, 'যাও মিঞা, নিচে যাও। কাজ কাম ফেলে উঠে এলে! সব নসিব।'

মুখার্জিদা বললেন, 'বেচারা।' তারপর কেমন আর্ত গলায় বললেন, 'আমি তো ভাবলাম তুই থেঁতলে গেছিস! ওখানে তো তোরই কাজ করার কথা!'

সুহাসের ভাল লাগছে না। তার মাথা ঘুরছে। সে বসে পড়ল। তার বাবা মার মুখ মনে পড়ল। গত জন্মের পুণ্যফল এমনও সে ভাবল।

এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কথা তারা ভাবতেই পারছে না। সবাই বিচলিত। কেউ কেউ সর্ষেফুল

দেখছে। বংশীদাকে দেখেই মনে হয়েছে এটা। সুহাস ফল্কার কাঠে হেলান দিয়ে বসে আছে। টোপাস হাজির। ডেক-জাহাজিরা দড়িদড়া বেঁধে ফাইভারের উপর থেকে বিশাল থামের মতো পড়ে থাকা লোহার ডেরিক, উইনচ চালিয়ে তুলে নিচ্ছে। জাহাজ ওঠানামা করছে বলে ফাইভারের হাত দোল খাচ্ছিল। মাথাও। তাকালেই চোখে পড়ছে। চিফকুক সেকেন্ডকুক থেকে কারপেন্টার কেউ বাদ নেই। কেউ কথা বলছে না।

আর এ-সময় সেকেন্ড ইনজিনিয়ার হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে এলেন। ওয়াচ ছেড়ে আসতে পারছিলেন না। ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলেন—এবং চিৎকার 'কে ডেরিক উপরে তুলল!'

এতক্ষণ কেউ ভাবেইনি, চালু জাহাজে কখনও ডেরিক তোলা থাকে না।

সত্যি তো। কে তুলল!

কিন্তু এ সব প্রশ্ন নিয়ে এ মুহূর্তে কারও মাথা ঘামাবার সময় নেই। কত তাড়াতাড়ি ফাইভারকে জলে ফেলে দেওয়া যাবে—অন্তত সবার ব্যস্ততা দেখে সুহাসের তাই মনে হল। দুজন ডেক-জাহাজি ছোট্ট একটা ট্রলিতে কাঠের বাক্স, কিছু ভারী পাথর এবং বস্তা নিয়ে হাজির। বোধ হয় কাপ্তানের নির্দেশেই ডেকসারেঙ সব বের করে এনেছেন। সুহাসের ইচ্ছেই করছে না, একবার উঠে গিয়ে সামনে থেকে দেখে।

ডেরিক যেখানে ভেঙে পড়েছে—কাপ্তান তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। খুঁটিয়ে দেখলেন। আপাতত তাঁর যে অনেক কাজ বুঝতেও কষ্ট হল না সুহাসের। কারণ তিনি বার বার চার্ট-রুমে ঢুকে যাচ্ছেন—তিনি যেখানে যাচ্ছেন, সেখানে চিফমেট সেকেন্ডমেট। লগবুকে সব নোট করার কাজ চিফমেট করছেন। কখন, কটায়, কোথায় যাবার সময় দুর্ঘটনা ঘটল, তার উল্লেখ—কত তারিখ, কে ছিল পাশে এবং জাহাজিদের সাক্ষ্য প্রমাণসহ তিনি তাঁর লগবুক সম্পূর্ণ করে ফিরতে প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় নিলেন। স্ট্রেচারে আপাতত তুলে রাখা হয়েছে ফাইভারকে। ওর সোনালি চুলে রক্তের দাগ। মুখ থেকেও রক্ত উগরে দিয়েছে। চক্ষু স্থির এবং খোলা।

সুহাসের একবার ইচ্ছে হয়েছিল, উঠে গিয়ে দেখে, ফাইভারের বুকপকেটে তার স্ত্রীর ছবি আছে কি না? সে তো সব সময় কাজে কিংবা কিনারায় বের হবার সময় বুকপকেটে স্ত্রীর এবং ছেলেমেয়েদের ছবি রাখত। এতে নাকি তার দিন ভাল যায়। কোনও বিপদের আশঙ্কা থাকে না। সে মনে করত, তার কোনও বিপদ ঘটবে না। আজ কাজে বের হবার সময় তা তার মনে ছিল কি না? কিন্তু তার পক্ষে ফাইভারের পকেট খুঁজে দেখা এ-সময় খুবই ঔদ্ধত্যের প্রকাশ। সামান্য একজন জাহাজির এতটা ঔদ্ধত্য অফিসাররা ভাল চোখে দেখবেন না। কাপ্তানেরও মন মেজাজ ভাল নেই। কারই বা আছে। তার পক্ষেও দেখা সম্ভব নয় বলেই সে বসে থাকল। উঠল না। একমাত্র চার্লি পারত। চার্লি গেল কোথায়। একেবারে নিখোঁজ হয়ে গেল! একবার এসে দেখল না পর্যন্ত। এটা যে খুব খারাপ দেখায় চার্লি কি বুঝছে না! চার্লি এতটা নির্বোধ হতে পারে সে কল্পনাই করতে পারছে না।

ফাইভারকে কফিনে ভরার আগে সে দেখল, চিফমেট তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছেন। পকেট হাতড়াচ্ছেন। বুক পকেট থেকে টোবাকো এবং পাইপ বের হল। নিচের পকেট থেকে দুটো ছোট চিজেল এবং হাতুড়ি—না আর কিছু না। টোবাকোর পাউচে থাকতে পারে। কাপ্তানকে একবার বললে হয়, সাব খুঁজে যদি দেখতেন। অবশ্য পরে সবই জানতে পারবে। তবে চার্লির এভাবে আড়ালে লুকিয়ে থাকা ঠিক হচ্ছে না। তার একবার এখানে এসে দাঁড়ানো উচিত। ফাইভার তো তার সঙ্গে দাবা খেলত। একজন বান্ধব ছিল জাহাজে তার।

সে মনে মনে বলল, এটা কি উচিত কাজ! তোমাব মন খাবাপ হতেই পারে। আমরা কি খুব ভাল আছি। দাবা খেলার সময় তো তোমার পাশে বসলে ক্ষেপে যেত। তোমার পাশে বসি—ফাইভার পছন্দ করত না। কই আমি তো না এসে পারিনি! সে আর না পেরে উঠে দাঁড়াল। যদি কেবিনে থাকে—সে এসে দেখল, কেবিনের দরজা বন্ধ। তা সবার কেবিনই ভিতর থেকে বন্ধ থাকে। সে খুটখুট করে আওয়াজ করল দরজায়। তারপর বলল, আমি সুহাস। তুমি কি চার্লি! একবার ফাইভারকে দেখলে না! সে কফিনে শুয়ে আছে।

ভিতর থেকে কোনও সাড়া নেই। তা হলে কি চার্লি ভিতরে নেই। আশ্চর্য, গেল কোথায়।

আর ফেরার সময় দেখল, চার্লি ব্রিজে ওঠার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখছে অপলক। মুখ কেমন রক্তশূন্য। চার্লি তা হলে ব্রিজে ছিল! কাচের ঘেরাটোপে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল! ব্রিজ থেকে সামনের মেনমাস্ট এবং চারটে উইনচই দেখা যায়। মাস্তুলের তলা আরও স্পষ্ট। এমনকি কে কে সেখানে ছুটে গেছে, তাও সে দেখতে পেয়েছে। চার্লি তাকে দেখে ধীরে ধীরে নেমে আসছে। রেলিং ধরে কিছুটা নেমে থমকে দাঁড়াল।

'আমাকে খুঁজছিলে?'

'ভাবলাম তুমি কোথায়?'

'ব্রিজে ছিলাম।'

'একবার যাবে না ম্যাককে দেখতে?'

'না।'

স্পষ্ট উত্তর।

'যাওয়া উচিত।'

'তুমি আমাকে যেতে বলছ?'

এমন ঠাণ্ডা গলায় কথা বলছে যে সে কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। সে বলার কে? সে বললে যাবে, না বললে যাবে না—এটাও যেন কিছুটা অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সুহাসের পক্ষে। তা ছাড়া চার্লিকে তার ধন্যবাদ জানানো দরকার। কিন্তু এটা খুবই স্বার্থপরের মতো আচরণ করা হবে। চার্লি এতে ক্ষুব্ধ হতে পারে—সুহাস তুমি শুধু নিজের কথা ভাবছ, বলতেই পারে। ম্যাক আমাদের মধ্যে আর নেই। শোক করার সময়। শোক করার সময়ে কেউ নিজের কথা ভাবে না। এমন বলতেই পারে। অবশ্য চার্লি হয়তো জানে না, শোকের সময়ই মানুষ নিজের কথা বেশি ভাবে, নিয়তির কথা বেশি ভাবে—যাই হোক, চার্লিকে এ-সব কথা বলার কোনও অর্থ হয় না। চার্লি নিজে না গেলে তার বলাও উচিত হবে না, তোমার কিন্তু ম্যাকের পাশে একবার গিয়ে দাঁড়ানো উচিত!

তারপরই মনে হল, সে তো চার্লিকে খুঁজছিল, ম্যাকের পকেটে তার স্ত্রীর সেই প্রিয় ছবিটি আছে কি নেই। ম্যাক আর তার স্ত্রী গির্জার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে। ছবিটা তাকেও দেখিয়েছে। এই নিয়ে হাসাহাসি কত। তার সরল বিশ্বাসের প্রতি সুহাসের কিছুটা অবজ্ঞা ছিল। কিন্তু আজ কেন যে মনে হল, ওটা পকেটে থাকলে এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হত না ম্যাক। না হলে সে ভাববে কেন, ওটা পকেটে আছে কি নেই। ম্যাককে রাতে কে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল—সে কে? উইনচে কাজ করতে এসে তাও সে ভুলে গিয়েছিল—তার বলাই হয়নি, ম্যাক তুমি তাকে দেখেছ? তুমি জান কে তোমাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে? ইস সে এতটা লঘু করে দেখবে বিষয়টা ভাবেইনি। অথচ রাতে এই নিয়ে তার কি না ত্রাস গেছে।

এটাই তার দোষ। তার কেন, সব মানুষের। দিনের বেলায় যেন কোনও ত্রাস থাকার কথা না। সারা জাহাজে কাজকর্মের ব্যস্ততা, কেউ একদণ্ড চুপচাপ বসে নেই। যে যার মতো কাজে ব্যস্ত। ডেক-জাহাজিরা কেউ চিপিং করছে, কেউ রং করছে, কেউ জল মারছে। মাস্তুলের উপরে উঠে গেছে কেউ, দড়িদড়া গোছাতে কেউ ব্যস্ত। বাটলার ডাইনিং হল নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে—গ্যালিতে রান্নার ঝাঁঝ। মনেই হয় না জাহাজে কোনও অশুভ প্রভাব থাকতে পারে। সকাল হলেই সে হালকা হয়ে গিয়েছিল—ম্যাককে একবার জিজ্ঞেস করতেও ভুলে গেল যে, তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে, না সে পা ফসকে সত্যি পড়ে গেছে!

জাহাজে এটা অশুভ প্রভাব থেকে হচ্ছে, না, কোনও আত্মগোপনকারী আততায়ীর কাজ!

চার্লি বলল, 'চল নিচে।'

চার্লি নিচে নামার সময় বলল, 'আমাকে খুঁজছিলে কেন?'

'ম্যাকের পকেটে ছবিটা আছে কি না যদি দেখতে!'

'কি হবে?'

'কি হবে জানি না। আমার তো মনে হয় ম্যাক আঁচ করতে পেরেছিল!'

'আঁচ করতে পেরেছিল, আঁচ করতে পারলে কি উইনচে মরতে যাবে স্ত্রীর ছবি পকেটে নিয়ে!'

সুহাস বুঝল, বুঝিয়ে লাভ নেই। চার্লি বুঝছে না, সত্যি যদি ত্রাসে পড়ে গিয়ে থাকে ম্যাক, তবে স্বাভাবিক কাজকর্মগুলির মধ্যে অস্বাভাবিকতা ফুটে উঠবে। সাধারণত জাহাজে কাজ করার সময়, কিংবা জাহাজে ঘুরে বেড়াবার সময় সে স্ত্রীর ছবি সঙ্গে রাখে না। জাহাজটা তো তাদের কাছে বাড়িঘরের মতো। কিনারায় নামলেই, সে ছবিটা সঙ্গে রাখত। তার মাও তো সঙ্গে ঠাকুরের বেলপাতা দিয়েছে। কাজে নামার সময় কি সঙ্গে নেয়। নেয় না। সে ঠাকুরের বেলপাতা কিনারায় নেমে যাবার সময়ও সঙ্গে নেয় না। কারণ বালিশের নিচে আছে—বালিশের নিচে থাকলেই সে বেশি নিরাপদ। সারাদিন সে যেখানেই থাকুক, রাতে ঠাকুরদেবতার বেলপাতা মাথায় দিয়ে শুয়ে থাকতে পারে। ঠাকুরদেবতার প্রতি তার তেমন আগ্রহ না থাকলেও ঠাকুরের ফুল বেলপাতাকে কেন যে অগ্রাহ্য করতে পারে না। তার কোনও ভয় থাকার কথা না। এও আর এক উল্কি পরে থাকার মতো। ম্যাকের হাতে কিংবা বুকে, অথবা পিঠে কোথাও কোনও উল্কি আঁকা ছিল না। কাপ্তানের হাতে মা মেরির ছবি আছে। সেকেন্ড ইনজিনিয়ারের হাতে সে গির্জার ছবি দেখেছে। কেউ যিশুর মুখ উল্কিতে এঁকে নিয়েছে বুকে—যে যেমন বিশ্বাস করে থাকে। ম্যাক যদি রাতে টের পায়, কেউ তার পিছু নিয়েছে, তবে সে পকেটে স্ত্রীর ছবি রেখে দিতে পারে। জাহাজও নিরাপদ নয় ভাবলে কাজের সময়ও পকেটে রেখে দিতে পারে। তবে সুহাস এ-সব ভেঙে বলতে চায় না। একবার দেখা দরকার, ম্যাকের কেবিনে যদি কিছু পাওয়া যায়। অর্থাৎ এটা নিছকই দুর্ঘটনা, না কোনও পরিকল্পিত হত্যা, না জাহাজের অশুভ প্রভাবে এটা হয়েছে তার বোঝা দরকার। কারণ সে আঁচ করতে পারছে যদি পরিকল্পিত হত্যা হয়, তবে সেও জড়িয়ে আছে। একা ম্যাক নয়—অথবা ম্যাক অকারণে শিকার হয়েছে, সে বেঁচে গেছে। কিংবা দুজনকেই সরিয়ে দেবার তালে আছে অদৃশ্য ঘাতক।

কফিনে তখন পেরেক পোঁতা হচ্ছিল। তার শব্দ কানে আসছে। বড় বিশ্রী লাগছে। সারা জাহাজ কাঁপিয়ে দিচ্ছে হাতুড়ির শব্দ। কারপেন্টার দাঁতে চেপে রেখেছে কফিনের কাঠ মাপার দড়ি। সবাই ইতস্তত দাঁড়িয়ে জটলা করছে। কেবল ইনজিনরুমে যারা আছে তারা উঠে আসেনি। কোনও নাবিককে সলিল সমাধি দেবার কি প্রক্রিয়া সে ঠিকঠাক জানে না। জাহাজটা সত্যি অজানা সমুদ্রের দিকে ধেয়ে যাচ্ছে না থেমে আছে। বোঝা যায় না, ঠিক সামনে অথবা জাহাজের কিনারায় গিয়ে না দাঁড়ালে। প্রপেলারের শব্দে টের পায় সে, জাহাজ যাচ্ছে। পিছিলে দাঁড়ালে টের পাওয়া যায় প্রপেলার নীল জলের নিচে পাক খেতে খেতে অস্থির। এমনিতে চারপাশে তাকালে মনে হয় শুধু অসীম অনন্ত জলরাশি—আর কিছু না। মনেই হয় না জাহাজটা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সমুদ্রে। যেন থেমে আছে। জাহাজটা তার একজন নাবিককে সলিল সমাধি দেবার জন্য যেন প্রস্তুত হচ্ছে। কিছু উড়ন্ত মাছের ঝাঁক চোখে পড়ে যায়। তীব্র বর্শা ফলকের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে আবার জলের তলায় হারিয়ে যাচ্ছে। কিছু ডলফিনের ঝাঁক দূরে অদূরে ভেসে বেড়াচ্ছে। আর মনে হয় আজ সমুদ্র বড়ই শান্ত। তার কোনও শোকতাপ নেই। এমন কি জলপায়রার ঝাঁকও আর চোখে পড়ছে না—তারা তীরের কাছাকাছি কোথাও আবার ফিরে গেছে। শুধু বিশাল দু-জোড়া অ্যালবাট্রস পাখি উড়ে আসছে। মানুষের অন্তিম সময় কি ভাবে কাটে দেখার জন্য এক জোড়া পাখি মাস্তুলের ডগায় এসেও বসেছে। তারা পাখায় ঠোঁট গুঁজে বিশ্রাম নিচ্ছে দেখলে এমন মনে হতেই পারে।

সুহাস দেখল চার্লি তার বাবার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং কি যেন খোঁজাখুঁজি করছে। কারণ সে ম্যাকের টোবাকোর পাউচ হাতে নিয়ে কিছু যে খুঁজছে বুঝতে অসুবিধা হল না। যাক জানা যাবে, স্ত্রীর ছবি ওতে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে কি না ম্যাক।

ম্যাকের গায়ে নতুন কাপড় পরাবার আগে টোপাজ শরীরের রক্ত নোনা জলে ধুয়ে দিল। ডেকের রক্তও সে নোনা জলে সাফ করেছে। অন্তত ডেকের কোথাও আর রক্তের দাগ নেই। রক্ত কি কখনও খুনের গোপন রহস্য তুলে ধরতে পারে। এত পরিষ্কারই বা করা হচ্ছে কেন! থাক না, কাঠে কিছু

রক্তের দাগ লেগে থাকলেও ম্যাক জাহাজে আছে এমন ভাবা যেতে পারত। তাও রাখা হবে না। টোপাজ নিখুঁতভাবে ডেক পরিচ্ছন্ন করে তুলছে।

টোপাজ কাজ দেখাচ্ছে এমনও মনে হল সুহাসের। আর তখনই চার্লি এসে খবর দিল, 'আছে।'

সুহাস বলল, 'ওটা তোমার কাছে রেখে দিয়ো।'

চার্লি টোবাকোর পাউচটা সামান্য আলগাভাবে ধরে আছে। কারণ এটা যে কোনও মৃত মানুষের পকেট থেকে কিছুক্ষণ আগে উদ্ধার করা হয়েছে চার্লির পাউচটি ধরে রাখার কায়দাতেই তা টের পেল সুহাস। খুব একটা স্বস্তি পাচ্ছে না। এতেও হয়তো রক্তের দাগ লেগে আছে। এটা যে সে তার কেবিনে নিয়ে যেতে পারবে না, নিয়ে গেলেও রাতে ঘুমাতে পারবে না, চার্লির ভাবভঙ্গিতেই তা টের পাওয়া যাচ্ছে।

চার্লি কি ভেবে বলল, 'না রাখা যাবে না। আমার ঘরে রাখতে পারব না। তা ছাড়া দেবে কেন রাখতে?'

'কার কাছে থাকবে?'

'ওর কেবিনে রেখে দেওয়া হবে। যা ম্যাকের ছিল, সব কিছুই তার কেবিনে রেখে দেওয়া হবে।'

ম্যাকের কেবিনে থাকলেও সুহাসের আপত্তি নেই। কিন্তু যদি এটি পরিকল্পিত হত্যা হয়ে থাকে – তবে ম্যাকের কেবিন থেকে ছবিটা চুরি যাওয়াও বিন্দুমাত্র অসম্ভব না। তা ছাড়া ছবিটার সঙ্গে দুর্ঘটনার কোনও সম্পর্ক আছে এমনই বা ভাবছে কেন। তবে ম্যাক স্বাভাবিক ছিল না এটা বুঝতে কষ্ট হয় না। হয়তো কিছু আঁচ করেছিল।

সুহাস বলল, 'চাবি কার কাছে থাকবে?'

'যেমন থাকে, চার্টরুমে থাকবে।'

সব চাবিগুলি চিফমেটের এক্তিয়ারে। কেউ চাবির গোছা ঝুলিয়ে রাখে। ডুপ্লিকেট চাবির সবগুলিই কেবিনের নম্বর অনুযায়ী বোর্ডে রেখে দেওয়া হয়। এখন থেকে সব কেবিনেরই একটি মাত্র চাবি বোর্ডে ঝুলে থাকলেও ম্যাকের থাকবে দুটো চাবিই। কারণ চাবিটা কোথায় ম্যাক রেখেছে তা নিয়ে খোঁজাখুঁজি হবে। ম্যাকের কেবিনেও ঢোকা হবে। কেবিনে তার কি কি আছে তারও তালিকা করা হবে। সর্বাগ্রে প্রয়োজন হবে চাবিটার। চাবিটা খুঁজে পাওয়া খুবই জরুরি।

সহসা জাহাজের সাইরেন বেজে উঠল।

জাহাজ সত্যি থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। একমাত্র তিন নম্বর সুখানি ছাড়া কেউ এখন জাহাজে কর্তব্যরত নয়। এমনকি ইনজিন-রুম থেকেও সবাই উঠে এসেছে। সবাই সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে। বয়লার রুমেও কেউ নেই। কয়লার বাঙ্কারও খালি।

চিফমেট ডেকসারেঙকে ডেকে কি বললেন। সুহাস শুনতে পায়নি। জাহাজে ডিউটির সময় অফিসারদের ইউনিফর্ম পরে থাকতেই হয়, যাঁরা ডিউটি দিচ্ছেন না, তাঁরাও যে যার ইউনিফরম পরে নেমে এসেছেন। সেই ব্যস্ততা আর যেন কারও মধ্যে নেই। কারণ সুহাস যখনই দেখে, দেখতে পায় গট গট করে এক একজন অফিসার অতি দ্রুত নেমে যাচ্ছেন, উঠে যাচ্ছেন। কেউ সুস্থিয়ালা নয়। চলাফেরায় অত্যন্ত মেজাজি সবাই। তারা কেউ নেমে এলেই বুটের খটাখট শব্দ শুনতে পায়। নেভি ব্লু সার্জের তৈরি ঝকঝকে দামি পোশাক। মাথায় সাদা অ্যাঙ্কারের টুপি, পায়ে সাদা বুট, পদমর্যাদা অনুসারে কারও কোটে একটা দুটো তিনটে সোনালি স্ট্রাইপ। সাধারণ জাহাজিদের পোশাক বলতে, নীল রঙের কম্বলের প্যান্ট আর সোয়েটার। তবে আজ সবাইকেই নীল রঙের টুপি পরতে হয়েছে। সেও পরে এসেছে। আর সবাই কেমন সুস্থিয়ালা—সহসা সবাই যেন মিইয়ে গেছে।

কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতা হয়ে গেল। ডেকসারেঙ মুসলমান জাহাজিদের নামাজ পড়ার ইঙ্গিত দিলেন। তারা সবাই একদিকে। মুখার্জিদা তিন নম্বর সুখানি বলে ব্রিজ থেকে নেমে আসতে পারেননি। সে দেখল, মুখার্জিদা তাকে হাতের ইশারায় কি যেন বলতে চাইছেন। সুরঞ্জন অধীরও তাকাল। তারা জাহাজের বাঙালিবাবু। অর্থাৎ হিন্দু জাহাজিরা সবেমাত্র জাহাজের লাইনে আসছে—তাদের সারেঙ

থেকে টোপাজ ডাক খোঁজ করার সময় বাঙালিবাবু বলেই ডাকে। মুখার্জিদা হয়তো বাঙালিবাবুদেবও এই সময় কিছু করণীয় থাকে এমন বোঝাতে চাইছেন। বংশীদাও চায় না ম্যাকের অন্ত্যেষ্টিতে কোনও খুঁত থাকুক।

এমনিতেই বংশীদার ধারণা, জাহাজটা বিশমার্ক সি-তে আসলে যাচ্ছে না, যাচ্ছে অজানা সমুদ্রে। তার আতঙ্কে খুবই ফাঁপরে পড়ে গিয়ে উন্মাদের মতো আচরণ করছে বংশীদা। তার কাছে মানুষ মরে গেলে আর জাত থাকে না। সুতরাং অন্ত্যেষ্টির সময় তার ধর্মমতে কিছু না করলে বাঙালি নাবিকেরা বিপাকে পড়ে যেতে পারে। অশুভ প্রভাবে তারা পড়ে যেতে পারে। ছিল লুকেনার, আর ছিল বরফঘরের সেই লাশ, এবারে ম্যাকও তাদের প্রভাবে চলে গেল। অন্তত তার অন্ত্যেষ্টিতে হিন্দু ধর্মমতে কিছু না করতে পারলে খুবই ঝামেলার আশঙ্কা। কি ভেবে যে বংশীদা একটা দেশলাই কাঠি জ্বেলে কফিনের কাঠে রাখার সময় বলল, ম্যাক এই আমাদের রীতি। আমরা শবদাহ কবি। মুখাগ্নি করি। আমরা যা জানি, সেইমতো সবার হয়ে তোমার মুখাগ্নি করলাম, তোমার আত্মার মুক্তি হোক। শান্তি হোক।

সবশেষে ডেক-অফিসাররা, ইনজিনিয়াররা ম্যাকের কফিনের পাশে দাঁড়ালেন। কাপ্তান প্রার্থনা করলেন, মে গড আওয়াব ফাদার শোয়ার ইউ উইথ ব্লেসিং অ্যান্ড ফিল ইউ উইথ হিজ গ্রেট পিস্। ভারী সব পাথরে ভর্তি কফিনটি এবার অফিসাবরা কাঁধে তুলে নিলেন।

তাঁরা হাঁটছেন।

তারাও হাঁটছে পিছু পিছু।

ফরোয়ার্ড পিকে তুলে নিয়ে যাওয়া হল ম্যাককে। শেষে ধীরে ধীরে রশি বেঁধে কফিনটি জলে ছেড়ে দেওয়া হল। সবাই শেষবারের মতো দেখল অনন্ত সমুদ্রের গর্ভে ম্যাক অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে।

চার্লি দৌড়ে চলে আসছে।

সুহাস দেখল, মুখার্জিদাও নেমে এসেছেন। তাঁর ডিউটি শেষ। তিনি নেমে বললেন, 'যাক, ম্যাককে যে বুদ্ধি করে আগুনে ছুঁইয়ে দেওয়া গেল। বংশী কোথায়?'

সুহাস বলল, 'আসছে।'

বংশীদা কাছে এলে মুখার্জিদা তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'যাক একটা কাজের কাজ করেছিস। আমার তো মাথায় আসছিল না কি করা যায়। ম্যাক অপঘাতে মারা গেল। তার আত্মার সদ্গতির বড়ই দবকাব ছিল। তুই যে বুদ্ধি করে আগুনে ছুঁইয়ে দিয়েছিস—তুই না থাকলে হত না। আমি তো ইশারায় বললাম, আমাদের পক্ষে কিছু একটা করা দরকার। কেউ বুঝতেই পারছে না। যাক তোমরা সবাই সোজা বাথরুমে চলে যাও। আমিও যাচ্ছি। আগুনে হাত সেঁকে ফোকসালে ঢুকবে। জাহাজে আছ বলে নিজেদের দিগ্‌গজ ভাববে না। যা খুশি তাই করে পরে পস্তাবে না।'

কাজেই স্নানটান করা দরকার। ম্যাকের কেবিনে যাওয়া দরকাব। চার্লি যদি ম্যানেজ করতে পারে। চার্লিকে ডেকে সুহাস বলল, 'একটা কাজ করতে পারবে?'

চার্লি বুঝতে পারছে না, কি কাজ।

চার্লিকে বলাও যায় না—কাজটা কিছুই না—তবে কেবিনে ঢুকে দেখা দবকাব। সে তার স্ত্রীর ছবি জাহাজে কাজের সময় পকেটে রাখত না। আজ কাজে আসার আগে সেটা নিল কেন? এতে তার মতিভ্রম প্রমাণিত হয়। তুমি কিছু বুঝতে পারছ, কি বলতে চাইছি। মতিভ্রম বলা বোধহয় ঠিক হল না—সে ভেবেছে, জাহাজেও সে নিরাপদ নয়। কিনারায় নিরাপদ নয় বলেই তো পকেটে ছবিটা রাখত! কিন্তু জাহাজে কেন!

আসলে ছবির সঙ্গে কেবিনের এই একটা সম্পর্ক থাকতে পারে। ম্যাক ছবিটার কথা সবাইকে বলেছে—যদি জাহাজের কেউ হয়ে থাকে, তবে সেও জানে ছবিটা সম্পর্কে তার বিশেষ দুর্বলতা আছে। এবং এই ছবিটা পকেটে থাকা মানে, সে তবে সত্যি কিছু আঁচ করেছিল। জাহাজে সে নিবাপদ নয় বলেই সঙ্গে ছবিটা নিয়েছিল। ছবিটা সবাইকে দেখিয়েছিল। গির্জার ছায়ায় দুই নারী পুরুষ এবং ছবির মতো সব ফুল পাখিরাও রয়েছে। মুখে নারীর পবিত্র হাসি। গির্জার মতোই তারা পবিত্র। তার

শিশুরাও বাদ নেই। তারাও সঙ্গে আছে। অন্তত শিশুদের কথা ভেবে ঈশ্বর তাকে সব দুর্যোগ থেকে রক্ষা করবেন এমন সে ভাবতেই পারে। তারা তো কোনও দোষ করেনি। যদি কখনও এই মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়, তখন ছবিটা রাখা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। জাহাজে তবে ম্যাক নিরাপদ ছিল না। ছবিটা চুরি হয়ে গেলে কোনও প্রমাণ থাকবে না। কারণ ছবিটার মধ্যে ম্যাকের ঈশ্বর-বিশ্বাসের এবং দৈব থেকে আত্মরক্ষার এক সবিশেষ কৌতূহল থেকে গেছে। সুতরাং চাবিটা যাতে হস্তান্তর না হয়, চুরি না যায় সেটা দেখা দরকার।

চার্লি বলল, 'কি কাজ করতে বলছ? বলে আর কথা বলছ না। চুপ করে আছ। কি ভাবছ কেবল!'

'না মানে বলছিলাম, কাপ্তান ম্যাকের কেবিনে কখন ঢুকবেন বলতে পার!'

'জিজ্ঞেস করব।'

'আমাকে খবর দিতে পারবে?'

'কি হবে খবর দিয়ে!'

'যেতাম একবার। যদি সঙ্গে থাকি তিনি কি রাগ করবেন?'

'রাগ করাই তো স্বাভাবিক।'

'তা হলে তো মুশকিল।'

'শোনো সুহাস আমার মন মেজাজ ভাল নেই। তোমরা ভাবছ আমি ঘোরে পড়ে দেখি। তোমার মুখার্জিদা আমাকে নিয়ে তামাসা করেন। তবে বলে রাখছি, আমি ভাল বুঝছি না।'

'আরে মুখার্জিদার কথা বাদ দাও। বললাম, লোকটার চুল সাদা, বললাম, গোঁফ সাদা অথচ লোকটার শরীর অত্যন্ত মজবুত। অন্তত আবছা অন্ধকারে দেখলে তাই মনে হয়। তিনি কি বললেন জানো, জাহাজে সবাই নানা কিসিমের লোক দেখে বেড়াচ্ছে, চার্লি শেষে একজন গোঁফয়ালা বাবরি চুলয়ালা জোয়ান মানুষকে দেখছে! কেন তোর মতো বোট-ডেকে কোনও সুন্দরীকে দেখতে পারে না! চার্লিটা সত্যি অপদার্থ।'

চার্লি গুম মেরে গিয়ে বলল, 'দাঁড়াও কোয়ার্টার মাস্টারকে দেখাচ্ছি মজা।' এবার চার্লি কেন যে মুখার্জিদা বলল না, কোয়ার্টার মাস্টার বলল বুঝতে অসুবিধা হল না। সে যে কাপ্তানের পুত্র এটাই যেন বুঝিয়ে দিচ্ছে। তা মজা দেখাতে পারে। চার পাঁচ মাস আগেও মজা দেখাতে পারত। ল্যাঙ মেরে ফেলে দিতে পারত। সহসা দড়িতে ঝুলে সুখানির কাঁধে পা রেখে রেলিঙ ধরে ফেলতে পারত। এখন যে ইচ্ছে করলে পারবে না, তা কে বলবে। নিমেষে কাজটা করে ফেলে সে। বুঝতেই দেয় না কাঁধে পা রেখে রেলিং টপকে মেসরুম পার হয়ে দ্রুত ছুটে গেল কে!

চার্লি রেগে গেলে পারে। মুখার্জিদার উপর খেপে গেলে সে মজা দেখাতেই পারে। এমনিতেই জাহাজে নানা জটিলতা, চার্লিও ভাল নেই। খেপে গিয়ে আবার কি ঝামেলা পাকাবে ভেবেই বলা, 'আরে মুখার্জিদার কথা ধরতে নেই। কখন কি মুড বোঝা মুশকিল। কখনও অপদেবতায় বিশ্বাস থাকে না, কখনও অপদেবতার ভয়ে আগুনে হাত সেঁকে ফোকসালে ঢুকতে বলে। মুখার্জিদাকে কিছুতেই বুঝতে পারছি না।'

চার্লি বলল, 'তুমি কখন বললে তাকে—আমি লোকটাকে দেখতে পাই?'

'সকালে কাজে যাবার সময় বললাম।'

'এ-সব কথা কেন বলতে যাও বুঝি না সুহাস! সারা জাহাজে ছড়িয়ে পড়বে।'

'না। মুখার্জিদা বলেছেন, কাউকে বলবেন না। তিনি শুধু বললেন, ম্যাকের মুখোসগুলি দেখা দরকার।'

'কি বলছ? মুখোস দেখে কি হবে?'

'আমিও বুঝছি না। মুখোস দেখে কি হবে? ম্যাক তো চলেই গেল। দ্যাখো যদি মুখোস পাও—ম্যাকের মুখোসগুলি তাকে দেখাতে পারো কি না। ওতে কি হতে পারে আমিও বুঝছি না। মুখার্জিদা আমাকে নিয়ে দুর্ভাবনায় আছেন কেন তাও বুঝছি না। বললেন, আমি তো ভাবলাম তুই থেঁতলে গেছিস।'

রাতেই মুখার্জিদার মাথায় কি পোকা ঢুকে গেল কে জানে। বিছানাপত্র নিয়ে পাশের একটা পরিত্যক্ত ফোকসালে উঠে এলেন। একটা মজবুত ব্যাঙ্ক ছাড়া কিছুই নেই। আর আছে একটা লকার। পোর্টহোলের কাচ ভাঙা। ঝড়-ঝাপটায় জল পর্যন্ত ঢুকে যায় ঘরে। এমন একটা ফোকসালে কেউ থাকতে পারে! মুখার্জিদা লকারটা সাফসোফ করছেন। সারেঙের কাছে গেলেন একবার। যদি লকারটার চাবি থাকে। সারেঙ বলেছেন, খুঁজে দেখতে হবে।

তিনি ফিরে এসেছেন। লকারটা খোলা পড়ে থাকে। নোংরা জামাকাপড়ও পড়ে আছে কার—তিনি জামাকাপড় তুলে বললেন, এগুলি কার? নিয়ে যেতে বল্।

সুহাসকেই বলা, কারণ সুহাস সেই থেকে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। সে না বলে পারল না, এভাবে এক কথায় সুরঞ্জনের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে আসার কোনও মানে হয়। জানোই তো ওর চ্যাংড়ামি স্বভাব। ফোকসালে আছেটা কি, থাকবে!'

মুখার্জিদা কোনও কথারই জবাব দিচ্ছেন না। শুধু বললেন, 'বকর বকর করবি না। যা বলছি কর। দ্যাখ, কোন বাবু তার নোংরা জামাকাপড় এতে রেখে দিয়েছেন। নিয়ে যেতে বল্।'

সুরঞ্জন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথার চুল আঁচড়াচ্ছিল। সুহাস সুরঞ্জনের দরজায় গিয়ে বলল, 'তোর জামা-প্যান্ট নিয়ে আয়। যা খেপে আছে, সব না পোর্টহোল দিয়ে সমুদ্রে ফেলে দেয়। কি হয়েছে, মুখার্জিদা তোমার ফোকসাল থেকে চলে গেল!'

'জিজ্ঞেস কর না কি হয়েছে! কি বলেছি আমি। শুধু বললাম তুমি সবই বেশি বোঝ। তোমার সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। ব্যস খেপে লাল।'

এত সামান্য কথায় খেপে যাবার মানুষ নন মুখার্জিদা। সারেঙ টিন্ডেল কেউ বাদ যায়নি, সবাই এসে অনুরোধ করেছে, আরে একসঙ্গে থাকলে কথা কাটাকাটি হবে, ঠোকাঠুকি হবে, আবার মিলমিশও থাকবে। অযথা মাথা গরম করবেন না সুখানি। ন্যাড়া বাঙ্কে শোবেন কি করে। ম্যাট্রেস নেই, ঝুলকালিতে কি হয়ে আছে। পাশের দুটো বাঙ্কই নড়বড়ে। বুড়ো মানুষের নড়া দাঁতের মতো কেবল খটর খটর করছে। অসুবিধা হলে সুহাসের ফোকসালে চলে যান। ওদের তো একটা বাঙ্ক খালি।

সারেঙসাব বুঝিয়েছেন, টিন্ডাল, ভাণ্ডারি কেউ বাদ যায়নি। কিন্তু ধনুর্ভঙ্গ পণ, ভাঙবেন তো মচকাবেন না। তাঁর এক কথা, 'মানুষ না বুঝলেন, সেদিনেব যোগী ভাতেরে কয় অন্ন। আমি নাকি ডগ-ওয়াচ মিড-ওয়াচও বুঝি না।'

'ওরা বোঝে! এই সুরঞ্জন তুই তিন নম্বর সুখানিকে কি বলেছিস ' সারেঙ তেড়ে গিয়েছিলেন সুরঞ্জনদের ফোকসালে। অধীরই সুরঞ্জনের হয়ে বলল, 'দেখুন সারেঙসাব এমন কিছু হয়নি, যাতে মুখার্জিদা হড়বড় করে সব নামিয়ে বলতে পারেন ব্যাটারা থাক, আমি চললাম।'

ডগ-ওয়াচ মিড-ওয়াচ নিয়ে কি কথা কাটাকাটি হতে পারে। অবশ্য এখন কিছু বললে, মুখার্জিদা আরও তেতে উঠবেন। অবসরমতো অধীরের কাছ থেকে জেনে নেওয়া যাবে। সে সুরঞ্জনকে বলল, দেরি করিস না, শিগগির তোর জামাকাপড় নিয়ে যা। তোরই মনে হয়।

সুরঞ্জন সোজা ঢুকে লকার থেকে জামাকাপড় নিয়ে গেল। যেন মুখার্জিদাকে চেনেই না। মুখার্জিদাও কোনও কথা বললেন না। সুরঞ্জন চলে গেলে বললেন, 'তোফা—বেশ জব্দ। চ্যাংড়ামি আমার সঙ্গে। থাক তোরা। জাহাজে জায়গার অভাব।' বলেই সুহাসের দিকে তাকালেন—'যা তো একবার। ওদের বলগে লকার থেকে আমার রেশনের চা চিনি যেন বের করে দেয়। আমার দুটো হ্যাঙ্গার আছে। ও দুটোও নিয়ে আসবি।'

এমন করছে মুখার্জিদা যেন সুরঞ্জনের ফোকসালে তাঁর ঢোকাও পাপ। কিছুতেই ঢুকবেন না। বিশাল লেদার সুটকেসটা লকারের মাথায় রেখে দিয়েছেন আগেই। সুহাস হ্যাঙ্গার দুটো নিয়ে আসার

সময় কেষ্ট বলল, 'দাদার গামছা। গামছা ফেলে গেছে।'

'তোমার গামছা দাদা।'

'হ্যাঁ গামছাটা ফেলে এসেছি। দে।' গামছাটা নিয়ে মুখার্জিদা বললেন, 'দ্যাখ তো আমার আর কিছু পড়ে থাকল কি না।' বলে তিনি সুটকেস নামিয়ে খুলে কি দেখলেন, আর যেন মনে মনে কি অঙ্ক কষছেন। সুহাস বলল, 'তোমার এক জোড়া মোজা পড়ে আছে।'

'রেখে দে।'

'আচ্ছা কি হয়েছে বলবে তো?'

'কিচ্ছু হয়নি। তুই কি বলেছিলি!'

'কি বলব?'

'কি বলব! খুব আনন্দে আছ দেখছি। সব ভুলে যাও। বলেছিলাম না, ম্যাকের ডুপ্লিকেট চাবিটা যদি হাত করতে পারিস?'

'কখন বললে? আর বললেই পাওয়া যাবে কেন? চাবিটা তোমাকে দেবে কেন। চাবি দিয়ে কি করবে?'

সত্যি তো চাবি দিয়ে কি হবে। খুবই যেন বোকার মতো কথা বলে ফেলেছেন। কি ভেবে বললেন, 'যা উপরে—পারিস তো এক কাপ চা খাইয়ে যেতে পারিস। এখন আমি শুয়ে পড়ব। যা ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়েছে। থামবে বলে মনে হয় না!'

আর তখনই ছলাত করে এক ঝটকা সমুদ্রের জল পোর্টহোল দিয়ে ভিতরে এসে পড়ল। মেঝের কিছুটা ভিজে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে মুখার্জিদা উঠে পড়লেন। ছেঁড়া জামা-প্যান্ট দলা পাকিয়ে ঠেসে দিলেন পোর্টহোলে। উপস্থিত বুদ্ধি এত প্রখর দাদার যে সুহাস কিছুটা অবাকই হয়ে গেল। আরও অবাক হল দেখে, নিশ্চিন্তে দাদা শুয়ে পড়েছেন বাঙ্কে। বুকের কাছে হাত জড়ো করে রেখেছেন আর পা নাচাচ্ছেন। দু-হাতের আঙুল নাচাচ্ছেন। এই সব মুদ্রাদোষ দাদার আছে। সে তা ভালই জানে। কোনও পরিকল্পনা মাথায় এলে তার মধ্যে এই মুদ্রাদোষগুলি দেখা দেয়। হঠাৎ উঠে বসে বললেন, 'শোন, চার্লি আর কি বলল। চার্লি যা বলবে সব বলবি। কিছু গোপন করতে যাস না। ডগ-ওয়াচ দিয়ে ফেরার সময়ও দেখেনি ডেরিক তোলা আছে।'

ডগ-ওয়াচ দিয়ে ফিরে আসার সময়ও দেখেনি? কে দেখেনি। কি দেখেনি। ডগ-ওয়াচের কথা উঠছে কেন। সুহাস পাশের বাঙ্কটায় বসতে গেলে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। সুহাস উঠে পড়ল। বাঙ্কটা ঠেলে তুলল কিছুটা। নিচে সামান্য সাপোর্ট দিতে পারলে বাঙ্কটা ব্যবহার করা যেত। ঘরে কিচ্ছু নেই, সাপোর্ট দেবার প্রশ্নই আসছে না। সে মুখার্জিদার পায়ের দিকে গিয়ে বলল, পা ওঠাও। বসব।

মুখার্জিদা পা তুলে নিলেন।

জাহাজ খুবই ওঠানামা করছে। ঝড়ের দাপট রাত যত গভীর হবে তত বাড়বে মনে হল। সুরঞ্জন হঠাৎ দরজার সামনে দিয়ে যাবার সময় খটাস করে বালতি মগ রেখে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে বালতি ফোকসালের মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে শুরু করেছে। ঝল প্রবল হচ্ছে বোঝা যায়। কারণ মাথার উপরে ছাদের মতো জায়গাটায় তাদের গ্যালি। গ্যালিতে হুড়মুড় করে কি পড়ল।

মুখার্জিদা উঠে পড়লেন।

বললেন, 'দেখলি তো।'

সুহাস বালতি মগ দুটো ধরে ফেলল। কি কর্কশ শব্দ। আর স্টিয়ারিং ইনজিনের শব্দও শুনতে পাচ্ছে। কক্ কক্। সব পেনিয়ান জোড়াতালি দিয়ে হালটাকে ধরে রেখেছে যেন। যে কোনও মুহূর্তে পেনিয়ান চুরমার করে দিতে পারে ঝড়ের দাপট। সে মগটা বালতির ভিতর রেখে লকারের এক কোণায় রেখে দিল। কিছুটা ঢালু বলে, বালতিটা জাহাজের দুলুনিতে একটু আধটু নড়ল, তবে পড়ে গিয়ে গড়াগড়ি খেল না।

সুহাস বলল, 'ডগ-ওয়াচ নিয়ে পড়লে কেন বুঝি না। কার ওয়াচ ছিল?'

'আরাফতের ওয়াচ গেছে।'

ডেক-জাহাজি আরাফত ডগ-ওয়াচ থেকে ফেরার সময় তবে দেখেছে, ডেরিক নামানোই ছিল। এত রাতে ওয়াচ দিয়ে ফেরার সময় কারও কি খেয়াল থাকার কথা ডেরিক তোলা আছে, না নামানো আছে? কি জানি।

সুহাস বলল, 'ঠিক দেখেছে তো?'

'তাই তো বলল।'

এত দুলছে জাহাজটা যে লকারের উপর লেদার সুটকেসটা পর্যন্ত নড়ানড়ি শুরু করে দিয়েছে। ভাঙা বাক্সগুলির রড, রেলিংও দোল খাচ্ছে। মাথার উপর না পড়ে। সুটকেসটা নামিয়ে রাখা দরকার। মেঝেতে জল গড়াগড়ি খাচ্ছে, রাখবে কোথায়। এমন একটা বসবাসের অযোগ্য ফোকসালে মুখার্জিদা থাকবেন কি করে সে বুঝতে পারছে না। গলা বাড়িয়ে ডাকল, 'মগড়া আছিস!'

টোপাজ মগড়া পাশের একটা ফোকসালে একা থাকে। গাঁজা খায় রাতে। তার গন্ধ এত তীব্র যে ফোকসালের ভিতর ঢোকে কার সাধ্য। সঙ্গে দুজন মহাবীরের ছবি। সাধুসন্ত সে বলে না। বলে মহাবীর। সে রোজ স্নানটান সেরে দুটো ফটোতেই সিঁদুর লেপে দেয়। এটাই তার পূজা আর্চার ঢং। তার ফোকসালে ঢুকলেও সে রাগ করে। ঘরেই থাকে তাব ঝাঁটা বালতি। সারাদিন কনুইয়ে ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কাজ করুক না করুক, ঝাঁটা বালতি যতক্ষণ তার হাতে আছে ততক্ষণই সে ডিউটি দিচ্ছে।

নেশায় বুঁদ হয়ে থাকলে সাড়া দেবে না, সুহাস ভালই জানে। অথচ মেঝের জল মুছে না নিলে ফোকসালে পা দেয়া যাবে না। সে তার চটি যেদিকটায় জল গড়ায়নি সেদিকে ঠেলে দিয়েছে। মুখার্জিদার জুতো এবং চটি জোড়াও সে সরিয়ে রেখেছে। অবাক মগড়া এক ডাকেই সাড়া দিয়েছে। সে এসে কি দেখল, তারপর ছুটে গেল তার ফোকসালে। শুকনো কাপড় দিয়ে মেঝেটা মুছে দেবার সময় বলল, 'গতিক ভাল বুঝছি না দাদা। পাঁচ নম্বর সাব বেঘোরে জানটা খতরা করে দিল। ডেরিকে মাথা টুটে গেল সাহেবের। ডেরিক তো তোলা থাকে না।'

মুখার্জিদা বললেন, 'ভর ধরেছে, বেটা নেশা কবতে ভুলে গেছিস। ভাল মানুষ সেজে বসে আছিস' তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বুঝলি টোপাজও বোঝে। কোথাও গোলমাল আছে।'

কোথাও যে গোলমাল আছে সেও বোঝে। না বুঝলে চার্লিকে বলবে কেন, ম্যাকের কেবিনে একবার যেতে পারলে ভাল হত। অথচ সে ভেবে পায় না, কেবিনে কি খোঁজাখুজি করবে। ছবিটা নিয়ে শিরঃপীড়ারও কি কারণ থাকতে পারে—তাও সে সঠিক বুঝল না। আসলে ছবিটা পকেটে রাখায় তার মনে হয়েছে ম্যাক হয়তো জানত, কে তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল—কিন্তু আতঙ্কে বলতে পারেনি। দৈবনির্ভর জীবন। এমন পাকা হিসাবই যত গণ্ডগোল সৃষ্টি করতে পারে। সফরে বের হলে ছবিটা সঙ্গে নিয়ে বের হয়। জাহাজিদের দুর্যোগের শেষ থাকে না। হয়তো ভেবেছিল, ভয় কি, সে তো তার বিশ্বাসমতো কাজ করে যাচ্ছে। দেখাই থাক না, উৎপীড়নকারী কতটা বাড়তে পারে।

সে স্থির হয়ে বসতে পারছে না। ঝড়ের দাপটে জাহাজ যেন সত্যি বেঘোরে পড়ে গেছে। বিদ্যুতের ঝলকানিও টের পাচ্ছে। মাথার উপর আকাশ ভেঙে পড়ার মতো। মুহুর্মুহু কড়মড় করছে বজ্রবিদ্যুতের আর্তনাদ। সে রেলিং চেপে বসে আছে। কারণ সব সময় জাহাজের উথাল পাতালে ব্যাঙের মতো লাফাতে কার ভাল লাগে। জাহাজ সমুদ্রে নেমে এলেই মদো মাতালের মত হাঁটতে হয়। সবসময় মনে হয় একটা দড়ির উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে হাঁটা যায় না। আর দুর্যোগ দেখা দিলে আরও কঠিন ডেক ধরে হেঁটে যাওয়া।

মুখার্জিদা চুপ। কি যেন ভাবছেন। সুরঞ্জন খবর দিয়ে গেল, খানা রেডি। ওদের 'বিশু' নিচে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। মুখার্জিদা এবং সুহাস যেন খেয়ে নেয়।

সুহাসের দিকে মুখার্জিদা তাকিয়ে বললেন, 'যা তো', বলে তাঁর ডিস এবং গ্লাস লকার থেকে বের করে দিলেন। সুরঞ্জনদের সঙ্গে বাক্যালাপও বন্ধ। বেশ চলছে যা হোক।

সে বলল, 'এসো, খেয়ে নেবে।'

'নিয়ে আয় না।'

'যাওয়া যায় বলো। কোথায় হুমড়ি খেয়ে পড়লে সব যাবে। এসো না।'

কোনওরকমে খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে মুখার্জিদা বললেন, 'চার্লিকে নিয়ে তোর এত মাথা ব্যথা কেন বুঝি না। তুই ওর সঙ্গে বেড়াতে যাস কেন। গোরারা ভাল হয় না জানিস। চার্লি তোর এত প্রাণের বন্ধু হয় কি করে!'

চার্লিকে নিয়ে তার মাথা ব্যথা না থাকারই কথা। তবু চার্লি তাকেই সব বলে, চার্লি তার বিপদ আপদের কথাও ভাবে। কেউ যদি বলে, থাক তোমাকে আর জড়াতে চাই না, খারাপ লাগে না! সে জড়াবে কেন? তার সঙ্গে কারও শত্রুতাও থাকার কথা না। তার ঠাকুরদাও ধনকুবের নন, তাছাড়া সে কোনও পাহাড়ি এলাকায় বুনো ফুলের উপত্যকাতেও একা মানুষ হয়নি। বেটসি বলে তার কোনও পিসিও ছিল না। মোটর দুর্ঘটনায় সে মারাও যায়নি। চার্লি তো বলল, মোটর দুর্ঘটনা না খুন সে বুঝতে পারছে না।

সে থালা গ্লাস ধুয়ে এনে তার লকারে রেখে দিতে গেল।

মুখার্জিদার থালা গেলাসও ধুয়ে এনেছে। সিঁড়ি ধরে উপরে ওঠাও ঝকমারি। কেবল ঝাঁকাচ্ছে। পড়ে যেতেই পারে। তবু সে খুব সন্তর্পণে সব কাজ সেরেছে। মুখার্জিদার বারোটা-চারটা ওয়াচ। সে ঘড়িতে দেখল নটা বাজে। রাত নটায় ঝড় না থাকলে জাহাজিরা ডেকে বসে এখন চিল্লাচিল্লি করত। তাস পেটাত। কিন্তু কিছুই করা যাচ্ছে না বলে সবাই শুয়ে পড়েছে। ঠিক সাড়ে এগারোটায় 'টান্টু'। দু-নম্বর সুখানি নেমে আসবে ব্রিজ থেকে, যাদের ওয়াচ আছে, তাদের জাগিয়ে দেবে। মুখার্জিদার এখন শুয়ে পড়ার কথা। ঘুমিয়ে পড়ার কথা। কিন্তু উঠতে গেলেই এক কথা, বোস না। সে চলে যেতে পারছে না। বসতে বলছেন, অথচ চুপ করে আছেন।

হঠাৎ মুখার্জিদা পাশ ফিরে শুলেন। তার দিকে তাকালেন। 'তোর কি মনে হয় তুই টার্গেট?'

'একথা বলছ কেন?'

'না, যেভাবে ভেঙে পড়ছিলি! তুই তো লোকটাকে দেখিসনি?'

'না।'

'তুই না দেখলে ঘাবড়ালি কেন?'

'জাহাজে কোনও অজ্ঞাত লোক উঠে এসেছে শুনলে ভয় লাগে না।'

'জাহাজে উঠে এসেছে। উঠুক না।'

সে খুব অনিচ্ছার সঙ্গে বলল, 'চার্লি তো তাই বলল। কাকে সে খুঁজছে। লোকটা তাকে অনুসরণ করছে। তোমাকে তো বলেছি।'

মুখার্জিদা উঠে বসলেন, 'তোর পোর্টহোলে কেউ উঁকি মারছে কি?'

'না, তা অবশ্য মারেনি।'

'তবে তুই এত ঘাবড়ে গেলি কেন?'

যেন কথা বের করতে চাইছেন। সুহাস বলল, 'তুমিই তো বলছ, ডগ-ওয়াচ দিয়ে ফিরে আসার সময়ও পরিদার দেখেনি, ডেরিক তোলা আছে। তোমার হলে বুঝতে।'

'ধুস কিচ্ছু বুঝছিস না। সে ভোর রাতের ব্যাপার। তুই তো ঘাবড়ে গেছিস, লোকটা চার্লির পোর্টহোলে অন্ধকারে এসে দাঁড়িয়েছিল তাই শুনে। সে তো গেল রাতে।'

'গেল রাতেই তো সব একের পর এক কাণ্ড জাহাজে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কত কিছু ঘটে গেল।'

'দ্যাখ সুহাস আমি এত ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে নেই। সোজাসুজি বল্, পোর্টহোলে চার্লি দেখেছে তুই দেখিসনি!'

'না, বললাম তো!'

'তোর খেতে ইচ্ছে হল না কেন!'

'চার্লি বিপদে পড়ে গেলে আমি ঘাবড়ে যাব না। কাপ্তানের ব্যাটারই যদি এত আতঙ্ক থাকতে পারে, আমারও যে থাকবে না, হয় কি করে। আমিও তাকে দেখে ফেলতে পারি। সে কেন উঠে এল

তাই বুঝছি না।'

'চার্লি আর কিছু বলেছে?'

'বলেছে।'

'কি বলেছে বল?'

'চার্লির ঠাকুরদা একজন ধনকুবের।'

'ধনকুবের মানেই তো পাপ আছে বংশে। জানিস না, দেয়ার ইজ ক্রাইম বিহাইন্ড এভরি ফরচুন। পাপ বাপকেও ছাড়ে না। চার্লিকে ছাড়বে কেন।'

'ধুস তোমার গোয়েন্দাগিরি আমার ভাল লাগছে না। কি জানতে চাও বল তো। ধনকুবের হলেই পাপ আছে ধরে ফেললে। ওর ঠাকুরদা তেমন মানুষই নন। মানুষটা অদ্ভুত প্রকৃতির। কোথায় মার্কিন মুলুকের উষর অঞ্চলে চার্লির ঠাকুরদা বুনো ফুলের চাষ করে বড়লোক হয়ে গেল। পাপ থাকবে কেন?'

'বুনো ফুল!'

'তাই তো বলল।'

কত রকমের ক্যাকটাস। সব দুর্লভ ক্যাকটাস। রমরমা ব্যবসা। মুখার্জিদা কেন যেন এই অনুসরণকারীর সঙ্গে কোনও পাপের সম্পর্ক খুঁজছেন। তার ভাল লাগল না।

সে বলল, 'জানো, যখন যুদ্ধ ওদের দরজায় করাঘাত করছে, তখন মানুষটা তার সব পাহাড়ি এলাকায় বুনো ফুলের চাষ করে যাচ্ছে। সারা আমেরিকায় এখন বড়লোকদের শৌখিন ক্যাকটাস বলতে ব্যালেল ক্যাকটাস। ওর ঠাকুরদা ফুল ভালবাসত। বুনো ফুলের চাষ করেই বড়লোক হওয়া যায়, ওর ঠাকুরদা তার প্রমাণ। তারপর থেমে বলল, চার্লি তার মা-র কথা মনে করতে পারে না। যে নিগ্রো রমণীর কাছে মানুষ। তিনিও বেঁচে নেই। মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। চার্লির বাবা ছাড়া কেউ নেই।'

'থাম থাম!'

'মোটর দুর্ঘটনা বলছিস। বুঝতে দে।'

মুখার্জিদা খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন। সে কথা বলতে গেলেই থামিয়ে দিচ্ছেন হাত তুলে। সে মুখার্জিদার এই গাম্ভীর্যে হেসেই ফেলল। আর এক পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে। ভাবল।

'আমি উঠব।'

'উঠবে ভাবছ, ডেরিক ভেঙে মাথায় পড়বে না! বোস। উঠলে তো চলবে না। তুমিও জড়িয়ে গেছ বুঝতে পারছি। আমরা থাকতে তোমার কিছু হলে দেশে গিয়ে মুখ দেখাব কি করে!'

'আমি জড়িয়ে গেছি বলছ!'

'আলবত জড়িয়ে গেছ। তুমি আর বাচ্চা গোরাটার সঙ্গে ঘুর ঘুর করবে না। ধনকুবের মানেই রহস্য বুঝলে। চার্লির আর কে কে আছে জানিস।'

'বলল তো।'

'কি বলল, আরে চুপ করে থাকলি কেন! এবারে হাসতে পারছ না কেন। যা উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দে। কে আবার কান পেতে থাকবে।'

সুহাস দরজা বন্ধ করে দিয়ে এল। ওর সত্যি গা শির শির করছে। অনুসরণকারী যদি এখানেও অন্ধকারে নেমে আসে। সে বলল, 'ধুস, দিলে সব মাটি করে। রাতে ঘুমাতে পারব না।'

'সবে শুরু। কত রাত না ঘুমিয়ে থাকতে হয় দ্যাখ। একদম ঝেড়ে কাশছিস না। আমি তোর কোনও ক্ষতি করব ভাবছিস! আমার দায় পড়েছে। ডগ-ওয়াচেও ডেরিক তোলা ছিল না। তার মানে তার পরের ওয়াচে কাজটা কেউ করেছে। কবে দেখেছিস সমুদ্রে অকারণে ডেরিক তোলা থাকে। বন্দরে ঢোকার আগেও ডেরিক তোলা হয় না। বন্দরে ভিড়লে মাল তোলার জন্য ডেরিক তোলা হয়। কম ওজনের মাল নামানোর জন্য কে আর কোম্পানির পয়সা খরচ করে। শালা খচ্চর কোম্পানি, দেখছিস একবারও বন্দরের ক্রেন ব্যবহার করেছে! কুনজুস। ডেরিকেই সব মাল হারিয়া করে দিতে পারলে

কোম্পানির পয়সাও বাঁচে কাজেরও সুনাম হয়। হাবড়া কাপ্তান সব বোঝে, বুঝলি! কোম্পানির কর্তা ব্যক্তিরা খুশি হলে আরও দু-চার সফর। দু-হাতে টাকা রোজগার।'

তারপরই মুখার্জিদা কেমন চুপসে গেলেন। কি খুঁজছেন। 'কোথায় রাখলাম।'

'কি খুঁজছ!'

'টোবাকোর প্যাকেট।'

'ও-ঘরে পড়ে নেই তো!'

'না। দেখ্ তো জামার পকেটে আছে কিনা।'

সুহাস উঠে গিয়ে জামার পকেট খুঁজল। বালিশের পাশে খুঁজল, নেই।

'কোথায় রাখলাম! বোস, আসছি।' বলেই মুখার্জিদা দ্রুত নেমে গেলেন বাঙ্ক থেকে। কম্বল জড়িয়ে গায়ে উপরে উঠে যাচ্ছেন।

'কোথায় যাচ্ছ।'

জবাব দিচ্ছেন না।

সে দরজায় মুখ বাড়িয়ে বলল, 'আরে উপরে যাচ্ছ কেন?'

'বলছি না বসে থাকতে! আসছি।'

সে বসে থাকল। ঝড়ের মধ্যে কোথায় উঠে গেলেন। উপরে তো এখন ধুন্দুমার কাণ্ড চলছে। টোবাকোর প্যাকেট খুঁজতে কেন যে এই দুর্মতি। রাতে তাঁকে ওয়াচে যেতেই হবে। তখন বর্ষাতি গায়ে যাবেন। এখন গেলে তো ভিজে, চুপসে যাবেন। অথচ সে নড়তে পারল না। যেন সিঁড়ি ধরে উপরে গেলেই অনুসরণকারীর সঙ্গে তার দেখা হয়ে যাবে। ফোকসালে বসে থাকতে বলে গেছেন। সে উঠতেও পারছে না। একবার অধীর কিংবা সুরঞ্জনকে ডেকে বললে হত, ঝড়ের মধ্যে কোথায় যে বের হয়ে গেল! এত রাতে বলতেও বাধছে। দরজা বন্ধ করা। কারণ ঝড়ের জন্য দরজা খোলা রাখা যাচ্ছে না। দরজা লক করে দিতে হচ্ছে। ডাকাডাকি করলে সবাই জেগে যাবে। বারোটা-চারটার পরিদাররা বিরক্ত হতে পারে। তারা পরি অর্থাৎ ওয়াচ দিতে যাবে বলে যে যতটা পারছে ঘুমিয়ে নিচ্ছে।

সে বুঝতে পারে ভয় বড় সংক্রামক ব্যাধি। সে এই ফোকসালে বসেও থাকতে আব সাহস পাচ্ছে না। উপরে উঠে যেতেও ভয় পাচ্ছে। সারেঙ-এর দরজাও বন্ধ। এবং তার ফোকসালের দরজা খুলে ঢুকে যেতে পারত। কিন্তু এই অসময়েও মুখার্জিদা টোবাকোর প্যাকেট খোঁজার জন্য যে কেন উপরে উঠে গেলেন, সে বুঝতে পারল না।

নিজের ফোকসালে ঢুকে শুয়েও পড়তে পারছে না। ত্রিশঙ্কুর মতো অবস্থা। সে যে কি করে।

আর তখনই মুখার্জিদা নেমে এলেন।

'কোথায় গেছিলে?' সে না বলে পারল না।

হাতের টোবাকো প্যাকেট দেখিয়ে বললেন, 'পেয়েছি।'

তারপর সহসা প্রশ্ন 'বুনো ফুল তোকে দেখছি ছবি এঁকে দেখিয়েছে চার্লি!'

কেউ তো জানে না! সে তো একাই ছিল ঘরে। আর কেউ তো ছিল না। সুহাস অবাক।

সে বলল, 'জানলে কি করে।'

মুখার্জিদা একটা কাগজ মেলে ধরলেন।

'কোথায় পেলে!'

'তা দিয়ে কাজ কি? এটা কি ফুল?'

'ব্লেজিং স্টার!'

'তোর মনে আছে দেখছি?'

'কোথায় পেলে বলছ না কেন। ইস, এর জন্য উঠে গেলে! আমাকে বললেই পারতে। আমার লকারে আরও আছে।'

'তোর লকার আমি খুলিনি। যাকগে, খুবই সুন্দর দেখতে। কি লম্বা আর সুন্দর ফুলগুলি?'

'বুনোফুল দেখতে সত্যি সুন্দর।'

বুনোফুলের বোটকা গন্ধও আছে।'

'কে বলল?'

'বলবে কে! বোঝা যায়। একটু বেশি মাখামাখি থাকলে বুনো ফুলের গন্ধও পাওয়া যায়। মেয়ে মানুষের গন্ধ!'

'মিছে কথা! একটা ফুলেরও গন্ধ নেই।'

'আছে আছে। টের পাস না। জাহাজে এই ফুল মনে হয় উড়ছে। যাকগে, আন্দাজে ঢিল মেলে লাভ নেই। বুনো ফুলের গন্ধ কেউ কেউ পায়। তুই পাস না বলে কি সবাইকে ভেড়া ভাবিস! যা শুয়ে পড়গে।'

সুহাস ভেবে পেল না, মুখার্জিদা কি তাকে নিয়ে তামাসায় মেতেছেন, না সত্যি আঁচ করেছেন, বেঘোরে পড়ে তার জানও খতরা হয়ে যেতে পারে। সে কেমন শুকনো মুখে বলল, 'জানো চার্লির সংশয় বেট্‌সকে কেউ খুন করেছে।'

'তোফা! এতক্ষণ ঝেড়ে কাশছিলি না কেন? তাই বল্।'

খুবই রহস্যজনক—অথচ গত সফরে মনেই হয়নি চার্লির জাহাজে উঠে আসার পেছনে কোনও রহস্য থাকতে পারে। রাতের ওয়াচে মুখার্জি স্টিয়ারিং হুইলের পাশে দাঁড়িয়ে এমনই ভাবলেন। কাপ্তানের আদুরে ছেলে উঠে আসতেই পারে। আর বজ্জাতের ধাড়ি। এমন দুরন্ত ছেলেকে কিনারায় রেখে এসে কাজেকর্মে স্বস্তি পাওয়া কঠিন। চার্লির কে আছে, কে নেই তাও জানার কোনও সুযোগ ছিল না। পর পর দুটো সফরেই চার্লি জাহাজে আছে। পর পর দুটো সফর একই জাহাজে তিনিও আছেন।

গত সফরে ইনজিনসারেঙ নিয়াজিও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। চার্লি জাহাজে উঠে আসার পর নানা উপদ্রবে পড়ে যেতে হয—কারণ কার পেছনে লাগবে ঠিক কি—যতটা পারা যায় চার্লি সম্পর্কে নানা হুঁশিয়ারির শেষ ছিল না। বাপের আদরে মাথাটি গেছে। মা নেই, কোন্ এক দূরসম্পর্কেব পিসির কাছে মানুষ—সেই পিসিও গত হওয়ায় কাপ্তান নিরুপায় হয়ে সঙ্গেই নিয়ে এসেছেন। তাঁর কেন সবারই কাছে চার্লির জাহাজে উঠে আসার কারণ যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে।

সুহাস জাহাজে না থাকলে এই নিয়ে তাঁর মাথা ঘামাবারও কারণ ছিল না।

তারা আছে এখন ওশিয়ানিয়া অঞ্চলে। এই অঞ্চলে হাজার হাজার দ্বীপের ছড়াছড়ি। অস্ট্রেলিয়াকে বলা যেতে পারে সব চেয়ে বৃহত্তম দ্বীপ। তারা অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে ফসফেট আমদানি করবে। বেশ ছিল—আর ক'মাস পরই হয়তো মাটি টানার কাজ শেষ হয়ে যেত। দেশে ফিরে যেতে পারত নির্বিঘ্নে। কিন্তু ফাইভারের আকস্মিক মৃত্যুর পেছনে যেমন রহস্য দানা বাঁধছে, তেমনি চার্লির অনুসরণকারীও কম রহস্যময় নয়। বেট্‌সি খুন হয়েছে, বেট্‌সি মানে চার্লির পরিচালিকা—মা নেই আগেই জানা ছিল, বেট্‌সির খুন হওয়া অবশ্য সংশয়ের পর্যায়ে আছে, কারণ চার্লি ঠিক জানে না, দুর্ঘটনা না খুন। যেমন ম্যাকের মর্মান্তিক মৃত্যু দুর্ঘটনাজনিত, না কোনও পরিকল্পিত হত্যা—কারণ ডেরিক যেই তুলে রাখুক—তার যে মতলব ভাল ছিল না, বুঝতে পারছেন মুখার্জি।

উইনচ চালিয়ে ডেরিক নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। কপিকলের সাহায্যে কাজগুলি হয়ে থাকে। একজন লোকের পক্ষে এভাবে ডেরিক তুলে ফসকা গেবোয় রেখে দেওয়া অসম্ভব। ডেরিক যার নির্দেশেই তোলা হোক, তারা ছিল দুজন। এবং কোনও দূর নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নিশ্চিত রাখা হয়েছিল। কার পক্ষে এ-কাজ করা সম্ভব।

ডেকটিন্ডাল লতু মিঞা এবং কিছু ডেক-জাহজি উইনচ চালাতে জানে। ডেরিক নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সেকেন্ডমেট কিংবা চিফমেটের নির্দেশ ছাড়া এ কাজে কেউ হাতও দিতে পারে না। সেকেন্ড ইনজিনিয়ার বব নিজেও উইনচ চালিয়ে দেখে নেন, ডেরিক ঠিকমতো কাজ করছে কি না! যদি ভুলবশত ডেরিক তোলা থাকত, তবে কারও চোখে পড়বে না হয় কি করে!

মুখার্জি টের পাচ্ছেন খুবই জটিল অঙ্ক। ম্যাককে হত্যা করে কার কি উপকার হল! সুহাস কেন এই জটিলতায় জড়িয়ে পড়বে! সুহাস সাধারণ জাহাজি, সে ধনকুবেরের নাতিও নয়, যে খুন-টুন করে ঠাকুরদার বিশাল সম্পত্তি গ্রাসটাস করা যাবে।

ঝড়বৃষ্টির দাপট চলছে। এত ঝাপসা—সামনে কিছুই দেখা যায় না। থার্ডমেট মাঝে মাঝে কম্পাসের রিডিং দেখছেন। থার্ডমেট পায়চারি করছিলেন। কারণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা টানা চার ঘণ্টা খুবই কঠিন। দু-বার চা খেয়েছেন। মুখার্জিই চা করে এনেছেন গ্যালি থেকে। ঝড় প্রবল হওয়ায় সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে ডেকে। বাতিগুলো জাহাজের তেমন জোরালো নয়। ইনজিন-রুমের সঙ্গে মাঝে মাঝে থার্ডমেটের সাংকেতিক কথাবার্তা চলছে। কত নট বেগে ঝড়ের দাপট চলছে, লগবুকে নোট করছেন। নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে বোঝা যায়।

পাশেই চার্ট-রুম। চা করে নিয়ে আসার সময় চার্ট-রুমের দরজা যে খোলা নয় লক্ষ্য করেছেন মুখার্জি। চার্ট-রুমেই চাবি থাকে সব কেবিনের। কি যে অজুহাত সৃষ্টি করা যায় ভেবে পাচ্ছিলেন না মুখার্জি। কি করে চার্ট-রুমে ঢুকে ম্যাকের কেবিনের চাবিটি হস্তগত করা যায়; কারণ ম্যাকের কেবিনে ঢুকে মুখোশগুলো দেখতে পারলে ভাল হত। জাহাজে ম্যাক কাকে কাকে মুখোশ উপহাব দিয়েছে, এটাও জানা দবকার।

এ-সব কাজে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার অধিকারী হতে হয়। রহস্যের জট খোলা চাট্টিখানি কথা নয়। কিছু ক্রাইম থ্রিলার পড়ে এটা তিনি টের পেয়েছেন। কম কথা, সহসা উল্টাপাল্টা প্রশ্ন করে ভ্যাবাচেকা খাইয়ে দেওয়া। কোনও সুযোগ এলে সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগানো—বিনা আগুনে ধোঁয়া সৃষ্টি হয় না, সব গুজবের পেছনেই কোনও না কোনও ঠাণ্ডা মাথার আকস্মিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া কাজ করে থাকে। গুজবের মাথাও কেটে দেওয়া যায় না। প্রায় রক্তবীজের বংশধর—একটা থিতিয়ে এলে আর একটা গজিয়ে ওঠে। লুকেনার থেকে মেয়েমানুষেব লাশ এবং বোট-ডেকে কখনও কখনও আবছা অন্ধকারে নারীর চলাফেরার কোনও হেতু থেকে নানা গুজব যে সৃষ্টি করা হচ্ছে না কে বলবে!

তবে গুজব লুকেনার এ-জাহাজে শুধু নয় তাঁর তিনটি জাহাজেই মাঝে মাঝে দেখা দেন। সিওল ব্যাঙ্ক, টিবিড ব্যাঙ্ক এবং এই ডিনা ব্যাঙ্কের এককালের অধীশ্বর এ-ভাবে গুজবেব মধ্যেই বেঁচে আছেন, তিনি তাও বুঝতে পারেন। লাশ দেখে আহামদ পাগল হয়ে যায়নি—আতঙ্কে ব্যাটা পাগল হয়েছে।

এটা তো হতেই পাবে, সারাক্ষণ কেবিনে মরা লাশ আছে ভাবলে, কার না ত্রাস সৃষ্টি হয়! কেবিনের পোর্টহোল দিয়ে যে বাইরের সমুদ্র দেখা যায় তখন তাও মনে থাকে না। লাশ বরফ-ঘরে রেখে দেওয়া হয়েছিল—এমন খবরে আহামদ সারাক্ষণ শুধু লাশের কথাই ভেবেছে।

চার্লিও যে আতঙ্কে পড়ে যায়নি মুখোশের কে বলবে। সে কি কোনও বুড়ো মানুষকে শৈশবে দেখলে ভয় পেত! কিন্তু মুশকিল চার্লির সঙ্গে এ-সব নিয়ে কথাবার্তা বলা মেলা ঝঞ্ঝাট। একমাত্র সহায় হতে পারে সুহাস। সুহাসকে দিয়েই কাজ উদ্ধার করা যাবে এই ধরনের দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি হতেই তিনি দেখলেন, ঘড়িতে সাড়ে তিনটে বেজে গেছে। তিনি দ্রুত হুইলের জিম্মায় থার্ডমেটকে রেখে সিঁড়ি ধরে নেমে এলেন। এখন তার কাজ সেকেন্ডমেটকে জাগিয়ে দেওয়া। তার কেবিনের দরজায় টোকা মেরে বলা, উঠুন, আপনার ওয়াচের সময় হয়ে গেছে। তারপর দ্রুত ডেক পার হয়ে ফোকসালে ফোকসালে খবর দেওয়া—বলা, 'টান্টু'। একনম্বর ওয়াচের পরিদারা এবারে উঠে পড়ো। জাগো।

একনম্বর পরিদারদের জাগিয়ে ফের ব্রিজে উঠে গেলেন তিনি। এবং ওয়াচ শেষে নেমে এলেন বোট-ডেকে।

মুখার্জি বোট-ডেকে নেমে কেন যে চার্লির কেবিনের পেছনে চলে এলেন নিজেও বুঝলেন না। মাথায় কি কোনও চিন্তাভাবনা কাজ করছিল—সহসা সব যেন ভুলে গেছেন, এই ভেবে থতমত খেয়ে গেলেন! তারপরই মনে হল, আসলে পোর্টহোলের পাশ দিয়ে তিনি হেঁটে যেতে চান। ঝড়-ঝাপটায় টলে টলে হাঁটতে হয়।

দু-নম্বর বোটের পাশ দিয়ে প্রায় হামাগুড়ি দিতে থাকলেন। চার্লির কেবিনের পেছনটায় চলে গেলেন তিনি। ফুট চার পাঁচ দূরে লোহার রেলিং বুক সমান উঁচু। দাঁড়াতে গেলে, এক ঝটকায় ঢেউ

ভাসিয়ে নিতে পারে। ঢেউ এত প্রবল। তা-ছাড়া জাহাজ যেভাবে ওঠানামা করছে, তাতে করে দাঁড়িয়ে থাকাও কঠিন। উইংসের আলো ঠিকমতো পড়ছে না। কেবিনের ছায়ায় জায়গাটা অন্ধকারাচ্ছন্ন। হাতড়েও কিছুর নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না। তবু কোনও রকমে দেয়ালে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

এতটা ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হচ্ছে না বুঝেও, মনে হল তাঁর সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। এই ঝড়-ঝাপটায় কেউ চার্লির কেবিনের পেছনে হাঁটা-চলা করতে পারে—অবিশ্বাস্য। তবু তিনি রেলিঙ ধরে হাঁটছেন। একবার দেখা দরকার পোর্টহোলের সামনে দাঁড়িয়ে। চার্লি নিশ্চয়ই অঘোরে ঘুমাচ্ছে। ভোর রাতের ঘুম সবারই কম বেশি প্রিয়।

তিনি এবার সোজা কিছুটা এগোতে গিয়ে ছিটকে পড়লেন। রেলিঙ ধরে ফেলে আত্মরক্ষা করা গেল। ফের এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। পারছেন না। পোর্টহোলে মুখ রেখে দেখতে চান, যে মানুষটা অনুসরণকারী সে দীর্ঘকায় কি না! কিংবা কত দূরত্বে দাঁড়ালে কেবিন থেকে চার্লি সেই মুখ দেখতে পারে—এ-সব দেখার কৌতূহলেই আসা। এদিকটায় তাঁর আসার দরকার হয় না। আসেনও না।

তিনি দেখতে পেলেন পোর্টহোলে পর্দা ঝুলছে এবং ভিতরে আলো জ্বালা। আসলে চার্লি কি জেগে আছে—না ভয়ে কেবিনের আলো জ্বালিয়ে রেখেছে! পোর্টহোলে পর্দা টানানো, এটা মুখার্জির অনুমানের বাইরে। পর্দা ফেলা থাকলে সেই হিমশীতল মুখ সে দেখতে পায় কি করে! তা ছাড়া কারও পোর্টহোলেই পর্দা ঝোলে না। এটা তো মালবাহী জাহাজ। যাত্রী-জাহাজ হলে তবু না হয় কথা ছিল। শালীনতা রক্ষার্থে যাত্রী-জাহাজে পর্দা ঝুলতেই পারে। মালবাহী জাহাজে এটা খুবই অস্বাভাবিক ঘটনা।

মালবাহী জাহাজে এ ধরনের শালীনতার প্রশ্নই আসে না। সাধারণত পোর্টহোলগুলি উঁচুতেই থাকে। কেবিনের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেও ভিতরে কি আছে না আছে দেখার কথা না। দেখতে হলে টুলের দরকার। কিন্তু আশ্চর্য চার্লির কেবিনের পোর্টহোল বেশ নিচুতেই বলা যায়। যাওয়া আসার পথে নীল কাচের ভেতরে কেবিনের সব কিছুই আবছা দেখা যেতে পারে। ভিতরে আলো জ্বালা থাকলে তো কথাই নেই।

তবে এদিকটায় কারও আসার কথা নয়। একেবারে বোট-ডেকের একপাশে পর পর দুটো কেবিন। কেবিনের পেছনে কয়েক ফুট মাত্র, কাঠের পাটাতন। জাহাজে কাঠের পাটাতনে মাঝে মাঝে হলিস্টোন মারা হয়ে থাকে। ঝড় জলে বৃষ্টিপাতে কাঠের পাটাতনে শ্যাওলা পড়ে যায়। হলিস্টোন মেরে পাটাতন ঘষে ঘষে মসৃণ রাখার কাজগুলি ডেক-জাহাজিরাই করে থাকে। এদিকটায় যে বেশ কিছুকাল কাঠের ডেক বালি আর পাথরে ঘষা হয়নি বুঝতে মুখার্জির অসুবিধা হল না। পা পিছলে যাচ্ছিল—খুব সতর্ক পায়ে হাঁটাহাঁটি করে তিনি কিছু মাপজোক নিতে ব্যস্ত।

আসলে লোকটা লম্বা না বেঁটে, লোকটা যদি চার্লির পোর্টহোলে এসে দাঁড়ায় তবে সে কতটা দীর্ঘকায় হতে পারে এমন কিছু চিন্তাভাবনা মাথায় কাজ করছিল বলেই একবার যেন দেখে যাওয়া।

কিছুটা গা-ঢাকা দেবার মতো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন। অঝোরে বর্ষণ চলছে। সমুদ্রের অন্ধকারে পাতলা বিবর্ণ ছাই রঙের নীলাভ জলরাশি পাক খাচ্ছে। এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকাও ঠিক হবে না। বুনো ফুলের ঘ্রাণ তো আর এভাবে পাওয়া যায় না! যদি তাই হয়, তিনি কেমন কিছুটা বেকুফই হয়ে গেলেন ভেবে।

মাঝে মাঝে তাঁর কেন যে মনে হয়, চার্লির গায়ে বুনো ফুলের গন্ধও লেগে আছে। ঘ্রাণশক্তি তাঁর একটু প্রবল। তবে মনে হয়েছে, সাহেবের বাচ্চা চার্লি, চানটান করে না, নোংরা থাকার স্বভাব এবং সহসা এই সেদিনও তিনি চার্লির শরীরে উত্তেজক গন্ধ পেয়ে কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। চার্লির শরীর থেকে গন্ধটা উঠছে, না অন্য কোথাও থেকে—চার্লি প্রায় তার নাকের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। তিনি হাঁটু গেড়ে বসেছিলেন ব্রিজে। জাহাজে নানা কিসিমের পতাকা ওড়ে। পতাকাগুলি ভাঁজ করছিলেন। চার্লি তার নাক ঘেঁষে হেঁটে যাবার সময়ই বুনো ফুলের গন্ধ। নারীর শরীরে কোথায় কি ঘ্রাণ থাকে তাঁর তো জানতে বাকি নেই। শরীরের ভাঁজে ভাঁজে নানা কিসিমের ঘ্রাণ। চার্লির শরীরে বুনো ফুলের গন্ধ পেয়ে কিছুটা তিনি হতভম্ব হয়ে গেছিলেন। জাহাজে শেষে সত্যি মেয়েমানুষ উঠে এল! চার্লি জাহাজেই বেড়ে উঠছে। যত বড় হচ্ছে তত বেশি যেন গন্ধ ছড়াচ্ছে।

জাহাজিদের অবশ্য এই এক দোষ! শরীরে মেয়েমানুষের গন্ধ শোঁকার স্বভাব। পুরুষ হলেও। সুন্দর বালক কিংবা যুবা হলে তো কথাই নেই। কারণ সমকামিতা জাহাজে সংক্রামক ব্যাধি। সেই ব্যাধিতে তিনি কি আক্রান্ত হচ্ছিলেন! এখন ঠিক আর তা অনুমান করতে পারছেন না। তা না হলে গন্ধে তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন কেন! নারীব মধ্যে ঘ্রাণের সুবাসের চেয়েও এই উত্তেজক গন্ধ জাহাজিদেব শুধু প্রিয় নয়, দৈহিক নির্যাতনও শুরু হয়ে যায়। আজ কেন জানি না তিনি পর্দা ঝুলতে দেখে এটা আরও বেশি অনুমান করতে পারছেন। সারা মাসকাল সমুদ্রের নোনা হাওয়ায় বসবাসের ফল। খ্যাপা কুকুরের মতো ছুটে মরা। রং বার্নিশের গন্ধ ছাপিয়ে বুনো ফুলের গন্ধ ভেসে ওঠে। বিকৃত রুচি থেকে হতে পারে—কি যে কারণ এটা এখনও তাঁর কাছে অনুমান-সাপেক্ষ। আবার ভাবলেন, তিনি সেই গন্ধে পাগল হয়ে আছেন!

তিনি আর দাঁড়ালেন না। পুব আকাশ ফরসা হয়ে উঠছে। ভিজে জবজবে এবং জুতো মোজা সব ভিজে গেছে তাঁর। বোট-ডেক থেকে লাফিয়ে সিঁড়ি ধরে নেমে এলেন। ছুটতে ছুটতে টুইন ডেক পার হয়ে আসছেন। পিছিলের ছাদের নিচে এসে রেনকোট টুপি খুলে গ্যালিতে উঁকি দিলেন। শীতে কাঁপছেন। যদিও ঠাণ্ডা কমে আসছিল, তবু ঝোড়ো হাওয়ায় শীতের কামড় আবার বেড়ে গেছে। এত সকালে কারও ওঠার কথা না। গ্যালিতে ভাণ্ডারি থাকতে পারে। এ-সময়টায় ভাণ্ডারি উনুনে আঁচ দেয়। একটু চা হলে খাসা হত। কে করবে!

ভাণ্ডারী মুখার্জিবাবুকে দেখে অবাক! চারটায় ডিউটি শেষ। এখন বাজে পাঁচটা। জামা-কাপড় ছাড়েননি। ভিজে জামা-কাপড়ে বেঞ্চিতে বসে আছেন। একে একে জাহাজিরা সিঁড়ি ধরে উঠে আসছে। গোসলখানায় ঢুকছে। কেউ কেউ গ্যালিতে ঢুকে হাতের তালুতে ছাই নিয়ে দাঁত মাজছে। ভাণ্ডারি খুব ব্যস্ত। উনুনে আঁচ উঠলে গরম জলের কেতলি বসিয়ে দিতে হবে। গ্যালি ধোওয়া মোছার কাজ শেষ। বাসি পরিত্যাক্ত আনাজ তরকারি, সব টিনের মধ্যে মজুত করা। টিন তুলে নিয়ে সমুদ্রের জলে ফেলে দিল অভুক্ত অবশিষ্ট খাবার। দুটো অ্যালবাট্রস পাখি কোথা থেকে সাঁ সাঁ করে উড়ে আসছে। পাখা মেলে ভেসে যাচ্ছে। তারপর জলে ঝাঁপিয়ে অভুক্ত খাবার ঠোঁটে নিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে সমুদ্রের জলে।

মুখার্জি সোজা সিঁড়ি ধরে তাঁর নিজের ফোকসালে নেমে যেতে পারতেন। তিনি গেলেন না। তাঁর পক্ষে অবশ্য এখানে দাঁড়িয়ে থাকাও ঠিক হচ্ছে না। তাঁর তো এখন শুয়ে পড়ার কথা। ভোরের ঘুমটা আজ ইচ্ছে করেই মাটি করে দিলেন। ঝড়ের দাপট কমে আসছে। তবু তাঁর কেন যে মনে হয় এক কাপ চা খেতে পেলে ভাল হত। কাকে বলবেন, ভাণ্ডারিকে বললে হয়। ভাণ্ডারি কি তাঁব অসহায় অবস্থার কথা ভেবে চা-এর ব্যবস্থা করবে! তারপরই মনে হল, আঁচ উঠতে সময় লাগবে। বলেও লাভ নেই। নিচে নেমে গিয়ে পোশাক ছেড়ে ফেলাই ভাল।

আসলে বুনো ফুলের গন্ধ জাহাজে ভেসে বেড়াচ্ছে। এই রহস্যটাই বা কি করে ফাঁস করা যায়। বুনো ফুলের গন্ধেই তিনি ছুটে গেছেন। বস্তুতপক্ষে তিনি নিজের মধ্যে ছিলেন না। ভাণ্ডারিই বলল, 'আরে মুখার্জিবাবু দাঁড়িয়ে থাকলেন কেন! সব তো ভিজে জবজবে। ঠাণ্ডায় যে কাবু!'

এই রে। ধরা পড়ে গেলেন বুঝি। চারটায় ওয়াচ শেষ। চারটায় ফোকসালে নেমে যাবার কথা। বাথরুমে ঢুকে হাতে মুখে জল দিয়ে শুয়ে পড়ার কথা, তা না, তিনি কোথা থেকে অসময়ে, এই সংশয় ভাণ্ডারির মনেও উঁকি দিচ্ছে।

তিনি আর বিন্দুমাত্র দেরি না করে নিচে নেমে গেলেন। সুহাসের সামনে পড়ে গেলে আর এক কেলেঙ্কারি।—দাদা তোমার এত দেরি! কোথায় ছিলে!

জাহান্নামে ছিলাম, বুঝলি! কোথায় ছিলে! দ্যাখ তোর কপালে কি আছে! যেন সুহাসের উপরই সব তিক্ততা গিয়ে পড়ল! কি দরকার বুঝি না, চার্লির সঙ্গে ঘোরার। বাবু তুমি বোঝ না কি চিজের পাল্লায় পড়ে গেছ! তুই কি আহাম্মক। আমি গন্ধে টের পাই, আর তোর সঙ্গে এত মাখামাখি, কিছু টের পাস না! তোর নাকে গন্ধ লেগে থাকে না! নোনাজলে ঘুরলে এমন গন্ধে তো পাগল হয়ে যাবার কথা!

না, এখন আর এ-সব নিয়ে ভাবনা নয়। লম্বা টানা ঘুম। জামা প্যান্ট খুলে এক কোনায় ফেলে

রাখলেন সব। রেনকোট হুকে ঝুলিয়ে রাখলেন। তারপর গামছায় শরীর মুছে, পাতলুন আর জামা গলিয়ে কম্বলের নিচে ঢুকে গেলেন। দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছেন। উঠে ফের দরজা বন্ধ করলেন। শরীর টাল হয়ে গেছে। শুয়ে পড়তেই তাঁর এটা মনে হল। মুখে শরীরে কম্বল চাপা দিয়ে চোখ বুজলেন। কিন্তু ঘুম এল না। এপাশ ওপাশ করছেন—কাউকে কিছু বলা যাবে না। এই বুনো ফুলের গন্ধ কেবল তিনিই টের পেয়েছেন, এমন ভাবলে ভুল করা হবে। অনুসরণকারী যে আগেই টের পায়নি কে বলবে। অনুসরণকারী জাহাজের কেউ হবে। সে কে?

ফোর্থ ইনজিনিয়ার?

থার্ড!

না সেকেন্ড!

সেকেন্ড তো খুব রাশভারী মানুষ। চার্লির অভিভাবক গোছের। কারণ চার্লিকে মাঝে মাঝে তিনি শাসনও করে থাকেন। কার্পেন্টার, কাপ্তান মেসরুমমেট বুড়োমানুষ। কাপ্তানবয়ই একমাত্র চার্লিব ঘরে যখন তখন ঢুকতে পারে। বুড়োকে কিছু বলাও মুশকিল। কাপ্তানের কানে গেলে সেও সুহাসের মতো জালে জড়িয়ে যেতে পারে। তা-ছাড়া কিছুই তো নিশ্চিত নয়। দুইয়ে দুইয়ে চাব হয়—এই যোগফলের উপর ভিত্তি করে অগ্রসব হওয়া। বুনো ফুলের গন্ধ, পোর্টহোলে পর্দা, অনুসরণকারী কেউ আছে, আছে না আতঙ্কে চার্লি সেই এক বুড়োর মুখ দেখতে পায়! তিনি কিছুতেই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারেন না।

সত্যি যদি বুনো ফুলের গন্ধ চার্লির গায়ে লেগে থাকে, সবসময় না হলেও মাঝে মাঝে যে গন্ধটা পাওয়া যায় এমন ভাবলেও তাঁর আর সিদ্ধান্তে ভুল থেকে যাচ্ছে। কাপ্তান চার্লিকে যত্রতত্র যেতে দেবেন কেন! সুহাসের সঙ্গে ঘুরতে দেবেন কেন! কাপ্তান যদি নেহাত দায়ে না পড়েন—দায়টা কি-সের। ডেরিক ভুলে রেখে তিনি কি সুহাসকে সরিয়ে দিতে চেয়েছেন। ইচ্ছে করলে তো তিনি চার্লিকে দেশেও পাঠিয়ে দিতে পারতেন। অথচ তাব কিছুই করছেন না। চার্লি জাহাজে আছে, বড় হয়ে উঠছে এ-সব কি কাপ্তানকে বিন্দুমাত্র ভাবায় না!

চার্লি তার অনুসরণকারীর কথা একমাত্র সুহাসকেই জানিয়েছে! সুহাস কি করবে! সে ছেলেমানুষ। চার্লি আর নির্ভরযোগ্য লোক খুঁজে পেল না! বাপ তো তার জাহাজেব দণ্ডমুণ্ডেব কর্তা। তিনি না পারলে কে পারবেন! সুহাস কে? চার্লি সুহাসকেই কেন বলে! সুহাস কি, তাকে সব ভেঙে বলছে না—আরে বুঝছিস না গাধা—যত সরল অঙ্ক ভাবছিস, পর্দা ঝুলতে দেখে মনে হল অঙ্কটা তত সরল নয়। তুই তো সোজা বলে দিতে পারতিস, তোমার বাবাকে বলছ না কেন! আমি কি করতে পারি। খুব ভুল করছ চার্লি—বলতে পারতিস! ভয়ে আতঙ্কে কাবু। রাতে আলো না জ্বালিয়ে ঘুমোতেও ভয় পাও—তখন কি না একজন সামান্য জাহাজিকে বলছে, আর কেউ যেন না জানে!

না, কিছুই মাথায় আসছে না।

অনুসরণকাবী কাছে থাকে না।

অনুসরণকারী দূরে থাকে।

কাছে থাকলেও আবছামতো অন্ধকার থেকে উঁকি মারে।

প্রথম দেখা দরকার, সত্যি উঁকি মারে, না ভূতগ্রস্ত চার্লি।

যাকগে। জাহাজের পরিণতি খুব যে ভাল না তিনি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। জাহাজে আরও কোনও বড় ধরনের নাটক হতে পারে। শুধু চেষ্টা করে যাওয়া।

দুপুরে মেসরুমে খেতে বসে মুখার্জি দেখলেন, সুহাস খুবই অন্যমনস্ক। এই সময়টায় সবার সঙ্গে দেখা হয়। বারোটা থেকে একটা—এক ঘণ্টা ছুটি। সবাই খেতে আসে মেসরুমে। বেশ গাঞ্জাম চলে। যারা বারোটা-চারটার ওয়াচ দিতে যায় স্টোকহোলডে কেবল তারাই হাজির থাকে না। এগারোটার মধ্যে দুপুরের খাওয়া সেরে তারা ধীরেসুস্থে নিচে নামে। সুরঞ্জনের দেখা পাওয়া গেল না। অধীর হরেকেষ্ট, মুখার্জি, সুহাস পাশাপাশি বসে খাচ্ছে। সুহাস কিছু বলছে না।

মুখার্জি বললেন, 'আর একটু ডাল নে। এত শুকনো খাচ্ছিস! গলায় আটকে যাবে যে।' বলে তিনি

ডেকচি থেকে এক চামচ ডাল দিলেন সুহাসকে।

'ইস কি করছ! এত আমি খেতে পারি না। তোমার লাগলে নাও না।'

আর তখনই সুহাস বিষম খেল।

'জল খা।'

বেশ জোরে বিষম খেয়েছে। কাশছে। কথা বলতে পারছে না। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। অধীর জলের গ্লাস এগিয়ে দিল মুখের কাছে। জল খেয়ে যেন স্বস্তি পেল সুহাস। মুখার্জি বললেন, 'বাড়ির জন্য মন খারাপ!'

সুহাস বলল, 'হ্যাঁ মন খারাপ। আর কি জানতে চাও বল!'

সুহাস মুখার্জিদার উপর যেন খুবই বিরক্ত। মুখার্জি বুঝলেন না হঠাৎ ক্ষেপে গেল কেন সুহাস! খারাপ কিছু বলেননি! বাড়ির জন্য মন খারাপ হতেই পারে। কতকাল হয়ে গেল, জাহাজে ভেসে বেড়াচ্ছে। ঘরবাড়ি, মা-বাবা এবং নদী থাকলে—নদীর জন্য মন খারাপ হতেই পারে। তবে কেন সুহাস ক্ষেপে গেল তাঁর উপর।

সুহাস কোনও রকমে খাওয়া শেষ করে নেমে গেলে মুখার্জিও পিছু নিলেন। হাত ধরে টেনে বললেন, 'কি হয়েছে বল্ তো!'

'কি হবে আবার। তুমি শেষে এই! তুমি চার্লিকে ভয় দেখাচ্ছ! বেচারা ভয়ে কাবু। তুমি চার্লির পোর্টহোলে ঘোরাঘুরি করছ! চার্লি টের পেয়েছে।'

'টের পেয়েছে! কি করে টের পেল।'

'বলল তো, ভোররাতে সে আবার এসেছিল।'

'দ্যাখ সুহাস।' বলেই বোধহয় চিৎকার করে উঠতেন। কি ভেবে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিলেন। সামলে নিয়ে বললেন, 'বুঝেশুনে কথা বলবি। চার্লি বলেছে, আমি ঘোরাঘুরি করছি!'

'চার্লি দেখলে তো বলবে।'

মুখার্জি কেমন মিইয়ে গেলেন।

'কে দেখেছে?'

'আমি।'

'তুই দেখেছিস?'

'হ্যাঁ দেখেছি। না দেখলে বলব কেন! ঝড়ের রাতেও কামাই নেই। পোর্টহোলে পর্দা ফেলা ছিল বলে রক্ষা। পর্দা তুললেই তোমাকে দেখতে পেত। কি করছিলে বল তো! কেন বেচারাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছ। তুমি জান, আতঙ্কে মানুষের কি হয়! আহামদ বাটলারকে ভাগালে। চার্লিকে ভাগাতে চাইছ। কি করছিলে—বল! চুপ করে আছ কেন। বেচারা কাঁদো কাঁদো মুখে হাজির—জানো সুহাস সে এসেছিল। ভয়ে কাঠ।'

মুখার্জি বুঝল এতটা বোকামি না করলেই পারতেন। পায়ে বুটজুতো—ঠক ঠক শব্দ হতেই পারে চলাফেরার সময়। আসলে গোয়েন্দাগিরি কাজটা যে সোজা না এতে তিনি টের পেয়ে গেলেন। কাঠের ডেকে জুতোর শব্দ উঠতেই পারে। চার্লি টের পেয়ে আলো জ্বেলে বসেছিল। শৌখিন গোয়েন্দারা কি করে যে এত তৎপর হয় তাঁর মাথায় আসে না।

মুখার্জি এবার আলটপকা বলে ফেললেন, 'বাজে একদম বকবি না। আমি মরতে যাব কেন ওখানে!'

সুহাস বলল, 'আমি তো দেখলাম, ঝাপসা অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে তুমি বোট-ডেক থেকে নেমে আসছ। কি করছিলে! পিকাকোরা পার্ক থেকে ফিরে অন্ধকারে সিঁড়ি ধরে, নামার সময়ও দেখেছিলাম, কেউ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে সিঁড়ির মুখে। আতঙ্কে তোমার কথা মনেই হয়নি। ওভারকোট পরে এত রাতে জাহাজে সিঁড়ি ধরে কে আর নামতে পারে। তুমি ছাড়া।'

'তুই বললি, কোয়ার্টার মাস্টার মুখার্জি ঘোরাঘুরি করছে।'

'আমার দায় পড়েছে। শুধু বললাম, ও কিছু না। মনের ভুল। কেউ আসেনি। তুমি প্লিজ চার্লির

পেছনে লাগতে যেয়ো না। বেচারার মা নেই। এত খারাপ লাগে ভাবলে। তোমার মায়াদয়া নেই। ধরা পড়লে কি হবে বল তো!'

'গাধা কি আর গায়ে লেখা থাকে। যা, যা পারিস করবি। যখন লেগেছি, দেখব চার্লি কত জলের মাছ! আর তোকেও বলে দিচ্ছি, যদি ফাঁস করে দিস সব, তোর নিস্তার নেই। যা করছি, তোমার ভালোর জন্য করছি মনে রেখ। জাহাজে আর একটি ডেরিক পড়ুক চাই না! মনে রাখিস চার্লি আর যাই হোক ছেলে নয়। এত কাছে থাকিস গন্ধেও টের পাস না মেয়ে না ছেলে! দেখতে দেখতে জাহাজে তো বিশ-বাইশ মাস হয়ে গেল।

আনাড়ি আর কাকে বলে! ফোকসালে ঢুকে নিজের উপরই খেপে গেলেন মুখার্জি।— তুই শেষে আমার পেছনে লাগলি! কার জন্য করছি! আর রাগের মাথায় আবোল তাবোল বকে গেলেন। 'চার্লি, কত জলের মাছ, চার্লি ছেলে না মেয়ে, গন্ধ শুঁকে টের পাস না,' বলাটা খুবই কি অযৌক্তিক।

তা ছাড়া তাঁর তো দাড়ি গোঁফ নেই, পাকা চুলও নয় তাঁর—চোখ পাথরের মতো হিমশীতলও নয়, তবে কেন সুহাস তাঁকে সন্দেহ করছে! কি যে বিশ্রী ব্যাপার—গাধাটাকে বুঝিয়েও লাভ নেই—একবার ডেকে বললে পারত, আরে চার্লিকে নিয়ে আমার কোনও মাথা ব্যথা নেই, তাকে তাড়াতেও চাই না—আমার কেন যে মনে হয়েছে, চার্লির শারীরিক গঠনে এতটুকু পুরুষালি ভাব নেই। ওর হাঁটা চলা দেখে আগেই সংশয় ছিল, এখনও সংশয় আছে—তবে তাই বলে নির্ঘাত সে মেয়ে এটা বলাও সম্ভব না। আর কেউ টের পায়নি, কে বলবে! নিশীথে বোট-ডেকে গভীর অন্ধকারে কে সে নারী! ভয়ে আতঙ্কে, ঘোরে পড়ে—না, মানি না। বোট-ডেকে তুই তো নিজেই একবার দেখেছিলি—দেখে দৌড়ে পালিয়েছিলি—গন্ধটাও কম রহস্যজনক নয়—তবে এখনও কিছু ঠিক জানি না। ফুল ফুটলে গন্ধ বের হবেই। বুনো ফুলের গন্ধ বড় উত্তেজক।

তাঁর এখন ওয়াচ। তিনি ওয়াচে যাননি। শরীর ম্যাজ ম্যাজ করছে বলে জুডিদার সোলেমান মিঞাকে বলেছেন, বদলি দিতে, পরে দরকারে তিনিও বদলি খাটবেন। প্রায় অখণ্ড অবসর। কিন্তু খেতে বসে এমন একটা গণ্ডগোলে পড়ে যাবেন ভাবতেও পারেননি। হয়তো কাজে উঠে গেছে সুহাস। তবু একবার দরজা খুলে সিঁড়ির মুখে উঁকি দিলেন—সুরঞ্জন নেমে আসছে। ইশারায় ডাকলেন·— সুরঞ্জনের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ, কেউ দেখে ফেললে ভাববে এই তোমার বাক্যালাপ বন্ধ! বিশেষ করে সুহাস টের পেলে আরও সংশয়ে পড়ে যাবে। এ সব নাটকের অর্থ কি জানতে চাইবে। সুরঞ্জনের ফোকসাল থেকে রাগারাগি করে তবে বের হয়ে এলে কেন! দিব্যি তো ভাব দুজনে!

সুরঞ্জন নিচু গলায় বলল, 'বাবু কাজে যাননি। শুয়ে পড়েছেন। সারেঙ ড'কতে এসেছিলেন, সাফ জবাব, শরীর ভাল নেই।'

মুখার্জি আর কি করেন! সুরঞ্জনকে পাশ কাটিয়ে সুহাসের ফোকসালে উঁকি মারলেন। সুহাস কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে সত্যি নির্বাসনে আছে যেন ছেলেটা। সমবয়সী প্রাণের বন্ধুটির ভিতরেই আসল রহস্য এমন শুনে ঘাবড়ে যেতেই পারে। রহস্যের উৎস চার্লি নিজেই জানতে পারলে বেকুফ হওয়া ছাড়া উপায়ই বা কি। সূত্রটি ধরার চেষ্টা করতে গিয়ে এমন গোলমাল পাকিয়ে ফেলবেন বুঝতেই পারেননি। সখের গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে নিজেই এখন অথৈ জলে। কম কথা, পর্যবেক্ষণ উল্টাপাল্টা প্রশ্ন করে প্রতিপক্ষকে জব্দ করে ফেলা, এবং একসময় সঠিক সূত্রের সন্ধান: একেবারে অঙ্ক কষার সামিল—সব নিজেই গুবলেট করে দিলেন। বরং সুহাসকে সত্যি কথা বলে ফেলাই ভাল। তিনি ডাকলেন, 'সুহাস কাজে গেলি না।'

সুহাস মুখ থেকে কম্বল সরিয়ে মাথা তুলে দেখল। আবার শুয়ে পড়ল।

ফোকসালে কেউ নেই। দরজা বন্ধ করে সব খুলে বললেন।

হঠাৎ সুহাস উঠে বসল।

'তাই বলে প্রাণ হাতে করে এমন কাজ কেউ করে!'

'সময় নেই। তুই চিন্তা করিস না। আমার ধারণা, চার্লির খুবই বিপদ সামনে। অনুসরণকারী জাহাজেই আছে—তোর কথায় এটাও টের পেলাম। কিন্তু কেন? ধর চার্লি যদি মেয়ে হয়—হতেই পাবে—কারণ চার্লি বড় হয়ে উঠছে! চার্লির চোখমুখ দেখে টের পাই, শরীর দেখে বোঝার উপায় থাকে না—কিন্তু চার্লির চুল একটু বড় হলেই দেখেছিস, কাপ্তান নিজেই কেটে দেন—কদম ছাঁট। চুল ছাঁটা নিয়ে কাপ্তানকে কি হুজ্জোতি পোহাতেও হয়, তাই তো দেখেছিস। চার্লিকে খুঁজেই পাওয়া যায় না। কয়লার বাঙ্কারে গিয়ে পর্যন্ত পালিয়ে থাকে। তুই চার্লিকে কিন্তু কিছু বলতে যাস না। চার্লি ঠিকই দেখেছে। পোর্টহোলে কেউ দাঁড়িয়েছিল—লোকটাকে না দেখতে পেলে, টেরই পেত না, শেষ রাতের অন্ধকারে কেউ তাব পোর্টহোলের পাশে ঘোরাফেরা করছে। কোনও ঘোর কিংবা আতঙ্ক থেকে নয়—সত্যি সে দেখেছে। দেখেছে বলেই আমার হাঁটাহাঁটিও টের পেয়েছে। রহস্যটা তবে খুবই দুর্ভেদ্য।

সুহাস বলল, 'জানো, ম্যাকের কেবিনে সাতটা মুখোস পাওয়া গেছে।'

মুখার্জিদা শুনে হাসলেন। 'সাতটা নয়, আটটা মুখোস। একটা মুখোসের সে হিসাব রাখেনি। সেই মুখোসটাই খুঁজে বের করা দবকার।'

সুহাস অবাক।

'তুমি জানলে কি করে!'

'জানি। এখন চেপে যা।'

'জাহাজে উঠে ম্যাক একুশটা মুখোস বানিয়েছে। কাকে কাকে দিয়েছে ডাইরিতে তাও লেখা আছে। কিন্তু একটা মুখোসের হিসাব নেই। কাকে দিয়েছে মুখোসটা। তার নাম লেখা নেই।'

'হিসাব ঠিকই আছে। তবে মুশকিল, জাহাজে সে কাকে কাকে মুখোস বিলিয়েছে তার হিসাব থাকলেও একটা মুখোসের হিসাব নেই। কেন, কাকে দিয়েছে তার নাম লেখা নেই কেন বোঝা দরকার। মুখোসটা এমন কাউকে দিয়েছে যাকে সে প্রকৃতই ভয় পায়।'

'আচ্ছা মুখোস নিয়ে পড়লে কেন বল তো?'

'পোর্টহোলে যেই দাঁড়াক সে মুখোস পরে দাঁড়িয়েছিল। মানুষটা মাঝারি হাইটের। সন্দেহ করতে গেলে অনেককেই কবতে হয়। মুখোস না পরলে ধবা পড়ে যেত।'

'মুখোস পরে কেন? ওকে দেখাব জন্য মুখোস পরতে হবে কেন?'

'কেন পরতে হয় জানতে পাবলে তো হয়েই যেত। সারাদিন যাকে ডেকে দেখা যায়, রাতে তাকে কেবিনে দেখাব এত আগ্রহ কার হতে পারে' তা ছাড়া এমন কোনও কাবণ আছে—চার্লির পোর্টহোলে উঁকি না দিলে বোঝা যাবে না বলেই উঁকি দিয়েছিল। তোদের অনুসরণ করেছে কিনাবায। সাঁজ লাগলে কাছাকাছি যাবাব চেষ্টা কবেছে। ঝাপসা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দেখেছে, চার্লি তোকে নিয়ে কি করে। তা না হলে আর অন্য কি কৌতূহল থাকতে পারে। সেও হযতো গন্ধ শুঁকে টের পেয়ে গেছে কিছু।'

সুহাস কেমন ঘোরে পড়ে যাচ্ছে। মুখার্জিদার কথা শুনে আবিষ্ট হয়ে গেছে। অথথা বাগাবাগি কবেছে। মুখার্জিদাকে অত্যন্ত নীচমনের ভেবেছে। কথা বলতেও ঘৃণ্য বোধ করেছে। আব এখন সত্যি যেন মুখার্জিদা চার্লিব পবিত্রাতা। তারও। ম্যাকের কেবিনে কখন গেল, কখন ঘাঁটাঘাটি করল! কখন এত হিসাব মাথায় নিয়ে বের হয়ে এল! রাতে কি তবে হুইলের কাজ ফেলে এই করে বেড়িয়েছেন। থার্ডমেট মানুষটি কড়া ধাতের নন। সুখানিদের সঙ্গে তার কথাবার্তাও হয়। দেশবাড়ির গল্প পর্যন্ত করেন। চুরুট মুখে থাকলে, প্রসন্ন থাকেন। আর মাঝে মাঝে নৈশ প্রহরীতে চা পেলে ছেলেমানুষের মতো আহ্লাদে আটখানা।

'কিন্তু মুখোস পরে দাঁড়ালে বোঝা যাবে না! মুখোস পরেছে বোঝা যাবে না!'

নাও যেতে পারে। সব মুখোস কটাই নারী পুরুষের মুখ। কি সজীব। সহসা দেখলে তো মনে হবে জীবন্ত মানুষেব মুখ। রঙের কত অসাধারণ জ্ঞান থাকলে এটা হয়, কত নিপুণ কারিগর হলে এমন মুখোস তৈরি করা যায়, হাতে নিয়ে না দেখলে বোঝার উপায় থাকে না। গিরগিটি গোঁফের মুখোসটাও দেখলাম।'

'তা হলে কি সিম্যান মিশানে এটাই কেউ পরে খেলা দেখিয়েছে? গিরগিটি গোঁফের মুখোসটার মতো—হুবহু একরকম জানো!'

'খেলা, কিসের খেলা!' মুখার্জিদা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

'আর বোলো না, তোমরা তো যেতে। আমার যাওয়া হয়ে উঠত না সিম্যান মিশানে। একদিন মনে নেই সুরঞ্জন গান গাইল—ঐ যে কি গান—অধীর রঙের টব বাজাচ্ছিল—আব বংশীদা গানটা শুনে চটে মটে লাল—মনে নেই, আরে বংশীদার পিছনে লাগলে তো সুরঞ্জনরা ঐ গানটাই গায়।

'প্রবাসে যখন যায় লো সে। বলি বলি বলেও বলা হল না।' মুখার্জি গানের কলিটা ধরিয়ে দিলেন সুহাসকে।

সুহাস বলল, 'হ্যাঁ, তো—যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে। আমায় নির্লজ্জ রমণী বলে হাসিত লোকে—টপ্পা গান গাইল। হাততালি কুড়াল।'

'সেদিন সিম্যান মিশানে গিরগিটি গোঁফের লোক দেখলি কোথায়। মুখোস পবে খেলা দেখালে সবাই টের পেত লোকটা মুখোস পরে আছে। যতই মিশে থাক মুখের সঙ্গে ধরা পড়তই। তবে তোরা আনাড়ি, তোদের কথা আলাদা। বল কি বলছিলি!'

'সেদিন কেন দেখব।'

'কবে দেখলি!'

মুখার্জিদার কপাল কুঁচকে গেল। সুহাসের উপর কিছুটা যেন বিবক্ত। তিনি বংশীর বাঙ্কে ধপাস করে বসে পড়লেন। বংশীদার ওয়াচ চলছে, অধীরেরও। তারা ফোকসালে নেই। চারটে না বাজলে ইনজিনরুম থেকে কেউ উঠে আসতে পারবে না। তা ছাড়া চারটে-আটটার ওয়াচের লোকের দিবানিদ্রা দিচ্ছে। ওঠার সময় হয়নি—ডেক-জাহাজিরা কাজেকর্মে টুইনডেকে না হয় আফটারপিকে ঘোরাঘুরি করছে। নিচের ফোকসালগুলি প্রায় ফাঁকাই বলা যায়। তবু সাবধানের মার নেই ভেবে সুহাস দরজা ফাঁক করে কি দেখে দরজা বন্ধ করে অধীরের বাঙ্কে মুখোমুখি বসে বলল, 'জাহাজ ছাড়ার দুদিন আগে তোমাদের খুঁজতে মিশানে ঢুঁ মেরেছিলাম।'

'তারপর?'

'তারপব দেখি, তোমরা নেই। চলে আসছিলাম।'

'তারপর?'

'এত তারপর তাবপর করলে পাবব না। আমার কিছু কেন মনে আসছে না। গোলমাল পাকিয়ে ফেলছি। তোমরা ছিলে, না ছিলে না—না কিচ্ছু মনে করতে পারছি না।'

মুখার্জিদা যে নিবিষ্টমনে কিছু ভাবছেন, তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যায়। নিবিষ্টমনে কিছু ভাবলে বুড়ো আঙুলটার নোখ কামড়ান। আর মাঝে মাঝে থু থু করে জিভ থেকে কি বের করার চেষ্টা করেন। তিনি বললেন, 'এখনই ঘাবড়ে গেলে চলবে' এ যে বাবা অনেক ঘাটের জল ঘোলা করবে। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। দেখ্ তারপর, মনে করতে পারিস কি না। ম্যাক কি মুখোস পরে খেলা দেখাচ্ছিল!'

'একটা লোক ডায়াসে ম্যাজিক দেখাচ্ছিল!' তবে ম্যাক কি না জানি না।'

'কিসের ম্যাজিক!'

সুহাস সব খুলে বলল।

'জামা খুললে কি হত বল তো! চার্লি তো খাপ্পা। বলল, এই ঠাণ্ডায় কেউ জামা খুলতে পারে! লোকটা জাহাজিটাকে কি কাবু করে ফেলল। যাই বলছে, করে যাচ্ছে। কান ধরে ওঠ বোস পর্যন্ত।'

'থাম! আমি অত শুনতে চাই না। চার্লি বলল, জামা খুলে ফেললে কি হত!' মুখার্জির এক ধমক।

'হ্যাঁ, তাই তো বলল। আমি যদি জাহাজিটার হেনস্থা সহ্য করতে না পেরে উঠে যেতাম, আর আমাকে নাস্তানাবুদ করলে চার্লির সহ্য হবে কেন, সেও উঠে যেত—আমরা দুজনেই তার শিকার হতাম।'

'চার্লি তোকে খুবই ভালবাসে। কেন যে বাসে—যাকগে—সেন্ট পার্সেন্ট না হলেও ফিফটি ফিফটি ধরে রাখতে পারিস। সন্দেহটা আমার অমূলক নয়। আরও কেউ ঘোরাঘুরি করছে। সে কে বুঝতে

পারছি না। ম্যাক নিজেই নয় তো!'

'চার্লি আমাকে সত্যি ভালবাসে। সকালে তো ওর ব্রেকফাস্ট থেকে কলা আপেল পর্যন্ত দেয়।' ম্যাক সম্পর্কে সুহাসের যেন কোনও কৌতূহল নেই।'

'দেখেছি।' বলে ঠোঁট টিপে হাসলেন মুখার্জি। দুজনে খুব মসগুল হয়ে খাও। খাওয়াটা ভাল। তবে দেখবে ধরা পড়ে না যাও।'

'দিলে কি করব বল! না খেলে রাগারাগি করে। মুখ গোমড়া। ভয়ে ভয়ে খাই। আবার কোন উপদ্রবে ফেলে দেবে।'

'শুধু ভয়!' মুখার্জি কেমন ঠাট্টার সুরে কথাটা বললেন। তারপর উঠে পড়লেন।

'উঠছ কেন? বোস না। চা করে আনছি।'

জাহাজিদের এই এক প্রলোভন। চায়ের নামে পাগল। যে যার চা নিজে বানিয়ে খায়। যাদের 'বিশু' একসঙ্গে তাদের একজন ঠিক করা থাকে। সে-ই গ্যালি থেকে চা বানিয়ে নিচে নিয়ে আসে। তাদের 'বিশু'তে তেমন কোনও ব্যবস্থা নেই। সব কটা ঘাড় বাঁকা—না পারব না। অধীরকে বল। না, পারব না, কেষ্টকে বল। তারপর তোষামোদ করে কাউকে রাজি করাতে হয়। চা চিনি কনডেনস্‌ড মিল্ক নিয়ে সে তখন উপরে উঠে যায়।

আর এই সময় সুহাস নিজেই চা বানিয়ে খাওয়াতে রাজি। মুখার্জি খুব খুশি। বললেন, 'সিগারেট থাকলে দে।'

সপ্তাহে রেশনে ক্যাপস্টেনের কুড়িটা করে পাঁচটা বড় প্যাকেট পায় তারা। সুহাস সিগারেট খায় না। সে রেশন থেকে খুব কমই সিগারেট তোলে। কোনও কোনও বন্দরে কিনারায় লোকদের কাছে সিগারেটের খুব চাহিদা তখন সে তার সিগারেট কাউকে তুলতে দেয় না। বুনোসাইরিসে সে এক প্যাকেট সিগারেট দিয়ে প্রায়ই গুচ্ছের আপেল, আঙুর কিনে আনত। একবার তো দুটো ক্যাপস্টেনের প্যাকেট পেয়ে একজন বুড়ো মতো মানুষ দামি একটা কম্বলই তাকে উপহার দিল। এ সব কারণেই বন্দর বুঝে সিগারেট তোলে, না হয় তার রেশনের সিগারেট সুরঞ্জনই তোলে।

সে বলল, 'দাঁড়াও, আছে কি না দেখি।'

লকার খুলে একটা আস্ত প্যাকেটই পেয়ে গেল সুহাস। বলল, রেখে দাও। আমি তো খাই না। তারপর বলল, 'জানো ম্যাকের সেই ছবিটা কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেল না। চার্লি ম্যাকের কেবিনে খুঁজে দেখেছে।'

'কিসের ছবি?' অবাক মুখার্জি।

'দাঁড়াও চট করে চা-টা করে আনছি। বলছি সব। সুহাস কেতলি চা চিনি কনডেনসেড্ মিল্ক নিয়ে উপরে উঠে গেল। গ্যালিতে ভাণ্ডারি নেই। মেসরুমে মাদুর পেতে শুয়ে আছে। আঁচ পড়ে গেছে কিছুটা। সে তাড়াতাড়ি কেতলিতে জল ঢেলে উনুনে বসিয়ে দিয়ে গ্যালির ফোকরে গলা বাড়িয়ে বলল, 'অ ভাণ্ডারি চাচা তোমার আঁচ কিন্তু পড়ে যাচ্ছে।'

ভাণ্ডারি কাত হয়ে শুল। বলল, 'খুঁচিয়ে কটা কয়লা দিয়ে যা বাপজান।'

সে কেন যে আজ সবার অনুরোধই রক্ষা করছে। কেমন যেন সাহস পেয়ে গেছে। মুখার্জিদা তার সঙ্গে আছে—অন্তত মুখার্জিদা যে ভাবে ঝড়ের মধ্যে গেলেন, এবং যেভাবে ম্যাকের কেবিন ঘাঁটাঘাঁটি করছেন তাতে সে আর একা নয়—চার্লি সে আর মুখার্জিদা—তিনজনে মিলে ম্যাকের হত্যাকাণ্ডের একটা কিনারা ঠিক করে ফেলতে পারবে। মুখার্জিদার উপর তার এই অগাধ বিশ্বাসের হেতুতেই বোধ হয় মন আবার প্রফুল্ল হয়ে উঠছে। সে চা করে, উনুন খুঁচিয়ে কটা কয়লা দিয়ে দ্রুত সিঁড়ি ধরে নেমে গেল। কাপ বের করে মুখার্জিদাকে দিল, নিজেও চুমুক দিল চায়ে। তারপর বলল, 'আরে যে ছবিটা ম্যাক কিনারায় গেলে পকেটে রাখত। তোমাকে তো বলেছি। কি খারাপ লাগছে না, ম্যাকের ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে। বেচারা।'

'থাম্। ম্যাককে নিয়ে আর আদিখ্যেতা করতে হবে না। নিজের কথা ভাব। ম্যাকের অদৃষ্ট। আর অপঘাতে মরার বিষয়টা বেশি মনে না রাখাই ভাল। আমরা কেউ ভাল নেই, মনে রাখিস। যেখানে

যাচ্ছি কেবল শুনছি ম্যাক, তার বউ, ছেলেপিলে! আরে আমাদেরও তো বাড়িঘরে কেউ আছে! ম্যাকের নিষ্ঠুর মৃত্যু একদম আমি সহ্য করতে পারছি না। তারপর—না। ঠিক আছে আমি উঠছি। ছবি পাওয়া যায়নি, কোথাও আছে। ছবিটা পকেটে নিয়ে গেছে বলেই ধরে নিতে হবে, ম্যাক জানত, তার বিপদ হতে পারে—আমি বিশ্বাস করি না। ছবিটা সরিয়ে ফেলারও কোনও কারণ নেই। মাথাটা আমার ঘোলা করে দিস না।

ওঠার সময় মুখার্জি বললেন, 'তোর কি শরীর সত্যি ভাল নেই! কাজে গেলি না কেন! কাজে না গেলে চলবে! কাজে না গেলে ভাববে না, ম্যাকের মৃত্যু তোকে কাহিল করে ফেলেছে। ম্যাকের মৃত্যুতে তুই মুষড়ে পড়েছিস! আর কেউ তো কাজ নাগা করেনি। কাজ না করলে জাহাজ চালু থাকবে কি করে! এতে শত্রুপক্ষ টের পাবে না, তুই কিছু আঁচ করেছিস? তুই ভয় পেয়ে গেছিস! এ-সব ক্ষেত্রে ভয় পেলে অসুবিধার সৃষ্টি হয় মনে রাখিস। যা কাজে যা। ম্যাকের পর তুই নির্ঘাত টার্গেট, টের পেলে অদৃশ্য আততায়ী সাবধান হয়ে যাবে এটা কি বুঝিস!'

সুহাসের মুখ নিমেষে কালো হয়ে গেল। আতঙ্কে গা শির শির করছে। যথাসম্ভব নিজেকে সামলে নেওয়া দরকার। না হলে মুখার্জিদা ভাববে ভীতু, কাপুরুষ। মরার ভয়ে আগেই মরে ভূত। তা ছাড়া মুখার্জিদা যখন জীবনের এতটা ঝুঁকি নিতে পারেন, সে পারবে না কেন! কারণ খ্যাপা সমুদ্রে জাহাজের এত কিনারায় অন্ধকারে বিচরণ করা খুবই সুস্থ মস্তিষ্কের কাজ না। যে কোনও সময় ছিটকে পড়তে পারতেন—এবং দরিয়ায় হাফিজ হয়ে যেতে পারতেন—সেই মানুষের সামনে তাকে দুর্বল হলে চলবে কেন! এতটা ঝুঁকি নিতে পারেন জীবনের, আর সে টার্গেট এমন অনুমানের ভিত্তিতেই মুখ কালো করে ফেললে রাগ হবে না মুখার্জিদার।

সে বলল, 'ধুস বাদ দাও। শোনো তোমাকে আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি।'

'খুব তো রাগ দেখিয়ে বিষম খেলি! এখন আবার এত কথা কেন!'

সুহাস কিছুটা যেন লজ্জায় পড়ে গেছে তার আচরণের জন্য। সে সহজ হতে পারছিল না। মুখার্জিদার সিগারেট শেষ। মুখার্জিদা নিজেও পরি দিতে যাননি—নিশ্চয়ই তার মাথার মধ্যে রহস্যের জট পাকিয়ে গেছে। তাঁকে বললে বুঝতে পারবেন, উইন্ডসহোলের আড়ালে, অন্ধকারে কে রঙের টব রেখে দিয়েছিল। সকালে সে উঠে দেখেছিল, রঙের টবটা নেই। হ্যাচের দুটো কাঠ তোলা। অন্ধকারে রঙের টবে হোঁচট খেলে, হ্যাচের খোলে যে কেউ গড়িয়ে পড়তে পারত। আর সঙ্গে সঙ্গে ছাতু। জোর বেঁচে গেছে।

'জানো মুখার্জিদা আমার মনে হয় রঙের টবটা কেউ ইচ্ছে করেই রেখে দিয়েছিল। অন্ধকারে এমনভাবে রেখে দিয়েছিল মনেই হবে না, উইন্ডসহোলের ছায়ায় একটা রঙের টব আছে। আমার তো বোট-ডেক থেকে যমুনাবাজু দিয়েই নামার কথা। তুমি বললে বলে গঙ্গাবাজু ধরে গেলাম।

'কবে?'

'আরে তুমি ছুটে নেমে এলে না বোট-ডেক থেকে—আমি কি দেখে দৌড়ে গেলাম! মনে হচ্ছিল অনুসরণকারী আমার গায়ে নিশ্বাস ফেলছে!'

মুখার্জিদা বললেন, 'তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। আমার মনেই নেই।'

'সকালে গিয়ে দেখি, টবটা নেই। লক্ষ্য করার কথা না। কিন্তু ম্যাকের মৃত্যু যেন সত্যি পাখা বিস্তার করছে। সব মনে পড়ছে। যমুনাবাজু ধরে গেলে, টবের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়া বিচিত্র ছিল না। পাশেই মরণ ফাঁদ। ছিটকে হ্যাচের মধ্যে পড়ে যাওয়াও বিচিত্র ছিল না। কে যে রাখল টবটা!'

'কাঠ তোলা ছিল বলছিস?'

'তাই তো দেখলাম। কে ত্রিপল তুলে দুটো পাটাতন সরিয়ে রেখেছে। কার কাজ! যে কেউ বিপদে পড়তে পারত; রক্ষা ছিল, পড়ে গেলে, বল!'

তা বিশ ত্রিশ ফুট উঁচু থেকে খোলে পড়ে গেলে কি হয় সেটা অনুমান করেই মুখার্জিদা গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, 'তুই যে এত রাতে আমার সঙ্গে উঠে গিয়েছিলি ঠিক কেউ লক্ষ্য করেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে মরণ ফাঁদ তৈরি করে রেখেছিল মনে হয়। যাকগে. আমার সঙ্গে বেশি মেলামেশা কেউ

হয়তো পছন্দ করছে না। একজন অভিজ্ঞ জাহাজি তোর পেছনে আছে সে টের পেয়েছে।'

তারপর হঠাৎই খেপে গেলেন মুখার্জিদা, 'তোর এত কাণ্ডজ্ঞানের অভাব, কই আগে তো বলিসনি! এত বড় খবরটা চেপে রেখেছিস!'

'চেপে রাখব কেন! আমার মনেই হয়নি, আমি কিছু ভাবিওনি। তুমি যে বললে, আমিই টার্গেট। তাই মনে পড়ে গেল।'

'তুই টার্গেট আমি বলতে যাব কেন? আমি বলেছি তুই নির্ঘাত টার্গেট টের পেলে—অর্থাৎ যদি তুই টার্গেট হোস, হতেও পারিস, নাও পারিস। সবই অনুমান। রঙের টবটা যেই রেখে দিক, সে তোমার ভাল যে চায় না, এটা বুঝতে কি কোনও অসুবিধা আছে! অন্য কোনও কারণেও রাখতে পারে অথবা পড়ে থাকতে পারে। যাই হোক তোর কাছে কলম-টলম থাকলে দে তো।'

সুহাস লকার থেকে কলম বের করে দিলে বললেন, 'চিঠি লেখার প্যাডটা দে।'

সে প্যাডও বের করে দিল।

'পাশে বোস।'

সে বসল।

মুখার্জিদা হঠাৎ কলম প্যাড নিয়ে পড়লেন কেন সে বুঝল না। প্যাডের উপর পাঁচটা মহাদেশকেই এঁকে ফেললেন। বুঝে নিতে হয়—কোন্‌টা কোন্ মহাদেশ—ঠিক অস্ট্রেলিয়ার উত্তর পুবে গোলমতো একটা প্রায় বৃত্ত রচনা করে বললেন—'এই যে দেখছিস জায়গাটা, এটাই ওশিয়ানিয়া—হাজার হাজার ছোট বড় দ্বীপের ছড়াছড়ি। দ্বীপগুলিকে প্রধানত তিনটি অংশে ভাগ করা যায় বুঝলি। যেমন মেলানেশিয়া —প্যাডের উপর গোলমতো একটা বৃত্ত এঁকে জায়গাটা তিনি দেখালেন। তারপরই প্রশ্ন করলেন জীবনানন্দের কবিতা পড়েছিস? পড়িসনি। বলিস কি—তাঁর কবিতা এটা—বুঝলি, আবার আসিব ফিরে, ধান সিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়। হয়তো মানুষ নয়, হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে। হয়তো ভোরের কাক হয়ে—এই কার্তিকের নবান্নের দেশে—তিনিই কোনও কবিতায় যেন লিখেছিলেন—মালয় সাগরে—মেলানেশিয়ার কথা তাঁর মনে হতে পারে—পাশের সমুদ্রটা মাইক্রোনেশিয়া আর উপরের দিকটায় আছে পলিনেশিয়ার দ্বীপগুলি। বিস্ময়ের শেষ নেই! ইস্টার দ্বীপের নাম শুনেছিস? গালাপেগাস? শুনিসনি—অবশ্য আমরা তার অনেক নিচে ঘোরাঘুরি করব। কোরাল সিতেই যাচ্ছি। বিশমার্ক সি-তেও যেতে পারি। নেরু দ্বীপে যাচ্ছি বোর্ডে লিখেছে কিন্তু আমার মনে হয় না নেরু দ্বীপে জাহাজ যাবে। যাবে কাকাতিয়া কিংবা ওসানিয়া দ্বীপে। ফসফেটের পাহাড়—দ্বীপগুলিতে নানাদেশের জাহাজ ফসফেট নিতে আসে। তবে খুব বেশি জাহাজ দেখা যায় না। সব বন্দরেই প্রায় জেটি বলতে কিছু নেই। জাহাজ নোঙর ফেলে রাখে। টাগবোটে মাল এলে পিপেগুলি তুলে ঢেলে নেওয়া হয়। যে জন্য এত সব বলা, এই এলাকায় যে কোনও জাহাজ যদি গা-ঢাকা দেয়, কারও সাধ্যি নেই খুঁজে বার করে। কত সব লেগুন আছে—লেগুনের ভিতর ঢুকে ঘাপটি মেরে থাকা যায়। শোনা যায় সি-ডেভিল লুকেনার এই সব অসংখ্য দ্বীপের কোনও একটাতে আত্মগোপন করে থাকতেন। এমন সব দ্বীপ আছে চাষবাসের খবরই রাখে না—এমন সব অনেক দ্বীপ আছে যেখানে একটা গাঁয়ের ভাষা অন্য গাঁয়ের মানুষেরা বোঝে না। পাশাপাশি গাঁয়ের ভাষা আলাদা। কোনও দ্বীপ গড়ে উঠেছে আগ্নেয়গিরির কালো লাভায়। প্রবাল দ্বীপেরও ছড়াছড়ি। শুধু কঠিন পাথর আর ক্যাকটাস। দুর্লভ সব কচ্ছপ। প্রাগৈতিহাসিক কালের পাখি জীবজন্তু। যুগ যুগ ধরে এই সব অজানা ভূখণ্ড ছিল জলদস্যুদের গুপ্ত আস্তানা। প্যালিকানও দেখতে পাওয়া যায়। আরও কত সব বিচিত্র পাখি। সিন্ধুঘোটকও দেখতে পাবি ভাগ্যে থাকলে। তবে জলদস্যুদের আস্তানা ছিল বলেই, গুপ্তধনেরও আশা রাখে কেউ কেউ। মাটি টানার কাজ আসলে অছিলা। তারা আসলে অনেকেই আসে গুপ্তধনের খবরাখবর সংগ্রহ করতে। দ্বীপের বুড়ো মানুষদের কাজে লাগায়।'

একটু থেমে মুখার্জিদা বললেন, 'আমাদের কাপ্তানও জাহাজ নিয়ে এদিকটাতেই ঘোরাঘুরি করতে ভালেবাসেন। কেন কে জানে।'

'তবে কি কাপ্তান গুপ্তধনের খোঁজে যাচ্ছেন!' বলতে গিয়ে সুহাসের কপাল কুঁচকে গেল। কিছুটা

যেন সে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে। 'লোকটা কি পাগল! এখানে কোন্ দ্বীপে কোন্ জলদস্যু কি গুপ্তধন রেখে গেছে খোঁজা কি চাট্টিখানি কথা! আমার মাথায় কিছু আসছে না দাদা।'

মুখার্জিদা বললেন, 'আস্তে। দু-কান হলে তুমিও শেষ, আমিও শেষ!'

সুরঞ্জনের সঙ্গে কথাবার্তা সব রাতের পরিতে। তাঁর এবং সুরঞ্জনের একই সময়ে পরি। বারোটা চারটা। সুবঞ্জন স্টোকার—পরি তার স্টোকহোলডে। তিনি সুখানি—পবি তাঁর হুইল-রুমে। ব্রিজ থেকে সিঁড়ি ধরে নেমে গেলেই চিমনি। যা কিছু গোপন কথাবার্তা চিমনির আড়ালে দাঁড়িয়ে। সুরঞ্জন স্টোকহোলডে নেমে যাবার আগে চিমনিব গোড়ায় বসে থাকে। মুখার্জি ব্রিজে উঠে যাবার সময় ঘড়ি দেখে বলে দেন, কটায় সুরঞ্জনকে উঠে আসতে হবে। দুজনেই সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। মধ্য রাতে জাহাজ নিঝুম। ইনজিনরুম আর ব্রিজ ছাড়া কেউ জেগে থাকে না। ঘোর মাতালের মতো জাহাজ টলতে টলতে ভেসে যায়। ডেকে, ব্রিজে কিছু আলো জ্বালা থাকে—মাস্তুলের আলো দুটো খুবই উজ্জ্বল। আর সব কেমন নিস্তেজ। সেই আলো অন্ধকারে তারা চিমনির আড়ালে গোপন পবামর্শ চালিয়ে যাচ্ছে।

গিরগিটি গোঁফের মুখোশটা নিয়ে কথাবার্তা বলা দরকার। মুখার্জিদার সাংকেতিক কথাবার্তা থেকে সুরঞ্জন টের পেয়েছে তার সঙ্গে মুখার্জিদার গিরগিটি গোঁফের মুখোশ নিয়ে কথাবার্তা বলতে চান। চিমনির গোড়াতে সুরঞ্জন বসে সিগারেট টানছিল। মুখার্জিদা এখনও আসছেন না। তাব জুরিদাররা সবাই একে একে নিচে নেমে যাচ্ছে। সুরঞ্জন সবার শেষে নামে। কোলবয় দুজনও নেমে গেল। মনুকে নিয়ে মুশকিল। মইনুদ্দিন—সে সুরঞ্জনের কিছুটা চেলা গোছের। বয়সের ফারাক খুবই। তবু সুরঞ্জনকে দাদা দাদা করে।

'দাদা তুমি বসে থাকলে।'

'যা। যাচ্ছি।'

'মসলা আছে?'

মসলা মানে টোবাকো। সুরঞ্জন পকেট থেকে সিগাবেট বেব করে দিল। বলল, 'মসলা নেই।' মনু বলল, 'ম্যাচেস দাও।' সুবঞ্জন সিগারেটের ছাই ঝেড়েআগুনটা এগিয়ে দিল। বলল দেশলাই নেই। তবু মনুর নামাব লক্ষণ দেখা গেল না। যতক্ষণ উপরে বসে থাকা যায়। খোলামেলা হাওয়ায় বসে থাকতে সবারই ইচ্ছে হয়। কয়লার বাঙ্কার তো অন্ধকূপের সামিল। হাওয়া বাতাসের বড টানাটানি। টন টন কয়লাব পাহাড়। পাহাড়ের পাশে দাঁড়িয়ে সারাক্ষণ বেলচায় কয়লা ভবতে হয় গাড়িতে—কষ্ট তো হবেই। কয়লার ধুলোয় বাঙ্কাবে নিঃশ্বাস ফেলাও কঠিন। সুট ভরতেই দম বের হয়ে যায়। নিচে নেমেই হাড্ডাহাড্ডি কাজ। দানবেব মতো ফার্নেসগুলো আগুন উগবে দেবে। ফারায়ম্যানরা ফার্নেস থেকে আগুন টেনে নামাবে আর কোলবয়রা জল মারবে—ধোঁয়া, আগুন, জলের হুড়োহুড়ি। উইন্ডসহোলের নিচে না দাঁড়ালে শ্বাস নিতেও কষ্ট। মনু নিচে নামার আগে দম নিচ্ছে। সহজে নড়বে বলে মনে হয় না। সুরঞ্জন বিরক্ত হয়ে বলল, বসে থাকলি কেন. যা নিচে যা। ছোট টিন্ডালকে বলবি আমার নামতে একটু দেরি হবে।

বারোটা বাজতে আর পাঁচ সাত মিনিট বাকি। মধ্যরাতের পরি। পরিদাররা ছাড়া মধ্যরাতে জাহাজে কেউ জেগে থাকে না। আকাশে অজস্র নক্ষত্র। অষ্টমীর চাঁদ এইমাত্র দিগন্তে টুপ করে ডুবে গেল। সমুদ্রের সোঁ সোঁ গর্জন ছাড়া আর কিছুই যেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। মনু চিমনির গোড়ায় বসে আছে দেখতে পেলে, মুখার্জিদা সোজা হুইলরুমে সিঁড়ি ধরে উঠে যাবেন। কারণ সবাই তো জানে, মুখার্জির সঙ্গে সুরঞ্জনের বাক্যালাপ বন্ধ। ডগওয়াচ নিয়ে কথা কাটাকাটির পর মুখার্জিবাবু ফোকসালই ছেড়ে দিলেন।

মনু নেমে যেতে থাকল। চিমনির জালিতে সুরঞ্জন বসে আছে। একটা পা সিঁড়ির রডে। প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ ফুট নিচে স্টোকহোলড। ফার্নেস ডোর খুলে দিলে আগুনের হলকায় সারা স্টোকহোলড ঝলমল

করে উঠল। উপরে এখনও ঠাণ্ডা আছে। নিচে বলতে গেলে আগুনের নরক। কোথাও হাত দেওয়া যায় না—দিলেই হাতে ফোসকা পড়ে যায়। সুরঞ্জন কয়লা মেরে মেরে এতই মজবুত যে তার আগুন কিংবা কয়লা নিয়ে কোনও ত্রাস নেই। সে কুঁড়ে নয়, একাই দুজনের কাজ সামলাতে ওস্তাদ। এ-জন্য টিন্ডাল তাকে খুবই সমীহ করে। দেরি করে নামলেও কৈফিয়ত দিতে হয় না। এটাই তার সুবিধা।

সুরঞ্জন দেখল একটা ছায়া লম্বা হয়ে আবার বেঁটে হতে হতে ক্রমে অদৃশ্য হয়ে গেল। মুখার্জিদা বোধহয় আসছেন—আর কারও এ-সময় বোট-ডেকে উঠে আসার কথা না। কাজ ছাড়া বোট-ডেকে ঘোরাঘুরি করলেও অপরাধ। কারও সাহসই হবে না অকারণে বোট-ডেকে উঠে আসার। ব্রিজ থেকে কেউ যদি তাকে অনুসবণ করে থাকে! ব্রিজে দেখল কেউ নেই। চিমনির আড়ালে যদি কেউ থাকে, ঝুঁকে দেখে নিল। যমুনাবাজুর লাইফবোট দুটোর আড়ালে—না কেউ নেই। সে নিশ্চিন্তে দেখা করতে পারে। এত রাতে বোট-ডেকে শলাপরামর্শ করার যে নিশ্চিত জায়গা নয়, সে ভালই বোঝে। গঙ্গাবাজুর দিকে দুটো কেবিন। কেবিন দুটোরই দরজা বন্ধ। কাপ্তান শুয়ে পড়েছেন। দশটা বাজলেই তিনি নিজের কেবিনে চলে যান। তার ঘর খুবই সাদামাটা। কেবল মাথার উপর ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তি ছাড়া একটা লকার—একটা র‍্যাক—এবং র‍্যাকে সব চামড়ায় বাঁধানো মোটা মোটা বই। ডেক-জাহাজিদের কাছেই খবর পেয়েছে সুরঞ্জন। কেবিন রং করার সময় তারা দেখেছে সব।

মুখার্জিদা খুবই অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে সিঁড়ি ধরে উঠে গেলেন। তবে এখুনি নেমে আসবেন। কারণ কাজ বুঝে নেওয়ার জন্য তাঁকে উঠে যেতেই হবে। সুরঞ্জন গলাখাঁকারি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে সে আছে। তিনি তা যে বিলক্ষণ টের পেয়েছেন, তাঁর হাত তোলার ভঙ্গি থেকেই সে বুঝে ফেলেছে। সে চিমনির ছায়ায় নিজেকে আড়াল করে ফেলল। কেবিন থেকে যদি বাড়িয়ালা বের হয়ে আসেন, তবে ঝামেলা হতে পারে। চিফ ইনজিনিয়ারকে ডেকে কৈফিয়ত চাইতে পারেন। চিফ তখন সেকেন্ডকে তলব করবে। সেকেন্ড তলব করবে ইনজিনসারেঙকে। তিন নম্বর পরির স্টোকার কেন কাজ ফেলে বোট-ডেকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। চিমনির অন্ধকারে বসেছিল কেন! এ ধরনের কৈফিয়ত কাপ্তান চাইতেই পারেন। তাকে নিয়ে হুজ্জোতি শুরু হয়ে যেতে পারে জাহাজে। যতটা সতর্ক থাকা যায়।

মুখার্জি নেমে এসে খুবই সন্তর্পণে তাকে চিমনির আড়াল থেকে ডেকে নিলেন। তারা যমুনাবাজুর লাইফ-বোটের আড়ালে গিয়ে বসে পড়ল। যত দ্রুত সম্ভব কাজ সেরে সরে পড়া দরকার। কারণ থার্ডমেট দেরি দেখলে, মুখার্জিকে খুবই অদায়িত্বশীল ভাবতে পারেন।

দুজনেই এখানে কথাবার্তা বলতে পারে সহজে। সমুদ্রের গর্জন এবং ইনজিনের গুম গুম আওয়াজে তাদের কথাবার্তা কারও কানে যাবার কথা না। কাছাকাছি কেউ জেগেও নেই।

মুখার্জি বললেন, 'শোন সুরঞ্জন, গিরগিটি গোঁফের মুখোসটি নিয়ে আবার একটা ঝামেলায় পড়া গেল। ওটা পরে নাকি সিম্যান মিশানে কে ম্যাজিক দেখিয়েছে।'

'যাঃ হতেই পারে না।' সুরঞ্জন এক বাক্যে সব উড়িয়ে দিল। বলল, 'তুমি বুঝছ না কেন, ডায়াসে কেউ মুখোস পরে খেলা দেখাচ্ছে আমরা তো জানি না। মুখোস পরলে বোঝা যেত না! গিরগিটি গোঁফের মুখোসটা তো ম্যাকের কেবিনে পড়ে আছে।'

'কিন্তু চার্লি যে বলল, দেখেছে।'

'সুহাস?'

'সুহাসও বলল, দেখেছে।'

'কবে?'

'জাহাজ ছাড়ার দু-দিন আগে। গোঁফো লোকটা হিপনোটাইজ জানে। সবাইকে হিপনোটাইজ করল, কেউ বুঝতে পারল না, লোকটা আসলে মুখোস পরে আছে বুঝতেই পারেনি কেউ।'

'গোটা হলসুদ্ধ হিপনোটাইজ করা কি সোজা কথা। কি জানি আমি কিছু বুঝছি না দাদা। নানা দেশের জাহাজি—কে কি খেলা দেখালে, গান গাইল, গিটার বাজাল মনেও করতে পারছি না—ম্যাকের ঘরে সেই মুখোসটাই পরে আছে বলল চার্লি?'

'তাই তো বলল। আমার বিশ্বাসই হয় না, ম্যাক এ-কাজ করতে পারে। কেন করবে বল! তাকে

তো একদিনও স্বাভাবিক দেখিনি—কাঁড়ি কাঁড়ি মদ গিলে বেহুঁশ হয়ে ফেরে। কোনও দুরভিসন্ধি থাকলে, একজন মানুষের পক্ষে রোজ রোজ বেহুঁশ হয়ে ফেরা অসম্ভব। তবে কখন কোথায় মদ গেলে আজও বোঝা গেল না। কেবিনে বসে মদ গেলে বলেও শুনিনি। ম্যাকের মদ গেলার ধনদও কম তাড়া করছে না। তার পরই মুখার্জি বললেন, 'তুই দেখেছিস মুখোসটা?'

'দেখেছি।'

'চাবিটা দে। চার্টরুমে রেখে দিতে হবে।' বলে দ্রুত চাবিটা পকেটে পুরে মুখার্জি বললেন, 'চার্লি নাকি হল থেকে বেরিয়েই বলেছে লোকটাকে সে কোথায় যেন দেখেছে! কিন্তু কোথায় দেখেছে মনে করতে পারছে না।'

সুরঞ্জন বলল, 'এমনও তো হতে পারে ম্যাকের কেবিনে চার্লি মুখোসটা দেখেছে। মুখোসটা দেখে সে ভয়ও পেতে পারে। গোঁফজোড়া ঝুলে আছে। তারপর হয়তো সে মুখোসটার কথা ভুলে গেছে। মুসকিল কি জানো, গাবদা লোকরা ঝুল গোঁফ রাখলে দেখতে একইরকম লাগে। লোকটাকে সে কোথাও দেখেছে মানে, সেই মুখোসটার কথা চার্লির মনে হতে পারে। মুখোস ঠিক বোধ হয় বলা উচিত না—ঐ কিম্ভূতকিমাকার মুখ তার অবচেতন মনে ছায়া ফেলতে পারে। লোকটাকে তাই চেনা মনে হতে পারে। কোনও মানসিক দুর্বলতা থেকে যে নয় কে বলবে। বুঝতেই পারছ চার্লি আগের চার্লি নেই। পাঁচ সাত মাসে কি ছেলেটা কি হয়ে গেল! এত বিনয়ী আর ভদ্র, ভীতু স্বভাবেরও হয়ে গেছে। এগুলো কিন্তু ভেবে দেখা দরকার। ম্যাকেব মৃত্যুরহস্য খুঁজে বের করা কঠিন। আর আমাব তো মনে হয় এ-সব ঝামেলায় আমাদের জড়িয়ে পড়াও ঠিক হবে না। দুর্ঘটনা ভাবলেই ক্ষতি কি!'

মুখার্জিদা খেপে গেলেন, 'তুই কি রে। এর মধ্যে থ্রিল আছে না। যদি জাহাজের কেউ হয় ধরা পড়বেই। সে জাল বিছিয়ে যাচ্ছে। জালে কে পড়বে, তুই, সুহাস না চার্লি এখনও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আমিও হতে পারি। ম্যাক গেল তাবপর কে যায় দ্যাখ্।' মুখার্জিদা টবেব প্রসঙ্গও তুললেন। 'তবে জাহাজ যাচ্ছে। বিশমার্ক-সি-তে। যারাই যায় তারা একবার জলদস্যুদের ঘাঁটি খুঁজে বেড়ায়। তারা কোথায় যে তাদের ধনসম্পদ লুকিয়ে রেখে হারিয়ে গেল কেউ জানে না। সি-ডেভিল লুকেনার যে বাড়িয়ালাকে কোনও প্রলোভনে ফেলে দেয়নি কে বলবে। তিনি জাহাজে উঠলে ঠিক মাটি টানাব কাজে এদিকটায় নেমে আসবেনই। জাহাজি সারেঙরাও বলেছে, এই এক দোষ ব্যাঙ্ক লাইন কোম্পানির। বাড়িয়ালা কোম্পানির এজেন্ট হয়েও যে কাজ করছে না কে বলবে।'

কে যেন উঠে আসছে। বোট-ডেকে কে উঠে আসতে পারে। হামাগুড়ি দিয়ে বোটের নিচে মাথা আড়াল করে মুখার্জি বললেন, 'কেউ না। শব্দটা নিচে উঠছে। এলিওয়েতে কেউ হেঁটে যাচ্ছে। বাটলারের ঘরের দিকে মনে হয়।'

মুখার্জি বললেন, 'শোন আমার যা যা মনে হয়েছে। ভেবে ভেবে যা সিদ্ধান্ত নিয়েছি—আমরা মনে রাখিস প্রফেসনাল নই—আমাদের ভুলচুক হবেই। কি করে যে এত সূত্র পেয়ে যায় গোয়েন্দারা তাও বুঝি না। গোয়েন্দা উপন্যাস পড়ে পড়ে মনে হয়েছে, সমাধানের অঙ্কটা মাথায় আগেই রেখে দেওয়া হয়। লেখক তারপর নানা বাহানা সৃষ্টি করেন। কাহিনীর জায়গায় জায়গায় লাঠি ফেলে রেখে যান। তারপর সব কুড়িয়ে নেন। নিজের খুশিমতো পটভূমি সৃষ্টি করেন, তারপর রহস্যের জাল একে একে ভেদ করেন। জালটা নিজেই বুনে ফেলেন, তারপর নিজেই খোলেন। বিস্তর পড়াশোনার দরকার হয়। অথবা কল্পনা—শালা ও দুটোর একটাও আমাদের নেই। নিরেট জাহাজি। সারাজীবন তুই বয়লারে কয়লা হাকড়ালি আর আমি স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে গেলাম। সুহাস তো এ-ব্যাপারে আরও নবিশ।'

তারপর মুখার্জি পকেট থেকে কি বের করে দেখালেন—'এটা কি?'

'এ তো দেখছি শোনপাটের সরু দড়ি।'

'দেখেছিস হলুদ রং—একেবারে মাস্তুলের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে কিনেছে। মাস্তুলের নিচে কিছুটা পড়েছিল। তুলে রেখেছি। জাহাজের কত গেরো জানিস তো—ফসকা গেরোই কত রকমের—ডেক-জাহাজি কেউ সঙ্গে আছে মনে হয়। ফিতে টানলেই গেরো আলগা। ডেরিক হুড়মুড় করে পড়ে

গেছে। কাজেই দুর্ঘটনা নয় ধরে নেওয়া যায়।'

সুরঞ্জন দড়িটা হাতে নিয়ে দেখছে। দড়িটা কাছিতে তবে জড়ানো ছিল। সুরঞ্জন সহসা প্রায় লাফিয়ে উঠল যেন—'তা হলে বেশ আটঘাট বেঁধেই কাজটা করা হযেছে। মাস্তুলের আড়াল থেকে দড়ি টেনে কেউ কাজটা করেছে ভাবছ!'

'ভাবনা ছাড়া কি সম্বল বল্। আততায়ী সুহাস এবং ম্যাককে খুন করার জন্যই জালটা পেতে ছিল। সুহাস বেঁচে গেল চার্লি তাকে ডেকে নিয়ে গেল বলে।'

'না, বুঝছি না কিছু!' সুরঞ্জন হতাশ হয়ে গেল।

'আমি যা সিদ্ধান্তে এসেছি, ভেবে দ্যাখ্—ঠিক কি না। প্রমাণ করা যদিও কঠিন, তবু এটা মনে হচ্ছে, এক নম্বর, চার্লি যে কোনও কারণেই হোক জাহাজে আত্মগোপন করে আছে। বাধ্য হয়ে থাকতে পারে, অথবা নিজের কোনও সমূহ বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য কাপ্তান চার্লিকে সঙ্গে নিয়ে আসছেন। সেটা কি হতে পারে জানি না। দু-নম্বর, চার্লির ঠাকুরদা ধনকুবের—দুই ছেলের সঙ্গেই তাঁর বনিবনা ছিল না। চার্লির বাবা কাকা দুজনই ডিভোর্সি বিয়ে করেন। গুচ্ছের বাচ্চাকাচ্চাসহ। তারা কোথায়! ধনকুবের যদি তিনি সত্যি হয়ে থাকেন, চার্লির বাবাকে জাহাজে পড়ে থাকতে হচ্ছে কেন? তিনি কি খুঁজে বেড়াচ্ছেন?'

'তিন নম্বর, চার্লি ছেলে নয়, মেয়ে।'

'মেয়ে বলছ!'

'হ্যাঁ তাই বলছি। সে কারও সঙ্গে মেশে না। পুরুষের ছদ্মবেশে আছে। নাবালক ছিল এতদিন, অসুবিধা ছিল না। জাহাজেই চার্লি বড হয়ে গেল। খবরটা একটু লেটে বুঝেছি। তাব আগেই কেউ টের পেতে পারে। ম্যাকের সঙ্গে চার্লির ভাব ছিল। অবসর সময়ে দাবা খেলত। চার নম্বর, চার্লির কেবিনে সুহাস ছাড়া সেই ঢুকতে পারত। সুহাস ছাড়া ম্যাকই ছিল চার্লির কাছের লোক। ম্যাক টের পেযে গেছে ভেবেই তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

'তা হলে সুহাসের কি হবে?'

'সুহাসকে এ-সময়ে সরিয়ে নেওয়া ঠিক হবে না। পাঁচ নম্বর, ধুরন্ধর আরও কেউ চার্লিকে অনুসবণ করছে। তার কেবিনের পোর্টহোলে উঁকি মারছে। পোর্ট অফ সালফাব থেকেই ঝামেলা। সুহাসের সঙ্গে এমন কোনও আচরণে যদি অনুসরণকারী টের পায় চার্লি কিশোরী বালিকা তবে তার জটিল অঙ্ক মিলে যাবে ভেবেছে।'

'ভুল তোমার সিদ্ধান্ত, বাদ দাও তো—তাই যদি হয় লোকটা একদিন অন্ধকারে জাপটে ধরতে পারে—এত কষ্টের কি দবকার। টিপেটুপে দেখলেই টের পেত মেয়ে না ছেলে।'

মুখার্জি ব্যাজার মুখে বললেন, 'আহম্মক আর কাকে বলে। জাহাজে বাড়িয়ালা হলগে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তিনি কি না করতে পারেন। জানিস ভয় শুধু না, নসিব একেবারে আন্ধা করে দিতে পারেন তিনি। সংশয় থেকে সব হয়। বোধ হয় কোনও সংশয়ও আছে, যদি সত্যি চার্লি মেয়ে না হয়ে ছেলেই হয়, তখন কি হবে। অন্ধকারে জাপটে ধরলে কি হয় বোঝো না। সুহাসকে দিয়ে বুঝছ না। বড় টিন্ডাল অন্ধকার বাংকারে সুহাসকে জাপটে ধরতে গেল, আর সুহাস ছুটে পালাচ্ছিল। সারেঙ সাব শুনে সবার সামনে বড় টিন্ডালকে খড়ম পেটা করলেন। সবাই টিন্ডালের মুখে থুথু ছিটাল! বড় টিন্ডালকে দেখলে ওর জাতভাইয়া এখনও থু থু ফেলে। কত মাস আগের ঘটনা, এখনও কেউ ভুলতে পারছে না।

'জাহাজি বলে কি ইজ্জত নেই।'

'তা হলে উঠি। সুরঞ্জন উঠতে চাইলে মুখার্জি বললেন, 'সব গোয়েন্দার দেখছি একজন সহকারী থাকে। সেক্রেটারি থাকে—বিশ্বস্ত চাকর থাকে—আমার শালা কিচ্ছু নেই। এত বেছে তোকে সহকারী নিয়োগ করলাম গোপনে, আর তুই কথায় কথায় সব ঝেড়ে ফেলতে চাস। কোনও নিষ্ঠা নেই। নিষ্ঠা না থাকলে বড় হওয়া যায় না জানিস। যাই বলি, উড়িয়ে দিতে চাস। একজন সহকারী সব সময় ধৈর্য সহকারে শুনবে। বোঝার চেষ্টা করবে, সব আদেশ মাথা পেতে নেবে—দুটো একটা প্রশ্নও যে করবি না, তা বলছি না। তবে সব সময় সব প্রশ্নের উত্তর আশা করবি না। কি বুঝলি?'

'সব প্রশ্নের সব সময় উত্তর আশা করব না।'

'হ্যাঁ তাই। টিপেটুপে দেখতে গেলেও ধরা পড়ার আশঙ্কা থাকে বোঝার চেষ্টা করবি। পোর্ট অফ সালফার থেকে অনুসরণকারী চার্লির পেছনে লেগেছে। চার্লি তার বাবাকে কিছুই বলছে না। কেন বলছে না বল্।'

'আমি কি করে বলব?'

'কোনও কারণে বাবার প্রতি চার্লি বিশ্বাস হারিয়েছে। বাবার সঙ্গে সম্পর্ক ভাল না। বাবাকে সে বোধ হয় খুব গ্রাহ্য করে না। কাপ্তানও তার পুত্র বল, মেয়ে বল চার্লিকে ভয় পায়। শাসন করার অধিকার তিনি হারিয়েছেন।'

সুরঞ্জন হাই তুলে বলল, 'তোমার ধারণা।'

'হাই তুলেছিস। তুই কি রে। এত বড় বিপদে হাই তুলতে পারলি।'

'আচ্ছা বলো তো, হাই উঠলে কি করব? তুমি অযথা রাগ করছ। টিন্ডাল হয়তো চিল্লাচিল্লি শুরু করে দিয়েছে—আমি যাই।'

'টিন যোগাড় করেছিস?'

'করেছি।'

'যা বলেছিলাম ঠিকঠাক করে যাচ্ছিস?'

'মনে তো হচ্ছে।'

চিমনির গোড়ায় এসে সুরঞ্জনের কি মনে হল কে জানে—সে ডাকল, 'মুখার্জিদা।'

মুখার্জি ফিরে কাছে এসে দাঁড়ালেন।

'টিন কিন্তু পাইনি। একটা রঙের টব পেয়েছি। ওতে চলবে না?'

'চলবে! কোথায় রেখেছিস?'

'আমার বাঙ্কের নিচে। কেউ দেখলে ভাববে ময়লা ফেলার জন্য রেখেছি। ভাল করিনি?'

'তোর তো যথেষ্ট বুদ্ধি আছে, এই তো সহকারী। এখন ছাপটাপ পাওয়া গেলেই বোঝা যাবে তিনি কে। সবার জুতো ভাল করে লক্ষ্য করবি। খালি পায়ে কেউ নিশ্চয়ই পোর্টহোলে উঁকি দিতে যাবে না।'

'নিশ্চয় করে কিছু বলা যাবে না দাদা।'

'কেন?' মুখার্জি হতবাক হয়ে গেলেন।

'আরে জুতো পরে গেলে ডেকে কেউ হাঁটছে বোঝা যাবে না?'

'কেন যদি ক্যাম্বিশের জুতো পরে যায়। যেতেই পারে। খালি পায়ে হাঁটার অভ্যাস জাহাজে কারও থাকে না। ভয় কখন কি কোথায় ফুটে যাবে। মগড়াকে বলেছিস, সকালে জল মেরে ঝাঁটা মেরে পরিষ্কার করে দিতে?'

'বলেছি। মগড়া রাজি হয়েছে। তবে শর্ত আছে।'

'কি শর্ত দিল?'

'আমাকে গাঁজা ভাঙ ধরতে হবে।'

'তার মানে?'

কার্ডে যা পায় হয় না। নেশাভাঙে টানাটানি পড়ছে। নাম লেখাতে পারলে কিনার থেকে সে বেশি মাল কিনতে পারবে। আমিও রাজি। একগাল হেসে বলল, কোই দিক্কত নেই হবে বাবু।'

'সাবাস। ওকে দিয়ে জুতো চুরি করাতে হবে। যদি ছাপটাপ পাওয়া যায়। পোর্টহোলের কাছে আটা ময়দা যাই হোক ছড়িয়ে রাখলে হারামির বেটা যাবে কোথায়। ঠিক পায়ের ছাপ দেখা যাবে। কার জুতোতে আটা ময়দা লেগে আছে দেখা শুধু। মগড়ার তো সবার কেবিনে ফ্রি পাসপোর্ট। এক পাটি জুতো গায়েব করতে অসুবিধা হবার কথা না।'

কিন্তু সব বৃথা। যথানিয়মে গ্যালি থেকে আটা ময়দা চুরি করে সুরঞ্জন গোপনে চার্লির পোর্টহোলের পাশে ডেকের উপর ছড়িয়ে রাখে, যথানিয়মে মগড়া জল মেরে ঝাঁটা মেরে খুব সকালে ধুয়ে দেয়।

কিন্তু জুতোর ছাপ, নিদেনপক্ষে কোনও পায়ের ছাপ পড়ে না। সুরঞ্জন রোজ রোজ রাতে কাজটা করার সময় খুবই সন্তর্পণে হাঁটা চলা করে। ক্যাম্বিসের জুতো পরে হাঁটাচলা করলে টের পাওয়ার কথা না। টের পেলে মুখার্জি জানতেন। সুহাস ঠিক এসে বলত, রাতে কে আবার হাঁটাহাঁটি করছে।

মুখার্জি ভেবে পেলেন না বোকার মতো কাজটা করা ঠিক হচ্ছে কি না। কেন যেন মনে হচ্ছে ম্যাক নেই বলে অনুসরণকারীও নেই। আবার এমনও হতে পারে অনুসরণকারী তার চেয়েও ধড়িবাজ। ফাঁদ পেতে তাকে ধরা কঠিন। সে টের পেয়ে গেছে হয়তো জাহাজে তার পিছু নিয়েছে কেউ।

দিন যায়। জাহাজও যায়। জাহাজ তো এখন বেশ হেলেদুলে যাচ্ছে। জাহাজে কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা আর ঘটছে না। সুহাসও কোনও খারাপ খবর দিচ্ছে না। চার্লিকে দেখলে সুহাস আগের মতো ছুটে যেতে পারছে না। চার্লির এটা ছদ্মবেশ—যদি সত্যি মেয়ে হয়, কিছুটা যেন তার হতভম্ব অবস্থা। এমনকি একদিন চার্লি পিছিলে চলে এসেছিস, ডাকাডাকি করেছে—সুহাস অধীরকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছে, সে পিছিলে নেই।

'পিছিলে নেই তো গেল কোথায়।' চার্লি বড়ই অধীর হয়ে উঠছে সুহাসের জন্য। যদি কোনও খববটবর থাকে। মুখার্জি নিজেই সুহাসকে ডেকে বললেন, 'যা না, দ্যাখ্ না কেন খুঁজছে। কোনও খবরটবর যদি পাস। মুখোসটার হদিস পাওয়া গেল না। দুটো মুখোস দেখা গেছে থার্ড মেট আর ফোর্থ ইনজিনিয়ারের কেবিনে। একটা মুখোস একজন পাদ্রির আর একটা মুখোস এক বালকের। হিমশীতল পাথরেব মতো ঠাণ্ডা চোখের মুখোসটাব তো কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। যদি চার্লি খোঁজটোজ পেয়ে যায়।'

'নেই। অনেক খোঁজাখুঁজি হয়েছে। তুমিও চেষ্টা করেছ। চার্ট-রুম থেকে চাবি চুরি করে যার তার কেবিনে ঢুকে খুঁজেছ। কিছু পাওয়া যায়নি। চার্লি তো দিব্যি খোস মেজাজে আছে। বললাম, চার্লি, আর ইউ গার্ল। সোজা জবাব, নো নো, মি বয়। সবটাই এখন আমার প্রহসন মনে হচ্ছে।'

সুহাস কাজে যাবে বলে জামা প্যান্ট পালটাচ্ছিল। মুখার্জি বাঙ্কে বসে আছেন। এ তো আবেক গভীর গাড্ডা। তাঁর মাথা খারাপ অবস্থা। তুই বললি—চার্লি আর ইউ গার্ল!'

'বলব না কেন? সে যদি আন্তরিক হয়, তবে আমাকে বলতে বাধা কোথায় বলো। কই বলল না তো, মি গার্ল। তার তো উচিত সব খুলে বলা। তোমরাই কেন ভাবছ, চার্লি বালিকা, বুঝছি না। মি. বয়! বলে হাউ হাউ কান্না। কি বলল জানো, আমরা নাকি সবাই মিলে তাকে নিয়ে মজা করছি। মজা আমরা কবছি না চার্লি কবছে। কোথায় সে কখন কাকে দেখছে, আর তার ভয়ে জড়সড়। নাটক বুঝলে। উইনচে আর কাজে যাচ্ছি না।'

'কোথায় কাজ কবছিস তবে?'

'ইনজিনরুমে। তেল জুট সিরিস নিয়ে রেলিং ঘষামাজা করছি। এখন তো মনে হচ্ছে, আমিই তামাসার পাত্র হয়ে গেলাম।'

'আবে গাধা তুই বলতে গেলি কেন, তুমি কি মেয়ে। তোর কি মাথায় কিছু নেই।' বলে মুখ ভ্যাংচালেন মুখার্জি।

'কেন তুমি যে বললে ফিফটি ফিফটি।'

'এখন আর ফিফটি ফিফটি বলছি না। সেন্ট পারসেন্ট ধরে রাখ।'

'ধরে রাখতে হয় তোমরা রাখ। আমার কিচ্ছু আসে যায় না। আমি যাচ্ছি। আর কিছু বলার আছে।'

'কাজে গেলেই কি রেহাই পাবি। চার্লিও যে তোর উপর অভিমানে কেবিন থেকে বেরই হচ্ছে না এটা কি তোর একবারও মনে হয়েছে! তোকে দেখতে না পেলে তো চার্লি সব অন্ধকার দেখে এটা বুঝিস?'

সুহাস লকার খুলে কি খুঁজল। পেয়েও গেল। ওটা ছুঁড়ে দিল মুখার্জিদাকে। বলল, 'এই নাও, দেখ কি লেখা আছে। ওটা চার্লি আমাকে দিয়েছিল—তোমাকে দিতে ভুলে গেছি। 'কলিজ' বলে একটা জাহাজডুবির ঘটনা এতে লেখা আছে। চার্লি তার বাবার ডাইরি থেকে উদ্ধার করেছে।

মুখার্জি পড়ে চমকে গেলেন। কাপ্তান ডাইরিতে 'কলিজ' কবে ডুবেছে, কি তারিখ, কেন ডুবল—মিত্রপক্ষের মাইনফিল্ড, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, ১৯৪২ সাল আরও কিছু খবর—তিনি পড়তে পড়তে কেমন রুদ্ধশ্বাসে বললেন, 'এত বড় খবরটা তুই অবহেলায় ফেলে রেখেছিস। তুই কি বুঝতে পারিস না, কাপ্তান জাহাজটার খোঁজেই ঘোরাঘুরি করছেন।'

'কোনও খবরই আমার কাছে আর গুরুত্ব পাবে না। চার্লি ডেকে বের হচ্ছে না, আমার উপর অভিমান করে নয় বুঝলে। চার্লি অসুস্থ। তাই বের হতে পারছে না। শুয়ে আছে। কাপ্তানবয়কে দিয়েই চার্লি খবরটা পাঠিয়েছে। সঙ্গে আমাকে কেবিনে যেতেও বারণ করে দিয়েছে। বুঝতেই পারছ তোমাদের গোয়েন্দাগিরির কোনও মূল্য নেই। চার্লি যে অসুস্থ তারও খবর রাখো না। কাপ্তান জাহাজটার খোঁজে আসুন আর মাটি টানার কাজে আসুন আমার কিছু যায় আসে না।'

'কি হয়েছে?'

'আমি কি করে বলব। কাপ্তানবয় বললেন, 'চিন্তা করার কিছু নেই। ও হয়। ক'মাস ধরেই নাকি হচ্ছে। দু-দিন হল উঠতে পারছে না।'

'উঠতেই পারছে না, এত অসুস্থ!'

'বলল তাই। তাকে কাপ্তান এবারে ডাক্তার দেখাবেন। ঘাটে জাহাজ লাগলেই।'

সে সিঁড়ি ধরে উঠে যেতে চাইলে হাত ধরে ফেললেন মুখার্জি। টেনে ফোকসালে ঢুকিয়ে দিলেন। দরজা বন্ধ করে বললেন, 'খুবই দুরারোগ্য ব্যাধি, মাঝে মাঝে যখন হয়, সহজে সারবে বলে মনে হচ্ছে না। তারপর থুতনি নাড়িয়ে দিয়ে বললেন, অসুখটা খুবই কঠিন দেখছি। মুখ ব্যাজার করে রাখিস না—ভগবানকে ডাক ভাল হয়ে যাবে। বলে তিনি মুচকি হাসলেন।

'জাহাজ আর ঘাটে লাগছে! ঘাটই খুঁজে পাচ্ছে না হারামির বাচ্চারা। সারাদিন চোখে দূরবীন লাগিয়ে খোঁজাখুঁজি করছেন। মর ঘুরে। রাস্তাঘাট চেনে না, জাহাজের মতিগতি ভাল না, কোথায় নিয়ে এসে ফেলল রে বাবা। আঠারো দিন হয়ে গেল! কথা ছিল না বারো চোদ্দদিনের মাথায় ডাঙা পাওয়া যাবে! কোথায় ডাঙা—?'

বংশী তেলের ক্যান ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চিৎকার করছে। এইমাত্র উপরে উঠে কেন যে তার মেজাজ বিগড়ে গেল কেউ বুঝতে পারছে না। চেঁচামেচি শুনে সবাই উপরে ছুটে এসেছে! বংশীর আবার কি হল! মাঝে মাঝেই বংশী খেপে যায়। অনিশ্চয়তা শুধু বংশীকেই কাবু করে ফেলেনি, সবাই যেন তার শিকার। সত্যি তো এতদিন তো লাগার কথা না, জাহাজ কি তবে সমুদ্রে নিজের খুশি মতো বিচরণ করছে! জাহাজ কি সত্যি অজানা সমুদ্রে ঢুকে গেল?

ইনজিন সারেঙ স্টোকহোলডে নেমে গেছেন। তিনি উপরে থাকলে বংশীকে ধমকধামক দিয়ে থামাবার চেষ্টা করতে পারতেন! যা মুখে আসছে বলছে বংশী। 'কুত্তার বাচ্চারা ভেবেছে কি! আমরা মানুষ না। দেব জাহাজে আগুন লাগিয়ে। কার সাধ্য আছে—রোখে।'

ভাণ্ডারি বলল, 'বংশীদা আগুন দেব? নিয়ে যাও।'

বংশী আরও খেপে গেল। তেড়ে গেল ভাণ্ডারিকে।

'মিঞা তোমরা কি মানুষ না। তোমাদের ঘরবাড়ি নেই!'

এ-সময় মাথা গরম করে লাভও নেই। সত্যি তো আঠারো দিন হয়ে গেল! ডাঙার দেখা নেই। ডাঙা পেলেও কিছুটা স্বস্তি। তাঁর চেঁচামেচিতে ডেক-জাহাজিরাও জড়ো হয়েছে। এটা ঠিক, জাহাজ কোথায় আছে না আছে কোনও খবরই তারা পায় না। জানেও না, কি হচ্ছে না হচ্ছে। তারা জাহাজের নাট বল্টু ছাড়া কিছু না। আর পিছিলে চেঁচামেচি করলে, কে শোনে! কুত্তার বাচ্চা বলে গাল দাও, আগুন লাগাও কেউ শুনতে আসছে না। আর উত্তেজনা কিংবা গোলমাল যতই হোক, সারেঙ যতক্ষণ নালিশ না দিচ্ছে, তাঁর কোনও গুরুত্ব থাকে না।

মুখার্জি উঠে এসেছেন। তিনি ক্যানটা তুলে পিছিলের বেঞ্চিতে রেখে দিলেন। ডেকে চিত হয়ে শুয়ে আছে বংশী। যেন সে আর কাজে যাবে না। পরি ছেড়ে চলে এসেছে। ভাঙুক সব। সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাক। ইনজিনে পিস্টন রডে, ক্র্যাঙ্কওয়েবে—সর্বত্র তেল খাওয়াতে হয়। না হলে ইনজিন গরম হয়ে গিয়ে আগুন জ্বলে উঠতে পারে। টানা আঠারো দিন জাহাজ চলছে। ইনজিনের বিরাম বিশ্রাম বলে কিছু নেই। মবিল ঠিকমতো জয়েন্টে না পড়লে গাঁটে গাঁটে ব্যথা। তারপর অবশ। খুবই জরুরি কাজ। মুখার্জি মাথার কাছে গিয়ে বললেন, 'ওঠ। যা নিচে।'

'না যাব না।'

'জাহাজ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেব। যা বলছি।'

'যাব না, যাব না। কেউ কিছু বলবে না। দেখতে পাচ্ছ না, আমরা মানুষ না, কি ভাবছ তোমরা। তুমি না সুখানি—কই বলতে পারছ, জাহাজ কোথায়। জানো কিছু?' কোন্ সমুদ্রে জাহাজ বলতে পারো?'

'জানি।'

'কোথায় জাহাজ?'

'আগে কাজে যা। তোর একার ঘরবাড়ি বিবি বাচ্চা পড়ে নেই মনে রাখবি। জাহাজ অজানা সমুদ্রেও ঢুকে যায়নি। অজানা সমুদ্র বলে পৃথিবীতে কিছু নেই। আমাদেরও ঘরবাড়ি আছে। দেশে বউ আছে। রাস্তায় ছেলে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। চিঠি পেলে মার কাছে দৌড়ে যায়। চিঠি চিঠি—সারা কলোনিতে খবর রটে যায়—দেবু মুখার্জিব চিঠি এসেছে।

'চিঠিই সব নয় দাদা! বুঝছ না কেন! তোমরা কেন বলছ না, জাহাজ দেশে ফিরিয়ে নিতে হবে। কেন বলছ না বলো! তোমাদের মতলব ভাল না, বুঝি না মনে করো!'

'সবাই রাজি হবে। টাকা, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা।—ছেলেমানুষি করিস না। আমাদের অপদস্থ করিস না। কেলেঙ্কারির শেষ থাকবে না। এতকাল জাহাজে চাচাদের রাজত্ব ছিল। মুখ বুজে সব সহ্য করে আসছে। কোনও গোলমাল পাকায়নি। তোরা উঠেই গোলমাল পাকালে, কোম্পানি পছন্দ করবে কেন। বাঙালিবাবুদের ইজ্জত নিয়ে টানাটানি করছিস। ওঠ্। কই সুহাস তো তোর মতো ভেঙে পড়েনি। দামড়া কোথাকার। বিয়ে করে জাহাজে উঠতে কে বলেছিল! উঠলি কেন। যা নিচে।' মুখার্জি হাত টেনে তুলে বসালেন বংশীকে। তারপর মবিলের ক্যান হাতে ধরিয়ে বললেন, 'মেয়েমানুষের অধম!' জোর করে তুলে প্রায় ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দিলেন পিছিল থেকে।

বংশী হেঁটে চলে যাচ্ছে! মুখার্জি জানেন, কিচ্ছু করার নেই। বাড়িয়ালার মর্জি না হলে জাহাজ হোমে ফিববে না। জাহাজে কি বড় রকমের কিছু ঘটতে যাচ্ছে! তারা সাধারণ জাহাজি—অধিকাংশ নিরক্ষর—তাদের নামও নেই জাহাজে। সুখানি, টিন্ডাল, সারেঙ ছাড়া ডাকখোঁজও করেন না অফিসার ইনজিনিয়াররা। সাদা চামড়ার ইজ্জত কত জাহাজে উঠলে বোঝা যায়। বন্দরের রাস্তায় দেখা হয়ে গেলে, ম্যান কোথায় যাচ্ছ। এতদিন এক জাহাজে থেকেও সম্পর্ক দুই মেরুর। তারা বাসিন্দাও দুই মেরুর। খানাপিনা সব আলাদা। তারা কি খায় সাদা চামড়ার লোকগুলি খোঁজ রাখে না। তারাও ডাইনিং হলে লাঞ্চ কিংবা ডিনারে কি পরিবেশন কবা হয় জানে না। তারা মাদুর পেতে খায়। আর ডাইনিং হলে ডিনারের সময় মিউজিক বাজে। বড় বড় ঝাড়লণ্ঠনও টাঙিয়ে দেওয়া হয়। অতিথি অভ্যাগত বন্দরে লেগেই থাকে। মেসরুম মেট, মেসরুমবয়, কাপ্তানবয়, স্টুয়ার্ড থেকে চিফকুক সব খিদমতগার। তাদেব সম্বল ভাণ্ডারি। ডেক-ভাণ্ডারি ইনজিন-ভাণ্ডারি। অসুখ বিসুখে সেকেন্ডমেট দাওয়াই দেন। অব্যবস্থার চূড়ান্ত। তার উপর বংশীর এই বিদ্রোহ—সুহাসের নির্বুদ্ধিতা, মুখোসের রহস্য, ম্যাকের মৃত্যু—বুনো ফুলের গন্ধ, সি-ডেভিল লুকেনার থেকে 'কলিজ' জাহাজ ক্রমে রহস্যকে গভীর করে তুলেছে।

মুখার্জি কিছুতেই বুঝতে পারছেন না, চার্লি কেন বাবার ডাইরি থেকে 'প্রেসিডেন্ট কলিজ' নামে জাহাজটির খবর সুহাসকে পাচার করল। বাবার কোনও বিপদ হতে পারে—কিংবা তার বাবা যে মাটি টানার নামে প্রবাল দ্বীপগুলি ঘুরে বেড়াবার অছিলা খোঁজেন, এমনও প্রমাণ এতে কি থাকতে পারে! 'প্রেসিডেন্ট কলিজ' জাহাজটি আগে ছিল প্রমোদতরণী। যুদ্ধের সময় জাহাজটি মার্কিন সরকার

বাজেয়াপ্ত করে। চার্লির ঠাকুরদা সেই জাহাজের যদি মালিক কিংবা অংশীদার হন! 'কলিজ' জাহাজ কোথায় ডুবেছে তারও উল্লেখ আছে পাচার করা খবরটিতে। চার্লি কি নিজের জীবন বিপন্ন. এমন আশঙ্কা করছে!

ফোকসালের সিঁড়িতে সুহাসের সঙ্গে দেখা। সে কেন কাজ ফেলে পিছিলে এসেছিল জানেন না। সুহাস সিঁড়িতে উঠে ফের নেমে এল, মুখার্জিকে বলল, 'দাদা, তুমি বুঝলে কি করে বুনো ফুলের ছবি এঁকে চার্লি আমাকে দেখাচ্ছিল!'

'হঠাৎ তোর এই অবান্তর প্রশ্ন কেন বুঝছি না!'

'না, বুঝলে কি করে?'

'বুনো ডেইজি ফুল দেখাবার জন্য কিনারায় চার্লি তোকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। দেখিয়েছে?'

'না।'

'আবার দেখাতে নিয়ে যেতে পারে। অবশ্য যদি খুঁজে পায়। ডেইজি ফুল দেখাবার তার এত শখ কেন বুঝি না। আসলে সে কিছু দেখাতে চায়, তবে বুনো ডেইজি ফুল নয়, তুই বোকা বলে বুঝতে পারছিস না। এবার তো অসুস্থ। গিয়েছিলি কেবিনে?'

'যাব কিনা বুঝতে পারছি না। চার্লি তো বারণ করেছে।'

'যদি যাস, 'কলিজ' জাহাজের আর কোনও খবর যদি পারিস নিবি।' পরে কি ভেবে বললেন, 'না থাক। কোনও খবরেই কৌতূহল দেখাবি না। চার্লি নিজে থেকে বললে শুনবি। হুঁ হাঁ এই পর্যন্ত। তোকে কোনও মন্তব্য করতে হবে না।' তারপর ঘড়ি দেখলেন, কি করা যায়, বংশীব চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেছে। চোখে তন্দ্রার মতো এসেছিল। দিল ভেঙে! কিছু ভাল না লাগলে পিছিলের বেঞ্চিতে গিয়ে বসে থাকা যায়। আর সমুদ্রের ঢেউ ভাঙাভাঙির খেলা, দিগন্তব্যাপী অসীম সমুদ্রের অনন্ত জলরাশি জীবনের নানা খুঁটিনাটি তুচ্ছতা সহজেই দূর করে দেয়। কিনার কালই দেখতে পাওয়া যাবে। তারা নিউ হেবরিডস দ্বীপপুঞ্জ পার হয়ে এসেছে—কাছে কোথাও কোনও প্রবাল দ্বীপে জাহাজ ভিড়বে। অফিসারদের কথাবার্তা থেকে তিনি এমন বুঝেছেন। প্রমোদ তরণী, যুদ্ধের কাজে শেষে সামরিক দপ্তর ব্যবহার করতে পারে চার্লির ঠাকুরদা হয়তো অনুমানই করতে পারেননি। প্রমোদ তরণীতে তিনি যে নিজেও এই অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করেননি কে বলবে। লুকেনারের অগাধ ধনসম্পদের কথা দ্বীপবাসীদের মুখে প্রায় কিংবদন্তীর সামিল। জনশ্রুতি পাহাড়ের খাঁজে, কোনও মৃত আগ্নেয়গিরিব বুকে ধনসম্পদ লুকানো আছে। অথবা এও মনে করা হয়—ধনসম্পদের খোঁজ পেয়ে গেলেই আকস্মিক দৈব দুর্ঘটনা। কেউ ফিরে আসতে পারে না। রাক্ষুসে হাঙরেরা খেয়ে হজম করে ফেলে অথবা দেখা যায় জাহাজ এবং সব নাবিকেরা মৃত। পরে দেখা যায়, জাহাজ খালি এবং মৃত মানুষগুলির কোনও খোঁজই পাওয়া যায় না। চরায় আটকে পড়ে থাকে জাহাজ।

তবে কোথায় এমন সব আজগুবি ঘটনা ঘটছে কেউ বলতে পারে না' যে কোনও দ্বীপ কিংবা পাহাড় আর আদিবাসীদের গুরুত্ব এ-জন্য অসীম। যারা এই ধনসম্পদ উদ্ধারে যায় তারাই হারিয়ে যায়—বিষয়টা গোঁজামিলের ব্যাপার। কারণ জনশ্রুতির ল্যাজা-মুড়ো এক করা সব সময়ই কঠিন। এই বিসমার্ক সি এবং কোলার সি-তে অজস্র জাহাজের কঙ্কাল খুঁজে পাওয়া যেতেই পারে। তবে অধিকাংশই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শিকার। চরায় জাহাজ উঠে গেছে, বনজঙ্গল গজিয়ে গেছে জাহাজের চারপাশে এমন দৃশ্য সে নিজেও দেখেছে। নিষ্ঠুর যুদ্ধে নিউগিনি থেকে সলোমন দ্বীপপুঞ্জ এলাকা ছিল প্রবল উত্তপ্ত। জাপ বাহিনী নিউ ব্রিটেন দ্বীপের রাবাউলে পাঁচটি এয়ার স্ট্রিপও তৈরি করে ফেলে। বিশাল নৌবহর। নিউগিনির মোরসবি দ্বীপে মিত্রশক্তির উপর প্রচণ্ড আক্রমণ। মিত্রশক্তিকে পিছু হটতে হয় বাধ্য হয়ে এবং কোরাল সি-তেই প্রথম মিত্রশক্তি বড় ধরনের জয়লাভের পর যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ জাপ বাহিনীর ক্রমে কমে আসতে থাকে। প্রায় এক লক্ষ জাপ সেনা হয় যুদ্ধবন্দি নয় সমুদ্রের গর্ভে হারিয়ে যায়। সঙ্গে অজস্র জাহাজ উভয় পক্ষের। বোমারু বিমান শয়ে শয়ে। ভাবতে গেলেই গা কাঁটা দিয়ে ওঠে।

এই এলাকা এখন কত শান্ত নিরীহ! শুধু সমুদ্রের ঢেউ আর পারপয়েজ মাছের ঝাঁক। কখনও বড়

এনজেল মাছের ঝাঁক। অজস্র বিষাক্ত মাছেরও ছড়াছড়ি। এই এলাকাটি ভয়াবহ, নানা কারণেই। তিনি এখানে আরও ঘুরে গেছেন বলেই জানেন! মাছে মাছি না বসলে, খাওয়ার উপযুক্ত বলে ধরা হয় না। মাছের এই বিচিত্র লীলাভূমিতেই জাহাজ এখন ঢুকে গেছে। ব্যাপ্ত মহিসোপান পার হয়ে অনন্ত মহাসাগর। আবার তারই বুকে সিন্দুর টিপের মতো সবুজ কিংবা মেরুন রঙের দ্বীপ ঝলমল করে ওঠে। কখনও মনে হয় দূর থেকে সবুজ পান্নার মতো দ্বীপটি ভেসে আছে। লাল বালুকাময় দ্বীপ থেকে কালো লাভায় তৈরি এই অজস্র দ্বীপমালায় বিচিত্র সব পাখি, কুমির, কচ্ছপ থেকে প্যালিকান, কি নেই। বংশীটা কেন যে ভাবতে পারছে না, এই যাত্রা তাদের কোনও দুঃসাহসিক অভিযানের সামিল। ভাবলে বাড়ির জন্য এতটা হতাশ হয়ে পড়ত না।

সুহাস সহসা যেন মনে করিয়ে দিল, 'কি ভাবছ বলত। আমাকে কেবল দেখছ! কথা বলছ না! এত কি দেখার আছে আমাকে বুঝি না। তুমি কিছুতেই বলছ না।'

'বুনো ফুল এঁকে তোকে কেন দেখাচ্ছিল জানতে চাইছিস তো?'

'আরে না। বুঝছ না কেন চার্লি, ব্লেজিং স্টার বলো, ওয়াটার লিলি বলো, নিজের শখ থেকেও আঁকতে পারে।'

'শখ থেকে আঁকা ছবি ময়লার ঝুড়িতে কেউ ফেলে রাখে!'

'কেন পারে না।'

'না পারে না। আমি তো ব্রিজ থেকে বিকেলের ডিউটি সেরে নামার সময় দেখতে পেলাম—গুচ্ছের কাগজ, নানা রঙিন ফুলে আঁকা। নিশ্চয় তোকে ফুলগুলি চেনাবার জনাই এঁকেছিল। চেনা হয়ে গেলে, আর সে ফুলের দাম থাকে! বাজে কাগজ হয়ে যায় না। কাপ্তানবয় নিশ্চয়ই ওর বিছানার নিচে থেকে কুড়িয়ে ওগুলো ময়লা কাগজের ঝুড়িতে ফেলে রেখেছিল। সেই থেকেই অনুমান। ঝট করে বলে ফেলতে পেরেছি। চার্লি তোকে ফুলও এঁকে দেখিয়েছে। ডেইজি ফুল কিন্তু সেখানে এঁকে দেখায়নি। এত সুন্দর আঁকতে পারে! চার্লির সত্যি অশেষ গুণ—অথচ নির্দোষ সরল, এই বলে থামলেন, ছেলে বলবেন না, মেয়ে বলবেন—আহাম্মকটা তো মেয়ে বলায় চটেই লাল! তিনি বললেন, 'চার্লির অকপট সারল্য ছবিগুলিতে ধরা যায়। আবার ছবিগুলির মধ্যে কোথাও যেন ক্রোধ ফুটে উঠেছে। আগ্নেয়গিরির সুপ্ত লাভার মতো। কাগজগুলি সব রেখে দিয়েছি।'

তারপর কি ভেবে চুপ করে গেলেন। কাগজগুলি সব রেখে দিয়েছি বলাটা বোধ হয় ঠিক হবে না। তিনি বললেন, কাগজগুলি রেখে দিয়েছিলাম, তবে আর দরকার নেই। তুই নিয়ে নিতে পারিস।'

'আমি নিয়ে কি করব।'

'তা অবশ্য ঠিক। কাগজগুলি রেখে দিয়েছি বললে, সুহাস যে চার্লিকে বলবে না, দাদা কাগজগুলি রেখে দিয়েছে, কেন রেখে দিয়েছে, কোথায় যে ফুলে বিষাক্ত পোকার বাস থাকে কে বলতে পারে। তিনি যেন আঁকা ছবিগুলির ব্যাপারে কোনও গুরুত্বই দিতে চাইছেন না। শুধু বললেন, 'বুঝতে পারছিস আমি যা ভাবি তা ঠিকই ভাবি।'

সুহাস ক্রমেই মানুষটার প্রতি আরও আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে! তিনি নিচে নেমে যাচ্ছেন। তার দিকে ফিরেও তাকালেন না। এখন যেন তাঁর আর কারও সঙ্গে কথা বলার সময় নেই। সোজা ফোকসালে গিয়ে শুয়ে পড়বেন দরজা বন্ধ করে। বংশীদা আবার গোলমাল শুরু করেছে খবর পেয়েই উপরে ছুটে এসেছিলেন।

বংশীদার চোখ মুখ দেখলেও তার আজকাল ভয় হয়। হতাশ চোখ। জীবন সম্পর্কে আগ্রহ কমে গেছে! ধরেই নিয়েছেন দেশে আর তাদের ফেরা হবে না। কখনও কখনও কাজে যেতেই চান না। ঠেলেঠুলে পাঠাতে হয়। কাজের পোশাক পরে উপরে উঠে গিয়ে বসে থাকেন। ঠেলেঠুলে কাজে পাঠানো কত ঝামেলা সে এক ফোকসালে থেকে বুঝেছে।

মুখার্জিদাও যেন বংশীকে নিয়ে উচাটনে আছেন। বংশী যতক্ষণ কাজে নেমে না যাচ্ছে, তিনি নিশ্চিন্তে শুতেও যেতে পারেন না। চার ঘণ্টা ডিউটি, আট ঘণ্টা বিশ্রাম। ব্রিজ থেকে নেমে হাত মুখ

ধুয়ে চা খান পিছিলের বেঞ্চিতে বসে। এই করতেই করতেই সকাল হয়ে যায়—তারপরও তিনি আটটা পর্যন্ত জেগে থাকেন—বংশীদা কাজে না নামা পর্যন্ত বড় অস্বস্তি তাঁর।

হতেই পারে। কারণ দেশ ভাগের পর কলকাতা বন্দর খালি হয়ে যাবার কথা। জাহাজিরা সব পূর্ব পাকিস্তানের। কোম্পানির আজন্মকাল থেকেই তাঁরা কাজ করে আসছেন! ব্যাঙ্ক লাইন, ক্রুক লাইন, সিটি লাইন, বি আই কোম্পানি সর্বত্র তারা—তাদের বাপ, নানা এবং আরও আগে যাঁরা ছিলেন—একেবারে যেন বংশগত এই ধারা। দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ায় তারা ভিনদেশি। এত বড় বন্দর তো ভিনদেশিদের উপর ভরসা করে ফেলে রাখা যায় না। ভারতীয় নাবিকেরা উঠে আসতে শুরু করায় তারা বিপাকে পড়ে যেতেই পারে। ভাল চোখে দেখার কথাও না। রুজি রোজগারের প্রশ্ন। পেটে হাত পড়লে তো সংঘর্ষ বাধবেই। কাজে কামেও তারা খুব পটু। তুলনায় ভারতীয় নাবিকেরা কিছুটা কামচোর—কোম্পানিগুলির দোষও দেওয়া যায় না। বংশীর জন্য ভারতীয় নাবিকেরা ফেরে পড়ে যেতে পারে এমন আশঙ্কাতেই মুখার্জিদা ভুগছেন।

যেন ভারতীয় নাবিকদেব যশ অপযশের দায় মুখার্জিদার মাথায় কেউ চাপিয়ে দিয়েছে। ঘুম ভাঙলেও তিনি বাথরুমে ওঠার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে একবার উঁকি দেবেন। দেখবেন, বংশীদা আছে কি নেই। কেউ থাকলে বলবেন, 'কাজে গেছে?'

'গেছে।' ব্যাস যেন আর কিছু জানার তাঁর আগ্রহ নেই। কাজ ফেলে ইদানীং মাঝে মাঝে চলেও আসেন বংশীদা। একজন গ্রিজারকে মাঝে মাঝে উঠে আসতেই হয়। স্টিয়ারিং ইনজিনে মবিল দিতে পিছিলে আসতেই পারে। পিছিলের বেঞ্চিতে বসে চা সিগারেট খাওয়াও যায়। কিন্তু বংশীদা স্টিয়ারিং ইনজিনের ঘরে না ঢুকে নিজের ফোকসালে নেমে যান। তারপর বাঙ্কে চিৎপাত হয়ে শুয়ে থাকেন। তাড়া না দিলে তাঁকে নড়ানো যায় না। এই এক উটকো ঝামেলা বংশীদাকে নিয়ে। কখনও চোখ জবাফুলের মতো লাল, বাঙ্কে মটকা মেরে পড়ে থাকেন। ঘুমটুম যেন সব গেছে তাঁর।

সুহাসের মাঝে মাঝে ভয়, কিছু না শেষে একটা করে বসেন। জাহাজিদের মানসিক অবসাদ দেখা দিলে খুব আতঙ্কের। মুখার্জিদাও ভাল নেই। অথচ কি করে যে বুঝে ফেললেন, চার্লি তাকে বুনোফুলের ছবি এঁকে দেখিয়েছে, কোন্‌টা কি ফুল—কত কিসিমের ফুল যে হয়, চার্লির সঙ্গে পিকাকোরা পার্কে ঘুরে না বেড়ালে জানতেই পারত না। সব ফুল তো আর সব জায়গায় ফোটে না। না ফুটুক, সে ফুলগুলি এঁকে দেখাতে পারলেই খুশি। সে একা ছিল কেবিনে। দরজা বন্ধ ছিল। কেউ জানার কথা না। অথচ মুখার্জিদা টের পেয়ে গেছেন।

চার্লি অসুস্থ, খবরটা তিনি জানেন না বিশ্বাস হচ্ছিল না।

সে ডাকল, 'মুখার্জিদা।'

মুখার্জি খেয়ালই করেননি, সুহাস তাঁর পিছু পিছু ফোকসালে এসে ঢুকেছে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে দেখলেন। খুশি না। কাজ ফেলে গুলতানি। যা উপরে যা। হয় এমন কিছু ভাবছিলেন, নয় ঘুমের ব্যাঘাত ঘটছে তাঁর। সুহাস বলবে কি বলবে না ভাবছিল।

মাঝে মাঝে মুখার্জিদার গম্ভীর মুখ দেখলে সমীহ না করে উপায় থাকে না। দীর্ঘকায় মানুষটির মুখে চোখেও আভিজাত্য আছে। মুখার্জিদা তাঁর বাঙ্কে বসে বালিশ চাদর ঠিক করছিলেন অথচ তার দিকে তাকাচ্ছেন না।

'আমি যাই দাদা।' কেমন ভয়ে ভয়ে বলল সুহাস।

'তামাসা দেখতে এসেছিলি?'

'কিসের তামাসা বলছ?'

'তবে যাই বলছিস কেন। চোরের মতো আমার ফোকসালে ঢোকা কেন! কতবার বলেছি, যখন তখন না বলে ঘরে ঢুকবি না, মনে থাকে না।'

সুহাস বিস্ময়ে থ। তিনি কখনও বলেননি, তার ঘরে বিনা অনুমতিতে ঢোকা বারণ।

সে বলল, 'ঠিক আছে।'

'ঠিক থাকলে তো ল্যাটা চুকেই যেত। চুকেছে কি, কি বলতে এসেছিলে সোজা বলে ফেল।

সারারাত ঘুমাই না, দিনেও যদি চোখ বুঝতে না পারি মেজাজ ঠিক থাকে!' বলেই শুয়ে পড়লেন। গরম পড়ে যাওয়ায় জামা গায়ে রাখা যায় না। কি ভেবে উঠে বসলেন। জামা খুলে পকেট হাতড়ালেন, সিগারেট লাইটার বের করে শুয়েই সিগারেট ধরালেন। বললেন, 'যা বলতে হয় বলে ফেল—তোরা সবাই এক একটা চিজ।'

এরপর আর কিছু বলা যায়? সুহাস উঠে পড়ল।

'যাচ্ছিস কোথায়।' তিনি সিগারেট টানতে টানতে নিবিষ্ট মনে আগুনটা দেখছেন। লাইটারের আগুন। লাইটার নেভাতে যেন ভুলে গেছেন তিনি।

'না, আমি বলছিলাম—'

'না, আমি বলছিলাম বলে কোনও কথা থাকতে পারে না। বল্, বলছিলি, চার্লি অসুস্থ খবরটা সত্যি আমি জানতাম কি জানতাম না। ফুলের কথা বলায় বিভ্রমে পড়ে গেছিস। কি তাই তো?'

সুহাস তাজ্জব।

'কি রে চুপ মেরে গেলি!'

'তুমি কি জ্যোতিষী জান!'

'ও সবে বিশ্বাস নেই। কিছু ঘটনা ঘটলে, আরও কিছু ঘটনা ঘটে। সব কিছুরই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া থাকে। জ্যোতিষীরা যা করে—এই যে চট করে মুখ দেখে, হাত দেখে ভূত ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারে, কোষ্ঠি গণনা, কিছু কিছু ফলেও যায়—আরে মানুষের রোগ, শোক, ব্যাধি, মৃত্যু তো থাকবেই, অশান্তিও থাকে। দুর্ঘটনাও ঘটবে। সব মানুষের জীবনেই এগুলি থাকে। এগুলো যে কেউ বলে দিতে পারে। কেউ কেউ একটু বেশি পারে। চর্চা করলেই পারে। আসলে মিলুক না মিলুক সৌভাগ্যের কথা কে না শুনতে চায়। এর উপরই সব। জালিয়াতি, জোচ্চুরি বলে থাকে জ্যোতিষীর নামে। ধরে নে আমি কিছু চর্চা করছি। আমার চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটাবি না।'

সুহাস সব শুনে বলল, 'তুমি তবে জানতে চার্লি অসুস্থ। অথচ না জানার ভান করে বললে, অভিমানে সে কেবিন থেকে বের হচ্ছে না।'

'না জানতাম না।'

'এত জানো, আর এটা জানতে না। ওর কেবিনের পাশ দিয়ে তো কাজে যাও।'

'যাই, তবে চার্লি এখন আমার মাথায় নেই। চার্লি সুস্থ না অসুস্থ তা নিয়েও মাথা ঘামাবার দরকার মনে করছি না।'

'চার্লি অসুস্থ। কি হয়েছে কিছু জানো!'

'বললাম তো, না।'

'কাপ্তানবয় যে বলল, মাঝে মাঝে হয়।'

এবার কেন যেন না উঠে পারলেন না মুখার্জিদা, তার দিকে তাকালেন। তারপর কেমন হাসি মুখে বললেন, 'আরে বন্ধু বয়ঃসন্ধিক্ষণের দোষ। বাড়াবাড়ি হয়েছে বলে কষ্ট পাচ্ছে। দেখলাম তো কাপ্তানবয় হট ওয়াটার ব্যাগ নিয়ে চার্লির কেবিনে ঢুকছে। এতে চার্লি অসুস্থ হয় কি করে! প্রকৃতির নিয়ম। কোমরে তলপেটে কত জায়গায় ব্যথা হতে পারে। সবার যে হয় তাও না। তবে কারও কারও হতেই পারে।

'চার্লি তবে অসুস্থ নয় বলছ।'

'অসুস্থ, তবে ধর্তব্যের মধ্যে নয়।' ঘাড় তুলে, ছোট্ট একটা রঙের খালি কৌটো খুঁজছিলেন তিনি। সুহাস তাড়াতাড়ি বাঙ্কের নিচ থেকে খালি কৌটো এগিয়ে ধরলে ছাই ঝাড়লেন আগুনের। সে উঠেও পড়তে পারছে না। অসুস্থ তবে ধর্তব্যের মধ্যে নয় কেন, সে বুঝছে না। এই যে বললেন, খুব দুরারোগ্য ব্যাধি—সহজে ছাড়ছে না, কখন কি বলেন নিজেও বোধহয় মনে রাখতে পারেন না। অসুস্থ হলে তো দেখতে যাওয়াই রীতি। তার সঙ্গে চার্লির এত ভাব, অথচ সেই চার্লিই খবর পাঠিয়েছে, সে যেন না যায়। কি যে খারাপ লাগছিল।

মুখার্জিদা বললেন, 'খুব একা একা লাগছে না রে!'

কেন মুখার্জীদা তাকে এ-কথা বলছেন, তাও সে বুঝছে না। চার্লি কাছে থাকলে কি করে সময়

কেটে যায় টের পায় না সে—এটা অবশ্য ঠিক। চার্লির যে কত রকমের প্রিয় গাছ আছে, কত রকমের যে তার শখ ছিল, সে ঘোড়ায় চড়তে পারে—কখনও কখনও ঘোড়ায় চড়ে বনভূমির পর বনভূমি পার হয়ে যেত। তার পড়াশোনার জন্য শিক্ষয়িত্রী আসত বাড়িতে—ভাঙা লঝঝড়ে ফোর্ড গাড়িতে আসত। চার্লি নাকি তার পড়ার ঘর থেকেই দেখতে পেত, গাড়িটা হামাগুড়ি দিয়ে পাহাড়ে উঠছে। তার তখন নানা কূটবুদ্ধি গজাত।

পড়তে আর কার ভাল লাগে—জঙ্গল থেকে কখনও সে শুঁয়োপোকা পাতায় করে টেবিলের উপর রেখে দিত। ব্যস দেখামাত্রই লাফ, পুয়োর ডেভিল! আর সঙ্গে সঙ্গে মিসকে খুশি করার জন্য বলত, মিস, লেট মি গেট ইয়ো সাম কফি। সঙ্গে সঙ্গে নাকি চার্লির প্রতি এত প্রসন্ন হয়ে উঠত যে, তিনি আক্ষেপ করে বলতেন, 'পোকামাকড়ের দোষ কি বল! তারা তো ঘুরে বেড়াবেই। যা জঙ্গল আর কাঁটাগাছের পাহাড়!' যেন পোকাটা ভুল করেই প্রাসাদের মতো বাড়িটার কোনও কক্ষে কাঁটাগাছের তাড়া থেকে আত্মরক্ষার জন্য ঢুকে গেছে। তখন নাকি চার্লির বেদম হাসি পেত। হাসি সামলাবার জন্য ছুটত পাশের ঘরে।

'চার্লি তোর খুব কাছাকাছি থাকতে ভালবাসে এটা কি টের পাস? চার্লি এত কি কথা বলে তোর সঙ্গে তাও বুঝি না।' মুখার্জিদা সিগারেটের আগুন খালি কৌটোয় ঘষে নিভিয়ে দেওয়ার সময় যেন কিছুটা স্বগতোক্তি করলেন।

সুহাস কি বলবে ঠিক যেন ভেবে পেল না। ঘোড়ায় চড়ে ক্যাডো লেকের চারপাশে চার্লি ঘুরে বেড়াত। কতটা বিশ্বাসযোগ্য তাও বুঝতে পারছে না। এতটুকু ছেলে ঘোড়ায় চড়তে পারে কখনও! অবিশ্বাসও করা যায় না। দড়ি দড়ায় ঝুলে যে-ভাবে ফক্কা থেকে বোট-ডেক কিংবা কখনও দড়ির মই বেয়ে যেভাবে দ্রুত টাগবোটে নেমে গেছে, তাতে ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ের পর পাহাড় পার হয়ে যাওয়া খুবই সহজ। ম্যাপল আর সাইপ্রাস গাছের জঙ্গল। ভিতরে ঢুকলে রাস্তা খুঁজে বের করাই কঠিন। তবে চার্লি নাকি জানত, নিচের হাইওয়ের মোড়ে যে বুড়ো থাকে—জর্জ মরিস না কি যেন নাম বলেছিল, সে মনে করতে পারে না, ওই বুড়োর ছোটমতো ধাবাই ছিল তার শেষ গন্তব্যস্থল।

সেখানে গেলেই বুড়ো বের হয়ে আসত। তার ভাঙা গ্যারেজ পাশে। ট্রাক নিয়ে ড্রাইভাররা হাইওয়ে ধরে সেতু পার হয়ে কোথায় যে চলে যায়—ট্রাক ড্রাইভারদের সম্পর্কেও তার ছিল অশেষ কৌতূহল। বুড়ো মানুষটা শীতের ঠাণ্ডায় জমে গেলেই বলত, কফি উইথ হুইসকি? চার্লি বলত, নো নো, নো হুইসকি, ওনলি কফি। ঘোড়ার জিন ধরে রাখত সে। বুড়ো মানুষটা ঘোড়া একদম পছন্দ করত না। বুড়ো কফি নিয়ে কাউন্টারে উঁকিঝুঁকি মেরে বলত, ওয়েল নাইস বয়, গেট ইট। বুড়ো কিছুতেই নাকি তার প্রিয় স্প্যানিশ ঘোড়াটির কাছে ঘেঁষত না। সে তখন নাকি হা হা করে হেসে উঠত। বলত, ইয়ো লাভ ট্রাকারস। নট মি! বুড়ো লোকটা নাকি প্রথম জীবনে ছিল মেষপালক, তারপর রাস্তার দিকনির্ণয়গুলিতে রং করত। সারা টেকসাস, নিউ মেক্সিকো তার ঘোরা। গমের মজুত গোলাতে কিছুদিন কেরানিরও কাজ করেছে। তবে তার এখন ধাবাটিই প্রিয়। ধাবার চারপাশে বুনো ফুলের বাগানটি চার্লির উপহার দেওয়া। বুড়োর এ-জন্য নাকি কৃতজ্ঞতারও শেষ ছিল না। একা সারাদিন ধাবা সামলায়। শীত বসন্তে কখনও কোনও ট্রাকার যত রাতই হোক, বুড়োকে দেখেনি ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুহাস বলল, 'কত কথা বলে, কি বলব। কোনও মাথামুণ্ডু নেই। ওর ঠাকুরদা নাকি টেকসাস ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার ক্লাবের পাইওনিয়ার ছিলেন।'

'টেকসাস। বলিস কি। সে তো ভয়ঙ্কর জায়গা।'

'তাই তো বলে!'

টেকসাস শব্দটি মুখার্জির মাথায় কেমন পেরেক পুঁতে দিল। সুহাস দেখছে, মুখার্জিদা বিড়বিড় করে বকছেন—'টেকসাস! টেকসাস।'

'কি হল তোমার!'

'লোমহর্ষক!'

টেকসাসের সঙ্গে লোমহর্ষক শব্দটি কেন যে ত্বরিতে জুড়ে দিলেন মুখার্জিদা! মাথা ঝাঁকাচ্ছেন, 'ভাল না, ভাল না। টেকসাস মোটেই ভাল জায়গা নয়।'

'টেকসাসে তুমি গেছ?'

'কেউ যেতে পারে না। দস্যু তস্করদের দেশ। অপহরণ, খুন, জখম জলভাত। প্রেম করতে চাইলে শেষ পর্যন্ত ফুল ফুটবে না। তার আগেই অপহরণ। খুঁজতে গেলে মরবে। সাঁ করে বুকের মধ্যে অরণ্যের অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়বে তরবারির খোঁচা।'

তারপরই কি ভেবে বললেন, 'ঘোড়ায় চড়া তাদের প্রিয় নেশা। চার্লি কি ঘোড়ায় চড়তে ভালবাসে! তার মানে, চার্লির ঠাকুরদা কি ঘোড়ায় চড়তে ভালবাসতেন?'

'ঠাকুরদা জানতেন কি না জানি না। তবে চার্লি খুব ছোট বয়েস থেকেই ঘোড়ায় চড়তে পটু।'

'রক্তের দোষ। ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার পায়নিয়ার না ছাই। দস্যুবৃত্তি। স্রেফ দস্যুবৃত্তি। ঘোড়ার পিঠে বস্তা বস্তা স্বর্ণপিণ্ড। ঘোড়া ছুটছে। পাহাড়ি পথে আমি এখনও দেখতে পাচ্ছি চার্লির ঠাকুরদা আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা পাহাড়ের উপত্যকা জুড়ে তাণ্ডব সৃষ্টি করে চলেছেন। চোখ বুজলেই টের পাই।'

'কি যে বলছ, বুঝছি না। এত নাটক করছ কেন, তাও বুঝছি না।'

'তুই বুঝছিস না, আমি কি সব বুঝছি। চার্লি কি করে টেকসাসের হয় বুঝি না! ওর বাবা তো কার্ডিফ না হয় লন্ডন থেকে জাহাজে ওঠেন। আমি তো ভেবেছিলাম, চার্লিরা ওয়েলসের লোক—মানে ইংরাজ। খাঁটি রাজার জাত। এখন দেখছি রক্তেই দোষ থেকে গেছে—'

'টেকসাস কোথায় বলবে তো।'

'টেকসাস মানে, হলিউডের খুন জখম দাঙ্গা ধর্ষণের ছবি। সে দেখা যায় না। তুই তো মেট্রো গোল্ডেন মেয়ের্সের ছবি দেখিসনি—হলিউডের ঘোড়াগুলি ছুটতে থাকলে মনে হবে, তোর ঘাড়ে এসে বুঝি পড়ল! প্রথমবার তো মেট্রোতে ছবি দেখতে গিয়ে চেয়ার ছেড়ে প্রায় দৌড়ে পালাচ্ছিলাম। দুর্ধর্ষ খুনি কাউবয়দের ওখানে গেলে দেখতে পাওয়া যায়। টেকসাস হল সেই দেশ, বুঝলি! চার্লি কি ঘোড়ায় চড়ে একাই ঘুরে বেড়াত!'

'তাই তো বলল। বেটসি ছাড়া বাড়িতে আর কেউ ছিল বলে তো জানি না। জর্জ মরিসের কথা অবশ্য মাঝে মাঝে বলে। ট্রাকারদের সঙ্গে মরিসের নাকি খুব ভাব। বুড়ো মানুষ। খুবই সজ্জন।'

'ট্রাকার মানে?'

'ট্রাক ড্রাইভার-টাইভার হবে। তবে চার্লি ট্রাক ড্রাইভার বলে না। ট্রাকারই বলে।'

'বুড়ো লোকটা কি করত?'

'ছোট্টমতো স্টপ অফ ছিল তার। ঐ ধাবাটাবা গোছের—হাইওয়ের ওটাই শেষ ধাবা। তারপর নদী পার হয়ে পাহাড় আর পাহাড়—গিরিখাত, উপত্যকা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ট্রাক চালিয়েও বসতির চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না।'

'চার্লি তা হলে অজ্ঞাতবাসে ছিল বলছিস?'

'না, অজ্ঞাতবাসের কথা বলেনি।'

'এটা অজ্ঞাতবাস ছাড়া কি। গাধা কি আর গায়ে লেখা থাকে। তাদের বাড়ির আশপাশে লোকজন ছিল কি না জানতে হয়, জায়গাটা শহরে না গ্রাম, জানতে হয়! ওর ঠাকুরদা ফুলের কারবারি! অফিস কাছারি, লোকজন থাকবে না!'

'বুড়ো লোকটাকে ছাড়া আর কাউকে চিনত বলে জানি না। ও না বললে, কি করব? বানিয়ে বলতে হবে। যে ভাবে জেরা করছ, যেন আমিই আসামি। ম্যাককে ডেরিক ফেলে খুন করেছি।'

'তুমি খুন করেছ না অন্য কেউ খুন করেছে—পরে ঠিক হবে। তবে চার্লির রিপোর্ট ঠিক নয়। 'কলিজ' জাহাজডুবিতে পাঁচ হাজার মার্কিন সেনাই তলিয়ে গেছে—মিছে কথা। সবাইকে উদ্ধার করা গেছে। কেবল পাঁচজনের খোঁজ পাওয়া যায়নি। চারজন ক্রু এবং স্বয়ং কাপ্তান। তারা জলের তলায়

নিখোঁজ, না অন্য কোনও রহস্য আছে বুঝছি না।

সুহাসের মেজাজ খিঁচড়ে গেল। মুখার্জিদা গুল মারছেন না তো! বলতেও পারছে না, যা খুশি বলে যাচ্ছ—চার্লির দায় পড়েছে—মিথ্যে রিপোর্ট দিতে। ডাইরিতে যা পেয়েছে, তাই টুকে দিয়েছে। তার বাবার ডাইরি হাতানো কি কঠিন যদি বুঝতে, তাও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। কোথাও যদি খুনের সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। বলেছে, প্রমিজ, ইউ উইল মেনসান দিস টু নো ওয়ান।

মুখার্জিদা শুয়ে আছেন। তাঁর সেই চিরাচরিত মুদ্রাদোষ—পা নাচাচ্ছেন। চোখ বুজেই কথা বলছেন। যেন কত দুশ্চিন্তা মাথায়। রহস্য উন্মোচন বোগাস! সে উঠতে যাচ্ছিল।

মুখার্জিদা বললেন, 'উঠছিস কেন! বোস! চার্লির টুকলিফাই রিপোর্টে দেখছি, জাহাজডুবির দু'একজনের সাক্ষাৎকারও আছে। ফলস ইন্টারভিউ। অবশ্য এটা আমার ধারণা। জাহাজের উপর কাপ্তান এবং ক্রুদের নিয়ন্ত্রণ ছিল না—বিশ্বাসযোগ্য নয়। অশুভ প্রভাবে পড়ে হয়েছে—বিশ্বাস করতে পারছি না। কোনও যে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ না কে বলবে!'

সঙ্গে সঙ্গে সুহাসের মাথা গরম! বাঙ্কে ঘুসি মেরে বলল, 'ও কি আজেবাজে বকছ! তুমি কি 'কলিজ' জাহাজে ছিলে! ঘরে কি নেশাটেশা করছ! বাটলার, কাপ্তানবয়ের সঙ্গে তো দোস্তি খুব। এ-সব রোগ তো আগে ছিল না।'

মুখার্জি রা করছেন না। যেন তিনি সুহাসের কথা শুনে মজা উপভোগ করছেন।

'আমার যে কি মুশকিল!' সুহাস নিরাশ গলায় বলল।

'কি মুশকিল!'

'চার্লি যে ব্যাজার মুখে বলল, 'সুহাস প্লিজ!' তাব তো একজন অনুসরণকারী এমনিতেই জাহাজে উঠে এসেছে—তার উপর যদি খবর পাচার হয়ে যায়, কাপ্তানের ডাইরি থেকে—ধরা পড়ে যাবে না। ধরা পড়লে বাপের কাছে মুখ দেখাবে কি করে! সে তো একমাত্র আমাকেই সব বলে! বলাটা কি দোষের!'

মুখার্জি হাই তুলে বললেন, 'মোটেই দোষের না।'

'জানো, আমি ওকে কথা দিয়েছিলাম, কাউকে বলব না। নট এ লিভিং সোল, নো ওয়ান। আই গিভ ইউ মাই ওয়ার্ড। সুহাসের চোখে মুখে হতাশা। মিথ্যা রিপোর্ট নিয়ে না আবার মুখার্জিদা ঝামেলা পাকান।

মুখার্জিদার এতে বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া হল না। যেন চার্লিই আসামি। চার্লি জল ঘোলা করার জন্য 'কলিজ' সম্পর্কে মিথ্যা খবর রটাবার চক্রান্ত করছে। মুখার্জিদা হেসে ফেললেন। খুব কাবু ছোঁড়া। বললেন, 'বলদা। আর কারে কয়! যা সত্য তাই কইলাম চাঁদু। বোঝলা।'

সুহাস বুঝল, নিজের দেশজ ভাষাটি ব্যবহার করে তাকে মুখার্জিদা আরও উপহাসের পাত্র করে তুলছে। সে রেগেমেগে বের হবার মুখে শুনল, মুখার্জিদা বলছেন, 'আমিও কথা দিচ্ছি কেউ জানবে না, নো ওয়ান, নট এ লিভিং সোল। আই গিভ ইউ মাই ওয়ার্ড। চার্লি ঠকেছে। চার্লির কোনও দোষ নেই। ডাইরিতে তাই আছে। যা পেয়েছে, তাই দিয়েছে। কাপ্তানের চাতুরি হতে পারে—অথবা প্রাথমিক খবর যে রকম হয় আর কি! উল্টাপাল্টা। পরে আরও খবরটবর নিয়ে হয়তো জেনেছেন, যাঃ আমিও শালা বুদ্ধু—তোর কি আর কিছু বলার আছে?'

'না।'

'তা হলে যা। কি যে মুশকিলে ফেলে দিস না, বুঝি না। চার্লি জলে পড়ে গেলে, তুইও জলে পড়ে যাস। চার্লি খারাপ কিছু করতে পারে না, এমন ধরেই নিয়েছিস, এ-সব লাইনে থাকলে—সবাই সন্দেহভাজন বুঝলি—চোখ তো আমার দুটো। দেখার চেয়ে বোঝার ব্যাপারটা গুরুতর। সিঁড়ি ভেঙে ওঠার মতো। সিঁড়িটাই খুঁজে পাচ্ছি না। 'কলিজ' জাহাজ নিয়েই বা এত মাথা ব্যথা কেন বুঝি না! আর সত্যি কলিজ জাহাজের খোঁজে তিনি যাচ্ছেনও কি না, ঠিক জানা নেই। সব তো অনুমান-নির্ভর।'

সুহাস উপরে উঠে যাচ্ছে। সুহাসের পায়ের শব্দ পেলেন মুখার্জি। যত দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে সুহাস লাফিয়ে উপরে উঠে যায়—তার বিন্দুমাত্র আভাস নেই। যেন ক্লান্ত কোনও বুড়ো মানুষ উপরে উঠে যাচ্ছে। বেচারা খুবই ধন্দে পড়ে গেছে। ডেরিক যে তার মাথায়ও একদিন ভেঙে পড়বে না, বিশ্বাস করতে পারছে না।

তিনি লাফিয়ে নিচে নামলেন, তারপর সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেলেন। ঘুমের বারোটা বেজেছে, ঘুম আর আসবে না। সুহাসকে ভয়ের মধ্যে রাখা আদৌ ঠিক হবে না। যাও খবর পাচ্ছিলেন, তাও যাবে। চার্লি না বললে তিনি তো জানতেনই না, টেকসাস অঞ্চলে এক বনভূমিতে চার্লি বড় হয়ে উঠেছে। ঘোড়ায় চড়ে বনভূমির পর বনভূমি পার হয়ে গেছে। বাড়িটা কি রকম। প্রাসাদ, না বাংলো টাইপ—পাহাড়ের মাথায় ওঠার রাস্তা পাকা না কাঁচা! পাথর ফেলে সিঁড়ির মতো করে নেওয়া হয়নি তো—তিনি তো কিছুই জানেন না। চার্লি তাঁর সঙ্গে কথাও বলে না—কেউ বা বলে রাজার-জাত, অহঙ্কার থাকতেই পারে। ট্রান্সমিশান রুমে একদিন ঢুকতে গিয়ে বেকুফ—রেডিও অফিসারের গম্ভীর গলা—কি চাই! প্রায় টেসপাসারসের দায়ে অভিযুক্ত হতে যাচ্ছিলেন আর কি।

তিনি পিছিলে উঠে দেখলেন, সুহাস ডেকে নেই, মেসরুমে নেই। গ্যালিতে যদি থাকে, সেখানেও নেই। ইনজিনরুমে ঢুকে গেছে তবে। সেখানে তাকে পাকড়াও করা যায়। তবে মুখার্জির পক্ষে ইনজিনরুমে ঢোকা উচিত হবে না। তিনি তো ইনজিনরুমের কেউ না। তার কি কাজ থাকতে পারে তবে ইনজিনরুমে! সেকেন্ডের ওয়াচ চলছে। নিচে তিনি আছেন। তাঁকে দেখলে, অসময়ে সুখানি ইনজিন রুমে কেন ভাবতেই পারেন।

সাত পাঁচ ভেবে পিছিলের বেঞ্চিতে বসে থাকলেন মুখার্জি। আর সমুদ্রে কিছু দেখার চেষ্টা করছেন। এই সমুদ্র নীল হাঙরের সাম্রাজ্য। এদিকটায় সমুদ্রে অনেক চোরা স্রোত আছে, আর অজস্র প্রবাল প্রাচীর চল্লিশ পঞ্চাশ ফুট নিচে গাছের শেকড় বাকড়ের মতো ছড়িয়ে আছে। কত সব বিচিত্র রকমের সামুদ্রিক জীব থেকে গাছপালা, সমুদ্রের তলায় ঘন বনাঞ্চল তৈরি করে রেখেছে। উপর থেকে তা বোঝাবই উপায় নেই।

তিনি কেন যে ভাবতে ভাবতে সেই অতল সাম্রাজ্যের রহস্যের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিলেন বুঝতে পারছিলেন না। হাজার লক্ষ বছর কি তার চেয়েও বেশি সময় ধরে প্রবাল সঞ্চিত হতে হতে ওই সব প্রাচীর গড়ে উঠছে, ভাঙছে, ডুবছে, সমুদ্র স্রোতে ভেসে যাচ্ছে—বিচিত্র জলজ প্রাণীর বিশাল সাম্রাজ্য সমুদ্রের নিচে যেন লুকিয়ে রেখেছে প্রকৃতি। প্রাচীরগুলি সরীসৃপের মতো যেন হামাগুড়ি দিচ্ছে। নানা প্রজাতির মাছ, নানা রং তাদের, বর্ণ-ছটায় পাগল হয়ে চক্রাকারে ঘুরছে স্রোতের গভীরে।

আর তখনই কেন যে মনে হল, সুহাসকে আসল কথাটাই বলা হল না।

অবশ্য এখনই বলা ঠিক হবে না, তাও ভাবছিলেন। কারণ বললেই সুহাস ফাঁপরে পড়ে যেতে পারে।

বাথরুমের ভিতর থেকে কেউ যেন উঁকি দিয়ে তাকে দেখল?

কে লোকটা।

তিনি দেখলেন, লতুমিঞা বেসিনে হাতটাত ধুয়ে এদিকে আসছে।

তাঁর দিকে তাকিয়ে সে বলছে, 'বসে আছেন মুখার্জিবাবু। ঘুমোলেন না। মন খারাপ।'

তা আজকাল চুপচাপ বসে থাকলেই সবার মনেই এই ধন্ধ দেখা দেয়। ভাল নেই কেউ। মুখার্জিবাবুও বোধহয় ভাল নেই।

তাঁর কি ষষ্ঠইন্দ্রিয় ক্রমে সজাগ হয়ে উঠছে। না হলে লতুমিঞাকে এড়িয়ে যাবেন কেন। আর তখনই মনে হল, দড়ি টানার ব্যাপারে অথবা ডেবিক তুলে রাখার ব্যাপারে লতুমিঞার হাত থাকতে পারে এমন একটা সংশয় তাঁর আছে। যেই ডেরিক তুলে রাখুক, একা তুলতে পারেনি। অন্তত দুজনের দরকার। দুজনের মধ্যে কখনও কখনও কেন যেন লতুমিঞার মুখ ভেসে উঠত তিনি বুঝতে পারতেন না।

লতুমিঞা হোস পাইপ ফেলে রেখে এসেছে ডেকে। এদিকটায় তার আসারও কথা না, যমুনা-বাজুতেই উঠে আসার কথা। ওদিকটাতেই তাদের গ্যালি। কিংবা ফোসকালে দরকার টরকার থাকলে, যমুনাবাজু দিয়েই ঢোকার কথা, তবু কেন যে তাঁকে দেখে গেল লতুমিঞা, বুঝতে পারলেন না।

তিনি ডাকলেন, 'চাচা, শোনো।'

লতু উঠে এল ফের।

আচমকা বলে ফেললেন, 'বাটলারের সঙ্গে লাইন আছে তোমার।'

লতুর মুখটা মুহূর্তে ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

তিনি বললেন, 'শোনো চাচা রসদঘর থেকে চুরি-চামারি হচ্ছে। মালের বোতল হাপিজ। কিনার আসছে—পয়সা কামাবার ধান্দা করছ শুনতে পেলাম।'

লতুমিঞা বলল, 'তোবা, তোবা।' সে কান ধরল, জিভ কাটল। বলল, 'আমার কোনও কসুর নাই। ঝুট বাত। বাটলারের সঙ্গে আমার লাইন নেই আল্লার কসম!'

মুখার্জি সহসা হেসে ফেললেন।' 'লতুমিঞা এত ঘাবড়ে যাও কেন বল তো! লাইন থাকলে দোষের কি আছে। আরে সব চিজ মাঙ্গা, বাটলার তো মাল সরাতেই পারে। ফাঁক করে দিতে পারে। দ্বীপের লোকজন নৌকায় এলে, কিছু মাল তো রাতের অন্ধকারে হাপিজ করা হয়েই থাকে। তুমি না থাকো, আর কেউ থাকবে।'

'সে আমি জানি না, কে আছে! আমারে জড়াবেন না।' কেমন বিমর্ষ মুখে লতুমিঞা তাকাল মুখার্জির দিকে। বলল, 'কিছু শুনছেন।'

'শুনলাম, ডজনখানেক মালের বোতল হাপিজ, বাটলার হিসাব দিতে পারছে না।'

'মিথ্যে কথা মুখার্জিবাবু। হিসাব ঠিক মিলিয়ে দেবে। কার ঘরে ক'বোতল হজম হয়, বাটলারই ভাল জানে। পানি মেশালে ধরে কার সাধ্য।'

'কাপ্তানবয় তো মিঞা খবরটা রাখে।'

'কি খবর।' কশপ আমতা আমতা করে কিছুটা কাশল।

'একটা পেটি পাওয়া গেছে—কেউ বোধ হয় সরাবার তালে ছিল। ছিল কশপের স্টোররুমে; এখন ওটা কাপ্তানবয়ের ঘরে পাচার।'

'ধরা পড়েছে কেউ?'

'না। কাপ্তানবয়কে বলে দিয়েছি, পেটি তোমার ঘরে কেন? সে জবাব দিতে পারেনি। সে তো বলল, সে কিছু জানে না। তাকে নাকি অপদস্থ করতে চায় কেউ। তারই কারসাজি। তুমি পেছনে নেই তো? মিঞাসাব তোমার স্টোরে পেটি আসে কোত্থেকে?'

'আমি কিছু জানি না মুখার্জিবাবু। আল্লার কসম।'

মুখার্জি বেশ রগড় বাধিয়ে দিতে পেরেছেন। সুহাসেরও অভিযোগ কাপ্তানবয়, বাটলারের সঙ্গে এত দোস্তি কেন। দোস্তিটা যে করতে হয়েছে কেন, বুঝবি পরে। মগড়াই খবরটা দিয়েছিল, 'মুখার্জিবাবু, তাজ্জব বাত। পেটি দেখলাম কশপের স্টোররুমে। সেই পেটি সরে গেল কাপ্তানবয়ের ঘরে। কি করে যায়।'

'কিসের পেটি?'

'কিসের পেটি আবার, মালের পেটি মুখার্জিবাবু।

'তাই বুঝি!'

এটা যে বাটলারের কাজ বুঝতে অসুবিধা হয় না। রসদঘরের তালাচাবি তার জিম্মায়। কার হিম্মত আছে সরায়। তিনি বাটলারকে ধরেছিলেন, কাপ্তানবয়কেও ধরেছেন, কশপকেও বাজিয়ে দেখলেন। কাপ্তানবয়ের মুখ সেই থেকে চুন। জানাজানি হয়ে গেল কি করে। কে ফেউ লাগিয়ে দিয়েছে। কাপ্তানবয়, তাকে দেখলেই তোষামোদ করছে এখন—'মুখার্জিবাবু লাগবে!'

'না। লাগবে না। আমি খাই না।'

'লাগলে বলবেন!'

সুতরাং লতুমিঞা মাল পাচারের সঙ্গে জড়িত না থাকলেও, কাপ্তানবয় আছে। একবার মালের পেটি সরিয়েছে যখন, তা আর রসদঘরে নিয়ে যাওয়া কঠিন।

মগড়া ডেক ধরে হেঁটে আসছে। কনুইতে বালতি ঝাঁটা। সেই হঠাৎ চিৎকার করে উঠল—'ওরেব্বাস।' দূরে কি দেখছে মগড়া! মুখার্জিরও [illegible] গেল। দূরের সমুদ্র সবুজ একটা গোলাকৃতি কিছু ঘুরছে। সমুদ্রের জল উঁচু হয়ে উঠছে—কোনও অতিকায় সমুদ্রদানব ঘোরাফেরা করছে যেন। আশ্চর্য সেই জল কিছুটা প্রাচীরের মতো উঠে দাঁড়িয়েছে। জাহাজে সোরগোল পড়ে গেল। কোথা থেকে ঝাঁকে

ঝাঁকে পাখি উড়ে আসছে। কি ব্যাপার কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সবাই প্রায় বোট-ডেকে নয় পিছিলে এসে জড়ো হয়েছে। চার্লিকেও দেখা গেল বোট-ডেকে দূরবীন চোখে—আরে সুহাসও দাঁড়িয়ে আছে চার্লির পাশে। বড্ড গা চাটা স্বভাব সুহাসের। তিনি চটে গেলেন। আর তখন সুহাসও কি দেখে ছুটে আসছে পিছিলের দিকে।

সুহাস চেঁচাতে চেঁচাতে আসছে—'হাঙরের ঝাঁক। উড়ন্ত পাখিগুলি ঝাঁকটাকে তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে।'

পাখিগুলি কত বড় আব কি রং বোঝা যায় না। রোদের জন্য চোখ টাটাচ্ছে। এই গরমে সমুদ্রের জলও উষ্ণ হয়ে উঠেছে। সুহাস কেবল বলছিল, 'দানব,—বিশাল হাঁ, চার পাঁচ হাত উঁচুতে লাফিয়ে উড়ন্ত পাখি গিলে জলে ঝপাস করে পড়ছে। পাখিরাও ছাড়ছে না। জল পায়রা নয়, অতিশয় অ্যালবাট্রসই হবে। পাখিদের সঙ্গে হাঙবের খণ্ডযুদ্ধ। পাখিগুলি ধারালো ঠোঁটে হাঙরের মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে।

নিমেষেই গোলাকার প্রাচীবের মতো সবুজ বৃত্তটি জলে মিশে গেল—পাখিদের ওড়াউড়িও নেই। শান্ত সমুদ্র—হাঁপাতে হাঁপাতে মুখার্জিব পাশে বসে পড়ল সুহাস।

মুখার্জি জানেন, ব্লু-সার্কেব বাজত্ব পার হয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। এতে হুড়োহুড়ির কি থাকতে পারে তিনি বুঝলেন না। সবাই উঠে এসেছে। এমনকি চার্লিও অসুস্থ শরীর নিয়ে বের হয়ে এসেছে।

'চার্লি কিছু বলল তোকে?' মুখার্জিদা ওর ঘাড়ে হাত রেখে এমন প্রশ্ন করলেন।

'না তো!' কি বলবে?'

তিনি দেখলেন, অনেকেই ঘোরাঘুবি করছে 'ছিলে। এখানে বলা ঠিক হবে না। কথাটা ঘুরিয়ে দিলেন, 'না বলছিলাম, হাঙর বুঝলি না। খুবই বাক্ষুসে মাছ। উড়ন্ত পাখি জলে লাফিয়ে ধরে ফেলতেই পারে। পাখিগুলিও কম যায় না, ঠুকরে হাঙরের মাংস খাবলে খুবলে খেয়েছে।'

'তাই তো দেখলাম।' সুহাস বলল।

'দেখো। দেখে শেখো। নিরীহ পাখিরাও সুযোগ পেলে হাঙরের মাংস খুবলে খায়। হাঙরের ঝাঁককেও তাড়া করে নিয়ে যেতে পারে। সমুদ্রে যখন ভেসে পড়েছ শিশিরে আর ভয় কি! আমার সঙ্গে এসো সোনা, কথা আছে।

সুহাস বিরক্ত হয়ে বলল, 'আবার নাটক!'

মুখার্জি হেসে দিলেন। বললেন, 'আয় এদিকে। তারপর নিচে নিয়ে গেলেন সুহাসকে। বললেন, আট নম্বর মুখোসটার খোঁজ পাওয়া গেছে।'

'আট নম্বর মুখোস?'

'আরে যে মুখোসটার হিসেব পাওয়া যাচ্ছিল না। একুশটা মুখোসের একটা কার কাছে আছে, আমরা কি জানতাম!'

সুহাস বললে, 'সকালে তো কিছু বলনি! এখন বলছ! আট নম্বর মুখোস কাকে উপহার দিয়েছিল, কিছুই তো ম্যাক লিখে রাখেনি। সব কটার লিখে রেখেছে, একটার লেখেনি কেন?'

'সেই তো রহস্য! কেন লিখে রাখেনি ম্যাক। সব কটা মুখোসের নামও আছে, কাকে দিয়েছে তাও লেখা আছে। যেগুলো দেয়নি, দেয়ালে আছে, একটা মুখোস কম। হিসাবে পাওয়া যাচ্ছিল না। সেটা পাওয়া গেছে! তোকে একটা কাজ করতে হবে।'

'কি করতে হবে?'

'ওটা পরে রাত বারোটায় চার্লির পোর্টহোলে গিয়ে একবার উঁকি দিতে হবে।'

'আমি!'

'হ্যাঁ কেন! ভয় পাচ্ছিস?'

'চার্লি পোর্টহোলের পর্দা খোলা রাখে না।'

'সে ব্যবস্থা হবে।'

'সে ব্যবস্থাও করে রেখেছ! না না আমি পারব না। মুখোস পরে চার্লির পোর্টহোলে কিছুতেই

দাঁড়াতে পারব না। রাতে পোর্টহোলে এমনিতে গিয়ে দাঁড়ালেও চিৎকার করে উঠতে পাবে। আর মুখোস পরে গেলে কি যে হবে, না ভাবতে পারছি না। আমি পারব না। কিছুতেই পারব না।'

'না গেলে তো বোঝা যাবে না। হিমশীতল ঠাণ্ডা পাথরের চোখ আছে কি না মুখোসে, ওটা না পরে গেলে তো বোঝা যাবে না।'

মুখোসটা নিয়ে সুহাস সত্যি ঘোরে পড়ে গেল। সে রাজি হয়নি। তার পক্ষে পোর্টহোলে গিয়ে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। আর মুখোসটা মুখার্জিদা পেলেন কি করে! কোথায় আছে। মুখার্জিদার লকারে! তিনি নিজেই কি তবে অনুসবণকারী। এ তো আর এক রহস্য। চার্লির কেবিনের পাশে শেষ রাতে হাঁটাহাঁটি করেন কেন! একবার তো ধরা পড়ে গেলেন! অথচ তখন এমন অভিনয় যে তার কোনও সংশয়ই ছিল না মুখার্জিদার উপর। তিনি মাপজোক্ করে বোঝার চেষ্টা করছিলেন, কতটা দূরত্বে দাঁড়ালে, পোর্টহোলের ববাবর মুখ ভেসে ওঠে। অনুসবণকাবী লম্বা না বেঁটে না মাঝারি মাপের—সে-রাতে তাও নাকি তাঁর ইচ্ছে ছিল দেখার। ঝড়ের রাতে সুযোগ বুঝেই প্রাণ হাতে করে কাজটা সেরেছেন।

কিন্তু এ কেমন কথা, মুখোসটা কাব—তিনি তা জানেন না। কোথায় আছে তাও তিনি মুখ ফুটে বলছেন না। আছে তো দেখাও। তাও দেখালে না। বললেন, আছে—যথাসময়ে দেওযা হবে। তুই রাজি না হলে মুশকিল। বলে তিনি চিবুক চুলকাতে থাকলেন। সহ্য হয়! তুমি নিজেই আসলে অনুসরণকারী? তোমাকে চিনতে বাকি আছে! বেহুঁশ রমণীকে পর্যন্ত ধর্ষণ করতে পার, তোমার মুখ দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে! এখন সাধুপুরুষ! আমাব সাধুপুরুষ রে! চার্লিকে বলে দেওয়াই ভাল। জানো, অনুসরণকারীর খোঁজ পাওয়া গেছে। তোমাকে ভয় দেখিয়ে জাহাজ-ছাড়া করতে চায়। পারে—আহমদ বাটলারকে জাহাজ ছাড়া করে ছাড়ল না! তুমি কি চার্লি বিশ্বাস করতে পার, তিন নম্বর কোয়ার্টারমাস্টারের ষড়যন্ত্র। বুঝিও না বাপু—জেদেব মাত্রা কেন শেষে এতদূর গড়ায়।

জিন পরী বিশ্বাস কবে না আহামদ। কবতে নাই পারে। তাই বলে এ-ভাবে পিছু লাগা। আহমদ বাটলার ঘরে ঢুকে আলো জ্বাললেই দেখতে পায় সাদা চাদরে সর্বাঙ্গ ঢেকে কোনও নাবী যেন চিৎ হয়ে পড়ে আছে বাঙ্কে। সে ত্রাসে ছুটে বের হয়ে গেলে অন্ধকাব থেকে হামাগুড়ি। তিনি ঢুকে যান। চাদর, কম্বল, বিছানা লণ্ডভণ্ড করে অদৃশ্য হয়ে যান। লোকজন ঢুকে কিছু দেখতে পায় না। কোথায় সাদা চাদরে ঢাকা মরা মানুষ। আর আদামদ বাটলার তোমারও বলিহারি যাই—চাদরটা সরিয়ে দেখবে না, সত্যি না ফলস মেবে গেছে কেউ! বালিশ কম্বল সাজিয়ে মরা মানুষের ছলনা কবে গেছে কেউ!

ছাল চামড়া তোলা গরু ভেড়ার কবন্ধ দেখতে দেখতে শেষে তুমি বরফঘরেও মেয়েমানুষের লাশ দেখে ফেললে! আতঙ্কে কি না হয়! বুদ্ধি বিবেচনা কাজ করবে না! ভোঁতা মেরে গেলে!

না কিছু ভাল লাগছে না। সে উপরে উঠে গেল। তেলের টব, সিরিস, জুট সব জমা দিল কশপের স্টোরে। পাঁচটায় ছুটি। কাল জাহাজ ধরছে। সব আনন্দ মাটি। ডাঙায় নেমে ঘোরাঘুড়ির আনন্দও মাথায় উঠেছে। সে বাথরুমে ঢুকে স্নানটান সেরে নিচে নেমে গেল। শুয়ে পড়েছে বাঙ্কে। তারপরই মনে হল, চার্লি তাকে যেতে বলেছে। চার্লি কত সরল অকপট, কত সুন্দর সুন্দর কথা বলে—তাও এরা জানে না।

ইউ আর সো জেন্টল্। চার্লি তার গা ছুঁয়ে যখন কথাটা বলে, গা তার শির শির করে! সেই চার্লিকে নিয়ে উপহাস! সে নাকি চার্লির পোষা কুকুর। খারাপ লাগে না।

অধীর তো ক্ষেপে গিয়ে রাস্তা রুখে দাঁড়িয়েছিল—'চাকর বাকরের মতো চার্লির সঙ্গে নেমে যাস, লজ্জা করে না!'

'না লজ্জা করে না।'

সুরঞ্জন তো একদিন কোন্ বন্দরে যেন বলেই ফেলল, 'জানিস সবাই তোকে চার্লির পোষা কুকুর ছাড়া কিছু ভাবে না।'

আর কিছু না ভাবলেই হল। সুহাসও ছেড়ে কথা বলেনি।

আরে পোষা কুকুর হলে গায়ে হাত রেখে বলতে পারে, ইয়োর টাচ ইজ সো জেন্টেল আই ফিল ফর অ্যান ইনস্ট্যান্ট, অ্যাজ ইফ টাইম হ্যাড স্টপড, অ্যান্ড অল দ্য ডার্কনেস ইজ গন।

চার্লির এমন সুন্দর কথাবার্তায় তার যে কি হয়, ওরা কি করে বুঝবে!

চার্লি কত ভদ্র এরা মেশে না বলে জানে না। বংশীদার খোঁজখবর পর্যন্ত নেয়। বংশীদা ডিপ্রেসানে ভুগছে তাও জানে। বংশীদার কথা উঠলে বলবে, বেচারা। সদ্য বিয়ে করে সফরে কেউ বের হয়।

অদ্ভুত সব কথাও বলে চার্লি। 'জানো, তো, বিয়েটা হল ঈশ্বরের পবিত্র সিদ্ধান্ত। বিয়েটা হল, সিঙ এ নিউ সঙ টু দ্য লর্ড। সিঙ ইট এভরি হোয়ার অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্লড। সিঙ আউট হিজ প্রেইজেস।'

এমন ঈশ্বর বন্দনা যেন নিষ্পাপ চার্লির মুখেই মানায়। সব সময় চার্লির সব কথার অর্থও সে বুঝতে পারে না, ধরতে পারে না কি বলতে চায় চার্লি। তবু বোঝে, তার গা ছুঁয়ে দিলে চার্লি টের পায়, সময় স্তব্ধ হয়ে গেছে। অন্ধকার দূর হয়ে যায়।

এ-সব কথার অর্থ কি বোঝে অধীর। বুঝলে কখনও বলতে পাবে। সুরঞ্জন, লজ্জা করে না, তু করলেই ছুটে যাস। তুই কি রে! চার্লি তার মধ্যে ঈশ্বরের স্পর্শ পায়, বলে কি লাভ! বললেই মজা করতে পারে। উপহাসও।

কি বললি, বিয়েটা হল সিঙ এ নিউ সঙ টু দ্য লর্ড!

হ্যাঁ তাই তো।

এত টুকুস টুকুস কথা কে শেখায় রে?

কে আবার শেখাবে? আমি বুঝি না মনে কর। বংশীদার বিয়ে করেই জাহাজে উঠে আসা উচিত হয়নি। বউটার কষ্ট, বংশীদার কষ্ট। চার্লি ঠিক বোঝে। বিয়েটা কত পবিত্র ব্যাপার চার্লি না বললে টেরই পেতাম না। ঈশ্বরের উপর পরম বিশ্বাস—সে তো তার অনুসরণকারীকেও ভয় পায় না। না হলে বলতে পারে, গড হ্যাজ মেড এভরিথিং ফর হিজ পারপাসেস—ইভিন দ্য উইকেড ফর পানিশমেন্ট।

কখন যে অধীর সুরঞ্জনদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কিভাবে যে চার্লির প্রসঙ্গ চলে আসে সে বুঝতে পারে না।

আবার চার্লি!

শোন সুহাস, চার্লিকে বলবি, হিউম্যান বিইংস আর অ্যানিমেল, জাস্ট দ্য সেম অ্যাজ এ ডগ অর এ কাউ। বংশীকে জোরজার করে হলেও কিনারায় নামাতে হবে। সর্বরোগহর বিষহরি বুঝলি! ওকে এ-ছাড়া নিরাময় করা যাবে না। কি সব কথা!

গরম পড়ায় ফোকসালে থাকা যাচ্ছিল না। সে চুপচাপ শুয়ে থাকায় অধীর কেষ্টরা ফাঁপরে পড়ে গেছে।

তার তো জানে না, মুখার্জিদা কি বলে গেছেন! মুখোসটা পরে গভীর রাতে একবার উঁকি দিতে হবে চার্লির পোর্টহোলে, সে সোজা বলেছে, যেতে পারবে না, উঁকি দিলে নিজেই সে অনুসরণকারী হয়ে যাবে। মুখার্জিদার কি মতলব কে জানে!

অধীর কেষ্ট তাকে মনমরা দেখেই তাতাতে চেয়েছিল। সে কারও কথা আমল দেয়নি। চার্লিকে নিয়ে ঠাট্টা করায় সে আরও খেপে গেছে।

এমন জঘন্য চিন্তা ভাবনা, চার্লির মাথাতেই আসবে না। হিউম্যান বিইংস আর অ্যানিমেল! শুনলে হাঁ হয়ে যাবে। চার্লি কত ভাল, কি করে বোঝাবে! চার্লিকে কেউ খাটো করলে সে কষ্ট পায়। ধর্মভীরু শান্ত স্বভাবের চার্লি। তা তো হবেই, মা নেই, শৈশব প্রকৃতি বন জঙ্গল পাহাড়ে একা বড় হয়ে উঠেছে। গাছপালা, পাখি, প্রজাপতি আর পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রটি ছাড়া তার তো কেউ আর সঙ্গী ছিল না।

সমাধি ক্ষেত্রের পাশেই তাদের নিজস্ব গির্জা। চারপাশে যত দূর চোখ যায় রেড ম্যাপেলের জঙ্গল। দূরে পাহাড়শীর্ষে কখনও বরফে মাখামাখি। চার্লি তো ঈশ্বরের মহিমা বেশি টের পাবেই। আর ওই স্টপ অফের বুড়ো মানুষটা। বুড়ো মানুষটাই হয়তো তাকে সুন্দর সুন্দর কথা বলত। বুড়ো মানুষেরা তো ঈশ্বরের বেশি কাছাকাছি থাকেন।

না হলে চার্লি বলতে পারে, দ্য লর্ড লাভস দোজ হু হেট ইভিল। হি প্রটেকটস দ্য লিভস্ অফ হিজ পিপল অ্যান্ড রেসকিউজ ফ্রম দ্য উইকেড।

চার্লির এই আত্মবিশ্বাসই সম্বল। বোট ডেকে অপদেবতার উপদ্রব জেনেও নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে। পোর্টহোলে হিমশীতল পাথরের মতো ঠাণ্ডা চোখ দেখেও অবিচল থাকতে পারে। না হলে চার্লিও আহামদ বাটলারের মতো পাগল হয়ে যেত। জাহাজ ছেড়ে পালাত। এত উপদ্রবের পরও চার্লি সকালে স্বাভাবিক। বরং চার্লির কথা শুনে সেই ঘাবড়ে যেত—আবার কে পোর্টহোলে ঘোরাঘুরি করছে, হাঁটাহাঁটি করছে।

সে ঘাবড়ে গেলে চার্লি হেসে বলত, হি প্রটেকটস। ভয় কি! এটা কত বড় সাহসের জায়গা ভেবে তার চোখে জল এসে গেল।

চার্লির জন্য, না, ঈশ্বরের মহিমা টের পেয়ে সে বুঝতে পারল না।

'কোথায় যাচ্ছিস?'

সে ওপরে ওঠার সময় মুখার্জিদা সিঁড়িতে দু'হাত ছড়িয়ে দিলেন।

'উপরে।'

'উপরে কোথায়।'

'চার্লির কাছে।'

'এখন যাবি না, আয়।'

'না, যাব। ছাড়ো।'

'পাগলামি করিস না। সোনা আমার লক্ষ্মী ছেলে। মাথা গরম করলে চলে!'

'ছাড়ো হাত। আমি পোষা কুকুর!'

'কে বলেছে, তুই পোষা কুকুর!'

'সবাই তো বলছে।'

'কার পোষা কুকুর।'

'জানি না। হাত ছাড়ো বলছি।'

'পাগলামি করিস না। মুখার্জিদা ওর হাত কিছুতেই ছাড়ছেন না। যেন এখন কোথাও গেলেই সব তার ভণ্ডুল হয়ে যাবে। সে বলল, 'আমি পারব না বলে দিলাম।'

'ঠিক আছে তোকে যেতে হবে না। আয় আমার সঙ্গে। মুখোসটা দেখবি বলেছিলি!' বলেই সতর্ক চোখে চারপাশে তাকালেন মুখার্জিদা। সে আর কি করে! মুখোসটা দেখারও আগ্রহ আছে তার। সে মুখার্জিদার কেবিনে ঢুকে বলল, 'কোথায় পেলে!'

'কি কোথায় পেলাম?' মুখার্জি দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, 'পাব। আজকেই পাবার কথা! মুখোসটার কথা বলছিস তো।'

মুখার্জিদার কথার কোনও খেই পাচ্ছে না সুহাস। এই বললেন, মুখোসটা দেখবি বলছিলি, আয় আমার সঙ্গে।.আর এক্ষুনি বলছেন, কি, কোথায় পেলাম? মুখোসটার কথা বলছিস?

হঠাৎ সুহাস খেপে গিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'অমাকে নিয়ে আর কত তামাসা করবে!'

মুখার্জি দ্রুত উঠে গেলেন। সুহাসের মুখ চাপা দিলেন হাতে। জোরজার করে ধরে ফেললেন—যেন না হলে সে এক্ষুনি দরজা খুলে ছুটে পালাবে।

তিনি ধীরে ধীরে বললেন, 'মাথা ঠাণ্ডা রাখ। অযথা উত্তেজিত হোস না। কে কোথায় আছে জানি না। তুই বুঝতে পারছিস না কত বড় বিপদ আমাদের সামনে।' সুহাসের বিপদ না বলে, আজ প্রথম

বললেন, আমাদের বিপদ। এতে সুহাস কিছুটা যেন দমে গেল। সে ঘামছিল। উত্তেজনায় মুখ চোখ লাল। হাওয়া পাইপ সুহাসের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন, 'কেলেঙ্কারি করতে যাস না। আমাকে তুই অবিশ্বাস করছিস! আমি বুঝি। কিন্তু হাতের কাছে কোনও প্রমাণ পাচ্ছি না!'

সে বলল, 'তুমি অযথা মুখোস নিয়ে পড়েছ। লোকটা মুখোস পরে চার্লিকে তাড়া করবে কেন বুঝি না। সে তো আবছা অন্ধকারে থাকে। তার চুল সাদা, দাড়ি গোঁফ আছে—অস্পষ্ট অন্ধকারে এমন টের পেয়েছে চার্লি। মুখোস পরার কি দরকার! এমনিতেই অনুসরণ করতে পারে। মুখোস পরার দরকার হবে কেন?

'তা অবশ্য জানি না। মগড়া বলেছে, সে জানে কোথায় আছে মুখোসটা। আমাকে দেখিয়ে আবার জায়গারটা জায়গায় রেখে দিয়েছে। কোথায় রেখেছে, কিছুতেই বলছে না। বলেছে, সে আমাকে দিতে পারে, তবে ওটা আবার ওকে ফেরত দিতে হবে।'

সুহাস কেমন ঘাবড়ে গেল। বলল, 'মগড়ার এত সাহস! চার্লির ঘরে তো সকালে বাথরুম পরিষ্কার করতে মগড়া এমনিতেই যায়। তার দরকার কি পোর্টহোলে উঁকি দেবার। চার্লি কেবিনে কি করছে না করছে এত আগ্রহ কেন তার! তুমি শেষে আমাকে মগড়া হতে বলছ!'

মুখার্জিদা কথা বলছেন না! শুধু ঠোঁটে আঙুল রেখে সতর্ক করে দিচ্ছেন, আস্তে। সে যতটা পারছে নিম্নস্বরে কথা বলছে ঠিক, তবে উত্তেজনায় মাঝে মাঝে নিজের স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলছে। কেবল বলছে, 'শেষে মগড়াকে লেলিয়ে দিলে!'

তিনি যেন কারও আসার প্রত্যাশায় আছেন। ঘরে আলো জ্বলছে। এখনও সূর্য ডোবেনি—পোর্টহোলে চোখ রাখলেই বোঝা যায়। তবে ঘরে আলো জ্বালিয়ে না রাখলে, ঘর অন্ধকার। বার বার সিঁড়িতে কারও পায়ের শব্দ পেলেই দরজা খুলে তিনি উঁকি দিচ্ছেন, তারপর ফের হতাশ হয়ে ফিরে আসছেন দরজা বন্ধ করে দিয়ে। তার কথার কোনও জবাব দিচ্ছেন না।

সুহাস টের পাচ্ছে, মুখার্জিদা অস্থির হয়ে পড়েছেন। হাতের মুঠো শক্ত হচ্ছে, আবার আলগা হচ্ছে, সব তার অজান্তে। তাঁর কোনও গূঢ় অভিসন্ধি নেই তো। সুহাসের যে কি হয়, মাঝে মাঝে মুখার্জিদাকেই ভয় পেতে শুরু করে। সে এই অবস্থায় কোনও আর প্রশ্ন করতেও সাহস পাচ্ছে না। চুপচাপ মাথা নিচু করে বসে আছে। চার্লি মেয়ে না ছেলে, এই রহস্য এত গোলমাল পাকিয়ে ফেলতে পারে সে ভাবতেই পারে না। যেন এই রহস্যটা জানাজানি হয়ে যাওয়া মারাত্মক কোনও অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। সে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। তার তো মনে হয়নি কখনও—তবে খুবই ঢিলেঢালা শক্ত টুইলের শার্ট পরে, আর সবসময় কেমন অস্বস্তির মধ্যে যেন চার্লি চলাফেরা করে। জাহাজেই এটা হয়। যেন শরীরে তার জামা এঁটে বসে যাচ্ছে—এমন আতঙ্ক। জামা টেনে ঢিলেঢালা রাখার জন্য কিছু মুদ্রাদোষ গড়ে উঠেছে চার্লির। হাঁটা চলার সময় এটা সে বেশি লক্ষ্য করেছে। বয়লার সুট, কিংবা যাই পরে বের হোক চার্লি, তাকে ঠিক যেন মানাচ্ছে না, সে কলার টানছে, জামার হাতা টেনে দিচ্ছে, বগলের দু-দিকের জামা টানছে, প্যান্ট টানছে—এগুলি যে কোনও অস্বস্তি থেকে গড়ে উঠতে পারে তার মনেই হয়নি। অথচ চার্লি তো সোজা বলে দিয়েছে, মি বয়। তারপর আর কি কথা থাকতে পারে। তারপরও মুখার্জিদারা ভাবেন কি করে, যে চার্লি মেয়ে, ছেলে নয়।

আর তখনই সহসা কে নেমে এল সিঁড়ি ধরে। মুখার্জিদা দ্রুত উঠে গেলেন। দরজা সামান্য ফাঁক করে যেমন দেখছিলেন এতক্ষণ, তেমনি দরজা সামান্য ফাঁক করতেই একটা হাত এগিয়ে এল। কাগজে মোড়া কিছু। এবং দ্রুত ওটা দিয়ে যেন কেউ অদৃশ্য হয়ে গেল। সে উঠে গিয়ে যে দেখবে তারও সময় পেল না। মুখার্জিদা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। দরজার ছিটকিনি তুলে দিয়ে ধপাস করে বসে পড়লেন। কাগজের মোড়কের ভিতর কি আছে জানার যেন বিন্দুমাত্র তাঁর স্পৃহা নেই। মোড়কটা তাঁর কোলের মধ্যে পড়ে আছে।

সুহাস প্রকৃতই বিধ্বস্ত। কে দিল! কার হাত। মুখার্জিদা কিছু বলছেন না। সে কথা বলতে গিয়ে দেখল, গলা বসে গেছে কেমন। সে গলা খাকরি দিল। গলা খুস খুস করছে। যেন গলার কফ আটকে আছে। কোনও রকমে গলা পরিষ্কার করে বলল, 'কে দিয়ে গেল?'

'জানি না। দেখতে হয় দ্যাখ্। এক্ষুনি ওটা আবার ফেরত নেবে।'

হাতে নিয়ে দেখতেও কেমন আতঙ্ক। কি দেখতে পাবে কে জানে!

সে কোনওরকমে হাত বাড়াল।

হাত তাঁর কাঁপছে।

মুখার্জিদা বললেন, 'বড্ড নার্ভাস দেখছি।'

তিনি নিজেই কাগজের মোড়কটা খুলে দেখালেন। সুহাস পাশের বাঙ্কে উবু হয়ে দেখতে গেলে বললেন, পাশে বোস। দেখেছিস, কেমন ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মুখ। এই দ্যাখ, হাতের কি নিপুণ কাজ। মাথার দিকে দুটো কব্জা লাগানো আছে। বাবরি চুল। পরে দেখাচ্ছি। বলে ভাঁজ করা মুখোসের সামনের দিকটা মুখে এবং পেছনের দিকটা মাথার পেছনে ফেলে তার দিকে তাকাতে থাকলেন। ঈশ্বরের পুত্র কে বলবে! চোখ দুটো যেন শীতল হয়ে গেছে। তার গা শির শির করতে থাকল। মুখার্জিদাকে কেন যে একটা দানবের মতো দেখাচ্ছে।

মুখার্জি মুখোসটা পরেই কথা বলতে থাকলেন, 'চার্লিকে গিয়ে দেখানো দরকার—এটাই কি না! চার্লির পোর্টহোলে উঁকি দিলে টের পাওয়া যেত এই মুখোশটা দেখেই সে ভয় পেয়েছিল কি না! এমনও তো হতে পারে ঘোরে পড়ে কিছু দেখেছেও! এমন তো হতে পারে, জাহাজে ওঠার সময়ই চার্লির কোনও আতঙ্ক ছিল। কোনও বুড়ো মানুষের আতঙ্ক।

সুরঞ্জন একা বোট ডেকে অপেক্ষা করছে।

গভীর রাত। পরিষ্কার আকাশ। অজস্র নক্ষত্রের ওড়াউড়ি আকাশে। পৃথিবী কেমন নির্জন হয়ে আছে। সমুদ্র আপন মহিমায় বিরাজ করছে চারপাশে। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে সব কিছু।

জ্যোৎস্নার এ হেন দৃশ্য দেখতে কার না ভাল লাগে। সুরঞ্জনেরও ভাল লেগে গিয়েছিল। সে ভুলেই গেছে মুখার্জিদার জন্য তার এখানে অপেক্ষা করার কথা। রেলিঙে ঝুঁকে সে সিগারেট খাচ্ছিল।

তারপর কেন যে মনে হল, এই চন্দ্রকিরণ জাহাজের সঙ্গে রওনা হয়েছে ডাঙার দিকে। কে একা পড়ে থাকতে পারে সফেন সমুদ্রে! কার ভাল লাগার কথা। জাহাজ যেখানে যাবে চন্দ্রকিরণও যাবে সেখানে।

তা হলে চল, আমরা তো ডাঙায় যাচ্ছি, তুমিও না হয় সঙ্গে থাকবে। না না, কোনও অসুবিধা হবে না। তারপরই সুরঞ্জন হেসে ফেলল। একঘেয়ে সমুদ্র-যাত্রায় জ্যোৎস্না, এবং সমুদ্রও যে বন্ধু হয়ে যায় সে টের পেল।

চিমনির আড়ালে সুরঞ্জন দাঁড়িয়ে আছে। সিগারেটটা সমুদ্রে টোকা মেরে উড়িয়ে দিল। তাকে রোজই এ-ভাবে আজকাল অপেক্ষা করতে হয়। আর একটা সিগারেটও শেষ। এখনও মুখার্জিদা কেন যে আসছেন না।

সবাই জানে সুরঞ্জনের বাক্যলাপ পর্যন্ত নেই মুখার্জিদার সঙ্গে। একসঙ্গে এ-জন্য মধ্যরাতে ডেকেও উঠে আসে না তারা। আগে পরে করতেই হয়, কে আবার দেখে ফেলবে। দেখে বলবে, বাজে কথা, দুজনকেই তো দেখলাম পাশাপাশি ডেকে হেঁটে যাচ্ছেন—কিংবা পিছিলেও দেখা গেছে। কেউ তো কাউকে এড়িয়ে চলছে না।

এই ক্যামোফ্লেজ কাঁহাতক রক্ষা করা যাবে তাও সে জানে না। কখন না, সামনা সামনি 'মুখার্জিদা শোনো' বলে ডেকে ওঠে। সতর্ক থাকতেই হয়। হয় মুখার্জিদা এসে এখানটায় অপেক্ষা করেন, নয় সে। অন্তত দুজনের দেখা না হওয়া পর্যন্ত একজনকে অপেক্ষা করতেই হয়।

শুধু পরিতে উঠে আসার সময় কে আগে যাচ্ছে, দরজার টোকা শুনলে টের পাওয়া যায়।

আজও ভেবেছে, মুখার্জিদা হয়তো আগেই উপরে উঠে গেছেন। মধ্যরাতের জাহাজ বড় বেশি একা। ডেকে কিংবা বোট ডেকে সামান্য হাঁটাহাঁটি করলেই টের পাওয়া যায়, কেউ কোথাও নড়ানড়ি করছে। তার এখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করারও হেতু থাকতে পারে না। কারও চোখে পড়লে, প্রশ্ন দেখা দিতেই পারে, এত রাতে বয়লার রুম থেকে উঠে আসা কেন! কি দরকার এখানটায়।

তাদের বসার জায়গা তিন নম্বর বোটের পাশটাতে। সে ইচ্ছে করলে সেখানে বসে অপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু মুশকিল, এতই আড়াল আবডাল যে বেশিক্ষণ বসে থাকা যায় না। কেউ দেখে ফেললে হৈ চৈ শুরু হয়ে যেতে পারে। ওখানটায় বসে এত রাতে কি করছিলে!

হঠাৎ তার ঘাড়ে একটা হাত চেপে বসল! সে খুব দ্রুত সরে দাঁড়াতে দেখল, মুখার্জিদা।

'ঘাবড়ে গেছিলি!'

'হঠাৎ যমুনাবাজু ধরে উঠে এলে। আমি তো গঙ্গাবাজুর দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছি!'

দুজনেই হামাগুড়ি দিয়ে বোটের আড়ালে চলে গেল। মুখার্জিদা চিমনির আড়ালে বোধহয় কোনও কথা বলতে চান না।

হামাগুড়ি দেবার সময়ই সুরঞ্জন বলল, 'খবর কি?'

'খবর ভাল না।'

'কাল যে বললে জাহাজের অন্তত একটা রহস্যের কিনারা করা যাবে মনে হচ্ছে। রহস্যটা টের পেলে পথ পরিষ্কার। সিঁড়িটা খুঁজে পাবে। খুব তো খুশি ছিলে। শিসও দিলে। এখন বলছ, খবর ভাল না।'

'কি করে খবর ভাল হবে বল! অর্বাচীন নির্বোধ হলে আমি কি করতে পারি। বলে তিনি হাঁটুর কাছে প্যান্ট টেনে একটু সহজ হয়ে বসতে চাইলেন। অর্বাচীন নির্বোধ না হলে বলে, আর ইউ গার্ল? ওকে কি আমি বলেছি, চার্লি বয় না গার্ল খোঁজ করতে! নিজের গলায় ফাঁস পরতে চাইলে আমি কি কবব! এটাই তো জাহাজেব সবচেয়ে বড় রহস্য! দুম করে বলে ফেললি, আর ইউ গার্ল! বল, রাগ হয় না! বললেই চার্লি স্বীকার করবে শি ইজ এ গার্ল! কখনও করে! এখন তো মনে হচ্ছে কিছুই করতে পারব না। চার্লি সতর্ক হয়ে যাবে না! কিংবা চার্লিকে যিনিই বাধ্য করেছেন, ছেলের পোশাকে থাকতে তিনি কি খবরটা পেয়ে যাবেন না।'

সুরঞ্জন হাঁটুর উপর হাত রেখে সামান্য কাত হয়ে শুল। কনুইতে ভর দিয়ে মাথা তুলে শুনছে। সে মুখার্জিদার কথাও বুঝতে পারছে না। চার্লি মেয়ে না ছেলে প্রশ্নটা আবার মাথায় পেরেক পুঁতে দিচ্ছে কেন তাঁর! এই না 'কলিজ' জাহাজের রহস্যটা খুব জটিল মনে হয়েছে! তা ছাড়া ছেলের পোশাকে থাকাটাও অস্বাভাবিক ভাবছে কেন। জাহাজে শুধু একজন মেয়ে আর সব দামড়া, বিশ বাইশ মাসে সব অমানুষ—অ্যানিমেল—টের পেলে বন্য হয়ে উঠবে না। ষাঁড়ের গুঁতোগুঁতি জাহাজে কত তুমি নিজেই জানো। সেই আতঙ্কেও ছেলে সাজিয়ে রাখতে পারে। এত সুন্দর দেখতে, কি ধারালো চোখ মুখ, আর পাতলা, যেন হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়—পাখি। হাঙরেরা টের পেলে পাখির ডানা ভেঙে দেবে সহজ কথা। তছনছ করে দেবে। ছিঁড়ে খুঁড়ে খেতে পারে।

সুরঞ্জন বলল, 'না, কিছু বুঝছি না! খবর ভাল না বলছ কেন! মগড়া যায়নি!'

'গেছে।'

'সুহাস দেখল!'

'দেখেছে।'

'কিছু বলল!'

'মগড়াকে সন্দেহ করছে।'

সুরঞ্জন উঠে বসল।

'মগড়াকে! কি যে বল! এত বুদ্ধু! মগড়ার সাহস হবে!'

'সাহস হবে না বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু—মগড়া তো বলছে না, কার কাছে মুখোশটা আছে! ও তো বলছে না, মুখোসটা সে পায় কোথায়! রাখে কোথায়। কিছু বললেই এক কথা, নিখোঁজ মুখোসটা নিয়ে জলে পড়ে গেছিলে—তাই দেখালাম। জাহাজেই আছে। জাহাজে থাক না থাক বড় কথা নয়। আসলে মুখোসটা পরে চার্লিকে অনুসরণ করবে কেন?'

'তোমার কি মনে হয়।'

'আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না। এটা ঠিক—চার্লি মেয়ে না ছেলে যদি কেউ প্রথম টের পায়, তবে

সে মগড়া। বাথরুম সাফসোফ আর কে করে। গঙ্গাবাজুর কেবিনগুলিতে সেই ভোরে কড়া নাড়তে পারে। চার্লি গঙ্গাবাজুতেই থাকে। মগড়া টের পেতেই পারে। ডেকটোপাজ ধরিয়া ওদিকে যায় না। বাথরুমে চার্লির অসতর্ক মুহূর্তে সে কিছু আবিষ্কার করে ফেলতে পারে।'

'সেটা কি?' সুরঞ্জন আর একটা সিগারেট ধরাবার সময় প্রশ্ন করল।

'কি, আমি জানি না। চেপে ধরতে হবে। কোথায় ধরা যায় বল্ তো। চিল্লাচিল্লি শুরু করে দিলে উপায় আছে! সে বলবে না, মুখার্জিবাবু বুলছে, আমি ছোটাসাহেবের কেবিনে ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছি! তিনি সাব না মেমসাব—আচ্ছা, আজব বাত বুলছে! হামার কি আর কৈ কামওম নেই।'

সুরঞ্জন কি বলতে গিয়ে থেমে গেল।

মুখার্জি বললেন, 'থেমে গেলি কেন?'

'না বলছিলাম, এ-বয়সে তো মেয়েদের পাছা ভারী হয়। বুক ঢেকেঢুকে রাখাও তো সহজ নয়।'

'পাছা ভারী না পাতলা, আমি হাত দিয়ে দেখেছি: না তুই! যা ঢোলা প্যান্ট শার্ট পরে—পাশ বালিশের খোল, মনে হয় গায়ে বস্তা চাপিয়ে রেখেছে। কার সাধ্য আছে পাছা ভারী না পাতলা, কে সন্দেহ করবে—বুকে দুটো কুসুম কলি ফুটছে।'

'ফুটছে মানে?'

'ফুটছে মানে, ফুটে উঠছে।'

'কত দিন এটা সম্ভব। তা-ছাড়া ধরো এই যে অসুস্থ—যদি ডাক্তার দেখায় সেখানে তো কারও কোনও জারিজুরি থাকবে না। ধরা পড়বেই।

মুখার্জির মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। ভাবল সুরঞ্জন ঠিকই বলেছে। কাপ্তানবয় এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারে। ইতিমধ্যেই আতঙ্কে পড়ে গিয়ে কিছু পাচার করে ফেলেছে। একটা ম্যাপ এবং কিছু বই। কিছু চিঠিপত্র। দুটো একটা রেখে বাকি সব ফেরত দিয়েছে। কাপ্তানবয়কে বুঝতেই দেয়নি, সব তিনি ফেরত দেননি। এখন সে-ই তাঁর বড় আড়কাঠি। সে-ই পাববে। কাপ্তান ঘরে না থাকলেও সে যখন তখন ঢুকতে পারে কেবিনে। কাপ্তানের একমাত্র অনুগত এবং বিশ্বস্ত। মানুষটি যে খুব খারাপ তাও না! ভাল মানুষই বলা চলে। তবে কিছুটা অর্থলিপ্সা আছে। তাতেই ফেরে পড়ে গেল। পাছে মুখার্জিবাবু থার্ডমেটের কানে লাগিয়ে দেয়—রসদঘর থেকে পেটি পাচার, সেই আতঙ্কে জো হুজুর হয়ে আছে। এখন তো আরও বেশি হাতের মুঠোয়। আভাসে ইঙ্গিতে বুঝিয়েও দিয়েছেন। যাবে কোথায়! এই যে বলে, চিঠিপত্র মেলে ধরলেই চুল খাড়া হয়ে যাবে। কাপ্তানের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র কার মারফত পাচার হল! আব এক সংশয়—এবং কাপ্তানবয় সে-ভয়ে কাবু।

'শোন, যদি জাহাজে ডাক্তার উঠে আসেন, তাঁর কাছ থেকে আমরা কিছু খবর-টবব চেষ্টা করলে পেয়ে যেতেও পারি। তবে কতটা সুবিধে হবে তাতে বুঝি না। প্রেসক্রিপসান, ওষুধ, এ-থেকেও ধরা যেতে পারে। অবশ্য ধরা যাবেই এমন কথা নেই। যিনি এত চতুর—তাঁর পক্ষে, কখনই ঢিলেঢালা কাজ করা সম্ভব নয়। তোর কাজ, জাহাজ লাগলে, কিনারায় সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়া। দ্বীপটায় জেটি নেই—জাহাজ বয়াতেই বাঁধা থাকবে। নৌকা ছাড়া পারাপারের আর কোনও সুযোগ নেই। জায়গাটা তোর প্রথমে চিনে রাখা দরকার। মানুষজন বলতে দ্বীপের কিছু বাসিন্দা। মাছের কিছু আড়ত আছে। কিছু স্টিমার লঞ্চ ভাড়া খাটে। আর সব নৌকা—উকন গাছের কাঠে তৈরি। আমাদের কঁড়ুই গাছের মতো দেখতে গাছগুলি। হয়তো কঁড়ুই গাছই—এরা উকন বলে। খুব শক্ত কাঠ। কাঠের গোলা আছে অনেকগুলো। পাকা রাস্তা। সমুদ্রটাকে ঘিবে রেখেছে। কোম্পানির নিজস্ব শহর এলাকায় রাস্তাটা ঢুকে গেছে। জীবিকা বলতে মাছ ধরা, না হয় ফসফেট কোম্পানির কুলি কামিনের কাজ। মানুষগুলো দেখতে বেঁটেখাটো, তামাটে রং। ভারতীয়দের সঙ্গে চেহারায় খুব মিল। তবে কাফ্রিদের মতো লোকজনও আছে। চাষ আবাদের অভ্যাস বিশেষ নেই।'

'কি খায় তবে?'

'পাশের দ্বীপগুলোতে চাষ আবাদ হয়তো হয়—দু-চার মাইল, কিংবা পাঁচ দশ কি আরও বেশি দূরে দূরে অজস্র দ্বীপ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তবে আমিও সব ভাল জানি না। জাহাজ ভিড়লেই নেমে

যাবি। নামলেই টের পাবি, নানা লোক কানের কাছে ফিসফাস কথা বলছে। জলদস্যুদের কথাও বলবে। তাদেরই বংশধর তারা—ঘরে নিয়ে যেতে চাইবে। জলদস্যুদের বংশলিপি থেকে কিছু নথিপত্রও গোপনে দেখাতে পারে। যদি প্রলুব্ধ করা যায়। কি সব হিজিবিজি লেখা—একটা বর্ণও উদ্ধার করা সম্ভব না, কি ভাষা তাও জানা যায় না। ঘুরতে গিয়ে গুপ্তধনের লোভে এ-ধরনের চক্রে পড়ে না যাওয়াই উচিত। জান-মান নিয়ে টানাটানি—সুযোগ পেলেই হল।'

'হেঁটেই ঘোরাঘুরি করা যাবে?'

'হেঁটেই পারবি। বন্দর এলাকাতে কিছু মানুষজনের ঘরবাড়ি, হোটেল। সাইকেল ভাড়া নিতে পারবি। টাট্টু ঘোড়ারও চল আছে। পয়সা বেশি খরচ করতে পারলে আরবি ঘোড়াও মিলতে পারে। দ্বীপের ভিতরে ঢুকে যাবার মুখে কিছু আস্তাবল আছে। সাইকেল চালাতে জানিস!'

'জানব না কেন?'

'জানলে ভাল। সাইকেলে কিছু অসুবিধাও আছে। দ্বীপের বন্দর এলাকাতেই সাইকেল নিয়ে ঘোরাঘুরি করা যায়। বেশি দূর যেতে পারবি না। ঝোপজঙ্গল, পায়ে হাঁটা পথ। উঁচু-নিচু এলাকা। পাথর আর পাথর। সমুদ্রের কাছাকাছি জায়গাগুলিতেই কিছু বসতি আছে। সবচেয়ে সুবিধা ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে পারলে।'

দ্বীপটাব এত বিববণ কেন দিচ্ছেন মুখার্জিদা সুরঞ্জন বুঝতে পাবল না। জীবনেও ঘোড়ায় চড়েনি। এমনকি কখনও ঘোড়া দেখলেই মনে হয়েছে, হয় কামড়ে দেবে, না হয় লাথি মেরে ভুঁড়ি ফাঁসাবে। ঘোড়া গরু ষাঁড় তার কাছে সমান। সাইকেলই নিরাপদ। বন্দর ছেড়ে আর যাবেই বা কোথায়।

'তুমি দ্বীপটা ঘুবে দেখেছ?'

'দেখেছি। আবার দেখিওনি।'

'সাইকেলে?'

'না। ঘোড়ায় চড়ে বসতে পারলে কোনও ভয় থাকে না। প্রথম প্রথম, ওরা সঙ্গে লোক দেয়। পরে কিছুটা অভ্যাস হয়ে গেলে, বেশ মজা। একা একা যত দূরেই যাও, কেউ দেখার নেই। তবে গাঁয়ের কাচ্চাবাচ্চারা ঝামেলা পাকায়। ঘিরে ধরে। ক্যাপস্তান, ক্যাপস্তান বলে চিৎকার—কান ঝালাপালা করে দেবে। পয়সা চাইবে। রুটি চাইবে। উলঙ্গ। ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে পেট শ্রীঘট।'

'সুন্দবীদের দেখা পাওয়া যাবে না?'

সুরঞ্জন দ্বীপটার কথা শুনে সুন্দবীদের কথা না ভেবে পারেনি। পাথর, পাহাড়, কচ্ছপ আর নানা জাতেব পাখির ওড়াউড়ি—তার ভিতর কোনও জঙ্গলে, কোনও কুটির নির্মাণ করে যদি কেউ থেকে যায়—কে জানে, কে আছে। মুখার্জিদা ঘোড়ায় চড়ে কি খুঁজে বেড়াত।

মুখার্জিদা কোনও উচ্চবাচ্য করছেন না। সুন্দরীদের কথায় বিরক্ত হতে পারেন। এত লঘু করে দেখলে হবে কেন। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় সুন্দরীদের কথা আসে কি করে!

'আরে কি হল! কথা বলছ না কেন?' সুরঞ্জন কনুইতে গুঁতো মারল মুখার্জিকে।

'আরে আমি ঠাট্টা করলাম। আচ্ছা বলো, আমরা কি ভাল আছি! মেজাজ খিঁচে থাকলে কি করব। উটকো এক ঝামেলায় আবার জড়িয়ে পড়ছি। সুন্দরীদের কথা ভাবলে মন হালকা হয় বোঝোই তো। বলো কি বলছিলে?'

না, কোনও কথা না। মুখার্জি কাত হয়ে বোট ডেকে শুয়ে আছেন। একেবারে গুম মেরে গেছেন।

'আচ্ছা বাবা দোষ হয়েছে।' বলে সুবঞ্জন মুখার্জির সামনে হামাগুড়ি দিয়ে চলে গেল। বলল, 'যা যা বলছ সবই তো করছি। এত টেনশান আর কাঁহাতক সহ্য হয়। চার্লি মেয়ে এই এক টেনশান, জাহাজ কবরে যাচ্ছে এই এক টেনশান। বংশীদার পাগলামি বেড়ে যাচ্ছে—জাহাজ কবে দেশে ফিরবে কে জানে! তার উপব আমরা যেন সত্যি কেউ খুন হতে যাচ্ছি। মুখোস তো তাড়া করছেই। 'কলিজ' জাহাজ আর এক বাঁশ।

সুরঞ্জন হঠাৎ যেন মুখার্জিকে কোনও সূত্র ধরিয়ে দিচ্ছে, "আচ্ছা দাদা, ম্যাকের ব্যাপারটা দুর্ঘটনা ভাবতে পারছ না! পারলেই নিশ্চিন্তি। মুখোস টুখোস বাজে ব্যাপার। কেউ অনুসরণকারী, বাজে

ব্যাপার। তোমার মাথায় দুশ্চিন্তাও থাকে না তা হলে, ডেরিক কে তুলে রাখল, কে খুন করল—ভুল-ভালও তো হতে পারে! ভুলে ডেরিক হয়তো নামনোই হয়নি! লজঝরে জাহাজের কোথায় নিরাপদ বলো! আজ এটা ভাঙছে, কাল ওটা খুলে যাচ্ছে—ডেরিক মাথায় ভেঙে পড়তেই পারে। এই তো শুনলাম বয়লার চকও নাকি কিছুটা বসে গেছে। কোন্‌দিন যে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে সব! দাও, জাহাজটাতে আগুন লাগিয়ে—ভূতের গুষ্টিসুদ্ধ পুড়ে মরুক। বংশীদা ঠিকই বলে, আগুনের কাছে সব ভূত জব্দ।

'থাম্!' মুখার্জিদা গম্ভীর গলায় বললেন। 'ভূতের কোনও দায় নেই, ভূতের মাথাও পরিষ্কার না। সে কারও অনিষ্ট করে না। ভয়টা মানুষ ভূতের। ভয়টা গুজবের। গুজবের কানমাথা থাকে না। গুজব শুনতেও ভাল লাগে, বিশ্বাস করতেও ভাল লাগে। অলৌকিক হলে তো কথাই নেই! ভিতরের দিকে ঢুকে সেবারে বি-সেভেনটিন বোমারু বিমানও দেখলাম একটা। পড়ে আছে। গোঁত্তা খেয়ে ভেঙে পড়ে আছে। দ্বীপের লোকেরা বলল, দুষ্ট হাওয়ার কাজ।'

সুরঞ্জন ফের একটা সিগারেট ধরাল। সে উত্তেজনা বোধ করছে। কিছুই তো জানে না। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের এই সব এলাকায় সে আসেওনি। দুষ্ট হাওয়ার কথাও কখনও শোনেনি।

'খাবে নাকি।' বলে একটা সিগারেট মুখার্জিদার দিকে এগিয়ে দিল। তারপর বলল, 'আমরা কি তবে দুষ্ট হাওয়ার চক্রে জড়িয়ে পড়ছি!'

'কি জানি! তোর মাথায় তবু যা হোক সুন্দরীরা নাচানাচি করে। আমার তো শালা সুহাসের কথা ভেবে ঘুমই আসে না। কেউ দ্বীপে মরে পড়ে আছে, তা দুষ্ট হাওয়ার কাজ। হয়ে গেল! না আছে পুলিশ, না আছে প্রশাসন বলতে কিছু—কিছু হলে তার কৈফিয়তও কেউ তলব করবে না।' তারপর সিগারেট ধরিয়ে মুখার্জি বললেন, 'মুশকিল কি, কেউ অবিশ্বাস করবে না। বিমানটা দেখে আমারও মনে হয়েছে, হতেও পারে। মনে হয় ইভিল উইন্ডস সত্যি হয়তো আছে। ভাঙা বিমানটার গায়ে দেখলাম, আলকাতরা দিয়ে লেখা—হয়তো বিমানের ক্রু এবং পাইলট অলৌকিক উপায়ে বেঁচে গিয়েছিলেন—বিমানের গায়ে লিখে রেখেছেন—ইট ওয়াজ দ্য ব্ল্যাকেস্ট অফ ব্ল্যাক নাইটস—দ্য ওয়ার্স্ট ইভিল ওয়েদার আই হ্যাভ এভার সিন ইন মাই লাইফ।'

'দ্বীপবাসীরা মড়ক লাগলে ভাবে না তো দুষ্ট হাওয়ার কাজ!'

'ভাবে। যেমন যুদ্ধের সময়টায় তারা দুষ্ট হাওয়ার কবলেই পড়ে গেছে এমন ভাবত। যারা বেঁচে আছে তারা তো তাই বলে—ঘোস্ট অফ ওয়ার। যুদ্ধের সব ভূতেরা দ্বীপের যেখানে সেখানে লুকিয়ে পড়েছে এমনও ভাবে।' বলে মুখার্জিদা হুস করে সিগারেটে জোর টান দিলেন একটা।

সুরঞ্জন বলল, 'যুদ্ধের ভূত জঙ্গলে দেখেছ?'

'দেখেছি! তবে জঙ্গলে নয়। সমুদ্রে। অতল জলে সে ফুটে আছে।'

'দেখতে কেমন?'

'একটা ফুলের মতো!'

'কি বলছ?'

যা দেখেছি তাই তো বলব। বানিয়ে বলে কি লাভ! দ্বীপটার বেলাভূমি জুড়ে এখানে সেখানে অদ্ভুত সব ছোট ছোট পাহাড় আছে। একেবারে গ্র্যানাইট পাথরের পাহাড় মনে হবে। সমুদ্রের জল থেকে ভেসে উঠছে, আবার জোয়ার এলে ডুবে যাচ্ছে। পাহাড়ের খাঁজে সমুদ্রের জল ভারী স্বচ্ছ। পঞ্চাশ ষাট ফুট গভীরে বিমানের একটা মুণ্ডু দেখেছিলাম। ককপিট নানা রঙের স্পঞ্জে ঢেকে গেছে। মনে হয় গভীর জলে পাহাড়ের গোড়ায় সবুজ লাল নীল একটা ফুল ফুটে আছে। না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না যুদ্ধের ভূত সমুদ্রের নিচে কত সব কুহেলিকা সৃষ্টি করতে পারে! দ্বীপের মানুষ জন—এই সব দেখিয়ে পয়সা-টয়সাও চায়।

সুরঞ্জন বলল, 'যুদ্ধের ভূত বলছ কেন? ভূত আসে কোত্থেকে। যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ বলো।'

'সব দেখার পর ঘোস্টস্ অফ ওয়ার না বললে যেন দ্বীপগুলিকে ছোট করা হয়।' মুখার্জি দু-হাত উপরে তুলে বললেন, 'মারাত্মক সব দৃশ্য। দ্বীপের যত্র-তত্র ভাঙাপোড়া সব মিলিটারি ছাউনি।

দ্বীপটার চারপাশে বিশাল বিশাল এয়ার স্ট্রিপ অক্টোপাসের মতো ছড়িয়ে গেছে। মরা এয়ারস্ট্রিপ ধরে দূরের বন-জঙ্গলে সহজে হারিয়ে যাওয়া যায়।'

সুরঞ্জন বলল, 'যুদ্ধ তো কবেই শেষ। বারো চোদ্দ বছরের কথা। এয়ারস্ট্রিপের আশপাশে মানুষজনের বসতি গড়ে ওঠেনি!'

'কোথাও উঠেছে, কোথাও খাঁ খাঁ করছে সব। যতদূর চোখ যায়, রেন ফরেস্ট, কোথাও পাহাড়ি ক্যাকটাস। কোথাও কোনও প্যালিকান পাখি আবার উড়ে এসে ঘরবাড়ি বানাবার চেষ্টা করছে।'

'প্যালিকান পাখি দ্বীপে নামলে দেখতে পাব!'

'তা জানি না। তবে দেখা যায়। বড় বড় কচ্ছপও দেখতে পাওয়া যায়। সব দ্বীপে নয়। কোনও কোনও দ্বীপে। প্রাগৈতিহাসিক জীবেরাও ঘোরফেরা করে। সব শোনা কথা।'

দুজনই চুপচাপ। কেউ আর কথা বলছে না।

মুখার্জি নীরবতা ভেঙে বললেন, বিশ্বাসই করা যায় না, এই সেদিন এখানে যুদ্ধের তাণ্ডব চলছিল। দ্বীপগুলিতে কামানের গর্জনে কান পাতা যেত না। সব এখন অতীতের গর্ভে। দ্বীপের লোকজন যে যার মতো যুদ্ধশেষে যেখানে যা পেয়েছে, বাড়ির সামনে ডাঁই করে রেখেছে। গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন। তবু মানুষ হারিয়ে যায় না। বেঁচে থাকে। ঘরে ঘরে ইস্পাতের হেলমেট। তাতে খাবার জল ধরে রাখে কেউ। কেউ বাসন-কোসনের মতো ব্যবহার করে। মৃত সৈনিকদের পরিত্যক্ত হেলমেট ভূতের কথা বড্ড বেশি মনে করিয়ে দেয়। সামান্য জনবিরল জায়গাতেই অন্ধকারে গা ছমছম করে। মনে হয় জঙ্গল থেকে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে আসছে কেউ। যুদ্ধের বিভীষিকা সহজেই গ্রাস করতে পারে। সতর্ক থাকা ভাল।

তারপর ফের দুজনেই চুপ হয়ে গেল। কেমন কঠিন হয়ে উঠছে দুজনেরই মুখ। নিরাপদ নয় তারা কেন যে এমন ভাবছে। পরির কথা মনে থাকল না। সমুদ্রের সোঁ সোঁ গর্জন আর ইনজিনের শব্দ মিলে কেমন সব ভুতুড়ে গোলমালের সৃষ্টি হচ্ছে মাথার ভিতর।

অগত্যা সুরঞ্জনই বলল, 'আচ্ছা মগড়াকে সত্যি সন্দেহ করা যায়!'

'যেতে পারে। মাপজোকের হিসাবে কোনও গোলমাল নেই। মাঝারি হাইটের মানুষের পক্ষেই সম্ভব রেলিঙের উপর উঠে ঝুঁকে পড়া। পোর্টহোলের মুখোমুখি হতে গেলে মাঝারি হাইট না হলে অসুবিধা আছে। চার্লির পোর্টহোলে গিয়ে দাঁড়ালে এটা বোঝা যায়। তবে এটাও সংশয়, মগড়া যাবে কেন? যদি যায়ই, ধরে নেওয়া যাক, গন্ধ শুঁকে টের পেয়ে গেছে, কৌতূহল কিংবা আবিষ্কার, যাই ভাবিস, সে যদি ধরা পড়ার ভয়ে মুখোস পরে যায়ই—তা সে সামান্য বোতলের লোভে ফাঁস করবে, বিশ্বাস করতে মন চায় না। বোতলের লোভে এমন আহাম্মকের মতো কাজ করতে পারে—নিজের বিপদের কথা ভাববে না!'

'তাও বটে!' সুরঞ্জন পায়ের নখ খুঁটছে।

আবার দুজনেই চুপ। কেউ কোনও কথা বলছে না। সমুদ্রের জ্যোৎস্নায় জাহাজ ভেসে যাচ্ছে।

সুরঞ্জন সহসা কি ভেবে বলল, চার্লির অনুসরণকারীর কথা কি মগড়া জানে! মানে চার্লি তার পোর্টহোলে মুখোস দেখতে পায়, মগড়া কি জানে?'

'জানলে উঁকি দিতে সাহস পায়! চার্লি জানেই না ওটা মুখোস। ওর ধারণা কোনও বুড়ো মানুষ তার পিছু নিয়েছে। পোর্টহোলে উঁকি দিচ্ছে। মগড়া ধরা পড়ে না যায়, মুখোসটা পরে উঁকি দিতে পারে। মেয়ে মানুষের গন্ধ—ঠিক থাকে কি করে! টের পেলে মগড়া কেন, জাহাজসুদ্ধু চার্লির পোর্টহোলে ঢুকে যেতে পারে। মগড়াকে দোষ দিয়ে কি লাভ! যেতেও পারে, নাও পারে। গেছে তার প্রমাণ কোথায়! মুখোসের খোঁজ দিয়েছে বলে, সে-ই অনুসরণকারী কিছুতেই প্রমাণ হয় না।'

সুরঞ্জন বলল, 'তা অবশ্য ঠিক।'

মুখার্জি কোনও সাড়া দিল না।

খুব সকালে জাহাজিরা যে যার মতো উঠে পড়েছে। রেলিঙে ঝুঁকে আছে। চিৎকার কিনারা দেখা যাচ্ছে—চেঁচামেচি।

সবার ঘুম ভেঙে গেল। কেউ আর নিচে থাকতে পারেনি। যেন কতকাল শুধু জল আর জল—ডাঙা দেখার আকর্ষণ কি গভীর এদের চোখে মুখে তা বড় বেশি প্রকট। দ্বীপের ছড়াছড়ি, একেবারে গা ঘেঁসে যাচ্ছে জাহাজ—গাছাগাছালি সব চোখে পড়ছে। কোনও দ্বীপে ঘন সবুজ অরণ্য। অথবা কোনও দ্বীপে পাথরের খাড়া পাহাড়—যেন এই মাত্র সমুদ্রে ডুব দিয়ে উঠেছে দ্বীপটা। আকাশ মেঘলা। শেষ রাতে দু এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে। ফল্কার ত্রিপলে ছোপ ছোপ জলের দাগ লেগে আছে এখনও। আর অজস্র পাখির ওড়াউড়ি। ঢেউয়ের মাথায়ও পাখিরা নাচানাচি করে বেড়াচ্ছে।

এ-ভাবে সাত আটটা দ্বীপ জাহাজ দু-পাশে ফেলে রেখে এগিয়ে গেল। দ্বীপগুলিতে কোনও বসতির চিহ্ন চোখে পড়েনি। তবে রাতের বেলা হলে জাহাজিরা টের পেত বসতি আছে কি নেই। দ্বীপে আগুন জ্বলত। ঘরবাড়ি থাকলে জঙ্গল ফুঁড়ে আলো ভেসে উঠত। কাজেই মানুষজন থাকতেও পারে নাও পারে। জঙ্গলের ভিতর যে বাড়িঘর বানিয়ে লোকালয় গড়ে ওঠেনি কে বলবে! এমন সুন্দর নির্জন নিরিবিলি দ্বীপে মানুষের চিহ্ন থাকবে না হয়। যেন জাহাজের যে কেউ সুযোগ পেলে নেমে পড়ত। জাহাজে আর ফিরত না। বন্দিজীবন—কাঁহাতক আর ভাল লাগে। সমবয়সী কোনও নারী আর শস্যক্ষেত্র কিংবা মিষ্টি জলের হ্রদ থাকলে তো কথাই নেই। মানুষের এর চেয়ে বেশি কিছু লাগে না।

চার্লিও ডেকচেয়ারে বসে আছে। সে চোখে দূরবীন লাগিয়ে দ্বীপগুলি দেখছে। দেখাই স্বাভাবিক—কি দেখছে, সুহাস অবশ্য বুঝতে পারছে না। ছুটেও যেতে পারছে না—তার প্রতি মুখার্জিদা থেকে প্রায় সবারই কম বেশি নজব। তা ছাড়া চার্লি যদি সত্যি মেয়ে হয়—সে তো কোনও মেয়ের সঙ্গেই কখনও ঘনিষ্ঠ হয়নি। এত কথাও কেউ তার সঙ্গে বলেনি। কি করে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে হয় তাও ভাল জানে না। ভাবতে গিয়ে সত্যি সে বিপাকে পড়ে গেল।

আচ্ছা মেয়ে হলে চার্লি বলত না! এত কথা বলে, সে তার আসল পরিচয় যে লুকিয়ে রেখেছে তাই বা বলবে না কেন! পছন্দ অপছন্দ সব কথাই বলে। সে তো ভেবেই পায় না, কেন অস্বীকাব করবে সে মেয়ে নয়। অথচ মুখার্জিদা এক এক করে যে-ভাবে বলে যাচ্ছেন, সব প্রায় ঠিকঠাক ফলে যাচ্ছে। এটা যদি সত্যি হয়! কারও চাপে সে আত্মপ্রকাশ করতে পারছে না। সে তো কোনও ক্ষতি করেনি তার। ক্ষতি করতেও পারবে না। জীবন সংশয় হলেও না। কি যে আছে চার্লির মধ্যে ভেবে পায় না। কিশোরী সে। তার শরীর শিরশির করছিল ভাবতে গিয়ে। ইচ্ছে হচ্ছিল, ছুটে চলে যায়, যে যাই বলুক, তাতে তার কিচ্ছু আসে যায় না। চার্লি তার কোনও ক্ষতি করতে পারে সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না। এই একটা ধন্ধ ঢুকিয়ে দিয়েছে।

তবে অকারণে যাওয়াও যায় না। গ্যালিতে চর্বি ভাজা রুটি হচ্ছে। তার গন্ধ ছড়াচ্ছিল। চা যে যার কাপে ঢেলে নিচ্ছে। সুরঞ্জন তাকেও এক কাপ চা দিয়ে গেছে। ডাঙা দেখলেই এত উত্তেজিত হয়ে পড়ে, আর দেশে ফিরে গেলে কি না জানি হবে! দূর থেকে চোখে ভেসে উঠবে নদীনালার দেশটা—ঢাকের বাদ্যি বাজতে শুরু করবে ভিতরে।

ঢাকের বাদ্যি এখনও কম বাজছে না। কাজের নামে বেব হয়ে পড়া গেলে বাঁচা যেত। ঘড়ি দেখল—সে ইচ্ছে করলে কাজের অছিলায় কশপের কাছে চলে যেতে পারে—সাবেঙ তাকে বলে দিয়েছেন, ফোর্থ-ইনজিনিয়ারের সঙ্গে মেরামতির কাজ করতে হবে। কোথায় করতে হবে জানে না।

চার্লি এখনও কিছু বলছে না। জাহাজ থেকে চার্লি নেমে যেতে পারবে কিনা, তার শরীর ভাল নেই, অসুস্থ—নাও নামতে পারে। একা একা দ্বীপে ঘুরতে তার ভাল লাগবে না। সুরঞ্জন কিংবা মুখার্জিদা তাকে আজকাল সঙ্গেও নিতে চান না। খারাপ জায়গায় গিয়ে তোর কি হবে! আমরা খারাপ জায়গায় যাচ্ছি। মুখার্জিদা আসলে তাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যই বাহানা সৃষ্টি করেন। চার্লির সঙ্গে ঘোরাফেরায় বাবুর রাগ।

রাগ কি এক কারণে! মুখার্জিদার কোনও কথাই গ্রাহ্য করছে না। মুখোস পরেও যেতে রাজি হয়নি। মুখার্জিদা খুবই গুম মেরে গেছেন। দরজা বন্ধ করে ফোকসালে কি যে সারাদিন করে! দরজায় কড়া নাড়লে, বিরক্ত হন। তার সঙ্গে কথা বলাও প্রায় যেন বন্ধ। মগড়াকে নিয়ে পড়েছেন। মগড়া মুখোস পরে সত্যি পোর্টহোলে উঁকি দিয়েছে কিনা, তা অবশ্য এখনও জানা যায়নি। কিংবা গেলেও

তিনি চেপে গেছেন। চার্লিকে বললে হত, তুমি একদম ভয় পাবে না। মগড়ার মাথা খারাপ আছে। তারই কাজ।

তারপর ভাবলেই সে কেমন গুটিয়ে আসে। কোনও ষড়যন্ত্রের শিকার সত্যি যদি সে হয়। চার্লি জেনেশুনে তাকে জড়াবে না, সে তো বলল, তুমি যাও সুহাস। তোমাকে আর জড়াতে চাই না। মুখার্জিদাকে বলবে কিনা বুঝতে পারল না। জড়াতে চাই না কথাটা তো ভাল না। বিপদের গন্ধ আছে কোথাও।

বিকেলে জাহাজ নোঙর ফেলে দিল। বাঁধাছাঁদার কাজও শেষ। সে লাফিয়ে নেমে যাচ্ছে। দড়ির সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে গেল। চার্লি আগেই রেডি। সে নেমে গেছে। দুপুরে কত কথা হল—এখানে কোথায় আস্তাবল আছে—ঘোড়া আছে—ইচ্ছে করলে সে চার্লির সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে দ্বীপটা ঘুরে দেখতে পারে।

'ঘোড়া!'

'হ্যাঁ কেন। তুমি অবাক হচ্ছ কেন!'

'আমি ঘোড়ায় চড়ে বেড়াব। পড়ে মরি আর কি!'

'সে দেখা যাবে।'

চার্লি আর কোনও কথাই তার শুনতে চায়নি। চার্লি অসুস্থ, অসুস্থ শরীর নিয়ে ঘোড়ায় চড়া ঠিক হবে না শুনে ক্ষিপ্ত। 'আমি অসুস্থ, কে বলেছে!'

'বারে কেবিন থেকে বের হলে না, চুপচাপ কেবিনে শুয়ে থাকলে তিন-চারদিন। কিছু না-হলে কাজে বের হতে না।

'আমার কিচ্ছু হয়নি।' বলে ফিক করে হেসে ফেলেছিল। জামা প্যান্ট অভ্যাসবশে একটু বেশি টানাটানি করছিল চার্লি।

সারেঙসাব ঝুঁকে চিৎকার করে উঠলেন, 'এই কোথায় যাচ্ছিস! কখন ফিরবি। মুখার্জিবাবু জানে!'

চার্লি নৌকায় টাল সামলাচ্ছিল। দেশি নৌকা, পাটাতন নেই। দুজন লোক, খালি গা, মাথায় ক্যাম্বিশের টুপি—পরনে হাফ-প্যান্ট, তালিমারা, তামাটে রঙের, চুল কোঁকড়ানো এবং ঠোঁট ভারী, ওরা বৈঠায় চাড় দিচ্ছে। জাহাজের নিচে অপেক্ষা করছিল, কেউ যদি যায় কিনারায়।

চার্লি বুকে হাত রেখে কি ইশারা করল সারেঙকে। যেন বলতে চাইল, আমার সঙ্গে যাচ্ছে। কোয়ার্টার মাস্টারকে বলে দেবে। তারপর দেখা গেল অধীর, কেষ্ট, ছুটে এসে ঝুঁকে পড়ছে, 'কোথায় যাচ্ছিস!'

'জানি না।' সুহাস হাত তুলে বলল।

ক্রমে নৌকা দূরবর্তী হচ্ছে। চারপাশে টাগবোট আর দেশী নৌকা। কিনারায় দুটো মোটরবোট এগিয়ে যাচ্ছে। গ্যাঙওয়েতে সিঁড়ি না ফেলতেই ওরা নেমে যাওয়ায় সবাই অবাক। দড়ির সিঁড়ি ধরে নামা যায় সহজেই। পিছিলে কেউ আগেই নেমে গেছে। সে কে?

মুখার্জি খবরটা পেয়ে ছুটে এলেন উপরে—'কি বলব বলুন', সারেঙসাবের দিকে তাকিয়ে হতাশা প্রকাশ করলেন।

সারেঙসাব বললেন, 'বাড়িয়ালা কেন যে এত আসকারা দিচ্ছে ছোটসাবকে বুঝি না। জাহাজে বাঁধাছাদার কাজ তো ভালভাবে শেষও হয়নি—দড়ির সিঁড়ি কে লটকে দিল পিছিলে!'

মুখার্জি বুঝলেন, সুরঞ্জনদের কাজ। তার নেমে যাবার কথা। কখন গ্যাঙওয়েতে কাঠের সিঁড়ি নামানো হবে, সে আশায় সে বসে থাকেনি। কিছুটা যেন নিশ্চিন্ত হলেন। বন্দর এলাকা খুব বড় নয়, ঘিঞ্জিও নয়। ফসফেট ছাড়া আর কিছু বাইরে যায় বলেও হয় মনে হয় না। নারকেলের ছোবড়া কিছু যায়। ছোট ছোট টাগবোট ভর্তি করে লঞ্চ টেনে নিয়ে যায় পাশের কোনও দ্বীপে। শহর বন্দর সবই আছে—জেটিও আছে সেখানে। দ্বীপটা বোধ হয় খুব দূরেও নয়। শহরটার নাম মাদাঙ, দ্বীপের নাম কি যেন—মনে আসছে না—তারপরেই মনে পড়ল, বাগবাগ দ্বীপ, স্থানীয় লোকেরা বাগবাগে যায় চাল আটা ময়দা চিনি কিনতে। এখানেও পাওয়া যায়, তবে মাঙ্গা। বাগবাগ থেকেই দ্বীপের বাসিন্দারা

সস্তায় সব কিছু কিনে আনে। নৌকা ভর্তি মাছ নিয়ে যায়। নানা কিসিমের মাছ। মাছের বদলে তারা চাল আটা ময়দা চিনি এমন কি জামাকাপড় জুতো তুলে আনে। সকাল সন্ধ্যায় লঞ্চ ছাড়ে। অবশ্য চার পাঁচ বছরে অনেক কিছু বদলে গেছে। লোকজন বেড়েছে। মোটর বোট সংখ্যায় তো অনেক। মোটর বোট কিংবা স্টিমারে মাদাঙ যাওয়া যায়—

জাহাজ টাল খাচ্ছে না—কারণ দ্বীপের ছড়াছড়ি বলে, সমুদ্রের ঢেউ বেশি মাথা তুলতে পারে না। আর প্রবাল প্রাচীরে ধাক্কা খেতে খেতে ঢেউয়ের ক্ষমতা খর্ব হয়ে যায় বোধ হয়।

এসব ভাবতে ভাবতে মুখার্জির মনে হল, তিনি খুবই ঠকে গেছেন। কাপ্তানবয়ের কথা তবে ঠিক নয়। চার্লির তো বের হবার কথা না। অসুস্থ। তারপর কেন যে সহসা তিনি খুশি হয়ে উঠলেন, বোঝা গেল না। শিস দিতে দিতে নিচে নামার সময় দেখা গেল অধীরের সঙ্গে। অধীর বলল, নেমে গেল—ছোঁড়ার ভয়ডর নেই দেখছি। তিনি তাঁর জবাব না দিয়ে পাশ কাটিয়ে গেলেন। যেন নিশ্চিত জেনে গেছেন কিছু এবং তখনই তার মন বিমর্ষ হয়ে গেল। গাধাটাব বুদ্ধিসুদ্ধি কম। কি না আবার ঝামেলা পাকায়। তবে চার্লি যতক্ষণ কাছে থাকবে—কোনও বিপদের আশঙ্কা থাকতে পারে বলে তিনি মনে করেন না। কি ভাবে তিনি আর নিচে না নেমে সোজা ডেক পার হয়ে মেসরুম-মেটদেব আস্তানায় উঁকি দিলেন। দরজায় উঁকি দিয়ে দেখলেন, না, কাপ্তানবয় ঘরে নেই। কাপ্তানের ঘরে যদি যায়, অপেক্ষা করতে হবে।

কি ভেবে ইতস্তত এলিওয়েতে ঢুকতে গিয়ে মনে হল, কোথাও থেকে তেল জুট পোড়া গন্ধ আসছে। ধোঁয়াও দেখতে পেলেন নিচে—কোল-বাঙ্কারে। এখন তো কারও ডিউটি নেই বাঙ্কারে। ডিউটি থাকলেও তেল জুট পোড়া বিশ্রী গন্ধ উঠবে কেন! সিঁড়ি ধরে বাঙ্কারে ঢুকে অবাক। বংশী। চুপি চুপি কয়লার বাঙ্কারে ঢুকে তেল জুটে আগুন লাগিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন—'কি করছিস! মরবি নাকি!' ঠেলে সরিয়ে দিলেন তাকে। বাঙকারের বাইরে বের করে বেলচায় চেপে তেল-জুটের আগুন থেঁতলে দিলেন। চেঁচামেচি করলেন না—কারণ লোকজন জড়ো হলে কেচ্ছা। বংশী কি চায়, সবাই পুড়ে মরুক। সে কি সত্যি জাহাজটাতে কয়লার বাংকারে আগুন ধরিয়ে দেবার কথা ভাবছে!

কি যে করা! বংশীকে চোখ রাঙিয়েও লাভ নেই। কিছুটা তোষামোদের গলায় বললেন, 'তোরা সবাই মিলে পাগলামি করলে, কি করি বলত! আয়। ছেলেমানুষী করিস না। কত বড় বিপদ হতে পারত বুঝিস। কয়লার গ্যাসে আগুন ধরে গেলে রক্ষা আছে! কেউ বাঁচবে!'

বংশী কোনও কথার জবাব দিল না। সে সিঁড়ি ধরে উঠে গেল। যতক্ষণ না বংশী পিছিলে উঠে গেল তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন। সুরঞ্জনের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার। এ তো একেবারে সত্যি খেপে গেছে! পরিণতির কথা ভাবল না। আর তখনই কাপ্তানবয় নেমে এসে বলল, 'মুখার্জিসাব, অসময়ে।'

'শোনো।'

কিছুটা আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'চার্লি কি সত্যি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল!'

'জি সাব।'

'জি সাব রাখো। কি হয়েছিল বল তো!'

'তা বলতে পারব না। কোমরের নিচে হটওয়াটার ব্যাগ নিয়ে শুয়ে থাকত। ব্যথায় কাতর মুখ। কাপ্তান, মাথায় হত বুলিয়ে দিচ্ছেন। শুধু বলছেন, চাইল্ড। মাই চাইল্ড। আর তো কিছু জানি না।'

'এক্ষুনি তো বের হয়ে গেল! কাপ্তান জানে!'

'জানে। বলেই গেছে। সুহাস সঙ্গে যাবে শুনেই বললেন, যাও। বেশি রাত কোব না। সরাইখানায় ঢুকে মাছাভাজাটাজা খেতে বারণ করলেন।'

ইস্ তাঁরও ভুল হয়ে গেছে। সুহাসকে সতর্ক করে দেওয়া উচিত ছিল। অভিজ্ঞ জাহাজিরা জানেন। বন্দরে নামলেই দু-পাশে নানা কিসমের সরাইখানা, লম্বা লম্বা তাজা মাছ ঝুড়িতে। লাফাচ্ছে। যে কোনও একটা চাইলেই আস্ত ভেজে দেবে। টেকচাঁদা মাছ খুবই সুস্বাদু। বড় বড় গলদা চিংড়িও পাওয়া যায়। তবে মুশকিল টেকচাঁদা মাছ কম সরাইখানাতেই পাওয়া যায়। শোলের পোনার মতো দেখতে লম্বা লাল বেলেমাছও পাওয়া যায়। তাও সুস্বাদু। তবে পয়সার লোভে বিষাক্ত মাছও এরা ভেজে দেয়।

তা সামান্য দাস্ত বমি পরে হলে, কি খেয়ে হয়েছে, বোঝা মুশকিল—সেই ভেবেই চালিয়ে দেওয়া। যারা জানে, তারা ঠিকই ধরে ফেলে। সুহাসকে বলে দেওয়া উচিত ছিল, মাছভাজার গন্ধে মজে যাস না। বরফঘরের বাসি পচা মাংস খেয়ে খেয়ে কিনারায় নামলে মেজাজও ঠিক রাখা যায় না। লোভে পড়ে যেতেই হয়। টাটকা মাছভাজার গন্ধ—মাথা ঠিক রাখা দায়।

যাঁরা জানেন, সঙ্গে একটি রুপোর কয়েন রাখেন।

কয়েনটি ছুঁড়ে দাও মাছে, মাছ বিষাক্ত হলে কয়েনটি সঙ্গে সঙ্গে নীল হয়ে যাবে। অন্তত খুব বিষাক্ত মাছের ক্ষেত্রে এটা ঘটবেই।

তাহলে কি ধরে নিতে হবে, চার্লি যতক্ষণ সুহাসের সঙ্গে আছে নিরাপদ! ম্যাকের খুনের পেছনে কার কি মোটিফ তাও তিনি বুঝতে পারছেন না। চার্লি সংশয়ের উর্ধ্বে এমনই বা ভাবেন কি করে।

না আবার মাথা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

যদি চার্লি নিজে না খায়।

যদি চার্লি সুহাসকে খাওয়ায়।

বিষয়টা ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে। চার্লি যে তাকে ছাড়া জাহাজ থেকেই নামছে না! যেখানে যাচ্ছে, সঙ্গে নিচ্ছে। পোষা গ্রে-হাউন্ড। যেন জীবন দিয়ে সুহাস লড়বে, দরকারে গলা কামড়ে ধরবে প্রতিপক্ষের। চার্লিকে সন্দেহ করা ঠিক না। তবে দড়িটার কি হবে! দড়িটা তো সে কাছে রেখে দিয়েছে। অনুমান, দড়ির বাকি অংশ জাহাজেই আছে। এই ধরনের দড়ি ক্যামোফ্লেজ করতে পারে মাস্তুল কিংবা ডেরিকের সঙ্গে। মাস্তুল, ডেরিক, চিমনির রং হলুদ। চিমনির উপরে কালো বর্ডার দেওয়া। তাঁর মনে হয়, আরও কেউ দড়ির ফাঁসে জড়িয়ে যাবে। একজনকে দিয়ে শেষ হচ্ছে না। ম্যাক কি টের পেয়েছিল, চার্লি মেয়ে—তার জন্যে কি মাথায় ডেবিক ফেলে মেরে ফেলা হল।

ভাবতে ভাবতে মুখার্জি খুবই অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। কাপ্তানবয়কে বললেন, ঠিক আছে যাও। চার্লি ভাল আছে জেনে খুব ভাল লাগল।

কাপ্তানবয় চলে যাচ্ছিল, মুখার্জি ডাকলেন।

'শোনো।'

কাপ্তানবয় ফিরে এলে বললেন, 'রিফ এক্সপ্লোরারে বাড়িয়ালা কবে যাবেন জানো?'

'রিফ এক্সপ্লোবারে! সেটা আবার কি বাবু।'

'এই একটা জাহাজ। দ্বীপের কাছাকাছি কোথাও নোঙর ফেলে আছে।'

'মাটি টানার কাজে আসেনি!'

'না।'

মুখার্জিবাবু এত খবন পান কি করে! সে বুঝল, আসলে চিঠিপত্র কিছু সে পাচার করেছে। তবে খুব জরুরি চিঠিপত্র নিশ্চয় নয়। কারণ এগুলো বিছানার নিচে ছিল, দিতে অসুবিধা হয়নি। তা থেকে মুখার্জিবাবু জানতে পারেন। সে বলল, 'মাটি টানার কাজে আসেনি তো তবে মরতে এল কেন!'

'কেন মরতে এল, আমিই বা জানব কি করে? কোথায় নোঙর ফেলে আছে তাও জানি না। নাম শুনে তো মনে হয়, প্রবাল প্রাচীর নিয়ে গবেষণার কাজেটাজে এসেছে। সঙ্গে ডুবুরি নিশ্চয় থাকবে—এ দিককার প্রাচীরগুলো তো সব আটদশ ফ্যাদম জলের তলায়।

'কোনও বাহানা নয় তো!'

'বাহানা বলছ কেন?'

'সঙ্গে ডুবুরি আছে বলছেন।'

'থাকতে পারে। আছে বলিনি। কাপ্তান রিফ এক্সপ্লোরারে যাবেন কথা আছে, তাই জিজ্ঞেস করলাম।'

কাপ্তানবয় লেখা পড়া জানে না—তাই রক্ষে। সে রিফ-এক্সপ্লোরারের নামই শোনেনি। চিফমেট সেকেন্ডমেটের সঙ্গে যদি যাওয়া-টাওয়া নিয়ে কথা হয়—সে ভেবেই প্রশ্ন করা—কিন্তু সত্যি সে কিছু জানে না।

এমন একটা পরিস্থিতি যে তিনি না বললে, কাপ্তানবয়ের যেন নড়াচড়া করারও ক্ষমতা নেই। তিনি বললেই যাবে, নতুবা স্ট্যান্ড-বাই। একেবারে নিথর। ঘামছিল খুব—কাপ্তানবয় কাঁধের তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছল। বেঁটে খাটো মানুষ—বয়সও হয়েছে, বুড়োই বলা যায়—সাদা উর্দি গায়—এবং দেখলে মনে হবে বড়ই নিষ্পাপ মুখ।

'মাল পাচার করবে কখন?'

কাপ্তানবয়ের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

'ভয় নেই। কেউ জানবে না। তা জাহাজে আসা তো দুটো বাড়তি পয়সা কামানোর জন্য। আবার কবে জাহাজ পাবে তাও জান না। যা মুফতে রোজগার করা যায়। সুযোগ পেলে আমিও করতাম।

এতে যেন কাপ্তানবয়ের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল! সে বলল, 'জি সাব কি যে বলেন, আপনি করতে যাবেন কেন! আমরা গরিব গুরবো মানুষ!'

মুখার্জি হেসে ফেললেন। তাঁকে কি সাব বলছে তোষামোদ করার জন্য।

'আমি খুব বড়লোক ভাবছ!'

'না, তা না। আপনারা ছোট কাজ করতেই পারেন না। আপনাদের তো জানি।'

আপনাদের বলতে কাপ্তানবয় বাঙালিবাবুদের কথা বলতে চাইছে। ফেরে পড়ে আসা। দেশ থেকে না তাড়ালে, উদ্বাস্তু না হলে জাহাজে কে উঠত!'

'ঠিক আছে যাও। দেখবে খুঁজে। আসল চাবিটা কিন্তু এখনও হাতছাড়া। চাবিটাব কোনও ডুপ্লিকেট নেই মনে হচ্ছে।' খুঁজে দেখো, যদি পাও দেবে। আমিও খুঁজছি।'

কাপ্তানবয়ের মনে ধন্ধ, কাপ্তানের কেবিনে কি আছে না আছে মুখার্জিবাবু কি জানেন। 'আমি খুঁজে দেখছি' বলায় মনে হল, মুখার্জিবাবু কি নিজেও গোপনে ঢুকে যান। ফাইভারের মৃত্যু, আহামদ বাটলারের জাহাজ ছেড়ে চলে যাওয়া, মুখার্জিবাবুর খোঁজাখুজি, কি একটা জাহাজ কোথায় নোঙর ফেলে আছে—সবই নানা ধন্ধ সৃষ্টি করছে। জাহাজটার নিজের অপবাদের শেষ নেই—সে আপসোসের গলায় বলল, 'গতিক ভাল লাগছে না। কি যে হবে! মাটি টানার কাজ কবে শেষ হবে কিছু জানেন?'

'তা আট দশ মাস ধরে রাখ। সুযোগ যখন এসে গেছে, সহজে কি কাপ্তান নড়বে! মনে তো হয় না।'

কাপ্তানবয় মুখ কালো করে ফেলল। মুখার্জির বলার ইচ্ছে হল, মুখোসটার খবরই রাখো না মিঞা। চার্লিকে কেউ অনুসরণ করছে তাও জানো না। জানলে নিশ্চয় বলতে, সাহেবের পোর্টহোলে নাকি কে উঁকি দিয়েছে। এখন কে কোথায় আরও উঁকি দেয় দ্যাখো। তিনি আর দেরি করলেন না। বোটডেক থেকে নেমে আসার সময় দেখলেন, জাহাজিরা যে যার ফোকসাল থেকে সেজেগুজে কিনারায় নেমে যাচ্ছে। সুরঞ্জনকে পাঠিয়ে কোনও লাভ হল কি না এ মুহূর্তে কিছুই বুঝতে পারছেন না। চার্লি নিজেই নেমে গেছে। ডাক্তার এবং ওষুধের দোকান, প্রেসক্রিপশান, ওষুধের রশিদ এগুলি সংগ্রহ করার কারণেই পাঠানো। চিনে রাখা। কিন্তু খোদ রোগী নিজেই কিনারায় গেছে। তার কেন যে মনে হয়েছিল, মেয়েলি সংক্রান্ত অসুখের চিকিৎসা কোনও কারণেই কাপ্তান অস্ট্রেলিয়ার বন্দরে—এই যেমন নিউ-ক্যাসল, অথবা জিলঙ বন্দরে করাবেন না—চার্লি ধরা পড়ে যেতে-পারে সে মেয়ে। ছেলে সাজিয়ে রাখতে চাইলে, ডাক্তার দেখাতে গেলে বিপদে পড়তে পারেন কাপ্তান। ছোটখাটো বন্দরে—নেটিভ ডাক্তারদের ততটা হয়তো ভয় থাকার কথা না। ফাঁস হবার কম আশঙ্কা।

এই সব আগাম আশঙ্কা তাঁর মাথায় কাজ করলেই সব গুবলেট করে ফেলেন তিনি। সুরঞ্জনকে পাঠিয়েও কোনও লাভ হল না। তবে এলাকাটা চিনে রাখতে পারলে আখেরে যে লাভ হবে না তাও বলা যায় না। আসলে সেজন্যই তো পাঠানো। নেমে গিয়ে সুরঞ্জন ভালই করেছে। তার কথার গুরুত্ব দিতে শিখেছে, এতে তিনি খুশি। নিচে নেমে সুহাসের ফোকসালে দরজা ঠেলে উঁকি দিতেই দেখলেন, বংশী তাড়াতাড়ি কি গোপন করার চেষ্টা করছে। কিছু ভাল না লাগলে স্ত্রীর ফটো লুকিয়ে দেখার

প্রবণতা গড়ে উঠেছে বংশীর। কেউ দেখে ফেলবে ভয়ে স্ত্রীর ছবি লুকিয়ে দেখে। নজর দিলে, বৌ তার অসতী হয়ে যাবে---জাহাজিরা মেয়েমানুষ দেখলে কি ভাবে, তার তো জানতে বাকি নেই। জাহাজে মেয়েমানুষের ছবি সাংঘাতিক ব্যাপার—আর সে যদি কচি ডাবের শাঁস হয়। রক্ষা আছে! বংশী এটা ভালই বোঝে।

মুখার্জি বললেন, 'বউয়ের সঙ্গে কথা বলছিলে!'

'না না। আমি কিছু দেখিনি! কোনও কথা বলিনি! সত্যি বলছি। তুমি যাও। আমি কিছু লুকিয়ে ফেলিনি, বিশ্বাস করো।'

'আমি দেখব না। যত খুশি দ্যাখ্। কথা বল্। বললাম, কিনারায় যা। হালকা হতে পারবি। কিছুতেই নড়বি না। খারাপ হলে বউকে মুখ দেখাবি কি করে!'

বংশীর চোখ লাল হয়ে উঠছে। জবা ফুলের মতো চোখ। মুখার্জি বুঝলেন, তাঁর দাঁড়িয়ে থাকা বংশী সহ্য করতে পারছে না। দরজা টেনে বের হয়ে এলেন তিনি।

তখনই মগড়া উঁকি দিচ্ছে তার ফোকসালের ভিতর থেকে। মুখার্জির কি মনে হল নিজেও জানেন না—কিছুটা যেন কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েই টলে গেলেন ফোকসালের ভিতর। নিচে কেউ নেই। সুযোগ। দবজা বন্ধ কবে মগডার চুল ধরে মাথা ঝাঁকতে থাকলেন, 'শুয়োর, হারামি, মনে করিস আমি কিছু বুঝি না। মনে করিস অন্ধকার থেকে উঁকি দিলে ছোটসাব দেখতে পাবে না। বল্ শুয়োব, কেন পোর্টহোলে গিয়েছিলি। কাপ্তান তোর গলা কাটবে। বাঁচতে চাস তো বল্!' সোজাসুজি আক্রমণ!

মগড়া হাউমাউ করে উঠলে, তিনি গর্জে উঠলেন, 'চুউপ। একদম চউপ। পায়ে পড়ছিস কেন! বল্ গিয়েছিলি কিনা। মুখোসটা পরে গিয়েছিলি কি না। একদম হারিয়া করে দেব। বল্, বল্।'

'হা বাবু গেছিলাম। জেনানা আদমি আছে বাবু—জাহাজে জেনানা ঘুমতা হ্যায়। মাথা বিলকুল খারাপ হোগিয়া। বাবু—আমার কসুর আছে বাবু।'

'মুখোসটা চুরি করেছিলি?'

'নেহি বাবু।'

'তবে।'

'বাতিল গোসলখানায সাফ করতে গিযে মিলে গেছে বাবু!'

'বাতিল গোসলখানা!'

'ঐ বাবু পাথরউথর হ্যায় না, কফিনভি হ্যায়। কোমড মে থা। লিয়ে আসি!'

'নিউপ্লাইমাউথে নেমে গিয়েছিলি জেনানার গন্ধে।'

'নেহি বাবু। ও ঝুট বাত।'

'পার্ল-হারবারে, লস এনজেলসে?'

'নেহি বাবু। ওভি ঝুট বাত আছে।'

তবে আর কোনও দ্বিতীয় ব্যক্তি মুখোসটা ব্যবহার করে? সে কে! সুযোগ বুঝে মগড়া সেখান থেকে নিয়ে আসে। আবার জায়গাবটা জায়গায় রেখে দেয়। যার মুখোশ সে টের পায় না।

'খবরদার আর কখনও যাবি না। মনে থাকবে? যদি যাস, তবে ম্যাকের মতো তোর জানও খতরা হয়ে থাকবে। কি বুঝলি।'

'জান খতরা হয়ে যাবে!'

'চল্ মুখোসটা কোথায় আছে দেখাবি। প্রায় হাত ধরে টানতে টানতে মুখার্জি মগড়াকে ধাক্কা মাবতে মারতে সিঁড়ি ধরে উপরে তুলে নিয়ে গেলেন।

কেউ টের পেতে পারে ভেবে উপরে উঠে মগড়ার হাত ছেড়ে দিলেন মুখার্জি। ধস্তাধস্তি হলে জাহাজিরা ছুটে আসতে পারে। মুখার্জিবাবুকে সবাই কম বেশি সমীহ করে। মগড়াকে টানতে টানতে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন, এমন কৌতূহলও দেখা দিতে পারে। উপরে উঠে মুখার্জি একেবারে সাদাসিধে মানুষের মতো, খুব সতর্ক গলায় বললেন, 'বেইমানি করবি তো তোর লাশও গায়েব হয়ে যাবে।'

মুখার্জি আর দেরি করলেন না। কিনারায় তারও নেমে যাওয়া দরকার। বাতিল বাথরুমে ঢুকে তিনি যা দেখলেন, তারপর আর জাহাজে চুপচাপ বসে থাকারও কোনও অর্থ হয় না। সুরঞ্জনের সঙ্গে তার এক্ষুনি দেখা হওয়া দরকার। কিনারায় না নেমে গেলে কথাবার্তা বলা মুশকিল।

গ্যাঙওয়েতে ডিউটি পড়ে যাবে তাঁর। ফোকসাল আর পিছিলে গ্যাঞ্জাম চলবে। কাজ-কামের চাপ থাকবে না বিশেষ। সুরঞ্জনকে একা পাওয়ার সুযোগই পাওয়া যাবে না। একমাত্র কিনারায় নেমে খুশিমতো আলোচনা করতে পারবেন।

পরিস্থিতি খুবই ঘোরালো—কি করা যায়—এমন সব চিন্তা ভাবনার সূত্র থেকেই মন স্থির করে ফেললেন, দেখা যাক, কিনারায় নেমে সুরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করা যায় কি না! সাইকেলে আর কতদূর যাবে! ঘুরে ফিরে জাহাজে ফেরার রাস্তাতেই সে নেমে আসবে। তা ছাড়া যদি সময় পান তিনি নিজেও আস্তাবল থেকে এক দু শিলিং দিয়ে ঘোড়া পেয়ে যেতে পারেন। দ্বীপের উঁচু জায়গায় উঠে গেলে, দূরে কোথাও যদি রিফ-এক্সপ্লোরার জাহাজটিকে আবিষ্কার করা যায়।

কিনারায় নেমে কাঠগোলার দিকে হেঁটে যেতে থাকলেন। মাছের আড়তগুলি সমুদ্রের ধারে। কিনারায় নেমেই মাছের আঁশটে গন্ধ পেলেন। বাতাসে গন্ধ ভেসে আসছে। সমুদ্রের কিনরায় মাইলখানেক কি তারও বেশি হবে জায়গা জুড়ে বালিয়াড়ি। নারকেল গাছ আর ঝাউ গাছের ছড়াছড়ি। গাছগুলির জন্য মাছের আড়ত চোখে পড়ছে না।

কিছুটা ভিতরে ঢুকলেই সরাইখানা। এবং চার পাঁচ বছরে এত বদলে গেছে যে মনে করতে পারলেন না, কোন্‌দিকে গেলে আস্তাবল, কিংবা সাইকেল ভাড়া পাওয়া যেতে পারে।

বাজারের দিকটায় ঢুকে তিনি অবাক। ফুলকপি বাঁধাকপি থেকে সব রকমের তরিতরকারি। এবং দোকানে দোকানে ফলের প্রাচুর্য। আপেল আঙুর থেকে ন্যাসপাতি খেজুর—কি নেই! দ্বীপের ঢালু জায়গায় স্কুল হাসপাতালও চোখে পড়ল। দালানকোঠার ছড়াছড়ি।

দ্বীপটার বন্দর এলাকা আগের মতো আর ছোট নেই। বেশ কিছু নতুন পাকা রাস্তাও তাঁর চোখে পড়ল। পিদগিন ভাষায় নানা সাইনবোর্ড দোকানের মাথায়। ইংরাজি হরফ বলে তাঁর পড়তে অসুবিধা হয় না।

স্থানীয় লোকদের পিদগিন ভাষা অর্থাৎ আধখ্যাচড়া ইংরাজি কথাবার্তা দুর্বোধ্য। তারা তাঁর কোনও উপকার করতে পারবে বলেও মনে হল না। তবু দু-একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, সাইকেল কোথায় ভাড়া পাওয়া যায়! কিংবা আস্তাবলগুলি কোন্‌দিকে উঠে গেলে পাওয়া যাবে?

নৌকা থেকে নেমে কিনারায় কিছুটা হেঁটে গেলে পাকা রাস্তা। আগে এদিকটায় ফাঁকা ছিল—কিনারায় উঠেই টের পেয়েছিলেন! অসুবিধা হয়নি। কিন্তু সমুদ্রের ধারে এবারে অজস্র ঝুপড়ি উঠে যাওয়ায় রাস্তাটা খুঁজে পেলেন না। হেঁটে যাচ্ছিলেন। পাকা রাস্তায় উঠে গেলে সব চিনতে পারবেন। একসময় পাকা রাস্তাটা ঠিকই আছে দেখতে পেলেন। ঐ তো ডানদিকের পাহাড়টা। সমুদ্র থেকে নাক জাগিয়ে রেখেছে! জলের নিচে যুদ্ধবিমানের মুণ্ডু হয়তো আগের মতোই পড়ে আছে।

নানা ইশারায়ও কাজ হচ্ছে না। মুখার্জি বোঝাতেই পারছেন না, আস্তাবলগুলি কোন্‌দিকে। বেঁটেমতো সব লোকজন—তামাটে রং, চুল খাড়া। নাক থ্যাবড়া উঁচু দুই-ই আছে। বেঢপ সাইজের মানুষজন—বুক কোমর সব এক মাপের। এবং বাচ্চারা আগের মতোই দোকানের সামনে ভিড় করছে। কিন্তু জাহাজিদের দেখে ছুটে আসছে না। ঘিরেও ধরছে না তাঁকে। কাপস্তান কাপস্তান বলে চিৎকারও করছে না। কাজে সবাই এতই ব্যস্ত যে কে দ্বীপে এসে নামল, কে জাহাজে উঠে গেল তার প্রতিও তাদের বিশেষ নজর নেই।

মুখার্জি জানেন পিদগিন ভাষা প্রবাল দ্বীপগুলির নিজস্ব ভাষা নয়। ইংরাজীর জগাখিচুড়ি বলা যায়, তারা কাজ চালিয়ে নেয় এই ভাষায়। বিশ বাইশ হাজার বর্গমাইলের মধ্যে কাজ চালিয়ে নেবার

মতো এই একটাই ভাষা। ইংরাজি আর অস্ট্রেলীয় ইতর ভাষার এক জগাখিচুড়ি অনুকরণ। সেবারে ফিলের সঙ্গে আলাপ না হলে এত কথা জানতেও পারতেন না। দোকানের সাইনবোর্ড পড়তে গিয়ে ফিলের কথা মনে পড়ে গেল।

মিঃ ফিলের ওখানে একবার যাওয়া দবকার। সুযোগমত ঘুরে আসা যাবে। ক্রোশ দশেক দূরে নির্জন এক টিলাতে তাঁর ডেরা। উকন গাছের ছায়ায় সাদা বাড়িটা বড়ই রহস্যজনক মনে হয়েছিল। দ্বীপের একটা পরিত্যক্ত অঞ্চল কেন তিনি বেছে নিয়েছেন তা জানারও কৌতূহল হয়নি! তিনি একজন যুদ্ধ পলাতক সৈনিক হতে পারেন, এটাও তাঁর মাথায় আসেনি। ব্যবহারে অত্যন্ত অমায়িক। তাঁর নিজস্ব আস্তাবলে বেশ বড় দুটো ঘোড়াও আছে। মুরগির খামার, কিছু শস্যক্ষেত্র এবং বাড়িটার ভেতরে বিশাল সব কাচের জার—নানা সামুদ্রিক জীব-জন্তুর আখড়া।

ফিল একা থাকেন।

একা কেন?

আসলে জাহাজেব নানা দুর্গতি মুখার্জিকে ফিল সম্পর্কে সজাগ করে দিচ্ছে। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জেগে যাচ্ছে। পিদগিন ভাষায় দোকানের নাম-টাম চোখে ভেসে না উঠলে হয়তো ফিল সম্পর্কে এত কথা তাঁর মনে হত না। মনেই পড়ত না, আরে এই দ্বীপেই তো সেই মানুষটিকে দেখেছেন তিনি।

তিনি কি এখনও আছেন!

থাকবেন না, যাবেন কোথায়!

ফিল যে একা থাকেন, সেবাবেই টের পেয়েছিলেন মুখার্জি। কিছু স্থানীয় লোক তাব বান্দা, এও মনে হয়েছিল। সামান্য সবষের তেল উপহাব পেয়ে ফিল কী খুশি! কে যে তাঁকে বলেছে, সবষের তেল মাথায় মাখলে সুনিদ্রা হয়। সামান্য তেলের জন্য দশ ক্রোশ রাস্তা ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছিলেন। তা হলে ফিল কি অনিদ্রায় ভুগতেন! কেন!

আসলে জাহাজিরাই খবর দেয়। বিশেষ করে বাঙালি জাহাজিরা সরষের তেল মাথায় মাখে দেখেই কিনারায় মানুষজনেব নানা প্রশ্ন—মাথায় এই তেল! আর তার উপকারিতা সম্পর্কে বিশদ বলতে যেন সব বাঙালি জাহাজিরাই ওস্তাদ। একেবারে ঘুমের বিশল্যকরণী। মাখো আর সুনিদ্রা যাও। ফিল সেই সুনিদ্রার আশাতেই জাহাজে উঠে এসেছিলেন।

এক বোতল সবষের তেলেব বিনিময়ে ফিলের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব। তিনি মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চড়ে আসতেন। জাহাজেও উঠে আসতেন। তাঁদের সঙ্গে খানাও খেয়েছেন। বাঙালি রান্নার তারিফও করেছেন। মুখার্জিও গেছেন তাঁর ডেরায়। ডেবা না প্রাসাদ এই মুহূর্তে কেমন গুলিয়ে ফেললেন মুখার্জি। প্রাসাদের অন্ধকার দেয়ালে তিনি ডুবুরির পোশাকও ঝুলতে দেখেছেন।

তিনিই তাঁকে বলেছিলেন, দ্বীপগুলির ভাষাব কোনও মাথামুণ্ডুও নেই। কোরাল সি-তে সাতশরও বেশি ভাষা। অধিকাংশ ভাষার হরফ পর্যন্ত নেই। এক দ্বীপের লোক অন্য দ্বীপের লোকদের ভাষা একদম বোঝে না। ফলে পিদগিন ভাষাই এদের সম্বল। কম বেশি সব দ্বীপের লোকেরাই বোঝে।

ফিল তাঁর পিযানোটা দেখিয়ে বলেছিলেন, 'বিগ ফেলা বক্কাস!'

'মানে?'

ফিল হেসে বলেছিলেন, 'টিদয়ালা সেম সার্ক — ইয়ো হিটিম, হি ক্রাই আউট।'

ফিল আমি কিছু বুঝছি না। পিয়ানো, বিগ ফেলা বক্কাস হতে যাবে কেন?'

ফিল তাঁকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, 'রেগে যাচ্ছ কেন! পিয়ানো বললে বুঝবে না। দ্বীপেব লোকজন 'বিগ ফেলা বক্কাস' বললে বুঝবে।' আরও বুঝিয়ে বলার জন্য ফিল বিস্তারিত করলেন তাঁর ব্যাখ্যা—'এ বিগ বকস—উইদ টিদ অল দ্য সেম সাইজ, অ্যান্ড ইফ ইয়ো হিট, ইট মেক্‌স এ নয়েজ! কি বুঝলে মুখার্জি।'

'দারুন তো। পিয়ানোর জন্য এত খরচ।'

লোকটির কথা মনে পড়ে যাওয়ায় মুখার্জি সরাইখানাগুলির বিজ্ঞাপন পড়তে থাকলেন। বিজ্ঞাপনে লেখা—স্পাক ম্যান ইনা কামিন। কি হতে পারে। স্পাক কথাটা গালাগাল তিনি জানেন। হয়তো

বোঝাতে চাইছে—ইনটকসিকেটেড পার্সনস উইল নট বি অ্যাডমিটেড। অস্ট্রেলিয় স্পার্ক অথবা স্পার্কি শব্দ থেকেই স্পার্ক কথাটার উৎপত্তি এও ফিল তাকে বুঝিয়েছিলেন। নেশাগ্রস্ত লোকদের অস্ট্রেলিয়ানরা স্পার্ক অথবা স্পার্কি বলে গালাগাল দেয় ফিল না বললে মুখার্জি জানতে পারতেন না। আসলে পিদগিন ভাষায় সামান্য ইতরবিশেষে বোঝায়—স্পার্ক ম্যান হি নো কাম ইন।

তিনিই বলেছিলেন, পাপুয়া নিউগিনি থেকে নিউ হেব্রিডস দ্বীপগুলির সর্বত্রই এই এক অসুবিধা মুখার্জি।

মুখার্জির মনে হল, ফিলের সঙ্গে তার দেখা করা খুবই জরুরি।

আর সঙ্গে সঙ্গে মুখার্জির মাথায় খেলে গেল—জনৈক অ্যালেন পাওয়ারের লেখা একটি ব্যক্তিগত চিঠির বয়ান। অ্যালেন কাপ্তান মিলারকে কিছু খবব দিয়েছেন চিঠিতে। চিঠিটা লেখা বোথ-বে হারবার থেকে। সামরিক দপ্তরের লোক বোধহয়। অনেক খুঁটিনাটি তথ্য দিয়েছেন 'কলিজ' জাহাজ সম্পর্কে। জাহাজটি কবে কোন্ তারিখে বাজেয়াপ্ত কবা হয়, প্রমোদ তরণীর খোল নলচে পালটে কবে জাহাটিকে ট্রুপ ট্রানসপোরট ক্যারিয়ারে পবিণত করা হয়—তার খুঁটিনাটি তথ্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সেভেনথ্ মিলিটাবি মিশানে জাহাজটি ডুবে যায় তার খবরও আছে। জাহাজডুবির তারিখ, সাল, এস পিরিতু সান্ত থেকে কতটা নর্থ ইস্টে জাহাজডুবি হয়েছে তারও উল্লেখ আছে।

মুখার্জির মাথায় এগুলিই তাড়া কবছে।

অথচ আসল খবরের উপব তিনি কোনও গুরুত্ব দেননি। ফিলের কথাও তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। কত বিচিত্র মানুষের সঙ্গেই তো তার দেখা হয়। সবার স্মৃতি মনে বাখাও কঠিন। জাহাজি জীবনে সারা পৃথিবী চষে বেড়ালে ফিলের মতো অসংখ্য চরিত্রের খোঁজ পাওয়া যেতেই পারে। দ্বীপে নেমে পিদগিন ভাষার সাইনবোর্ড দেখেই ফিলের কথা বোধ হয় মনে পড়ে গেল।

শি ওয়াজ এ গ্র্যান্ড সিপ।

শি মানে তবে 'কলিজ'! 'কলিজ' জাহাজ!

পলকে পড়ে চিঠিটি কাপ্তান-বয়ের হাতে ফেরত দিলেও মুখার্জির ঠিকই মনে পড়ছে—অ্যালেন লিখেছেন, 'শি ওযাজ এ গ্র্যান্ড সিপ' এটা তাঁব কথা না। একজন ডুবুরির কথা।

ডুবুরিটি কে?

সে কি ফিল!

কিন্তু চিঠিতে ফিলের নাম তো ছিল না। জাহাজেরও নাম ছিল না। ডুবুরির নাম ফিলিপ। ফিলিপ আর ফিল কি একই ব্যক্তি। মাথাটা কেমন ঝন ঝন করে উঠল।

'শি ওয়াজ এ গ্র্যান্ড সিপ' নোটস্ ফিলিপ, অ্যান অসি ডাইভার।

'অসি' ডাইভার আবার কি!

ডাইভার ডুবুরি বোঝা যায়।

কিন্তু 'AUSSIE' খুবই গোলমেলে ব্যাপাব। আমেরিকান হলেও কথা ছিল। এই 'অসি' শব্দটাই তাঁকে কাবু করে ফেলায় বোধ হয় আর শেষ পর্যন্ত এগোতে সাহস পাননি। 'অসি' নিয়ে বিড়ম্বনার খুব দরকার আছে বলেও তাঁর মনে হয়নি শেষে।

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আসল রহস্য সেখানেই।

'শি ওয়াজ এ গ্র্যান্ড সিপ' নোটস ফিলিপ অ্যান 'অসি' ডাইভার হু ফেল আন্ডার দ্য স্পেল অফ দ্য লাকসারি লাইনার টুয়েলভ ইয়ার্স এগো অ্যান্ড স্টেইড অন অ্যাজ এ কাইন্ড অফ কিপার অফ দ্য রেক।'

ফিলিপ যদি ফিল হয়, 'অসি' যদি অস্ট্রেলীয় হয় আব লাকসারি লাইনার যদি 'কলিজ' হয়, তবে তবে—তারপর থতমত খেয়ে মুখার্জি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলেন, 'তবে কি!'

'তবে কাজ কিছুটা এগুবে। বুঝলে বুদ্ধু!' নিজে এতটা বুদ্ধু এই প্রথম যেন টের পেলেন মুখার্জি। হাসলেন আপন মনে। নিজেকে বুদ্ধু বলায় খুশিই হতে পেরেছেন। কাপ্তান রিফ একসপ্লোরারে যাবেন, ফিলিপের কাছেও যেতে পারেন। আটঘাট বেঁধেই যে কাপ্তান এগোচ্ছেন বুঝতে কষ্ট হল না তাঁর।

হাঁটতে হাঁটতে একটা টিলার মাথায় উঠে এসেছেন। রাস্তার পাশে বাগান, কুঁড়েঘর, মুরগি কুকুর। কুকুর তাড়া করতে পারে। কিছু বস্তিও পার হয়ে গেলেন। বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে মা। বিশ বাইশ বছরের যুবতী। কোনও সংকোচ নেই। মুখার্জি সেদিকে তাকালেন না। সুরঞ্জনকে খুঁজে না পেয়ে কিছুটা হতাশ। দূরে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। তবে কোনও জাহাজ দেখা গেল না। তাঁদের জাহাজ খাড়ির ভেতরে। কাছেই। নেমে গেলেই হল। আর কোথায় খোঁজা যায়। মোষের কিছু গাড়ি যাচ্ছে সার বেঁধে। কিছু সাইকেল আরোহী চেঁচাচ্ছে গাড়িগুলি রাস্তা জ্যাম করে রেখেছে বলে।

খুবই অন্যমনস্ক মুখার্জি। তিনি হাঁটছেন। জাহাজে ফিরে যাবেন কিনা ভাবছেন! তখনই মনে হল কে যেন তাঁকে ডাকছে। এদিক ওদিক তাকালেন। তালপাতার টুপি মাথায় সুরঞ্জন চায়ের দোকান থেকে উঠে আসছে। বাবু তবে হাওয়া খাচ্ছেন! মসগুল হয়ে গেছে কিছু যুবতীর পাল্লায় পড়ে। কারণ দোকানগুলো সবই মেয়েরা চালায়। লুঙির মতো পোশাক, আর পাতলা ফ্রক পরে থাকায় সুরঞ্জন বোধ হয় যুবতীকে ছেড়ে নড়েনি। কতাবার্তাও হয়ে যেতে পারে। কিছুটা ক্ষুব্ধ গলায় বললেন, 'এখানে বসে কি করছিলি!'

টুপি খুলে মাথা চুলকাতে থাকল সুরঞ্জন। কোনও কথা বলছে না।

'সাইকেল পাসনি?'

'না।'

'ওরা কোন্ দিকে গেল জানিস?'

'কারা?'

'চার্লি, সুহাস।'

'চার্লি সুহাসকে ঘোড়ায় চড়া শেখাচ্ছে।'

'কোথায়?'

'যাবে? এস।'

'না।'

'শোনো মুখার্জিদা. ছোঁড়া মরবে বলে দিলাম। দু-বার পড়ে গেছে। জাপটে ধরে থাকে ঘোড়ার পিঠ। আর ঘোড়াও বলি যাই. পা ছুঁড়ছে। চার্লি ঘোড়ার লাগাম ধরে বশে আনার চেষ্টা করছে। এক লাফে চড়ছে, আবার নেমে পড়ছে। পাদানিতে পা, জিনে পেট ঠেকিয়ে অদ্ভুত কায়দায় উঠেই আবার নেমে পড়ছে। বুঝলে না ঘোড়ায় চড়া সুহাসকে শেখাচ্ছে। লাগাম ধরে সুহাস ঘোড়া টেনে নিয়ে যেতেই ভয় পাচ্ছে। দামড়া কোথাকার। লজ্জা করে না, তুই কি রে! পড়ে গেলি! হাত পা ভেঙে পড়ে থাকবে বলে দিলাম।'

মুখার্জি এদিক ওদিক কি দেখলেন। তারপর বললেন, 'আমার সঙ্গে আয়।' যেতে যেতে বললেন, 'চার পাঁচ বছরে দেখছি দ্বীপটার বেশ উন্নতি হয়েছে। আগের মতো মনে হয় রাস্তাঘাট খুব দুর্গম নয়। দোকানগুলিতে এত ভিড়ও দেখিনি। ফসফেট কোম্পানি দেখছি স্থানীয় লোকদের অভাব অভিযোগের দিকে বেশ নজর দিয়েছে। এটা খুব ভাল ব্যাপার।' বলেই হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিলেন সুরঞ্জনকে। ওরা বাতিঘরের পেছনটাতে নিজেদের আড়াল করে ফেলল।

মুখার্জি বললেন, 'দ্যাখ কে যাচ্ছে?' আঙুল তুলে দেখালেন।

'সেকেন্ড! সেকেন্ড কোথায় যাচ্ছে!'

'দেখা যাক।' বলে মুখার্জি বললেন, 'মাথার টুপিটা দে।'

সুরঞ্জন টুপিটা এগিয়ে দিল।

'দাঁড়া। আমি আসছি।'

'কোথায় যাবে।'

'তুই দাঁড়িয়ে থাক। আমি আসছি। যাবি না কিন্তু।'

পাতার টুপি পরলে, স্থানীয় বাসিন্দা একেবারে। তবে রোদ তেতে নেই। কিংবা রোদে চাঁদি ফাটারও কথা না। রোদ থেকে আত্মরক্ষার জন্যই পাতার টুপি পরার চল। রাতেও পাতার টুপি পরে

স্থানীয় লোকজন হাটবাজার করে, কিংবা অফিস থেকেও ফেরে। কিছুটা স্থানীয় বাসিন্দাদের মতো সুযোগ সুবিধে নেবার জন্যই যেন মুখার্জি মাথায় পাতার টুপি সেঁটে দিলেন। দ্বীপের লোকজনের মতো হাঁটতে থাকলেন।

সূর্য হেলে গেছে সমুদ্রে। ডুবেও গেল। পশ্চিমের আকাশ লাল হয়ে কিছুটা নীলবর্ণ ধারণ করল। খাড়ির দু-পাশে বিদ্যুতের আলো ঝকমক করে উঠল। জ্যোৎস্না উঠেছে। দুটো ছোট টিলা পার হয়ে নিচে নেমে যেতেই টের পেলেন মুখার্জি, সেকেন্ড যেন সতর্ক হয়ে গেছে। গাছের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে গেছেন। মুখার্জি জঙ্গলের ভিতর বসে পড়লেন। খানিক দূরে চার্লি আর সুহাস। দুটো ঘোড়া। দুজন স্থানীয় লোক সঙ্গে। আর পাথরের আড়ালে তিনি দেখলেন, সেকেন্ড সহসা অদৃশ্য।

ঝোপ জঙ্গল ফাঁক করে মুখ কিছুটা জাগিয়ে রাখলেন তিনি। নিশ্চয় সুহাস এবং চার্লিকে তিনি অনুসরণ করছেন। কাছে কোথাও আছে। সেকেন্ড কি করে দেখা দরকার। হাতের কাছে এমন সুযোগ পাওয়া যাবে তিনি কল্পনাই করতে পারেননি।

জাহাজ থেকে তিনি নেমে এসেছিলেন, মগড়ার উদ্ভট খবর দিতে। মগড়া তাকে বাতিল বাথরুমে নিয়ে দেখিয়েছে—কোথায় সে মুখোসটা রাখে। কোথায় সে মুখোসটা পায়—একটা বাতিল কমোডে মুখোসটা উল্টো পিঠে বসিয়ে রাখা হয়। কমোডের সাদা রঙের সঙ্গে সম্পূর্ণ খাপ খেয়ে যায়। হঠাৎ দেখলে মনেই হবে না, উল্টো পিঠে বুড়ো মানুষের মুখোস আঁকা আছে। মগড়া বলেছে, মুখোসটা সে কখনও কখনও দেখেছে, কমোড থেকে কেউ নিয়ে যায়। কে নিয়ে যায় সে অবশ্য জানে না। বাতিল ঘরের চাবি চার্টরুমে থাকে। দরকারে সে নিয়ে আসে ঘরের ঝুলকালি সাফ করার জন্য।

মুখার্জি হামাগুড়ি দিতে থাকলেন।

কাছে যাওয়া দরকার। জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট নয়।

বাতিল ঘর থেকে কখনও উধাও হয়ে যায় মুখোসটা। মগড়ার কৌতূহল ছিল। সে চার্লির বাথরুমে ঢুকে টের পেয়েছে সব। লুকিয়ে জাহাজে নারী দেখার বাসনা কার না হয়! লোভে পড়েই ঘোরাঘুরি। চার্লির অনিষ্ট করার কথা সে কখনও ভাবে না। প্রায় পায়ে পড়ে এই ধরনের স্বীকারোক্তির পর তাকে ছেড়ে দিয়ে বলেছেন, আর ধরবি না। ধরলে পিটিয়ে ছাল চামড়া তুলে নেব।

তিনি হামাগুড়ি দিয়ে প্রায় গজ দশেকের মধ্যে এগিয়ে গেলেন। আর স্পষ্ট দেখতে পেলেন, সাপের মতো গর্ত থেকে মুখ বার করে কেউ চার্লিকে দেখছে। চার্লির সঙ্গে সুহাসের আচরণ লক্ষ্য করছে বোধ হয়। তার মুখে সেই মুখোস। মুখার্জি স্তম্ভিত।

একবার মনে হল হাত বাড়িয়ে মুখোসটা মুখ থেকে টুক করে তুলে নিলে কেমন হয়! বেইজ্জত করার সুযোগ পেয়ে হাত বেশ নিশপিশ করছে। কারণ এত আছে কেউ আছে সেকেন্ড টেরই পায়নি। কেমন আবিষ্ট হয়ে গেছে যেন। কি দেখছে এত! কাপ্তানের চর নয় তো! কাপ্তান কি অদৃশ্য জায়গা থেকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন সেকেন্ডকে। কাপ্তানের নির্দেশেই যদি কাজটা করে থাকে সেকেন্ড—ভাবতেই তিনি কেমন গুটিয়ে গেলেন।

তা হলে চার্লির অনুসরণকারী এই!

টুক করে মুখোস খুলে নেবার কথা আর মুখার্জির মাথায় থাকল না। দ্রুত টিলা থেকে নেমে এলেন। সুরঞ্জনকে পেলে হয়। বড় একা মনে হচ্ছে। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছেন না। সুরঞ্জন যদি মেয়েটার নেশায় পড়ে যায়। দোষও দেওয়া যায় না। লাইনের মেয়ে বলেই মনে হয়। গত সফরে জাহাজ থেকে নামলে ঘিরে ধরেছিল এক দঙ্গল মেয়ে। যুবতী প্রৌঢ়া বালিকা সব বয়সের।

একজন তো প্রায় নাবালিকা। তবু তাঁর জামা ধরে টানছিল।

মুখার্জির হাসিও পাচ্ছিল, আবার এক ধরনের মজা। তাকে হাসতে দেখেই বাচ্চা মেয়েটা একেবারে জোঁকের মতো লেগেছিল। সে না পেরে বলেছিল, 'তুমি কিছু বোঝো এ সবের! তুমি পারবে?'

আশ্চর্য সেই ছোট্ট বালিকার চোখে কি ক্ষোভ—যেন তাকে অপমান করা হয়েছে! সে তেরছা চোখে বলেছিল, 'আই নো দিস লাইন।' খুবই গর্বের সঙ্গে কথাটা বলেছিল। তারপর ছুটে পালিয়েছিল বস্তির দিকে। অশ্লীলতার চূড়ান্ত।

মুখার্জি দৌড়ে নেমে যাচ্ছেন।

এবারে আর তারা যেন নেই। ম্যাজিকের মতো লাইনের মেয়েরা সব উধাও। সুরঞ্জনের কপাল ভাল বোধ হয়—পেয়ে যেতেও পারে। তবে পেয়ে গেলে মুশকিল, তিনি সত্যি ত্রাসে পড়ে যাবেন। সুরঞ্জনকে এখন সেখানে না পেলে মুশকিলে পড়ে যাবেন।

না, ঠিক দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি কিছুটা ত্রাসে পড়ে গেছেন এমন ভেবেই যেন সুরঞ্জন বলল, 'তুমি এত হাঁপাচ্ছ কেন, এস বসি।' পাশের একটা দোকানে নিয়ে বসাল তাঁকে। মুখার্জি দরদর করে ঘামছেন।

'কি হল বলবে তো!'

'সেকেন্ড।'

'সেকেন্ড কি। সেকেন্ড অনুসরণকারী?'

'সত্যি। সেকেন্ডই তো ওদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেকেন্ড ছাড়া কে আর ওখানে সাপের মতো ফণা তুলে ঝোপের মধ্যে বসে থাকবে।'

তিনি আর কোনও কথা বলতে পারছেন না। কিছুটা অবোধ বালকের মতো তাকিয়ে আছেন। কিছু যে ভাবছেন বোঝাই যায়।

'কি হল তোমার?'

'কি যে হয়নি তোকে কি করে বোঝাই। সেকেন্ড এত কাছে থেকে কেন দ্যাখে। লুকিয়ে কেন দ্যাখে! মুখোস পরে কেন দ্যাখে! তিনি তো ইচ্ছে করলেই চার্লির কাছে গিয়ে বলতে পারতেন, আরে তোমরা! দেখি তো আমি পারি কি না। বলে ঘোড়ার লাগাম ধরে টানাটানি করলেও অশোভন হত না। এ যে খুবই অশোভন মনে হচ্ছে। চার্লি মেয়ে না ছেলে বোঝার জন্য আড়ালে হাঁটাহাঁটি করারই বা কি দরকার। কত বড় অফিসার! তার এক ধমকে আমাদের কাপড়চোপড় নষ্ট হয়ে যায়—আর তিনি কি না—না ভাবতে পারছি না। তোর কি মনে হয়?'

সুরঞ্জন বলল, 'তুমি কি সেন্ট পার্সেন্ট সিওর চার্লি মেয়ে?'

'সেন্ট পার্সেন্ট।'

সুরঞ্জন কিছু ভাবছে। ভাবলে সে দু আঙুলে ঠোঁট চেপে ধরে তার। মাঝে মাঝে ঠোঁটের নিচে হাত বুলায়।

'সেন্ট পার্সেন্ট হলে তো সেকেন্ডকে লেলিয়ে দিতেই পারে কাপ্তান।'

'লেলিয়ে দিতে পারে মানে?'

'চোখে চোখে রাখা আর কি। দামড়াটাও আমার মনে হয় শুঁকে শুঁকে ঠিক ধরে ফেলেছে, চার্লি মেয়ে। আড়াল আবডাল পেলে কার আর মেজাজ ঠিক থাকে। চার্লি জড়িয়ে ধরলে সাহস আছে না করতে পারে। বুনো ফুলের গন্ধে কে না পাগল হয় বলো!'

'পাগল হলে শেষ হয়ে যাবে! সম্পূর্ণ বিনাশ। আর এক ফাইভার। আফশোসের শেষ থাকবে না।'

'ফাইভারের খুনের দৃশ্যটা যেন চোখে দেখতে পাচ্ছেন মুখার্জি। ওয়ারপিন ড্রামের উপর ঝুলে পড়ে আছে। মাথা থেকে রক্ত চোঁয়াচ্ছে।

সুরঞ্জন বলল, 'কেক দেবে—কেক দিতে বলি দুটো।'

টিনের খুপরি ঘর বলে হাওয়া বাতাস কম। তবে বেশ ঠাণ্ডা। বিজলি আলো আগে এদিকটায় ছিল না—টিম টিম করত লণ্ঠনের আলো, বড় দোকানে হ্যাজাক কিংবা ডে-লাইট জ্বলত—এখন সবই কত পালটে গেছে—জুন জুলাই মাস। শীতকাল শুরু বোধহয়, এই হেমন্তের হাওয়ার মতো মেজাজি ঠাণ্ডা হাওয়া, বেশ আরামদায়ক—কেক হলে মন্দ হবে না। মুখার্জি বললেন, 'নে।'

ওদের কেক দিয়ে কাউন্টারের দিকে চলে চলে যুবতী। অন্য সময় হলে, কত কথা বলত তারা, মেয়েটির কাছ থেকে দ্বীপের নানা খবরও নিত, কিন্তু আজ তারা এ সব কিছু ভাবতেই পারছে না।

সুরঞ্জন চায়ে চুমুক দিয়ে দু হাত ঝেড়ে কেমন কিছুটা মুক্ত হয়ে যাবার মতো বলল, 'মুখোসের

রহস্য বের করা গেল, তবে কি তোমাব মনে হয়, মুখোসটা সেকেন্ড চেয়ে নিয়েছিল ফাইভারের কাছে। ফাইভার কি জানত, মুখোসটা যে সেকেন্ডকে দেওয়া গেল। ডাইরিতে তার নাম লেখা চলবে না।'

যমের মতো জাহাজে সেকেন্ডকেই ভয় করত ফাইভার। যখন তখন সেকেন্ড ফাইভারকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করছে, পায়ের উপর জুতোর চাপ দিচ্ছে। ফাইভাবেব সহনশীলতাব পরীক্ষা। ফাইভারের কাজের ত্রুটি থাকত বলে তাঁরা বিশ্বাস করতে পারত না। অথচ সেকেন্ড ঠিক ত্রুটি খুঁজে বের করত। মেজাজ গরম করে ফেলত। অমানুষিক নির্যাতন। চোখে দেখা যায় না।

মুখার্জি শুধু 'হুঁ' উচ্চারণ করলেন।

মুখার্জি আলগা করে এক টুকরো কেক মুখে ফেলে বললেন, 'আট নম্বর মুখোসেব তবে এই পরিণতি। যাকগে, এখন কি করবি বল্। আমার তো মনে হয় চার্লিকে সোজাসুজি বলা দবকার—সুহাসের জীবন বিপন্ন। হয় তোমার ছদ্মবেশ খুলে ফেলতে হবে, নয় সুহাসের সঙ্গে তোমার মেলামেশায় আমরা বাধা দেব। দবকারে কাজ বন্ধ করে দেবার হুমকি দেওয়া যেতে পারে।'

'ওতে কি কাজ হবে।' সুরঞ্জনের মধ্যে কেমন দ্বিধা দেখা গেল। তারপর কি ভেবে বলল, 'চার্লি যে মেয়ে, ফাইবার কি টের পেয়েছিল তোমার মনে হয়?'

'নির্ঘাত টের পেয়েছে। আর তোকে বলে রাখি, ফাইভার নিজেও জানত। রাতে গোপনে ডেরিক তুলে রাখতে সেও যেতে পারে। তবে এটা যে তার মাথায় ভেঙে পড়বে সে আঁচ করতে পারেনি। পকেটে তার বউয়ের ছবি, সুহাস ঠিকই ধরেছে, পকেটে ছবি নিয়ে সে কখনও জাহাজে ঘোরাঘুরি করেনি। কারণ জাহাজই তার নিরাপদ জায়গা মনে হয়েছে। কিন্তু সেদিন সকালে সে জানত কেউ খুন হবে। ডগওয়াচের শেষে সে-ই গোপনে ডেবিক তুলেছে কারও নির্দেশে। নিজের পকেটে ছবিটা রেখেছে আতঙ্কে।

'তিনি কে?'

'আমি জানি না, তিনি কে? তবে আমি জানি, আমাদের মতো আবও অনেকে টের পেযে গেছে চার্লি মেয়ে। আমি নিজেও বুঝেছিলাম চার্লি মেযে। চার্লির কথাবার্তা, চাউনি, সুহাসের দিকে তাকালে সহজেই তাকে ধরা যায়, একজন পুরুষ কখনও পুরুষের দিকে ওভাবে তাকায় না। মেয়েলি চাউনি, কান্নি মেরে দেখা মেয়েদের স্বভাব—হাঁটাচলায়ও বোঝা যেত। তোকে খুলেই বলছি, আমিও মাঝে মাঝে বের হয়ে পড়তাম। গোপনে খুঁজে দেখতাম, ওরা কোথায় যায়, কি করে। চার্লির প্রতি সুহাসের আকর্ষণ প্রবল। ভাল লাগছিল না। নিষ্পাপ ছেলেটা বেঘোরে মারা পড়বে শেষে!'

'তুমি দেখেছ কিছু? ওরা কিছু করছিল!'

'না, কিছুই দেখিনি। ছেলেমানুষের মতো সুহাস গলা ছেড়ে গান গেয়েছে। জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছে। বুনো ফুলের খোঁজে গেছে, ছবি এঁকে দেখাত, কখনও সে নিবিষ্ট মনে চার্লির ছবি আঁকা দেখেছে, সরল শিশুর মতো। চার্লির ছবির হাত খুবই সুন্দর—অবাক হবারই কথা। নির্দোষ মেলামেশা।'

'তা হলে আর এত ভাবছ কেন?'

'ভাবছি। কেন যে ভাবছি নিজেও ঠিক বুঝতে পারছি না।' মুখার্জিকে খুবই বিমর্ষ দেখাচ্ছে।

সুরঞ্জন বিল মিটিয়ে দেবার সময় বলল, 'মুখোসটা সেকেন্ড নিজের কেবিনে রাখল না কেন? বাতিল ঘরটায় ফেলে রাখল কেন। কি মোটিফ মনে হয়?'

'তেমন কিছু না। এ নিয়ে ভাববার কারণ আছে বলে মনে হয় না। সেকেন্ড মনে করতে পারে, মুখোসের কথা চাউর হয়ে গেলে খোঁজাখুঁজি হতে পারে। কাপ্তান নিজেই সর্বত্র খুঁজে দেখতে পারেন। সেকেন্ড সেই আতঙ্কে হয়তো রাখেনি। বাতিল ঘরে রেখে দিয়েছে।'

'তুমি যে বলছ, কাপ্তান সেকেন্ডকে চার্লির পেছনে লাগিয়েছেন!'

মুখার্জিদা খেপে গেলেন, 'বোঝার চেষ্টা করবি। না বুঝে কিছু বলবি না। লেলিয়ে দিয়েছেন কি বলেছি! সংশয়ের কথা বলেছি, লেলিয়ে দিতে পারেন বলেছি।'

'তবে এখানে একটা গণ্ডগোল থেকে যাচ্ছে না?'

'গণ্ডগোল কি একটা, চার্লি কিছুই তার বাবাকে বলছে না, বললেও কাপ্তান ঢোক গিলে হজম

করছেন। মুখোসের কথা জাহাজে চাউর হয়ে যাক চান না। এতে তাঁর নিজেরও বিপদের আশঙ্কা থাকতে পারে।'

'বিপদ, কিসের বিপদ!'

'তা তো জানি না। শোন, কাল সকালেই আমি বের হয়ে যাচ্ছি। জাহাজে ফিরতে রাত হয়ে যেতে পারে। তোরা সাবধানে থাকবি। বংশীকে ভাল ঠেকছে না। উন্মাদ হয়ে গেছে। বাঙ্কারে আগুন লাগাবার চেষ্টা করছিল। নির্বোধ। কয়লায় আগুন ধরে গেলে রক্ষা আছে! বেটা নিজেও পুড়ে মরতে পারে। জাহাজে আগুন ধরিয়ে সব অপদেবতাদের নাকি ভাগাতে চায়। জাহাজটা জ্বলে গেলে, অপদেবতারাও সব পুড়ে মরবে। বোঝো এবার—কি নিয়ে আমরা জাহাজে আছি। তবে কাউকে বলতে যাস না। বংশীকে নিয়ে টানাটানি শুরু হবে। বাতিল ঘরটায় বংশীকে নির্বাসনেও পাঠিয়ে দেওয়া হতে পারে। এত বড় অপরাধের শাস্তি জাহাজে কি, আমি নিজেও জানি না।'

সুরঞ্জন বিরক্ত হয়ে বলল, 'মজার ব্যাপার! মেয়েকে ছেড়ে দিয়েছেন আবার পেছনে লোকও লাগিয়ে রেখেছেন। কি রাগ হচ্ছে না! তার সঙ্গে কলিজ জাহাজের সুড়সুড়ি, গুপ্তধন, সি-ডেভিল লুকনোর—আছি বেশ।

কলিজ জাহাজে কোনও গুপ্তধন যদি থাকে! থাকা অস্বাভাবিক না। এই গুপ্তধনের খোঁজে কাপ্তান মিলার রিফ একসপ্লোরারে হয়তো যাবেন। নিউপ্লাইমাউথেই খবর পেয়েছিলেন হয়তো, রিফ একসপ্লোরার প্রবাল সমুদ্রের তলদেশে গবেষণার কাজ চালাতে যাচ্ছে। খবরের কাগজে যে কোনও অভিযানের কথাই ফলাও করে প্রচারিত হয়। ছবিটবিও প্রকাশ করা হয়।

কাপ্তান মিলার যোগাযোগ করে হয়তো জেনেছেন, জাহাজ ডুবির জায়গাতেই তারা অনুসন্ধানের কাজ চালাবে। সঙ্গে পাঁচ জন ডুবুরি এবং গবেষণাগারও থাকছে। অ্যালেন পাওয়ারের চিঠিটি আর একবার ভাল করে দেখা দরকার। ফিল কলিজ জাহাজের ধ্বংসাবশেষই বা পাহারা দিচ্ছে কেন! যাই হোক কলিজে এমন কোন্ গুপ্ত ব্যাপার আছে যা ফিলিপ এবং কাপ্তান মিলার দুজনেই জানেন।

বেশ রাত হয়ে গেছে ফিরতে। সুরঞ্জনকে আগে নৌকায় পাঠিয়ে দিয়েছেন মুখার্জি। জাহাজে একসঙ্গে উঠে যাওয়া বিপজ্জনক। সুরঞ্জনের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ। নাটকটা জমেও গেছে। কাজেই তিনি পরের নৌকায় জাহাজে উঠে এলেন। সুহাসকে সব বলা দরকার। চার্লিকেও।'

চার্লিও কোনও বড় রকমের ষড়যন্ত্রের শিকার। মুখার্জি এটাও কেন যে না ভেবে থাকতে পারছেন না। একটি স্বাভাবিক জীবনকে এভাবে অস্বাভাবিক করে রাখার কী হেতু থাকতে পারে! চার্লিকে বলা দরকার—সেকেন্ড মুখোশ পরে তোমাকে অনুসরণ করছে। কেন করছে, সে তো এমনিতেও অনুসরণ করতে পারত। মুখোশের দরকার হচ্ছে কেন। সামনাসামনি পড়ে গেলে ধরা পড়ে যাবার ভয়। তাই কি কখনও হয়। কত রকমের অজুহাত সৃষ্টি করা যায়। মুখোশ পরার দরকার হচ্ছে কেন! লোকটা কি কোনও বিকৃত রুচির শিকার!

কি কারণ! খুলে বলো চার্লি। নিশ্চয় কিছু জানো তুমি, বলছ না। কেন বলছ না, কেন বলতে পারছ না। রিফ একসপ্লোরারে কি তুমি যাচ্ছ। যাচ্ছ মানে, কাপ্তান কি তোমাকে সঙ্গে নেবেন। নিলে খুব ভাল হয়। দ্যাখ চার্লি, অকপট না হলে আমরা কিছুই করতে পারব না। তারপর কেমন হতাশ হয়ে পড়লেন। চার্লিকে জেরা করার কোনও অধিকারই নেই তাঁর। তিনি জাহাজের সামান্য কোয়ার্টার মাস্টার। তার উপর নেটিভ ইন্ডিয়ান। চার্লি সাহায্য না চাইলে তিনি আগ বাড়িয়ে কিছুই করতে পারেন না।

সুহাস পারত। সে তো গ্রাহ্যই করছে না। এমনকি চার্লি সম্পর্কে কোনও খবরও আর দিচ্ছে না। উলটে তাঁকেই সন্দেহ করছে। কি যে করা।

জাহাজে উঠে ফোকসালে ঢুকে গেলেন মুখার্জি। রাত বারোটা থেকে সকাল আটটা একটানা গ্যাঙওয়েতে ওয়াচ দেবেন। ডেকসারেঙ রাজি হয়েছেন। রাত জাগতে কার আর ভাল লাগে। তার

দুজন জুরিদার। তারাও খুশি। হঠাৎ মুখার্জিবাবুর মাথায় পোকা ঢুকে গেল কেন, তারা ভেবে পাচ্ছে না হয়তো। যাই হোক এখন গিয়ে খেয়েদেয়ে সুহাসের সঙ্গে কথা বলা দরকার। তাঁর ফোকসালে ডেকে পাঠালে সুহাস দৌড়ে চলেও আসবে।

তিনি নিচে নেমে দেখলেন, ডেক-জাহাজিরা অনেকেই জাহাজে ফেরেনি। বংশী কোথায়! বংশীও তো নেই। সে গেল কোথায়। ছোট টিন্ডাল বলল, বংশীকে নিয়ে অধীর কিনারায় গেছে। ঘড়ি দেখলেন তিনি। রাত ন'টা বাজে। সুহাস কোথায়! সেও কি কিনার থেকে ফিরে আসেনি? এত রাত করছে ছোকরা! সবাই না ফিরলে, হাত মুখ ধুয়ে রাতের খাওয়াও সারা যাচ্ছে না।

অধীর বংশী সিঁড়ি ধরে তখন নেমে আসছে। বংশী ফিরে আসায় কিছুটা যেন হালকা হতে পারলেন, সুহাস ফিরে এলে উদ্বেগ আরও কমে যাবে।

ফোকসালে তিনি ঢুকে কিনারার পোশাক খুলে ফেললেন। পাতার টুপিটা মাথায় আছে। ওটা খুলে হুকে ঝুলিয়ে রাখলেন। সুযোগ বুঝে টুপিটা সুরঞ্জনকে ফিরিয়ে দিতে হবে। না দিলেও সুরঞ্জন কিছু মনে করবে না। টুপিটা বরং রেখেই দেবেন ভাবলেন। প্রয়োজনে কাজে লাগাবেন। দরকারে সুরঞ্জন না হয় আর একটা পাতার টুপি কিনে নেবে।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ।

তিনি উঁকি দিলেন।

ডেক টিন্ডাল এবং দু-জন ডেক জাহাজি কিনার ঘুরে এল। একজনের মাথায় একটা বস্তা।

তখনই দেখল, সুরঞ্জন আর সুহাস সিঁড়ি ধরে একসঙ্গে নামছে।

খেতে বসে পাতে শাক পেয়ে সবাই খুশি। কিনার থেকে কেউ শাক তুলে এনেছে। মাংস কেউ ছুঁয়েও দেখল না। টাটকা মাছের ঝোল—হোক না সামুদ্রিক মাছ, তবু টাটকা শাক-সবজি মাছ খাওয়ার আনন্দই আলাদা। সবার একটু বেশিই খাওয়া হয়ে গেল। নিচে নামার সময় মুখার্জি সুহাসকে ইশারায় তার ঘরে যাওয়ার কথা বলে গেলেন।

দরজা খোলাই ছিল। তবু সুহাস একবার টোকা দিল।

মুখার্জি বললেন, 'আয়।'

সুহাস ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। মুখার্জিদার কড়া হুকুম—দরজা খুলে কোনও কথা নয়। দরজা বন্ধ করে কথা।

সে বলল, 'হঠাৎ ডাকলে।'

'বোস কথা আছে।'

সুহাস বলল, 'আমারও কথা আছে।'

কাগজের প্যাকেটটি মুখার্জি দেখতে পাননি। মুখার্জিকে অবাক করে দেবার জন্য হাত পেছনে রেখে সুহাস কথা বলছিল। পরে কাগজের প্যাকেটটি এগিয়ে দিল।

'কে দিল!' মুখার্জি কিছুটা অবাক।

তারপর বললেন, 'কি আছে এতে?'

'কি আছে খুলে দ্যাখ না। 'কলিজ' নিয়ে তো তোমার মাথা খারাপ। 'কলিজ' রহস্য—খুলে দ্যাখ না।'

তিনি প্যাকেটটি উলটে পালটে দেখলেন। বিশ্বাসই হচ্ছে না। 'কলিজ'-রহস্য সুরাহা করার জন্য তাকে কেউ কিছু দিতে পারে! বললেন, 'কে দিল?'

'চার্লি। চার্লি হাতের কাছে যা পেয়েছে দিয়েছে। তোমার যদি কাজে লাগে?'

'চার্লি আমাকে দেখতে দিয়েছে, না তোকে!'

'আচ্ছা ফিচেল লোক তো তুমি! তুমি এত জেরা করছ কেন বলো তো! চার্লি তো সাধ্যমতো চেষ্টা করছে। সে আমাকে দিল, কি তোমাকে দিল, কি আসে যায়!'

যাক তবে সুহাসের তার প্রতি আর কোনও সংশয় নেই। চউপ বলায় সুহাস খুবই খেপে ছিল। ছোঁড়ার মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে।

খামের ভিতরে এক গাদা ছবি। 'কলিজ' জাহাজের ছবি। জাহাজটা ডুবছে। তার ছবি। অসংখ্য সেনা দড়ির সিঁড়ি বেয়ে আত্মরক্ষার জন্য নামছে, সাঁতার কাটছে—লাইফ বোট দুলছে ঢেউয়ে। উদ্ধার কার্যের এমন যাবতীয় ছবি দেখতে দেখতে সহসা মুখার্জির মুখে আত্মপ্রসাদের হাসি ফুটে উঠল। বললেন, চার্লি এ সব ছবি বইপত্র কোথায় পেল?'

'জানি না। কিছু বলেনি। ঘোড়ায় চড়তে পারছি না বলে খেপে আছে। কথা বন্ধ। আমি আনাড়ি, আমার কিছু হবে না। যা মুখে আসে বলল। দ্যাখ না, বলে সে তার হাত পা জামা প্যান্ট টেনে দেখাল। ছাল চামড়া উঠে গেছে। সে চেষ্টা করছে। চার্লি সহজে ছাড়ছে না এও বুঝতে পারলেন মুখার্জি। খুশি হলেন। বললেন 'হয়ে যাবে।'

'জানো, উঠে বসতে পারছি। কিন্তু ঘোড়া কদম দিলেই কেমন মাথা ঘুরতে থাকে। কেবল মনে হয় এই বুঝি পড়ে গেলাম।'

'ও ঠিক হয়ে যাবে। আমারও হত। সাইকেল আর ঘোড়া, একবার চড়ে বসতে পারলে ঠিক তর তর করে পালে হাওয়া লেগে যায়।'

সুহাস কিছুটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল বলতে গিয়ে 'জানো, চার্লি না বাতাসের আগে ছুটতে পারে। ইস কোনও ভয় ডর নেই। ঘোড়াটাব পেটে গুঁতো মারলেই হল। লাগাম ধরে কোন্‌দিকে কিভাবে টানলে, খুশিমতো ঘোড়াকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাও দেখাল। আচ্ছা তোমরাই বল, এক দুদিনে হয়!'

মুখার্জি পাতা উলটে যাচ্ছেন। আর ছবি দেখে বলছেন, 'কলিজ' জাহাজে দেখছি একটা বিশাল লাউনজও আছে। প্রমোদ তরণীর খোলনলচে পালটে ফেললেও লাউনজ দেখছি অক্ষত রেখেছিল। আরে দেখছিস? এই সুহাস—দ্যাখ লাউনজের দু-পাশে দুটো গ্রিক দেবীর মূর্তি। ঘোড়ার পিঠে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দুই নারী। লাউনজের ছবিট দেখেছিস!' বলে সুহাসের সামনে এগিয়ে ধরলেন ছবিটা।

'প্রমোদ তবণীর লাউনজে ফুর্তিফার্তাও চলত। জোড়ায় জোড়ায় সম্ভ্রান্ত নারী পুরুষ। কারও চোখে চশমা, হাঁটুর উপর সংবাদপত্র। পায়েব উপর পা তুলে বসে আছেন। কেউ একা নিবিষ্ট মনে তাস খেলছেন। ওদিকটায় দ্যাখ—থামের আড়ালে নারী-পুরুষ কত ঘনিষ্ঠ—টেবিলে টেবিলে হুইস্কি, শ্যাম্পেনের ফোয়ারা—আর মাথার উপর দুই নারীমূর্তি আর এক সিঙ্গি ঘোড়া। কিন্তু ঘোড়ার আবার শিং হয় কখনও।'

'ঘোড়াটা দেখেছিস? আরে দ্যাখ না!'

'দেখেছি।'

'এটা আবার কি রকম ঘোড়া! ঘোড়াব কখনও শিং থাকে। তাও আবার একটা শিং!'

সুহাস ছবিটা দেখে বলল—'এটা ঠিক ঘোড়া নয়। চার্লি তো বলল, ওটা গ্রিক ও ল্যাটিন লেখকদের বর্ণিত এক রকমের একশিঙ্গি অশ্বাকৃতি কল্পিত জন্তুবিশেষ। ওটা ঠিক ঘোড়া নয়।'

লাউনজের ছবিটা খুবই আকৃষ্ট করছে মুখার্জিকে। তিনি ঝুঁকে দেখছেন। সুসজ্জিত বিশাল কক্ষ—কারুকাজ করা থাম, আলোর বাহার। নাচের আসর বেশ জমে উঠেছে। ছবিটা দেখলে এমনই মনে হবার কথা। চার পাশে সম্ভ্রান্ত পোশাকে নরনারীর নানা ভঙ্গিমার ছবি। কার্পেটের নীল রঙটাও যেন খুব তাজা। থামের আড়ালে এক জোড়া দম্পতি উঁকি দিয়ে কি যেন দেখছে। তাঁর কেন যে মনে হল এক সিঙ্গি ঘোড়া তাদের কোনও কারণে কৌতূহল উদ্রেক করছে। শিল্পীর তরিফ করতেই হয়। নেহাতই ছবি, না কোনও ফলক অথবা ঢালাই-এর কাজ করা কোনও ভাস্কর্য, বোঝা কঠিন। নারী দু-হাত মেলে দিয়ে যেন ঘোড়ায় চড়ে উধাও হয়ে যেতে চাইছে।

কোনও দুর্মূল্য ভাস্কর্য কি না কে জানে!

আসলে চার্লির বাবা কাপ্তান মিলার হয়তো সুযোগ খুঁজছিলেন। সমুদ্রের তলায় 'কলিজ' জাহাজে অনুসন্ধান চালাতে হলে ডুবুরির দরকার। খুবই ব্যয়সাপেক্ষ বলে রিফ এক্সপ্লোরারকে দিয়ে যদি কাজটা ফাঁক তালে করিয়ে নিতে পারেন। আর কিছু না পারলেও 'কলিজ' কতটা জলের তলায়, এবং ডাঙ্গা থেকে কত দূরে, কি ভাবে জলের তলায় ডুবে আছে তার মোটামুটি একটা হিসাব পেয়ে যেতে পারেন।

আর যদি কোনও গুপ্তধন কিংবা দুর্মূল্য ভাস্কর্য উদ্ধারের ব্যাপারে থাকে তা হলেও রিফ এক্সপ্লোরারের সাহায্য নিতে পারেন। তারপরই মনে হল অত বোকা নন তিনি। গুপ্তধন উদ্ধারে তিনি তার নিজের লোকজনের উপরই বেশি নির্ভর করবেন। প্রাথমিক কাজটুকু সেরে নেওয়ার জন্য তিনি রিফ এক্সপ্লোরারে হয়তো যাচ্ছেন।

তবে কলিজ জাহাজের সঙ্গে চার্লির অস্বাভাবিক জীবনযাপনের কী সম্পর্ক থাকতে পারে এটা কিছুতেই তাঁর মাথায় আসছে না।

তবু যা হোক কিছু গুরত্বপূর্ণ নথিপত্র পাওয়া গেল।

তারপরই কি ভেবে মুখার্জি সুহাসকে প্রশ্ন না করে পারলেন না, 'তোকে এগুলি চার্লি দেখতে দিল কেন?'

'বলল, 'কলিজ' জাহাজের খবর চেয়েছিলে—এগুলি পেলাম। চার্লি তো আর কিছু বলল না আগেও তো দিয়েছে।'

'চার্লি জানে, খবরটা আমার জানা দরকার? তোর নয়।' মুখার্জি পাতা উলটে যাচ্ছেন কাগজটার—তার দিকে তাকাচ্ছেন না।

'তা জানে কি না জানি না। বললাম না, চার্লি ভাবে নিশ্চয়ই আমার কোনও জরুরি দরকার আছে!'

'দরকারটা কিসের। এমন প্রশ্ন চার্লির মনে উদ্রেক হবে না! হঠাৎ কেন 'কলিজ' নিয়ে পড়লি, তার সংশয় হবে না! কোনও প্রশ্ন না করেই তোকে দিয়ে দিল! তার বাবার বিপদ হতে পারে। ধরা পড়লে যে আরও দু একটা খুন হবে না জাহাজে কে বলতে পারে।'

সুহাসের মুখ বড় ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। সে কিছুটা বিব্রত গলায় বলল, 'তা হলে দিয়ে দাও। সকালেই ফেরত দেব। বলব, না আমার কোনও দরকার নেই। 'কলিজ' নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই, বললেই হবে।'

মুখার্জি হেসে ফেললেন। '—তোর না থাকলেও তার আছে। আর তুই যতই মনে করিস, আমাকে ভাল জানে না, মুখ চেনা, আর দশটা জাহাজির মতোই হয়তো আমাকে ভাবে—আমি কিন্তু তা মনে করি না। চার্লি জানে জাহাজে আমরা সংখ্যায় বেশি। শুধু বেশি নয়, সংখ্যায় প্রায় আমরা ওদের দশগুণ। কোন বিপদে তোর পেছনে আমরা সবাই আছি এটা সে ভালই বোঝে। তোর পেছনে থাকা মানে, চার্লির বিপদেও আমরা আছি। এটাও সে ভালই বোঝে। তুই যাই নিয়ে আসিস না কেন, সে বোঝে, একা তুই দেখছিস না, আরও কেউ কেউ দেখছে। মুখে বলতে হয় বলা, দ্যাখো সুহাস ঘুণাক্ষরে কেউ যেন টের না পায়। টের পেলে সাংঘাতিক কিছু যে ঘটে যেতে পারে না সে তা ভালই জানে। তোকে সাবধান করে দিয়ে আসলে ইঙ্গিতে সবাইকে সাবধান করে দেয়। বুঝলি কিছু?'

সুহাস জবাব না দেওয়ায় তিনি তার দিকে তাকালেন। সুহাস এত জটিল ব্যাপার-স্যাপার ভাল বোঝেও না। সে খুবই কাতর হয়ে পড়ে। মুখ দেখলে মায়া হবারই কথা। তখন মুখার্জির খুব খারাপ লাগে। সুহাস যে খুব ঘাবড়ে গেছে বুঝতে অসুবিধে হয় না।

তবে একেবারে আনাড়ি সুহাসকে তিনি ভাবতে পাবেন না। ম্যাকের পকেটে স্ত্রীর ছবিটাই তার প্রমাণ। সুহাসই বলেছিল, 'উইনচে কাজ করতে যাবার সময় সে তার স্ত্রীর ছবি রাখবে কেন বলো? নিরাপদ জায়গায় সে কখনও স্ত্রীর ছবি রাখে না। ভীতু স্বভাবের কি না জানি না, তবে ছবিটা পকেটে থাকায় আমার মনে হয়েছে, জাহাজে কিছু ঘটছে এমন আঁচ করছিল।'

মুখার্জি হাওয়া পাইপ ঘুরিয়ে দিলেন। বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। উঠে গিয়ে লকার খুললেন। লকারে সব রেখে দিলেন যত্ন করে। বললেন, 'তোকে একটা কাজ করতে হবে। জিজ্ঞেস করবি অ্যালেন পাওয়ার বলে কাউকে চেনে কি না চার্লি। চিনলে, সে কবে কখন তাকে কোথায় দেখেছে। অ্যালেন কাপ্তানকে চিঠি দেয়। তাকে দেয় কি না তাও খবর নিবি। অ্যালেন তার আত্মীয় কি না, কিংবা অ্যালেন তার বৈমাত্রেয় ভাই ভগিনীপতিদের কেউ যদি হয়। নামটা মনে থাকবে তো? যদি মনে করতে না পারে

বলবি, বোথ-বে-হাববার থেকে অ্যালেনের চিঠি আসে। 'কলিজ' সম্পর্কে সে অনেক খবর রাখে। মনে হয় মার্কিন সামরিক দপ্তরে কাজটাজ করে।'

একটু থেমে বললেন, 'মনে থাকবে তো নামটা।'

'অ্যালেন পাওয়ার।'

'বেশ তো মনে রাখতে পারিস। ম্যাকের পকেটে স্ত্রীর ছবিটা রাখার ব্যাপারে তোর ধারণাই সত্য। তোর বুদ্ধির সত্যি তারিফ করতে হয়। ম্যাক জানত, ডেরিক কারও মাথায় ভেঙে পড়বে। সে নিজে গিয়েছিল ডেরিক তুলতে। গভীর রাতে ডেকে তখন অন্ধকার। লগবুক ঘেঁটে দেখলাম, জেনারেটার অচল, স্ট্যান্ড-বাই জেনারেটারও চালু করা যায়নি। লগবুক ঘেঁটে উদ্ধার করেছি। অন্ধকারেই কাজটা সারা হয়েছে। শোনপাটের হলুদ রঙের দড়ির বাকি অংশটা পাওয়া গেছে। ওতে রক্তের দাগ আছে। অন্ধকারে ছুরি দিয়ে দড়ি কাটতে গিয়ে হাতফাত কেটেছে মনে হয়। রক্তে মাখামাখি দড়িটা। খুনি হাতে খুবই বড় রকমের চোট পেয়েছে।'

'দড়ির বাকি অংশটা কার কাছে আছে?' সুহাস না বলে পারল না।

'যেখানেই থাক ঠিকই আছে। যে রেখে দেবার সে ঠিকই রেখে দিয়েছে। বেচারা ম্যাক জানতই না, সে তার নিজের কবর নিজেই খুঁড়েছে। খুব খারাপ লাগে ভাবলে।'

সুহাস বলল, 'ম্যাককে খুন করে কি লাভ!'

'লাভ কি জানি না, তবে ম্যাক টের পেয়ে গেছিল, চার্লি মেয়ে। হয় চ

ার্লির আচরণে আততায়ী টের পেয়েছে নয়তো, চার্লি তার বাবাকে কোনও নালিশ দিয়েছিল। 'আচ্ছা হাতে ব্যান্ডেজ বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে এমন কাউকে কখনও দেখেছিস?'

'নালিশ কেন? হাতে ব্যান্ডেজ! কিছু বুঝছি না।'

'বলতে পারে, ম্যাক যখন তখন আমার কেবিনে ঢুকে পড়ছে। আরও কিছু বলতে পারে। চার্লির সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার। কিন্তু কোথায় কী ভাবে কে নজরদারি চালাচ্ছে তাও বুঝতে পারছি না। শেষে খুনের সূত্র খুঁজতে গিয়ে নিজেই না আবার হজম হয়ে যাই।'

সুহাস বলল, 'আচ্ছা তুমি কি বলত! ম্যাক অসময়ে ডেরিক তুলতে কেন যাবে! তার কি দরকার!'

'সে কি আর নিজে গেছে। তাকে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। এবং সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায় তিনি তাব ওপরওয়ালা। এমন ওপরওয়ালা যাকে যমের মতো ভয় পেত ম্যাক। অন্ধকারে ডেরিক তোলার কি মানে, ফসকা গেড়ো দেবাব কি মানে সে সবই বুঝতে পেরেছে। কিন্তু তার হুকুম পালন করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। শুধু তাই না। হুকুম গোপন করারও শর্ত ছিল বোধ হয়।'

সুহাস সহসা খুবই অধীর হয়ে পড়ল—'আচ্ছা কি বলছ বল তো, জেনেশুনে সকাল বেলায় সে ডেরিকের নিচে গিয়ে তবে কাজ করতে পারে! হয় কখনও। সে তো জানে, যে কোনও সময় ডেরিক পড়ে যেতে পারে মাথায়।'

'সে জানে, তবে সে ভাবেইনি, তার মাথায় ডেরিক খুলে পড়বে! হ্যাঁ সংশয় ছিল, কখন না খুলে পড়ে। পকেটে ছবিটা রেখেছিল।'

'তাহলে আমি খুন হতে যাচ্ছি ম্যাক টের পেয়েছিল।'

'মনে হয়।'

সহসা সুহাস চিৎকার করে উঠল, 'কেন, কেন আমি খুন হতে যাব। আমি কি করেছি। আমার কি দোষ!'

মুখার্জি ওকে টেনে বসালেন। জাহাজ নোঙর ফেলে আছে বলে নিঝুম। একটা পিন পড়লেও শব্দ শোনার কথা। সিঁড়ি ধরে কেউ নেমে এলেও স্পষ্ট টের পাওয়া যায়। দুপদাপ শব্দ। উপরের ছাদে হাঁটাহাঁটি করলেও টেব পাওয়া যায়—এমন এক করুণ নৈঃশব্দ্যের ভিতর এই চিৎকার করে ওঠা কতটা মারাত্মক হতে পারে সুহাস যদি বুঝত।

'দোষ তোমার, চার্লির প্রেম। চার্লি তোমাকে ভালবাসে।'

'প্রেম বলছ কেন। আবার চার্লি। চার্লি মেয়ে তোমরা ধরেই নিয়েছ।'

'নিয়েছি। তোকে রক্ষা করার উপায় চার্লিই বাতলাতে পারে। ইচ্ছে করলে চার্লিকে তুই অ্যাভয়েড করতে পারিস। কিন্তু চার্লি ছাড়বে না। তোকে না দেখলে তার মাথা খারাপ হয়ে যায়। কিছুটা মনে হয় হিস্টিরিয়াগ্রস্থও হয়ে পড়তে পারে। ঝড়ের রাতে গভীর রাতের অন্ধকারে যে নারী ডেকে বেড়াতে পারে সে যে তার অবদমিত ইচ্ছার প্রকোপে ঘোরে পড়ে যায়। সে তার অবচেতন সত্তায় প্রস্ফুটিত হতে চায়। সে তো জানে না আসলে সে কি করছে! সে কিছু করে বসলে বলারও থাকবে না।'

'কিছু করে বসলে মানে?'

'সে মেয়েদের পোশাক পরে তোর কেবিনে গট গট করে নেমে আসতে পারে। চিৎকার করে বলতে পারে, মি গার্ল সুহাস। আমাকে ষড়যন্ত্রকারী জোর করে ছেলে সাজিয়ে রেখেছে। হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিলে এতদিনের সতর্কতা সব যাবে। এবং তার জন্য বড় খেসারতও দিতে হতে পারে যারা তাকে জোর করে মেয়ে সাজিয়ে রেখেছে।'

'তুমি কি বলছ!'

'ঠিকই বলছি। আমার মাথার মধ্যে নানা প্রতিক্রিয়া চলছে। তোকে ছাড়া তারা চার্লিকে শান্তও রাখতে পারবে না। কোনও দুর্ঘটনায় তোর মৃত্যু হলে চার্লি শোকে মূহ্যমান হয়ে যেতে পারে—কিন্তু কাউকে দায়ী করতে পারবে না সে জন্য বার বার ফাঁদ পাতা হতে পারে। তোর ক্ষতি করা সহজ কাজ না ষড়যন্ত্রীরা ভালই বোঝে।'

সুহাসের গলা খুবই নির্জীব শোনাল!

'তা হলে ঘোড়ায় চড়া আমার ঠিক হবে না বলছ?'

'কেন ঠিক হবে না!'

'ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে যদি মরে টরে যাই।'

'ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে অত সহজে কেউ মরে না। আর ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে যদি সত্যি মারা যাস—তবে তোর মরাই ভাল।'

'চার্লির সঙ্গে একা বের হতে কি বারণ করছ।'

'না, তা করব কেন।'

'কি করি বল তো?'

'কিচ্ছু করতে হবে না। যা বলছে করে যা। আমাদের লোক তোর পিছনে পাহারায় থাকবে।'

'কে?'

'কে জেনে লাভ কি? থাকছে। থাকবে। চার্লি কেন, কোনও দুরাত্মাও বুঝতে পারবে না, তারা তোমায় অনুসরণ করছে। আমিও এক সময় করেছি।'

'জানি।'

তারপর থেমে বলল, 'মুখোশধারী তবে তুমি?'

'না।'

'তবে মগড়া!'

'না।'

'তবে কে?'

'সেকেন্ড ইনজিনিয়ার বব। সাবধান, কেউ যেন না জানে। চার্লিও না। মুখোশের সূত্র ধরেই আমরা এগোচ্ছি।

সেকেন্ড ইনজিনিয়ার বব! সে কিছুতেই কেন জানি বিশ্বাস করতে পারছে না। মানুষটা দাম্ভিক, চাপা স্বভাবের। তাদের সঙ্গে আজ পর্যন্ত একটা কথা বলেনি। সারেঙকেই ডেকে কাজ বুঝিয়ে দেয়। গঙ্গাবাজু ধরে হেঁটে এলে সেকেন্ড, জাহাজিরা যমুনাবাজু ধরে হাঁটতে থাকে। বেঁটেখাটো মানুষ—চোখ পিংলা, চুল পাতলা, সব সময় মনে হয় অদ্ভুত রাশভারী। সেই লোক এমন একটা জঘন্য কাজে লিপ্ত ভাবতেও খারাপ লাগছে। সে উঠে পড়ছিল।

মুখার্জি বললেন, হাতে সময় নেই। চার্লি তার কাকার কোনও খবর রাখে কি না। রাখলে কোথায় আছেন তিনি! কি নাম। কি কাজ করতেন। সব জেনে নিবি।'

'চার্লির কাকা রাচেল জাহাজডুবিতে মারা গেছেন।'

'জাহাজডুবি! কোথায়। কবে?'

'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়।'

উত্তেজনায় অধীর হয়ে পড়ছেন মুখার্জি। তিনি স্থির থাকতে পারছেন না।

'কোথায় মারা গেছেন! জাহাজের নাম কি!'

'তা জানি না।'

'কোন্ সমুদ্রে!'

'তাও জানি না।'

'তাব নাম কি ফিল।'

'তাও জানি না। বলে তো আঙ্কিল রাচেল। ফিল হবে কেন?'

'তবে কি জানিস, ঘণ্টা জানিস। এত করে বললাম, সব খবর নিবি। আমরা কি করব। একমাত্র তুই পারিস, তোর কাছেই চার্লি সব বলে। তার কাকার নাম জানতে হয় না। বুঝলি না, তার বাবা-কাকাকে সম্পত্তি থেকে তাব ঠাকুবদা বঞ্চিত করেছেন। ত্যাজ্য পুত্র। এত বড় সম্পত্তি বেহাত হয়ে গেলে মানুষের মাথা ঠিক থাকে! সম্পত্তি উদ্ধাবের জন্য একটা কেন, দশটা খুন করতে পাবে। আমার মনে হয়, ক্ষমতা-পাগল, আব অর্ধ-পাগল মানুষেরা সব পারে।'

সুহাস উঠতে যাচ্ছিল—মুখার্জি বললেন, 'শোন, তোর জেনে রাখা ভাল। সুরঞ্জনের সঙ্গে আমার কোনও মনোমালিন্য হয়নি। ইচ্ছে করেই দুজনে মিলে নাটক করেছি। আলাদা ফোকসালে না থাকলে, গোয়েন্দাগিরি কবার অসুবিধা হচ্ছিল। সুরঞ্জনকে ডাকি।'

সুহাস বলল, 'এত রাতে ডাকবে। শুনলাম তুমি নাইটওয়াচ নিয়েছ। টানা আটঘণ্টা রাত জাগলে শরীর খারাপ করবে না? একটু ঘুমিয়ে নিলে পারতে।'

'ও তোকে ভাবতে হবে না। সারাটা দিন ছুটি। রাত বারোটার আগে জাহাজে ফিরলেই হল। দরকারে ওয়াচে ঘুমিয়ে নেওয়া যাবে। আমার অভ্যাস আছে। দাঁড়িয়েও ঘুমোতে পারি। টুলে সারাক্ষণ বসে ঝিমোলে এত রাতে কে টের পাবে! টানা বারো চোদ্দ ঘণ্টা কিনারায় ঘুরে বেড়াতে পারব। কাউকে কৈফিয়ত দিতে হবে না।' তারপরই কি ভেবে মুখার্জি বললেন, 'এবারেও কি চার্লি তোকে নিয়ে বুনো ফুল খুঁজে বেড়াবে? ঘোড়ায় চরা শেখাচ্ছে—কিসের মতলবে।'

সুহাস বলল. 'এখানে নাকি ঘুরে বেড়াতে হলে হয় সাইকেলে না হয় ঘোড়ায়। অন্য কোনও যানবাহনের সুবিধা নেই নাকি? চার্লি তো সাইকেল চালাতে জানে না। আমিও না। ঘোড়ায় উঠে কদম দিতে শিখলেই প্রায় শেখা হয়ে যায়। আরও কত কথা বলল, ঘোড়ার পিঠে চেপে বসতে পারলে—সে নাকি কখনও বেইমানি করে না। চেপে বসাটা জানা দরকার। বাকিটা ঘোড়া নিজেই দায়িত্ব নিয়ে নেয়। ছুটবে ঝোপ জঙ্গল ডিঙিয়ে যাবে—কিছুতেই ঝেড়ে ফেলবে না পিঠ থেকে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে মরবে, তবু না।'

মুখার্জি হাসলেন। বললেন, 'আমি অশ্ব-বিশারদ নই। আমি জানব কি করে! চার্লির বাপ ঠাকুরদা ঘোড়ায় চড়ে মানুষ। সে আমার চেয়ে ভাল জানবে। গত সফরে কোনওরকমে টানাহ্যাঁচড়া করে শিখে ফেলেছিলাম। এ-সফরে দেখা যাক কতটা পারি। তারপর থেমে বললেন, 'চার্লিকে এখুনি মুখোশধারীর নাম বলা ঠিক হবে না, সে ঘাবড়ে যেতে পারে। চার্লি কি আজ কিছু টের পেয়েছে?'

'না তো! কি টের পাবে।'

'বব মুখোশ পরে আজও জঙ্গলে বসেছিল। টের পায়নি!'

'বলছ কি! আমি তো দেখলাম, মগড়া জঙ্গল থেকে নেমে যাচ্ছে। ডাকতেই ছুটে পালাল।'

'কলিজ' জাহাজডুবির জায়গাটার নাম সহসা মুখার্জি গুলিয়ে ফেললেন। তালপাতাব টুপি মাথায়। রোদ বেশ প্রখর। তিনি ঘোড়ায় চড়ে দুলকি চালে যাচ্ছেন। রাস্তার দু-ধারে কিছু বসতি আছে দেখতে পেলেন।

এদিকটায় দুটো টিলা ছিল—হয়তো ফসফেট কোম্পানি টিলার সব মাটি সরিয়ে নিয়েছে। দ্বীপের এই একমাত্র প্রাকৃতিক সম্পদ প্রায় লুণ্ঠন হচ্ছে বলা চলে। টিলা দুটো দেখতে পেলেন না। রাস্তায় সার সার ঘোড়ায় টানা মালগাড়ি দেখতে পেলেন। কাঠের বাক্সমতো— ফসফেট বোঝাই হয়ে খাড়ির দিকে যাচ্ছে। বাঁশের জঙ্গল দু-পাশে, অনাবাদি জমিগুলিতে নানা বর্ণের ফুল ফুটে আছে।

ঘাসের জমিগুলি পার হয়ে তিনি দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দেবেন ভাবলেন। জায়গাটার নাম কিছুতেই মনে করতে পারছেন না। ঘোড়ার লাগাম টেনে পকেট থেকে ডাইরি বের করলেন।

ঘোড়ার পিঠে চেপে বসে থাকা সহজ না। অভ্যাস না থাকলে সব সময় সতর্ক থাকতে হয়। তবু তিনি ডাইরির পাতা উলটে দেখলেন, জায়গাটার নাম এসপিরিতো সান্তু। সান্তু জায়গাটা কোথায়? কাছে কোথাও কি। তিনি মনে করতে পারলেন না, ফিলেব বাড়ির টিলায় দাঁড়িয়ে কাছে কোথাও কোনও দ্বীপ দেখতে পেয়েছিলেন কি না!

সামনে কিছুটা জলাভূমি। সমুদ্রের জল ভাটাব সময় এখানে হাঁটুর উপব থাকে না। ক্রোশ খানেক জলাভূমি সহজেই পার হয়ে যাওয়া যায়। তাবপর কিছুটা চরাই—পাথবের মালভূমির মতো জায়গাটা। ক্যাকটাস আর সব নাম না জানা গাছ। আখের চাষ হয় এদিকটাতে। পাহাড়ের ঢালু জমিতে তিনি সেবাবে মাইলের পর মাইল আখের চাষ দেখেছিলেন। আখের জমিগুলির পাশ দিয়ে উঠে গেলে, ঘণ্টাখানেকের পথ।

সমুদ্র বাঁ-দিকে পড়ে থাকল। কাছাকাছি কোথাও জাহাজ দেখতে পেলেন না। মোটর লঞ্চে মাদাঙ যাচ্ছে কিছু যাত্রী এবং পণ্য। দুটো ঘোড়াও লঞ্চে দেখতে পেলেন। এই অঞ্চলেব একমাত্র যানবাহন এখনও ঘোড়া। তবে এবারে তিনি রাস্তায় ফসফেট কোম্পানির গাড়ি দেখেতে পেয়েছেন। দ্বীপটার যথেষ্ট উন্নতির লক্ষণ দেখে ভালই লাগছিল। আখের জমিগুলি পাব হতেই দেখলেন, রাস্তার পাশে তামার ফলকে লেখা—গো আপ, ওঃ মাই ওয়ারিয়ার্স এগেনস্ট দ্য ল্যান্ড অফ মেরাথাইম অ্যান্ড এগেনস্ট দ্য পিপল অফ পিকো। তামার ফলক দেখে মুখার্জি কিছুটা অবাক হলেন। কিসেব সংকেত এটা ঠিক বুঝতে পাবলেন না। যেন কেউ বিধর্মীদের বিরুদ্ধে ফলকে যুদ্ধ ঘোষণা করে গেছে। গেল সফরে তামার এই সাইনবোর্ডটা ছিল কি না মনে করতে পারছেন না। ফলকের নিচে মাইলের হিসাব। খাড়ি থেকে দূরত্ব বোঝাতে চাইছে, না, ফিলের প্রাসাদের দূরত্ব এই ফলকে উল্লেখ করা হয়েছে, মুখার্জি তাও বুঝতে পারছেন না।

পাশে সুন্দর কাঠের গির্জা—কিন্তু কোনও লোকালয় আছে বলে মনে হল না। নিচে যতদূর চোখ যায়, বিশাল সব গাছের অরণ্য। একেবারে দিগন্তে গিয়ে মিশে গেছে। সহসা কেন যে মনে হল হয়তো এখান থেকেই ফিলের এলাকা শুরু।

এদিকটায় রাস্তা বেশ চওড়া। পাহাড় কেটে রাস্তা বানানো হয়েছে। মসৃণ। যুদ্ধের সময়কার না নতুন, তাও বুঝে উঠতে পারছেন না। ফিলের নির্দেশ মতোই সেবারে তিনি গিয়েছিলেন।—সমুদ্রের কিনারা ধরে যাবে। সমুদ্রের ধারে আমার বাড়ি। রাস্তা হারিয়ে ফেললে, সমুদ্রের দিকে চলে যাবে। অলওয়েজ অ্যাট লেফট—-মনে রাখবে। সমুদ্র বাঁ-দিকে থাকলে রাস্তা হারাবার ভয় থাকবে না।

এই দ্বীপগুলির সৌন্দর্য এমনিতেই মুগ্ধ কবে—কিছু সারস পাখি মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। দুটো ঈগল পাখিও দেখতে পেলেন। কাক, চড়াই এবং শালিখ পাখিও ওড়াউড়ি করছে। জঙ্গলে এক ধরনের ছোট্ট নীল রঙের বাঁদর হুটোহুটি করছে। নানা জাতের সরীসৃপও আছে। তবে রাস্তায় কিংবা জঙ্গলে তাদের দেখা পাওয়া গেল না। প্রাগৈতিহাসিক জীবের উত্তরসূরী এরা, ফিল তাকে এমনই বলেছিলেন। তিনি এই টিলাটায় উঠেও দেখলেন, সমুদ্রে তাঁর বাঁ-দিকেই আছে।

নিচে পাহাড় সোজা নেমে গেছে—দূরে কোথাও বড় জাহাজ চোখে পড়ছে না। রিফ এক্সপ্লোরার জাহাজটির কোনও চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আর সামনেই আবার একটি তামার ফলক—লেখা—শাউট উইদ জয় বিফোর দ্য লর্ড, ওবে হিম গ্ল্যাডলি, কাম বিফোর হিম, সিঙিং উইদ জয়।

আশ্চর্য, এ তো অদ্ভুত কথাবার্তা। কে লিখে রেখেছেন! কোনও ধর্মপ্রাণ মানুষ! না, সরকার থেকে এমন সব ঈশ্বর ভজনার কথা প্রচার করা হচ্ছে তিনি বুঝতে পারছেন না। এই দ্বীপগুলি ব্রিটিশদের। সরকার মনোনীত একজন কমিশনারের অধীন। নিউক্যাসেলে তার অফিস। তবে সবই শোনা কথা। দু আড়াই হাজার মাইল দূরত্বে বসে দ্বীপগুলি শাসন করাও কঠিন। অসংখ্য এমন সব কত দ্বীপ আছে যেখানে আজ পর্যন্ত মানুষের পদচিহ্নই পড়েনি।

তিনি যত এগুচ্ছেন তত ফলকের সংখ্যাও ক্রমে বেশি দেখতে পাচ্ছেন। ফলকগুলি ঝক ঝক করছে। তামাব না পেতলের এটা অবশ্য তিনি ঘোড়ার পিঠে বসে অনুমান করতে পারছেন না। একটা পাথরের উপব বসানো ফলকের সামনে এসে দাঁড়ালেন। হাত দিলেন। তবে তামার না পেতলের বোঝা গেল না।

তিনি কি রাস্তা ভুল করলেন—গত সফরে এ-ধরনের কোনও ফলক কি চোখে পড়েছে! কিছুতেই মনে করতে পারছেন না। তাঁর জল তেষ্টা পাচ্ছে, বোতল খুলে জল খেলেন। এখানে মিষ্টিজলের অভাব। শীত আসছে, বোধহয় কিছুটা হেমন্তের কাছাকাছি ঋতু। তবু রোদ প্রখর। তাঁকে আবার ফিরতে হবে বলেই সকাল সকাল জাহাজ থেকে নেমে এসেছেন—কিছু লোকালয় পার হয়ে গেলেন।

এদের জগাখিচুড়ি ইংরাজি না বুঝলেও ফিলের কথা বলায়, সবাই যে কি ভাবে সাহায্য করবে—কেউ কুর্নিশ পর্যন্ত করছে তাকে। পারলে তাকে আপ্যায়ন করে ঘরেও নিয়ে যেতে চাইছে। মিঃ ফিল, নামটার বোধ হয় খুব আর পরিচিতি নেই—তবে খাঁটি গোরা সাহেব এবং পাদ্রি বাবা বলতেই লোকগুলি তার ঘোড়ার পেছনে ছুটতে থাকল।

বাড়িগুলি অধিকাংশ কাঠের। মাথায় টালির ছাউনি। যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ। প্রায় নিশ্চিহ্ন। এখানে নতুন করে মানুষ যেন নতুন প্রেরণার উৎস থেকে ঘরবাড়ি বানিয়ে, চাষ আবাদ করে একটি ছিমছাম পৃথিবী গড়ে তুলতে চাইছে। মুখার্জি সেবারে ফিরে বেডরুমে পাদ্রির পোশাকও আবিষ্কার করেছিলেন।

ফিল কি তবে ধর্মযাজক।

তিনিই কি এই সব বাণী প্রচার করছেন ঈশ্বরের! হাজার হাজার মাইল ব্যাপ্ত সমুদ্রে কি তিনি, সেই কোনও সন্তের মতো নীল লণ্ঠন হাতে নিয়ে দুর্গম পথ পরিক্রমায় বের হয়েছেন! তাই যদি হয়, তবে অ্যালেন পাওয়ার বর্ণিত ডুবুরি মানুষটির সঙ্গে ফিলের সম্পর্ক কোথায়! দেয়ালে ডুবুরির পোশাক ঝুলতে দেখেই তিনি দুজনকে এক লোক ভেবে গুলিয়ে ফেললেন। নিজের এই অবিবেচক চিন্তাভাবনার প্রতি তাঁর কিছুটা করুণা হল। অকারণ সময় নষ্ট করা যায় না। তবু ভাবলেন, একবার যখন এসেই গেছেন, দেখা করে যাওয়া ভাল। তা-ছাড়া ফিলের খুবই প্রভাব আছে, বিপদে ফিলকে দরকার হতে পারে।

এই বিপদের মুহূর্তে জাহাজ ছেড়ে আসা তাঁর ঠিক হয়নি এমনও ভাবলেন। এলেনই যখন, সঙ্গে এক বোতল সরষের তেল নিয়ে এলে ফিল যৎপরোনাস্তি খুশি হত। নাভিনিদ্রা কাকে বলে সেবারে মুখার্জি বুঝিয়ে দেবাব সময় দেখেছেন, খুব আগ্রহ নিয়ে ফিল সব শুনছেন। ফিল তাঁর নোটবুক বের করে তেল ব্যবহারের মুদ্রাগুলিও লিখে রেখেছিলেন। এই তামাসার কথা ভাবলেও খারাপ লাগে।

আসলে শিশুর সদ্য দাঁত ওঠার মতো। সদ্য স্বাধীন দেশের মানুষ। রাজার জাতকে কব্জায় পেলেই বেকুফ বানিয়ে তখন তিনি খুবই আনন্দ পেতেন। লিখুন, মুখার্জি বলেছিলেন।

নাভিনিদ্রা হল ভাবতীয় কুম্ভক—

কুম্ভক কি?

কুম্ভক মানে এক ধরনের আসন। যোগবল তৈরি করার জন্য আসনটির ব্যবহার হয়ে থাকে। নাভিনিদ্রা প্রায় তাঁর সমগোত্র। তেল ব্যবহারের পদ্ধতি লিখে নিন।

ঠিক দ্বিপ্রহরে স্নানের আগে—স্নানটান রোজ করা হয় তো?

ফিল বলেছিলেন, হয়।

অবগাহন স্নান কাকে বলে জানেন?

ফিল বলেছিলেন, না।

পুকুর কিংবা নদীর জলে কোমর পর্যন্ত নেমে যেতে হবে। দ্বীপে নদী আছে?

নেই।

হ্রদ আছে?

আছে।

বাড়ির কাছাকাছি?

কাছেই।

কোমর জলে নেমে ডুব দেবেন। ডুব কাকে বলে জানেন তো! যাকে বলে অবগাহন স্নান!

জানি। তবে অবগাহন স্নান কি জানি না!

ডুব মানে বেদিং। তাকেই অবগাহন বলে।

মুখার্জির খাপছাড়া ইংরাজি থেকে সাধ্যমতো বোঝার চেষ্টা করেছিলেন ফিল। অবগাহন কাকে বলে তাও হয় তো বুঝে নিয়েছিলেন।

মুখার্জি বলেছিলেন, স্নানের আগে বাঁ হাতে এক গণ্ডুষ সরষের তেল। তারপর ডান হাতের বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ সহযোগে, সেই তেল প্রথমে নখাগ্রে, পরে নাভিমূলে, তারপর নাসিকা এবং কর্ণকুহরে—বাকি তেল তালুতে দেবার সময বলতে হবে, ওম ব্রাহ্মণেভ্য নম।

ব্রহ্মাণেভ্য নম মানে?

ব্রহ্ম থেকে জাত যিনি, তাঁকে প্রণাম।

আসলে জাহাজে থাকলে বিদেশের বন্দরগুলিতে খাঁটি গোরা সাহেবদের সঙ্গে মজা করার বাতিক সব নাবিকদেরই থাকে। সাহেবদের সঙ্গে রগড় করার জন্য কিছুটা তবলমতি হয়ে গিয়েছিলেন মুখার্জি। সেই বাতিক থেকেই একজন খাঁটি গোরা সাহেবকে বাগে পেয়ে যা খুশি মুখে আসে গড়গড় করে বলে গেছেন। ফিল চলে যাবার পব সে কি তাঁর অট্টহাসি! কিন্তু তাজ্জব মুখার্জি।

দু-দিন বাদেই হাজির হয়ে বলেছিলেন ফিল, মুখার্জি, তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ! আমার নাভিনিদ্রা হচ্ছে। কি করে সকাল হয়ে যায়, টেরই পাচ্ছি না। শরীর ঝরঝরে। জড়তা থাকে না। এ তো আশ্চর্য যোগবলের কথা বাতলে গেলে। আচ্ছা নাভিনিদ্রায় কি মানুষ হাওয়ার উপর ভেসে থাকে। মানে বলছি শরীর কি বিছানা থেকে উপরে উঠে যায়!

যেতে পারে। তবে আপনি খাঁটি সরষের তেল জোগাড় করবেন কি করে। আমাব জাহাজ তো ছেড়ে দেবে—কবে আসব জানি না। আর আসাই হবে কি না তাও জানি না। মাদাঙে খোঁজ করলে চর্বি ব্যবসায়ীরা তেল আনিয়ে দিতে পারে।

এই সব মজার কথা ভেবে মুখার্জির এখন বেশ খারাপ লাগছে। মানুষটিকে তাঁর কত দবকার—কে যে কখন বিপত্তারিণী হয়ে দাঁড়ায় কেউ বলতে পাবে না। ফিল ঠিকই খোঁজ রাখে খাড়িতে কোন্ দেশের জাহাজ ভিড়েছে—তার যথেষ্ট লোকবল আছে।

তিনি সকালেই আশা করেছিলেন, মোটর লঞ্চ কিংবা ঘোড়ায় চড়ে ফিল তাঁর জাহাজের খোঁজে চলে আসবেন। কিন্তু না আসায় তাঁর আর দেরি করা ঠিক হবে না ভেবেই তিনি বের হয়ে পড়েছেন—অথচ আসল জিনিসটিই তিনি ফিলের জন্য আনতে ভুলে গেছেন। ফিল ছেলেমানুষের মতো তবে তাঁকে জড়িয়ে ধরতেন। ইউ আর সো কাইন্ড বলে হ্যান্ডসেক করে একেবারে প্রাসাদের নানা অলিন্দ পার হয়ে নিজের ছোট্ট এবং দীনজনের বাসোপযোগী ঘরটায় তাঁকে টেনে নিয়ে যেতেন।

একজন খাঁটি গোরা সাহেব এমন পাণ্ডববর্জিত জায়গায় পড়ে আছে কিসের আশায়। ভাবতে গেলে বড় বিস্ময় লাগে।

অ্যালেন পাওয়াবের চিঠির বক্তব্যও খুব জোরালো মনে হচ্ছে না। শি ওয়াজ এ গ্র্যান্ড শিপ। কি এমন গ্র্যান্ড যে তাঁর জাদুর টানে একজন মানুষ দ্বীপ ছেড়ে যেতে পারেন না। 'কলিজ' জাহাজের

গুপ্তধনের খবর কি ফিলিপ রাখতেন। ডুবুরির পোশাক পরে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছেন! যদি মিলে যায়।

কাপ্তানবয়কে দিয়ে চিঠিগুলি ফের পাচার করার দরকার আছে। তখন ততটা গুরত্ব দেননি। গুরত্ব দেননি বললে ঠিক হবে না। কাপ্তানের অগোচরে চিঠিগুলি আনা হয়। ধরা পড়লে চরম সর্বনাশ। চিঠিগুলি তাঁর হাতে দিয়ে বেচারা কাপ্তানবয় মুখ শুকনো করে দাঁড়িয়েছিল। মুখার্জির খুব খারাপ লাগছিল।

ফিল ফিলিপ হতে পারে, কিংবা ফিলের কথা সেই মুহূর্তে তাঁর মাথায়ও ছিল না। নামটাও হয়তো ভুলে গেছিলেন ফিলের। পিদগিন ভাষায় জগাখিচুড়ি ঝামেলাতেই পলকে নামটা মগজে ভেসে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে চিঠিরও গুরুত্ব বুঝে ফেলেছেন। ফিল ফিলিপ হলে—ইস তিনি আর ভাবতে পারছেন না।

ঘোড়া দুলকি চালে কদম দিচ্ছে।

মাথায় ফিল।

ফিলেব ঘরে তিনি একটি বড় মানচিত্রও দেখেছিলেন—বিশাল মানচিত্রের উপরে লেখা ব্যাটেল গ্রাউন্ডস অফ দ্য পেসিফিক। তখন কিছুই তাঁর খুঁটিয়ে দেখার আগ্রহ হয়নি। এত বড় মানচিত্রে ফিল কি খুঁজে বেড়ান। তিনি মাঝে মাঝে সারারাত এই মানচিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে রাত কাবার করে দিতে পারেন—এমনও বলেছেন।

সত্যি রহস্য।

জাহাজে চার্লি আর এই দ্বীপে ফিল। চার্লি তো বলেছে, তাঁর কাকা জাহাজডুবিতে নিখোঁজ।

আবার সামনে পেতলের ফলক।

উই লিভ উইদিন দ্য শ্যাডো অফ দ্য অলমাইটি, শেলটারড বাই দ্য গড, হু ইজ অ্যাবাভ অল গডস।

পরের ফলকেও লেখা—লর্ড, গ্রো অল দ্য জেনারেশানস ইয়ো হ্যাভ বিন আওয়ার হোম, বিফোর দ্য মাউনটেনস্ ওয়্যার ক্রিয়েটেড, বিফোর দ্য আর্থ ওয়াজ ফর্মড, ইয়ো আর গড উইদাউট বিগিনিং অর এন্ড।

ফলকের লেখাগুলি পড়তে পড়তে মুখার্জি কেমন বিহুল হয়ে পড়েছেন। জন্মের আগেও তিনি। পরেও তিনি। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আগেও তিনি, পরেও তিনি—নিরবধি কালের আগেও তিনি, শেষেও তিনি। ফলকগুলি পড়তে পডতে তাঁর মনে হচ্ছিল চৈতন্যময় এক জগতের ওপার থেকে কেউ যেন ইশারায় এই সব বাণী প্রচার করে যাচ্ছে।

তিনি যতটা দুর্বল বোধ করছিলেন ফলকের লেখাগুলি পড়তে পড়তে তা আর থাকল না। সত্যি এক অজ্ঞাত ইচ্ছের সূত্র ধরে তাঁর জীবন। তাঁর কেন সবার। সুহাসকে তিনি রক্ষা করতেও পারেন, নাও করতে পারেন। সবই পূর্ব পরিকল্পিত। ফলকের লেখাগুলি তাঁকে মুহূর্তে দৈববিশ্বাসী করে তুলেছে।

এটা মুখার্জি বুঝলেন, এতে যেমন খারাপ হতে পারে আবার ভালও হতে পারে। সব সময় দুশ্চিন্তা—মনে হয় তিনি একা, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তিনি সত্যি আর একা নন। আরও একজন আছেন, যিনি জন্মের আগেও থাকেন, পরেও থাকেন। তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী হয়ে পড়ছেন।

প্রকৃতি বড়ই নিষ্ঠুর। এবং চারপাশের বনজঙ্গল পার হয়ে যাবার সময় মনে হল, কাছেই কোথাও ড্রাম বাজছে। নাচ গান হচ্ছে। দূরে গাঁয়ের কোথাও উৎসবে নাগরা টিকারা বাজছে।

পাহাড়ের মাথায় অদ্ভুত এক অনুভূতির মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। যে ঈগল পাখিটা মাথার উপর উড়ে আসছিল, সেটা এখন মাথার উপর পাক খাচ্ছে। দ্বিতীয় ঈগল পাখিটা সমুদ্রে ছোঁ মেরে একটা বড় বাইম মাছ তুলে আনছে। মাথার উপর গাছের ডালে এসে বসল। ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে।

তিনি ফের ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। ঈগল পাখিটা আর তাঁকে অনুসরণ করছে না। সামনে সেই ফিলের সাদা রঙের বাড়ি। নিচে একটা ছোটখাটো বন্দরও দেখতে পেলেন। লোকলস্কর, তেলের

পিপে, বাদাম তোলা কাঠের নৌকা, দেশী নৌকা, মোটর বোটের ছড়াছড়ি। বড় বড় ঝুড়ি, কাঠের পেটি তোলা হচ্ছে স্টিমারে।

গত সফরে তিনি এ-সব কিছুই দেখতে পাননি। চারপাশে লোকালয় গড়ে উঠেছে, বাজার—চায়ের দোকান পর্যন্ত। ঘোড়াটার লাগাম ধরে হেঁটে কিছুটা যেতেই ছুটে আসছে কেউ। ভিনদেশী মানুষ হয়তো টের পেয়েছে লোকটা। কেন এখানে, কি চাই, কাকে চাই, জানার জন্য ছুটে আসতেই পারে।

নির্জন দ্বীপে সবাই সবাইকে চেনে। তিনি অপরিচিত, এবং ভিনদেশী—মাথার উপর ঈগল পাখিটা এতক্ষণ তাঁর ভিতর গভীর সংশয়ের উদ্রেক করেছে। ঈগল পাখিটা ফিলের প্রাসাদ পার হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তাঁকে পৌঁছে দিল, না তিনি ফিলের সাম্রাজ্যে ঢুকে গেছেন এমন খবর পৌঁছে দিল!

কিছুটা হেঁটে যেতে হবে। এখনও ফিলের প্রাসাদের দিকটা বেশ নিরিবিলি। নানা প্রজাতির পোকামাকড় চোখে পড়ল একটা দোকানে। নানা শেকড়-বাকড়েরও। ফুল ফলের বীজও রাখে দোকানি। আশ্চর্য, খরিদ্দার বিশেষ নেই। নিচে সমুদ্রের বেলাভূমিতে যত লোকজন, উপরে ঠিক ততটাই যেন জনশূন্য—বেলা পড়ে আসছে।

ফিলের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে দ্রুত ফিরে না গেলে যথাসময়ে জাহাজঘাটায় পৌঁছতে পারবেন না। বেশ চিন্তিত মুখে লোকটিকে প্রশ্ন করলেন, 'মিঃ ফিলের সঙ্গে দেখা করতে চাই।' বলে মুখার্জি ডাইরির পাতা থেকে একটি চিরকুটে তাঁর নাম এবং জাহাজের নাম লিখে দিলেন।

লোকটি কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এল। গাট্টাগোট্টা বেঁটে তামাটে রঙের পুরুষ। চুল কোঁকড়ানো, ঠোঁট পুরু—ল্যাটিন আমেরিকানদের মতো দেখতে।

লোকটি বোবা কি না তাও বোঝা গেল না। কাবণ তাঁকে লোকটি কোনও প্রশ্নও করেনি—এমনকি চিরকুট দিলেও না। সে সোজা হেঁটে চলে গেছে।

এমনও হতে পারে, ভিনদেশী লোক দেখা করতে এলে, একমাত্র ফিলের সঙ্গেই দেখা করতে আসেন—লোকটি হয়তো তা ভালই জানে। হাফপ্যান্ট পরনে। মাথায় লালরঙের বেল্ট বেঁধে রেখেছে। চুল বড় বড়। বেল্ট বেঁধে চুল সামলাচ্ছে। কিছুটা ডাকাত ডাকাত চেহারা।

বাড়িটা বেশ একটা বড় টিলার মাথায়। আগে সোজা উঠে যাওয়া যেত। তবে কষ্টকর ছিল! এখন ধাপে ধাপে সিঁড়ি ভাঙতে হবে কিছুটা পথ। পাশেই পর পর দু-তিনটে আস্তাবল।

সামান্য কটা পেনি দিলেই আস্তাবলে ঘোড়া রাখা যায়—তিনি আস্তাবলে তাঁর ঘোড়ার জিম্মা দিয়ে ফিরতেই দেখলেন, সিঁড়ি ভেঙে ফিল দ্রুত লাফিয়ে নেমে আসছেন। গায়ে জামা নেই—পায়ে জুতো নেই। লম্বা দাড়ি। পরনে হলুদ রঙের একটা লুঙি। একেবারে স্থানীয় লোকদের পোশাক পরেই তিনি এত দ্রুত নেমে আসবেন, মুখার্জি অনুমানই করতে পারেননি। ফিল কত বদলে গেছেন।

ফিল কাছে এসেই তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যেন ভাষা নেই ফিলের। তাঁর সঙ্গে ফিলের দেখা হতে পারে আর কখনও, হয়তো আশাই করেননি ফিল। ফিলকে নিয়ে সেবাবে তামাসায় মজে যাওয়ায়, কিছুটা অপরাধ বোধও কাজ করছিল মুখার্জির ভিতর। ফিল যতটা স্বাভাবিক হতে পাবছেন, তিনি ততটা হতে পারছেন না। তিনি টের পেলেন, ফিলের আলিঙ্গনে যথেষ্ট উষ্ণতা আছে।

তাঁদের পরস্পর দেখা হয়ে যাওয়াটা যেন খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার। ফিল হড়বড় করে কথা বলে যাচ্ছেন—'কবে জাহাজ এল? আর বোল না, আমি তো জানিই না, তোমার জাহাজ খাড়িতে ঢুকে গেছে? কতদিন আছ?'

'যাক আমাকে মনে রেখেছ! এই যথেষ্ট। ভুলে যাওনি দেখছি।'

'খুব ভাল। আমি তোমাকে মনে রেখেছি, না তুমি আমাকে মনে রেখেছ! একদম সময় পাই না, আমারই তো উচিত ছিল, কোথাকার জাহাজ, কারা আছে। কত জাহাজই তো আসছে—খবর নিতে নিতে নিরাশ। তুমি সেই কবে এসেছিলে—চার পাঁচ বছর তো হয়ে গেল।'

ফিল লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙছেন। যাকে দেখছেন, তাঁকেই বলছেন, মিঃ মুখার্জি ডিনা ব্যাঙ্কের কোয়ার্টার মাস্টার।

মুখার্জি উঠে যাচ্ছেন। কিন্তু তাঁকে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে। রাত হয়ে গেলে রাস্তা চিনে যাওয়া কষ্টকর। অবশ্য রাতে জ্যোৎস্না থাকবে দ্বীপে, এই যা ভরসা। আলিঙ্গনের বহর দেখেই মনে হয়েছে, ফিল সহজে ছাড়ছেন না।

তিনি যে তাঁর বাড়িটায় সর্বত্র এক বিশাল অ্যাকোরিয়াম গড়ে তুলতে চান, মুখার্জি সেবারই টের পেয়েছিলেন। সব সময় ব্যস্ত সব মানুষজন, কাঠ, কাচ, রজন এনামেলের পাত নিয়ে ঠক ঠক করে দেয়াল জুড়ে বিশাল লম্বা সব অ্যাকোরিয়াম গড়ে তুলেছেন ফিল। ফিলের এই এক নেশা। নেশা এখনও যে নেই কে বলবে! অ্যাকেরিয়ামের পাশে নিয়ে দাঁড় করাবেন। টানা হলঘরের মতো বিশাল সব জলাধার। কৃত্রিম প্রবাল প্রাচীর জলাধারের ভিতর—এবং নানা প্রজাতির মাছ। সমুদ্রের তলাকার দুর্লভ সব প্রবালের গাছপালা—এবং শ্যাওলা—আশ্চর্য সব বর্ণচ্ছটা তৈরি করছে নীল জলের ভিতর।

প্রাসাদের অভ্যন্তরে গেলে মনে হয় সমুদ্রের তলদেশে কোনও প্রবাল প্রাচীরের পাশ দিয়ে জল কেটে এগিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। গতবার এ-সব দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। সহজে ছাড়তেই চাইতেন না। মাছগুলির নাম থেকে কোন্ মাছের কি স্বভাব তাও বলেছেন। তাঁর এই বিশাল সাম্রাজ্যটিকে ঘুরিয়ে দেখাতে না পাবলে তিনি স্বস্তি পান না।

ফিল যে একজন ডুবুরি এ-বিষয়ে সন্দেহের আর অবকাশ থাকার কথা নয়। তবে ফিল আসলে ফিলিপ কিনা, তাই তিনি জানতে এসেছেন।

তিনিই সেই কিপাব অফ দি রেক কি না, যদি হন, তবে 'কলিজ' সম্পর্কে খোঁজ খবর পাওয়া সহজ হবে। কেন তাঁর জাহাজের কাপ্তান মিলার 'কলিজে'র ধ্বংসাবশেষের খোঁজে এখানে এসেছেন তাও জানা যাবে। এ জন্য 'কলিজ' সংক্রান্ত সব পেপার কাটিঙও সঙ্গে রেখেছেন।

ফিল তাঁকে নিয়ে সোজা ভিতরে ঢুকে যাবার সময়ই মনে হল, বসার ঘরেব এক কোণে কারা চুপচাপ বসে আছে।

আরে এ যে জাহাজের চিফমেট, আর সেকেন্ডমেট। ঠিক খোঁজ নিতে পাঠিয়েছেন কাপ্তান।

তিনি কিছুটা চমকে উঠলেন। তাঁকে এখানে দেখলে, ওপরয়ালাদের নিশ্চয় খুশি হবার কথা না। ফিল তাঁর হাত ধরে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছেন, একবার ওদের দিকে ফিরেও তাকালেন না।

মুখার্জি নিজেকে আত্মগোপনেব চেষ্টা করছেন। পলকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন বলে রক্ষা। পেছন থেকে নিশ্চয়ই বুঝতে অসুবিধা হবে। তাদের জাহাজের একজন কোয়ার্টার মাস্টারের এত বড় আস্পর্ধা, জাহাজ ছেড়ে একা এতদূরে চলে এসেছে ভাবতেই পারে! তিনি কোনওরকমে ভিতরে সেই কাচের জলাধারগুলি পার হয়ে বললেন, 'ফিল তোমার জন্য কারা অপেক্ষা করছেন!'

'বাদ দাও। তোমার জাহাজ থেকেই এসেছে। আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। কি খাবে বলো।'

'ফিল কিছু মনে কোর না। আমি কিন্তু ভুলে গেছি। রাস্তায় এসে মনে হল।'

'কি ভুলে গেছ!'

'সরষের তেল।'

'ওহো! মুখার্জি, তোমার তেল মাদাঙ থেকে আসছে। মাদাঙে প্রায়ই ভারতীয় নাবিকেরা আসে। ও জন্য ভেব না। তুমি যা উপকার করেছ! তুমি হয়তো ভাবছ, সেটা কি—ওদিকে কোথায় যাচ্ছ। আমার ঘরে এসো।'

'তোমার পিয়ানোটা আছে? বলতে রাতে কিছু ভাল না লাগলে, পিয়ানোতে সুর তোলার চেষ্টা করতে।'

'আছে। তবে দরকার হয় না।'

'সেই মানচিত্রটা?'

'আছে। তাঁর সামনে আর দাঁড়িয়ে থাকি না।'

'ওরা কেন এসেছে, কি চায় কিছু বলল?'

'বলেছে। ওরা 'কলিজ' জাহাজের খোঁজ নিতে এসেছে। আমি কিছু জানি কি না। কে এক অ্যালেন পাওয়ার নাকি লিখেছেন, ফিলিপ নামে এক ডুবুরি 'কলিজের' কিপার অফ দ্য রেক! কি সব আজগুবি

কথা বলো তো! আমার কি দরকার, একটা ডুবন্ত জাহাজের পাহারাদার হয়ে বেঁচে থাকার। বোকারা এসব ভাবে।'

খুবই অকপট কথাবার্তা।

'তা হলে তুমি ফিলিপ নও!'

'কেন ফিলিপ হলে কি তোমার সুবিধে হয়। ফিল আর ফিলিপ তফাতই বা কি! আসলে কি জানো, আমি কেউ নই। না ফিলিপ, না ফিল।

ফিলের হেঁয়ালি কথাবার্তা মুখার্জির ভাল লাগছে না। তাঁকে ফিরতে হবে। ফিলের বেশভূষা সন্ত মানুষের মতো। এই ফিলকে তাঁর চিনতেও কষ্ট হচ্ছে। তিনি বললেন, 'ফিল আমরা খুবই বিপদের মধ্যে আছি। জাহাজে নানারকম জটিলতা দেখা দিয়েছে। দুর্ঘটনায় আমাদের ফিফথ ইনজিনিয়ার মারা গেছেন। খুনটুন নয় কে বলবে!'

প্রাসাদের এদিকটায় ফাঁকা জায়গা। একটি টিনের চালাঘর। ফিল মাথা নুয়ে ঘরে ঢোকার সময় বললেন, 'দুষ্টু লোকেরা মনে করে, দে ক্যান হাইড দেয়ার ইভিল ডিডস অ্যান্ড নট গেট কট।' বলে ফিল হা হা করে হাসলেন।

তারপর ফের বললেন 'দে লাই অ্যাওয়েক অ্যাট নাইট টু হ্যাচ দেয়ার ইভিল প্লটস—ইনস্টিড অফ প্ল্যানিং হাউ টু কিপ অ্যাওয়ে ফ্রম রঙ। এসো। কতদিন পর দেখা। কেমন আছ? তোমাকে খুবই অপ্রসন্ন দেখাচ্ছে। কি ব্যাপার বল তো। তুমি তো খুবই আমুদে লোক ছিলে।'

সামান্য গ্রিনপিজ সেদ্ধ, দু কাপ কফি রেখে গেল নিনামুর বলে লোকটি। এদিকটায় নিনামুর সামলায় মনে হয়। বারান্দায় কাঠের একটি টুল। ছোট দুটো টিপয় এনে রাখা হয়েছে।

ঢালু জমি অনেক নিচে নেমে গেছে। এবং সেখানে চাষ আবাদ, যত দূর চোখ যায় চায়ের জমি এবং ট্রাকটারের ধোঁয়ায় কেমন কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে আছে জায়গাটা।

ফিল বললেন, 'খুন ভাবছ কেন?'

'সে অনেক কথা।'

মুখার্জি কফিতে চুমুক দিলেন। তারপর বললেন, 'তোমার কি সময় হবে? একবার জাহাজে আসা দরকার। তুমি ফিলিপ কিনা জানতে আমিও এসেছি। 'কলিজ' জাহাজ সম্পর্কে তুমি যদি কিছু জান? সান্তু এখান থেকে কতদূর? তোমার এখান থেকে সান্তু যেতে হলে কিসে যাওয়া যায়?'

'সে যাওয়া যাবে। যেতে চাও, নিয়ে যাব। বেশি দূর নয়। ওদিকের টিলটা দেখছ—ওখানে উঠে গেলে দেখা যায়।'

'আচ্ছা ফিল', বলে একটা সিগারেট ধরালেন মুখার্জি, 'রিফ এক্সপ্লোরারের কোনও খবর রাখ? কাছাকাছি কোথাও আছে মনে হয়। 'কলিজ' জাহাজ সম্পর্কে খোঁজ নিতে তিনি সেখানেও যোগাযোগ করতে পারেন। দ্যাখ ফিল, আমরা নিরুপায় বলেই তোমার কাছে এসেছি। কাপ্তানেব পুত্র চার্লিও রহস্য। তোমাকে আমি বিশ্বাস করতে চাই।'

ফিল মুচকি হাসলেন। বললেন, 'এই হলগে মুশকিল বুঝলে মুখার্জি, কেউ বিশ্বাসই করতে চায় না, হাউ শর্ট ম্যান'স লাইফস্প্যান। ভাল, কাজ না করলে লাইফ ইজ এমপটি। অল উইল ডাই। হু ক্যান রেসকু হিজ লাইফ ফ্রম দ্য পাওয়ার অফ গ্রেভ! এ-সব ভাবলে, মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি থাকে না। স্বার্থপরতা থাকে না। শুধু ভাল কাজের মধ্যেই মানুষ বেঁচে থাকতে পারে। তোমার কুম্ভক আমার চোখ খুলে দিয়েছে। আমার এ-জন্য কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। আর যাই করি অবিশ্বাসের কাজ করব না। করে লাভও নেই। আমি ফিল, আমার আগেও কেউ ছিল না, পরেও কেউ নেই। ফিলিপকে নিয়ে তোমার চিন্তার কোনও কারণ নেই। 'কলিজ' নিয়েও না। গুজব মানুষকে কিভাবে বিচলিত করতে পারে, কিভাবে মানুষকে অমানুষ করে দেয়, হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি।'

মুখার্জির এত কথা ভাল লাগছিল না। তিনি শুধু বললেন, 'তা হলে তুমি ফিলিপ নও? 'কলিজ' সম্পর্কে কিছু জানো না?'

ফিল চুপ করে থাকলেন।

'বলো চুপ করে আছ কেন?'

'মুখার্জি, কেন আমাকে বিরক্ত করছ। আমি সব ভুলে গেছি। মরীচিকা সব। সব মরীচিকা। সমুদ্রের নিচে পাহাড়ের তলদেশ খুঁজে বেড়ালে ধীরে ধীরে উপরের আকাশ এবং নক্ষত্র কত রহস্যময় দেখায় তুমি জানো না!'

মুখার্জির মনে হল, ফিল কোনও দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে যেন এখন মুক্ত। সে তাঁর পূর্ব ইতিহাস স্মরণ করতে চায় না। 'কলিজে'র কথা উঠলেই মুখ ব্যাজার হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে হেসেও দিয়েছেন। বলেছেন, 'শোনো মুখার্জি, হ্যাপি আর দোজ হু আর স্ট্রং ইন দ্য লর্ড, হু ওয়ান্ট অ্যাভব অল এলস টু ফলো, হিজ স্টেপস। আমি তাঁকে সমুদ্রের নিচে প্রথম খুঁজে পাই। পরে গভীর নিদ্রার মধ্যে।

মুখার্জি বললেন, 'উঠছি। যদি পারো এসো।' বলে তিনি উঠে দাঁড়ালে, ফিল বললেন, 'এসো।' তারপর তিনি কাছের সমুদ্র অতিক্রম করে অন্য একটি রাস্তা ধরে যাবার মুখেই আঁতকে উঠলেন। দেয়ালে সেই গ্রিক নারীমূর্তি, এবং এক সিঙ্গি ঘোড়া। 'কলিজে'র সেই বিশাল ভাস্কর্যটি এখানে অতি যত্নের সঙ্গে রক্ষিত আছে। মুখার্জি বললেন, 'এটা কি, এটা কি ফিল! এটা তুমি কোথায় পেলে?'

দেয়ালে চালচিত্রের মতো গেঁথে দেয়া গ্রিক দেবীদের সামনে এগিয়ে গেলেন ফিল। কি দেখলেন। তারপর বললেন, 'তোমার পছন্দ।'

মুখার্জিও পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। কিছুটা বুদ্ধিলোপ পাবার মতো পরিস্থিতি তাঁর। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলেন সহজেই। কারণ তিনি এখন আর ফিলের বন্ধু নন। তাঁকে মনে রাখতে হবে তিনি একজন সত্যসন্ধানী। ভাস্কর্যটি দেখে এতটা অবাক হবার কোনও কারণ থাকতে পারে না। এটা কোথায় পেলে, বলাও উচিত হয়নি।

ফিল গ্রিক দেবীদের দিকে তাকিয়ে তখনও অপলক দেখছে।

'কি পছন্দ তোমার।'

'দারুণ দেখতে।'

ফিল কি বলবে, গ্রীক দেবীদের নিয়ে যাও! যে-ভাবে কথা বলছে। পছন্দ! পছন্দ হলে নিয়ে যাও যেন বলল বলে।

মুখার্জি বললেন, 'দেবী প্রতিমা। দুর্গাঠাকুরের মতো লাগছে।' দুর্গা ঠাকুর সম্পর্কে কিছুটা ব্যাখ্যাও সঙ্গে।

তারপরই ফিল কেন যে তাঁকে একা রেখে কোন্‌দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আসছি বলে কোথায় গেল! শেষে এলেনও ঠিক। বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে ভক্তের মতো ফিল বললেন, 'হাউ ওয়ান্ডারফুল টু বি ওয়াইজ, টু আন্ডারস্ট্যান্ড থিংস। গভীর নিদ্রা মানুষকে শান্তি দেয়, সুখ দেয়। আমার চোখ খুলে গেল মুখার্জি। এই নাও মুখার্জি। তোমার প্রণামি।' বলে, একটি স্বর্ণমুদ্রা তাঁর হাতে দিলেন।

মুখার্জি বললেন, 'না, না। কি পাগলামি করছ ফিল।'

'রেখে দাও। বিপদে আপদে কাজে আসবে। কখন কোথায় ঝামেলায় পড়বে কে জানে। মুদ্রাটি স্থানীয় লোকদের দেখালেই তোমাকে মান্য করবে। কিছুটা ঋণশোধ বলতে পারো।'

টনটন করছে। যেন চেপে বসেছিল—পারছিল না—চার্লির সহ্য করার ক্ষমতাও যেন লোপ পাচ্ছে। কেমন অসাড় হয়ে যাচ্ছে—চার্লি কোনও রকমে টলতে টলতে কেবিনে ঢুকে দরজা লক করে দিল। হাসফাঁস করছে—আর পারছে না। জামা খুলে নিচে ফেলে দিল। লাথি মেরে সরিয়ে দিল জামাটা। পটাপট ব্রেসিয়ারের ফিতে টেনে খুলে ফেলল।

বিড়বিড় করে বকছে চার্লি! 'আই উইল রিওয়ার্ড ইভিল, উইদ ইভিল, নাথিং ক্যান স্টপ মি।' শরীর থেকে ছাল-চামড়া তুলে নেবার মতো ব্রেসিয়ার টেনে চিৎকার করে উঠল, 'নো মি বয়।'

ব্রেসিয়ার বিছানায় ছুঁড়ে দিল। প্যান্ট টেনে খুলে ফেলল। আয়নায় সে নিজেকে দেখতে পারত। না, দেখতে ইচ্ছে করে না। হাত বুলিয়ে দিচ্ছে বুকে। ব্রেসিয়ার থেকে স্তন ফেটে বের হয়ে আসছিল।

সব খুলে ফেলায় হালকা-আরাম। জ্বালা করছিল। ব্রেসিয়ার খুলে ফেলতেই ভাঁজ করা রুমালগুলি নিচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে গেল। সে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল—শরীরে যেন তার আর বিন্দুমাত্র শক্তি নেই। সে ভারী আরাম বোধ করছে। হালকা। তবু ভিতরের জ্বালা মরছে না।

নো মি বয়।

এই এক আচ্ছন্নতা তার শৈশব থেকে। সে আজ কি যে করে ফেলল। কেমন হুঁশ হারিয়ে ফেলেছিল—সে বালিশে আঁকড়ে মুখ গুঁজে দিল। তার শরীর থর থর করে কাঁপছিল। তার কোমর থেকে উরুর ছবি আয়নায় ভেসে উঠছে। যেন সে সত্যি বড় অসহায়। বিছানায় পড়ে থাকার ভঙ্গিমাটুকু বড় করুণ।

অনেকটা পথ সে সুহাসকে ঘোড়ায় চাপিয়ে টেনে নিয়ে এসেছে। সে আর পারছিল না। সুহাসের ঘাড়ে লেগেছে। মেরেই ফেলত। সে কি করেছিল—মনে করতে পারছে না। যেন সে তার ঘোর থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রাণ খুলে হাউ হাউ করে কাঁদতে পারলে বাঁচত। কাঁদতে পারছে না। ছটফট করছে। কেন কাঁদতে পারছে না!

সে উঠে বসল। তাব যে এখনও সম্পূর্ণ হুশ ফেরেনি বোঝাই যাচ্ছে।

সে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নাভিমূলে নরম উলের মতো সোনালি উষ্ণতার জন্য এতটুকু তার আতঙ্ক নেই। সে যেন ইচ্ছে করলে এখন দবজা খুলে ডেক ধরেও ছুটে যেতে পারে। কি করবে বুঝতে পারছে না। আচ্ছন্ন ভাবটা যে কাটেনি—সে তা এখনও টের পাচ্ছে না। টের পেলে, সত্যি হাউ হাউ কবে কেঁদে ফেলতে পারত। দেয়াল ধরে বসে পড়তে পারত। এবং শরীব উবু করে নিজের এই আতঙ্ক থেকে আত্মবক্ষার জন্য আরও বেশি কুশলী হতে পারত।

সে কিছুই করছে না।

সে কেবল ভাবছে, কেন সে নির্জন পাহাড়ি উপত্যকায় ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছিল।

কোনও ফুল!

নিশ্চয়ই বুনো ফুল।

সে দেখতে পেল দূরে মাইলেব পর মাইল জুড়ে ব্লুস্টেম ঘাসের ছড়াছড়ি।

সে চিৎকার কবে উঠেছিল, 'সুহাস সামনে দ্যাখ। দিগন্ত জুড়ে আমার ঠাকুরদা ঘাসের বীজ বুনে গেছেন। দ্যাখ কি সুন্দর সবুজ আর নীল স্বচ্ছ সৌন্দর্য আকাশেব নিচে খেলা করে বেড়াচ্ছে। ব্লুস্টেম ঘাসের ডগায় সাদা ফুল। দ্যাখ সুহাস তিনি কত সুন্দর ছিলেন—তিনি তাঁর জাহাজে এই সব দ্বীপেও ঘুরে গেছেন। ডরোথি ক্যারিকো জাহাজে ইস্টারের ছুটিতে, অথবা কোনও প্রমোদ ভ্রমণে যাত্রী নিযে বের হয়ে পড়তেন সমুদ্রে। আমার ঠাকুরদাকে বুঝতে চেষ্টা কর।'

ও কি দারুণ অভিজ্ঞতা! ঘাসগুলির ভিতর ঘোড়া হেঁটে যাচ্ছে। সে আর সুহাস পাশাপাশি দুই অশ্বারোহী। সে দেখতে পাচ্ছে সুহাস খুবই মুগ্ধ হয়ে গেছে এমন এক উপত্যকায় নেমে এসে। সুহাস যত মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে তত দুলকি চালে ঘোড়ার উপর থেকে সে বলছে, 'ডরোথি ক্যারিকোর ছবি আছে আমাদের দেয়ালে —কি বিশাল জাহাজ! সি ওয়াজ অ্যা গ্র্যান্ড সিপ। দেয়াল জুড়ে তাব রেপ্লিকা। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায় সুহাস। আমার ঠাকুরদা তবে এখানেও এসেছিলেন।'

সুহাস তার দিকে যেন তাকাল।

'এগুলো তো কাশফুল। ব্লুস্টেম বলছ কেন বুঝি না।'

'সুহাস না না, তুমি কাশ বলবে না। ওতে আমার ঠাকুরদার অমর্যাদা করা হবে। তিনি আমাকে কত ভালবাসতেন জান না। তিনি তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকার আমাকে দিয়ে গেছেন।'

আচ্ছন্ন অবস্থায় বোধ হয় চার্লি হুবহু সব মনে করতে পারছে। কারণ সেই উপত্যকার নিচে নির্জন বালিযাড়িতে যা ঘটে গেল—সে ভাবতে পারছে না—অথচ সে নিজে কেন যে দেয়াল ছেড়ে নড়তে পারছে না। কোনও নগ্ন নীরব বর্ণমালার সৌন্দর্য তার চেয়ে প্রবল কিনা সে এখনও কিছুই বুঝছে না।

কারণ সে কখনও নিজেকে দেখে না। দেখতে তার ভাল লাগে না। দেখলে সে মাথা ঠিক রাখতে পারে না। সে হালকা, আরাম বোধ করছে এখন, ফ্রি ফ্রম অল বাইন্ডিংস—এ যে এক জাদুকরের স্পর্শে সে জেগে যাচ্ছে বোঝায় কি করে!

'সুহাস দ্যাখ দ্যাখ।'

সুহাস তাকাল।

সে আঙুল তুলে দূরে দেখাচ্ছে—'কেনিফ্লাওয়ার। পাথরের খাঁজে খাঁজে ফুটে রয়েছে। আমাদের পাহাড়গুলিতে কেনিফ্লাওয়ারের ছড়াছড়ি। আহা আমি যদি কখনও সেই সব উষর অঞ্চলে তোমাকে নিয়ে যেতে পারতাম। এস, ওদিকে না। সব আছে, সুহাস, বুনো ডেইজি ফুল দেখতে পাচ্ছি না। আমি যে কি করি।'

সে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

এমন সুন্দর উপত্যকায় ঘাস পাথর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে তারা এত দূরে নিরিবিলি কোনও উষর অঞ্চল আবিষ্কার করতে পারবে, সে আশাই করতে পারেনি।

সে কেবল বলছিল, 'অন আইদার সাইড নিয়ার টাইলার, গোল্ডেন কোরিওপসিস স্ট্রেচ অ্যাজ ফার অ্যাজ আই ক্যান সি।' কিছুটা দূরে, ঘাসের ভিতর ঢুকে সে বলেছিল ঐ দেখ নিচের দিকটায় এমন অজস্র গোল্ডেন কোরিওপসিস ফুটে আছে।

তারপর বলতে গিয়ে যেন গর্বে বুক ফুলে যাচ্ছে চার্লির। '—অবশ্যই এটা আমার ঠাকুরদার পক্ষেই সম্ভব সুহাস। তুমি জানো সুহাস, দাদুর এই বুনো ফুল, অ্যাট্রাক্টস গ্রোয়িং নাম্বার অফ ভিজিটার্স, হু কাম টু সি আওয়ার স্প্রিং ওয়াইল্ড ফ্লাউয়ার্স। আই হ্যাভ নেভার ফরগটেন দ্যাট গিফট অফ মাই চাইল্ডহুড। সিনস দেন ইট হ্যাজ বিন মাই জয়। ইয়েস, দিস ইজ ওনলি মাই জয়—কি করে যে তোমাকে বোঝাব!'

'তুমি জান সুহাস, ওয়াইলড ফ্লাওয়ার্স অফ আওয়ার উডল্যান্ড ইন এপ্রিল মেক দ্য ইয়ার হেভি উইদ সেন্ট।'

সে আরও কিছুটা নেমে গেছে তখন।

সুহাস তাকে ডাকছে।

'চল ফিরি। কতদূরে চলে এসেছি। রাস্তা চিনে ফিরে যেতে পারব না।'

'পারব। তুমি সুহাস জান না অ্যাটামাসুক লিলি কি আশ্চর্য সুন্দর। জানো, এ ওম্যান হু পুলস ইট আপ বাই দা রুট উইল সুন বিকামস প্রেগন্যান্ট। একটা আস্ত লিলি, গাছ থেকে তোলা কত কঠিন তুমি জান না। এই অ্যাটামাসকু লিলি ব্লুমস কুইকলি আফটার স্প্রিং রেইনস। সেই দুর্লভ জাতের লিলি কখন ফুটবে, সেই আশায় দম্পতিরা তাঁবু খাটিয়ে দিনের পর দিন অপেক্ষা করে। সামান্য দূরে এসেই তোমার ভয় ধবে গেল! তুমি কি সুহাস! দুর্লভ লিলি ফুল খুঁজে পাই কি না দেখি। ঠাকুরদা এত সব ফুলের বীজ বুনে গেছেন—আর তিনি তাঁর উত্তরাধিকারের জন্য দুর্লভ লিলি ফুল এখানে রোপণ করে যাবেন না, হয়! এস। প্লিজ সুহাস। এখনও তো সূর্য অস্ত যায়নি সমুদ্রে। এখনও তো কচ্ছপেরা উঠে আসেনি সমুদ্র থেকে। এখনও তো পাখিরা ওড়াউড়ি করছে মাথার উপর। তুমি ভয় পাচ্ছ কেন!

সুহাস অনেক পেছনে পড়ে গেল কেন! সে কি আর এগোতে সাহস পাচ্ছে না।

সে কি জাহাজে ফিরে যেতে চায়?

'না, না, জাহাজে আমার একদণ্ড মন টেকে না। এই টিলা পার হয়ে আরও কতদূর যাওয়া যায় এস না, দেখি। মানুষ তো এ-ভাবেই বের হয়ে পড়ে। কখনও একা। কখনও দুজনে। আমরা তো একা নই। তবে নেমে আসতে সাহস পাচ্ছ না কেন! সে সুহাসকে উজ্জীবিত করছে—ডোন্ট হাইড ইয়োর লাইট, লেট ইট শাইন ফর অল।'

তার আচ্ছন্নতা কেটে যাচ্ছে। সে সব মনে করতে পারছে। দেয়াল থেকে সরে গিয়ে বিছানায় বসল। হাতে ভর করে যেন বসে আছে।

সে সুহাসকে বলতে চাইছে, লেট ইয়োর গুড ডিডস গো ফর অল টু সি—অ্যান্ড ফর মি অলসো সুহাস। বনে জঙ্গলে তুমি দেখতে পাচ্ছ না—কি সুন্দর সব ফুল ফুটে আছে। ফুল তুমি ভালবাস না?

সুহাস আমি আর পারছিলাম না। আমার কোনও দোষ দিয়ো না সুহাস। এটা আমার আরও হয়েছে। বিশ্বাসই করতে পারি না আমি মেয়ে। আমার যে কি হয়। ভেতরে আমার কষ্ট বাড়ে। স্থির

থাকতে পারি না। আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। এবং সর্বত্র যেন হাহাকার—কি যে করি। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছি—সত্যি বলছি—বিশ্বাস কর, প্রাণপণ চেষ্টা করেছি—পারিনি। বুনো ডেইজি ফুল দেখবার আগ্রহে আমি সত্যি পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম।

অদৃশ্য এক জগতে ঢুকে যাচ্ছিলাম।

সব পোশাক খুলে ফেললাম।

তুমি রাগ করলে আমার আর দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না।

তুমি ডাকছিলে, 'চার্লি তুমি কোথায়?'

বনজঙ্গলে ঘোড়া ছুটিয়ে তুমি ডাকছিলে, 'চার্লি এ-কোথায় তুমি আমাকে এনে ছেড়ে দিলে! আই হ্যাভ লাভড ইয়ো ভেরি ডিপলি।'

না আমি আর স্থির থাকতে পারিনি। উত্তেজনায় অধীর হয়ে পড়েছিলাম।

সত্যি বলছি, আমি অনুভব করলাম, গড হ্যাভ মার্সি অন আস।

আমি অনুভব করলাম—আমার বিকশিত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। কেবল বলছিলাম, বেন্ট ডাউন অ্যান্ড হিয়ার মাই প্রেয়ার ও লর্ড, অ্যান্ড অ্যানসার মি, ফর আই অ্যাম ডিপ ইন ট্রাবল।

তুমি ডাকছিলে, চার্লি, প্লিজ ফিরে এস। আমাদের জাহাজে ফিরতে হবে।

আমার কোনও হুঁশ ছিল না। আমি থর থর করে কাঁপছিলাম। শরীর থেকে সব জামা কাপড় খুলে ফেলতে থাকলাম। তুমি চেষ্টা কর, আমাকে খুঁজে দ্যাখ আমি কে?

পাথরের উপর চুপচাপ বসেছিলাম, সূর্যাস্তের সময় যে ভাবে বসে থাকে জলকন্যারা, আমার কেন যে চুপচাপ ঠিক সে-ভাবে বসে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছিল জানি না। আমি তো জানি না, হাউ টু এনসার। কি করে সাড়া দিতে হয় আমার কিছুই জানা নেই। কেমন মুগ্ধ বিস্ময়ে সেই পাথবের উপর কোনও ছবির মতো আমার অস্তিত্ব, বিশ্বাস করবে না, সমুদ্রের ঢেউ এসে আমার পাযেব কাছে আছড়ে পড়ছে। সমুদ্রের জলকণায় আমি ভিজে যাচ্ছিলাম।

আমার কি যে ভাল লাগছিল! আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। বন জঙ্গল, অসীম সমুদ্র, অনন্ত জলরাশি, কিছুই দৃশ্যমান নয়। কেমন এক নীল নীহারিকার মধ্যে আমি ঢুকে যাচ্ছি। কোনও প্রাণিজগতের সাড়া পাচ্ছি না। আমি জানি না, ঈশ্বর এর চেয়ে বেশি অনুভবের মধ্যে কখনও আমাকে নিয়ে যেতে পারেন কি না। আমি তোমাকেই দেখতে পাচ্ছি শুধু—যেন বলছ, ফর আই অ্যাম দ্য লর্ড —আই ডু নট চেঞ্জ।

কেন এমন হয় জানি না।

পেছনে পাথরের উপর ঘোড়ার পায়ের শব্দ পেলাম সুহাস। ইস তুমি বুঝবে না, ভিতর যেন অনন্তলোক উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। বসন্তকালে কোনও সানফ্লাওয়ার যে অনুভবে বিকশিত হতে থাকে। আমিও তাই হচ্ছিলাম। অধীর হয়ে পড়ছি। আমার মাথা এলিয়ে পড়ছে। এক হাতে ভর দিয়ে নিজেকে সামলাচ্ছি। এবং আমার সেই প্রিয় বুনো ডেইজি ফুলটিকে লজ্জার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য আবৃত করছি। যেন তুমি খুঁজে না পাও। যেন তুমি খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হও। বালকের মতো সরল নিষ্পাপ চোখে তুমি আমাকে আবিষ্কার কর—এ-ছাড়া সত্যি বলছি কিছু চাইনি সুহাস।

তুমি বিশ্বাস করো, আমি এর চেয়ে বেশি কিছু চাইনি।

মনে হচ্ছিল অশ্বখুরের প্রতিধ্বনি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। পাথর জ্বলে উঠছে, খুরের আঘাতে। আমি তলিয়ে যাচ্ছিলাম। নড়বার শক্তি ছিল না। কেউ সাহায্য না করলে, কেউ জাগিয়ে না দিলে বোধ হয় আমার এই আচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি পাবার উপায় ছিল না।

তুমি অবাক বিস্ময়ে নিশ্চয়ই আমাকে দেখছিলে। তুমি বিশ্বাস করতে পাবছিলে না—চার্লি, জাহাজের সেই দুরন্ত বালক কখনও সমুদ্রের ধারে জলকন্যা হয়ে যেতে পারে!

আমি টের পাচ্ছিলাম, তুমি প্রথমে এসে পেছনে দাঁড়ালে। কিছুটা বিব্রত। বিশ্বাস করতে পারছ না। তারপর সামনে এসে দাঁড়ালে। নতজানু হলে। সত্যি জীবন্ত কেউ কিনা তোমার সংশয হচ্ছিল। এমনকি তুমি একটা কথা বলতে পারছিলে না।

আমি বললাম, ওয়ান নাইট আই ওয়াজ স্লিপিং, মাই হার্ট ওয়েকেনড ইন অ্যা ড্রিম। আই হার্ড দ্য ভয়েস অফ মাই বিলাভেড।

তুমি আমার গায়ে হাত দিলে।

যেন কোনও মর্মরমূর্তির গায়ে হাত দিচ্ছ। তোমার হাত শির শির করে কাঁপছিল।

অথচ কোনও কথা না।

তুমি নতজানু হয়ে আমার কি সব দেখছ।

আমি চোখ মেলে তাকাতে পারছি না।

শুধু শুনলাম, আই হিয়ার দ্য ভয়েস অফ মাই বিলাভেড। হি ইজ নকিং অ্যাট মাই ডোর।

তুমি শুধু বললে, ওপেন টু মি। প্লিজ আনল্যাচ দ্য ডোর। প্লিজ রাইজ আপ, মাই লাভ, মাই ফেয়ার ওয়ান।

সুহাস আমার সব তছনছ হয়ে গেল।

আই জামপ্‌ড আপ টু ওপেন দ্য ডোর।

আমি তোমাকে পাগলের মতো জড়িয়ে ধরলাম। আই অ্যাম সিক উইদ লাভ।

আমি তোমার চুলের গন্ধ নিলাম।

তুমি আমার শরীরে কি খুঁজে বেড়াচ্ছ বুঝতে পারছি। কোমল নরম উলের উষ্ণতা ক্রমে বুনো ডেইজি ফুল হয়ে ফুটে উঠল। তুমি মুগ্ধ বালকের মতো কি করবে ভেবে পাচ্ছিলে না। শুধু জড়িয়ে রেখেছিলে। আমবা তো জানি না দ্য ওসেনস, হাই দেয়ার ওয়েভস অ্যারাইজ ইন ফিয়ারফুল স্টর্ম। আচ্ছন্ন না থাকলে, আমি কখনই পারতাম না। আর যখনই আচ্ছন্নতা কেটে যাচ্ছিল, চিৎকার করে উঠলাম, নো মি বয়।

তুমি আমাকে জড়িয়ে রেখেছ।

তুমি বললে, ফর আই হ্যাভ বিন আউট ইন দ্য নাইট অ্যান্ড অ্যাম কভাবড উইদ ডিউ।

তুমি আমার কোমর জড়িয়ে হাঁটু গেড়ে বসলে এবং নাভিমূলে গাল রেখে বুনো ডেইজি ফুলের গন্ধে মাতাল হয়ে গেলে। আমি নড়তে পারছিলাম না। তারপর কি করতে হয় কিছুই যে জানি না।

তখন পিছিলে শোরগোল।

সুহাস ঘোড়া থেকে পড়ে গেছে। ঘাড়ে চোট লেগেছে। ঘাড় নাড়াতে পারছে না। সে যে খুব অস্বস্তি বোধ কবছে তার আচরণেই টের পাওয়া যাচ্ছে। চার্লি তাকে ফোকসালে রেখে ছুটে কেবিনে চলে গেছে।

সবাই উঁকি দিয়েছে। 'কি হল? কি করে পড়লি—' এসব নানা প্রশ্ন। তা' এক কথা, 'পড়ে গিয়ে লেগেছে।' তার এক কথা, 'দ্যাখ তো মুখার্জিদা ফিরল কি না। কোথায় যে যায়!' দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় সুহাসের মুখ খুবই ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

বংশী বলল, কোথায় আর যায় বোঝ না!

বংশী ব্যাঙ্কে বসে পা দোলাচ্ছে। উপরের বাঙ্কে শুয়েছিল। নিচের বাঙ্ক ছেড়ে দেওযায় তাকে উপরে উঠে যেতে হয়েছে। সেই সারেঙসাবকে খবর দিয়েছে, সুহাস ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে জখম। নুনজলের সেঁক দেওয়া হচ্ছে। অধীর বাঙ্কের পাশে একটা টুল নিয়ে বসে গেছে। সুহাসের ঘাড় ফেরাতেও কষ্ট। সে কেবল বলছে, এখনও এল না। রাত তো কম হয়নি। মুখার্জিদা না ফেরায় তার যেন আতঙ্ক বেড়ে গেছে। খুবই ঘাবড়ে গেছে মনে হয়। সুরঞ্জন আর মুখার্জিদা একই সঙ্গে বের হয়ে গেছে।

জাহাজে মাল তোলা হচ্ছে। ইনজিনরুমে কাজের চাপ নেই বললেই হয়। টানা আট ঘণ্টা একজন করে ফায়ারম্যান নিচে থাকলেই হল। এখন কিছু হালকা কাজ ফায়ারম্যানদের করতে হয়। কাজের চাপ কম বলেই মুখার্জির সঙ্গে বের হয়ে যেতে পেরেছে সুরঞ্জন। বন্দরে এসে একটা মাত্র বয়লার চালু রাখা হয়। জাহাজ চালানো বাদেও নানা খুচরো কাজ থাকে—একটা বয়লার সে-জন্যই চালু রাখা হয়। জেনারেটাব, জেনারেল সার্ভিস পাম্প, উপরের ট্যাঙ্কগুলিতে জল তোলার কাজ।

বন্দরে এলেও জাহাজে কাজ থেকে যায়। সুরঞ্জনের অবসর এখন অনেক। মুখার্জিদার সঙ্গে যেতেই পারে।

অস্বস্তিতে সে শুয়ে থাকতে পারছে না। একবার উঠে বসছে। আবার শোবার চেষ্টা করছে। ঘাড় ভাল করে ফেরাতেও পারছে না। সারেঙসাব চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছেন, 'আমার কথা কেউ শোনে! এখন কিছু হলে কোথায় যাব!'

কিনারায় লোক নেমে যাওয়ায় জাহাজে ভিড়ভাট্টা কম। সকাল থেকেই টাগবোটে মাল আসছে। বড় বড় তামার পিপে ভর্তি ফসফেট। ডেরিকগুলো সব তুলে দেওয়া হয়েছে। ডেবিকে মাল তোলা হচ্ছে। সারা ডেকে ফসফেটের গুঁড়ো। কিনাবায় লোক নেমে গেলে জল মেরে সাফ কবা হয়েছে। ফক্কার কাঠও ফেলাব কাজ থাকে। বৃষ্টিবাদলা হলে ফসফেট গলে যাবে সব। নানা ঝামেলার মধ্যে সুহাস ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে নতুন ঝামেলা পাকাল—কাপ্তানকে রিপোর্ট কবা দবকার। সুহাস কিছুতেই বাজি না। মুখার্জিদা না এলে কিছু হবে না।

সারেঙ এতেও ক্ষুব্ধ।

'আরে মুখার্জিবাবু কি তোর ওপরয়ালা। ভালমন্দ দেখার কি দায় তার।' কিন্তু ওই এক গেরো—কাপ্তানের পুত্রটি সুহাসের গায়ে এঁটেলির মতো কামড়ে রয়েছে। সে জন্যই যত আরও ঝামেলা। তিনি কি যে করেন।

মুখার্জিদা বোধাহয় গ্যাঙওয়েতেই খবরটা পেয়েছিলেন। তিনি ছুটে এসেছন। তিনি তো ভাল নেই। ম্যাকেব হত্যারহস্য শুধু নয়, 'কলিজ' জাহাজের রহস্য তাঁব মধ্যে সমান বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। মুখোসের হদিস পেয়ে গেছেন, কে মুখোস পরে চার্লিকে অনুসরণ কবছে তাও তিনি জানেন, কিন্তু কেন এই অনুসরণ, একজন নারী যদি জাহাজে থাকেই তার জন্য মুখোস পরে ঘুরে বেড়াবাব কি দরকার—তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পাশে বসলেন—তারপর কোনও প্রশ্ন না করে চোটপাট শুরু কবে দিলেন।

'আমরা কি তোর চাকর। হ্যাঁর—তুই আর চার্লি এয়াবস্ট্রিপ পার হয়ে কোন্‌দিকে গেলি, চার্লির লাগেনি তো! ঘোডা থেকে পড়ে গেলি—দেখি—বলে তিনি ঘাডে হাত দিতে গেলে সুহাস প্রায় আর্তনাদ করে উঠল—'লাগছে।'

'খুব লাগছে!'

'ঘাড় তো ঘোরাতে পারছি না!'

তারপর আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে মুখার্জি বললেন, 'সেরে যাবে।' বংশীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোর খাওয়া হয়েছে? না হলে খেয়ে নে। আমার দেবি হবে। বসে থাকিস না।' অধীরের দিকে তাকিয়েও সেই এক কথা।

'বসে থাকলি কেন! যা। সুহাসের খাবার নিচে দিয়ে যা।'

বংশী অধীর বের হয়ে গেলে, দরজায় মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'থাক, সুহাসের খাবার নিচে পাঠাতে হবে না। হরেকেষ্টকে ডেকে দে।' বলে দরজা বন্ধ করতেই দেখলেন, সুহাস উঠে বসেছে। সে শুধু বলল, 'ঘাড়ে লেগেছে। তবে ঘাবড়াবে না। সেরে যাবে। চার্লি মেয়ে। তোমার কথাই ঠিক।'

'মেয়ে! মানে ওম্যান!' তাহলে তাঁর বিন্দুমাত্র ভুল হয়নি।

'ইয়েস ওম্যান। তোমার কথাই ঠিক। সেন্ট পার্সেন্ট ঠিক। তুমি এ-ভাবে তাকিয়ে আছ কেন। যেন ভূত দেখছ! না আমার খুব লাগেনি—বলছি তো সেরে যাবে।'

তিনি ধীরে ধীরে কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। কিছু ডেকজাহাজি খবর পেয়ে সুহাসকে দেখতে এসেছে। মুখার্জিদা খুবই বিরক্ত। বললেন, 'ভাল আছে। যাও ভিড় বাড়াবে না!' উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বললেন, 'চার্লি শেষে তোর কাছে ধরা দিল!'

'আমি জানি না দাদা! আমার কাছে ধরা দিল কি দিল না বলতে পারব না। কিন্তু,' বলে, লজ্জায় সুহাস কিছুটা বিচলিত বোধ করল। কী করে বলা যায়। নারী যদি জলকন্যা হয়ে যায়, যদি পাথরের উপর বসে থাকে, নিরাবরণ হয়ে থাকে তার কথা সে একজন বয়স্ক লোকের সামনে বলে কি করে!

কিছুটা আমতা আমতা গলায় বলল, 'তোমরা কি আমাদের ফলো করছিলে!'

'করছিলাম তো। দেখি তোরা দুজনেই সহসা উধাও। বেটা সুরঞ্জন সাইকেল নিয়ে ঢুকবে কি করে! আমি একাও যেতে পারছিলাম না। কোপটা যে কার উপর পড়বে বুঝতে পারছি না।'

'কোপটা আমার উপরই পড়েছে। চার্লি না থাকলে মেরেই ফেলত।'

'দাঁড়া আমাকে ভাবতে দে।' বলে তিনি পকেট থেকে সিগারেট বের করে দেশলাইয়ের উপর ঠুকলেন। কিছু ভাবলেন! তারপর বললেন, 'আমার ঘরে যেতে পারবি! ধরব।'

'না, না ধরতে হবে না।'

সুহাস পায়ে চটি গলিয়ে বাঙ্ক ধরে উঠে দাঁড়াল। মনে হয় বে-ম্বরেও কিছুটা চোট পেয়েছে। কিন্তু সে যে এত শান্ত হয়ে আছে কি ভাবে তাও বুঝতে পারছেন না মুখার্জি।

সুহাসকে দেখে মনে হচ্ছে তার যেন পুনর্জন্ম হয়েছে। যে কোন আতঙ্ককে সহজে তুচ্ছ করতে পারে, অন্তত তার কথাবার্তা এত স্বাভাবিক, এবং তিনি যে আশঙ্কায় ভুগছিলেন, আজ তার একটা তবে মহড়া হয়ে গেছে।

তিনি বললেন, 'পড়ে টড়ে লাগেনি বলছিস? হেঁটে যেতে পারবি তো।'

'পারব।' বলে সুহাস কোনও রকমে পা টেনে টেনে মুখার্জির ফোকসালে ঢুকে গেল।

মুখার্জিদা বললেন, 'সুরঞ্জনকে ডাকি। সুরঞ্জন বোধহয় খবরটা পায়নি।

'ডাক। ওর জানা দরকার।'

মুখার্জিদা সুরঞ্জনের ঘরে গিয়ে দেখলেন নেই। বোধহয় ডেক থেকে নামেনি। মনু জাল বুনছে। তাকেই বলে এলেন, 'সুরঞ্জনবাবুকে বলবে, আমার সঙ্গে যেন দেখা করে।'

তিনি যে কিছুটা অস্বস্তির মধ্যে আছেন তাও বোঝা গেল। কারণ সিগারেটে আগুন দিতে ভুলে গেছেন। দেশলাইটা পকেটে রেখে দিয়েছেন। সিগারেট টানতে গিয়ে টের পেলেন আগুন ধরাননি। দেশলাই খুঁজতে গিয়ে এ-পকেট সে-পকেট হাতড়াচ্ছেন। তারপর প্যান্টের পকেট থেকে দেশলাই বের করলেন—কিন্তু সিগারেট ধরালেন না। হাতের দু আঙুলে সিগারেট—মাঝে মাঝে মুখ মুছছেন হাতে। এগুলো মুখার্জিদার দুর্বলতার লক্ষণ সে আগেও টের পেয়েছে। বাঙ্কে বালিশটা মুখার্জিদাই টেনে বললেন, 'বসে থাকতে কষ্ট হলে শুয়ে পড়।'

'না কিছু কষ্ট হচ্ছে না। তুমি ভেব না।'

'কি হল বলবি তো!'

'চার্লির ধারণা তার ঠাকুরদা এই দ্বীপটায়ও বুনো ফুলের চাষ করে গেছেন। জাহাজটার নাম ডরোথি ক্যারোকা না কারকার কি যে বলল মনে করতে পারছি না। ওর ঠাকুরদার প্রমোদ তরণীর নাম নাকি ওরকমেরই ছিল!'

'তারপর।'

'তারপর এক একটা ফুল দেখছে আর কেমন আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। ঘোড়া ছুটিয়ে দিচ্ছে। কাশের জঙ্গলে ঢুকে বলছে ওগুলো নাকি ব্লুস্টেম ঘাস। বল কি বলি। বুনো ফুলের মধ্যে চার্লি নাকি নিজেকে ফিরে পায়। এক একটা ফুল আবিষ্কার করছে, আর বলছে, সুহাস, আই হ্যাভ নেভার ফরগটেন দ্যাট গিফ্‌ট অফ মাই চাইল্ডহুড! বল কি বলি! ফুলগুলি জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে।'

সুহাস বুঝতে পারছে, মুখার্জিদা অস্থির হয়ে পড়ছেন। অধৈর্যের চূড়ান্ত। কিন্তু সবটা না বললে বুঝবেন কি করে।

সে বলল, 'জানো, ক্রমে কেমন আচ্ছন্ন হতে হতে আমার কথা ভুলে গেল। ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। চোখের বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল। ডাকছি, চার্লি সাড়া নেই। ঘাসের ফাঁকে উঁকি দিচ্ছি, নেই। ঘাসের মধ্যে কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেল! ঘোড়াটাকেও দেখতে পেলাম না। ছুটলাম। ঢালু জমি পার হয়ে পাথরে লাফ দিয়ে নামতেই দেখি দূরে পাথরের গায়ে সমুদ্র লেগে আছে। বড় বড় ঢেউ আছড়ে পড়ছে। আর মানুষের অবয়বে কেউ বসে আছে দেখতে পাচ্ছি। যত এগিয়ে যাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি, সে চোখের সামনে বড় হয়ে উঠছে। ঘাবড়ে গেছি। সুহাস বলতে গিয়ে ঢোক গিলল। জ্যান্ত মৎস্যকন্যা।

ভয়ে হয়তো পালাতাম। দেখি ঘোড়াটা ঘাস খাচ্ছে। সাহস ফিরে পেলাম। কিছু দূরে জামা প্যান্ট পড়ে আছে। আর তখনই ডেকে উঠলাম, চার্লি। ওর জামাপ্যান্ট তো আমি চিনি। কোনও সাড়া নেই!'

'তারপর?'

আবার ঢোক গিলল। সবিস্তারে বলতে পারল না। শুধু বলল, 'ওর হাত ধরে তুলে আনলাম। বললাম, কি ছেলেমানুষি করছ! চার্লি, প্লিজ, কে দেখে ফেলবে। তুমি ওম্যান। তুমি গার্ল! ছিঃ ছিঃ শিগগির জামা প্যান্ট পরো। কিছুতেই পরবে না। জোরজার করে পরিয়ে দেবার সময় ঠাট্টা করে বলেছি, দেন ইয়ো আর এ গার্ল। সঙ্গে সঙ্গে চার্লি আর্তনাদ করে উঠল, নো মি বয়!'

'আর তখনই একটা লোক যমদূতের মতো কোত্থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এল। দেখি, দেখি'...সে কেমন তোতলাতে থাকল।

'কি দেখি!' মুখার্জিদা জানার জন্য অস্থির হয়ে উঠছেন।

'সেই গুঁফো লোকটা। নিউপ্লাইমউথ বন্দরের সিম্যান মিশনে যে হিপনোটাইজ করেছিল।'

মুখার্জিদা উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠছেন।

'ঘোড়া থেকে নেমেই আমাকে ঘুষি মেরে ফেলে দিল। উঠতে পারছিলাম না।'

সুহাস হাঁপাচ্ছে। কিছুটা দম নিয়ে বলল, 'আমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারছি না—কী করে ঘটে গেল সব। চার্লি চোখের পলকে ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে বসল। মনে হল চার্লি বুঝি পালাচ্ছে। না, চার্লি পালাচ্ছে না। সোজা ঘোড়ার পিঠে দাঁড়িয়ে গেল। বুটের ডগায় লোকটার মাথায় বিদ্যুৎ বেগে লাথি মারল। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল লোকটা। চার্লি লাফিয়ে নেমে এল—আমার মাথা তখনও ঘুরছে। উঠতে পারছি না। শিশুর মতো বগলে নিয়ে ঘোড়ায় তুলে ছুটতে থাকল।' বলতে বলতে সুহাস শিউরে উঠছে। 'টিলাতে উঠে দেখছি, লোকটা নিচে উঠে দাঁড়িয়েছে। মরে যায়নি। খোঁড়াচ্ছে।'

টিলার উপর থেকে চার্লি চিৎকার করে বলছে, আই উইল রিওয়ার্ড ইয়োর ইভিল, উইদ ইভিল। নাথিং ক্যান স্টপ মি।

জঙ্গলের মধ্যে চার্লি নিমেষে আমাকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল,—সুহাস ফের হাঁপাচ্ছে। যেন দম পাচ্ছে না।

'বুনো ডেইজি ফুল খুঁজে পেলি!' মুখার্জি সিগারেট ঠুকছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে সুহাসেব মুখ আশ্চর্য সুষমায ভরে গেল। মুখ নিচু করে বলল, 'পেয়েছি।'

'আর কিছু?'

সুহাস কেন যে লজ্জায় কিছুতেই মাথা তুলতে পারছে না! অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, 'এই প্রথম চার্লি স্বীকার করেছে, সে নারী। বলেছে, আই অ্যাম স্লিম টল অ্যান্ড ফুল ব্রেস্টেড্। আই নিড ইয়োর হেলপ সুহাস। আই নো দ্যাট ওয়ান ডে ইয়ো উইল কাম অ্যান্ড হ্যাভ মার্সি অন মি।'

মুখার্জি খুবই বিচলিত। সঙ্গে সাফল্যের সুখও অনুভব করছেন। তিনিই ঠিক। শি ইজ ওম্যান! 'আই অ্যাম স্লিম, টল অ্যান্ড ফুল ব্রেস্টেড।' চার্লির অকপট স্বীকারোক্তি।

তিনি দেখলেন, সুহাস ফের শুয়ে পড়েছে। পাশ ফিরে শুয়ে আছে। আর কোনও কথা বলছে না। সুহাস যে খুবই ভেঙে পড়েছে বোঝা যায়। আশঙ্কা, শেষে এ-ভাবে সত্যি হবে তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। তাঁর কি অপরাধ তাও সুহাস বোধ হয় বুঝতে পারছে না। খুবই ঘাবড়ে গেছে। ঘাবড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। তা হলে নিউপ্লিমাউথ থেকেই সুহাসকে খুন করার চক্রান্ত শুরু হয়েছে।

না হলে ফল্কার পাশে খালি টব অন্ধকারে রেখে দেবে কেন! ডেকের অন্ধকারে কিছু পড়ে থাকলে রাতবিরেতে হোঁচট খাওয়া স্বাভাবিক। সুহাস যে তার সঙ্গে গভীর রাতে বোট ডেকে উঠে গেছে তা কেউ লক্ষ্য বেখেছে। সে যে ফেরার সময় যমুনাবাজু ধরে নীচে নেমে আসবে তাও চক্রান্তকারীর জানা। ভাগ্যিস যমুনাবাজু ধরে নামেনি! গঙ্গাবাজুতে নেমে এসেছিল। কেউ অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে আছে ভেবেই তো সুহাস ছুটে গিয়েছিল। না গেলে বুঝতেও পারত না, অদৃশ্য চক্রান্তকারী সুহাসের জন্য মরণ ফাঁদ সৃষ্টি করে রেখেছে। অন্ধকারে হোঁচট খেলে নির্ঘাত সে ফল্কার নিচে জাহাজের

খোলের মধ্যে পড়ে যেত। দুটো কাঠও খুলে রেখেছিল ফম্কার। ঠিক খালি টবটার পাশেই। পড়ে গেলে সুহাস ছাতু হয়ে যেত।

সুহাসকে এখন বেশি জেরা করাও ঠিক হবে না। অথচ জেরা না করলে বুঝতেও পারবেন না, অ্যালেন পাওয়ার সম্পর্কে কিছু জানা গেল কি না। চার্লির প্রসঙ্গ তোলা যায়। চার্লি ছিল বলে সে রক্ষা পেয়েছে বললে সুহাস খুশিই হবে। সুরঞ্জনটা কি করছে! তাকে সব বলা দরকার। সুহাসকে একা ফেলে রেখেও যেতে মন চাইছে না। সুহাস তাঁর খুবই অনুগত আর বিশ বাইশ মাসে সম্পর্ক কত গভীর হয়ে যায় সে জানে। জাহাজ থেকে নেমে যে যার লটবহর নিয়ে বিদায় জানাবার সময় সবারই চোখ ছল ছল করে ওঠে। কবে দেখা হবে, কি দেখা হবে না! অথচ জাহাজে সুখে দুঃখে দিন কাটিয়ে ঘরে ফেরার সময় বোঝা যায় কি গভীর টান। কেউ কেউ বুকে জড়িয়ে কেঁদেই ফেলে। জাহাজি জীবনে এই এক জ্বালা।

তিনি উঠে গিয়ে দরজায় ডাকলেন, 'অধীর আছিস?'

তিনি ডাকলে সাড়া না দেওয়ার কথা নয়। অধীরও কি উপরে বসে আছে! আশ্চর্য অধীরের ফোকসালে গিয়ে দেখলেন, সে নেই, সুরঞ্জনের ফোকসালও ফাঁকা। চারজন জাহাজী ফোকসালের চারটে বাঙ্কে থাকে। কেউ নেই। গেল কোথায় সব! রাত দশটা বাজে। ঘড়ি দেখে টের পেলেন। সুহাসের ফোকসালে শুধু বংশী শুয়ে আছে। যা করে থাকে—স্ত্রীর চিঠি না হয় ছবি দেখে। তাকে দেখেও যেন দেখল না।

অধীর নেই দেখছি।

বংশী শুয়ে থেকেই বলল, 'কোথাও গেছে।'

বংশীকে বলেও লাভ নেই। তিনি পব পর সব ফোকসাল খুঁজে কাউকেই দেখতে পেলেন না। এমনকি ডেকসারেঙ, ইনজিন সাবেঙের ঘরও খালি। অগত্যা নেমে এসে বংশীকে বললেন, 'আমার ফোকসালে গিয়ে শুয়ে থাক। দরজা বন্ধ করে যাস।'

তিনিও দরজা বন্ধ করে সুহাসের কাছ থেকে সব খবর নিচ্ছিলেন! সেই সেই ফাঁকে সবাই ঘর খালি রেখে কোথাও উঠে গেল! জাহাজে এমন কি হল, ফোকসাল খালি করে সবাই উপরে উঠে গেছে! কি ব্যাপার! সাংঘাতিক কিছু কি ঘটে গেল! কেউ কি আবার কোনও দুর্ঘটনাব শিকার। মাথা ঠিক রাখাই মুশকিল। ফোকসাল সব খালি হয়ে গেলে, জাহাজটা যে কি সাংঘাতিক ভুতুড়ে ভুতুড়ে মনে হয় এই প্রথম টের পেলেন তিনি।

বংশী গেল কি না কে জানে! সুহাসকে একা ফেলে উপরে যেতে সাহস পাচ্ছেন না। ফের নিজের ফোকসালে ঢুকে দেখলেন, বংশী তার কথা রেখেছে। সে পাশের বাঙ্কটায় বসে আছে।

'শোন বংশী। আমি উপরে যাচ্ছি। আমি ফিরে এলে যাবি।'

একা সুহাসকে ফেলে যাবি না বলতে পারতেন। কিন্তু বললেন না। কি দরকার। এতে সুহাস আরও কাতর হয়ে পড়তে পারে। যতই বলুক তার কিছু হয়নি, কিংবা সে ভয় পায় না, সব রকমের দুর্যোগের মুখোমুখি হওয়ার সাহস সে রাখে—বলতে হয় বলে বলা। তা ছাড়া কিছু একটা হয়ে গেলে হাত কামড়াতে হবে।

'ওর যা লাগে দিস। তোর খাবার দেবে সুহাস?'

সুহাস উঠে বসার চেষ্টা করলে বললেন, 'উঠছিস কেন?'

'বাথরুমে যাব।'

'বংশী যা। ওকে ধরে নিয়ে যা।'

'ধরতে হবে না। একাই যেতে পারব।'

'পারবি তো, পড়ে টড়ে যাবি না তো!'

'না না। তুমি কেন যে এত উতলা হয়ে পড় বুঝি না! ভালই তো আছি।'

সহসা ক্ষেপে গেলেন, 'ভাল আছিস তো গুম মেরে গেলি কেন! উঠতে পারছিস না। তবু বলছিস পারবি!'

'পারব, দ্যাখ না।' বলে সন্তর্পণে সে উঠে বসল। বাঙ্কের রেলিঙ ধরে উঠে দাঁড়াল। তারপর বের

হয়ে গেলে মুখার্জি বংশীকে বললেন, 'সঙ্গে যা। সঙ্গে সঙ্গে থাকবি। যাই বলুক, গায়ে মাখবি না।'

বংশী উঠে গিয়ে বাথরুমের দরজায় দাঁড়াতেই তিনি ছুটে গেলেন ডেকে। আর আশ্চর্য, দেখলেন ঠিক বোট-ডেকের নিচে জাহাজিদের জটলা! ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে জাহাজিরা।

সামনে পেলেন গালির ভাণ্ডারি ইমতাজকে। বললেন, 'কি হল চাচা! তোমরা সবাই এখানে! সুরঞ্জন কোথায়!'

'তা তো জানি না।'

বুকটা ধক করে উঠল।

জটলার মধ্যে ঢুকে বললেন, 'কি হয়েছে? সুরঞ্জন কোথায়!'

সুরঞ্জন বের হয়ে বলল, 'শুনছ!'

যাক সুরঞ্জনের কিছু হয়নি। কিছুটা যেন হালকা হতে পেরেছেন।

'কি হয়েছে?'

'কি আর হবে!' বাপ ব্যাটাতে লেগে গেছে!'

'বাপ ব্যাটা।'

'আরে চার্লি খেপে গেছে। ঘর থেকে সব ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। জামা প্যান্ট লাথি মেরে ফেলে দিচ্ছে। পোর্টহোল দিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে সব। একবার নাকি প্রায় উলঙ্গ হয়ে বের হয়ে আসছিল। কাপ্তান বোট-ডেকের সব আলো নিভিয়ে দিয়েছেন! অন্ধকারে কি হচ্ছে বোঝাও যায় না। চিফমেট সেকেন্ডমেট সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছেন। কাউকে ওদিকে যেতে দিচ্ছেন না। যা মুখে আসছে গালাগাল দিচ্ছে চার্লি। কাপ্তানকে কি বলেছে জানো? চিৎকার করতে করতে ছুটে গেছে কাপ্তানের কেবিনে। হুল্লোড়। কাপ্তান একটা চাদর দিয়ে সারা শরীর ঢেকে চার্লিকে কেবিনে ঠেলে ঢুকিয়ে দরজা লক কবে দিয়েছেন। ভাগ্যিস অন্ধকার! কেচ্ছা। কেউ টের পায়নি।'

মুখার্জি বললেন, 'অন্ধকার কোথায়। জ্যোৎস্না উঠেছে। জ্যোৎস্নায় বোঝা যাবে না?'

'সে তো জানি না!'

'কাপ্তান বয় কোথায়?'

'ওব কেবিনে। কেউ বের হতে পাবছে না। নিষেধাজ্ঞা জারি হয়ে গেছে। বোট-ডেকে কাউকে উঠতে দেওয়া হচ্ছে না। চার্লি খেপে গেল কেন বল তো?'

'চার্লি তার বাবাকে কি বলেছে বলবি তো!'

'আমি কি শুনেছি। কাপ্তান বয় এসে বলল, 'জানেন, এমন ভাল মানুষের কপালে এই দুর্গতি! শত হলেও তোর বাবা—গুরুজন, তাকে বলতে পারলি, ইয়ো ক্রেজি ওল্ড গোট!'

'ও এটুকু! আর কিছু বলেনি?'

'স্টিঙ্ক কি, দাদা!' একপাশে ডেকে নিয়ে সুরঞ্জন মুখার্জিকে প্রশ্ন করল।

'স্টিঙ্ক!'

'তাই তো বলল কাপ্তান বয়। চার্লি নাকি বাবার দরজায় লাথি মেরে বলেছে, ইয়ো স্টিঙ্ক!'

'স্টিঙ্ক মানে তো দুর্গন্ধ।

'দুর্গন্ধ!'

'তাই তো জানি! কাপ্তান বয় শুনল কি করে!'

'সে কাপ্তানের কেবিনে কোনও কাজে গিয়েছিল বোধ হয়।'

'আর অফিসার ইনজিনিয়াররা কোথায়!'

'সব কটা তটস্থ। যে যার কেবিনে চুপচাপ বসে আছে। কাপ্তান একবার ব্রিজে, একবার চার্টরুমে, একবার নিজের কেবিনে পাগলের মতো ছোটাছুটি কবছেন। আচ্ছা কাপ্তেনের মাথা খারাপ হয়ে যায়নি তো। যাকে সামনে পাচ্ছে, গালাগাল দিচ্ছে। বাস্টার্ড সোয়াইন বিচ বলতেও মুখে আটকাচ্ছে না!'

'যাক তা হলে চার্লি রিভোল্ট করতে চাইছে! এদিকে খবর রাখিস, সুহাসকে আজ মেরেই ফেলত!'

'কে মেরে ফেলত!'

'সে কে জানে না! তারই প্রতিক্রিয়া এখানেও চলছে কি না জানি না! কি যে হবে!'
সুরঞ্জন বলল, 'চার্লি?'
'না, চার্লি না। চার্লিকে অযথা আমাদের সন্দেহ করা ঠিক হয়নি!'

জাহাজিরা যে বোট-ডেকের ছাদের নিচে জটলা করছে, নিশ্চয় কাপ্তান টের পাননি। টুইনডেকে নামার সিঁড়ির ঠিক কাছে না গেলে বোঝা যায় না, সেখানে জাহাজিদের কোনও জটলা আছে। মাঝে মাঝে কাচ ভাঙার শব্দ তারা পাচ্ছে। মাঝে মাঝে হাতুড়ি দিয়ে দড়াম দড়াম দরজায় কেউ মারছে। কে মারছে, কাপ্তান না চার্লি, বোঝা যাচ্ছে না।

জাহাজিরা ফলে চিফকুকের গ্যালির ছাদের নিচে নিজেদের আড়াল করে রেখেছে। মুখার্জি ডেকে ছুটে আসার সময় শুধু দেখেছেন সেকেন্ডমেট বোট-ডেকের রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি নিশ্চয়ই জানেন, জাহাজিরা ডেকছাদের নিচে ঘাপটি মেরে বসে আছে। তিনিও বোধ হয় বেশ বিচলিত। জাহাজের সর্বময় কর্তা যদি অস্থির হয়ে পড়েন, তবে জাহাজিরাই বা ঠিক থাকে কি করে!

অথচ আর কোনও টুঁ শব্দ হচ্ছে না। কেউ কেউ অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সরেও পড়ছে। ইনজিন সারেঙ চিফকুকের গ্যালিতে বসে আছেন। তিনিও বুঝতে পারছেন না, কেন চার্লি এত খেপে গেল।! কেন কাপ্তান পাগলের মতো অস্থির হয়ে পড়েছেন। ঘোর দুর্যোগে সমুদ্রে যিনি এত অবিচল থাকেন, তাঁর এমন কি হল, যে এক দণ্ড স্থির হয়ে বসতে পারছেন না।

আর তখনই মনে হল, ঠিক সিঁড়ি ধরে কে নেমে আসছেন, চিৎকার করতে করতে, বলছেন, 'লিসন মাই ফেইথফুল সেলরস লিসন ক্লোজলি টু মাই প্রেয়ার—হিয়ার মাই আরজেন্ট ক্রাই? আই উইল কল টু ইয়ো হোয়েনেভার ট্রাবল স্ট্রাইকস, অ্যান্ড ইয়ো উইল হেলপ মি।'

মুখার্জি থ। কাপ্তান দু-হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছেন বোট-ডেকে। এমন নিরুপায় মানুষ মুখার্জি যেন জীবনেও দেখেননি! তাঁর চকচকে পোশাক আজ নোংরা মনে হচ্ছে। অন্তহীন এক অরাজকতার শিকার যেন তিনি। জাহাজের অফিসার-ইনজিনিয়াররা কেউ যেন তাঁর নয়। একমাত্র বিশ্বস্ত তাঁর এই নিরক্ষর অর্ধশিক্ষিত জাহাজিরা।

বোধ হয় কাপ্তান পিছিলে উঠে যেতেন। অন্তত তর তর করে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে আসার ভঙ্গি দেখে মুখার্জির এমনই মনে হয়েছিল! তিনি ঘোর দুর্যোগে পড়ে গেছেন। দু-হাত উপরে তুলে দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যেও এই অবিচল মানুষটিকে বোঝা যায় তাঁর রাশ আলগা হয়ে গেছে। অথচ তিনি পিছিলে ছুটে গেলেন না। ডেকছাদের নিচেই জাহাজিরা গা ঢাকা দিয়ে আছে টের পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছেন।

সবাই একে একে সরে পড়তে থাকলে, তিনি ফিরে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালেন।

মুখার্জি যাচ্ছেন না।

মাস্তুলের আড়ালে দাঁড়িয়ে কাপ্তানকে দেখছেন।

তাঁর সুন্দর চকচকে সাদা পোশাকে কিসের দাগ!

চার্লি কি কফির পেয়ালা ছুঁড়ে মেরেছে কাপ্তানকে। আই উইল রিওয়ার্ড ইভিল, উইদ ইভিল, নাথিং ক্যান স্টপ মি! এই কি তবে সেই রিওয়ার্ড। কাপ্তান কি তবে চার্লির সেই নিশ্চিত ইভিল—কফির কাপ ছুঁড়ে মেরে বুঝিয়ে দিল!

না, মাথায় কিছু আসছে না। তবে সেকেন্ড কে? সে মুখোস পরে অনুসরণ করে কেন? কাপ্তানের চর! চর হলে এ-সময় তাকে সঙ্গে দেখা যাচ্ছে না কেন! চর হলে কেন তিনি তাঁর নাবিকদের সম্বোধন করলেন, লিসন মাই ফেইথফুল সেলরস, লিসন ক্লোজলি টু মাই প্রেয়ার...

প্রেয়ার কথাটাই বা বললেন কেন!

তাঁর আদেশ জাহাজে শিরোধার্য। সমুদ্রে ফাঁসির হুকুম দিলেও। তবে কেন তিনি চার্লি কিংবা

সুহাসের পেছনে চর নিয়োগ করবেন। সুহাস যদি তাঁর পথের কাঁটা হয়, জাহাজ থেকে নামিয়ে দিতে পারেন। দেশেও পাঠিয়ে দিতে পারেন। চার্লিকেও পারেন।

তবে পারছেন না কেন।

তাঁর এই কাতর প্রার্থনা কি যে করুণ! মুখার্জির নিজেরই খারাপ লাগছিল। চার্লি তাঁকে অসম্মান করতেই বা সাহস পায় কি করে! ইয়ো ক্রেজি ওল্ড গোট, ইয়ো স্টিঙ্ক—বাবাকে এভাবে কুৎসিত কথাবার্তা বলা কত অশোভন চার্লি বুঝবে না! চার্লি বুঝবে না, সে তার বাবাকে খাটো করলে নিজেই খাটো হয়ে যায়!

এটা কি কোনও আচ্ছন্ন অবস্থা থেকে! অবদমিত আকাঙ্ক্ষার আগ্নেয়গিরি, লাভার মতো বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে! চার্লির কাছ থেকে এমন অস্বাভাবিক আচরণ তিনি যেন কিছুতেই আশা করেননি। চার্লি কি মনে করে তার এই নিগ্রহের মূলে তার বাবা। এটাও তো ঠিক, চার্লিকে ছেলে সাজিয়ে রাখা কেন। কি দায় পড়েছে একজন পিতার, তার কন্যাকে অকারণে এই নিগ্রহের মধ্যে ফেলে রাখার! না তিনি কিছুই বুঝছেন না।

মুখার্জি পিছিলে ফিরে এলে সবাই ঘিরে ধরল।

সুরঞ্জন মেসরুমে ঢুকে গেছে। ভাণ্ডারিকে কিছু বলছে হয়তো। খাবার সব ঠাণ্ডা। গবম করেও নিতে পারে খাবার। তার ধারণা, সবার খাওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু সে দেখল, খাবাব প্রায় সব পড়েই আছে। কেউ খায়নি তবে। তার পছন্দ হচ্ছিল না, মুখার্জিদা বক বক করুক।

সে একবার সিঁড়ি ধরে নিচেও নেমে গেল। সুহাস নেই। খালি ঘর। সবাই ডেকে উঠে গেছে, সুহাস যায়নি কেন? সে বুঝতে পারছে না, সুহাস কোথায় থাকতে পারে! তার কি হয়েছে তাও জানে না। মুখার্জিদার দরজা ঠেলে দিতে দেখল, সুহাস ক্ষিপ্ত। গজ গজ করছে। বলছে 'কারও সাড়া শব্দ নেই—না মুখার্জিদার না সুরঞ্জনের। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে।'

সুবঞ্জন বলল, 'উপবে চলে আয়। ওদিকে তোমার তামাসা জমে উঠেছে। পরে বলা যাবে। আমি যাচ্ছি। বংশীদা খেয়েছ?'

বংশী ঘাড় নেড়ে বলল, খেয়েছে।

উপরে উঠে বুঝল, মুখার্জিদাকে সবাই এখনও জেরা করছে। কাপ্তান চিৎকার করে কি বলছিল, জানতে চাইছে। মুখার্জিদা বেঞ্চিতে বসে বলছেন, 'তোমরাই আমার বিশ্বস্ত জাহাজি। বিপদে তোমরাই আমার সব।' কাপ্তান শেষ পর্যন্ত হাত তুলে যা হোক স্বীকার করলেন।

'এ-কথা কেন মুখার্জিবাবু?'

'তা তো জানি না।'

'চার্লি খেপে গেল কেন? কাপ্তান খেপে গেল কেন?'

সারেঙ ধমক দিলেন, 'মুখার্জিবাবু কি করে বলবেন কাপ্তান খেপে গেল কেন? কাপ্তান কি তাঁকে ডেকে বলেছেন, মুখার্জি চার্লি খেপে গেছে। পার তো আমাকে উদ্ধার কর। তোমরাও যা জান, তিনি তার চেয়ে বেশি জানবেন কি করে।'

সুরঞ্জন আর পারল না। খিদে পেলে সে মাথা ঠিক রাখতে পারে না। মুখার্জিদা না এলে খেতেও পারছে না। অথচ মুখার্জিদা যেন মজা পেয়ে গেছেন—তাঁর কথাবার্তা শুনে মনে হয়, জাহজে এটা এমন কিছু ঘটনা নয়! যখন কিছুই তেমন ঘটনা নয়, তবে বকবক করছ কেন! দেরি করছ কেন? খেয়ে নাও। যেন খুবই লঘু চিত্ত। তিনি বললেন, 'আরে কি দেখতে কি দেখেছে!'

না, মানে, ছোটসাব নাকি মেয়েদের পোশাকে বের হয়ে এসেছিল?' কয়লায়ালা হাফিজের খুব রগড়...'আমি শাড়ি পরে ঘুরে বেড়ালে বখশিস দেবে?'—বলে সে লুঙ্গিটা মাথায় তুলে সবার সামনে কোমর দুলিয়ে ঘুরে গেল। সামনে সারেঙসাবকে দেখেই জিভ কেটে এক দৌড়।

জাহাজিদের মধ্যে বেশ রগড় জমে উঠেছে। বাপ ব্যাটার লড়ালড়ি বোঝো এবার! ঘরে ঘরে যে যার মতো কেচ্ছাও ছড়াচ্ছে। ওপরওয়ালারা বেইজ্জত হলে কে না খুশি হয়! বড় রকমের কোনও দুর্যোগের আভাস থাকতে পারে এর মধ্যে তারা ভাবতেই পারে না। চার্লি যে কিনার থেকে আকণ্ঠ মদ্যপান করে ফেরেনি—কিংবা কোনও নারী সংক্রান্ত ব্যাপার-স্যাপার আছে এমনও চাউর হয়ে গেল।

কেউ তো বলল, 'সুহাসকে তো চার্লিই ফোকসালে দিয়ে গেছে। দুজনেই টলছিল। জাহাজ হোমে ফিরছে না বলে খেপে ছিল, মদ্যপান করে ঝাল মেটাল।' কেউ বলল, 'সুহাসও কিনার থেকে ফিরেই শুয়ে পড়ল। ঘোড়া ল্যাং মেরেছে। আরে কার ল্যাং খেয়ে জব্দ কে জানে! মুখার্জিবাবু তো কাউকে ফোকসালে ঢুকতেই দিচ্ছিলেন না।'

মুখার্জির কানেও উড়ো কথা ভেসে আসছে। তিনি গা করছেন না। জাহাজিদের তো কিছুই সম্বল নেই—এতে যদি মজা পায় পাক না। তিনি নিচে নামার মুখেই দেখলেন, সারেঙ হন্তদন্ত হয়ে পিছিল থেকে ছুটে আসছেন।

'মুখার্জিবাবু।'

তিনি ঘাড় ফেরালেন।

'মেজমালোম!'

'কোথায়?'

'কি বলছে বুঝতে পারছি না। মেজমালোম সুহাসকে খুঁজছে মনে হয় : আপনি দেখুন কথা বলে!'

মেজমালোম মানে সেকেন্ডমেট। মানে সেকেন্ড অফিসার। এত রাতে এদিকে! সুহাসকেই বা খুঁজছে কেন! তাঁর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। দৌড়ে গেল, ইয়েস স্যার। বলুন।

সুহাসেব নাম ঠিক বলতে পারছেন না। কেবল বলছেন 'দ্যাট ইয়াঙ সেলব—আই মিন সাঁস।'

'সাঁস নয়। সুহাস।'

'ইয়েস সাঁস!'

মুখার্জি আর ভ্রান্তি দূর করার চেষ্টা না করে বললেন, 'ওর তো শরীর ভাল নেই। নিচে যাবেন?'

'দিস ইজ দ্য মেসেজ।' বলে তিনি একটি খাম ধরিয়ে দিলেন। কার লেখা—কাপ্তান নিজে লিখেছেন। সারেঙকে ডেকে বললেই পারতেন। মেসেজ পাঠালেন কেন। আশ্চর্য তিনি—দেখলেন, নাম, এবং নিচে মাস্টার অফ দ্য শিপ লেখা। উপরে লেখা, আই নিড ইয়োর হেল্প। তারপর লিখেছেন, ওনলি এ ফুল ডেসপাইজেস হিজ ফাদার'স অ্যাডভাইস, এ ওয়াইজ সন কনসিডারস ইচ সাজেসান। চার্লিকে তুমি বোঝাও।'

'ঠিক আছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি যান। ও খাচ্ছে।'

সেকেন্ডমেটকে চিরকুটটি ফেরত দিলেন না মুখার্জি। চার্লি কথা শুনছে না। চার্লি অবুঝ। চার্লি সুপুত্র নয়। এমন অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যদি সুহাস তাঁর পুত্রের মতিগতি ফেরাতে পারে। তাঁব হাসি পাচ্ছিল। এত কাণ্ডের পর একজন সাধারণ জাহাজির কাছে এতটা নতি স্বীকারও কেমন খারাপ লাগল। সুহাস গিয়ে কি করবে। সুহাসকে একা ছেড়ে দেওয়াও যায় না। এটা আদেশের পর্যায়ে না পড়লেও পরোক্ষে যেন তিনি সুহাসকে এখুনি যেতে বলছেন। বাবা হয়ে মেয়ের কাছ থেকে কি করে পুত্রের আচরণ আশা করেন তাও বোঝা যাচ্ছে না। খুবই রহস্য।

নিচে নেমে দেখলেন আবার ভিড়। এত খারাপ লাগে—নানা প্রশ্ন, 'সেকেন্ডমেট পিছিলে কেন এসেছিলেন, কাকে খোঁজাখুজি করছেন, কে সে!'

তিনি সোজাসুজি বললেন, 'সুহাস। সুহাসকে কাপ্তান তাঁর কেবিনে ডেকে পাঠিয়েছেন।'

কথাটা শুনেই সুহাস বলল, 'আমাকে?'

'হ্যাঁ তোমাকে।'

সুরঞ্জন বলল, 'ছেলে বদমাইসি করল, আর টানাটানি সুহাসকে নিয়ে।'

মুখার্জির কিছু ভাল লাগছে না।

'আরে মিঞারা এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন। এখানে কি তামাসা। সার্কাসও নয়। জন্তু জানোয়ারও উঠে আসেনি। যাও।' বলে ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন। সুরঞ্জনকে সব খুলে বললেন। বসে পড়লেন। মাথাটা তাঁর বেশ ধরেছে। বসে কপাল টিপছেন। কোনও কথা বলছেন না।

সুরঞ্জন বলল, 'ভেঙে পড়লে চলবে। কিছু বলো।'

সুহাসের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রেডি হয়ে নে। আজ কপালে আমাদের দুর্ভোগ আছে। এই

অধীর ওর জুতো পালিশ করে দে তো। মোজা ভাল না থাকলে, বের করে দিচ্ছি।' বলে তিনি আলমারি খুলে একটা পাট করা সাদা শার্টও বের করে দিলেন।'

সুরঞ্জন বলল, 'আমার তো মনে হয় কাপ্তানকে সব খুলে বলা দরকার।'

'কি খুলে বলবে?' চোখমুখে কুঁচকে গেল মুখার্জির।

'এই যে জাহাজে যা যা ঘটছে!'

'কি ঘটছে?' মুখার্জি বিরক্ত।

'তাহলে বলা উচিত হবে না?'

'না।'

'কিন্তু আজকে যা ঘটল?'

'না. তাও না!'

সুরঞ্জন সুবিধে করতে না পেবে বলল. 'যা খুশি কর. আমার কিছু বলার নেই! আরে তিনিই তো সব। তিনি জানবেন না! এমন তো নয়. আমরা তাঁকে নালিশ দিতে পাবি।'

মুখার্জি কেমন নিরাশ। তিক্ত গলায় বললেন, 'তোব দেখছি সত্যি মাথাটা গেছে। চিরকুটে কি লিখেছেন দেখার পরও বলছিস আজকেব ঘটনা তাকে বলা দরকার। চার্লি কি জানে না। বলার দরকার থাকলে সে-ই বলবে! আর যাই করুক চার্লি সুহাসেব কোনও ক্ষতি হয় এমন কাজ করতে পারে না। যদি মনে করে সুহাসের কিংবা তার ঘোর বিপদ সামনে তবে দরকারে বলতেই পারে। আবার বলতে নাও পারে। চার্লি তার বাবাকে নির্ভরযোগ্য না মনে করলে বলতে যাবে কেন! নিশ্চয়ই কোনও অশনি সংকেত দেখা দিতে পারে বললে।

সুহাস জোর পাচ্ছে না। সে সেজেগুজে বসে থাকল। তার যেন উঠতে ইচ্ছে কবছে না। কোমরে ব্যথাটা আছে। ঘাড়েও। সত্যি যেন ফ্যাসাদে পড়ে গেছে।

সুরঞ্জন খেপে গিয়ে বলল, 'হয়েছে ভাল, মেয়ে আর বাবা দুজনেরই এক কথা—আই নিড ইয়োর হেল্প। জাহাজে আর কাউকে পেলি না। সেদিনের ছেলে, সে তোদের কতটা সাহায্য করতে পারে!'

সুহাস উঠে দাঁড়ালে, মুখার্জি বললেন, 'অধীরকে ডাক সুরঞ্জন। তুই, অধীর বোট-ডেকের দুই সিঁড়ির আড়ালে বসে পাহারা দিবি। অধীর ফরোয়ার্ড ডেকের দিকে, আর তুই আফটার ডেকের দিকে। সুহাস কাপ্তানের কেবিন থেকে বের হলে লক্ষ রাখবি।'

সুহাসের মুখে ব্যাজার হাসি—'আমার কি ফাঁসি হবে! যা করছ! যেন আগুনে ফেলে পুড়িয়ে মারার মতলব আছে কাপ্তানের।'

মুখার্জি বললেন, 'কাপ্তানের না থাক, আর কারও থাকতে পারে। মার খেয়েও লজ্জা হয় না। এক ঘুষিতে কাত। পালটা ঘুষি চালাতে পারলি না। শেষে এক অবলা তোকে উদ্ধার করে নিয়ে এল।'

সুহাস বের হবার মুখে বলল, 'আচমকা সবাই মারতে পারে কিছু বুঝে ওঠার আগে। কে কতটা সাহসী আমারও জানা আছে।'

কিছুটা তুচ্ছ করতে শিখছে—এটা ভাল। মুখার্জি এমন ভাবলেন। অন্তত সুহাস নিজেকে সামলে নিয়েছে।

মুখার্জি বললেন, 'গ্যাঙওয়েতে থাকব। সুরঞ্জন বিপদের গন্ধ পেলে দেরি করবি না। আমিও বোট-ডেকের নিচে আছি।'

সুহাস বোট-ডেকে উঠে গেল। কাপ্তানের কেবিনের পাশে চিফমেট সেকেন্ডমেট অপেক্ষা করছেন। সে ঢুকেই অভিবাদন করল। তার গলা শুকিয়ে উঠছে। বুক কাঁপছে। কিন্তু সে যতটা পারছে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছে। তিনি কি বলবেন সে জানে না। কেন ডেকেছেন তাও জানে না। যদি আজকের ঘটনার কথা জানতে চান, কিংবা চার্লি যা বলছে তা কতটা ঠিক, কতটা কি গোপন করেছে—এসব কারণেও ডাকতে পারেন। সে দেখল, তিনি পিছন ফিরে বসে আছেন। সাদা হাফশার্ট হাফ প্যান্ট পরনে—ঘরে বিশাল র‍্যাক, ভারী ভারী সব বই, নীল রঙের ক্যালেন্ডার—সাদা বিছানা, সবুজ সোফা, লাল কার্পেট, মাথার উপরে যিশুর মূর্তি। ফুলদানিতে গোলাপ গুচ্ছ।

তিনি তার দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'গড ব্লেসেস গুড ম্যান, অ্যান্ড কনডেমস্ দ্য উইকেড। তোমার ভয় পাবার কিছু নেই। চার্লি আজ আবার অস্বাভাবিক আচরণ করছে। কেন করছে জানি না। তুমিই পার তাকে সামলাতে। আমি অন্তত তাই বিশ্বাস করি। দ্যাখ তাকে স্বাভাবিক করে তুলতে পার কি না। চেষ্টা করতে আপত্তি কি।'

সুহাস ফের অভিবাদন জানিয়ে বের হবার মুখেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু তার দিকে তাকালেন না। চাবিটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'ওকে আটকে রাখা হয়েছে। কি অবস্থায় আছে জানি না। দরজা খুলতে সাহস পাচ্ছি না। দ্যাখ সে আবার যেন কেবিন থেকে ছুটে বের হয়ে না যায়। চার্লি তোমাকে পছন্দ করে। তোমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে। চার্লির কোনও ক্ষতি হয় নিশ্চয়ই তুমি চাও না। আমিও চাই না। আমাদের দু'জনেরই এ-জায়গাটায় দুর্বলতা আছে।' বলে তিনি দরজার কাছে এসে চিফমেট সেকেন্ডমেটকে ইশারায় চলে যেতে বললেন, তারপর দরজা বন্ধ করে দিলেন।

শেষে আবার সেই বোট-ডেকে সে একা। বোট-ডেকের আতঙ্ক এক নারী—যে বাতে, কিংবা রাত সুনসান হয়ে গেলে রেলিঙে চুপচাপ গোপনে দাঁড়িয়ে থাকে। সে যে বরফঘরের ভূত নয়, সে যে চার্লি, আজ আর সুহাসের বিশ্বাস করতে কোনও দ্বিধা থাকল না। ছদ্মবেশের খোলস চার্লির বোধ হয় অসহ্য ঠেকত। তাকে দেখার জন্য অস্থিরও হয়ে পড়তে পারে। কতকাল থেকে চার্লি তার কাছে বুনো ফুলের সৌন্দর্য নিয়ে যে আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছে। পারেনি। যার জন্য ফুটে থাকা নিভৃতে, সেই যদি দৌড়ে পালায় ক্ষোভ জ্বালায় ছটফট করতেই পারে, ভুতুড়ে কাণ্ড ভাবে, তবে অপমানে জ্বলে উঠতেও পারে।

চার্লির কোনও দোষ নেই।

কেন যে মনে হল চার্লি বড় নিঃসঙ্গ একা। এবং কিছুটা বোকা। সে তো মুখ ফুটে বলতে পারত, মি গার্ল সুহাস। সে কেন স্বীকার করত না। চার্লি বোট-ডেকে গভীর রাতে দাঁড়িয়ে থেকে যে তাকে আতঙ্কে ফেলে দিত তখন বুঝতে পারত না।

সে ব্রিজ দেখল, কেউ নেই। কোথাও থেকে আচমকা কেউ নেমে এলে প্রস্তুত থাকা ভাল। কিনারায় ঘর বাড়ির আলো—পাহাড়ের ও-পাশে কোম্পানির শহর—সেখান থেকেও আলোর উৎস উঠে আসছে পাহাড়ের মাথায়। চিমনির পাশের আলোটা বাতাসে দুলছে।

সে চাবিটা হাতে নিয়ে দেখল। তার তাড়াতাড়ি চার্লির কেবিনে ঢুকে পড়া দরকার। তবে সে জানে, সুরঞ্জন অধীর সিঁড়ির গোড়ায় বসে আছে। নিচের কেবিনগুলো থেকে কেউ বের হলে তারা দেখতে পাবে। কেবল এলিওয়েয়ের সিঁড়িটায় তারা নজর রাখতে পারবে না। ওটা ভিতরের দিকে। এলিওয়ে থেকে সিঁড়িটা বোট-ডেকে উঠে এসেছে। সাহেব-সুবোরা এই সিঁড়িটাই বেশি ব্যবহার করেন। সে সে-দিকটায় নিজেই নজর রাখছে।

ইস কি করেছে!

পায়ের নিচে সব কাচ ভাঙা কাপ প্লেট ডিস জলের গ্লাস—ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। চাদর তোয়ালে, কাটা ছেঁড়া ম্যাট্রেসের ছড়াছড়ি। দরজার সামনে যাওয়াই কঠিন। সে নিচু হয়ে ম্যাট্রেস সরিয়ে দেবার সময় দেখল, ফালা ফালা করে কেটে ফেলেছে ম্যাট্রেসটা। আর তখনই ঘাড়ের উপর কার নিঃশ্বাস।

সে চমকে গেল।

সে অতর্কিতে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই দেখল, কাপ্তানবয় সামনে। তাকে ইশারায় কোথাও যেতে বলছেন।

কতদূর যেতে হবে। বুঝতে পারল না সুহাস। কাপ্তানবয় বুড়ো মানুষ। তিনিও যেন ভাল নেই। তার চোখমুখ দেখে সুহাসের এমনই মনে হল।

'কিছু বললেন!' খুব সতর্ক গলায় কথাটা বলল সুহাস। কেউ যেন শুনতে না পায়। এত রাতে মানুষটার জেগে থাকাও বিচিত্র ব্যাপার।

যাই হোক সুহাস সব শুনে আশ্বস্ত হল। খারাপও লাগছে।

কাপ্তানবয় বললেন, 'আমি আছি। ছোটসাব কিছুই খায়নি। কোন্ সকালে খেয়ে বের হয়েছেন, মুখে

কিছু দেওয়াই গেল না। যদি পারেন, ওকে কিছু খাইয়ে যাবেন। যখন যা দরকার বলবেন। চিমনির আড়ালে আমি আছি। ডাকলেই পাবেন।

ভাঙা কাচ, ছুঁড়ে ফেলা জামা-প্যান্ট ডিঙিয়ে সুহাস চার্লির দরজার সামনে চলে গেল। দরজায় কান পাতল। যদি কোনও সাড়া পাওয়া যায়। না, ভিতরে একেবারে চুপ। ভিতরে সে নড়াচড়া করছে না। দরজা খুলে কি দেখবে তাও জানে না। চার্লি যদি রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে থাকে! কাপ্তান যদি কন্যার ছদ্মবেশ ধরা পড়ায় খুনটুন করে ফেলে রাখেন! কত রকমের বীভৎস চিন্তা যে মগজে জট পাকিয়ে তুলছে।

দরজা খুলতেই ভয় পাচ্ছে সে।

তার হাত কাঁপছিল।

লক খুলে ধীরে ধীরে দরজা ফাঁক করতেই অবাক—এ কি ঘরে যে কেউ নেই। সে ছুটে পালাবে ভাবছিল, আর তখনই দেখল নীল কার্পেটে দু-খানি পা দেখা যাচ্ছে। মাছরাঙার মতো সুন্দর লাল নীল রঙের কোনও উর্বশীর পা। তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। এক পা বাড়িয়ে সে ঝুঁকে দেখার চেষ্টা করবে তারও যেন সাহস নেই। চার্লির যদি কিছু হয়—তার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। খাটের আড়ালে চার্লি পড়ে আছে। ভিতরে ঢুকলে কি দেখবে কে জানে!

তাব গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, সে জোর পাচ্ছে না। তবু কোনও রকমে দবজা লক করে খাটে ভর করে দাঁড়াল। পা ছাড়া কিছু দেখা যাচ্ছে না। তাবপব কি ভাবে পড়ে আছে চার্লি সে জানে না। দরজা খোলাব পর তো চার্লিব উঠে বসার কথা। তার ঘরে কে ঢুকে গেছে—সে কে দেখবে না! তাহলে কি চার্লির হুঁশ নেই। চার্লি নিজেই কিছু করে বসেনি তো। ক্ষোভে দুঃখে, অভিমানে কিছু একটা করে বসতেই পারে।

সে জোরে শ্বাস ফেলল। কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

সে চোখ বুজে আছে। আতঙ্কে। কি না শেষে দেখতে হয়!

আতঙ্ক—কাপ্তান তাকে কেন পাঠাল। চার্লি যদি খুন হয়। তাকে যদি তিনি জড়িয়ে দিতে চান! দৌড়ে পালাবে কি না তাও ভাবছে। তারপরই মনে হল, না সে পালাতে পারবে না। চার্লিকে ফেলে সে কোথাও যেতে পারবে না। খুন হলেও না। চার্লি নিজে কিছু করে বসলেও না। তাকে খুনের সঙ্গে জড়িয়ে দিলেও না।

আরও কত কথা যে মনে হচ্ছে। জাহাজডুবির পর কোনও জলমগ্ন নারীকে সে উদ্ধার করার জন্য যেন সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

সে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। খাটের ওপাশে লম্বা হয়ে পড়ে আছে চার্লি। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। মুখ আড়াল করা। সে পাশে গিয়ে বসল। তার বুক ঠেলে কান্না উঠে আসছে —কেন চার্লির সাড়া শব্দ নেই, কেন চার্লি উঠে বসছে না?

সে ডাকল, 'চার্লি।'

সে আর পারছেন না। মুখের কাছে হাত নিযে গেল। হাত তার কাঁপছে। সে শ্বাস প্রশ্বাসের ওঠা নামা টের পেল শরীরে। মুহূর্তে কি যে হয়ে গেল। পাগলের মতো জড়িয়ে ধরল চার্লিকে।

চার্লি তাকে অপলক দেখছে!

চার্লি তাকিয়েই আছে। সে যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না, সুহাস এত রাতে তার কেবিনে ঢুকে যেতে পারে। কি করে ঢুকল, কি ভাবে! দরজা লক করা বাইরে থেকে। চার্লি ফের চোখ বুজে ফেলল।

আর সঙ্গে সঙ্গে সুহাস চার্লিকে ঝাঁকিয়ে বলতে থাকল, 'চোখ বুজে ফেললে কেন। আরে আমি। বিশ্বাস হচ্ছে না! দ্যাখ, এই, এই।' চার্লি সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে ধরল। উঠে বসল। ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল।

সুহাস স্বাভাবিক হয়ে গেছে। মেয়েরা কান্নাকাটি করলে কি ভাবে সান্ত্বনা দিতে হয় সে জানে না।

সে বসে থাকল বোকার মতো। কেবিনের এ কি লণ্ড-ভণ্ড অবস্থা! আলমারি খোলা। ভিতর থেকে যা পেয়েছে হাতের কাছে, সব ছুঁড়ে ফেলেছে। খাটের বিছানা চাদর বালিশ সব। তারপর দরজা লক করে দিয়ে গেলে, সে কাঁদতে কাঁদতে কখন হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে নিজেই জানে না। সে কিছুতেই হাঁটু থেকে মুখ তুলছে না। আজ সে প্রসাধনও করেছিল বোঝা যায়। সব ছুঁড়ে ফেলে দিলেও, সে তার দামি গাউন, স্কার্ট, ফারের কোটে হাত দেয়নি।

সুহাস ভাঙা-ফ্রেম ছবি এবং যততত্র ছড়ানো জিনিসপত্র গুছিয়ে তুলতে থাকল। দরজার বাইরে এসেও জামা প্যান্ট কোট সব তুলে নিল। আলমারির ভিতর ভাঁজ করে রেখে দিল। আসলে সে চায় চার্লি স্বাভাবিক হয়ে উঠুক। চার্লি যে খুবই বিশ্রী কাণ্ড করে বসে আছে টের পাক।

ঘরের ভিতরও এখানে সেখানে কাচের টুকরো পড়ে আছে। চার্লির খালি পা, হাত পা কাটতে পারে। সে না বলে পারল না, 'ওঠো। দ্যাখ, আরে করছ কি, হাত পা যে কাটবে! খাটে বোসো। আগে সব জড়ো করে বাইরে নিয়ে যাই—নিচে কিন্তু এখন নামবে না।'

চার্লি খাটে উঠে গেল। দেয়ালে হেলান দিয়ে পা ভাঁজ করে বসে থাকল। যেন ঘরের আসল মানুষটি ঘরে ফিরে এসেছে। আর তার ক্ষোভ নেই। সে যা বলবে তাই করবে।

'যাও হাত মুখ ধোও। কি ছিরি হয়েছে মুখের দেখেছ?'

চার্লি উঠে বাথরুমে ঢুকে গেল। চোখে মুখে জল দিয়ে মুখ মুছল। তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখও দেখল।

সুহাসের এক দণ্ড সময় নেই। সে তার ঘাড়ের ব্যথাও যেন আর টের পাচ্ছে না। দরজা খুলে বের হবার সময়ই চার্লি ছুটে এল। বলল, 'কোথায় যাচ্ছ সুহাস!' এই প্রথম কথা বলল চার্লি। যেন তাকে একা ফেলে রেখে গেলে সে ভয় পাবে। অবোধ বালিকার মতো আবদার, 'না তুমি কোথাও যাবে না।'

'আরে যাচ্ছি না। কি করে রেখেছ কেবিনটা। সব তো ছুঁড়ে-ফুঁড়ে তেজ দেখালে। রাতে শোবে কিসে। আসছি।' বলে সে দরজা বন্ধ করে চিমনির আড়ালে চলে গেল। কাপ্তানবয় উনন্ডসোলে হেলান দিয়ে বসে আছে, হয়তো সেও ঘুমিয়ে পড়েছে। সুহাস তাড়াতাড়ি তাকে জাগিয়ে দিয়ে বলল, 'চাদর বালিশ ওয়াড় দিন। ম্যাট্রেস আজকের মতো চালিয়ে দিচ্ছি। কাল পালটে দেবেন।' বলেই এক দৌড়ে দরজা ফাঁক করে উঁকি দিল। চার্লিকে বলল, 'আমি এখানেই। ওদিকে পোর্টহোলে কিছু ছুঁড়ে ফেলনি তো! তোমার যে কি হয় বুঝি না! বাবকে এ-ভাবে কেউ গালাগালি করে। তিনি তোমার গুরুজন না!'

সুহাস চার্লির কেবিনে ফের ঢুকে গেলে কাপ্তানবয় বাইরে সব রেখে গেল। চাদর বালিশ ওয়াড়। সুহাস সব তুলে নিয়ে এল। দরজা খোলা রাখতে পারছে না, যদি সে টের পেয়ে যায়, চার্লি মেয়ে—তবে আর এক কেলেঙ্কারি। কাপ্তানের কি করে এত বিশ্বাস তার উপর সে কিছুই জানে না! না কি সে জানে, তার কাছে চার্লি ধরা দিয়েছে। বিশ্বস্ত থাকার মূল্যও কম না—এমনই মনে হল তার। কি যে জাঁতাকলে পড়া গেল। আগে চার্লি, তার বাবা ছিল জাঁতাকলে, এখন সেও জড়িয়ে গেল! এর কি পরিণাম তাও বুঝতে পারছে না। চার্লির আচ্ছন্ন ভাব থেকে আত্মরক্ষার জন্যই যে তাকে ভিড়িয়ে দেওয়া এটা বুঝতেও তার অসুবিধা হচ্ছে না। এখন ভালয় ভালয় চার্লিকে স্বাভাবিক করে তুলতে না পারলে ঘোর বিপদে পড়ে যেতে পারে।

সে চার্লির টেবিল পরিষ্কার করে সাদা চাদর বিছিয়ে দিল। চিনে মাটির জগে জল রাখল। প্লেটে খাবার ঢাকা। প্লেট সাজিয়ে বলল, 'খেয়ে নাও চার্লি। খাওয়া নিয়ে রাগ করতে হয়! জানো তো আমার বাবা বলতেন, বোকারা রাগ চেপে গেলে না খেয়ে থাকে। আমার বাবা জানো রোজ নদীতে স্নান করেন। নদীত স্নান করলে পুণ্য হয় জানো! দু'মাইল রোজ হেঁটে যান নদীতে স্নান করবেন বলে—তোমার ঠাকুরদা কত দূর দেশে চলে গেছেন, বুনো ফুল খুঁজতে। আমার বাবা কত নদীর মোহনায় গেছেন ডুব দিতে। আসলে জীবনে সবাই পুণ্য অর্জন করতে চায়।'

সে চার্লির দিকে তাকিয়ে বলল, 'এস খাবে। বোসো। তোমাকে খাইয়ে আমিও যদি কিছুটা পুণ্য অর্জন করতে পারি' বলে হাসল সুহাস। চার্লি খেতে বসে কেমন বিমূঢ় হয়ে গেল। আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

'আচ্ছা এ-ভাবে কান্নাকাটি করলে ভাল লাগে! কাল আমরা আরও দূরে চলে যাব। আমাদের দেখতে হবে না দ্বীপের আর কোথায় তোমার ঠাকুরদা বুনো ফুলের চাষ করে গেছেন! সব কি আমাদের দেখা হয়েছে, তুমিই বল। তুমি এত সুন্দব তোমার ঠাকুরদার পুণ্যফলে বোঝো না। তোমার কি মাথাগরম করা সাজে। এতে তোমার ঠাকুরদা খাটো হয়ে যাচ্ছেন না!'

'আমরা কিন্তু সারাদিন ঘুরে বেড়াব!' সেই এক অবোধ আবদার যেন বালিকার। চার্লি তাকিয়ে আছে।

'নিশ্চয়। আসুক না সেই লোকটা মজা দেখাব।'

চার্লি ফের শক্ত হয়ে গেল। মুখ তাব কঠিন হয়ে গেল।

এই রে এ-সময় বোধ হয় এসব কথা বলা ঠিক হল না। সে বলল, 'জান, ফিল বলে এখানে একটা লোক আছে, সে নাকি সেই 'প্রেসিডেন্ট কলিজ' জাহাজের কিপার অফ দি রেক হয়ে আছে। তার ওখানেও না হয় দরকারে ঘুরে আসা যাবে। আমাদের মুখার্জিদার সঙ্গে খুব ভাব। দ্বীপের আসল কর্তা নাকি তিনি। তাঁর খুব প্রভাব দ্বীপে। তাঁর ঘরে বিশাল সব কাচের জারে প্রবাল পাহাড়ের নানা রঙের ছবি। বিশাল হলঘরে ঢুকলে নাকি মনে হয় সমুদ্রের তলদেশে ঢুকে যাচ্ছে সবাই। এ কি খাচ্ছ না কেন? খাও। ইচ্ছে করলে আমবা কাল সমুদ্রের তলদেশেও ঘুরে বেড়াতে পাবব।'

'তুমি খেযেছ!'

'কখন!'

'ঘাড়ে খুব লাগেনি তো! কাছে এস।'

সুহাস কাছে গেলে বলল, 'ফুলে আছে দেখছি।'

'তা থাক। তুমি খাও।'

'আমার খেতে ইচ্ছে করছে না। এত খেতে পারব না। তুমি আমার পাশে বোসো।'

কে বলবে এই চার্লি কিছুক্ষণ আগে তার বাবাকে কটুকথা বলেছে। কি হয়েছিল! চার্লি তার বাবার উপর এত খেপে গেল কেন? কি কারণ? সে তো ফেরার সময় থেকেই ফুঁসছিল। চার্লিকে কত কিছু প্রশ্ন করার আছে। ওর কাকা জাহাজডুবিতে নিখোঁজ। কোন্ জাহাজ! কোন্ সমুদ্রে। চার্লি কখনও তার শৈশবে কোনও বুড়ো মানুষের মুখ দেখে ভিরমি খেয়েছিল কি না, আততায়ী যদি সে-সব খবর রাখে! সে ভিরমি খেলে, কি খুঁজত আততায়ী! তার শরীর। চার্লিকে তাব ঠাকুবদা সব দিযে গেছে, যদি তাই হয় তবে কাপ্তান তাকে জাহাজে নিয়ে উঠেছেন কেন। অপহরণের ভয়ে! চার্লির আর দিদিরা কোথায় থাকে? তাব ভাইদের খবরও মুখার্জিদা নিতে বলেছেন। অ্যালেন পাওয়াব সম্পর্কেও। কিন্তু সুহাসের যে কি হয়—এখন তাকে এ-সব প্রশ্ন করা যায়?

বরং চার্লি যে তার শৈশব ফেলে এসেছে তার টুকরো টুকরো ছবির কথা মনে করিয়ে দিলে সে খুশি হবে।

চার্লি কাঁটা চামচে মাংসের টুকরো মুখে দিচ্ছে। ম্যাস্ট পটেটোজ চামচে তুলে মুখে দিচ্ছে, কখনও কাঁটা চামচে মাংসের টুকরো মুখের কাছে এনে তাকিয়ে থাকছে। খাবে কি না যেন বুঝতে পারছে না। আসলে চার্লি এখনও অন্যমনস্ক। সে বোধ হয় কিছু বলতে চায়—অথচ বললে যদি সুহাসের বিপদ হয়, কিংবা এমন কোনও প্রিয়জনের বিপদ হতে পারে সে যা চায় না। অন্ধকূপ থেকে পড়ে সে যেন বের হয়ে আসার রাস্তা খুঁজে বেড়াচ্ছে।

চার্লিকে মুখোসটার কথা বলা যেত। সে বলতে পারত, ববের কাজ। মগড়াও উঁকি দিয়েছে। দড়িরও খোঁজ পাওয়া গেছে। কে আততায়ী মনে হয় শিগগিরই ধরা পড়বে। আসলে ডেরিক ফেলে আমাকে সরিয়ে দেবারই চক্রান্ত ছিল। টব রেখে, ডেরিক ফেলে শেষে আচমকা আক্রমণ করে—তবে আমি আর আগের মতো ভীতু নই। মুখার্জিদা যা বলছেন, ঠিক মিলে যাচ্ছে। জাহাজে সবার আগে মগড়া টের পায় তুমি মেয়ে। তারপর মুখার্জিদা, আর কে অবশ্য জানি না। সেকেন্ড হতে পারে—তবে মুখার্জিদা এখনও সেকেন্ডকে জড়াতে পারছেন না বোধ হয়। বিকৃত রুচি থেকেও হতে পাবে। কিন্তু গিরগিটি গোঁফের লোকটা যে আবার কোথা থেকে উদয় হল।

তার কি মোটিফ—সে কি জাহাজেরই কেউ! তুমি সব খুলে না বললে জানাও যাবে না। মুখার্জিদা বাব বার বলছেন. চার্লিকে নিয়ে বসা দরকার। আরও যে বিপদ সামনে তাও টের পেয়েছেন। ফিলের কাছেও গেছেন।

'তুমি কি ভাবছ বল তো! কি ভাবছিলে?'

'আরে না কিছু না। তুমি খাও।' বলে সুহাস নিজের অন্যমনস্কতা আড়াল দেবার জন্য বলল, আমাদের তো স্টিফ গোল্ডারউড দেখাই হল না। তুমি বলেছিলে না, ফুলগুলি দলা-পাকানো তুলোর মতো দেখতে। লাল নীল সবুজ হলুদ ফুলে গাছ ছেয়ে থাকে। নানা বর্ণের কাচপোকা ওড়াউড়ি করে বলছিলে। প্রজাপতির ঝাঁক উড়ে বেড়ায় তার উপর! বিচিত্র বর্ণের সব প্রজাপতিতে গাছটা এত ঢাকা থাকে আসল ফুল খুঁজে বের করাই কঠিন বলেছিলে। ও! দারুণ মজা হবে খুঁজে বের করতে পারলে। বুনো ফুলের এই সৌরভে পাখিরা পর্যন্ত অস্থির হয়ে ওঠে বলছিলে। যদি খুঁজে পাই না, বীজ তুলে নেব। আবার যে দ্বীপে যাব, তুমি আমি সেই বীজ মাটিতে ছড়িয়ে দেব। কি মজা হবে না। জানো, বুনো ফুলের গন্ধ থাকে আমি জানতামই না। মুখার্জিদাই বললেন, থাকে। তুই টের পাস না। মুখার্জিদা এত সব টের পায় কি করে বুঝছি না।'

যেন অবাধ্য শিশুটিকে ভুলিয়ে ভুলিযে খাওয়ানো হচ্ছে। অন্তত সুহাসের আচরণে তাই প্রকাশ পাচ্ছিল। সেও যে কেন এত আগ্রহ বোধ করছে, পেট না ভরলে যেন সেই আধপেটা খেয়ে থাকছে।

চার্লি মাথা নিচু কবে আবার ডাকল, 'সুহাস!'

'বল।'

'আমরা কোথাও যদি চলে যাই।'

'কোথায়?'

'কোথাও। আমি তো তোমার সঙ্গে থাকছি। ভয় পাবে?'

'ধুস তুমি থাকলে ভয় পাব কেন।'

'আমরা অনেক দূরে চলে যাব। কেউ জানবে না সুহাস। তুমি যাবে তো।' চার্লি তার দিকে তাকাচ্ছে না। প্লেটেব খাবার ঘাঁটছে চামচে।

'নিশ্চয়ই যাব। তুমি বললে না গিয়ে পারি! আমার আর কে আছে?'

'আমারও তো আর কেউ নেই।'

'কেন তোমার বাবা!'

চার্লি মাথা নিচু করে বসে থাকল।

'আরে কি হল! খাও। বললাম তো যাব।'

তারপর চার্লি নিজেব মনেই যেন বকছে, 'গড সেভ মি। দ্য ফ্লাডস হ্যাভ রাইজেন। ডিপার অ্যান্ড ডিপার আই সিঙ্ক। আই অ্যাম একজস্টেড।'

সুহাস শুনতে পাচ্ছিল না। কেমন বিড়বিড় করে করে বকছে চার্লি। সুহাস মাথায় হাত রেখে বলল, 'অকারণ কেন কষ্ট পাচ্ছ বলো তো! আমরা তো আছি। তুমি সব খুলে না বললে বুঝব কি করে। তুমি একা নও। তুমি বিশ্বাস কর, তুমি একা নও। আমরা আছি না! খাও। ভেব না।'

চার্লি সুহাসের দিকে তাকিয়ে কি ভাবল—তারপর চামচ দিয়ে খাবারগুলো নাড়াচাড়া করতে থাকল।

তুমি একা নও, বলছি তো। বিশ্বাস করতে না চাও, দেখবে, সবাইকে ডাকলে এক্ষুনি চলে আসবে। আমি জানি তোমার উপব প্রচণ্ড নিগ্রহ চলছে। কেন এই নিগ্রহ, আমরা তো কিছুই জানি না চার্লি। না জানলে—কি করে বুঝব, তোমার জন্য আমাদের কি করা দরকার। দেখছ না তোমার বাবা পর্যন্ত বলছেন, মাই ফেইথফুল সেলর...'

'সুহাস',...চার্লি তার দিকে তাকাল। যেন বুঝতে চাইছে, সুহাস সত্যি তাকে স্তোকবাক্য বলে সান্ত্বনা দিচ্ছে কি না, না পরম আন্তরিকতা থেকে তাকে সাহস দিয়ে যাচ্ছে।

কি বুঝল কে জানে—সুহাসের চোখে যে আর্তি ফুটে উঠেছে, এতে সে বোধ হয় কিছুটা সহজ হতে পারছে। বলল, 'আই অ্যাম ওনলি উইপিং অ্যান্ড ওয়েটিং ফর মাই গড টু অ্যাক্ট।'

'তোমার ঈশ্বর আশা করি তোমাকে রক্ষা করবেন। তিনি নিশ্চয়ই তোমার পাশে সব সময় থাকবেন। তুমি খাও। তুমি না খেলে যে আমি শাস্তি পাচ্ছি না।, এটা তুমি বুঝতে পার না! তুমি না খেয়ে থাকলে আর জলগ্রহণ করব না বলছি। খাও।' সুহাস ধমক দিল।

এমন কথায় চার্লি যেন আরও ভেঙে পড়ল। হাউ হাউ করে কাঁদছে—বলছে, 'সুহাস আই ক্যান নট ইভিন কাউন্ট অল দোজ হু হেট মি উইদাউট কজ। দোজ হু প্লট টু পানিস মি, দো আই অ্যাম ইনোসেন্ট। দে ডিমান্ড দ্যাট আই বি পানিশড্ ফর হোযাট আই ডিড নট ডু।'

'তুমি কোনও দোষ করনি, তবু তোমাকে শাস্তি পেতে হবে। কেন! তুমি অকপট হও চার্লি। কে সে গিরগিটি গোঁফের লোকটি, কে সে? সে কেন মিশনে হিপনোটাইজ করছিল একজন নাবিককে? নাবিকটিকে তুমি চেন? তাকে তো আমরাও জাহাজে দেখিনি। এক গাল দাড়ি লোকটার! দূর থেকে বোঝারও উপায় ছিল না। সে কি ম্যাক! ফলস দাড়ি গোঁফ পরে লোকটার বান্দা হয়ে গিয়েছিল! আমাদের উচিত ছিল ডায়াসের কাছে যাওয়া। এত ভড়কে গেলে, কিছুতেই কাছে যেতে দিলে না। হাত ধরে টানতে টানতে মিশন থেকে বের করে আনলে।

চার্লি কিছু বলছে না। কাঁদছে আর খাচ্ছে। সে না খেলে সুহাস জলগ্রহণ করবে না ভয়েই যেন গিলছে। প্রচণ্ড বিষম খেল খেতে গিয়ে। কাঁদতে কাঁদতে খেলে বিষম তো লাগবেই। সে কাশছিল। মুখের খাবার ছড়িয়ে পড়ছে। সুহাস তাড়াতাড়ি মুখের কাছে জলের গ্লাস নিয়ে গেল। বলল, 'শিগগির জল খাও। নাও হয়েছে—আর খেতে হবে না।' বলে সে এঁটো বাসন টেবিল থেকে তুলে নিয়ে বাইরে বের করে রাখল। চাদরও বাইরে বের করে দিল। দরজা সামান্য ফাঁক করে পিঠে ঠেস দিয়ে প্লেট ডিস সব রেখে দিল। সুহাস জানে, কাপ্তানবয় সব নিয়ে যাবে।

সুহাস বলল, 'ওঠো।'

রুমালে মুখ মুছে চার্লি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। পারছে না। খুবই ভেঙে পড়েছে। সুহাস তাকে ধরে নিয়ে গেল বিছানার কাছে। সে শুয়ে পড়লে, পা দুটো তুলে গায়ে চাদর দিয়ে ঢেকে দিল। পাশ ফিরে শুয়ে আছে চার্লি। তাকে একা ফেলে রেখে যেতেও মন চাইছে না। শিয়রে বসে, আশ্বাস দেবার চেষ্টা করল, 'তুমি যে বলতে হি প্রটেক্টস। তোমার সব বিশ্বাস তছনছ হয়ে গেল কি করে! তোমাকে শাস্তি দিলে রক্ষা পাবে সে! তুমি তো বলতে, হি উইল সেভ ইয়ো ফ্রম ইয়োর এনিমিজ।'

চার্লি সুহাসের দু হাত জড়ো করে নিল বুকেব কাছে। বলল, 'আই নো, হি প্রটেক্টস। আই নো পাওয়ার বিলঙস টু গড। আই ট্রাস্ট ইন দ্য মার্সি অফ গড ফরেভার অ্যান্ড এভাব।'

'তবে তুমি অযথা ভয় পাচ্ছ কেন বুঝি না। তোমার বিশ্বাসের দাম থাকবে না! তোমার কেউ কখনও ক্ষতি করতে পারে বল!'

চার্লি স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। স্বাভাবিক হয়ে গেলেই চার্লির মধ্যে বোধহয় সাহস ফিবে আসে। সে সহজ হয়ে যায়। সরল অকপট কথাবার্তা। তখন সে শরীরে তার শক্তিও ফিবে পায়।

সুহাস ইজেলটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আবার দেখছি সেই মুখের ছবি আঁকছ—কি ব্যাপাব বল তো! পর পর মুখের ছবি।' চার্লি এক টানে আরও কটা নিখুঁত মুখ এঁকে ফেলল। মুখগুলি পিনে গেঁথে দেয়ালে ঝুলিয়ে দিল।

'তুমি চেনো একে?' চার্লি একটু সরে ইজেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।—এ কে, এ কে? এই লোকটা কে!

পিছু পিছু সুহাসও। চার্লি যেন প্রদর্শনী করছে।

সুহাস সব ছবির মুখই চিনতে পারছে। সব অফিসার ইনজিনিয়ারদের মুখ। শুধু একটা মুখ ঠিক চিনতে পারছে না। মুখটা কার বুঝতে পারছে না। নিউপ্লিমাউথে এই মুখের ছবিটাই বোধহয় আঁকতে চেয়েছে। বার বার কেন একই মুখ, একই ছবি। চার্লি কেন এ-ভাবে একটি মুখে এত রহস্য খুঁজে বেড়াচ্ছে!

সে বলল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

চার্লি তার রঙের বাক্স বের করে পাশের টেবিলে সাজিয়ে রাখছে।

'তুমি চিনতে পারছ না?'

কথা বলছে চার্লি আর কাজ করছে। কাপে জল নিল। তুলি ভেজালো। চার্লি কি করতে চায়, কেন এত রাতে ওই পাগলামি, সে কিছুটা বিব্রত। অস্বস্তিও। কোনও রকমে চার্লিকে স্বাভাবিক করে তোলাই তার কাজ। সে অনায়াসে বলতে পারে, রাত হয়েছে, এবারে শুয়ে পড়ো। আমারও তো জানো শরীরটা ভাল নেই। কিন্তু বলতে পারছে না। আবার যদি গুম মেরে যায়। সব তছনছ করে ফেলে। ঝামেলার তবে শেষ থাকবে না।

আর সুহাস কি দেখছে?

চার্লি কালো কালিতে মুখে লম্বা গিরগিটির গোঁফ এঁকে দিতেই চমকে গেল সে। আরে এই লোকটাই তো বেলাভূমিতে তাকে আক্রমণ করেছিল—এই লোকটাই। দূর থেকে দেখলে মুখোস, সামনে থেকে, দুরাত্মা। চার্লি কি তাকে সনাক্ত করতে চায়? সে কে, বারবার মুখ এবং গোঁফ এঁকে সনাক্ত করতে চায়!

দূর থেকে দেখলে এক বকমের, কাছ থেকে দেখলে আর এক রকমের। সুহাস বলল, 'কে তিনি!'

চার্লি গম্ভীর হয়ে গেল। মুখ শক্ত হয়ে গেল। বলল, 'প্রোসরপিনা।'

'প্রোসরপিনা! সে আবার কি বস্তু। কে সে? প্রোসরপিনা কি কারও নাম! না কোনও ভৌতিক বহস্য চার্লিকে তাড়া করছে।

সুহাস আর কোনও প্রশ্ন করতে পারছে না। লোকটা কি তবে জাহাজেই আছে। এ তো সেকেন্ডের মুখও নয়। কাপ্তানেব মুখও নয়। এ আবার কে জাহাজে হাজির। মুশকিল, সাহেব-সুবোদের মুখ সব সময়ই তাকে গোলমালে ফেলে দেয়। জাহাজে উঠে সে যে কতবার কতজনের মুখ গুলিয়ে ফেলেছে। প্রায় দু-তিন মাস লেগে গেল মুখগুলি চিনতে। প্রথমে সে কেন যে তফাত বিশেষ কিছু খুঁজে পেত না। পরে সবাইকে চিনতে পারত। তবে ভিড়ের মধ্যে চিফ ইনজিনিয়ারকে দেখলে, সে এখনও সনাক্ত করতে পারবে না। তিনি কেবিন থেকে বেরই হন না। তাঁকে সে একদিনই দেখেছিল। জাহাজের চিফ, তিনি শুধু কেবিনে বসে থাকেন, মদ্য পান করেন, তাস খেলেন, তাস তোলেন—আর বন্দর এলে বাতে নেমে যান। কি যে দরকার জাহাজে লোকটার এমনও মনে হত!

পরে অবশ্য সে বুঝেছিল, না লোকটির সত্যি দরকার আছে। জাহাজ সমুদ্রে। ইনজিনরুমে সেকেন্ড ইনজিনিয়ারের ওয়াচ। সহসা সে দেখেছিল দ্রুত তিনি নেমে আসছেন—সেকেন্ড সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেছে। না কোনও কথা না, টর্চ মেরে কি দেখিয়ে ফের দ্রুত উপরে উঠে গেলেন। সেকেন্ড ইনজিনরুমে পাহাবায় থেকেও যা টের পাননি, তিনি তাঁর কেবিনে বসে তা ধরতে পাবেন। ইনজিনের শব্দ এতই ভাল জানা, তালগোল পাকালে, শব্দ থেকে ত্রুটি ধরে ফেলার এই ঐশ্বরিক ক্ষমতার জন্যই বোধহয় তিনি চিফ। সুহাস দেখেছিল, ব্যালেস্ট পাম্পের নাটবল্টু আলগা।

তবে কি চিফ! তিনি তবে প্রোসরপিনা!

সুহাস না বলে পাবল না, 'কে প্রোসরপিনা?'

'জানি না সুহাস। আই হিয়ার এ ভয়েস ফ্রম দ্য ক্লাউড।'

'কি বলছ?'

'ইয়েস আই হিযার।'

চার্লি কি মাঝে মাঝে ভূতগ্রস্ত হয়ে পড়ে! তার কথার জবাব দিচ্ছে না। চার্লি তাকে নিয়ে গেল বাথরুমে। পোর্টহোল খুলে অদূরের অন্ধকারে একটি উইন্ডসহোল দেখিয়ে বলল, মধ্যরাতে সে আসে। আমাকে শাসায়। বলে, দ্য প্ল্যান্ট নট প্ল্যান্টেড বাই আওয়ার ফাদার শ্যাল বি কটেড আপ, সো ইগনোর হিম।'

সে কে? কাকে ইগনোর করতে বলছে!

চার্লি সত্যি যেন ভূতগ্রস্ত!

তার কথার জবাব দিচ্ছে না। বলছে 'দ্যাখো উইন্ডসহোলের একটা পাইপ বাথরুমে ঢুকেছে। উইন্ডসহোলের মুখটিকে সে চোঙ-এর মতো ব্যবহার করে। সে জানে, সেখানে কথা বললে, আমি তার কথা শুনতে পাব। সে আমাকে শাসায়, 'হি ইজ ব্লাইন্ড গাইড লিডিং দ্য ব্লাইন্ড অ্যান্ড বোথ উইল ফল ইনটু এ ডিচ্।' সুহাস জানে অদূরের উইন্ডসহোলের মূল পাইপটি ক্রমে বাঙ্কারে ঢুকে গেছে। তারই কোনও শাখা-প্রশাখা চার্লির বাথরুমে! মুক্ত বায়ু প্রবেশের এই ব্যবস্থাটি তাকে কিছুটা হতবাক করে দিল।

'আর কি বলে?'

'গেট অ্যাওয়ে ফ্রম হিম, হি ইজ এ স্যাটার্ন।'

'সে কে! কেন বলছ না সে কে? না আমি সত্যি পাগল হয়ে যাব। তুমি তাকে চেন না! তিনি কি চিফ?'

'না।'

'তবে কে? তিনি কি সেকেন্ড?'

'না না।' চার্লি চিৎকার করে উঠতে গেলে সুহাস বুঝল, আবার সে ভুল করছে। সে বলল, 'ঠিক আছে। এস।' চার্লির হাত ধরে বাথরুম থেকে টেনে বের কবে আনল।

চার্লি তখনও বলে যাচ্ছে, 'সে শাসায়—আই হিয়ার এ ভয়েস ফ্রম দ্য ক্লাউড।'

না আর কোনও প্রশ্ন করা ঠিক হবে না। মেঘের ওপার থেকে যে কণ্ঠস্বর শুনতে পায় তাকে আর কি বলা যায়। তবু কেন যে না বলে পারল না, 'তিনি কি তোমার বাবা?'

সহসা চার্লি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল—তুমি কি সুহাস! আমি কি বাবার মুখে গোঁফ এঁকেছি।'

সুহাস বলল, 'না।'

'তুমি তো সব মুখগুলিই চেন, চেন কিনা বল। পর পর চিনতে পারছ না!' চার্লিব চোখে মুখে হতাশা। তারপর মুখগুলির আরও কাছে গিয়ে বলল, 'চিফেব মুখ কোন্‌টা, কে চিফ!'

'কেন এই যে। গোলগাল ফুটবল।'

চার্লি বলল, 'আমি কি চিফের মুখে ফলস্‌ গোঁফ এঁকেছি না জুলপি।

'না, তা অবশ্য আঁকোনি। সত্যি ভুল হয়েছে। গোঁফ তো ওটার এঁকেছ!'

চার্লি বলল, 'তা হলে দেখে নাও ফের।' যেন পরীক্ষা নিচ্ছে সুহাসের। দেখে নাও বলে গোঁফ জোড়া সাদা রং দিয়ে মুছে দিল। তারপর সুহাসেব দিকে তাকিয়ে বলল, 'চিনতে পারছ।'

'চেনা চেনা লাগছে। দেখেছি কোথাও। তবে কে ঠিক মনে করতে পারছি না। আচ্ছা তোমার বাবা তাকে আমাদের পেছনে লেলিয়ে দেননি তো?'

'জানি না। মনে হয়, না। কারম তাঁর জানা দরকার তোমার ক্ষতি হলে তার আরও বড় ক্ষতি হবে। মনে হয় তিনি তা ভালই জানেন।' বলে চার্লি বিছানায় পড়ে সহসা খামচে ধবল বালিশটা। মুখে প্রচণ্ড তিক্ততা। আবাব সেই চিৎকার, 'আই উইল রিওয়ার্ড ইয়োর ইভিল, উইথ ইভিল, নাথিং ক্যান স্টপ মি।'

'চার্লি ফেব পাগলামি শুরু করলে! চলে যাচ্ছি। শোনো এভাবে চলে না। সব খুলে বল তোমাব বাবাকে, এই কি নিজে ফুঁসছ, অথচ কাউকে কিছু বলছ না। নাকি তোমাকে ভূতে পায় মাঝে মাঝে। কিচ্ছু বুঝছি না।'

'হ্যাঁ পায়! বের হয়ে যাও! আমাকে ভূতে পায়! আমি ভূত!'

'আরে আমি কি তাই বলেছি নাকি। কিন্তু তুমি যে বলছ, মেঘের ওপার থেকে কণ্ঠস্বর শুনতে পাও।'

উইন্ডসহোলে মুখ রেখে কথা বললে তাই শোনা যায়। একটা পাইপ আমার বাথরুমে, অন্য

পাইপটা গেছে ক্রস বাঙ্কারে। বাথরুমে এস। দাঁড়াও। আমি যাচ্ছি!'

'কোথায়?'

'বাইরে যাচ্ছি। উইন্ডসাহালে মুখ ঢুকিয়ে কথা বললে মেঘের ওপার থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে কি না বুঝতে পারবে।'

'ঠিক আছে। আমি শুনতে চাই না। আমরা কি করতে পারি বল।'

'কিছুই না।'

'তুমি কি জান, মুখোসটা পাওয়া গেছে। বুড়ো মানুষের মুখোস নয়। যিশুর মুখ। আবছা অন্ধকারে বুড়ো মানুষের মনে হয়।'

চার্লি বালিশে মুখ ডুবিয়ে দিয়েছে। শক্ত করে সুহাসের হাত ধরে রেখে বলছে, 'জানি।'

'জান?' বলছ কি!'

'সুহাস, তখন যে আমি সেই বুড়োমানুষটাকেই দেখতে পাই। মুখোস পরে অনুসরণ যেই করুক, তাকে ভয় পাই না।'

'বলছ কি, অনুসরণকারীকে ভয় পাও না?'

'না।'

'সেই বুড়োমানুষটি কে? কে তিনি!'

'তিনি আম'র ঠাকুবদা জোহানস মিলার।'

সুহাস হতভম্ব। চার্লিকে তবে কোনো অনুসরণকারী তাড়া করছে না। তাড়া করছে তার ঠাকুরদা। ভারি তাজ্জব ব্যাপার' ঠাকুবদা তো চার্লিকে তার উত্তরাধিকার করে গেছেন। সেই ঠাকুরদাই আবার তাড়া করছে। চার্লির কি মাথার কোনও গোলমাল আছে। ঠাকুরদার অপ্রশংসা করলেও চার্লি অখুশি। অথচ সেই ঠাকুবদার তাড়া তাকে এই নিগ্রহে ফেলে দিয়েছে। তবে তার বাবাকে গালমন্দ করল কেন? নিগ্রহের হেতু যদি কেউ হয় তবে তো সেই বুড়োমানুষটা!

অথচ জঙ্গল পার হয়ে যখন তাকে নিয়ে ছুটছিল, তখন তো চার্লি ভয়ঙ্কর হিংস্র হয়ে উঠছিল। চোখ জ্বলছিল তার। ঘোড়ার পিঠে সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়ার দৃশ্যটাও তাকে কাবু করে ফেলছে। তার সেই 'ভয়ঙ্কর চিৎকার এখনও যেন সে শুনতে পাচ্ছে—আই উইল রিওয়ার্ড ইভিল, উইদ দ্য ইভিল, নাথিং ক্যান স্টপ মি। এসব কথারই বা অর্থ কি। যদি তার উপর কোনও প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপার না থাকে তবে এ-ভাবে আচমকা কলার টেনে আততায়ী ঘুষিই বা মারল কেন! আবার চার্লিই বলছে, তোমার গায়ে কেউ হাত দিতে সাহস পাবে না। চোখের সামনে এত বড় সংঘাত হবার পরও চার্লির কি করে বিশ্বাস, সে নিরাপদ!

কিন্তু এ-মুহূর্তে কিছুই বলা আর সম্ভব নয়। চার্লির চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে। সে দরজা খোলা রেখে যেতে পারে না। চার্লিকে এ-অবস্থায় বোঝাতেও পারে না, ফক্কার পাশে টব রেখেছিল, শিকার ধরার জন্য, ডেরিক খুলে দিয়েছিল, তাকে খুন করার জন্য। আচমকা ঘুষি মেরে তাকে শেষ করে দেবার চেষ্টাও তো করেছে: তবু কেন চার্লি বলছে, সে নিরাপদ। তার গায়ে কেউ হাত দিতে সাহস পাবে না। কাপ্তানের সাহস না থাকলে কার এত সাহস তার গায়ে হাত দেয়!

চার্লি কি তাকে সাহসী করে তুলতে চায়। খুনের আতঙ্কে সে কাবু হয়ে পড়লে চার্লি কি খুব দুর্বল বোধ করবে!

চার্লি তো সুহাসেব বিপদ টের পেয়েই শাসিয়েছিল, আই উইল রিওয়ার্ড ইভিল উইদ ইভিল, নাথিং ক্যান স্টপ মি। সেই তো জাহাজে ফিরে তার বাপের কেবিনে তেড়ে গিয়েছিল। যা মুখে আসে বলেছে।

চার্লিই তো বলেছিল, তোমাকে জড়াতে চাই না সুহাস। তুমি যাও।

জড়াতে চাই না কেন বলেছিল! চার্লি তবে সব জানে। চার্লি চারপাশ থেকে কেমন অন্ধকার দেখতে পাচ্ছে বোধহয়। চার্লি নিজের উপর আস্থাও হারিয়ে ফেলতে পারে। তাকে নিয়ে চার্লি পালাতে চায়। দুর্বল মুহূর্তে চার্লি নিজেকে সামলাতে পারেনি। তার অর্থ তো একটাই দাঁড়ায়, চার্লি জানে তার

রক্ষার আর কোনও উপায় নেই। কোনও দ্বীপে নিখোঁজ হয়ে গেলে কেউ আর তাদের খোঁজ পাবে না। তার ক্ষতিও করতে পারবে না।

চার্লি তার দু-হাত নির্ভয়ে বুকে জুড়িয়ে রেখেছে। চোখ বুজে আছে। সে কেন যে তার হাত সরিয়ে নিতে পারছে না। সে ইচ্ছা করলেই নিখোঁজ হয়ে যেতে পারে না। আবার চার্লির মুখের দিকে তাকালে মনে হয় এই নিরুপায় মেয়েটির জন্য সে সব করতে পারে। তার কাছে চার্লি ছাড়া সব অর্থহীন। সারা শরীরে চার্লির আশ্চর্য সুষমা। হাতে পায়ে মুখে এবং নাভিমূলে। স্তনের আশ্চর্য আকর্ষণে মুখ ডুবিয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে। একজন ধনকুবেরের বংশধর কত সহজে সব ফেলে তার সঙ্গে চলে যেতে চায়। নিখোঁজ হয়ে যেতে চায়। পাতার কোনও কুটির নির্মাণের কথা বলে, শস্য বোনার কথা বলে, সমুদ্রে ডুবে মাছ ধরার কথা বলে, আবার আগুন জ্বেলে আকাশের নিচে বসে থাকার কথা বলে। সে মাথা পাতলেই তারা যেন বের হয়ে যেতে পারে। সে মাথা পাতলেই চার্লি কোনও দ্বীপে ফুল হয়ে ফুটে থাকতে পারে।

সে কেমন বোকার মতো চার্লিব পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। চার্লির বুকে মুখ লুকিয়ে বলল, আমি যাব। তুমি যেখানে নিয়ে যাবে—চলে যাব। আমবা দুজনেই তোমার ঠাকুরদার ইচ্ছেকে সম্মান জানাব। আমরা দুজনেই বুনো ফুল হয়ে ফুটে থাকব। কথা দিচ্ছি চার্লি। যখন বলবে, যখন বুঝবে—আমি তোমার সঙ্গে আছি। বলে এই প্রথম চার্লিকে বুকে জড়িয়ে কেঁদে ফেলল।

আসলে এ-সময় তার বাবা-মা-র মুখ মনে পড়ছে। বাবা তো সে ফিববে বলে কত রাত ঘুমায় না। মা তার গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকে চিঠির আশায়। কবে সে ফিরবে!

সুহাস নিজেকে সামলে নিল। তার ঘন চুলে চার্লি দু-হাত শক্ত কবে চেপে বেখেছে। সারা শরীব চার্লির থরথর কবে কাঁপছে। এতটা ভেঙে পড়া বোধহয় উচিত হয়নি। নিজেকে সামলে সে উঠে দাঁড়াল।

চার্লি যে এখনও স্বাভাবিক নয় তার বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না। কে অনুসরণকারী চার্লি যেন জানতে চায় না। এই অনুসরণকারীকেই তো সারা জাহাজে সে আর চার্লি খুঁজে বেড়িয়েছে। মুখোস সম্পর্কেও তার কেন জানি কোনও আগ্রহ নেই। মুখোসটা পাওয়া গেছে বলা ঠিক হল কি না তাও বুঝতে পারছে না। মুখার্জিদা তো বার বার বলেছেন, কিছুই যেন প্রকাশ না হয়ে পড়ে। যা ঘটছে দেখে যাও। বুড়োমানুষের মুখ তাড়া করতে পাবে মুখার্জিদা যেন এমনও বলেছিলেন। মানুষটাকে কেন যে খুবই প্রাজ্ঞ মনে হল তাব। মুখার্জিদার কথাই ঠিক— বুড়োমানুষের মুখই তাকে তাড়া কবছে। অনুসরণকাবী আর কেউ নয়। অনুসরণকারী তার সেই মৃত ঠাকুরদা। খুবই ভৌতিক ব্যাপার। যে মরে যায় সে কেন অনুসরণ করবে! মানসিক বিভ্রম থেকেই কি চার্লির এই নিগ্রহ! মুখোস এবং অনুসরণকারীকে ঠাকুরদাব মুখের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছে। চার্লির ভুল ভেঙে দেওয়া দরকার। তা হলে সে তার ঘোরে পড়ে যাবে না। ঘোরে পড়ে গেলেই ঠাকুরদা, ঘোড়ে না পড়ে গেলেই অনুসরণকাবী। তখন সে তাকে নিজেও খুঁজতে বের হয়। মুখার্জিদাকে সব খুলে বলা দরকার। তিনি চার্লির আচরণ থেকে যদি কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেন।

সে বলল, 'চার্লি আমি যাচ্ছি। দরজাটা বন্ধ করে দাও।'

'তুমি যাবে!'

যেন সুহাস চলে গেলে জলে পড়ে যাবে চার্লি।

'কত রাত হয়েছে! বুঝছ না ওরা ডেকের অন্ধকারে অপেক্ষা করছে। তুমি কিন্তু তোমার বাবার কথা শুনবে। তিনি তোমাকে নিয়ে খুবই অস্বস্তিতে আছেন। হুট করে মেয়ে সেজে কেবিন থেকে বের হয়ে যাবে না। যা ছিলে তাই আছ, থাকবে। দেখি না শেষ পর্যন্ত রহস্য কতটা গড়ায়।'

'আমি তো মেয়ে।' চার্লি উঠে বসল।

'জানি।'

'তবে কেন আমি গাউন পরে বের হতে পারব না বল?'

'কেন, তুমি যে বলতে, নো মি বয়। হঠাৎ মেয়ে সাজার এত শখ কেন!'

আমি তো আর কাউকে ভয় পাই না।

'কি বলছ চার্লি, ভয় পাও না! কিসের ভয়ে, তবে বলতে নো মি বয়!'

চার্লি কিছুটা যেন সম্বিত ফিরে পাচ্ছে। বলল, 'ঠিক আছে মি বয়।'

চার্লিকে কি আবার ভয়ের জুজু তাড়া করছে!

সুহাস বলল, 'শোনো, মন দিয়ে শোনো। মালবাহী জাহাজে জানই তো মেয়ে থাকে না। কাপ্তানই একমাত্র তার স্ত্রী অথবা প্রিয়জনকে নিয়ে উঠতে পারেন। তুমি সেই সূত্রেই উঠে এসেছ। মনে রাখবে জাহাজের নাবিকরা সব ক্ষেপে আছে। তাদের মাথার ঠিক নেই। কতকাল তারা ঘরবাড়ি ছাড়া হয়ে থাকতে পারে! তারা যদি জন্তু হয়ে যায় রক্ষা আছে! সমুদ্রের একঘেয়েমি থেকে আত্মরক্ষার জন্য জাহাজিরা কত কিছু করে থাকে। আমাদের ইমতাজ মিঞা তো শাড়ি পরে, বুকে ফলস পরে কতদিন ফোকসালে ফোকসালে নেচে বেড়ায়। গুনাইবিবি সেজে গান গায়। নাচে। এতে কেউ রাগ করে না। বরং মজা উপভোগ করে। কেউ টব বাজায়, কেউ থালা বাজায়। পিছিলে গুনাইবিবির গানও হয়। আসর বসে যায়। গান হয় —ও চাচা আমারে যে করবেন বিয়া, মায়রে করবেন কি! সঙ্গে সঙ্গে সবাই উঠে পড়ে। কোমর বাঁকিয়ে আঁচল উড়িয়ে নাচে। বাড়িঘরের কথা ভুলে থাকে!'

সুহাস দরজা খোলার আগে বলল, 'মেয়ে সেজে বের হলে ভাববে না, তুমিও সং সেজে মজা করছ। এটা কি ভাল দেখাবে!'

'বের হব না বললাম তো।' চার্লির মুখে লজ্জার হাসি।

'ভয় পাবে না?'

'না।' বলেই হঠাৎ উঠে সুহাসকে চুমু খেল।

'হি প্রটেকটস্।' সুহাস বলল। 'দরজা বন্ধ করে দাও।'

চার্লিও যেন দৃঢ়তা খুঁজে পেয়েছে। সে-ও বলল, 'হি প্রটেকটস্।' দরজা লক করে দিল চার্লি।

দরজা খুলে বের হয়ে সুহাস ভূত দেখার মতো কাপ্তানকে দেখে ঘাবড়ে গেল। তিনি তবে সব শুনেছেন। তিনি তাঁর কেবিনে শুয়ে পড়েননি! কখন এলেন। ধরাচুড়ো-পরা পাথরের মতো স্থির। যেন চোখের পলক পড়ছে না। দবজা বন্ধ ছিল—সব কি তিনি শুনেছেন। এমন কি নিখোঁজ হয়ে যাবার পরিকল্পনা। তার বুক ধড়াস করে উঠল।

কাপ্তান বললেন, 'মাই বয়, হি ইজ ওককে?'

'ইয়েস স্যার। ও কে।'

'মেনি থ্যাংকস।' বলে তিনি তাঁর কেবিনের দিকে হেঁটে চলে গেলেন। আর তখনই সে দেখতে পেল উইন্ডসহোলের পাশ থেকে একটা ছায়া উইংসের তলায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। উইন্ডসহোলে কান পেতে রাখলে কি চার্লির কেবিনের কথা সব শোনা যায়।

ইস এত বোকা সে!

তার হাত কামড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে।

কিন্তু তখন তো মনে হয়েছিল তিনি অগাধ জলে ডুবে যাচ্ছেন। তার কথাবার্তায় কাতর অনুনয় বিনয়—অগাধ বিশ্বাস আছে বলেই তাকে চার্লির কেবিনে পাঠাচ্ছেন—যদি সে পারে চার্লিকে শান্ত করতে। শেষে এই গুপ্তচরবৃত্তি! অদৃশ্য ছায়া। না মাথায় আসছে না। কেমন সে অসার বোধ করছে। তার এক পা হেঁটে যাবার যেন ক্ষমতা নেই। চার্লির দরজায় কান পাতলে ভিতরের কথাবার্তা কি শোনা যায়। সে কি খুব জোরে কথা বলছিল! অন্তত ইনজিন চালু থাকলে সে দেখেছে, দরজায় কান পাতলে ভিতরের কোনও কথাবার্তাই কানে ভেসে আসে না। সমুদ্রের গর্জন, আর ইনজিনের শব্দ কানে তালা লাগিয়ে দেয়। বন্দরে কিছুই থাকে না। না সমুদ্রের খ্যাপা আর্তনাদ, না ইনজিনের কঠিন ধাতব শব্দ। একেবারে শান্ত নির্জন এবং সম্পূর্ণ নীরব বন্দর এলাকা। শুধু হাওয়ায় চিমনির আলোটা দুলছে।

তার গলা শুকিয়ে উঠছে।

সে দৌড়ে বোট-ডেক থেকে নেমে যেতেই দেখল—সুরঞ্জন, অধীর, মুখার্জিদা ছুটে এসেছেন।

সে হাঁপাচ্ছে।

সে প্রচণ্ডভাবে ঘামছিল।

'কি হল!' মুখার্জিদা ফিস ফিস করে বলছেন।

সুহাস বলল, 'জল খাব। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে।'

অধীর দৌড়ে চিফকুকের গ্যালি থেকে জল নিয়ে এলে, সুহাস ঢক ঢক করে সবটা জল খেয়ে বলল, 'চল।'

ডেকের উপর দিয়ে চারটে ছায়া আবছা অন্ধকারে হেঁটে যাচ্ছে।

মুখার্জিদা বললেন, 'কথা বলছিস না কেন?'

'কি বলব বল!'

'চার্লি তার বাবাকে তেড়ে গেল কেন? তোকে ডেকে পাঠাল কেন? অধীর তো বলল, তুই চার্লির কেবিনে ছিলি!'

'সবই ঠিক। ছিলাম।'

'চার্লি কিছু বলল?'

'অনেক কথা। এখানে বলা ঠিক হবে না। কে কোথায় আড়ালে লুকিয়ে লক্ষ্য করছে বোঝা মুশকিল! তোমাদেরও আমাকে দেখেই দৌড়ে আসা উচিত হয়নি।'

মুখার্জিদা বললেন, 'কি করব। সেই যে ঢুকে গেলি আর পাত্তাই নেই। চার্লির কেবিনে তোকে পাঠাল কেন?'

'চার্লিকে শান্ত করতে।'

'আর কিছু না?'

'আর কিছু না বলব কি করে। কি মতলব বুঝছি না।'

সে হেঁটে যাচ্ছে। মুখার্জি পাশে হাঁটছেন। সুরঞ্জন অধীর পেছনে। কিছুটা সুহাসকে পাহারা দেবার মতো করে তারা পেছনে রয়েছে যেন।

সুহাস খুবই দ্রুত হাঁটছিল। মুখার্জিদাও পা মিলিয়ে সঙ্গে দ্রুত হেঁটে আসছেন। ডেক একেবারে খালি। গ্যালির দরজা খোলা। মেসরুম, বাথরুমে কেউ নেই। এত রাতে থাকার কথাও না। কেবল ইনজিন সারেঙ তার কেবিনে জেগে আছেন। শত হলেও তিনি এদের সবার ওপরওয়ালা, জাহাজিদের বিপদে-আপদে তার দায় থেকেই যায়। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেয়েই তিনি দরজা খুলে সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন। কাপ্তান সোজাসুজি তাকে কিছু না জানিয়ে সুহাসকে ডেকে নেওয়ার অস্বস্তিও আছে ভেতরে। তাদের দেখেই তিনি বললেন, 'এত রাত করে ফেললি! কি ব্যাপার।'

মুখার্জি বললেন, 'ও কিছু না।' সারেঙকে এড়িয়ে যাবার জন্যই কথাটা বলা।

'ও কিছু না বলছেন কেন মুখার্জিবাবু! ছেলেটা সেই কখন গেল কাপ্তানের ঘরে, ফিরল এতক্ষণে! ঘুম আসে!'

সারেঙকে আশ্বস্ত করার জন্যই যেন বলা, 'চার্লি কি আরম্ভ করেছে দেখছেন তো! বাপকে যা তা গালাগাল করছে। সুহাসের সঙ্গে চার্লির দোস্তি আছে বলেই ডেকে পাঠিয়েছেন। তরলমতি, খুবই তরলমতি বালক। বাবাকে মানে না। কি কখন করে বসবে—সুহাস বুঝিয়ে যদি শান্ত করতে পারে! আর কিছু না!'

'শান্ত হল?'

মুখার্জিদা বললেন, সুহাসকে, 'কি রে মেজাজ পড়েছে!'

'পড়েছে!'

'যাক! মুশকিল, সব পুত্রই ডানা গজিয়ে গেলে বাপকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে চায়। যাক গে, মেজাজ শান্ত হলেই ভাল। কাপ্তান ব্যাটাকে নিয়ে খুবই ফাঁপড়ে পড়েছেন।' বলে তিনি তার ফোকসালে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

আর মুখার্জি অবাক! নিচে নেমে দেখছেন, কেউ ঘুমায়নি। সবাই যে যার ফোকসালে বসে আছে। এটা যে খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার জাহাজে, একজন সাধারণ জাহাজিকে এত রাতে খোদ কাপ্তান ডেকে

পাঠিয়েছেন--ভাবাই যায় না। কি এমন ঘটল, সুহাসের এত কি বরাত জোর যে কাপ্তান খোদ তাকে ডেকে পাঠাতে পারেন! সে ফিরে আসায় সবাই ফের মুখার্জির ফোকসালে জড় হয়েছে। জানতে চাইছে, কেন ডেকে পাঠিয়েছিল।

তিনি সারেঙকে যা বলেছেন, তাদেরও তাই বলে বিদায় করলেন। বললেন, তোমরা সবাই দেখছি আহাম্মক। আরে চার্লি সুহাসের সঙ্গে বের হয়ে যায় দেখ না! মতি স্থির নেই ছোকরার। যদি কিছু আকাম কুকাম করে আসে, সুহাসই ভাল বলতে পারবে। এতে তোমরা ঘাবড়ে গেলে কেন বুঝি না। যাও। শুয়ে পড়গে। রাত কত হয়েছে টের পাও না! সুহাসকে এত রাতে বখশিস দিতেও ডাকতে পারে না—আর তিরস্কারের কথা তো আসেই না। জাহাজে সারেঙ থাকতে সুহাসকে তিরস্কার করতে পারে কাপ্তান! এমনই বা ভাবলি কি করে! সারেঙ আমাদের মুরুব্বি। তাকে ডিঙিয়ে ঘাস খেলে সহ্য করব কেন?'

এরপর আর আশ্বস্ত না হয়ে উপায় কি। যে যার মতো সিঁড়ি ধরে ফোকসালে ঢুকে গেল। হরেকেষ্টও চলে গেল। তার পরি আছে বয়লার-রুমে। বারোটা-চারটা পরি। খুব তাড়াহুড়ো নেই বলে দেরিও হয়ে গেছে। সুহাস না ফেরায় সেও অস্বস্তিতে ছিল। একটা বয়লার চালু। একজন ফারায়ম্যান আর একজন কোলবয়ই যথেষ্ট। দুশোর মতো স্টিম রাখলেই চলে যায়। স্টিম নেমে গেলেও ব্যস্ততার কিছু থাকে না। ক'বেলচা কয়লা মেরে দিলেই হল।

মুখার্জি হরেকেষ্টকে তাড়া লাগালেন, 'যা যা। দেরি করিস না। এই অধীর তুই জেগে থেকে কি করবি। যা শুয়ে পড়গে।' অধীর চাইছিল, মুখার্জিদা তাকে বলুক চলে যেতে। সবার মতো চলে গেলে স্বার্থপর ভাবতে পারে। সেও চলে গেল।

এখন ফোকসালে তারা মাত্র তিনজন। মুখার্জিদা বললেন, 'শুয়ে পড় সুহাস। আমরা পাশের বাঙ্কটায় বসছি। আরে ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? আমাদের অসুবিধা হবে না।'

ভাঙা বাঙ্কে বসা ঠিক হবে না—তাও আবার তারা দুজন, সুহাস এ-জন্য এক পাশে সরে ওদের জায়গা করে দিতে গেলে, বালতিটা উপুড় করে তার উপর দুটো লুঙ্গি ভাঁজ করে পেতে দিলেন মুখার্জিদা। তিনি বালতিটার উপর বসে বললেন, 'আমার সুবিধে তোমার এখন দেখতে হবে না। সময় হাতে কম। সুরঞ্জন মন দিয়ে শোন। ভুলে গেলে যেন মনে করিয়ে দিতে পারিস। বল্, হাঁপাচ্ছিলি কেন! এত দেরি হল কেন! কি দেখলি!' সুহাস যতটা পারল গুছিয়ে বলার চেষ্টা করল। কেবল বলল না, চার্লি তাকে নিয়ে নিখোঁজ হয়ে যেতে চায়। কথাটা বলতে তার কেন বিবেকে বাধল তাও বুঝল না। যেন চার্লির বিশ্বাসের অমর্যাদা করা হবে। নিখোঁজ হওয়ার কথা সে কিছুতেই বলতে পারল না।

'চার্লি তার ঠাকুরদার তাড়া খাচ্ছে। মুখোস নয়?' মুখার্জিদা কেমন অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলেন।

'তাই তো বলল! মুখোসের কথা গ্রাহ্যই করল না। অনুসরণকারীর খবরেও তার আগ্রহ নেই!'

'বলেছিলি মুখোসটা যিশুর!'

'বলেছি।'

'সেকেন্ড ফলো করছে বলেছিলি?'

না তা বলিনি। তোমাকে তো বললাম, যা পরিস্থিতি তাতে বেশি বলাও যাচ্ছিল না।'

সুরঞ্জন বলল, 'কাপ্তান দরজায় এসে কখন দাঁড়াল, টের পাসনি?'

'না। তবে আমি তো দরজা খুলে মাঝে মাঝে বের হয়েছি। কাপ্তানবয় বোট-ডেকে বসে আছেন। মনে হয় কাপ্তানবয় চলে গেলে তিনি এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। এমন হতে পারে আমার দেরি দেখে তিনি না এসে পারেননি।'

'হুম।' বলে একটি অতি দীর্ঘশ্বাস এবং বিস্ময়সূচসক শব্দ ছাড়া মুখার্জির মুখ থেকে আর কিছু শোনা গেল না।

সুহাস দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে। মুখার্জির সেই চিরাচরিত মুদ্রাদোষ, হাত পা নাচানো। হাত মুঠো করা, খুলে ফেলা। মাঝে মাঝে রুমাল দিয়ে মুখ মুছছেন।

তারপর হঠাৎ তিনি বলে ফেললেন, 'চার্লি সব ঠিক বলেনি! প্রথম কথা চার্লিকে সেকেন্ড জাহাজে উঠেই অনুসরণ করছে। লস এনজেলস থেকে নয়। চার্লি টের পেয়েছে লস এনজেলসে, পার্কে

বেড়াতে গিয়ে টের পেয়েছে। চার্লি জানেই না, এখানেও সে তাকে অনুসরণ করছে। সেকেন্ডের দুটো মুখোস আছে। একটা যিশুর, আর একটা গিরগিটি গোঁফের। যেখানে যেটা দরকার পরছে। দরকারে যিশুর মুখোস খুলে দিলেই তার গোঁফ ঝুলে পড়ছে। ওটা নিশ্চয়ই ফলস গোঁফ। চাইনিজম্যান মনে হয়েছিল কি গুঁফো লোকটাকে?'

'কি করে বুঝব? মিশনে লোকটার কাছে যেতে দিলে তো! কাছে না গেলে বুঝব কি করে। আর আমার অত মনেও নেই। আমার তো কোনও আতঙ্ক ছিল না লোকটাকে নিয়ে—চার্লির ত্রাস কেন তাও বুঝছিলাম না। আসলে জান ব্যাপারটাকে আমি পাত্তাই দিইনি। তা ছাড়া এখন তো দেখছি মুখোস-টুখোস সব বাজে ব্যাপার। আচ্ছা তোমাদের কি ধারণা? চার্লি কি মাঝে মাঝে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে!'

সুরঞ্জন বলল, 'হারাতে পারে! আসলে মানসিক ভারসাম্য হাবালেই সে স্বাভাবিক হয়ে যায়। না হলে তোমাকে বলবে কেন, দে ডিমান্ড দ্যাট আই বি পানিসড ফর হোয়াট আই ডিড নট ডু। তার মানে, তাকে এমন শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, যার জন্য সে মোটেই দায়ী নয়! তুমি কি মনে করছ মুখার্জিদা। এও বলেছে—তারা সব ইনফ্লুয়েনসিয়েল ম্যান! আমরা জানি, সে ধনকুবেরের নাতনি। তাকে নাতি সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এর চেয়ে বড় শাস্তি একটি মেয়ের পক্ষে আর কি হতে পারে।'

মুখার্জি মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। হ্যাঁ হুঁ কিছু বলছেন না। তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ পা নাচিয়ে যাচ্ছেন। কি ভেবে উঠে দাঁড়ালেন। সিগারেটের প্যাকেট বের কবে একটা নিজে ধবালেন, একটা সুরঞ্জনকে দিলেন। তারপর সিগারেট মুঠো করে ধরে হুস করে পর পর দুটো টান মেরে প্রায চোখ বুজে ফেললেন।

চোখ খুলে বললেন, এটা একটা পয়েন্ট। তবে এর অন্য দিকটাও ভাবার দরকাব আছে।

তখনই সুহাস বলল, 'তোমাদের আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। দ্যাখ এব সঙ্গে চার্লিব কোনও বিপদ জড়িয়ে আছে কি না। আসল কথাটা বলতেই ভুলে গেছি। চার্লিই কিন্তু তাব ঠাকুবদার উত্তারধিকারী হবে।'

'হয়নি!' সুরঞ্জন প্রশ্ন না করে পারল না।

'তা তো জানি না। বলল, আমাকেই ঠাকুরদা সব দিয়ে গেছেন।'

'চার্লি জানল কি করে সে ঠাকুবদাব সব পাবে? কিংবা তাকে দিয়ে গেছেন! শোনা কথার দাম কি! চার্লির সব কথা মেনে নেওয়াও যায় না। বিশ্বাসও করা যায় না। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেললে কে কখন কি বলছে তার দামও দেওয়া যায় না।'

মুখার্জি বললেন, 'এগুলো পরে ভাবা যাবে।' সুরঞ্জনের কোনও কথারই গুরুত্বই দিচ্ছেন না।

সুরঞ্জন কিছুটা চটে গেল।' 'এত বড় একটা খবর—তুমি গুরুত্বই দিচ্ছ না! তুমি কি! খুব সোজা অঙ্ক—আসলে অপহরণের ভয়ে কাপ্তান মেয়েকে সঙ্গে এনেছেন—যদি বড় কোনও ষড়যন্ত্র টের পান, নিয়ে আসতেই পারেন। আসলে দেখা দরকার চার্লি প্রকৃতই সম্পত্তির মালিক কি না! আর এ জন্যই কাপ্তান চার্লিকে নিয়ে জাহাজে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে। এর ভিতর অন্য কোনোও ষড়যন্ত্র নেই কে বলবে। জাহাজ তো ভাল জায়গা নয়। জাহাজে ঘুরতে ঘুরতে মেযেটা যে বড হয়ে যাবে তিনি জানতেন। জাহাজে একটা ডবকা ছুঁড়ি ঘুরে বেডালে তোমরা কেউ মাথা ঠিক রাখতে পারতে! বল পারতে তোমরা?'

মুখার্জি বললেন, 'একটা ডবকা ছুঁড়িকে ছেলে সাজিয়ে রাখা কি কোনও শাস্তির পর্যায়ে পড়ে। টাইমবিঙ ছেলে সাজিয়ে রাখলে চার্লি বলবে কেন, দে ডিমান্ড দ্যাট আই বি পানিশড ফর হোয়াট আই ডিড নট ডু। মনে রেখ চার্লি কখনও কিন্তু হি বলেনি, দে বলেছে। হি বললে, একজনকে ভাবা যেত। হি বললে আমরা তার বাবাকে সনাক্ত করতে পারতাম। হি যখন নয় তারা বেশ কয়েকজন। তারা বেশ সব ক'জনই চায়, চার্লির শাস্তি। এই তারা কে কে হতে পারে। তার বাবা, তার দিদিবা, তার ভাইয়েরা এবং তার নিঁখোজ কাকাও থাকতে পারেন। চার্লি বলেছে, জাহাজডুবিতে তিনি নিঁখোজ। আমার মনে হয় চার্লি তাও ঠিক বলেনি। মুখার্জি ছাই ঝেড়ে সিগারেটে টান দিয়ে বললেন, আমি কি ক্লিয়ার?'

সুরঞ্জন বলল, 'তুমি কি ভাবছ তার কাকা জাহাজডুবিতে মারা যাননি।'

মুখার্জি বললেন, 'মারা গেছেন কি যাননি বলা এখন ঠিক হবে না। তবে সবই চার্লির শৈশবের ঘটনা। মনে রাখবে, চার্লি জাহাজে উঠে এসেছে ঠিক তার বয়ঃসন্ধিকালে। নিশ্চয়ই এমন কোনও বিপাকে পড়ে গিয়েছিলেন কাপ্তান, যাতে তাঁর স্বার্থে চার্লিকে তুলে না এনে পারেনি। স্বার্থ নানারকম হতে পারে। এক অপহরণের ভয়, দুই ব্লাকমেল, তিন খুন—সব কিছুই সম্ভব। তবে চার্লি সব ঠিক জানে না। জানে না এজন্য সে একজন পরিচারিকার কাছে মানুষ। পরিচারিকা যা বলেছেন, সে তা বিশ্বাস করেছে। ম্যাক এবং সেকেন্ডের আসল পরিচয় কি? তারা কি তার আত্মীয়। অথবা চার্লির আত্মীযদের এজেন্ট। ম্যাক মানে আমাদের ফাইবার দেখেছিস, সেকেন্ডকে কি তোয়াজ করত। সেকেন্ড তাকে যখন তখন নিগ্রহ করত। সে কিছু বলত না। সাধারণত, জাহাজে ফাইভারদের কপালে সব সময়ই এই নিগ্রহ থাকে। সেকেন্ড তার মাথার উপর। তার হুকুমই শেষ হুকুম। এসব আমরা জানি। তোমরা কি কেউ বলতে পার, ম্যাকের কিংবা সেকেন্ডের হাতে দুর্ঘটনার সময় কিংবা পরে কোনও জখমের চিহ্ন ছিল! দড়ির একটা অংশে রক্তের দাগ আছে। তবে সব আমার কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।'

সুরঞ্জন বলল, 'গোলমাল কি তোমার এক জায়গায়! তুমি ধরেই নিয়েছ, সেকেন্ড জঙ্গলের দিকে গেছে বলে, জঙ্গলে মুখোস পরে সেই বসেছিল। কি ঠিক বলছি কি না দ্যাখ।'

'বলে যা।' বলে মুখার্জি দু'আঙুলে নিজের চোখ চেপে রাখলেন। অর্থাৎ যেন মনোযোগের কোনও অভাব না ঘটে।

'কিন্তু সুহাস কি বলেছে। এই সুহাস বল্ না।'

মুখার্জি বললেন, 'জঙ্গল থেকে মগড়া উঠে এসেছিল। ডাকতেই ছুটে পালাল। কি সুহাস তাই তো?'

'তা হলে তুমি নিশ্চিত হও কি করে, সেকেন্ড জঙ্গলে বসেছিল মুখোস পরে। শুধু মাথা দেখেছ। তাও দূর থেকে—তাও আবার জ্যোৎস্নায়।'

মুখার্জি মাথা ঝাঁকালেন, 'ঠিক ঠিক।'

'তোমার আর একটা সিদ্ধান্তও ভুল।' সুরঞ্জন আর কথা বলছে না। কি ভুল বলবে তো। মুখার্জি রেগে যাচ্ছেন।

'ম্যাকের আততায়ীকে প্রায় যেন সনাক্তই করে ফেলেছ। কেন না ম্যাক সেকেন্ডকে যমের মতো ভয় পেত। সেকেন্ড ম্যাককে নিয়ে গিয়ে ডেরিক তুলেছে। সেকেন্ডের হাতে কিন্তু কোনও ক্ষত নেই। সেকেন্ডই খুনি এমন সিদ্ধান্ত চট করে নিতে যাইনি। তবে চার্লি মেঘের ওপার থেকে কার কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। ছবি এঁকে সে গুঁফো লোকটাকেই সনাক্ত করছে। কিন্তু লোকটাকে সুহাস চিনতে পারল না কেন?'

সুহাস বাধা দিল, 'না না।' আমি দেখেছি তাকে। জাহাজেই দেখেছি মনে হয়। তবে ঠিক মনে করতে পারছি না তিনি কে?'

'তোর উচিত ছিল সুহাস, সব কটার মুখেই গিরিগিটির গোঁফ এঁকে দেখা। তোর কাছে কোনও মুখই বিশেষ তফাত মনে হয় না। তবে চার্লি একজনকে ঠিক সনাক্ত করেছে আমার মনে হয়। সেকেন্ডকে নিয়ে আর পড়ে থাকা বোধ হয় ঠিক হবে না। আরও কেউ। কিংবা আরও অনেক।'

মুখার্জি ছাই ঝেড়ে সিগারেটে টান দিয়ে বললেন, 'চার্লি কিছুতেই বলল না, কে মধ্যরাতে দাঁড়িয়ে থাকে। উইন্ডসহোলে মুখ রেখে কথা বলে। এ তো আচ্ছা ঝামেলা। তোর কি মনে হয়নি সুহাস, দ্য প্ল্যান্ট ইজ নট প্ল্যান্টেড বাই আওয়ার ফাদার শ্যাল বি রুটেড আপ, ইগনোর হিম। কাকে ইগনোর করার কথা বলছে। তোর মাথায় কি কিছু নেই! কবে থেকে শাসাচ্ছে তাও জানতে হয়।'

সুহাস বলল, 'অত আমার মাথায় আসেনি। আমাকে তোমরা কি পেয়েছ বল তো। কবে থেকে শাসাচ্ছে চার্লি না বললে জানব কি করে। চার্লিকে তো বললাম, তিনি কি সেকেন্ড! সে তো স্রেফ বলল, না সেকেন্ড নয়। তার বাবাও না।'

মুখার্জি হতাশ গলায় বললেন, 'নাও এবার। আমরা কি করতে পারি। তবে বলে রাখি, এই

সিদ্ধান্তটা বোধ হয় আমার ভুল নয়। চার্লির কাকা সম্ভবত বেঁচে আছেন। এবং এই দ্বীপেই আছেন। দেখি কি করা যায়। রক্তমাখা বাকি দড়িটাও খোঁজা দরকার।'

'তবে কে?' সুরঞ্জন সংযম হারিয়ে চিৎকার করে উঠল। 'চার্লিকে কে শাসায়। চার্লি কি জানে না মনে করিস? উইন্ডসহোলের পাশ থেকে শাসায়! উইন্ডসহোলের একটা শেকড় ওর ঘরে ঢুকে গেছে! বোট-ডেকে উইন্ডসহোলের ছড়াছড়ি।'

মুখার্জি বললেন, 'সত্যি তো বোট-ডেকে উইন্ডসহোল কি একটা?'

সুহাস বলল, 'চার্লির বাথরুমের পোর্টহোল থেকে দেখা যায়। সুটের মুখে পাটাতনের পাশে। দু-নম্বর বোটের কাছে।'

সুরঞ্জন মুখার্জির দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি সব বলছে! শোনো। সে চার্লির ঘর থেকে বের হবার সময়ও নাকি দেখেছে, অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে কেউ। প্রেতাত্মার সঙ্গে কথা বলে না তো চার্লি!'

মুখার্জি বললেন, 'প্রেতাত্মা হোক, খুনি হোক, অপহরণকারী হোক, কেউ রেহাই পাবে না। দেখি না কতদূর যেতে পারে।' আসলে সুহাসকে সাহস দেবার জন্যই বলা। কারণ সুহাসেব উপর দিয়ে যে ঝড় যাচ্ছে তাতে সেও আবার না কিছু একটা করে বসে। মুখ ওর কেমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

'তুমি উঠছ কেন?' সুহাস না বলে পারল না। কথা যেন শেষ হয়নি। কথা শেষ না করেই মুখার্জিদা উঠে চলে যাচ্ছেন। ঠিক কাজ করছেন না। গ্যাঙওয়েতে তার ডিউটি। এত রাতে কেউ গ্যাঙওয়েতে নেমে দেখবেও না সুখানি জাহাজ পাহারা দিচ্ছে কি না। ডিউটি দিচ্ছে কি না। সবাই তো চার্লি আর কাপ্তানকে নিয়ে তটস্থ!

মুখার্জি বললেন, 'আসছি। পেচ্ছাপ করে আসছি। অনেকক্ষণ থেকে চেপে আছি।'

সুহাস বলল, 'জানো কেবিন থেকে বেব হতেই কাপ্তান বললেন, হি ইজ ওককে, মাই বয়?'

'আমি আসছি।' বলে তিনি দরজা খুলে উপরে ছুটে গেলেন। আর কেন যে মনে হল সিঁড়ির অন্ধকারে কেউ আগে লাফিয়ে উঠে গেল। চোখের ভুল নয়তো। হতে পারে। সে যাই হোক, হালকা হয়ে নিচে নেমে বললেন 'কি বলছিলি? হি ইজ ওকে মাই বয় বলল।'

'তা না বলে উপায়!'

সামান্যক্ষণ কি ভেবে মুখার্জি বললেন—

'না বলছিলাম তিনি কি তবে জানেন, চার্লি নিতান্ত তোর একজন বন্ধু। তার বেশি কিছু না।'

মুখার্জি তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, 'না তুমি কিছু জান না। তিনি হি বললে, তোমার কাছে চার্লি 'হি'। তিনি 'শি' বললে চার্লি তোমার কাছে 'শি'। ভুল যাতে না কর, হি বলে তা বুঝিয়ে দিলেন। ঠিক আছে, সুরঞ্জন যা। ঘুমিয়ে নে। কাল সকালে বের হচ্ছি। আমার ফিরতে রাত হবে। সুহাস তুই যাবি? কাল তো আমাদের ছুটি আছে। চার্লিকে নিতে পারিস। একদিন ফিলের ওখানে সবাইকে যেতে বলেছে। ওর ইচ্ছে এখানকার সব কিছু ঘুরে ফিরে দেখি। একা তোদের ফেলে রেখে মন যেতে চাইছে না। তুই বললে, চার্লি নিশ্চয়ই যাবে। গেলে ফিল খুবই খুশি হবেন।'

'সুরঞ্জন যাবে না?' সুহাস না বলে পারল না।

'ও তো ঘোড়ার ল্যাং খেতেই শিখল না। নিয়ে যাই কি করে! সাইকেলে যাওয়া যায় না। ঘাড় কোমর তোর ঠিক আছে তো? সুহাসের দিকে চোখ সরিয়ে মুখার্জি এমন প্রশ্ন করলেন।

'সে দেখা যাবে।' সুহাস ঘাড় কোমর নিয়ে গ্রাহ্য করল না।

সুরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একটু সতর্ক থাকবি। আর শোন, বাটলারকে আমার নাম কবে বলবি,' তারপর কি ভেবে বললেন, 'না থাক, আমিই যাব।' সুরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুইও যা। আমার ফোকসালে থাকার দরকার নেই। নিজেব ফোকসালে চলে যা। দরজা লক কবে শুয়ে পড়। যতটা পারিস ঘুমিয়ে নে।'

কিন্তু সকালে কেন যে মত বদলালেন মুখার্জি কিছুই বোঝা গেল না। কিনারার লোকজন আজ উঠে আসছে না কেউ। মালও তোলা হবে না। রবিবার। ছুটির দিন। সকালেই এসে জাহাজের নিচে একটা মোটর বোট লাগল। মোটর বোট থেকে এক ঝুড়ি গলদা চিংড়ি, গোটা আটেক পুরুষ্টু মুরগি আর আখ, আনারস, নারকেলসহ নিনামুর হাজির। মুখার্জি বললেন, 'আরে তুমি। কি ব্যাপার। ফিলের কাণ্ড দ্যাখ। আমি যেতে পারব না বলে করেছে কি! এত মাছ! ও সারেঙসাব, শিগগির আসুন।'

সারেঙসাব খবর পেয়েই উপরে উঠে এসেছেন। সব দেখে তাজ্জব। কে পাঠাল!

'দেখুন ফিলের কাণ্ড।' বলে ঝুড়ির ঢাকনা খুলতেই জ্যান্ত চিংড়ি সব লাফিয়ে পড়তে থাকল। মুরগিগুলি কোকরো কো করে ডেকে উঠল। জাহাজিরা সবাই ছুটে এসেছে। ফিল কে? ফিলের কথা তারা জানতে চাইল। মানুষটি তার বিদেশী অতিথির সম্মানার্থে তার নিজস্ব খামার থেকে সব পাঠিয়েছে। বেগুন, টমেটো, পটল, ঝিঙে কিছুই বাদ নেই। ফিল খুবই সজ্জন ব্যক্তি এমন বললেন মুখার্জি। এমন কি থলেতে কাঁচা লঙ্কা পর্যন্ত। গন্ধরাজ লেবু। ফিল তবে সবই মনে রেখেছে।

আগেব এক সফরে মুখার্জির আমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসে জাহাজে বাঙালি খানা খেয়ে খুশি হয়েছিল ফিল। আসলে এই দ্বীপেব এবং অন্যান্য দ্বীপগুলিতে চাইনিজ রান্নার চল আছে। ভারতীয় রান্নারও। ফিল মনে রেখেছে। মুখার্জি ডালের সঙ্গে গন্ধরাজ লেবু খেতে ভালোবাসেন।

লোকটার মগজ এত সাফ—অথচ ফিল কিংবা ফিলিপ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে—সব হেঁয়ালি কথাবার্তা। সে যিশুব বার্তা ঘরে-ঘবে, দ্বীপে-দ্বীপে পৌঁছে দিচ্ছে। এবং বসতি মানুষজনের বাড়িয়ে যাচ্ছে এই দ্বীপগুলিতে। এ ছাড়া সে কিছুই যেন মনে রাখতে চায় না। তিনি ফিলের মিশনারি কাজকর্ম দেখে খুশি হলে, যেন খুবই আনন্দ হবে তাঁর। সেজন্যই হাতে সময় নিয়ে বারবার তাঁকে ফিলের ওখানে যেতে বলেছেন।

আজই যাবেন ঠিক করেছিলেন। যাওয়া হল না। যাওযা কতটা ঠিক হবে ভেবেই যাননি। তাঁর হাতে অনেক কাজ —এখনি একবার যাওযা দরকাব বাটলারের ঘরে। বন্দরে এলেই বন্দর কর্তৃপক্ষের হাতে জাহাজেব একটি মোটামুটি সব কিছুর তালিকা পৌঁছে দিতে হয়। শুল্ক বিভাগ এখানে নামেমাত্র থাকলেও তাঁরা নিয়মনীতি মেনে চলেন। তালিকায়, জাহাজে কি আছে, কতজন ক্রু, তাদের নাম, ঠিকানা অফিসার ইনজিনিয়ারদের নাম ঠিকানা সই সব খবরই থাকে। চিফ মেটের কাজ হলেও বাটলার নানা ব্যাপারে চিফ মেটকে সাহায্য করে। এখন তাঁর কাজ একটি তালিকা হাতানো। অন্তত অফিসাব ইনজিনিয়াবদেব নাম ঠিকানা তাঁব দরকার।

অবশ্য এতে তিনি কাজ কতটা উদ্ধার করতে পারবেন জানেন না। দেখাই যাক না, অফিসার ইনজিনিয়ারদের আসল পরিচয় কি। তারা টেকসাসের লোক না সত্যি ওয়েলসের লোক তাও বোঝা যাবে। টেকসাস কিংবা অন্য যেখানকারই হোক, যদি তারা ওয়েলসের ঠিকানা দেয় তা হলেও কিছু করণীয় নেই। দিতেই পারে। তারা ভারতীয় জাহাজি বলে, মার্কিন মুলুক থেকে অফিসার ইনজিনিয়ার নেবে তেমন ভাবাও ঠিক না। আবার নিতেও পারে। নানা সংশয়ে পড়েই বাটলারের কাছে যাওয়া।

নিনামুরকে যাওয়ার আগে বললেন, 'আমার ঘরে এসে বোস। আরে এস। তোমার কর্তাকে এক বোতল সরষের তেল দেব। নিয়ে যাবে।' নিনামুর কিছুতেই বাঙ্কে বসবে না। সুহাস সুরঞ্জন এবং সবাব সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেও নিনামুর খুব সহজ হতে পারছে না।

কর্তাব সঙ্গে ওঠাবসা করেন, সে কি করে এমন মানুষের বিছানায় বসতে সাহস পাবে। লাল বেল্টটি মাথায় ঠিক বেঁধে রেখেছে। তবে আজ সে লুঙ্গি পরেনি। হাফ প্যান্টও নয়। পারিপাট্য আছে জামা-কাপড়ে। ভেট নিয়ে এসেছে—মালিকের সম্মান বলে কথা। মুখার্জির কথাবার্তাও খুব ভাল বুঝছে বলে মনে হয় না। সে উসখুশ করলে মুখার্জি বললেন, 'ঠিক আছে যাও।' বলে ফিলকে একটা ছোট্ট চিঠিতে জানালেন, তিনি হাতে সময় নিয়ে যাচ্ছেন। দরকারে তিনি দু-একদিন থাকতেও পারেন।

সঙ্গে জাহাজের আরও দু-একজন যেতে পারে এমনও ইঙ্গিত দিলেন চিঠিতে। নিনামুরকে বললেন 'বোটে অপেক্ষা কর। আমাকে কিনারায় নামিয়ে দিয়ে যাবে।'

তারপর তিনি আর দেরি করলেন না। কারও সঙ্গে তাঁর কথা বলারই সময় নেই যেন। দেয়ালে ছোট্ট আয়না ঝুলিয়ে চুল আঁচড়াতে গিয়ে দাড়ি কামানো দরকার মনে হল। চিৎকার চেঁচামেচিরও খামতি নেই। 'এই অধীর, গরম জল দিয়ে যা। আমার ব্রাশ কোথায় গেল। কিছুতেই জায়গারটা জায়গায় থাকে না।' জাহাজিদের এই দোষ। জামা-কাপড় থেকে পেস্ট সাবান, যে যার মতো তুলে নেয়। কার, দেখার দরকার হয় না। এই নিয়ে বচসাও হয়, আবার মিটেও যায়।

সে ছুটে গিয়ে মুখার্জিদার সেভিং ক্রিম থেকে ব্লেড সব নিয়ে এল। কাপে করে গরমজল রেখে গেল। সুহাস তখনও ঘুম থেকেই ওঠেনি। ছুটির দিনে সবারই ঘুম ভাঙতে দেরি হয়। কাল রাতে সুহাসের ঘুমও বোধহয় ভাল হয়নি। সকালের দিকে ঘুমিয়ে পড়তে পারে। সুরঞ্জনকে ডেকে বললেন, 'তোরা চা খেয়ে নিস। ওকে ডাকতে যাস না। আমি যাচ্ছি। আজ তো ভোজ। দারুণ।'

'তুমি ফিরবে কখন?'

'কাজ হয়ে গেলেই ফিরব।'

'কোথায় যাচ্ছ বলে যাবে না। কখন ফিরবে বলে যাবে না। মুরগিগুলো কি হবে! ডবকা ছুঁড়ির মতো চিংড়িগুলি লাফাচ্ছে। পিছিলে দেখগে কি গেঞ্জাম! আর তুমি বের হয়ে যাচ্ছ! সারেঙসাব কেবল বলছেন, কি হবে না হবে মুখার্জিবাবু বলে যাবেন না!'

জুতো ব্রাস করতে করতে বললেন—'যাচ্ছি হরসাগামে। ফিরতে বারোটা-একটা বেজে যেতে পারে। সারেঙসাবকে বলবি, ডেক-জাহাজিদেরও যেন খেতে বলা হয়। সবাই মিলে খাওয়ার মধ্যে আলাদা আনন্দ আছে। জাহাজিরা কেউ যেন বাদ যায় না।'

'হঠাৎ হরসাগামে যাচ্ছ!'

'যাচ্ছি কাজ আছে বলে। সব সময় কৈফিয়ত।'

সুরঞ্জন আর কিছু বলতে সাহস পেল না। সকাল বেলায় এত কি জরুরি কাজ—যে তিনি হরসাগামে চললেন। সেখানে সব আস্তাবল পর পর। আস্তাবলে গিয়ে কি হবে। তারপরই চকিতে এই তাড়াহুড়োর ব্যাপারটি ধরে ফেলল। আস্তাবল থেকে ঘোড়া নিতে হলে রেজিস্ট্রি খাতায় সই করতে হয়। ঠিকানা দিতে হয়। কাল কে কে ঘোড়া নিয়ে গেছে, কি নাম, ঠিকানা কি, হয়তো খোঁজ নিতেই চললেন তিনি।

সবাইকে বোকা ভাবে! সুরঞ্জন গজ গজ করছে। আসলে আজকের সকালটা সত্যি মনোরম। মুখার্জিদা না থাকলে কেমন ম্যাড়মেড়ে—কিচ্ছু ভাল লাগে না। মুখার্জিদা না থাকলে যা পরিস্থিতি জাহাজে তাতে আতঙ্কের কারণ থাকে। তার কেন যে মন সায় দিচ্ছিল না, মুখার্জিদা এ-সময় বের হোক।

সে না বলে পারল না, 'এত বোকা ভাবছ। তোমার মাথা তো সাফ জানতাম! গুঁফো লোকটার হদিস খুঁজতে যাচ্ছ! ভাবছ তুমিই বুদ্ধিমান। আর সবাই নির্বোধ। ধূর্ত লোকেরা ক'পা হাঁটতে হয়, ক'পা পিছোতে হয় ঠিকই জানে। জাহাজের ঠিকানা কখনও দেয়! দিলে ধরা পড়ে যাবে না!'

মুখার্জি সুরঞ্জনের দিকে বেশ তারিফ করার চোখে তাকালেন। একজন হবু গোয়েন্দার সহকারী যদি তার কর্তার গতিবিধি আঁচ না করতে পারে তবে আর তাকে দরকার হবে কেন?

তিনি বললেন, 'দেখতে দোষ কি! নামগুলি টুকে আনব ভাবছি।'

'কিচ্ছু পাবে না বলে দিলাম। যাচ্ছ যাও। তবে কোনও কাজ হবে বলে মনে হচ্ছে না।'

'শোন সুরঞ্জন, আমরা সামান্য জাহাজি—এখানে কোনও পুলিশ ফাঁড়ি নেই। খবর দিতে গেলে সেই মাদাঙ। আমরা কে, যে আমাদের অভিযোগ তারা শুনবে। কাপ্তান ছাড়া কারও ক্ষমতা নেই। যেই খুন করুক, সময়টা ঠিক বেছে নিয়েছে। পুলিশ নেই, প্রশাসন নেই, কাপ্তান ছাড়া কেউ নেই। খুন না দুর্ঘটনা—তিনি ছাড়া কারও কথা কানে তুলবে না। কাপ্তানের কাছে যাব! যাওয়া ঠিক হবে! এত সব কাণ্ড ঘটছে জাহাজে, তারপরও কি তাকে বিশ্বাস করা যায়! মাই ফেইথফুল সেলর! জানা আছে কত ফেইথফুল! নাটক বুঝলি।'

মুখার্জি সিঁড়ি ধরে লাফিয়ে উঠে যাবার মুখে ছোট টিন্ডাল বলল, 'সারেঙসাব ডাকছে।'

তিনি যেতে যেতেই বললেন, 'আরে ডাকাডাকির কি আছে! তাঁর কথামতোই সব হবে। তিনি যা ভাল বুঝবেন করবেন। সারেঙসাব আমার চেয়ে কি কম বোঝেন। মেনু কি হবে তাঁর কাছে জেনে নাও।'

কারণ মুখার্জি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাহাজ থেকে নেমে যেতে চান। নিনামুরকে অপেক্ষা করতে বলেছেন। সে ঠিক গ্যাঙওয়ের সিঁড়ির কাছে অপেক্ষা করছে। একবার বাটলারের ঘরেও উঁকি মেরে যেতে হবে। ফালতু ডাকাডাকি কার এ সময় ভাল লাগে।

আর তখনই হরেকেষ্ট ছুটে এসে তালপাতার টুপিটা দিল।

'রোদে বের হচ্ছ! সুরঞ্জন পাঠিয়ে দিল।'

এই এক স্বভাব তাঁর। তাড়া থাকলে ভুলের অন্ত থাকে না। টুপিটার খুবই দরকার। ডেকে এসেও মনে হয়নি। বেশ কড়া রোদ উঠেছে। চারপাশে যতদূর চোখ যায় দ্বীপটা রোদে ঝলমল করছে। তিনি পকেট হাতড়ে কি খুঁজলেন—না আছে। সিগারেটের প্যাকেট, লাইটার নিতে ভুল করেননি।

প্রায় দৌড়ে সিঁড়ি ভেঙে বাটলারের কেবিনে গিয়ে টোকা মারলেন।

পর পর সব কেবিন। বাটলারের কেবিনটা সবার শেষে। আগের দুটো কেবিনে, দুজন মেসরুম-বয়, চারজন মেসরুম-মেট ভাগাভাগি করে থাকে। পরের কেবিনটাতে থাকে চিফ কুক, সেকেন্ড কুক। মাঝখানের রাস্তা পার হয়ে কাপ্তান বয়ের কেবিন। তারপর বাটলারের কেবিন। কেবিনে কেউ নেই। ছুটির দিনেও এদের বিশ্রাম নেই। যে যার কাজে নেমে গেছে। বাটলার আছে কি না? তবু টোকা মারতেই দরজা খুলে বাটলার এক গাল হেসে বলল, 'মুখার্জিবাবু কি ব্যাপার?

'ব্যাপার কিছু না। একটা কাজ করতে হবে।'

'বলুন।'

'তোমাকে এই যে তালিকা দেওয়া হয় না, জাহাজে রসদ কি আছে না আছে, ক্রু, অফিসার কতজন, কি নাম, ঠিকানা—তালিকার একটা কপি আমাকে জোগাড় করে দিতে হবে।'

'এক্ষুনি দরকার? দরকার তো দাঁড়ান। দেখছি খুঁজে।'

'খুঁজে রেখে দিয়ো। আমি বিকেলে এসে নেব।'

বাটলারের সঙ্গে কথা বলে দুটো উইন্ডসহোল পার হয়ে চিমনির গোড়ায় এসে মুখার্জি হতবাক। সামনে সুটের মুখে কে উবু হয়ে আছে। কয়লার সুট। কয়লা ফেলার মুখ এটা। তিন ফুটের বর্গাকৃতি একটি পাটাতন তুলে দিলেই মুখটা গঙ্গাবাজুর বাঙ্কারে প্রায় বিশ বাইশ ফুট নিচে ঢুকে গেছে। হাতির শুঁড়ের মতো বিশাল চোঙওলা মুখ ওখানে ঢুকিয়ে দিলেই ঘণ্টা চার-পাঁচেকের মধ্যে বাঙ্কার কয়লার পাহাড় হয়ে যায়। সেই সুটের মুখে কে উবু হয়ে আছে? পড়ে গেলে একেবারে ছাতু হয়ে যাবে। কাজ নেই কাম নেই, এখান থেকে কয়লা তোলার কথাও নেই। তোলা হলেও মই লাগিয়ে তোলা যেতে পারে। খরচ বেশি। কোম্পানি এত দরাজ! মাথায় মুহূর্তে নানা সংশয় উঁকি দিতেই ভাবলেন—একবার দেখাই যাক না, কে সে!

অবাক—চার্লি! উইন্ডসহোলের পাশে পাটাতন তুলে চার্লি ঝুঁকে কি দেখছে!

মুখার্জিকে দেখে কিছুটা যেন বিব্রত বোধ করছে চার্লি।

মুখার্জি বললেন, 'গুড মর্নিং চার্লি।'

চার্লি মুখার্জিকে দেখে আদৌ খুশি নয়। বিশেষ করে এই অসময়ে। মুখ গোমড়া। তবু সাড়া দিল, 'গুড মর্নিং।'

মুখার্জির সব মনে পড়তেই মুখে মজার হাসি খেলে গেল। আই অ্যাম স্লিম, টল অ্যান্ড ফুল ব্রেস্টেড। চার্লি সত্যি ফুল ব্রেস্টেড। তার ঘাড় গলা দেখে আর এটা বুঝতে আদৌ কষ্ট হয় না। চুলও তার বড় হয়ে গেছে। বেশ কোঁকড়ানো চুল। দেবী-প্রতিমার মতো মুখখানি ঝলমল করছে। চার্লি এখানে কি করছে! সাদা বয়লার সুট পরনে। একবার জোক করতেও ইচ্ছে হল, আর ইউ গার্ল? কিন্তু তিনি অত্যন্ত সংযত গলায় বললেন, 'এভাবে কেউ ঝুঁকে দেখে! নিচে কি কিছু পড়ে গেছে! কি খুঁজছ। এত ঝুঁকে দেখছ, পড়ে গেলে কি হবে?'

'কিছু না। পড়ে যাব কেন?'

চার্লি দ্রুত উঠে দাঁড়াল। প্রায় বিশ-বাইশ ফুট নিচে বাঙ্কার। অন্ধকারে কিছু দেখা যাবারও কথা নয়। এদিকটায় আর কাউকে দেখা গেল না। অফিসার ইনজিনিয়াররা কিনার দেখা গেলে পাশের রেলিঙে এসে ঝুঁকে দাঁড়ান। এই রাস্তাটায় অফিসার ইনজিনিয়াররাই হাঁটাহাঁটি করেন। আর এই উইন্ডসহোলের পাশে মধ্যরাতে কি সে এসে সুটের পাটাতনে দাঁড়ায়!

চার্লি দ্রুত পাটাতন তুলে সুটের মুখ বন্ধ করে সরে পড়ল। একটা কথাও বলল না।

যাক চার্লি আবার আগেকার চার্লি। সুহাসের আশ্চর্য মন্ত্রশক্তি কাজে লেগেছে। এতে তিনি কিছুটা স্বস্তি বোধ করলেন। চার্লিকে দেখেই মনে পড়ে গেল, আরে সুহাসকে তো আসল কথাটাই বলা হয়নি। একা কতদিক সামলাবেন বুঝতেও পারছেন না। রেলিঙে ঝুঁকে হাতের ইশারায় নিচে নিনামুরকে জানিয়ে দিলেন, তিনি আসছেন। কারণ এখুনি তাঁকে একবার ফোকসালে ফিরে যেতে হবে। একটু দেরি হবে। বেচারা নিচে বোটে অপেক্ষা করছে তাঁর জন্য। সবই তিনি গোলমাল করে ফেলছেন। গ্যাঙওয়েতে পরির সময় মাথা এত পরিষ্কার থাকে—আর ফোকসালে ঢুকে গেলেই সব ভুলভাল হয়ে যায়। গণ্ডগোলের মূলেও ফিল। সাতসকালে ভেট পাঠানোতে তিনি তাজ্জব।

তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফেলার জন্য ছুটে আসছিলেন ডেক ধরে। সুরঞ্জন পিছিলে বসে আছে—সে বুঝতেই পারছে না, কিনারায় গেলেন না কেন মুখার্জিদা। ফিরে আসছেন কেন! আবার কি কিছু ফেলে গেলেন। বেঞ্চিতে আর বসে থাকা যায়! সে নেমে মুখার্জিদার দিকে এগিয়ে গেল—'কি ব্যাপার। ফিরে এলে! কিনারায় গেলে না!'

মুখার্জিদা তাকে ইশারায় সঙ্গে আসতে বললেন। মেসরুম পার হবার মুখে দেখলেন, মুরগি হালাল করতে বসে গেছে—কয়লাআলা হাফিজ। সে মুরগির নলি কেটে হাতে চেপে রাখছে। দৃশ্যটা দেখতে তাঁর ভাল লাগছিল না। খেতে বসলেও দৃশ্যটা মনে পড়বে। খেয়ে তৃপ্তি পাওয়া যাবে না। যে কোনও নৃশংস ঘটনাই তাঁকে পীড়নে ফেলে দেয়। তিনি সিঁড়ি ধরে তরতর করে নামার সময়ই বললেন, 'সুহাস উঠেছে? সুহাসের সঙ্গে জরুরি কথা আছে। ও উঠেছে কি!'

সুরঞ্জন বলল, 'উপরে তো দেখলাম না। উঠেছে বলে মনে হয় না। কি দরকার?'

'আয় না।'

সুহাসের ফোকসালে উঁকি দিতেই মনে হল, সে উঠেছে ঠিক—তবে কেমন মনমরা। মুখার্জিদাকে দেখেও দেখল না। কেমন ভোঁতা মেরে গেছে। সে যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না মুখার্জিদা উঁকি দিয়ে তাকে দেখছে।

সুরঞ্জন বলল, 'দেখছ ছোঁড়ার কাণ্ড। আরে তোর হল কি। আমাদের এত দেখার কি দরকার হল। তুইও বংশী হয়ে গেলি শেষে!'

সুহাস অগত্যা কি করে! বলল, 'কিছু বলবে।'

'আয়। নেমে আয়! মুখ ধুসনি। চা-ও খেলি না। চুপচাপ ঘুম থেকে উঠে বিছানায় বসে আছিস। আমি তো ভাবলাম, ঘুমে কাতর!'

মুখার্জিদা বললেন, 'দেরি করিস না। হাতে সময় নেই।'

সুহাস জামা গলিয়ে মুখার্জিদার ফোকসালে ঢুকলে তিনি বললেন, 'আচ্ছা, চার্লির কাছে তার পরিবারের কোনও অ্যালবাম আছে? অনেকেই তো সঙ্গে নিয়ে আসে। মন-মেজাজ খারাপ হলে অ্যালবাম খুলে মা-বাবা ভাই-বোনদের ছবি দেখে। বিয়ে করলে বউয়ের। ছেলেপুলে থাকলে তাদের।'

মুখার্জিদা বসছেন না। দাঁড়িয়েই আছেন, সুরঞ্জন বলল, 'এর জন্য ফিরে এলে! কখন যাবে, ফিরবে কখন!'

সুহাস বলল, 'ম্যাকের অ্যালবাম দেখেছি। সে দেখাব। কিন্তু চার্লি তো কোনও অ্যালবাম খুলে তার প্রিয়জনদের ছবি দেখায়নি।'

সুরঞ্জন ফুট কাটল। 'দেখাবে কি, প্রিয়জন থাকলে তো দেখাবে!'

মুখার্জিদা সুরঞ্জনের কথা গ্রাহ্য করলেন না। শুধু বললেন, 'আজই খোঁজ করবি—যদি অ্যালবাম

থাকে। ডরোথি ক্যারিকো—কি নাম যেন জাহাজটার—যাই হোক, জাহাজটার কোনও নিজস্ব গাইডবুক যদি থাকে। ওর ঠাকুরদা ব্যবসা ভালই বুঝতেন। ব্যবসা রমরমা কি করে করতে হয় তাও জানেন। ডরোথি ক্যারিকোর ছবি, লাউঞ্জের ছবি, কিংবা দ্রষ্টব্য কিছু যদি থাকে জাহাজের তার ছবি গাইডবুকে থাকতেই পারে। চার্লির কাছে না থাকলেও তার বাবার গোপন লকারে থাকতে পারে। চার্লিকে খুঁজে দেখতে বলবি। 'কলিজ' জাহাজের খোঁজে যদি সত্যি আসেন, তবে সঙ্গে ডরোথি ক্যারিকোর গাইড-বুকটিও সঙ্গে রাখবেন। 'কলিজ' জাহাজের সঙ্গে ডরোথি ক্যারিকোর মিল কতটা, কি আদৌ কলিজ জাহাজ ডরোথি ক্যারিকো কিনা বুঝতে গাইডবুকটি তার দরকার, বুঝলি কিছু! মাথায় গেছে!'

সুহাস মুখার্জির বালিশ টেনে বাঙ্কে শুয়ে পড়েছে। কিছুই যেন তার শোনার আগ্রহ নেই। কেমন উদাস হয়ে গেছে।

জবাব না দিলে কার না রাগ হয়!

'আরে দেখছ ছোঁড়ার কাণ্ড। আবার শুয়ে পড়ল! এমন চোখে তাকাচ্ছে আমাকে যেন চিনতে পারছে না। কি রে তোব হয়েছেটা কি! ফের শুয়ে পড়লি! চোখেমুখে জল দিলি না। চা খেলি না। কত বেলা হয়েছে। ওঠ বলছি। না উঠলে লাথি মেরে তুলে দেব।'

সুহাস বলল, 'আমি কিচ্ছু করতে পারব না। আমার কিছু ভাল লাগছে না। তুমিই বরং চার্লিকে বলে যাও। কাপ্তান কিছু মনে নাও করতে পারে। দেখলে না রাতে তার বিশ্বস্ত জাহাজিদের লেকচার মারল।'

'আমি বলতে পারলে, তোকে সাধব কেন?'

সুরঞ্জন বলল, 'চার্লি কি পারবে! আর গাইডবুক, কিসের গাইডবুক! ডরোথি ক্যারিকো কি শহর না ঐতিহাসিক জায়গা। তাব গাইড বুক থাকবে!'

মুখার্জির দেরি হয়ে যাচ্ছে। জামার আস্তিন টেনে ঘড়ি দেখলেন—

'তোরা বুঝছিস না। ডরোথি ক্যারিকো প্রমোদ তরুণী। ধনকুবেরের বাচ্চারাই ফুর্তিফার্তা করতে বের হয়ে যেত। টাকা উড়ত। নাচা গানা, সাঁতার কাটা, তার লাউঞ্জ সবই বিজ্ঞাপনের ভাষায় অতি চমৎকার। ভ্রমণার্থীদের আকর্ষণের জন্য গাইডবুক থাকতেই পারে। দেখিস না বিমান কোম্পানিগুলির কত সুন্দর সুন্দর গাইডবুক থাকে। কোথায় কি সুযোগ-সুবিধা গাইডবুক না থাকলে ভ্রমণার্থীরা আকর্ষণ বোধ করবে কেন?'

সুহাস বালিশে মাথা ডুবিয়ে দিয়েছে। উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। কথার গুরুত্ব বুঝতে চাইছে না। সুরঞ্জনও যেন পাত্তা দিচ্ছে না তাঁর কথা—গাইডবুক শেষে তোমাকে গাইড করবে! হয়েছে বেশ! এই সুহাস, এত মনমরা হলে লাথি মেরে সত্যি জলে ফেলে দেব। ওঠ। যা বলছি শোন।'

সুহাস বালিশ থেকে মুখ না তুলেই বলল, 'ঠিক আছে চার্লিকে বলব। এখন যাও তো!'

উপরে ওঠার সময় দুজনেই লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙছে। মুখার্জি, সুরঞ্জন। এটা তাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙা—দু'পাশের রড ধরে কখনও সিঁড়িতে পা না রেখেই নিচে আসা সড়াত করে, একেবারে জলভাত। ওঠার মুখে মুখার্জি বেশ চিন্তিত। দ্বিধা-দ্বন্দ্বও কম না। না বলে পারলেন না, 'সুহাসের কি হয়েছে বলতে পারিস! কিছুই গা করছে না!'

'আরে বুঝছ না—নারী। নারী এখন তার যা দেবী সর্বভূতেষু হয়ে আছে। স্লিম, টল, ফুল ব্রেস্টেড হয়ে আছে—যেদিকে ছোঁড়া তাকায় চার্লি এখন তার দেবীরূপেণ সংস্থিতা। মাথা ঠিক রাখতে পারে। তুমি হলে পারতে? চাপ সৃষ্টি করে লাভ নেই। মাথা খারাপ—রাতে ছোঁড়া অকাম কুকামও করতে পারে। দেখছ না, ক্লান্তি মুখে। অলস। রাতে দু'চোখের পাতা এক করতে পারেনি বোঝাই যায়।'

আর তখনই নিচে থেকে হাঁকছে সুহাস, 'মুখার্জিদা শোনো। ও মুখার্জিদা!'

ওরা মেসরুম পার হয়ে পিছিলে ঢোকার মুখেই সুহাসের চিৎকার শুনে ছুটে গেল নিচে।

সুহাস দরজার বাইরে দ্বিতীয় সিঁড়ির পাশে মুখ বাড়িয়ে ডাকছে।

'কি হল।'

'শোনো।'

'না এখন আমার শোনার সময় নেই।'

'শোনোই না।'

হয়তো খুবই জরুরি খবর। সুহাস তো মাঝে মাঝে এভাবেই, কলিজ জাহাজের কাগজপত্র তাব মুখের উপর ছুঁড়ে দিত। যদি ডরোথি ক্যারিকোর ছবি-টবি চার্লি আগেই তাকে দিয়ে থাকে—এ সব ভাবতে ভাবতে নিচে ছুটে গেলেন।

'কি বল্!'

'ভিতরে এস না!'

তবে খুবই গোপন খবর।

মুখার্জি ভাবলেন, যা হোক ছোঁড়ার মাথা ঠিকই আছে। সুরঞ্জনও ঢুকে গেছে। কি খবব কে জানে। খবরের মূল সূত্রগুলি তো সুহাসই যোগাড় করে দেয়। না হলে জানতেই পারত না—চার্লিব মা নেই। চার্লি ধনকুবেরের নাতি, বেটসির দুর্ঘটনা, চার্লিকে তার ঠাকুরদা সব দিয়ে গেছে' এমনকি প্রেসিডেন্ট কলিজ জাহাজটিরও প্রাথমিক রিপোর্ট সুহাসই সংগ্রহ করেছিল—এত সব মাথায় যখন মুখার্জিব কাজ করছে—তখন, সুহাস যা বলল!

'কি বললি! রেগে আগুন মুখার্জি।

'না বলছিলাম, চার্লিকে বোট-ডেকে দেখলে!'

'এ-জন্যে ডেকে আনলি।'

'না বলছিলাম, যদি দেখে থাকো।'

'দেখে থাকলে কি হবে! এই হারামজাদা, তুই নিজে উঠে দেখতে পারিস না, চার্লি বোট-ডেকে না, তার কেবিনে? আমার কি দায় পড়েছে চার্লি কোথায় আছে দেখার!'

মুখার্জি সুরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি কি করব বল্! যাচ্ছি একটা জরুরি কাজে। বোঝো! ধুস শালা, যাবই না। যা হয় হোক! চার্লি শেষে তোর মাথাটিও খেল!'

সুরঞ্জন বলল, 'অযথা রাগ করে লাভ নেই। আমি বুঝি কি হয়! বলে সুহাসেব দিকে তাকিয়ে বলল, 'যা ওপরে যা। নিজের চোখে দেখে আয়, তোমার দেবীরূপেণ সংস্থিতা কেমন আছেন!'

সুহাস কিছুটা বিব্রত বোধ করছে। এ জন্য মুখার্জিদাকে ডেকে আনা উচিত হয়নি। বোকাব মতো তার উচাটন এভাবে ধবা পড়ে যাবে বুঝতেই পারেনি। মুখ ব্যাজার করে বাঙ্কে বসে পড়ল।

আর কি যে মায়া বেড়ে যায়। মুখার্জি নিজের ক্ষোভ সহজেই হজম করে বললেন, 'চার্লি বেশ স্বাভাবিকই আছে। তুইই দেখছি অস্বাভাবিক আচরণ করছিস। যা। উপরে উঠে হাত মুখ ধুয়ে চা চাপাটি হচ্চে খেয়ে নে। ফিল কত কিছু পাঠিয়েছে। এত বড় বড় গলদা চিংড়ি। মুরগি। ফিস্টি হচ্ছে। ফুর্তি কর। গুম মেরে কেবিনে পড়ে থাকিস না। সব গুলি মেরে ফুর্তিফার্তা' কবতে শেখ। চার্লিকে দেখলাম বোট-ডেকে সুটের পাটাতন তুলে ঝুঁকে কি খুঁজছে। আমাকে গুডমর্নিংও বলেছে। ভালই আছে—এখন তুমি ভাল না থাকলেই আমাদের বিপদ। যত সব ঝামেলা!'

সুহাস চোখে মুখে জল দিল। দাঁত মাজল। ফোকসালে নেমে আয়নায় মুখ দেখল। তার দাড়ি কামাতে হয় না। ঈষৎ নীলাভ দাড়ি গালে, সমুদ্রেব জল হাওয়ায় গায়ের রঙ খুলে গেছে। নোনা হাওয়ার গুণ। মনেই হয় না. রাতে না ঘুমিয়ে সে খুবই কাহিল। সে তবে জোর পাচ্ছে না কেন! উপরেও উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না। এক অজানা আতঙ্কে, না, চার্লির সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে তাকে সামলাবে কি করে—কাবণ চার্লি যদি সত্যি জোরজার করে—আচ্ছন্ন অবস্থায় চার্লি ভালও ছিল না—এখন তার যদি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে, কি ভাবে তাকে গ্রহণ করবে সে জানে না।

কেমন কুহক মনে হয়। গত রাতের ঘটনা কেন যে এখনও তার কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকছে। চার্লির কাশের জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়া, তার খোঁজাখুঁজি, চার্লির সমুদ্রস্নান, সাঁতার কাটা—এবং ক্লান্ত শরীর

টেনে এনে পাথরে জলকন্যার মতো বসে থাকা সবই যেন এক কুহেলিকা। কেবিনে খুবই অবিন্যস্ত পোশাকে চার্লির পড়ে থাকাও সে কেন যে সহ্য করতে পারছে না। চার্লির উলঙ্গ শরীরে সে তার গোপন বুনো ডেইজি ফুলটিও দেখে ফেলেছে। চার্লির সব দেখে ফেলার পর, সে কিছুটা গুটিয়েও গেছে। আর সে আগের মতো নেই। ভিতরে তার ঝড় উঠে গেছে। কি করবে! দরজা খুলে কাপ্তানকে দেখার পর ভয়ে সে হিম হয়ে গিয়েছিল—চার্লি জানে না, তার বাবা দরজায় দাঁড়িয়ে হয়তো সব শুনেছেন। সেই অদৃশ্য প্রেতাত্মাও...

চার্লি তাকে নিয়ে কোথাও চলে যেতে চায়।

কোথায় কতদূরে সে জানে না। প্রকৃতই সে যেতে চায়, না, আচ্ছন্ন অবস্থায় যা ভাবে, তাই প্রকাশ করে ফেলে—সে বুঝতে পারছে না। কি ভাবে চার্লির সামনে গিয়ে দাঁড়াবে তাও বুঝতে পারছে না। মুখার্জিদার কথামতো কাজ না করলেও খেপে যাবেন। প্রমোদ তরণীর খবর নিতে বলে গেছেন। শুধু কি ডরোথি ক্যারিকো—সেই লোকটা কে? চার্লি নিশ্চয়ই তাকে চেনে। না হলে বলে কি করে, আই উইল রিওয়ার্ড ইভিল, উইদ ইভিল নাথিং ক্যান স্টপ মি। কোনও অজ্ঞাত অপরাধী যে লোকটা নয়—লোকটাকে উচিত শিক্ষা দেবার ক্ষমতা রাখে চার্লি এমনও মনে হয়েছে তার। আসলে নির্জন বালিয়াড়িতে মার খাওয়ার পর থেকে সে কিছুতেই তার হতভম্ব অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারছে না।

মাঝে মাঝে সে তার অবসাদ ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করছে। পারেনি। চার্লির কেবিনে সে ঢুকে বুঝেছিল, সে শক্ত না থাকলে চার্লি আরও ভেঙে পড়তে পারে। তাকে সাহস যুগিয়েছে। যা বলেছে, তাতেই সায় দিয়েছে। কোনও কারণেই চার্লি হতাশ হয়ে পড়ুক সে চায়নি। যেন জাহাজ তার শেষ বন্দর পেয়ে গেছে—দড়িদড়া গুটিয়ে শুধু নেমে পড়া।

বুনো ফুলের গন্ধে সেও আচ্ছন্ন—কিন্তু তাকে শক্ত হতেই হবে। ঘরে সে পায়চারি করছিল, মাঝে মাঝে বের হয়ে আবার ঘরে ঢুকে যাচ্ছিল।

অধীর চা আর চার-পাঁচ টুকরো মেটে সেদ্ধ রেখে গেছে। চাপাটি রেখেছিল। চাপাটি খেল না। চা, মেটে সেদ্ধ খেয়েছে। উপরে সবাই গুলতানি করছে বোঝা যায়। দৌড়ঝাঁপও টের পাওয়া যাচ্ছিল। বড় গামলা এনে কেউ রাখছে। তার শব্দও সে নিচে বসে টের পাচ্ছিল। উপর থেকে নেমেও আসছে অনেকে। তাকে ডাকাডাকি করেছে। সে ওপরে ওঠার কোনও মেজাজ পায়নি। সে কেন যে এ-ভাবে জড়িয়ে পড়ল।

না আর দেরি করা ঠিক হবে না। যা হয় হবে—চার্লির কেবিনে না যাওয়া পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই। চার্লি একবার খোঁজ নিতে আসতে পারত। বোধহয় কোনও অসুবিধা আছে তার। বরং সে গেলে দৃষ্টিকটূ দেখাবে না। কাপ্তান এত রাতে বিশ্বাস করে চার্লির কেবিনে পাঠাতে পারেন যখন...।

সে উঠে গেল উপরে। মেসরুমে সবাই ব্যস্ত। গামলায় মুরগির মাংস, বড় বড় গলদা চিংড়ি ছাড়ানো। নারকেল কোরা। সরু চাল বেছে একটা গামলায় আলাদা রেখে দেওয়া—বিরিয়ানি হবে হয়তো। কনডেনস মিল্কের কৌটো সাজানো—পায়েস হবে হয়তো—অথচ তার কিছুতেই আগ্রহ নেই। সে এমনকি মেসরুমে চুপি দিয়েও দেখল না। সহসা কেন সবই এত অর্থহীন হয়ে গেছে সে বুঝতে পারে না।

সুরঞ্জনও বসে গেছে। আলুর খোসা ছাড়াচ্ছে। সুহাসবাবু সেজে উঠে আসায় রসিকতাও করল, 'এই যে আমাদের গেস্টের যা হোক পাত্তা পাওয়া গেছে! চললি কোথায়!'

'আসছি' বলে সুহাস সুরঞ্জনকেও এড়িয়ে গেল।

'আরে যাচ্ছিস কোথায়!'

সুরঞ্জন আলুর খোসা হাতে নিয়েই ছুটে এল।

'কোথাও না।'

'কোথাও না মানে।'

'বোট-ডেকে যাচ্ছি।'

সুরঞ্জন বলল, 'বোট ডেকে যাচ্ছ যাও, সেখানে জমে যাবে না। ফিরে এসে কাজে হাত লাগা।

দেখছিস না এলাহি ভোজ হচ্ছে। বসে থাকলে চলবে! তোমার তো আমরা কেউ নই। একবার বলতেও পার না, চার্লির কাছে যাচ্ছ। চার্লির কাছে গেলে কি আমরা খেয়ে ফেলব। একেবারে ভেড়া বনে গেলি! আমাদের কোনও দাম নেই!'

সুহাস হাসল। গায়ে মাখল না। এটাও এক ধরনের ক্যামোফ্লেজ করে রাখা—কারণ সুরঞ্জন সবই জানে। ঠাট্টা হোক, গম্ভীর চালে হোক কিংবা দরদ দিয়েই হোক তার ত্রিশঙ্কু অবস্থার কথা টের পেয়ে মুখার্জিদাকে বলেছে, 'দেবীরূপেণ সংস্থিতা। সুহাসকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। তোমার হলে কি করতে! অযথা গালমন্দ করছ!'

সুহাস যে খুবই অন্যমনস্ক তার হাঁটার ভঙ্গি দেখেই টের পাওয়া যায়। সে উঠেও গেল। সিঁড়ি ধরে বোট-ডেকে উঠে চার্লির কেবিনে কড়া নাড়ল। চার্লি নেই। লাইফবোটের পাশে ডেকচেয়ারে চুপচাপ বসে আছে চার্লি। হাতে তার একটা সদ্য আঁকা ক্যাকটাস। সামনে ইজেল। এত সব ঘটে যাবার পরও চার্লি ছবি আঁকার কথা ভাবতে পারে। তার কিছুটা অবাক হবারই কথা। চার্লি কি বুনোফুলের ছবি আঁকতে পারলে সব দুঃখ ভুলে থাকতে পারে! প্রায় নিঃশব্দে সে চার্লির পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। চার্লি ছবিটা দেখতে দেখতে কেমন মজে গেছে। ক্যাকটাসটা ডালপালা মেলে দিয়েছে। বিশাল দুটো রঙিন পাথর এনামেল রঙের—কোথাও খয়েরি এবং হলুদ রঙের সমাবেশ। ক্যাকটাসের ডালে আশ্চর্য নীল সাদা দুটো ফুল। নিচে লিখে রেখেছে ব্ল্যাক চোল্লা। ক্যাকটাসটা এত সজীব। আর ঊষর অঞ্চলের আভাস ফুটিয়ে তুলেছে মাত্র কয়েকটা রেখা টেনে। আরও সব পাশে পাথরের খাঁজে খাঁজে রঙিন ফুলের বাহার। কোন্টার কি নাম নিচে অবশ্য কিছু লেখা নেই।

সুহাস ডাকল, 'চার্লি!'

চার্লি মুখ ঘুরিয়ে সুহাসকে দেখল। তারপর ছবিটাব দিকে তাকাল। তারপর থেমে থেমে বলল, 'অল মাই লাইফ আই হ্যাভ লাইকড ওয়াইলড ফ্লাওয়ারস—কিছু ভাল লাগছে না সুহাস। কি যে করব! মাথা কেমন করতে থাকে। বসে বসে এই কিছু করা। তুমি কি কিছু বলবে!'

'ছবিটা দেখি!'

চার্লির গুণগ্রাহী সে। বলল, 'দারুণ এঁকেছ। সারা ঊষর অঞ্চলে ফুল ফুটিয়ে রেখেছ দেখছি। দারুণ। এটা আমি নেব। দেবে তো! ঊষর অঞ্চলে সব সময় ফুল ফুটিয়ে রাখা তো খুবই কঠিন।'

'দেব না কেন! সত্যি তুমি নেবে?' যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না সুহাসের কথা।

আসলে সুহাস কিছুটা নিজেও স্বাভাবিক থাকতে চায়। এ সব কথা বলার জন্য এখানে সে আসেনি। তার তো খবর নেবার কথা ডরোথি ক্যারিকোর কোনও ছবি আছে কি না। তাদের পারিবারিক অ্যালবামের খবরও নিতে বলেছে।

চার্লি উঠে দাঁড়াল। তার ঘাড়ে হাত বুলিয়ে বলল, 'লাগছে?'

'সামান্য। সেরে যাবে। চিন্তা কোরো না। ভিতরে যাবে?'

ছবিটা নিয়ে সে সুহাসের সঙ্গে কেবিনে ঢুকে গেল। সুহাস ভিতরে ঢুকলে চার্লি বলল, 'মুখার্জি বের হয়ে গেল কেন?'

সুহাস পাশের সোফায় বসে বলল, 'হরসাগামে যাবে বললেন। কি যে করছেন! তবে সবই তো দেখছি মিলে যাচ্ছে। মুখার্জিদা আগেই টের পেয়েছিলেন, তুমি মেয়ে। আমার বিশ্বাস হত না। তিনি তো ঠিকই বলেছেন। মুখোসটার খবর কিছু রাখ?'

'না।' চার্লি ছবিটার চার কোনায় পিন গেঁথে দিচ্ছে।

'মুখার্জিদা ধরে ফেলেছেন! সেকেন্ড মুখোসটা পরে অনুসরণ করত। এখানেও করছে। মুখোস পরার দরকার কেন আমরা কেউ বুঝতে পারছি না। তবে মগড়াকে নিয়েও বোধহয় সংশয় আছে। আচ্ছা কাল যা হল—লোকটা কি তোমার চেনা?'

'না না, আমি কাউকে চিনি না।' কেমন ভীতবিহ্বল গলায় চার্লি চিৎকার করে উঠল। তারপর কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়ল।

'তুমি ভয় পাচ্ছ কেন! আমরা আর একা নই। বুঝতে চেষ্টা কর। তোমার চোখ মুখ কেন এত

বিহ্বল দেখাচ্ছে। কি কারণ খুলে বল। মুখার্জিদা তো বললেন, তুমি সব কিছু বলছ না—কেন বেটসি খুন হয়েছে ভাবছ। কেন, বুড়ো মানুষের মুখ দেখলে তুমি ভিরমি খাও, বুড়োমানুষের মুখ তোমাকে তাড়া করে—তিনি কি তোমার পিছু নিয়েছেন, সেকেন্ড কি জানে, বুড়োমানুষের মুখ দেখলে ভয় পাও! তোমাকে ভয় দেখিয়ে তার কি লাভ!'

'সুহাস আমাকে কেন পীড়ন করছ। প্লিজ, আমাকে পীড়নে ফেলে দিয়ো না। মাথা ঠিক রাখতে পারি না। আমি চাই না, তুমি ছাড়া আর কেউ জানুক, আই অ্যাম টল, স্লিম অ্যান্ড ফুল ব্রেস্টেড। তুমি আমাকে ইচ্ছে করলে রক্ষা কবতে পার। আমি ভয় পাই সুহাস, দ্য টাইম ইজ কামিং, ইন ফ্যাক্ট ইট ইজ হিয়ার, হোয়েন ইউ উইল বি স্ক্যাটার্ড, ইচ ওয়ান রিটার্নিং টু হিজ ওন হোম—লিভিং মি অ্যালোন।
'

'কেন তুমি এত একা বোধ করছ। কেন তোমাকে একা ফেলে সবাই চলে যাবে! দেশে ফিরে গেলে— তোমার বুনো ফুলের সাম্রাজ্যে আবার ঘোড়া ছুটিয়ে দিতে পারবে। ইস কি মজা হবে।'

কথা ঘুরিয়ে দেবার জন্য চার্লি বলল, 'সকালে কি খেলে!'

'খেয়েছি। ফিল তার খামার থেকে চিংড়িমাছ মুরগি পাঠিয়েছে। পিছিলে ভোজ হচ্ছে। মেটে সেদ্ধ, এক কাপ চা।'

চার্লি ফোন করল সার্ভিস রুমে।

কাপ্তানবয় এলে বলল, 'দু-গ্লাস ব্লু চেরিজ জুস।'

চার্লি অন্য প্রসঙ্গে চলে যেতে চাইছে।

সুহাস তবু নাছোড়বান্দা।

'আমি একা কেন টের পাব, ইয়ো আর ফুল ব্রেস্টেড। সেই লোকটাও তো দেখেছে। তুমি নাকি সেই গুঁফো লোকটাও জানে।'

চার্লিব যেন গা কাঁটা দিয়ে উঠল। জলে ডুবে যাবার মতো দু'হাতে যেন কোনও অবলম্বন খুঁজছে। সে বসে পড়েছে বিছানায়। খুব ঘামছে। কোনওরকমে যেন বলল, 'সুহাস, আজ কিন্তু আমরা বের হচ্ছি না। বাবা বিকেলে বের হয়ে যাবেন। তুমি চলে এস।'

'কোথায় যাচ্ছেন?'

'রিফ এক্সপ্লোরারে।'

'তোমাকে বলেছেন, রিফ এক্সপ্লোরারে যাবেন। তিনি একা যাচ্ছেন না সঙ্গে কেউ যাচ্ছে।'

'চিফমেট যাবেন। সেকেন্ডমেটও যেতে পারেন। ওখানে তাঁরা ডিনারে যোগ দেবেন।'

রিফ এক্সপ্লোরার জাহাজটির খবর মুখার্জিদাও জানে। এত সব খবর তিনি আগে থেকে পান কি করে। জাহাজে সমুদ্রতলের কিছু বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি আছেন। হয়তো 'কলিজ' জাহাজের খোঁজখবর করতেই যাওয়া। ডিনারে যে বাহানা নয় কে বলবে। সুহাস ব্লু চেরি জুসের গ্লাস মুখের কাছে নিয়ে ফের কি ভেবে রেখে দিল। যেন এক্ষুনি না বলতে পারলে পরে ভুলে যেতে পারে।

সে বলল, 'কলিজ সম্পর্কে তুমি কিছু জান চার্লি। না মানে, ছবি-টবির কথা নয়। জাহাজের লাউজের ছবি, কলিজ ডুবছে তার ছবি দেখিয়েছ। তার আগের ছবিও। কেবিন, লাউজ, এলিওয়ে, বিলোডেকের ছবি পর্যন্ত। আমি বলতে চাই, কলিজ সমুদ্রের তলায় ডুবে যাবার পর কোনও অনুসন্ধানকারী দল ছবি-টবি যদি জলের নিচ থেকে তুলে নিয়ে যায়। যত গভীরই হোক, তিন চারশ ফুট জলের নিচেও শুনেছি স্বচ্ছ কাচের মতো সব পরিষ্কার। ছবি তোলা কঠিন না। অবশ্য আমি সঠিক কিছু জানিও না। সম্ভব কি অসম্ভব তাও জানি না।'

চার্লি বলল, 'আমিও কি জানি! বই-টই পড়ে যতটুকু জেনেছি। শুধু এটুকু জানি, কলিজ ওয়ানস এ লাকসারি লাইনার অ্যান্ড দেন এ ওয়ারসিপ, হ্যাজ বিকাম অ্যা মিউজিয়াম অফ ওয়ারস গ্রেট ওয়েস্ট।'

সুহাস বলল, ' 'কলিজ' কত টনের জাহাজ জান? তুমি যা দিয়েছিলে তাতে বোধহয় কত টনের জাহাজ উল্লেখ ছিল না।'

'দাঁড়াও।' বলে চার্লি দরজা খুলে বের হয়ে গেল। দরজা বন্ধ করল না! সুহাস ঘরে আছে, দরজা বন্ধ করার দরকারও নেই। কোথায় বের হয়ে গেল, তাও বুঝল না। সে তার বাবার কেবিনে যেতে পারে। সে স্বাভাবিক থাকলে বাবাও তার কেমন নিরীহ গোবেচারা মানুষ। ভদ্র, শান্ত, ঈশ্বরবিশ্বাসী।

সুহাস ভাবল ডরোথি ক্যারিকো সম্পর্কে এক্ষুনি কোনও প্রশ্ন করা চলবে না। চার্লি কোনও বিপদের গন্ধ পেতে পারে। বিপদের গন্ধ পেলে সতর্ক হয়ে যেতে পারে। জাহাজ সম্পর্কে কৌতূহল থেকেই বিশেষ করে কোনও বিশাল জাহাজ সমুদ্রের অতলে ডুবে গেলে, তার কি চেহারা দাঁড়ায়—বছরের পর বছর সমুদ্রগর্ভে ডুবে থাকলে নোনাজলে জাহাজ ক্ষয় পেতেই পারে—তারপর একদিন সব ঝুর ঝুর কবে যে ঝরে যাবে না—তাও তো বলা যায় না। সমুদ্রগর্ভে বিশ পঁচিশ পঞ্চাশ একশ বছর পর জাহাজের কি পরিণতি হয় জানার কৌতূহল থেকেই যেন সে কলিজের পরিণতি জানার আগ্রহ বোধ করছে।

চার্লি খুব উৎসাহ নিয়ে উঠে গেছে। সুহাসের এত আগ্রহ—চার্লি স্থির থাকে কি করে! সে হয়তো খুঁজছে। তার বাবা যদি কেবিনে থাকেন তিনিও তাকে সাহায্য করতে পারেন। তবে 'কলিজ' সম্পর্কে কোনও সংশয় সামান্য একজন জাহাজির মনে কেন উদ্রেক হতে পারে এমন অবিশ্বাস একজন দুর্ধর্ষ কাপ্তান অনুমান নাও করতে পারেন।

চার্লিকে যে এতটা মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে, চার্লি যার এত বশীভূত তাকে খুশি রাখার জন্য তিনি চার্লিকে সাহায্য করতে পারেন। আর, তখনই কেন যে মনে হল রাতে দরজা খুলে তো সে তাঁকেই দেখেছিল—তিনি দাঁড়িয়ে আছেন—সেই সি-ডেভিল লুকেনারের মতো। হিমশীতল চেহারা। ঠাণ্ডা গলায় বলেছিলেন, মেনি থ্যাঙ্কস। আর সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডে রক্তের চাপ বেড়ে যাচ্ছিল।

মূর্ছা গেলেও খুব অস্বাভাবিক মনে হত না। কে জানে, সি-ডেভিল লুকেনারের প্রেতাত্মা যদি সত্যি কাপ্তানের উপর ভর করে তবে তো তিনি সহজেই টের পাবেন—কলিজ সম্পর্কে এত খবব নেবার উৎসাহ কেন!

চার্লি ঢুকেই বলল, 'আছে। সব আছে। ছবিগুলি রিফ এক্সপ্লোরারই পাঠিয়েছে। এই দ্যাখ।' কি খুশি চার্লি। ছবিগুলি একটা বড় খামের ভিতর।

সুহাস বলল, 'জাহাজটা কত টনের!'

বাবা তো বললেন, 'আটাশ হাজার টনের।'

'সে তো বিশাল জাহাজ!' সুহাস অবাক চোখে তাকিয়ে আছে।

সুহাস তাকিয়েই আছে!

'ছবিগুলি দ্যাখ।' বলে চার্লি টেনে খাম থেকে বের করছে।

সুহাস বলল, 'কলিজ কি তোমাদের প্রমোদতরণী ডরোথি ক্যারিকোর চেয়ে বড়।'

'না। ডবোথি ক্যারিকো জাহাজও আটাশ হাজার টনের। এত বড় জাহাজ—খুব কমই ছিল। দাদু তার সব উজাড় করে জাহাজটা তৈরি করেছিলেন। কি ছিল না জাহাজে, বার, ক্যাসিনো, বলরুম, সুইমিং পুল, লাউঞ্জ—সব। লাউঞ্জে ছিল দুর্লভ গ্রিক রোমানশৈলিতে তৈরি মূর্তিভাস্কর্য। আচ্ছা তুমি মিকেল-এঞ্জেলার নাম শুনেছ?'

'না।'

'র‍্যাফেলের নাম?'

'তিনি আবার কে!'

চার্লির মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। কিন্তু কোনও অবজ্ঞা নয়। যেন এই সরল নিষ্পাপ তরুণের পক্ষে পৃথিবীর আর কোনও নামই মহার্ঘ নয়। সে ছাড়া। চার্লি ছাড়া তার কাছে সব নামই অর্থহীন। চার্লি বলল, 'যদি কখনও রোমে যাও দেখতে পাবে ক্লাসিসটিক প্রথায় তৈরি অপূর্ব সব মিউজেসের মূর্তি—সক্রেটিস, সোফোক্লিস আরও সব নাম! আমিও মনে রাখতে পারি না।' চার্লি তার দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। তাকে দেখছে। কোনও মিউজিসের মূর্তির মতো কি তাকে দেখাচ্ছে! না হলে

মেয়েটা এত অবাক হয়ে তাকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করবে কেন?

সুহাস চার্লির এই অপার কৌতূহলে কেমন মজে গেল। বলল, 'তুমি কোথায় দেখলে এ সব?'

'রোমে। রোমে না গেলে জানব কি করে! জাহাজ সিসিলিতে গেলে বাবা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সব ঘুরে ঘুরে দেখেছি। পৃথিবীর যত জায়গায় যাও, যত শিল্পকীর্তিই দেখ না রোমে না গেলে সব অর্থহীন। আমি তোমাকে নিয়ে যাব। এথেন্সের ভাস্কর অ্যাপোলোনিয়াসের মূর্তিটি তোমাকে দেখাব। বোরগিজ গ্যালারিতে তোমাকে নিয়ে যাব। 'দ্য রেপ অফ প্রোসরপিনা' বলেই চার্লি কেমন কাঁপতে থাকল। তার শরীর থর থর করে কাঁপছে।

'এই, এই, চার্লি চার্লি! কি হল তোমার। রেপ বলছ কেন! প্রোসরপিনা কি। আমি কিছু বুঝছি না। তোমার চোখে জল কেন! মূর্তিটিতে কি আছে! আরে কথা বলছ না কেন! তোমার যে মাঝে মাঝে কি হয়!'

চার্লি বলল, 'দানব।' আর কিছু বলল না।

'দানব! কে সেই দানব!'

'জানি না। চার্লি গুটিয়ে গেল। ধীরে ধীরে বলল, 'একজন সুকুমারীকে রেপ কবার সময় মুখের কি চেহারা হয় না দেখলে বুঝতে পারবে না।'

'বাদ দাও তো! আমি রোমে যেতে চাই না। রোমে গিয়ে আমার কি হবে। আমাকে দেখাতে হবে না! রোমে গিয়ে কাজ নেই।'

'তুমি না দেখলে যে বুঝতে পারবে না, কি কুৎসিত জঘন্য আর বীভৎস দানব অসহায় এক কুমারীকে উলঙ্গ করে দিয়ে কাঁধে ফেলে পালাবার চেষ্টা করছে। তুমি না দেখলে কুমারীর সেই অসহায় করুণ আর্তনাদ যে বুঝতে পারবে না সুহাস। মূর্তির আসল মানে আমার মনে নেই। কোঁকড়ানো চুলের ভিতর গভীর অতলে মুখগহ্বর, সিংহের মতো মুখ। চোখে আগুন। মূর্তির সামনে আমি মূর্ছা গিয়েছিলাম। একটা কুকুর পায়ের নিচে বসে 'ঘেউ ঘেউ' করছে। দেখা যায় না। নরক!'

সুহাস কথার মোড় ঘোরাতে চাইছে। কিন্তু কেন যে সে চার্লিকে আর আয়ত্তে আনতে পারছে না। চার্লি অবিন্যস্ত হয়ে উঠছে যেন। গেল বুঝি সব। সে বলল, 'আর কি কি দেখলে।'

'যাকগে।' চার্লি বোধহয় দৃশ্যটা ভুলতে চাইছে। সে বলল, 'জান অ্যাপোলোনিয়াসের মূর্তিটির মজবুত শরীর এবং গঠন মিকেলএঞ্জেলোকে এতই অভিভূত করেছিল, পোপের কথায়ও তিনি কান দেননি। পোপ শিল্পীর মূর্তির গঠন পুনরুদ্ধারে মনোযোগী হতে বলেছিলেন। তাঁর এক জবাব—হয় না।'

তারপরই চার্লি বলল, 'তুমি দাঁড়াও।'

সে দাঁড়ালে চার্লি দরজা লক করে দিল।

চার্লি তার গা থেকে জামা খুলে নিচ্ছে। তারপরে সে প্যান্ট খুলতে চাইলে সুহাস বলল, 'না না ছিঃ এটা কি করছ! কি পাগলামি শুরু করলে!' কেমন কাতর চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে চার্লি। সে কি জ্যান্ত কোনও মিউজেসের মূর্তি দেখার জন্য অধীর হয়ে উঠছে! সে কি অস্থির হয়ে উঠছে—মূর্তিটি সামনেই আছে—খুলে দেখলেই হল! শুধু সুহাস রাজি হলেই তার দুঃখ থাকবে না।

'প্লিজ সুহাস। আমি তোমার কোনও ক্ষতি করব না। তুমি নিষ্পাপ থাকবে। আমি শুধু মূর্তিটি তোমাব মধ্যে আবিষ্কার করতে চাই।'

সুহাস আর বাধা দিল না। চার্লির কথামতো ঘাড় বাঁকিয়ে হাত শক্ত করে রাখল বুকেব উপর। ওর জানুদেশের পেশি ফুলে উঠল। নাভিমূলের নীল নরম উলের উষ্ণতা ভেদ করে সে সজীব হয়ে উঠতে চাইল কোনও গ্রিক দেবতার মতো। তার হাসিও পাচ্ছিল। এই এক মজা চার্লির সঙ্গে। যেন সে চার্লির সঙ্গে মজা করছে। মজা করছে বলেই স্বাভাবিক থাকতে পারছে। তার শরীরে চার্লি যেন কি খুঁজে বেড়াচ্ছে।

তার সুড়সুড়ি লাগছিল।

আসলে চার্লি তার শরীরের ভাঁজে ভাঁজে কোনও গ্রিক মূর্তির সৌন্দর্য খুঁজে বেড়াচ্ছে। সুড়সুড়ি

দিচ্ছে মনে হবে। আলতো হাতে তাকে স্পর্শ করছে। শিল্পী যেমন মূর্তিটির সৌন্দর্য যাচাই করে, চার্লি প্রায় অনুরূপ ভাবভঙ্গি করে যাচ্ছে। আর এত গম্ভীর যে হাসলেও অপরাধ হয়ে যাবে।

চার্লি তার বাঁ হাত উপরে তুলে দিল। কলের পুতুলের মতো সে যেন চার্লির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ডান হাত নিচে নামিয়ে বলল, 'না না, এ ভাবে না! তুমি কি! কিছু বুঝতে পারছ না। ঠিক আছে।' কিছুটা সরে গিয়ে ফের বলল, 'ডান কাঁধ উঁচু কেন! আর একটু নামাও। আর একটু। ঠিক আছে।'

'পেশি শক্ত কর।' চার্লি পেশি টিপে দেখল।

'হচ্ছে না।'

চার্লি বাঁ পাটা সরিয়ে দেবার ইশারা করল।

'হ্যাঁ ঠিক আছে। নড়বে না।'

চার্লি তার স্কেচ করছে।

সুহাসের হাত পা ধরে যাচ্ছে। এতক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায়? কি যে করে!

স্কেচ শেষ করে চার্লি উঠে দাঁড়াল। সুহাসকে আনন্দে জড়িয়ে ধরল। বলল, 'হ্যালেলুজা! থ্যাঙ্ক ইয়ো, লর্ড। হাউ গুড ইয়ো আর।'

সুহাস জামা প্যান্ট পরে ভাবল, পাগল। সত্যি পাগল। কি যে হয়!

তবু সুহাস সৌজন্য রক্ষার্থে বলল, 'খুশি!'

কেন যে হঠাৎ মুখ নিচু করে ফেলল চার্লি! কেমন এক সঙ্কোচ এবং লজ্জায় সে সুহাসের দিকে তাকাতে পারছে না। বিহ্বল হয়ে পড়ার মতো। সুহাস ডাকল, 'চার্লি কি হল!'

'কিছু না।' চার্লি বোধহয় আবার নিজের মধ্যে ফিরে আসছে। বলল, 'দেখবে না?'

কি দেখাতে চাইছে চার্লি। আবার কি সে চায় সেই নির্জন বালিয়াড়ির মতো সে চার্লির সব কিছু দেখুক। সুহাস উত্তেজনায় অধীর হয়ে পড়ছে। আর তখনই চার্লি তার স্কেচটি সুহাসের সামনে মেলে ধরল। সুহাস বুঝল, চার্লি চায় তার সব স্কেচ সুহাস দেখুক। সে অন্য কিছু দেখাতে চায় না।

সুহাস লজ্জায় পড়ে গেল—'খুব সুন্দর। দারুণ। আমি এত সুন্দর দেখতে বিশ্বাস হয় না।'

'ধুস, সুন্দর না, ছাই।' বলে এক ঝটকায় স্কেচটি কেড়ে নিলে সুহাস বলল, 'রাগ করলে!'

'না না। রাগ করব কেন। তুমি কি সুন্দর, সুহাস তুমি জান না।' বলে, সে চলে গেল লকারের সামনে। লকার খুলে তুলে রাখল স্কেচটি। লকার বন্ধ করে বলল, 'এস, দেখবে।

সুহাস চার্লির পাশে বসলে, খাম থেকে রিফ এক্সপ্লোরারে তোলা ছবিগুলি বের করে দেখাতে থাকল।

সুহাস বলল, 'কলিজকে তো চেনাই যায় না। এত বনজঙ্গল গজিয়ে ফেলছে শরীরে। আমি তো ভাবলাম বারো চোদ্দ বছরে নোনা লেগে জাহাজ ঝুরঝুরে হয়ে গেছে।'

চার্লিও বোধহয় অবাক। ছবিটি দেখতে দেখতে বলল, 'আসলে জান সুহাস ডেথ ডু নট প্রিভেইল আন্ডার দ্য সি ফর ডিকেডস। তাই না, না হলে জাহাজের গায়ে বনজঙ্গল গজিয়ে যাবে কেন! অ্যাজ সুন অ্যাজ দ্য কলিজ হ্যাড ডাইড, দ্য সি হ্যাড বিগান টু গিভ ইট এ নিউ লাইফ। কি ঠিক বলছি না!'

'ঠিক ঠিক। সমুদ্র তার নিজের মতো করে সব বাঁচিয়ে রাখে।'

চার্লি বলল, 'দেখছ না, জাহাজের গায়ে শ্যাওলা জমে গেছে। কত সব রঙ-বেরঙের স্পঞ্জ। ঘাসে কত বিচিত্র বর্ণের ফুল ফুটে আছে। জাহাজ নিজেই এখন প্রবাল প্রাচীর। যুদ্ধের লিভিঙ মনুমেন্ট। দ্য সিপ হ্যাভ বিকাম এ রিফ, এ ফেস্টিভ গার্ডেন হোম ফর থাউজেন্ডস অফ ক্রিয়েচারস। কত সব মাছের ঝাঁক—উড়ছে, ঘুরছে, ফিরছে। নেচে বেড়াচ্ছে।'

চার্লি কথা বলছে, আর মাঝে মাঝে সুহাসকে চুরি করে দেখছে। সুহাস ছবিটা থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না।

চার্লি যেন সুহাসকে সজাগ করে দেবার জন্য সামান্য ঠেলা মেরে বলল, 'কি দারুণ লাগছে। দ্যাখ ডেকে সেই বুনো ফুলের ছড়াছড়ি।'

সুহাস মজা করে বলল, 'সমুদ্র দেখছি তোমার মতোই গোপন প্রেমিক। তোমার মতোই বুনো ফুলের জন্য পাগল!'

'ধ্যাত!'

'আরে রাগ করছ কেন!'

'দ্যাখ না। কি সুন্দর না। খাঁজকাটা পদ্মপাতা অসংখ্য। দ্যাখ চিত্রকরের সব তুলির টান—ওঃ দারুণ। কত সব ক্যাকটাস। জলজ ঘাসের ছবি এটা। দ্যাখ না। মনে হয় না সমুদ্রের নিচে আগুন ধরে গেছে!'

'তাই তো! দেখি দেখি!' বলে সুহাস চার্লির বুকের কাছে ঝুঁকে পড়ল। ছবিগুলি চার্লির হাতে।

সুহাস ছবিগুলি দেখে সত্যি মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। সে যে ছলনা করে চার্লির কাছ থেকে গোপন খবর পাচাব করার তালে আছে ভুলেই গেছে।

সুহাস বলল, 'তাবিফ করতে হয়, ক্ষমতাও আছে। সমুদ্রের এত গভীরে ডুবে যায় কি করে! কি করে সমুদ্রের অতল থেকে এমন সব সুন্দর দুর্লভ ছবি তুলে আনে ডুবুরিরা! হোক না ডুবুরি! আচ্ছা যদি হাঙ্গর তাড়া করে!'

'হাঙ্গর তাড়া করে কি না, আমি কি জানি। আমাকে কি বলেছে, হাঙ্গর তাড়া করলে ডুবুবিরা কি ভাবে আত্মরক্ষা করে। এমন সব কথা বলো না, যেন আমি সবজান্তা।'

চার্লির অকপট কথাবার্তায় সুহাসেব খুবই খাবাপ লাগছে—ছলনা করে চার্লির কাছ থেকে কি গোপন খবর সে উদ্ধার করতে পারবে? যা দিয়েছে, সরল বিশ্বাসেই সুহাসের হাতে তুলে দিয়েছে। কোনও কপটতা ছিল না। তবে চার্লি এখনও নিজেকে বহস্যাবৃত করে রেখেছে। কেন রাখছে কিছুতেই বুঝতে পাবছে না। এতটা ধরা দেবার পরও কেন বলে, দ্য টাইম ইজ কামিং, ইন ফ্যাকট ইট ইজ হিয়ার! কেন বলে, ইচ ওয়ান রিটার্নিং টু হিজ ওন হোম—লিভিং মি অ্যালোন!

ইট ইজ হিয়ার! হিযার বলতে কি জাহাজ বোঝাতে চায়—না টেকসাসের ক্যাডো লেক বোঝাতে চায। লিভিং মি অ্যালোন, বলতে কি সে তার সেই বনবাসে ফিরে যাবে। নিঃসঙ্গ একাকী জীবন তার! ইচ ওয়ান বলতে কি পরোক্ষে তাকেই বলতে চায, সেও তাকে ফেলে চলে যাবে! সেই নিঃসঙ্গ জীবনে বুনো ফুলের পৃথিবী ছাড়া আর কেউ থাকবে না! শুধু বনজঙ্গল, ঊষব অঞ্চল আর বুনোফুলের বাজত্বে চার্লিকে কি নির্বাসনে রাখা হবে!

চার্লি যে তাব পাশে বসে একের পর এক ছবি দেখিয়ে যাচ্ছে খেয়ালই নেই। কত কথা বলছে। সে হুঁ হাঁ এই পর্যন্ত—ছবি নিয়ে কোনও মন্তব্য করছে না।

চার্লি হঠাৎ ছবিগুলি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'কি হয়েছে তোমার বল তো? ভাল লাগছে না। ছবিগুলি তুমি দেখছ না কেন?'

'আরে দেখছি তো! কি যে করো না।'

সুহাস হাঁটু গেড়ে ছবিগুলি তুলে নিচ্ছে। জড়ো করছে ছবিগুলি।

'আমি ঠিকই দেখছি!' সুহাস নিস্পৃহ গলায় বলল।

'ছাই দেখছ! আমি কিছু বুঝি না মনে করো। তুমি পছন্দ করছ না। কি সব সুন্দর ছবি—আর তুমি কেমন আগ্রহ হারিয়ে ফেলছ। খারাপ লাগে না বলো!'

'ছবিগুলো কে দিল!'

'বললাম না, রিফ এক্সপ্লোরার ছবিগুলি বাবাকে প্রেজেন্ট করেছে। তাদের ডুবুরিরা ছবিগুলি তুলে এনেছে। কতবার এক কথা বলব।'

'হ্যাঁ তাই তো! আচ্ছা ছবিগুলির মধ্যে লাউঞ্জের কোনও ছবি নেই তো।'

'লাউঞ্জ!'

'আরে তুমি আগে কলিজের ছবি দিয়েছিলে না—বা রে! মনে করতে পারছ না—জাহাজের লাউঞ্জে দুই গ্রিক দেবীর ভাস্কর্য আর একটা একসিঙ্গি ঘোড়া—এবারে কি ডুবুরিরা তার কোনও ছবি তোলেনি! ডুবুরিরা কি লাউঞ্জের ছবি তোলেনি? জাহাজের এত সব ছবি দেখলাম, কই এবারে তো

লাউঞ্জের ছবি দেখলাম না। দেখতে ইচ্ছে হয় না! সমুদ্রে ডুবে গিয়ে লাউঞ্জের কি পরিণতি! তোমার ঠাকুরদা বুনো ফুল ভালবাসতেন—লাউঞ্জে নিশ্চয়ই বুনো ফুলের রাজত্ব হয়ে গেছে। তুমিই তো বলেছ সমুদ্রের গভীরে মৃত্যু চিরদিন বিরাজ করে না! কি বলনি! সমুদ্র আবার তাকে নিজের মতো সাজিয়ে তোলে। প্রবাল প্রাচীর গড়ে দেয়। 'কলিজ' জাহাজের লাউঞ্জটি যে এখন সমুদ্রের লিভিং মনুমেন্ট হয়ে নেই কে বলবে! কি বল! এখন কথা বলছ না কেন, চুপ করে আছ কেন! দুর্লভ সব ভাস্কর্যে লাউঞ্জটি সাজিয়েছিলেন তোমার ঠাকুরদা। কি ঠিক বলছি কি না! সমুদ্র তার ইচ্ছেমতো নিশ্চয়ই লাউঞ্জটি জলের অতলে সাজিয়ে রেখেছে, নানা রঙিন স্পঞ্জে কিংবা শ্যাওলার রাজত্ব গড়ে উঠেছে, কই কোনও ছবিতেই তার কোনও সাক্ষ্য নেই!'

'নেই! দেখেছ ভাল করে!'

'দেখেছি!'

চার্লি তার ঠোঁট দাঁতে কামড়ে ধরল। কোনও গূঢ় চিন্তা মাথায় এলে চার্লির এটা অভ্যাস। তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাবা যে বললেন, সব ছবি এতে আছে। কলিজ জাহাজটির খোঁজ রিফ এক্সপ্লোরার আগেই পেয়েছে। শুধু সমুদ্রে কলিজই তো ডুবে নেই, আরও কত জাহাজ, বোমারু বিমান। বাবাকে তো চিঠিতে কলিজ সম্পর্কে জানিয়েছে, অ্যাজ উই ডোউব থ্রো ফরটি ফিট, দেন ফিফটি ফিট, দেন সিক্সটি ফিট অফ সিলটি ওযাটারস দ্যাট সিমড লাইক টেপিড শ্যাম্পু, উই কুড শি হার লাইং অন হাব সাইড, লাইক এ মর্টেলি উন্ডেড বার্ড কাম টু ফাইনাল রেস্ট অন এ কোরাল স্লোপ।'

'চিঠিটা দেখাতে পাব!' সুহাসের মধ্যে ফের গুপ্তচরবৃত্তি কাজ করছে।

'কোথায় বাবা রেখেছেন, জানব কি করে? আচ্ছা দাঁড়াও বাবাকে জিজ্ঞেস করি।' বলে ছুটতেই সুহাস তার হাত ধরে ফেলল। বলল, 'থাক যেতে হবে না। কি হবে চিঠি দিয়ে। তোমাব কথাই যথেষ্ট। তবে কি জানো?' বলে, দম নিল সুহাস, 'এত ছবি তুলেছেন, লাউঞ্জের ছবি তোলেননি বিশ্বাস হয না।'

'আমি তোমার সঙ্গে একমত।' চার্লি সুহাসকে সমর্থন করায় কিছুটা যেন সে লঘু হতে পারছে।

'চিঠিটা কবে দিয়েছে, আই মিন চিঠিটি তোমাব বাবা কবে পেয়েছেন!'

'কাল। কাল মানে দুপুরে যখন বের হচ্ছি তখনই দেখলাম, মিঃ জর্জ লুমিস হাজির। রিফ এক্সপ্লোরারের ফটো বিশেষজ্ঞ। দুর্লভ এবং দুর্মূল্য ছবিগুলি পাবার পরই বাবার মাথা গরম হয়ে গেল! পাগলের মতো জাহাজে কি বিশ্রী কাণ্ড! ভাবতেও লজ্জা হয়। রাতে তো দেখলে!'

সুহাসের বলার ইচ্ছে হল, তুমিও কম যাওনি। কিন্তু বলল না।

আসলে ছবিটি তিনি সরিয়ে ফেলেছেন। লাউঞ্জের রহস্য তবে সেই ছবিতে ধরা পড়েছে। তিনি পাগলের মত যা তা করে এখন হয়তো ডিনারেব নাম করে নিজে স্বচক্ষে কিছু দেখতে চান। তাই রিপ এক্সপ্লোরারে যাবেন।

সুহাস বলল, 'ডরোথি ক্যারিকোর উপর কোনও বই-টই মানে প্রচার পুস্তিকার খবব কিছু বাখ?'

চার্লি বলল, 'এখন লাগবে? এনে দেব! আছে। ডবোথি ক্যারিকোর উপর ঠাকুরদা নিজেই একটা বই লিখেছেন। কারণ জাহাজটি তো তাঁর জীবন এবং বাণী। এনে দেব!' বলে চার্লি তাব বাবাব কেবিন থেকে বইটি এনে সুহাসের হাতে দিল।

সুহাস বোট-ডেক থেকে ছুটে আসছে। ডরোথি ক্যারিকো জাহাজের ওপর যখন বইটা পাওযা গেছে, তখন আর ভাবনা কি! মুখার্জিদা শুনে খুবই খুশি হবেন। চার্লি তাকে দরজায় দাঁড়িয়ে বিদায় জানিয়েছে। 'কি সুন্দর দিন!' চার্লি তাকে বিদায় জানাবার সময় এমনও বলেছিল।

সে বোট-ডেক ধরে হেঁটে এলে চার্লি কেবিনে ঢুকে গেল।

সুহাস দারুণ মেজাজে আছে। মুখার্জিদা কলিজ জাহাজের গুপ্ত রহস্য বোধহয় এবারে ঠিক

আবিষ্কার করে ফেলবেন। কাপ্তানের ঘোরাঘুরি কেন এই সমুদ্রে, তাও ধরা যাবে। কলিজ জাহাজটিই যে আসলে প্রমোদতরণী ডরোথি ক্যারিকো, এ-ব্যাপারে তারও বিন্দুমাত্র যেন সন্দেহ নেই। দুই গ্রীক দেবীর ভাস্কর্য অথবা একসিঙ্গি ঘোড়াই তার প্রমাণ।

যাই হোক, বইটি চার্লির ঠাকুরদার নাকি জীবন এবং বাণী। এই জীবন ও বাণী হাতে পেলে মুখার্জিদা কি করেন দেখা যাক। মুখার্জিদা সব শুনে খুবই খুশি হবেন—যাক, কাজের কাজ করলি একটা। তুই তো খুবই বুদ্ধিমান দেখছি। দুঁদে গোয়েন্দারাও এত সহজে কাজটা উদ্ধার করতে পারত না। আসলে মুখার্জিদার প্রশংসায় সে কেন যে এত খুশি হয়—সাবাস সুহাস, কি খাবি বল্, এই চা লাগা, যেন সুহাস দিগ্বিজয় করে ফিরে এসেছে।

আরও কত কথা বলার আছে। চার্লি বলেছে, সবাই যে যার মতো ঘরে ফিরে যাবে, শুধু চার্লি একা পড়ে থাকবে। এ-সব কথায় গোয়েন্দা গন্ধ থাকতে পারে। অন্তত চার্লির বিপদ না হয়। এ-সব ভেবেই সব খুলে বলা দরকার।

কেন চার্লি নিজেকে এত নিরুপায় ভাবছে—সে বুঝতেই পারছে না। অবশ্য নানা ঝামেলা পাকাচ্ছে জাহাজে—দিন দিন জাহাজ আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠছে—এখন যেন মুখার্জিদা ছাড়া এই রহস্যের কিনারাও কেউ করতে পারবে না।

সে আর কিছুই গোপন করবে না, তাই বলে, তার শরীর থেকে চার্লি জামা কাপড় খুলে নিয়ে ছবি এঁকেছে—কিছুতেই বলতে পারবে না। তার নুড এঁকেছে—ঠিক আঁকা নয়, কিছুটা যেন স্কেচ করে রাখা—পরে স্কেচটি অবলম্বন করে হয়তো কোনও বড় কাজে হাত দেবে।

সে যাই হোক—-এখন শুধু মুখার্জিদা আর পিছিলে ভোজ—আর কাপ্তান চিফমেট থাকছেন না—ওঃ এটাও তো গুরুত্বপূর্ণ খবর। কাপ্তান চিফমেট রিফ এক্সপ্লোরাবে যাবেন—ফিরতে অনেক রাত হবে —কেন যাচ্ছেন রিফ এক্সপ্লোরারে—জাহাজটা কোথায় নোঙর ফেলে আছে তাও সে জানে না। মুখার্জিদা হয়তো জানেন। তার তো রিফ এক্সপ্লোরার নিয়ে মাথা ব্যথা থাকার কথা না। কলিজ জাহাজের অনেক ছবি সে দেখেছে—তবে লাউঞ্জের ছবিটি পাওয়া যায়নি। মুখার্জিদাকে সব বলা দরকার।

আসলে সে কাজ অনেকটা হাসিল করে ফিরতে পারছে বলেই মনটা ফুরফুরে হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছিল যেন।

আর তখনই ঠিক সিঁড়ির গোড়ায় নেমে আসার মুখে কে যেন ডাকল—'ম্যান ফলো মি!'

ফলো মি!

কাকে বলছে!

কে বলছে!

সে কিছুটা থতমত খেয়ে গেল!

কেমন হিমশীতল কণ্ঠস্বর।

আবার কেউ বলছেন, 'ম্যান ফলো মি!'

না, ডেকে কেউ নেই। সহসা এক দঙ্গল উৎক্ষিপ্ত মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। ঝড়ো হাওয়া বইছে। বৃষ্টি হতে পারে। সে বুঝতেই পারছে না—কার কণ্ঠস্বর—কোথা থেকে ভেসে আসছে।

সে পা বাড়াতে গেলেই আবার সেই শীতল কণ্ঠ, 'ম্যান ফলো মি।'

কে সে!

চারপাশে তাকাতে থাকলে আবার সেই শীতল কণ্ঠস্বর—'আই অ্যাম হিয়ার।'

আশেপাশে কেউ নেই। কয়েক কদম হেঁটে গেলে চিফকুক-গ্যালি! গ্যালিতে দুজন কুক, থাকতেও পারে, নাও পারে। অন্তত সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে তার এমনই মনে হল। ডেক পার হয়ে কিছুটা দূরে পিছিলের দিকটায় উৎসবের মেজাজ। লোকজনে ভর্তি। অথচ তাকে কেউ বলছেন, ম্যান ফলো মি। অফিসাররা এ-ভাবে লস্করদের সঙ্গে কথা বলেন। জাহাজের সেও একজন লস্কর। তাকে ছাড়া আর কাকে বলতে পারে! কেউ তো আর আশেপাশে নেই।

আবার হিম ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বর—'লুক হিয়ার।'

সে দেখল, অদূরে এলিওয়েব অন্ধকারে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। অস্পষ্ট। কিছুই ঠিক অনুমান করা যায় না। দিনদুপুরেও আলো জ্বালা না থাকলে বেশ অন্ধকার থাকে। সেই আবছা অন্ধকার থেকে তিনি তাকেই যেন ডাকছেন। কেন ডাকছেন! ভিতরে ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল, তার কেমন ভয় ধরে গেল।

কিছুই ভাল করে বুঝতে পারছে না।

সে একজন জাহাজি বলেই অনুসরণ করা দরকার। সে কিছুটা অস্বস্তির মধ্যেও আছে। অথচ সে জানে, একজন দক্ষ জাহাজি কখনও ভয় পায় না। সব কাজেই দরকারে তাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। ছুটির দিনেও জরুরি কাজকর্ম থাকলে কোনও অফিসার প্রয়োজনে তাকে ডাকতেই পারেন। শুধু সেই কণ্ঠস্বরটি তার কেন জানি চেনা মনে হচ্ছে না। অবশ্য সে সবার কণ্ঠস্বর ভাল চেনেও না। বিশ বাইশ মাস সফরে কটাই বা কথা হয়েছে কার সঙ্গে এক চার্লি ছাড়া। কাজকর্ম সাবেঙই বুঝিয়ে দেন। কার কোথায় কাজ করতে হবে তিনিই ভাল জানেন।

সে কেমন কিছুটা ঘোরে পড়ে যাচ্ছিল।

সে এলিওয়েব দিকে হাঁটছে।

লোকটি কে?

সেকেন্ড!

থার্ড ইঞ্জিনিয়ার!

না চিফ ইঞ্জিনিয়ার!

সে তো মুখ দেখতে পাচ্ছে না। লম্বা টুপিতে মুখের আংশিক ঢাকা। তার আগে তিনি হেঁটে যাচ্ছেন। ইনজিনরুমে নেমে যাচ্ছেন। বেশ অন্ধকারই মনে হচ্ছে। ইনজিনরুমেও কোনও আলো জ্বালা নেই। স্কাই লাইটেব ফাঁকে সামান্য আলো ফুটে উঠলেও লোকটির টুপি এবং বয়লাব সুট ছাড়া কিছুই যেন দৃশ্যমান নয়। আট দশ কদম আগে তিনি ইনজিনরুমের সিঁড়িতে নিঃশব্দে নেমে যাচ্ছেন।

সেও নেমে যাচ্ছে।

তাকে কোথায় নিয়ে যেতে চান।

কি কাজ ইজিনরুমে?

সে একজন সাধারণ জাহাজি। তার প্রশ্ন কবার কোনও অধিকার নেই। সে বলতেও পাবছে না, স্নান খাওয়া হয়নি। সবাই হযতো অপেক্ষা করছে। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। তাছাড়া আমি খুবই ক্ষুধার্ত।

সে সিঁড়ির গোড়ায় থামল।

তার হাঁটু অবশ হযে আসছে। কেমন এক ঘোর রহস্যময়তা সৃষ্টি করছে যেন কোনও এক কাপালিক।

ইনজিনরুমে এখন কাকপক্ষীও নামে না।

শুধু ব্যালেস্ট পাম্পের কিট কিট আওয়াজ।

শুধু চালু বয়লাবের স্টিমককে ফ্যাচ ফ্যাঁচ শব্দ। দানবের মতো জাহাজের মূল ইনজিনটি হাত পা ছড়িয়ে দিয়েছে। অজস্র স্টিম পাইপ, একজস্ট পাইপের ছড়াছড়ি—সিলিন্ডারের ভিতব সব ঢুকে গেছে।

ওপরে স্মোক বক্সের ডালা খোলা।

স্মোক বক্স পরিষ্কার করা হচ্ছে। ছুটির দিন বলে কেউ কাজে আসেনি।

সে সব চিনতে পারছে। এখানেই তো কতদিন সে নেমে এসেছে। ইনজিন-কশপের ঘব থেকে হাতুড়ি বাটালি নিয়েছে। নাট-বল্টু নিয়েছে। অথচ আজ এত অচেনা মনে হচ্ছে কেন! প্রবল আতঙ্ক কেন ভেতরে!

কেমন তাকে কিছুটা বোবায় ধরে ফেলেছে।

ঘুমের মধ্যে তার এটা হয়। সে সব কিছু দেখতে পায়। কেউ তাকে জলে ডুবিয়ে মারছে, অথচ সে কিছু বলতে পারছে না। কেউ তাকে পাহাড়শীর্ষ থেকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে, অথচ কিছু বলতে পারছে না। কেউ তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারার জন্য ঠেলে ঠুলে নিয়ে যাচ্ছে—বোবায় ধরলে এটা

তার হয়—সে কিছুই বলতে পারে না। সব বুঝতে পারে অথচ বলতে পারে না।

সে অবশ্য কিছু বুঝতেও পারছে না। আর ইনজিনরুমে আলো জ্বালা না থাকলে, এমন হতকুচ্ছিত দেখায় ইনজিনরুম, তাও জানত না। দানবের মতো ইনজিনের পিস্টন রডগুলো ত্যাড়াব্যাঁকা হয়ে আছে। থামের মতো ঝকঝকে পিস্টন রড অন্ধকারে ক্র্যাঙ্কওয়েভের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে তাও বোঝা যাচ্ছে না।

সে যে উর্ধ্বশ্বাসে সিঁড়ি ধরে ছুটে পালাবে তাও উপায় নেই। কারণ বোবায় ধরলে হাত পা অবশ হয়ে যায়। তার ক্ষমতা থাকে না। সে মরণপণ চেষ্টা করে ঠিক, তবু পালাতে পারে না। ঘুম ভেঙে গেলে টের পায় ঘামে সে ভিজে গেছে।

আর তখনই তার মনে হল তিনি নুয়ে কি খুঁজছেন।

এই ফাঁকে...।

আর তখনই সেই শীতল কণ্ঠ যেন তাকে মনে করিয়ে দিল, 'এ সন অনার্স হিজ ফাদার, এ সারভেন্ট, অনার্স হিজ মাস্টার। পালাবে না।'

সে বলতে পারত, না স্যার পালাচ্ছি না!

আধিভৌতিক রহস্যটি তবে টেরও পায়, সে পালাতে চায়। সে উর্ধ্বশ্বাসে সিঁড়ি ধরে উঠে যেতে চায়। তার আর জোর থাকে কি করে!

দীর্ঘ প্রপেলার স্যাফট অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। টানেলে কোনও আলো জ্বালা নেই। সেদিকে সে তাকাতে পারছে না। যেন এক বিশাল গুহাপথ অদৃশ্য হয়ে গেছে কালো পাথরের কোনও গোপন কক্ষ চিরে। যেদিকে তাকাচ্ছে শুধু কুহকের বেড়াজাল। সব চেনা, অথচ অন্ধকার, কি ভয়াবহ করে রেখেছে! বিশাল সব বয়লার দাঁড়িয়ে আছে পর পর। বয়লারগুলির ওপাশে কেউ থাকতে পারে। সেখানে আলো জ্বালা থাকতে পারে। বয়লারের পাশ দিয়ে যাবার রাস্তায়ও ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না। যেন এ-মুহূর্তে তার নড়বারও ক্ষমতা নেই।

জেনারেটারের পাশে সুইচবোর্ড। কালো রাবারের মোটা তারে প্লাক সুইচে ঢুকিয়ে দিতেই তিন নম্বর বয়লারের শেষ মাথায় প্লেটের উপর আলো জ্বলে উঠল। তার সাহস ফিরে আসছে ঠিক, তবু যেন বলছেন, এ সারভেন্ট অনার্স হিজ মাস্টার। জাহাজে ওঠার আগে এটাই ছিল তাঁর মন্ত্রগুপ্তি। অন্তত টি. এস. ভদ্রাজাহাজে প্রশিক্ষণ নেবার সময় কানে কানে সেকেন্ড অফিসার চ্যাটার্জি এই মন্ত্রগুপ্তি পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। তার বিবেকও তাকে তাড়া করছে। সে কিছুতেই তার প্রভুকে অসম্মান করতে পারে না।

কিন্তু তিনি কে?

সেকেন্ড?

চিফ? বা অন্য কেউ। সে মুখ দেখতে পাচ্ছে না কেন?

তিনি নিজেই বিশাল প্লেট কেন টানাটানি করছেন!

পাশে একটা বালতি, কিছু জুট।

'আপনাকে সাহায্য করতে পারি!' বলে সে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলে আবার চিৎকার, 'নো। ইউ ওনলি ফলো মি।'

অর্থাৎ আমি না বললে হাত দেবে না। সামনে যাবে না। আমার মুখ দেখারও চেষ্টা করবে না।

তাকে কি করতে হবে তিনিই বলে দেবেন।

কোথায় তিনি তাকে কাজ দেবেন!

এই অসময়ে, কখনও তো কাজ হয় না। সে শুধু নিজের সঙ্গে কথা বলছে। আর ক্রমে সেই ঘোর তার বাড়ছে।

ঘুমের মধ্যে বোবায় ধরলে তার এমন হয়।

বালতি জুট দেখে সে বুঝতে পারছে না তিনি কি চান। তাঁর সামনে যেতেও তিনি বারণ করছেন। বালতি জুট থাকলে কি করতে হয় সে যে জানে না তাও নয়। কিন্তু একা কি করে সম্ভব!

তিনি বললেন, 'ম্যান, কাম অ্যালঙ।'

সে কাছে গেলে তিনি ছিটকে দূরে সরে দাঁড়ালেন।

আঙুল দিয়ে তাকে ইশারা করছেন।

অর্থাৎ তাকে জাহাজের খোলে নেমে যেতে বলছেন। ইনজিনরুমের তলায় খোলের মধ্যে অজস্র জলের ট্যাঙ্ক। ট্যাঙ্কের দেয়ালে অজস্র ম্যানহোল। একটা ট্যাঙ্ক থেকে অন্য ট্যাঙ্কে যাবার রাস্তা। খুবই অপরিসর। উবু হয়ে বসাও যায় না! হামাগুড়ি দিয়ে, প্রায় সাঁতার কাটার মতো ট্যাঙ্ক থেকে ট্যাঙ্কে ঢোকা যায়—উপরে উঠে আসার একটাই রাস্তা। সেখানে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। ঠুলি পরানো আলোটা খোলের মধ্যে নামিয়ে দিয়েছেন।

শুধু বললেন, 'গো অ্যাহেড।'

কোথায় কতদূর? নামার সময় বালতি জুট তার হাতে ধরিয়ে দিলেন। শ্যাওলাব ট্যাঙ্ক পিছল হয়ে আছে, পা ফসকে যাচ্ছে, কোনও রকমে নুয়ে খোলের ভিতর নেমে গেলে তিনি মুখ বাড়ালেন না। মাছ ধরার মতো পাড়ে যেন উবু হয়ে বসে থাকলেন।

সে জানে, আসলে এটা একটাই বৃহৎ জলাধার। ভাগ ভাগ করে অজস্র দেয়াল তুলে দেওয়া হয়েছে। সব দেয়ালেই একটা থেকে আর একটায় ঢোকাব ম্যানহোল। সে পিছলে যাচ্ছিল। উপর থেকে দড়ি ছাড়ার মতো ঠুলি পরানো আলোটা সে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

উপর থেকে হাঁক আসছে, 'লুক, দ্য লাস্ট ওয়ান।'

অর্থাৎ শেষ প্রান্তে চলে যেতে বলছেন তিনি। সেখানে কি এই মানুষটি পাচার করার জন্য কোনও নিষিদ্ধ বস্তু রেখে দিয়েছেন। রেখে যে দেয না, তা নয়। তবে বিশ বাইশ মাসে এমন অদ্ভুতুড়ে কাণ্ড কখনও দেখেনি। তাকে এত বিশ্বাসই বা কেন! আবার মনে হচ্ছে, তিনি বলছেন, 'কি ঠিক আছে?'

সে বলল, 'আমি কি করব স্যার? কি কাজ! তলানির নোংরা জল তুলতে হবে?'

কোনও সাড়া নেই।

আমি একা! সে বলতে পারত!

তার জামা-প্যান্ট শ্যাওলায়, জং ধরা নোংরা জলে বিশ্রী রং ধরে গেছে। হাতে পায়ে মাথায জলের বিশ্রী দাগ। এবং সে ক্রমে কেমন এই পচা তলানি জলের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট বোধ করছে।

পাম্প করে নোংরা জল ফেলে দিলেও তলানি সামান্য পড়ে থাকে। জুট দিয়ে মুছে তুলতে হয় জল। চিপে চিপে জল বালতিতে রাখতে হয়। আট দশ জন জাহাজি কাজটা তুলতে পারে। তাকে একা এখানে ফেলে রাখা কেন! তার কি দোষ!

আর তখনই মনে হল, মধ্যরাতে চার্লির দরজার বাইরে তিনিই কি দাঁড়িয়েছিলেন। না, সেই মধ্য রাতের প্রেতাত্মা! উইন্ডসহোলের আড়ালে অদৃশ্য এক ছায়ার মতো গোপনে অন্ধকারে যে মিলিয়ে গিয়েছিল! সে যেন শুনতে পাচ্ছে, তিনি বলছেন, মেনি থ্যাঙ্কস ইয়ং-ম্যান!

কাপ্তান তাকে এখানে শেষে শাস্তি দিতে নিয়ে এলেন! তার ঘোর বাড়ছে। সে কেমন ঘোলা ঘোলা দেখছে সব কিছু। আলোর ঠুলিটা হাতে আর ধরে রাখতে পারছে না। হাঁটু মুড়ে মাথা ঝুঁকে কোনও রকমে বালতিতে জল চেপার সময় মনে হল, এক হ্যাঁচকায় আলোটা কেউ টেনে নিয়ে গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে আলো নিভে গেল! সে লাফিয়েও আলোর তারটা ধরতে পারল না। হারিয়ে গেছে। কিছু দেখতে পাচ্ছে না। ব্ল্যাকেস্ট অফ দি ব্ল্যাক নাইটস।

সে একেবারে বুঝি অন্ধ হয়ে গেল! সে হাতড়াতে থাকল—চিৎকার করতে থাকল, 'আমার কি দোষ! আপনি তো আমাকে ডেকে নিলেন। সে দুমদাম লাথি মারতে থাকল দেয়ালে—চিৎকার করে বলল, 'চার্লি আমি শেষ।'

লোকটি তখন সরল ভাষায় তাঁর আক্রোশের কথা বুঝিয়ে দিলেন, দাঁত চেপে ট্যাঙ্কের মুখে ঝুঁকে বললেন, ইয়ো স্যাটান! ইয়ো আর এ ডেনজারাস ট্র্যাপ টু মি।' তারপরই প্লেট পড়ার শব্দ। প্লেট টেনে মুখটা বন্ধ করে দিলেন।

তারপর আর কারও সাড়া নেই।

প্লেট পড়ার শব্দও শোনা গেল।

কেমন এক পৃথিবীর গোপন অন্ধকূপে তাকে ফেলে আততায়ী সরে পড়ল।

সে কে?

কাপ্তান?

না অন্য কেউ।

সেকেন্ড?

না অন্য কেউ।

কে সে!

সি-ডেভিল লুকেনার নয়তো। লোকটার মাথা নেই, মুখ নেই, ঘাড় গলা, হাত পা কিছুই নেই। যেন আছে শুধু পোশাকের খোলস। অশরীরী! কিছুতেই সে তার মুখ দেখতে পেল না কেন। টুপির নিচে শুধু অন্ধকার। হাত পা কি দেখেছে! মনে করতে পারছে না। যেন বয়লার সুট আর টুপি ছাড়া তার আর কিছুই ছিল না। শরীরও না। কে তবে প্লেট তুলল! কোনও দুষ্টু আত্মার কাজ! তাহলে সত্যি কি তিনি সি-ডেভিল লুকেনার! বংশীদা কি তবে ঠিক! সঙ্গে সঙ্গে তার শরীর অসাড় হয়ে আসছে। বরফেব কুচি ঢুকে যাচ্ছে হাড়ে। কে জানে কে সেই অপদেবতা! তার ক্রমে শরীর বরফ হয়ে যাচ্ছে। জলে গড়াগড়ি যাচ্ছে—চেষ্টা করছে বের হবার। আর যত সেই অপদেবতার আতঙ্ক তাকে গ্রাস করছে, তত জলে গড়াগড়ি খেতে খেতে সহসা স্থবির হয়ে গেল। চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে জলে ডাঙায় পড়ে থাকা মৃত মানুষের মতো।

জাহাজে জল তোলার তোড়জোড় শুরু হচ্ছে তখন। দুটো জলের ট্যাঙ্কার জাহাজের পাশে টাগবোটে দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজে জল নেওয়া হবে। বার-বার ডেকসারেঙ তাড়া দিচ্ছিল, কি ব্যাপার, মুখার্জিবাবু কিনার থেকে এখনও ফিরছেন না। কখন পাত পড়বে তোমাদের।

ইনজিনসারেঙ বললেন, চলে আসবে। আপনারা না হয় বসে যান!

আব তখন, মুখার্জি ফিবছেন নৌকায়। জাহাজে উঠে আসছেন। নৌকার মাঝিকে পয়সা দিয়ে গ্যাঙওয়েয় সিঁড়ি ধরে উঠে আসছেন। অকাবণ ঘুরে মরা। কিছুই পাওয়া যায়নি। ঘুরে মরাই সার। আস্তাবলগুলির কোথাও তিনজন ছাড়া আর কারও ঠিকানা ডিনা ব্যাঙ্কের দেওয়া নেই। একটা স্টিমার পার্টি এসেছে—তাদের অনেকে ঘোড়া ভাড়া করেছে। তা-ছাড়া অজস্র নাম—শুধু তিনি খুঁজেছেন, ডিনা ব্যাঙ্ক থেকে কে কে আস্তাবলে গেছে। তিনি, সুহাস আর চার্লি ছাড়া আর কেউ ডিনা ব্যাঙ্ক থেকে ঘোড়া ভাড়া করেনি।

সুবঞ্জন ঠিকই বলেছে, এত বোকা ভাবছ কেন? সে জানে, কোনও কারণেই সাক্ষ্য প্রমাণ রাখা চলবে না। যার এতটা সাহস, ঘোড়াব পিঠে চড়ে চার্লিকে অনুসরণ করতে সাহস পায়, সে কখনও রেজিস্ট্রি খাতায় তার নাম রাখে—কিংবা জাহাজের নাম!

মুখার্জিকে উঠে আসতে দেখেই সুরঞ্জন বলল, 'ওই তো আসছে। মাথায় যে কি চাপে!'

তবু সুরঞ্জন ভাবল, যদি কোনও সাক্ষ্য প্রমাণ পেয়ে যায়! তার স্নান সারা। তামার বিশাল ডেকচিতে দুধে চাল দেওয়া হচ্ছে। চালের গুঁড়ো পাওয়া গেলে অবশ্য সিন্নি হত। কারণ মুসলমান জাহাজিরা পায়েসের চেয়ে চালের গুঁড়ো, দুধ, জাফরান, লবঙ্গ, কিসমিস, বাদাম দিয়ে সিন্নি বেশি পছন্দ করে। সিন্নির সবই ভাল, তবে নুন দেওয়া মুখার্জি পছন্দ করেন না। বাটলারও খাবে। মেসরুম-মেটদের বলা হয়েছে। বাটলাব বিরিয়ানির মশলা রসদঘর থেকে পাঠিয়েছেন। খুবই উল্লাস সবার। মাদুর পেতে তাস খেলছে অনেকে।

মুখার্জি দৌড়ে পিছিলে উঠে এলেন। টুপি খুলে মাথা চুলকালেন। উঁকি দিলেন দরজায়—রান্নার কতদূর! বিরিয়ানির সুঘ্রাণ। জিভে প্রায় জল এসে গেল। ইনজিনসারেঙ সব তদারক করছেন মেসরুমে বসে। মুখার্জিবাবু ফিরেছেন শুনে তিনি উঠে গেলেন। বললেন, 'গেলেনই যখন কিছু শালপাতা আর মাটির গ্লাস নিয়ে এলে পারতেন। তা হলে মেমানরা আপনার আরও খুশি হতে পারত— সুখ্যাতি হত ফিল সাহেবের।'

মুখার্জি বললেন, 'এখানে শালপাতা কোথায় পাব!'

সারেঙ বললেন, 'আছে। দ্বীপে সবই পাওয়া যায়। যাকগে তাড়াতাড়ি নিচে যান। একটা তো বাজে। কখন গোসল করবেন, খাবেন!'

'মুখার্জি নিচে নেমে গেলে দেখলেন, সবারই প্রায় স্নান সারা। মাথা আঁচড়ে থালা গ্লাস নিয়ে বসে আছে। মুখার্জিদা ফিরছেন না বলেই পাতে বসা যাচ্ছে না। সারেঙ দু-বার সুহাসেরও খবর নিয়েছেন—সুরঞ্জনের এক কথা, 'ওর কথা বলবেন না। ছোঁড়া বোট-ডেকে গেলে আর ফিরতেই চায় না। মরুকগে, আরে জাহাজে তোর পেছনে কে এত লেগে থাকবে। আমরা খেয়ে নেব। তোর জন্য বসে থাকতে বয়ে গেছে।'

মুখার্জি সারেঙকে ডেকে বললেন, 'সবার তো একসঙ্গে জায়গা হবে না। এক লপ্তে পাত পেতে খাওয়ার জায়গা তো নেই—লোক তো কম না।'

তা অনেক। প্রায় ষাটজন তো হবেই। সারেঙও জানেন। প্রথম ব্যাচে বসার জন্য বংশীও উঠে যাচ্ছিল। মুখার্জিকে দেখেই বলল, 'এই যে গুরু এসে গেছ। বলে হাঁটু গেড়ে বসল। 'পা দুখানা দেখি। গড় হই। বিরিয়ানি—সোজা কথা। তোমার অশেষ গুণ। দাও দেখি, জাহাজে ভোজ দিলে—সোজা কথা।'

'শুধু পা দুখানি দিলে হবে! তোর যে আরও কত ব্যামো আছে।' বলে পা দুখানা উপরে তুলে দিতেই বংশী পা মাথায় রেখে বলল, 'আবার কবে খাওয়াচ্ছ?'

মুখার্জি বললেন, 'হবে, যা তাড়াতাড়ি। খেয়ে নে। শেষে কম পড়লে ঠকে যাবি।' মুখার্জি সুহাসকে দেখছেন না! আবেদালি লুঙি পরে গেঞ্জি গায়ে বেশ ফিটফাট হয়ে খেতে উপরে যাচ্ছে। ফার্স্ট ব্যাচে বসে যাবার তার তাড়া। মুখার্জি তাকে দেখেই বললেন, 'সুহাস কোথায়?'

আবেদালি জানে না কিছু। সে বলল, দাঁড়ান দেখছি। বংশীর ফোকসালে উঁকি দিয়ে বলল, 'মুখার্জিবাবু সুহাসের খোঁজ করছেন।' হরেকেষ্ট বলল, 'উপরে আছে হয়তো।' কিন্তু সে তো সকাল থেকেই সুহাসকে দেখেনি। সে মুখার্জির ঘরে গিয়ে খবরটা দিতেই মাথা গরম করে ফেললেন তিনি।

'তার মানে! সে সকাল থেকে কোথায় তোমরা জানো না, সকাল থেকে বেপাত্তা। অধীর, সুরঞ্জন—সুহাস কোথায়!' না আর বসে থাকা যায় না। উপরে ওঠার মুখে যাকে পেলেন, 'সুহাস কোথায়?'

মনুর সঙ্গে দেখা। সেও বলল, 'সকাল থেকে তো দেখছি না।'

ওপরে উঠে সুরঞ্জনকে পেয়ে গেলেন।

'সুহাস কোথায়?'

'কোথায় আবার! যেখানে মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম, কোথায় থাকতে পারে বোঝ না!'

'তার মানে। এত কাণ্ডজ্ঞানের অভাব। বেলা কত হয়েছে! ওর জন্য কে বসে থাকবে।'

'সেই তো! বাবু ফিটফাট হয়ে চার্লির কেবিনে গেলেন। সেই কখন! কি রোয়াব! আমাকে পাত্তাই দিল না!'

'পাত্তা দিল না। চার্লির ঘরে এতক্ষণ কি করছে।'

'কি করছে সেই জানে। আমি যেতে পারব না। তোর সামান্য বুদ্ধিসুদ্ধি নেই! তুই জমে গেলি! সময়জ্ঞান তোর থাকবে না! সবাই বসে থাকবে, এটাও বুঝলি না। ছোঁড়া স্বার্থপর বুঝলে। কার জন্য করছ। এত কাণ্ডজ্ঞানের অভাব।'

সারেঙসাব এসে বললেন, 'মুখার্জিবাবু চিংড়ি মাছ রেখে দিলাম। একদিনে সব শেষ করে কি হবে। বাটলারকে বললাম, মাছগুলো বরফ ঘরে রেখে দিতে। কাল ভাবছি—মুখার্জির মাথা গরম। কেমন অসহিষ্ণু—তার কোনও কথা শুনতে ভাল লাগছে না—তবু সারেঙসাব সবার মুরুব্বি। অবজ্ঞাও করা যায় না, দায়সারা গোছের জবাব, 'ঠিক আছে। ভাল করেছেন।'

'কাল বুঝলেন, মুগের ডাল, গন্ধরাজ লেবু, চিংড়িমাছের মালাইকারি...।'

মুখার্জি বললেন, 'সব তো বুঝলাম, আপনার ছোকরা জাহাজির যে পাত্তা নেই।'

'ছোটসাবের কেবিনে গেছেন। ওই তো সুরঞ্জন বলল।'

এবার মুখার্জির অসহিষ্ণুতা যেন চরমে। গেছে যখন, যান এবার। ডেকে আনুন। কে যাবে মরতে ওখানে। আমাদের তো কাজ ছাড়া বোট ডেকে গেলে সাহেবদের জাত যায়।

এত দেরি হবার তো কথা না। ডরোথি ক্যারিকোর কিছু ছবির খবর নিতে বলেছিলেন। ছোঁড়া কি জালে সত্যি জড়িয়ে গেল। খুবই অসহায় বোধ করছেন। সে তো জানে, ফিল তার খামার থেকে কত কিছু পাঠিয়েছে। ভাল মন্দ খাবার লোভও আছে। জাহাজের একঘেয়ে খানা কারই বা ভাল লাগে। ভোজের কথা ভেবেও তো তার চলে আসার কথা! এল না কেন? কে যাবে ডাকতে।

'এই সুরঞ্জন, যা না। বাবুকে একবার মনে করিয়ে দিয়ে আয়। আমরা সবাই বসে আছি।'

সুরঞ্জন ইসস্তত করছিল। কারণ চার্লির কেবিনে যাওয়া মানেই সেও লক্ষ্যবস্তু হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যা হচ্ছে জাহাজে—সে ঠিক কিছু বুঝতে পারছে না। তার কেমন যেন ভয় কবছে।

মুখার্জি আব পারলেন না।

'ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি।'

সুরঞ্জন মুখার্জিদাব অভিমান বোঝে। কেউ কম স্বার্থপর নয় ভাবতেই পারে। সে বলল, 'তুমি চানে যাও। আমি যাচ্ছি। সেই কখন বের হয়েছ, ফিরেও স্বস্তি নেই। আমি যাচ্ছি।'

আব সুরঞ্জন কেবিনে নক করতেই শুনতে পেল, 'কে?'

'আমি স্টোকার সুরঞ্জন। সুহাস কি করছে। সবাই বসে আছে ওর জন্য। মিঃ মুখার্জি পাঠালেন।'

দড়াম করে দরজা খুলে গেল।

'সুহাস!'

'হাঁ ও তো আপনার কেবিনে সকালে এল।'

'সুহাস। সে তো কখন চলে গেছে।' চার্লি ঘড়ি দেখে বলল।

'চলে গেছে?'

'হ্যাঁ। আমি তো বোট-ডেক থেকে দেখলাম সিঁড়ি ধরে নামছে।'

'পিছিলে নেই।'

'নেই' চার্লি বলল, 'সত্যি নেই! না না আছে। পিছিলেই আছে। আমি নিজে দেখেছি সিঁড়ি ধরে নেমে গেল। ভাল করে খুঁজে দেখ। দু-ঘণ্টা হবে—সে যাবে কোথায়। বলে দরজা ঠাস করে বন্ধ করে সেও সুরঞ্জনের পেছনে ছুটতে থাকল। যেন আগুনের ভিতর ছুটছে চার্লি। দাউ দাউ করে জ্বলছে। সুহাসকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না শুনে প্রবল যন্ত্রণায় সে ছটফট করছে।

চার্লি ছুটে আসছে দেখতে পেয়েই মুখার্জি প্রমাদ গুনলেন। কিছু একটা হয়েছে। তিনি ছুটে গেলে সুরঞ্জন হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'সুহাস বোট-ডেকে নেই।'

'গেল কোথায়!' মুখার্জি চার্লির দিকে তাকিয়ে বুঝলেন, তাকে সামলানো কঠিন। পিছিলে নেই, বোট-ডেকে নেই—গেল কোথায়?

'দ্যাখ চার্লি ভেঙে পড়লে চলবে না। তুমি তো বিশ্বাস কর হি প্রটেক্টস। তার তো কোনও অপরাধ নেই। গোলমাল বাধালে জাহাজে অনাসৃষ্টি হতে পারে। কেউ রক্ষা পাবে না। আগে খুঁজে দেখা দরকার। তবে পিছিলে নেই। তবু চল, দেখাই যাক। পিছিলে খুঁজে দেখতে ক্ষতি কি।'

সুরঞ্জন মুখার্জির পেছনে পেছনে ছুটছে। চার্লিও। কেন যে চার্লি নিজেকে কিছুতেই শান্ত রাখতে পারছে না—স্থির হতে পারছে না। সুহাসকে নিয়ে তার কেন যে সবসময় এত আতঙ্ক! সারেঙসাব ওদের উঠে আসতে দেখেই তাজ্জব। সঙ্গে আবার কাপ্তানের ব্যাটা। গোলমেলে কিছু কি না কে জানে। ফাইভার মারা যাবার পর থেকেই মুখার্জিবাবু কেমন উচাটনে পড়ে গেছেন।

মুখার্জিকে তিনি বললেন, 'পেলেন!'

'না। চার্লির কেবিন থেকে কখন চলে এসেছে! গেল কোথায়, বুঝতে পারছি না।'

'কোথাও গেছে। বাথরুমে নেই তো! সারেঙ নিজেই বাথরুমের দিকে গেলেন। বললেন, 'সকাল থেকেই তো নেই।' মুখার্জি দাঁড়ালেন না। নিচে নেমে গেলেন। সবাইকে এক প্রশ্ন, সুহাসকে দেখেছ?

'না। সকাল থেকে দেখিনি।' হাফিজ বলল।

মুখার্জি অধীরকে ডাকলেন, 'তুই একবার দেখে আয় তো বাঙ্কারে আছে কি না!'

মুখার্জি বুঝতে পারছেন না কি করবেন। সারেঙকে সব খুলে বলা ঠিক হবে কি না তাও মাথায় আসছে না। সারেঙসাব ভাবতে পারেন, গোলমালটা কোথায়! কাপ্তান তো সুহাসকে স্নেহ করেন। না হলে এত রাতে ডেকে পাঠাতে পারেন! সব খুলে বলাও যায় না! চার্লি যে ওম্যান প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে। চার্লি যে বিপদের মধ্যে আছে তাও প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে, চার্লিকে মুখোশ পরে অনুসরণও করছে। সুহাসকে দু-দুবার খুন করার চেষ্টা হয়েছে—এ-সব তো তাঁরা তিন চারজন ছাড়া আর কেউ জানে না। সুহাসের জন্য এতটা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়াটাও ওদের কাছে খুবই অস্বাভাবিক ঠেকতে পারে। বলতে পারে, গেছে কোথাও। কিনারায়ও নেমে যেতে পারে।

তবে একা সে বের হয় না। সারেঙই বারণ করে দিয়েছেন, এখনও জাহাজ চিনতে সময় লাগবে। কিনারা চিনতে সময় তো লাগবেই। তবু আজকালকার ছোকরা, কে কার কথা শোনে।

সুরঞ্জন অধীর কোল বাঙ্কারে ছুটে গেল। ওখানে নিয়ামত আছে। স্টোকহোলডে নিযামতের ডিউটি। আড্ডায় যদি মেতে যায়।

মুখার্জি ফোকসাল, বাথরুম এমন কি বোট-ডেকে উঠে গেলেন। চার্লি যেন আর ধৈর্য ধরতে পারছে না। সে বলল, একবার ইনজিনরুমে গেলে হত! ইনজিনরুমে নেমে কি হবে মুখার্জি বুঝতে পারছেন না। তাকে তো কোনও ডিউটি দেয়া হয়নি। দিলে সারেঙসাব জানবেন না হয়! তার আগে দেখা দরকার ফল্কাগুলি। ফল্কার কাঠ খোলা রেখে কেউ যদি জাল পেতে রাখে। তিনি সামনে পেছনে চারটা ফল্কাই দেখলেন। ফল্কার কাঠ খোলা নেই। ফল্কা ত্রিপল দিয়ে কিল এঁটে রাখা। মাল বোঝাই হচ্ছে। বৃষ্টি বাদলায় ভিজে গেলে মাল নষ্ট হতে পারে। এমন কি বাতিল হয়ে যেতেও পারে। সারেঙসাব বাথরুমে ঢুকে গেলেন। চার্লি মুখার্জিকে কেবল বলছে, তোমাদের কিছু বলে যায়নি! গেল কোথায়?

'না।' আমি তো এইমাত্র ফিরলাম।

চার্লির চিৎকার করে ডাকতে ইচ্ছে হচ্ছে। সুহাস, তুমি কোথায়? কোথাও তুমি ঠিক আছ। সাড়া দিচ্ছ না। কিন্তু এত অধীর হয়ে পড়লে মুখার্জি বিরক্ত হবেন। সে চিৎকার করে ডাকতে সাহস পাচ্ছে না। দু-একজন অফিসার ইনজিনিয়ারও বের হয়ে এসেছেন। চার্লিকে প্রশ্ন, 'কি ব্যাপার! জাহাজ তোলপাড় করে বেড়াচ্ছ!'

চার্লি শুধু বলল, 'সুহাসকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।' তারপর নিজেকে সামলে নিচ্ছে। এই দোষ চার্লির, একটুকুতেই ভেঙে পড়ে। মুখার্জি বারবার বলছেন, 'ধৈর্য ধরতে হবে চার্লি! যাবে কোথায়! জাহাজেই আছে।'

'কোথায় আছে! প্রায় দাঁত চেপে নিজেকে সামলে বলল, কখন সামান্য ব্লু বেরিজ জুস খেয়েছে। সবে ডাইনিং হল থেকে ফিরছি। শুনি সুহাস পিছিলে নেই! কোথায় যেতে পারে! কেন যাবে! বল, কেন সে জাহাজ থেকে নেমে যাবে! জাহাজে থাকলে, কোথায় থাকতে পারে!'

'আমিও তো বুঝতে পারছি না! কি বলব!' চার্লিকে যে আর শান্ত রাখা সম্ভব না মুখার্জি নিজেও বুঝতে পারছেন। তিনিও তো ভাল নেই। চার্লির কথার জবাব দিতে গিয়েও ধৈর্য হারিয়ে ফেলছেন। অধীর সুরঞ্জন ছুটে এসে বলল, না স্টোকহোলডে নেই। নিয়ামত বলল, 'গেছে কোথাও। গিয়ে দ্যাখ বাছাধন হয়তো এতক্ষণে পিছিলে হাজির।'

মুখার্জি বললেন, 'কোল বাঙ্কারগুলি দেখেছিস?'

'দেখেছি।'

'ক্রশ বাঙ্কারে দেখলি!'

'ওখানে তো দরজা সিল করা। খোলা হয়নি।'

মুখার্জি ভাবলেন, সব খুলে দেখা দরকার হবে। যদি কিছু হয়েই যায় লাশ পাচার করতে দেওয়া হবে না। আগুন জ্বলবে। কেউ রেহাই পাবে না। তিনি নিজেও কতটা অস্থির হয়ে পডছেন, এতেই টের পেলেন। বিচলিত হলে চার্লিকে ধবে রাখা যাবে না। সে কি করে বসবে কে জানে।

বংশী ছুটে আসছে।

সে এসেই বলল, 'কি হয়েছে বল তো!'

এই আব এক ঝামেলা। তাকে কিছু বলাও যাবে না। মুখার্জি বললেন, 'কিছু না। তুই যা। তোর খাওয়া হয়েছে?'

'কিছু না বলছ কেন! আমি আহাম্মক ভাবছ! তোমরা আহম্মক! তোমরা মনে কর আমি কিছু বুঝি না। সুহাসকে খুঁজছ। আমি বলছি না, জাহাজে কিছু একটা আছে! সুহাস তার পাল্লায় পড়ে গেছে। তাকে তোমরা কোথাও খুঁজে পাবে না। বললাম, মিলিয়ে নিয়ো। ফাইবার গেল, কাপ্তান নাটক করল, কিসের নাটক--চার্লিকে বলে দেখ না, সে কি দেখতে পায়! চার্লি তুমি সত্যি করে বল, বোট-ডেকে মেয়েমানুষ দেখা যায় কি না! কে ডেরিক তুলে রাখে। শয়তান। জাহাজে সমুদ্র শয়তান উঠে এসেছে। কাপ্তানের উপর শয়তান ভর করেছে। হারামির বাচ্চারা পার পাবে ভাবছ!'

মুখার্জি আর পারলেন না!

'কি হচ্ছে!'

'কিছু হচ্ছে না। যা হচ্ছে, তোমরা সবাই জান। মুখ খুলছ না। আগুন লাগিয়ে দিলে বুঝবে!'

মুখার্জি এবাব তেড়ে গেলেন—'একদম বাজে কথা না। যা শুয়ে পড়গে। বউয়ের ছবি বের করে দেখগে। আমাকে জ্বালাবি না! বেশি বাড়াবাড়ি করবি তো চ্যাংদোলা করে জলে হারিয়া করে দেব।'

মুখার্জির তড়পানিতে বংশী কিছুটা মিইয়ে গেল—বিড়বিড় করে বকছে, 'আমার কি, গেলে সবাই যাবে। জাহাজ ডুবলে কে আর রক্ষা পায়! এক দুজনেব উপর দিয়ে গেল—ভেবেই তেনারা খুশি। আরে দ্যাখ কি হয়। তবে আমিও ছাড়ব না। বলে দিলাম, আমি জানি, কিছু একটা হবে। শুয়োরের বাচ্চা কাপ্তানকে কি করে টাইট দিই দ্যাখ না। জাহাজ নিয়ে ঘুরবে শয়তানের রাজত্বে। ঘোরা বের করে দেব।'

মুখার্জি এখন কি যে করেন! কাকে সামলান। চার্লি তাড়া দিচ্ছে, নিচে নেমে গেলে হয়। চার্লি বোধহয় আর পারছে না। সে ছুটে যাচ্ছে। কে জানে কেবিনে কেবিনে সে লাথি মেরে দরজা খুলতে বলবে কি না! এতটা ভেঙে পড়াও ঠিক না। যদি কিনারায় যায়ই, যেতে পারে না, তাও তো বলা যায় না। তাঁর দেরি দেখে কে জানে যদি সে খুঁজতে চলে যায়। তবে একা যাবে এমনও ভাবতে পারেন না। কিনারায় নেমে গেলে ঠিক সুরঞ্জন অথবা চার্লিকে বলে যেত। কাউকে না বলে যাবার মতো অদায়িত্বশীল সে তো নয়। তবু একবার খাঁড়ির জলে নৌকা কিংবা মোটরবোটগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। কিনারায় গেলে ফেরাব সময় হয়ে গেছে। তাঁকে চার্লিকে জাহাজের রেলিঙে দেখলে হাতও তুলে দিতে পারে।

না কিছু না। কেউ কোনও বোটে হাত তুলে দিচ্ছে না।

পাল তোলা নৌকা ভেসে যাচ্ছে।

মোটর বোটে কাপ্তান, চিফমেট সেকেন্ডমেট নেমে গেলেন। দূরে স্টিমার পার্টির লোকজন হৈচৈ করে ফিরছে। বোটে পাল তুলে অনেকে খাঁড়ি পার হয়ে সমুদ্রে নেমে যাচ্ছে। কেবল সুহাসের পাত্তা নেই।

কোথায় যাচ্ছেন কাপ্তান! মুখার্জি বিস্মিত।

'চার্লি তোমার বাবা কোথায় যাচ্ছে জান?'

'রিফ এক্সপ্লোরারে যাচ্ছেন। দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

চার্লি নিজেও আর বোধহয় বিশ্বাস রাখতে পারছে না মুখার্জির উপর। যেন মুখার্জি নেহাতই সামান্য ঘটনা ভাবছেন। এতটা উতলা হবার কিছু নেই। কিন্তু চার্লি তো জানে কি হতে পারে। সে তো ভেবে পাচ্ছে না, কারণ তার রক্তে যে সেই এক প্রবল ঈশ্বরে বিশ্বাস—হি প্রটেক্টস। সে তো মরিয়া

হয়ে উঠতে পারছে না, শুধু ঈশ্বরের কথা ভেবে! সে তো সিনার হতে চায় না। সে যতই বলুক, আই উইল রিওয়ার্ড ইভিল, উইদ ইভিল, নাথিং ক্যান স্টপ মি—কিন্তু পারছে কই! পারলে সুহাসের জীবন বিপন্ন হত না। তবু শেষ পর্যন্ত সে লড়বে। সে ছুটছে। ইনজিনরুমে দৌড়ে সিঁড়ির রেলিঙ ধরে নেমে যাচ্ছে। যদি সুহাস কোথাও পড়ে টড়ে থেঁতলে যায়। কিংবা প্রতিহিংসা—এবং সুহাসকে যদি সত্যিই শেষ করে দেয়। কত কুকথা যে মনে হচ্ছে তার। দ্য প্ল্যান্ট ইজ নট প্ল্যান্টেড বাই আওয়ার ফাদার শ্যাল বি আপরুটেড।

সে নেমে গেলে মুখার্জিও নেমে গেলেন। অন্ধকার ইনজিনরুম। মুখার্জি আলোগুলি সব জ্বালিয়ে দিলেন। পাগলের মতো ডাকছে চার্লি—'সুহাস, আই অ্যাম উইদ ইয়ো অলওয়েজ, ইভিন টু দ্য এনড অফ দ্য ওয়ার্লড। এনসার মি। সুহাস তুমি কোথায়! সাড়া দিচ্ছ না কেন?'

কোন সাড়া নেই।

মুখার্জি টানেল পথটায় ছুটে গেলেন, ডাকলেন, 'সুহাস আছিস? সুহাস।'

আরে থাকলে তো তিনি দেখতেই পেতেন! ছেলেমানুষের মতো ডাকাডাকি করছেন কেন তিনি নিজেও বুঝছেন না!

চার্লি বিলজে টর্চ মেরে দেখছে। আর ডাকছে সুহাস, তুমি কোথায়? কেন সাড়া দিচ্ছ না। মুখার্জি, সুহাসের সাড়া পাচ্ছি না কেন! আবার আর্তকণ্ঠে ডাকছে। অভয় দিচ্ছে যেন। বলছে ইফ এভরিওয়ান এলস ডেজার্টস ইয়ো, আই ওন্ট সুহাস। বলেই ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

মুখার্জি আর পারলেন না।

'কি হচ্ছে চার্লি!'

'আমি জানি না মুখার্জি, আমি কিচ্ছু জানি না। ও সাড়া দিচ্ছে না কেন!'

'আচ্ছা এত ভেঙে পড়লে চলবে।' তারপর কেমন উত্তেজিত হয়ে পড়লেন, 'কেন এসব হচ্ছে! তুমি বুঝতে পারছ না, বার বার সুহাসকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে! কে করছে! তুমি সব জান। বল, কে করছে। সুহাসের কিছু হলে আমি তোমাকেও জ্যান্ত পুড়িয়ে মারব। কেউ রেহাই পাবে না। সে যত বড় সি-ডেভিলই হোক।'

চার্লি কিছুই বলছে না। নিরুপায় বালিকার মতো শুধু কাঁদছে। বসে আছে হাঁটু গেড়ে। টর্চ পড়ে আছে প্লেটে।

আমি জানি না কিছু। আমাকে তুমি কিছু বলবে না।'

'তুমি চেন তাকে?' মুখার্জি ইনজিনরুমে চার্লিকে একা পেয়ে জেরা করছেন। 'তুমি তাকে জান! না হলে কেন বললে, আই উইল রিওয়ার্ড ইভিল উইদ ইভিল। কেন বললে বল। তুমি তাকে চেন! কি অসুবিধা তোমার! কেন তুমি তোমার বাবাকে ক্রেজি ওল্ড গোট বলে গালাগাল দিলে বল! কেন তুমি মুখ আঁকলে গোঁফ আঁকলে!'

'আমি জানি না, কিচ্ছু জানি না মুখার্জি।'

'বিটসি খুন হয়েছে কেন?'

'তাও আমি জানি না!'

'কিছুই জান না। এটা বুঝছ না সব গণ্ডগোলের মূলে তুমি! সেটা কি! বল, চুপ করে আছ কেন? তুমি মেয়ে! ছেলের পোশাক পরে ঘুরে বেড়াও। তা বেড়াতেই পার। কিন্তু তুমি কি আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে সব দেখাতে পাও? তোমার কাকার কথা মনে করতে পার। আঙ্কল রাচেলকে দেখলে তুমি চিনতে পারবে? তোমাদের বুনোফুলের সাম্রাজ্য পার হয়ে কোনও স্টপ অফে ট্রাকারদের সঙ্গে কারও কি দোস্তি ছিল। তোমার দাদা, তোমার দিদিরা কোথায়। তাদের নাম তুমি জান না বিশ্বাস করতে হবে! তোমার ঠাকুরদা সব তোমাকে দিয়ে গেছেন। তোমার শত্রু থাকবে না ভাবছ কি করে!'

'কি ঠিক বলছি।'

চার্লি বলল, 'সুহাসকে তো সব বলেছি।'

'তুমি বলেছ, সেও আমাদের সব বলেছে, যার জন্য তুমি দায়ী নও, অথচ তোমাকে তার দায় বহন

করতে হচ্ছে। দায়টা কি। বল! তোমাকে কোনও অনুসরণকারী তাড়া করছে না, তাড়া করছে, তোমার ঠাকুরদা। কেন তাড়া করছে। তা হলে এত খোঁজাখুঁজি কেন। জাহাজেও অনুসরণকারী উঠে আসে কি করে। সুহাসকে নিয়ে কাকে খুঁজতে বের হয়েছিলে। যদি সত্যি সে অনুসরণকারী হয়, কেন সে তোমাকে অনুসরণ করছে। হাজার প্রশ্ন। তোমার ঠাকুরদা কেন জাহাজে উঠে আসবেন। তিনি বেঁচে নেই। তিনি কি করে এই জাহাজে উঠে আসতে পারেন। এতে কি মনে করতে পারি না, তুমি মানসিকভাবে সুস্থ নও। অথবা কি মনে করতে পারি না, তোমার কোনও অজ্ঞাত পাপ আছে। অজ্ঞাত পাপের তাড়নায় তুমি মাঝে মাঝে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেল! বল! কথা বলছ না কেন। সুহাস সাড়া দিচ্ছে না। আমরা তাকে আর কোথায় খুঁজতে পারি। অপেক্ষা ছাড়া আমাদের আর কি করণীয় থাকতে পারে। চার্লি অকপট হও। প্লিজ। কাঁদলে চলবে! তুমি উত্তর দিচ্ছ না কেন।

চার্লি শক্ত হও। আমি জানি সুহাসেব কিছু হলে মাথা ঠিক রাখতে পারবে না। কিন্তু আমাদের শক্ত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। বুঝে দ্যাখ, তোমার বাবা তোমাকে জাহাজে তুলে এনেছেন—জাহাজে নিয়ে বছরের পর বছব ঘুরছেন। জাহাজেই তুমি বড় হয়ে গেলে! কেন? তাঁর কি কোনও দুরভিসন্ধি আছে। তাঁর কিংবা আর কারও। তুমি তো বলেছ, ইভিন কাউন্ট অল দোজ হু হেট ইয়ো উইদাউট কজ।'

'তুমি বলেছ, তাঁরা ইনফ্লুয়েসিয়েল ম্যান। দোজ হু প্লট টু পানিস ইয়ো, দো ইউ আর ইনোসেন্ট। দো ডিমান্ড দ্যাট ইয়ো বি পানিশড ফর হোয়াট ইয়ো ডিড নট ডু।

তারা তোমাকে কি শাস্তি দিতে চায়! সব খুলে না বললে কিছু করা যাবে না। আমরা চেষ্টা করছি। আমাব মনে হয় তুমি সবাইকে চেন।

তোমার কাকার নাম নিশ্চয়ই জানবে। বল জান কি না।'

'আঙ্কেল রাচেল বেঁচে নেই। তিনি বেঁচে থাকলে আমার এই দুর্গতি কিছুতেই হত না মুখার্জি। চার্লি রুমালে মুখ চেপে কথা বলছে।'

'আচ্ছা আঙ্কেল রাচেলকে দেখলে চিনতে পারবে! মুখার্জির চোখে প্রত্যাশা ফুটে উঠছে।'

'বুঝতে পারছি না। আবছা মনে আছে।'

'কবে তাকে শেষ দেখেছ।'

'আমি খুবই ছোট। এই চার পাঁচ বছর। যুদ্ধে যাবার আগে তিনি ঠাকুরদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। ঠিক চিনতে পারব কিনা জানি না।'

মুখার্জি কিছুটা দম নিলেন যেন। 'যুদ্ধে তিনি কবে যোগ দেন?'

'যোগ দেন কবে বলতে পারব না। আমার এখন মাথাও ঠিক নেই। সুহাস কোথায়! সে কোথাও আছে! সাড়া দিচ্ছে না।'

'যেখানেই থাকুক খুঁজে বের করব। চল উপরে উঠি। মিঃ ফিলের কাছে আজ একবার যেতে পারবে?'

'সুহাস কোথায়? ফিল বলছ কেন। সুহাসকে ফেলে আমি কোথাও যাব না। কোথাও না।'

'সুহাসকে ফেলে আমিও যাব না। কথা দিচ্ছি। তাকে খুঁজে পেলেই আমরা যাব। তাকে আমরা ঠিক খুঁজে বের করব। যেখানেই থাকুক। সব ঠিক হয়ে যাবে। ঘাবড়াবে না।'

আসলে মুখার্জির কেন যে মায়া হল, এত অগাধ বিশ্বাস আর ভালবাসা যে নারীর তার প্রতি আর কতটা নিষ্ঠুর আচরণ করা যায়। তিনি তাঁর নিষ্ঠুর আচরণের জন্যও কেমন কিছুটা অনুতপ্ত। মুখার্জি চার্লির মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, অবোধ কন্যাকে তিনি মাঝে মাঝে দেশে গেলেও এ-ভাবে আদর করেন।

আর জাহাজে যেতে হবে না বাবা।

না, আর যাই!

কিনারায় কোথাও কাজ খুঁজে নাও।

ঠিক কাজ খুঁজে নেব। ভালই লাগে না তোদের ছেড়ে থাকতে। আমাকে ছেড়ে তোদের থাকতে কষ্ট হয়, আমার বুঝি হয় না! আজ চার্লিকে দেখে নিজের মেয়ের কথা বড় বেশি মনে পড়ছে।

সুহাসকে খুঁজতে গিয়ে চার্লিকে এ-ভাবে একা পাওয়া যাবে মুখার্জি আশাই করতে পারেননি। ইনজিন রুমের সিঁড়িতে সবাই একে একে নেমে আসছে।

এক প্রশ্ন, পাওয়া গেল?'

মুখার্জি বললেন, 'না।'

চার্লি হেঁটে চলে যাচ্ছে। বয়লার রুম পার হয়ে পাগলের মতো দু'হাত মুখে বেখে চিৎকার করছে 'সুহাস তুমি কোথায়? সুহাস উত্তর দাও। সুহাস—'

আসলে এই আর্তডাক কোনও নিবিড় এবং নিরুপম উপাসনার মতো। চার্লি সিঁড়ি ধরে বাঙ্কাবে ঢুকে যাচ্ছে। সে কাউকে বিশ্বাস করছে না।

'সুহাস, সুহাস।'

আসলে এক নারী তার প্রিয়জনকে জ্যোৎস্না রাতে সমুদ্রে যেন ডুবে যেতে দেখছে।

চার্লি যদি কিছু একটা কবে বসে।

বাব বার সে বলছে, আই অ্যাম উইদ ইয়ো অলওযেজ, ইভিন টু দা এনড অফ দি ওয়ার্লড।

এই পৃথিবীর শেষেও সে সুহাসেব সঙ্গে আছে। ভাবতে গিয়ে তাঁর মতো অভিজ্ঞ জাহাজিব চোখেও জল এসে গেল।

তিনি চার্লির পেছনে ছুটছেন। চার্লি একদণ্ড দাঁড়াচ্ছে না। সামনে বঙের টব পড়ল, লাথি মেরে উড়িয়ে দিল। সিঁড়ি ধবে উঠে যাচ্ছে লাফিয়ে। সে কাউকে যেন বিশ্বাস কবতে পারছে না। দৌড়ে যমুনাবাজুর কয়লার বাঙ্কারে ঢুকে গেল। সুটের মুখে টর্চ মেরে ঝুঁকে দেখল। সুটেব গর্তে কযলার মধ্যে যদি চিৎপাত হয়ে পড়ে থাকে। গঙ্গাবাজুর বাঙ্কারে ঢুকে গেল। সেখানেও টর্চ মেরে দেখল, যদি পড়ে থাকে।

তারপর কযলার পাহাড়ে টর্চ মেবে দেখল। সে ছুটে যাচ্ছে। জাহাজের সবাই হাজিব। কাপ্তান জাহাজে নেই—কেউ যেন এই উদ্‌ভ্রান্ত ছেলেটিকে নিরস্ত কবতে পারবে না। এমন কি মুখার্জিও ভয পেতে শুরু করেছেন। চার্লি থামছে। তেলঘামে মুখ চক চক করছে। বিস্ফারিত চোখ। দেবী তাঁব বণচণ্ডী রূপ নিতে শুরু করেছেন। চোখে বিন্দুমাত্র অশ্রু নেই। ঝিম ধবা ভাব চোখে মুখে। দেবী ফল্কায ফল্কায় ছুটে গেলেন। কাঠ ছুঁড়ে ফেলে দিতে থাকলেন। কারপেন্টারকে ডেকে তার ঘর খুলতে বললেন।

কোথাও তাকে আটকে রাখা হয়েছে।

কারপেন্টাব চার্লির রুদ্রমূর্তিতে ভয় পেয়ে মুখার্জিকে বলল, কিযা মাংতা বাবু।

আরে আগে তোমাব স্টোব খুলে দেখাও।

কার্পেন্টার দৌড়ে চাবি নিয়ে দরজা খুলে দিল। ঘরে ঢুকে কাঠ, র‍্যাদা, বাটালি, হাতুড়ি যা কিছু সামনে পেল ছুঁড়ে ফেলে দিল ডেকে। তারপর বের হয়ে ক্রশ বাঙ্কারে নেমে দুমদাম দবজায় লাথি মারতে থাকল।

মুখার্জি বসে পড়লেন।

তিনি আর কিছুই ভাবতে পারছেন না।

তিনি তবু চার্লির কাছে গিয়ে বললেন, 'এটা কি হচ্ছে। সব ভাঙচুর করছ। সব ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছ!' তিনি ছুটে গেলেন, থার্ডমেটের কাছে। বললেন, 'একটা বিহিত করুন। আপমারা হাঁ করে দেখছেন!'

থার্ডমেটও খেপে আছেন। সোজা জবাব, 'মাথা গরম ছোকরা। বাপই সামলাতে পারে না, আমাদেব দায় পড়েছে! যা খুশি করুক। আরে একজন নেটিভকে নিয়ে তোর এত মাথা গরম কবার কি আছে! কোথাও গেছে। আসবে।'

থার্ডমেট তো ভালমানুষ! তিনিও নেটিভ বলে গালাগাল দিচ্ছেন। এই বর্ণবিদ্বেষও একটা যে হেতু হতে পারে এই প্রথম টের পেলেন মুখার্জি।

তিনি বুঝতে পারছেন, জাহাজে চার্লিকে শুধু সুহাসই সামলাতে পারে। আর কেউ পারে না। কারও সাধ্য নেই। সবাই তামাসা দেখতে বোট-ডেকে, ফল্কায জড়ো হয়েছে। এ-ছাড়া তারাও যেন নিরুপায়।

কি যে হবে!

জাহাজে লণ্ডভণ্ড অবস্থা।

চার্লি কারও সঙ্গে আব কথা বলছে না। চোখ মুখ শক্ত হয়ে গেছে। সে বোট-ডেকে ছুটে আসছে কেন।

ইনজিন সারেঙ দলবল নিয়ে ক্রশ বাঙ্কারের দরজা খুলতে গেছেন। মুখার্জিবাবুই বলেছেন, 'খুলে দেখান। চার্লি কাউকে বিশ্বাস করছে না। সুহাস গেলই বা কোথায়! কিছু একটা অঘটন ঘটেছে। চার্লি বোধহয় জানে।'

আর এ-সময়ই বোট-ডেকে ছোটাছুটি শুরু হয়েছে। চার্লি কাপ্তানের কেবিনে ঢুকে গেছে। চার্টরুম থেকে চাবি এনে দরজা খোলারও যেন তর সইছে না। সে লক ভেঙে দিল চিজেল আর হাতুড়ি মেরে। কেউ সামনে যেতে সাহসই পাচ্ছে না। কেন লক দুমড়ে মুচড়ে লাথি মেরে কেবিনের দরজা খুলছে—তাও বুঝতে পারছেন না মুখার্জি! মুখার্জি কেন, কেউ না। সবাই তটস্থ। জাহাজে এ-কি অনাসৃষ্টি শুরু হল—আর তখনই দেখা গেল চার্লি বের হয়ে আসছে। হাতে বাপের নিরাপত্তার আগ্নেয়াস্ত্র। পিস্তল তুলে সে হেঁটে যেতেই, অফিসার ইনজিনিয়াররা যে যার কেবিনে ঢুকে দরজা লক করে দিয়েছে। চার্লি নিচে নেমে গেল। এলিওয়েতে রেডিও অফিসারেব দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ঠাণ্ডা গলায় চার্লি বলল, মিঃ উইলিয়াম ডু ইয়ো নো হোয়াই আই হ্যাভ কাম! আই অ্যাম হিয়ার টু টেল ইয়োর ফেট! তারপর সহসা চিৎকার করে উঠল চার্লি এখন কি হবে? স্কাউন্ড্রেল। বলেই দুমদাম দরজায় লাথি মারতে থাকল চার্লি। মুখার্জি এলিওয়েতে কি ঘটছে বুঝতে পারছেন না। তিনি বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখার্জি বুঝলেন, এই সুযোগ। চার্লির হাতে পিস্তল দেখে যে যার মতো পালাচ্ছে। মুখার্জি কাপ্তানেব ঘরে ঢুকে গোপন চাবিটির খোঁজে সব লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছেন। না, পাওয়া যাচ্ছে না—কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। র‍্যাক থেকে সমুদ্র-সংক্রান্ত সব বই টেনে নামালেন। ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন সব। লকার টানাটানি করেও ফল হচ্ছে না। কাগজপত্র যা পাচ্ছেন, জড়ো করছেন। কোথায় রাখেন। উপরে যিশুর মূর্তিটা। টেবিলে লাফ দিয়ে উঠে ওটা টেনে নামালেন। কেন যে তাঁর মনে হচ্ছিল, ঈশ্বরের মুখ মুখোস হয়ে গেলে সাংঘাতিক হয়। দেশ ভাগ হয়। হাজার লক্ষ মানুষ গৃহহারাও হয়। ধর্ষণ, লুণ্ঠন, গৃহদাহ কিছুই বাদ যায় না। তিনি যিশুর মূর্তিটির ভেতর কিছু আছে টের পেলেন। ফাঁপা। ভিতরে কিছু আছে। দুমড়ে মুচড়ে আছাড় মেরে মূর্তিটি ভেঙে ফেলতেই ইউরেকা।

মুহূর্তে কাজ সেরে ফেললেন মুখার্জি। সেই গুপ্তলকার থেকে যা কিছু চিঠিপত্র, ছবি, ডরোথি ক্যারিকোর গাইড বুক, দলিল দস্তাবেজ—এবং তাঁর কিছুই খুঁটিয়ে দেখার সময় নেই—এইসব কাগজপত্র থেকে যদি কিছু উদ্ধার করা যায়। সামান্য চিরকুটটি পর্যন্ত যত্ন করে ফাইলবন্দী করে ফেললেন। আর মাঝে মাঝে দরজায় উঁকি মেরে দেখছেন, কেউ যদি কোনও অদৃশ্য জায়গায় লুকিয়ে থাকে। তিনি জানেন না, নিচে এলিওয়েতে কি হচ্ছে।

তবে খুবই ত্রাসে পড়ে লোকজন ছোটাছুটি করছে, এবং এক বিধ্বংসী আচরণের সাক্ষ্য এখন এলিওয়েতে চলছে, চলুক। ভেবে লাভ নেই। সুহাসের যাই হোক, তিনি এই সুযোগ নষ্ট করতে পারেন না। একটা হেতু আছে, যা চার্লি জানে, অথচ প্রকাশ করার ক্ষমতা নেই। অফিসাররাও জানতে পারেন—কিন্তু মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন। নানা দুশ্চিন্তায় তাঁর এখন মাথা ঠিক না থাকার কথা। অথচ খুবই ঠাণ্ডা মাথায় কাজ সেরে বের হয়ে পড়লেন। কাপ্তান কেবিনে ঢুকে যাই দেখুক, পুত্রের কাণ্ড ভেবে মাথায় হাত দিয়ে বসবেন। কারণ কাপ্তানের নিরাপত্তার জন্য যে আগ্নেয়াস্ত্রটি সেটিও যখন খোয়া গেছে, তখন আর তাঁর বিষদাঁত কতটা প্রখর হতে পারে।

মুখার্জি কাপ্তানের কেবিন থেকে বের হয়ে দেখলেন, বোট-ডেকে কাকপাক্ষিটি নেই। তিনি নিচে নেমে দেখলেন পিছিলে সবাই জটলা করছে। ডেকের দিকে কেউ যেতে সাহস পাচ্ছে না। তাঁর এখন কিছুই

দেখার সময় নেই। ছুটে আসার মুখে সবাই বলল, 'শিগ্গির যান। চার্লি দরজায় দাঁড়িয়ে শাসাচ্ছে। মার্কনিসাব দরজা লক করে ভিতরে ঘাপটি মেরে আছেন! চার্লি পাগল হয়ে গেছে। চার্লি মার্কনিসাবের দরজার সামনে হামলা করছে!' মুখার্জি কেমন আচমকা ধাক্কা খেলেন। লোকটিকে তো জাহাজে প্রায় দেখাই যায় না।

দিনরাত ট্র্যান্সমিশান রুমে পড়ে থাকে। তার মুখটিও যেন তাঁদের ভাল চেনা নেই। তিনি এই খবরে অন্যসময় হলে খুবই বিপাকে পড়ে যেতেন—এখন তাঁর কাছে সবই অর্থহীন। যিনিই সেই ইভিল হোন, সুহাসকে উদ্ধার করতে না পারলে সেই অদৃশ্য শত্রুর শাস্তির যেন আর গুরুত্ব থাকে না। তিনি জানেন, তবু চার্লি থেকে যাবে। চার্লির গায়ে হাত দেবার সাহস কারও নেই—তাও এই দুদিনে জানা হয়ে গেছে। সে যদি খুনটুনও করে বসে, তবু সে যেন রেহাই পেয়ে যাবে। এত যার দাপট সুহাসের কিছু হলে সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে যাবে না কে বলতে পারে!

চার্লিকে শত্রুমুক্ত করতে পারলেও তাঁর একটা যেন সান্ত্বনা থাকবে। তিনি দ্রুত নিচে নেমে গেলেন। ফোকসালের দরজা খুলে লকারে ফাইলটি রেখে ভাল করে টেনে দেখলেন লকার। তারপর দরজা বন্ধ করে লক করে দিলেন। দরজা ঠেলে দেখলেন, নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না, যত রাতই হোক, তাঁকে আজ সব কাগজপত্র ফিলের জিম্মায় পৌঁছে দিতে হবে। মানুষটি যে প্রকৃতই ধার্মিক, ঘোড়ায় চড়ে বসলেই টের পাওয়া যায়। মানুষের বসবাস কত সুন্দর হয় তাঁর এলাকায় না ঢুকলে বোঝা যায় না।

এসব ভাবনা যে কেন মাথায় আসছে। অন্তত আর একবার শেষ চেষ্টা। তিনি সুরঞ্জন অধীরকে নিয়ে ছুটতে থাকলেন। চার্লিকে স্বাভাবিক করে তুলতেই হবে। সুহাস তো বলেছে, চার্লি খুবই ঈশ্বরবিশ্বাসী। সে পাপকে ভয় পায়। তার এই পাপবোধই এতদিন তাকে রক্ষা করে আসছে। সে কিছুই করতে পারছে না। প্রতিশোধ চরিতার্থ করার ক্ষমতা থাকতেও সে নিজেকে কষ্ট দিয়েছে, ঈশ্বরের পৃথিবীতে বুনোফুল হয়ে ফুটে থাকার জন্য সে শাস্তি মাথায় পেতে নিয়েছে। সে জানে, তার ঠাকুরদার ইচ্ছেই এটা।

চার্লি সুহাসকে বলেছে, ওয়ান ডে, ইন এ ভিসান, গড টোল্ড হার সাম অফ দ্য থিংস দ্যাট ওয়াজ গোয়িং টু হ্যাপেন ইন হার লাইফ। চার্লিকে তিনি নাকি বলেছেন, প্রতীক্ষা তোমাকে একদিন বুনো ফুলের সৌন্দর্য প্রদান করবে। চার্লি নাকি ঘুমের মধ্যে এ-সব দেখতে পায়। সে নাকি তাঁর ঈশ্বরকে বার বার প্রশ্ন করে, হাউ অফেন সুড আই ফরগিভ হিম হু সিনস এগেইনস্ট মি? সেভেন টাইমস? ঈশ্বরের জবাব, নো, সেভেনটি টাইমস সেভেন। সুহাসই বলেছে, চার্লির কি যে সব অদ্ভুত ধারণা মুখার্জিদা।'

মুখার্জি ছুটছেন। অধীর সুরঞ্জনও ছুটছে সঙ্গে।

চার্লি কিছু করে বসতে পারে। হাতের কাছে কাউকে না পেলে নিজেকেও শেষ করে দিতে পারে।

কেমন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে মুখার্জির। শেষে মার্কনি সাব! মুখোস, অনুসরণকারী, ডেরিক তুলে রাখা কার কাজ হবে! সেকেন্ড কি সত্যি নির্দোষ। তিনি যে সেকেন্ডকে দেখলেন, লাইটহাউজের পাশে, মগড়াকেও দেখেছে সুহাস। মগড়ার এত সাহস!

তিনি ডাকছেন, 'চার্লি, চার্লি। প্লিজ চার্লি পাগলামি করবে না। ওয়েট ফর সেভেনটি টাইমস সেভেন।'

চার্লি মার্কনি সাবের দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লাথি মারছে দরজায়।

মুখার্জি চার্লির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ধস্তাধস্তি করে চার্লি পেরে উঠছে না। কেবল বলছে, 'বেটার ইউ কিল মি মুখার্জি। আই উড র্যাদার বি ডেড দ্যান এলাইভ।'

'চার্লি' প্লিজ লিশেন। তুমি জানো, হি প্রটেক্টস।' সঙ্গে সঙ্গে চার্লির সারা শরীরে ঠাণ্ডা হিমেল স্রোত নেমে আসছে। সে কেমন অস্থির হয়ে পড়ছে। গায়ে জোর পাচ্ছে না। বসে পড়ছে। পিস্তলটা হাত থেকে আলগা হয়ে গেল।

তার যেন আর দাঁড়াবারও ক্ষমতা নেই। দেয়ালে কপাল ঠুকতে ঠুকতে বলছে, 'ওঃ লর্ড হাউ লঙ মাস্ট আই কল ফর হেলফ বিফোর ইউ উইল লিশেন?'

সহসা চার্লি চুপ মেরে গেল। কি যেন খুঁজছে।

চারপাশে তাকিয়ে বলল, 'কে ডাকে?'

সবই স্বগতোক্তি।

'ইজ দ্যাট হোলি স্পিরিট?'

'কি বলছে।' চার্লির চোখে মুখে ত্রাস।

'হি সিঙ্কস বিনিথ দ্য ওয়েভ! অ্যান্ড ডেথ ইজ ভেরি নিয়ার!'

সে চিৎকার করে উঠল, 'না না।'

আর তখন ইনজিনরুমে ধুন্ধুমার কাণ্ড! নিয়ামত নাকি দেখেছে, খোলের ভিতর থেকে এক অপদেবতা উঠে আসছে। লোমের মতো শ্যাওলা গজিয়ে গেছে অপদেবতার সারা গায়ে। কোনও রকমে নিয়ামত জান বাঁচিয়ে উপরে উঠে এসেছে। ডেকে এসে কিছু বলারও চেষ্টা করল।

গোঙানির মতো শোনাল।

ভূ-ভূ-ত।

তারপরই ধড়াস করে ডেকে পড়ে গেল। মুখে গাঁজলা উঠছে।

ইনজিন রুমে ভূত!

ইনজিন রুমে অপদেবতা!

শ্যাওলা গজিয়ে গেছে শরীরে। সারা জাহাজে তোলপাড়। নিয়ামতের চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতেই উঠে বসল। বোকার মতো সবাইকে দেখছে। চোখ আগের মতোই ঘোলা ঘোলা। সে আবার পালাতে চাইছে। কখনও বলছে—জিন, কখনও বলছে, শ্যাওলায় ঢেকে আছে—উঠে দাঁড়াতে পারছে না। জাহাজের খোল থেকে উঠে আসার চেষ্টা করছে। মাথা তুলে দিচ্ছে খোল ফুটো করে উঠে আসছে। এমন সব কথাবার্তা। খুবই অসংলগ্ন—কোনও মাথামুণ্ডু নেই।

কখনও বলছে, কবন্ধ।

মুখার্জি নিজেও কেমন কিছুটা বিচলিত। জাহাজে তবে সত্যি কি একটা কিছু আছে। চার্লি ওদের কথাবার্তা বুঝতে পারছে না। সে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। চার্লি নিজেও মধ্যরাতে কি সব শুনতে পায়।

সে মুখার্জিকে বলছে, 'এনি ডিজহনেস্ট গেইন অর ব্লাডসেড!'

'না না। কোনো ব্লাডসেড নয়। ইনজিনরুমে অপদেবতা উঠে আসছে। সমুদ্রের তলা থেকে খোল ফুটো করে উঠে আসছে শ্যাওলায় ঢাকা শরীর। কি জানি কি হচ্ছে জাহাজে—জানি না!'

হঠাৎ চার্লির কি হল কে জানে—'মাই গ্লিটারিং সোর্ড' বলতে বলতে ইনজিন রুমের দিকে ছুটতে থাকল। আর সবাই অবাক। একজন সমুদ্র দানব, সত্যি যদি দানব হয়ে থাকে—জাহাজিদের কুসংস্কারের তো অন্ত নেই—তারা এমন বিশ্বাস করতেই পারে—এমন খবরে চার্লির মাথায় কি করে সহসা জেগে যায়, মাই গ্লিটারিং সোর্ড। চার্লির মাথায় কি দুষ্টু আত্মা ভর করে আছে। মুখার্জি ছুটে যেতে চাইলে, বংশী এসে জাপটে ধরল। কোমর ধরে ঝুলে পড়ল। 'দাদা যাবে না। পায়ে পড়ি। তুমি গেলে আমাদের কেউ থাকবে না। যাবে না দাদা! দোহাই যাবে না। আমি তো জানি, সে দেখা দেবেই। সে যখন উঠে আসছে কাউকে রেহাই দেবে না।'

মুখার্জি এক ঝটকায় বংশীকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন। ছুটতে থাকলেন, সুরঞ্জন এবং সবাইকে ইশারায় ডাকলেন। তিনি সিঁড়ি ধরে নেমে যাচ্ছেন অন্ধকার ইনজিনরুমে।

না, নিচে আর কেউ নামতে সাহস পাচ্ছে না। ইনজিন রুমে নেমে যাবার দরজায় সবাই শুধু উঁকি মারছে। নিচে তারা দেখল, মুখার্জি সিলিন্ডারের তলায় নেমে যাচ্ছেন। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেলেন অন্ধকারে।

পঁচিশ ত্রিশ ফুট নিচে স্পষ্ট দেখাও যাচ্ছে না। আলো জ্বালা নেই।

বেশ ঘুটঘুটে অন্ধকারই বলা যায়।

এমন কি নিচে তারা কারও সাড়াশব্দও পাচ্ছে না। তারা হা-হুতাশ করছে। কি করবে বুঝতে পারছে না।

মুখার্জি নিচে নেমে জেনারেটরের পাশে এসে অবাক—আবার কেউ সুইচ অফ করে দিয়েছে। কার কাজ।

তিনি কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। চার্লি কোথায় গেল। ইনজিন রুমেই তো নেমে এসেছে। কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল! জাহাজটায় কি তবে সব প্রেতাত্মা উঠে এসেছে! চার্লি নিমেষে উধাও। গ্লিটারিং সোর্ড কে! চার্লি কি তাকে চেনে! তবে কি বংশীর কথাই ঠিক! জাহাজে কিছু একটা আছে! সে চার্লিকেও খেল, সুহাসকেও খেল! ম্যাককে তো আগেই খেয়েছে।

মুখার্জির সারা গায়ে লোম খাড়া হয়ে উঠল। তিনি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সুইচ জ্বেলে দিতে পর্যন্ত ভয় পাচ্ছেন। জীবনেও এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হননি। দিন যত যাচ্ছে, সত্যি সব ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। আর তখনই মনে হল, তিন নম্বর বয়লারের কাছে কারা যেন নড়াচড়া করছে। কে যেন বলছে 'আমি ধরছি। উঠে এস।'

চার্লির গলা।

না আছে। আরও কেউ আছে। তিনি তাঁর দৃঢ়তা ফিরে পাচ্ছেন। মুহূর্তে তিনি তাঁর মধ্যে রক্ত সঞ্চালন শুরু হয়েছে বুঝতে পারলেন।

কাছে গেলে দেখতে পেলেন সব। নিয়ামত ভয় পেতেই পারে। সত্যি শ্যাওলায় ঢাকা এক কবন্ধ। মাথায় মুখে শরীরে শ্যাওলা ভর্তি। চার্লি শ্যাওলা তুলে সাফসুফ করছে। কেউ যেন সারা সকাল ধরে জলের তলায় চুবিয়ে ইনজিন রুমের পাটাতনে সুহাসকে ফেলে রেখে গেছে। সুহাস বসে আছে—কিছুটা স্থবির। মায়ের মতো চার্লি তাকে জাপটে ধরে রেখেছে এক হাতে। অন্য হাতে গা থেকে মাথা থেকে শ্যাওলা সাফ করছে। তা হলে চার্লির গ্লিটারিং সোর্ডের এই অবস্থা!

চার্লি সুহাসকে নিয়ে এতই নিমগ্ন ছিল, তিনি পাশে দাঁড়িয়ে আছেন তাও টের পাচ্ছে না। কিংবা পায়নি। পেলেও তার যেন কিছুই আসে যায় না। সে জানে, হি প্রোটেকস্। এই বিশ্বাস তাকে দুর্বল হতে দেয়নি। যদিও সে কিছুক্ষণ আগে তার সেই ঈশ্বরের প্রতি সব বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল—এখন আর সে তা বোধহয় মনে করতে পারছে না।

মুখার্জি ওদের মাথার উপর ঝুঁকে পড়লেন।

চার্লির তখনও যেন হুঁশ ফেরেনি!

মুখার্জির স্তম্ভিত প্রশ্ন, 'কি করে হল! কি হয়েছে?' চার্লি এবার তাকাল। সে সুহাসকে ধরে রেখেছে। ছেড়ে দিলেই যেন পড়ে যাবে। দেখল, মুখার্জি এসে গেছেন।

চার্লির যেন আর ভাবনা নেই। বলল, 'কি করে হল জানি না। কিছু বলছে না। অল দিস টাইম আই ওয়াজ লুকিং ডাউন—আনএব্‌ল্ টু স্পিক এ ওয়ার্ড। দেন সামওয়ান, হি লুকড এ ম্যান—টাচড্ মাই লিপস্। আমি সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলি। আই ওয়াজ টেরিফাইড বাই হিজ অ্যাপিয়ারেন্স অ্যান্ড হ্যাভ নো স্ট্রেংথ! কাউকে ডেকে বলতে পারিনি সুহাস জলের তলা থেকে উঠে আসতে পেরেছে। আমি নিজেও ভাল ছিলাম না।'

উপরে ইনজিন রুমের দরজায় ভিড়। সুরঞ্জন নেমে আসতে চাইছে জোরজার করে। কিন্তু তাকে কেউ নামতে দিচ্ছে না। কিছু একটা আছে। কিছুই দেখা যায় না। তিন নম্বর বয়লার, কনডেনসার আর উপরের অতিকায় সিলিন্ডার সব অদৃশ্য করে রেখেছে। কেউ বুঝতেই পারছে না, চার্লি কিংবা মুখার্জি ইনজিনরুমের কোথায় আছে। এমন কি কারও সাড়া শব্দও নেই। নিচে এত অন্ধকারই বা কেন! যেন যেই নামবে, তাকেই ইনজিন রুমের অন্ধকার গিলে ফেলবে। তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেউ নিচে নেমে যে ইনজিন রুমের আলো জ্বেলে দেবে তারও যেন সাহস নেই।

সুরঞ্জনকে আটকে রাখাই দায়। সারেঙের হুকুমও সে অগ্রাহ্য করে নেমে যেতে চাইলে, ইমতাজ, হাফিজ, আরাফত, বংশী তাকে জাপটে ধরে আছে। নামলেই শেষ। ইনজিনরুমে হাফিজ।

'তোর কি মাথা খারাপ। দেখছিস না, যে নামছে, সেই নিখোঁজ। চার্লি গেল, মুখার্জিও গেলেন। সুহাস বোধহয় তার আগেই গেছে। নিয়ামতের নসিব, খুদার কুদরতে পার পেয়ে গেল।'

সারেঙ বললেন, 'আল্লা মুবারক।'

মুখার্জি তখন বললেন, 'উঠতে পারবি! ধরব!'

সুহাস কোনও রকমে হাত তুলে দিল।

সে খানিকটা বিশ্রাম চায়। যেন বলতে চাইল, একটু দম নিতে দাও।

চার্লি তখনও বলে চলেছে, 'দেন হি টাচড মি এগেইন অ্যান্ড আই ফেল্ট মাই স্ট্রেংথ ইজ রিটার্নিং।'

চার্লি ফের বলল, 'গড লাভস হিম ভেরি মাচ। আমাকে তিনি যেন বললেন, ডোন্ট বি অ্যাফ্রেইড। কাম ইয়োরসেলফ—বি স্ট্রং, ইয়েস স্ট্রং।'

মুখার্জির দিকে তাকিয়ে কিছুটা অনুনয়ের ভঙ্গিতে চার্লি বলল, 'হি ক্যান হার্ডলি ব্রিদ। ওকে একটু সুস্থ হতে দাও মুখার্জি।'

মুখার্জি এবার নিজেও বসে গেলেন শ্যাওলা সাফ করার জন্য। অন্ধকারে ভাল বোঝাও যাচ্ছে না। তাঁর মনে হল, আরে একটা আলোও তো জ্বালা নেই। তিনি দৌড়ে যাবার সময় কি যেন মাড়িয়ে দিলেন।—সাপেব মতো পায়ে কিছু জড়িয়ে গেল। একটু ঝুঁকে গোড়ালির কাছে হাত দিলেন। সেই রবারের মোটা বিদ্যুতের তারটি পড়ে আছে। টেনে আনলেন। জলের ট্যাঙ্ক কিংবা বিলজ—অর্থাৎ ইনজিন রুমের অন্ধকাব জায়গাগুলি সাফ করার জন্য—তারের ঠুলি পরা আলোটাব দরকার হয়। তা হলে কি সুহাসকে কেউ জলেব ট্যাঙ্কগুলিতে ঢুকিয়ে দিয়ে প্লেট চাপা দিয়ে সরে পড়েছে। সে কে?

তিনি দৌড়ে এসে সুইচগুলো সব অন কবে দিলেন। মুহূর্তে গোটা ইনজিনরুম আলোকিত হয়ে উঠল। আর তখন উপরে হল্লা। খুবই ভুতুড়ে কাণ্ড। কে জ্বালাল আলো—তাও এতক্ষণ পর। কে সে। নিচের কিছুই দৃশ্যমান নয়। সেই অতিকায় সিলিন্ডার আর কনডেনসার সব আড়াল হয়ে আছে। দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যে যেদিকে পারছে, ছুটে পালাচ্ছে।

ইনজিনরুমে যে মুখার্জি এবং চার্লি আছে এটা জাহাজিদের মাথাতেই নেই। তারা বিশ্বাসও করে না। তিনজনকেই গিলে খেয়েছে ইনজিনরুম। নিরক্ষর অর্ধশিক্ষিত জাহাজিরা ভূত-প্রেতে বিশ্বাসও করে থাকে। সেই এক কথা—কিছু একটা আছে। সি-ডেভিল, লুকেনারই হোক, আর, সেই বরফঘরের মেয়েমানুষের লাশই হোক। তারাই যত কুকর্ম করে বেড়াচ্ছে। কে মরতে যাবে।

সুরঞ্জন অধীরকে ডেকে বলল, 'তোরা কি সবাই পাগল হয়ে গেলি! চল নিচে দেখা দরকার। চার্লি, মুখার্জিদা কোথায় গেলেন।'

সুবঞ্জনের আর সাহস নেই, একা ইনজিন রুমে নেমে যায়। ভূতের আতঙ্ক বড়ই সংক্রামক ব্যাধি। অধীর সঙ্গে না থাকলে সেও একা নেমে যেতে সাহস পাচ্ছে না। কারণ সিঁড়ির মুখে উঁকি দিয়ে সে কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। আতঙ্ক হবারই কথা।

কিছু হলে মুখার্জিদা এতক্ষণে উঠে আসতেন। চার্লি উঠে আসত। অথবা মুখার্জিদা তাকে ডেকে নিয়ে যেতেন। ইনজিন রুমে কোনও সাড়াশব্দ নেই। ভুতুড়ে নিস্তব্ধতা। কেবল সেই ব্যালেস্ট পাম্পের কিট কিট শব্দ না হয় স্টিম ককগুলি ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করছে! সেই কখন নেমে গেল! আর কারও পাত্তা নেই!

অধীর বলল, 'আজব ব্যাপার।'

চার্লি বলল, 'আমি ধরছি ওঠো।'

মুখার্জি বললেন, 'উঠে যেতে পারবি!'

'পারব তো বললাম। দ্যাখ না।'

চার্লি আর মুখার্জিদার উপর ভব করে হাঁটছে সুহাস। জামা প্যান্টে লাল হলুদ ছোপ ছোপ দাগ। জামা-প্যান্টে জলের পচা গন্ধ। দম বন্ধ করে মারার মতলবে ছিল কেউ! সে কে! অথচ এখন কোনও প্রশ্ন করাই ঠিক নয়। চার্লিও চাইছে না, কারণ ক্লান্ত অবসন্ন আর এতই ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে সুহাসকে, চার্লি মাঝে মাঝে অজানা আতঙ্কে যেন অস্থির হয়ে উঠছে।

তখনই কেন যে চার্লি কাতর গলায় বলল, 'মুখার্জি, তুমি আমাকে আগুনে পুড়িয়ে মারবে না তো!'

মুখার্জি কঠিন গলায় দাঁত চেপে বললেন, 'এখনও বলছি, সুহাসের কিছু হলে, তোমাকে আগুনে পুড়িয়ে মারব। শুধু তোমাকে নয়, সবাইকে।'

সুহাস এত অবসন্ন, তবু কেন যে না বলে পারল না, 'ওর কি দোষ! চার্লি কি করেছে। তুমি ওকে পুড়িয়ে মারতে চাও!'

বেচারা।

তাদের দেখতে পেলে, হাজার প্রশ্ন। ভিড়। তামাসা। সুহাস তামাসার পাত্র হয়ে যাক তিনি চান না। মুখার্জি ফের আলো নিভিয়ে দিলেন। বললেন, 'সিঁড়িতে বোস। উঠতে দম পাবি না। সিঁড়িতে দুজন একসঙ্গে পাশাপাশি ওঠা যাবে না।'

সুরঞ্জন হরেকেষ্ট অধীরও ভুতুড়ে আলো অন্ধকারে তাজ্জব হয়ে গেল। ইনজিন রুম নিজের খুশিমতো যা খুশি তাই করছে। কখনও আলো, কখনও অন্ধকার তার। ম্রিয়মাণ হয়ে গেল। তারা নেমে যেতে সাহস পেল না। ডেকে উঠে গেল! সত্যি ইনজিন রুমে কিছু আছে।

বংশী ফক্কায় বসে হাসছে। মাথা ঝাঁকাচ্ছে। 'কি রে হিম্মত গেল কোথায়। উঠে এলি কেন। যা। নাম্! মজা বোঝো।'

মুখার্জি বললেন, 'চার্লি, তোমার অনেক কাজ। ভেঙে পড়বে না। আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে মাথা ঠিক রাখতে পার না। তোমাকে নিয়েও কম আতঙ্ক না। তোমার বাবা তো যা করলেন। জুজু না দেখলে কেউ এত ঘাবড়ায় না। শেষ পর্যন্ত তিনি জাহাজিদের কাছে...। ইফ এনি ট্রাবল—ট্রাবলটা কি! তুমি জান, কেন তিনি তাঁর ফেথফুল সেলরদের প্রত্যাশা করছেন।'

চার্লি সাড়া দিচ্ছে না।

'যাক গে, তুমি আমাকে এখনও বিশ্বাস করতে পারছ না। হয় বিশ্বাস কবতে পারছ না, নয় সাহস পাচ্চ না। তুমি নিজেও বুঝতে পার না, আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে কত মারাত্মক হয়ে উঠতে পাবো। শোনো, বাপের কেবিন তো লণ্ডভণ্ড কবে রেখেছ। আলো থাকুক না থাকুক কিছু আসে যায় না। ইনজিন রুমটাকে ভুতুড়ে করে রাখার দরকার আছে। আলো ইচ্ছে কবেই নিভিয়ে দিলাম। তোমার সঙ্গে আমাব কিছু জরুরি কথা আছে। এই সুহাস।'

'বলো!'

'উঠতে পারবি? সিঁড়ি ভাঙতে পারবি? শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্চে না তো!'

'আর একটু বসি।'

'চার্লি, তুমি উপরে যাও। কারপেন্টারকে ডেকে বলো কেবিনে নতুন লক যেন লাগিয়ে দেয়। এক্ষুনি। আমি সুহাসকে নিয়ে উপরে যাচ্ছি। ভয় নেই, ওকে না নিয়ে উপবে যাব না। কথা দিচ্ছি।'

চার্লি কিছুটা ক্ষোভের গলায় বলল, 'আমাকে কি করতে বলছ?'

'উপরে উঠে যেতে বলেছি। কেবিনের লক পালটে দিতে বলেছি। মন দিয়ে শোনো! কারপেন্টারকে বলবে, কেউ যেন না জানে, অফিসার ইনজিনিয়াররাও ভাল নেই। তোমার রণচণ্ডী মূর্তিতে তারা ঘাবড়ে গেছে। কেউ বের হচ্ছে না। সবাই দরজা বন্ধ করে বসে আছে। এটা একটা সুযোগ। কেবিনে যেখানে যা ছিল, তুলে রাখবে। কেবিনে ঢুকে যেন তিনি কিছু বুঝতে না পারেন!'

চার্লি দ্রুত সিঁড়ি ধরে উঠে যাচ্ছিল।

এত বাধ্য!

মুখার্জি অবাকই হয়ে গেলেন।

তবে মুখার্জিকে বিশ্বাস করছে। আস্থা ফিরে এসেছে। ভাল! এটাই চান।

'চার্লি!'

সিঁড়ির ধাপ থেকে ঝুঁকে সাড়া দিল চার্লি—'ডাকছ।'

'এদিকে নয়। ওদিকে। স্টোকহোলডে চলে যাও। স্টোকহোলডের সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে যাবে সোজা বোট-ডেকে। মনে হয় কার্পেন্টারও তার কেবিনে গা ঢাকা দিয়ে আছে। উপরে না গেলে অবশ্য কিছু বুঝতে পাববে না।'

চার্লি দৌড়ে নেমে এল। সে স্টোকহোলডে ঢুকে যাবার জন্য ছুটলে তিনি বললেন, 'বুঝতে পারছ, এখন—বাপের কেবিনটির কি ছিরি করে রেখেছ! এই নাও। বলে তিনি পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে দিয়ে বললেন, যেখানে ছিল, রেখে দেবে। এটাও নাও। ধরো।'

চাবিটি হাতে নিয়ে চার্লি কি করবে বুঝতে পারল না।

মুখার্জি বললেন, 'তোমার বাবার। যিশুর মূর্তির মধ্যে ছিল। মূর্তিটি তুলে রাখবে। মাথাটি আলগা বসিয়ে দেবে। চাবিটি ভেতরে রেখে দেবে!'

আবার ছুটছিল চার্লি।

আরে এত ছটফট করছ কেন? সব টেনে হিঁচড়ে ফেলেছ। র‍্যাক থেকে বই কিছুই বাদ দাওনি দেখছি। আচ্ছা আচ্ছন্ন হলে কি করে ফেল কিছুই কি মনে থাকে না? সবই দেখছি ভুলে যাও। বাবার লকার মরতে খুলতে গেলে কেন। চাবিটি রাখার আগে লকারটি বন্ধ করে রাখবে। কি মনে থাকবে?'

'থাকবে।'

'এই তো চার্লি। কি সুন্দর তুমি। চার্লি কত ভাল, কেউ বুঝলই না। চার্লি সব পারে। আর দেরি নয়। বি কুইক।'

চার্লি অন্ধকারে বয়লারের পাশ দিয়ে ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর তখনই তিনি সুহাসের হাঁটুর কাছে ঝুঁকে বসলেন। বললেন, 'কি হয়েছিল বল্! বলতে কষ্ট হলে, থাক।'

'না। মানে!'

সুহাস যেন অতিশয় রুগ্ণ। ক্ষীণকণ্ঠ। তবু যা বলল, যা বুঝতে পারলেন, তাতে তাঁরও গা কেমন কাঁটা দিয়ে উঠল। অশরীবী। সুহাস তার মুখ দেখেনি। মাথায় চ্যাপটা টুপি। টুপির অন্ধকারে মুখ ঢাকা।

দিনদুপুরে এমন কাণ্ড ঘটলে কে আর মাথা ঠিক রাখতে পারে। ট্যাঙ্কগুলি খুব একটা ব্যবহারও হয় না। সমুদ্রে দীর্ঘ পাড়ি দিতে হলে এদিককার ট্যাঙ্কগুলিতে জল নেওয়া হয়—খাবার জলের ট্যাঙ্ক আলাদা। বয়লারে মিষ্টি জলের টানাটানি পড়তে পারে—এভাপরেটর চালিয়েও জল জোগানোর ব্যবস্থায় অনিশ্চয়তার আশঙ্কা থাকলে ট্যাঙ্কগুলিতে জল নেওয়া হয়। এক দুবার সাফ করা যে না হয় তাও না, তবু সুহাসকে এই জলের ট্যাঙ্কগুলিতে এক অশরীরী ঢুকিয়ে দিয়ে গেল।

প্লেট ফেলে দেবার আগে সুহাস স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে, ইয়েস ইউ আর এ ডেনজারাস ট্র্যাপ টু মি। কাপ্তান নিজে তো তখন মোটরবোটে। স্বচক্ষে দেখা! ট্যাঙ্কগুলির অজস্র গলিঘুঁজি। আলো নিবিয়ে দিলে মৃত্যুফাঁদ—অশরীরী তাও জানে। মগজ ঠাণ্ডা না থাকলে বের হয়ে আসা একজন দক্ষ জাহাজির পক্ষেও কঠিন।

'তোর হুঁশ ছিল না!'

'না! কেন যে মনে হল, অন্ধকারে কিছুই নাগাল পাচ্ছি না, কেবল হাতড়াচ্ছি। ম্যানহোলে ঢুকে একটার পর একটা ট্যাঙ্ক পার হচ্ছি—আলো নিভিয়ে দিলে হঠাৎ মনে হল, সবই অন্ধকার। নিজেকেও দেখতে পাচ্ছি না। তারপর আর হুঁশ ছিল না।'

'তারপর!'

'তারপর কিছু জানি না। আলো জ্বলছে না কেন।'

'দরকার আছে।'

মুখার্জি যত দূর সম্ভব জেনে নিতে চান। জানাজানি হয়ে গেলে—হুড়মুড় করে জাহাজিরা সবাই নেমে আসবে। গোলমাল বাধবে। খুবই গুপ্ত খবর—আর কেউ জানুক তিনি চান না। সুরঞ্জনকে পা বলা যাবে। অধীরকেও। কিন্তু তিনি বুঝতে পারছেন না, সুহাসের হুঁশ ফিরল কখন। কখন শ্যাওলার মাখামাখি হয়ে প্লেট ঠেলে উপরে উঠে আসার চেষ্টা করল। তারা তো ডাকাডাকি ক করেনি। সুহাস কি শুনতে পায়নি। সুহাস কি তখন বেহুঁশ হয়ে জলের তলানিতে পড়েছিল।

'টের পেলি কখন। হুঁশ ফিরল কখন?'

'আমি যে কি শুনতে পাচ্ছিলাম।'

'কি শুনতে পাচ্ছিলি? কেউ কি তোকে ডাকাডাকি করছিল। আমি চার্লি দুজনেই তো খোঁজাখুঁজি

করে গেছি। একবারও মনে হয়নি, খোলের মধ্যে জলের ট্যাঙ্কে তুই পড়ে থাকতে পারিস। কি শুনতে পাচ্ছিলি?'

'মনে করতে পারছি না। কে যেন ডাকছিল, সুদূর থেকে কে যেন ডাকছিল। যেন অন্য জন্মের কথা শুনতে পাচ্ছিলাম।'

'কি শুনতে পাচ্ছিলি।'

সুহাস সিঁড়িতে হাঁটু মুড়ে বসে আছে। ভিজে জামা প্যান্ট আর অজস্র শ্যাওলা লাল নীল, শরীরে শুকিয়ে উঠছে। সে ক্রমে এক বিচিত্র বর্ণের মানুষ হয়ে যাচ্ছিল। ইনজিন রুমের আবছা অন্ধকারেও তা টের পাওয়া যাচ্ছে। ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। কিন্তু তাতে মুখার্জি বিশেষ দুর্বল হয়ে পড়ছেন না। অন্য জন্মের খবরটা কি জানা দরকার। অন্যজন্ম বিষয়টাও তো খুবই গোলমেলে।

'কে ডাকছিল?' মুখার্জি অধৈর্য হয়ে পড়ছেন।

'মনে করতে পারছি না। কিছুটা খালি মাঠে অন্ধকার রাতে কোনও নিখোঁজ বালকের বাবা যদি নাম ধরে ডেকে যায়—'

'তোর বাবার কণ্ঠস্বর?'

'না না। আমার বাবা হবে কেন? আমি কেন মনে করতে পারছি না কে ডেকে গেছে।'

সুহাস দু-হাঁটুর ফাঁকে মাথা গোঁজ করে বসে থাকল। সে কিছুই যেন মনে করতে পারছে না। কে ডেকে গেল! কে তিনি! গভীর রাতে হাতে লণ্ঠন নিয়ে কেউ যেন মাঠ পার হয়ে চলে গেল।

তার বাবা! মানে কতদিন দেশ থেকে তারা চিঠিও পায়নি। বাবা কি তাকে সাহস জুগিয়ে গেছেন। —তুমি খুঁজে দ্যাখো। ঘুলঘুলিতে মাথা গলিয়ে দাও। সামনের দিকে এগিয়ে যাও! বার বার চেষ্টা কর। তুমি শেষ প্রান্তে আছ। একবার ভুল হতে পারে, দু'বার, তিনবার, চারবার হতে পারে। চেষ্টা কর সামনেই তোমার বাতিঘর। দূরে দ্যাখো, ওই যে দূরে। মাথার উপরে কত বড় আকাশ। সমুদ্রের জল তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তুমি হেরে যাচ্ছ কেন। আবার। আবার জলে ডুবে যাচ্ছ কেন? বাতিঘরের আলো দেখতে পাচ্ছ না। সেখানে গেলে সব মিলবে। আহার, উত্তাপ, আশ্রয়।

তাকে বয়লারের দিকে যেতে হবে সে জানে।

বারবার কে যেন ডাকছে।

কেউ ডাকছে—অথচ মনে করতে পারছে না। না ডাকলে তার হুঁশ ফিরত না। সে কে?

মুখার্জি খুবই বিব্রত বোধ করছেন।

সুহাস হাঁটুর ভেতর সেই যে মাথা গুঁজে বসে আছে—কিছুতেই মুখ তুলছে না। সে মনে করতে পারছে না।

কেউ না ডাকলে সে সাহসও পেত না।

'কি রে, কে ডাকল মনে করতে পারছিস না?'

হঠাৎ সুহাস কেমন ভেঙে পড়ার মতো বলল, 'আমার বাবা ডাকবে কেন! অতদূর থেকে তার কণ্ঠস্বর কি করে ভেসে আসবে! কিছুই বুঝতে পারছি না। তিনি তো ভালই ছিলেন। নিউপ্লাইমাউথ বন্দরেও তাঁর চিঠি পেয়েছি। শুধু জানতে চেয়েছেন, আমি সাবধানে চলাফেরা করি কি না। জাহাজে ফিরতে যেন রাত না করি। কবে জাহাজে ফিরছে, দেশে কবে ফিরব—এ-ছাড়া তার তো আর কোনও খবর থাকে না।'

'তবে সে কে? তোর বাবা ভালই আছেন। দুশ্চিন্তা করিস না।'

আর তখনই সুহাসের মাথায় বিদ্যুতের মতো খেলে গেল। সে মনে করতে পারছে। অবোধ বালকের মতো উচ্ছ্বাস দেখা দিল। 'জান, আমাকে কেউ ডাকছিল। সুহাস, ইফ এভরিওয়ান ডেজার্টস ইয়ো আই ওন্ট সুহাস!'

'জান, আমাকে কেউ বলেছিল, আই অ্যাম উইদ ইয়ো অলওয়েজ, ইভিন টু দ্য এনড অফ দি ওয়ার্লডি।'

মুখার্জি বললেন, সে তোমার পাশে আছে এটুকুই এখন আমাদের সান্ত্বনা। তারপরেই মনে হল—চার্লি কতটা পারবে!

পৃথিবীর শেষ প্রান্তে সে সুহাসের জন্য কতটা যেতে পারবে। নিরুপায় দুই তরুণ তরুণীর হয়ে তিনিও কতটা লড়তে পারবেন জানেন না। তবু তাঁকে শক্ত হতে হবে। সুহাস এবং চার্লিকেও। কেন এত দুর্বল হয়ে পড়ছেন! চার্লি না ডাকলে সুহাসের বোধ হয় আর হুঁশও ফিরে আসত না। চার্লিই তাকে যমের দুয়ার থেকে ফিরিয়ে এনেছে। আই অ্যাম উইদ ইয়ো, ইভিন টু দ্য এন্ড অফ দি ওয়ার্লর্ড। মানুষের কাছে এর চেয়ে বড় আর কি খবর থাকতে পারে।

বাড়ির কথা তাঁর মনে পড়ছে। স্ত্রীর কথা মনে পড়ছে। ছেলে মেয়ে, ঘর বাড়ি এবং পৃথিবীর এই যে দূরতম প্রান্তে তিনি ভেসে বেড়াচ্ছেন সেও সেই এক টানে। আছি, আমরা আছি—যত দূরেই ভেসে বেড়াও আমরা আছি। কেন যে চার্লির এই সামান্য ইচ্ছের কথা, আজ তাঁকে এত দুর্বল করে দিচ্ছে! মেয়েটার কথা ভেবে চোখে জল এসে গেল।

মেয়ের মুখ মনে পড়ে যাওয়ায়, না চার্লির অসহায় জীবনের কথা ভেবে তাঁর চোখে জল তিনি বুঝতে পারছেন না।

'এ কি, তুমি কাঁদছ দাদা!'

'কোথায়।'

'ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করছ কেন!'

'ওঠ। পারবি!'

'পারব!'

শেষে অশরীরীর পাল্লায় তুইও পড়লি! বংশী হলেও না হয় বুঝতাম। মগড়া হলেও না হয় কথা ছিল! লেখাপড়া শিখে ঘণ্টা করলি! মুখার্জি যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছেন। লোকটা ধূর্ত। চার্লি মার্কনিসাবের দরজায়ই বা ছুটে গেল কেন! মার্কনিসাব জাহাজে আছে বোঝাই যেত না। হয় ট্র্যানসমিশান রুম না হয় নিজের কেবিন—কিনারায় সে নেমে গেলেও ধরা মুশকিল, কে নেমে গেল! একবার ট্র্যানসমিশান রুমের দরজায় উঁকি দিতে গিয়ে ধমকও খেয়েছেন। নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকে ট্রেসপাসারসের দায়ে পড়ে গিয়েছিলেন!

'ধরব!'

'না না ধরতে হবে না। উঠছি তো!' সুহাস বিরক্ত।

'একে ওঠা বলে! আরে আমরা তো আছি। এত ঘাবড়ে গেলি কেন? লোকটার হাত পা মুখ কিছুই চোখে পড়েনি!'

'না। মনে করতে পারছি না। দড়ি ছাড়ার মতো অদৃশ্য সুতোয় জামা প্যান্ট টুপি ঝুলে ঝুলে ইনজিন রুমে নেমে এল।'

'তোর সঙ্গে কথাও বলল!'

'বলেছে তো!'

'বেশ করেছে। বারবার বলেছি, তোকে সারেঙ ছাড়া কোথাও কেউ কাজ দিতে পারে না। তিনি তোর মুরুব্বি। তাঁর কথা তোর একবার মনে হল না! এদের কথা শোনার জন্য তো জাহাজে উঠে আসিসনি। এরা কে? আমরা এদের চিনি না। ডাকল আর নেমে গেলি!'

'জান আমি কেমন হয়ে গিয়েছিলাম! আমার কোনও বোধ-বুদ্ধি কাজ করছিল না।'

'হিপনোটাইজড! আবার বসে পড়লি কেন! কি হয়েছে! আরে তুই তো এখনও স্বাভাবিক নোস দেখছি। বংশীর কথাই আমাকে ঠিক ধরে নিতে হবে! জাহাজে একটা কিছু আছে! আমি বিশ্বাস করি না। বারবার বলছি, গুজবে কান দিবি না। জাহাজটা পুরনো, ঠিক। ভাঙা লঝ্ঝরে ঠিক। সি-ডেভিল লুকোনার বলেও কেউ থাকতে পারেন। তাই বলে তুই অশরীরীর পাল্লায় শেষে পড়ে যাবি। গুজবের

শিকাব হবি। মানুষ মরে গেলে কিছু থাকে। জাহজেও তুই নিশির ডাক শুনতে পেলি।'

'আমি কিছু ভাবতে পারছি না। আমার যে কি হয়।'

'মারব এক লাথি। মরে যা। তোর মরে যাওয়াই ভাল। একটা মেয়ে যা পাবে, তুই তাও পারিস না। সে তো লাফিযে নেমে এল। গ্লিটারিং সোর্ড বলে চিৎকার করতে করতে নেমে এল। গ্লিটাবিং সোর্ডেব এই পরিণতি। অশরীরীকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে তুলে আনল তোকে। তোর লজ্জা হয় না। শরীর কেমন করছে! গুঁফো লোকটার ঘুষি খেয়েও লজ্জা হয না। তোব মরে যাওয়াই উচিত।'

আসলে তিনি আস্থা ফিরিয়ে আনতে চান সুহাসের মনে।

'দুষ্ট আত্মা বলে কিছু নেই। থাকে না। মানুষ মরে গেলে শেষ। তোকে চার্লিই বারবার ডেকে বলেছে, সুহাস ইউ, এভরিওয়ান ডেজর্টস ইয়ো—আই ওন্ট। চার্লিই বলেছে, আই অ্যাম উইদ ইয়ো অলওয়েজ, ইভিন টু দ্য এন্ড অফ দি ওয়ার্ল্ড! আর তুই ভাবছিস, অশরীবী—অশরীবী কখনও বলতে পারে—ইয়ো আর আ ডেনজারাস ট্র্যাপ টু মি! বল্, সে কোন্ অশবীরী, যে তোকে খুন কবতে চায? তার তুই কি ক্ষতি করেছিস, বল্!'

সুহাস বলল, 'সেই তো! আমাকে খুন করে তার কি লাভ!'

'লাভ-অলাভ পরে হবে। হাঁট। ওঠ। না উঠতে পারলে আমিই তোকে ধাক্কা মেবে ফেলে দেব। ভেবেছিস কি! সবাই মিলে জ্বালাতে শুরু করলি। বংশী, তুই—নিযামত, সেও তো ভূত দেখে ছুটে গেছে। তুই প্লেট ঠেলে উঠে আসছিলি—অন্ধকারে ভূত ভেবে সে ছুটে গেল। ডেকে গিয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল? মুখে গ্যাঁজলা। ভূত এবার কে কি ভাবে দেখে ফেলে বুঝতে পারছিস! চার্লি ছুটে না নেমে এলে তোকে তুলেও আনা যেত না। তোর যে ফের কিছু হত না, অশবীরী তোকে আবাব প্লেটের ভিতর ঠেসে দিয়ে চাপা দিত না, প্লেট চাপা দিয়ে নাচানাচি করত না কে বলতে পাবে! বল্, মেয়েটার কথা ভাববি না!'

তাবপব ফেব বিড়বিড় করে বকছেন, 'চার্লিরও হযেছে মরণ। গ্লিটারিং সোর্ড না ছাই! ভোঁতা মাল। এত কিল খেয়ে কেউ হজম করে! রুখে দাঁড়ায় না! রুখে দাঁড়াবার সাহসও হারিযে ফেলেছিস! ভোজ, বিরিয়ানি, পায়েস, সব মাটি। সবাই না খেয়ে আছে তোর জন্য।'

'আমার খুব খিদে পেয়েছে।'

'ঠিক আছে, খিদে পেয়েছে যখন বুঝতে পাবছিস, ধীরে ধীরে উঠে যা। চুপচাপ হেঁটে যাবি। কেউ জিজ্ঞেস করলে কোনও কথা বলবি না। অশরীরী টেনে নিয়ে গেছে বললে, খুন কবব বলে দিলাম। কিচ্ছু হয়নি। ট্যাঙ্কে পিছলে পড়ে গেছ! উঠতে পারছিলে না। আমি তুলে এনেছি। কি, মনে থাকবে তো।'

'ইনজিন রুমে মবতে কেন এলাম, কেউ যদি জানতে চায। আজ তো ছুটি।'

তাও তো ঠিক। মুখার্জি ভেবে পাচ্ছিলেন না, সুহাসের এই দুর্গতির কথা কি ভাবে চাউব করা যায়। ওর জামা প্যান্ট, মুখ, চুল শ্যাওলায় শক্ত হয়ে যাচ্ছে। ভূতের মতোই দেখতে। তাঁর নিজেরও মাথায় আসছিল না। তারপর এত খোঁজাখুঁজি, কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না, শেষে মুখার্জি সাব নিজে নেমে আস্ত ভূত টেনে তুলেছেন ডেকে। ছোটাছুটিও শুরু হয়ে যেতে পারে। মুখার্জি আর মানুষ নেই, তিনিও ভূত হয়ে গেছেন ভাবতে পারে সবাই। কেউ কাউকে বিশ্বাস করছে না যে। বংশীর যে এক কথা, ভূত কে নয় দ্যাখো। কাকে বিশ্বাস করবে! জাহাজ নিজেই যে ভূত নয়, ভুতুড়ে জাহাজ নয় কে বলবে।

ইনজিন রুমে আলো দপ করে জ্বলছে, দপ করে নিভছে।

ইনজিন রুমে কিছু একটা আছে। সে খুশিমতো আলো জ্বালায় নেভায়। কেউ নেই দরজাব মুখে। মুখার্জি হাঁটছেন।

মুখার্জির মাথা গরম। ভূত বিষয়টাই এত বেআক্কেল—যে বলতে হলে সব খুলে বলতে হয়। উঠে গেলে সবাই দৌড়ে আসবে, না পালাবে তাও বুঝতে পারছেন না। তিনি নিজেও ভাল ছিলেন না। জাহাজে কি যে সব হচ্ছে কেবল ভাবছিলেন।

কি ভেবে বললেন, 'দাঁড়া আসছি।'

তারপর ডেকে উঠে দেখলেন, পিছিলে সবাই জটলা করছে। তাঁকে দেখে অনেকেই ছুটে আসছে। সবাই না। শেষে মনে হল অনেকেও না। কারণ, কেউ কেউ কিছুটা এগিয়েই আবার ফিরে গেছে। কেবল সুরঞ্জন অধীর ফিরে যায়নি। সারেঙসাবও এগিয়ে আসছেন। কিছুটা সংশয়ের গলায় তিনি বললেন, 'ইনজিনে কে যে আলো জ্বালাচ্ছিল, নেভাচ্ছিল।'

মুখার্জি বললেন, 'কেন আমি জ্বালাচ্ছিলাম।'

'তাই বলি, কে জ্বালায়। এদিকে তো সবার এক কথা। জাহাজ ছেড়ে দেবে। কিনারায় নেমে যাবে। কি যে করি। জাহাজে বংশী ঘোঁট পাকাতে শুরু করেছে। ভুতুড়ে জাহাজে কেউ থাকতে রাজি না।'

'কে বলে। কোন্ শুয়োরের বাচ্চা বলে নেমে যাবে।'

বংশী ছুটে বের হয়ে বলল, 'আমি বলছি।' নিয়ামত ছুটে এসে বলল, 'আমি বলছি। ভুতুড়ে জাহাজে আমরা থাকব না।'

'ধুস, যাও মাথা ঠাণ্ডা করে গোসল টোসল করে খানা খাওগে। সারেঙসাব পাত পেতে ফেলতে বলুন। সুহাস আসছে। জলের ট্যাঙ্কের ফুটোতে ওর লকারের চাবি পড়ে গিয়েছিল। খুঁজে পাচ্ছিল না। আহাম্মকের কাণ্ড আর কাকে বলে।'

'পেয়েছে খুঁজে।'

'পায়। বলুন। কিছুতেই উঠে আসছিল না। বললাম, খানা রেডি সবাই বসে আছে, তুই কি রে। তোকে সবাই খোঁজাখুঁজি করছে। পরে না হয় খুঁজে দেখা যাবে।' তারপর ইনজিন রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকলেন, 'এই সুহাস, বললাম না, পরে খুঁজে দেখা যাবে। আয়। দাঁড়িয়ে থাকলি কেন।'

সুহাস উপরে উঠে এলে বললেন, 'অবস্থাটা বুঝুন। চাবির খোঁজে তিনি পাতালে ঢুকে গিয়েছিলেন। চাবিটা এখন পেলে হয়।' সুহাস ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। মুখার্জিদার কথাবার্তা কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না।

মুখার্জির দম ফেলার সময় নেই। তিনি ছুটছেন। সারেঙসাবও ছুটে গেছেন।

'আরে কোথায় যাচ্ছেন। গোসল কখন করবেন।'

তিনি দূর থেকেই হাত তুলে বললেন, 'আসছি। সবাইকে বসিয়ে দিন। আমার জন্য বসে থাকবেন না।'

তাঁর এখন দরকার চার্লির খোঁজ খবর নেওয়া। চার্লি এক দণ্ডে তাঁর এতটা অনুগত হয়ে যাওয়ায় তিনি খুশি। চার্লিই পাবে। বাপের কেবিনে ঢুকে চার্লি কতটা কি করতে পারছে, নিজের চোখে না দেখতে পেলে স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। লক লাগানো হয়েছে কি না। অফিসার ইনজিনিয়াররা কে কি করছে। ধরা পড়ে না যান। কত সব চিন্তা মাথায় জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

বোট-ডেকে উঠে দেখলেন, চার্লি তাঁর কথামতোই কাজ সেরে ফেলেছে। কার্পেন্টার নতুন লক লাগিয়ে দিয়েছে। কাপ্তানের কেবিন কেউ খুলে সব তছনছ করে গেছে দেখলে মনেই হবে না। চার্লি বোট-ডেকে নেই। তাই কেবিন থাকতে পারে। নক করতেই চার্লি দরজা খুলে মুখ বাড়াল।

'সব ঠিক আছে?'

'আছে।'

'অফিসার ইনজিনিয়াররা বের হয়েছিল?'

'না। বের হয়নি। দরজা বন্ধ করে বসে আছে।'

'ভাল। কোনও ভাবনা নেই। সুহাস ভাল আছে। শোনো, তাকে তুমি জলের ট্যাঙ্ক থেকে তুলে এনেছ, কাউকে বলতে যাবে না।'

'তোমাদের ওদিকে আমি একবার যেতে পারি?'

চার্লির কি কাতর অনুনয়! সে যে তার কেবিনে বসে সুহাসের জন্য ছটফট করছে, বুঝতে কষ্ট হল না। চার্লি স্বাভাবিক না থাকলে এভাবে কথা বলতে পারত না। এমন কি চার্লি হয়তো ভেবেছে, এত সব ঘটে যাবার পর পিছিলে ছুটে যাওয়া তিনি পছন্দ নাও করতে পারেন। সাত পাঁচ ভেবেই

দরজা বন্ধ করে বসে আছে ভিতরে।

তার বেশি কথা বলার সময় নেই। তিনি শুধু বললেন, 'না এখন না। সময় হলে বলব। ববং দেখে নাও আমাদের কর্তারা কে কি করছেন কেবিনে।' বলেই তিনি সোজা বাটলার, মেসরুম মেটদের কেবিনের দিকে ছুটে গেলেন। সব দরজা বন্ধ। নক করতেই বাটলাব মুখ বাড়াল দবজা খুলে। সন্তর্পণে। ভূত দেখাব মতো কাউকে দেখে ফেলবে—এমন ফ্যাকাসে মুখ। মুখার্জিবাবুকে দেখে খানিকটা স্বস্তি। বলল, 'চার্লি নাকি খেপে গেছে। পিস্তল নিয়ে ঘোরাফেরা করছে!'

'না না! কে বলেছে।'

'ইনজিনরুমে ভূত! ইনজিনরুমে লীলা খেলা তেনার?'

'ধুস, যত বাজে কথা।'

'নিয়ামত যে ভূত দেখে উঠে এল!'

'আরে বাটলার সাব বুঝছ না, সবার মেজাজ বিগড়ে আছে। কাহাতক কতদিন সমুদ্রে পড়ে থাকা যায়। সব খ্যাপা কুকুব হয়ে আছে। বাহনা। স্রেফ বাহানা।'

যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল বাটলাবের। মুখার্জি বললেন, 'যাও। পিছিলে চলে যাও। সবাইকে বল, চার্লিব মেজাজ পড়েছে। সে ঘবে বসে ছবি আঁকছে। ভয়ের কিছু নেই।'

আসলে জাহাজে ফেব স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসুক, যেন কিছুই হয়নি, রেডিযো অফিসারের দবজায় নক করলে কেমন হয়! কেন যে মনে হচ্ছে, মুখোস, অনুসরণকারী সব ভাঁওতা। নতুন করে ছক সাজাতে না পারলে আততায়ীর হদিস পাওয়া যাবে না। হাতে কি তার ব্যান্ডেজ বাঁধা। কিন্তু সাহস হল না। তাঁর আস্পর্ধা সহ্য নাও করতে পারেন। তখনই বাটলার একটা খাম বাড়িয়ে দিল। বলল, 'নিন ধরুন। সবার নাম ঠিকানা আছে।'

তিনি সব ভুলে গেছেন-মতো বললেন, 'নাম ঠিকানা? কার?'

'বারে একটা তালিকা চাইলেন না।'

'অ। একদম ভুলে গেছি। দাও।'

আব তিনি দেরি করলেন না। মেসরুমমেট থেকে কাপ্তানবয়কে খবব দিয়ে এলেন, সবাই চলে যাও। খানা রেডি। দেরি কোব না। ইস তিনটে বেজে গেল। কখন খাবে।

তিনি ফিবে এসে দেখলেন, সুহাস তার ব্যাঙ্কে বসে আছে। সে খেতে যায়নি। সুরঞ্জন গেছে উপবে। তার খাবার আনতে। সে এখনও বেশ কাহিল। কিন্তু মুখার্জি বিরক্ত। আলাদা খাওয়াব কি হল বুঝলেন না। ঘরে ঢুকে বসতেই সুহাস বলল, 'যাও বসে থাকলে কেন? চান টান কববে না?'

'যাচ্ছি। তুই বসে আছিস কেন? তুই উপবে যা। ওখানে খাবি। নিচে খাবাব নিয়ে আসার কি হল?'

'আমি তো বললাম। সুরঞ্জন কিছুতেই শুনল না।'

'ইস ওব মাথা এত মোটা। আরে তুই না আমরা সহকারী? বুঝতে পারছিস না সুহাস নিচে খেলে কথা হবে না। যা যা চলে যা। সবার সঙ্গে খেয়ে নে। আমি যাচ্ছি।' বলেই তিনি বংশীব লকার টেনে তেল নিলেন হাতে, মাথায় মাখলেন। গামছা কাঁধে ফেলে উপরে চলে গেলেন। এক দণ্ড সময় নষ্ট করা মানে, আততায়ী আরও এক ক্রোশ রাস্তাব ফারাক সৃষ্টি করে ফেলবে। সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। কাপ্তান ফিরে এলে কি হবে তিনি জানেন না। কানে তাঁর কথা উঠবেই। সারা জাহাজ তোলপাড়, চাপাচুপি কতটা আর কাঁহাতক দেওয়া যাবে। সংশয় দেখা দিলে কাপ্তান খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিতে পারেন। ঘরে ঘরে তল্লাশি চালাতে পারেন। এত সব আতঙ্ক থেকেই তিনি ঠিক সাঁঝ লাগার মুহূর্তে, অধীর সুরঞ্জনকে তাঁব ফোকসালে ডেকে পাঠালেন। সব বলে, শেষে বললেন, এই হল চার্লির গ্লিটারিং সোর্ডের পরিস্থিতি। আমাকে বের হতে হবে। ফিলের কাছে যাচ্ছি। আমার ধারণা ফিল এবং চার্লির আঙ্কেল রাচেল একই ব্যক্তি। মিলিটারি ট্র্যানসপোরট সিপ, প্রেসিডেন্ট কলিজের নিখোঁজ পাঁচজনের সে একজন। চার্লির ঠাকুরদার প্রমোদ-তরণী ডরোথী ক্যাবিকো জাহাজটিই মার্কিন সামরিক দপ্তরে ঢুকে প্রেসিডেন্ট কলিজ হয়ে গেছে মনে হয়। কাপ্তান তারই খোঁজে এসেছেন।

সুরঞ্জন অধীব সব শুনে স্তম্ভিত। অশরীরী, ডেনজারস ট্র্যাপ, জলের ট্যাঙ্ক, ফিল, কলিজ জাহাজ, মুখোস, চার্লির ঠাকুরদার মুখ, সব মিলে কেমন এক রহস্যের ধোঁয়াশা ক্রমে কাবু করে ফেলছে তাদের। তারা একেবারে নির্বাক। অশরীরী কে সে? সুহাসকে ডেনজারাস ট্র্যাপ বলছে কেন? কাপ্তান জাহাজে ছিলেন না। কে সে তবে?

কত প্রশ্ন।

মার্কনি সাবের দরজায় হামলা।

চার্লির চিৎকার, আই অ্যাম ইয়োর ফেট।

চার্লির গড়াগড়ি—কান্না—বেটার ইয়ো কিল মি, আই উড র‍্যাদার বি ডেড দ্যান অ্যালাইভ। সুবঞ্জন কিছুই বুঝতে পারছে না।

ফিলকে সন্দেহ করছেন। কেন? কিছুই ভেঙে বলছেন না। ফিলকে সুরঞ্জন দেখেনি। শুধু মুখার্জিদার মুখ থেকে সব শোনা। ফিলকে মনে হয়েছে প্রকৃত একজন ধর্মযাজক। মিশানারি কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন দ্বীপে। হাসপাতাল, স্কুল, এবং দ্বীপের সব প্রাচুর্যের হেতু ফিল। একজন গরিব মানুষের মতো তাঁর জীবনযাপন। ফিলকে দ্বীপবাসীরা ঈশ্বরের চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করে। সেই ফিল, চার্লির আঙ্কেল—মুখার্জিদার এমন অনুমানের কি ভিত্তি তাও বুঝতে পারছে না।

সে মাথা নিচু করে বসে আছে। অধীরও বোকা হাবার মতো দেখছে মুখার্জিদাকে।

ফিল মুখার্জিদার কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি আজ তার কাছেই যাবেন। উপকারীর ঋণ স্বীকারের আশায় কাপ্তানের ঘর থেকে পাচার করা কাগজপত্র সঙ্গে নিচ্ছেন। ফিলের কাছে জিম্মা রাখবেন। এত আস্থা মুখার্জিদার। সে যে নতুন উপদ্রব সৃষ্টি করবে না কে জানে!

মুখার্জি বললেন, 'কিরে, রা নেই কেন! তোদের সঙ্গে তবে পরামর্শ করছি কেন? তোদের ডেকে পাঠালাম কেন! তোরা কোনও কথা বলছিস না।'

সুরঞ্জন মুখ তুলে তাকাল। মুখার্জিদাকে দেখল। আবার মাথা নিচু করে দিল। বলল, 'কি বলব দাদা! মাথায় কিছুই আসছে না। ভাবছি তোমার একা যাওয়া ঠিক হবে কি না। সঙ্গে কেউ থাকলে ভাল হত। এতটা রাস্তা রাতে ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া তো সোজা কথা না। রাস্তা হারিয়ে ফেললে কি করবে। কিংবা যদি অন্ধকার থেকে ভূতটুত উঠে আসে। এ-দ্বীপে যুদ্ধের ভূত তো এখনও জাঁকিয়ে বসে আছে দেখছি।'

'ভূত কারও ক্ষতি করে না। ভূতের ভয়ে মরছিস! তোরাও তবে সবাই বংশী নিয়ামত হয়ে গেলি। অশরীরী কখন দেখা যায়? ঘোর সৃষ্টি হলে। নিজের উপর আস্থা হারালে। আর মনে রাখবি, এই যে রহস্য, এটা মনে হয় নিতান্তই পারিবারিক। এঁরা কেউ অপরাধ জগতের লোক নয়। ফেরে চক্রে সব ভূত হয়ে যাচ্ছে। ফেরে চক্রে খুন হচ্ছে। বর্ণবিদ্বেষও যে কাজ করছে না কে বলবে। এক জন নেটিভ ইন্ডিয়ান শেষে ধনকুবেরের নাতনিকে কব্জা করে ফেলল। সহ্য করবে কেন? কি যে হেতু, ফিলের কাছে না গেলে বোঝা যাবে না।'

মুখার্জি কি ভেবে বললেন, 'আমি ঠিক বলছি। সুহাসের মধ্যে চার্লি কোনও ঐশ্বর্যের খোঁজ পেয়েছে। সুহাসের মধ্যে চার্লির এই মহিমা আবিষ্কারই রহস্যের হেতু নয় কে বলবে। চার্লি না হলে বলতে পারে, আই অ্যাম উইদ ইউ, ইভিন দ্য এন্ড অফ দি ওয়ার্ল্ড। বল, বলতে পারে।'

'সবই তো বুঝলাম দাদা। কিন্তু চার্লিকে তার ছদ্মবেশ থেকে বের করে আনা যে খুবই কঠিন।'

'কঠিন বলেই তো চেষ্টা করছি। সোজা হলে কার দায় পড়েছে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বের হয়ে পড়ার। রাস্তা হারিয়ে ফেলতে পারি। দ্বীপটা যে খুব ছোট নয় দু-আড়াই হাজার বর্গমাইল তো হবেই। পাঁচ সাত হাজার লোকের বসবাস। দুর্গম অঞ্চলে হারিয়ে গেলে বেরিয়ে আসাও কঠিন। আর সত্যি যদি নিশির পাল্লায় পড়ে যাই, তবে তো আরও মজা। দেখা যাবে একই চক্করে সারা রাত ঘোরা ফেরা। জাহাজের এই পরিস্থিতি। অজানা দ্বীপে জঙ্গলে ঘোড়া ছুটিয়ে যাওয়া খুব সহজ নয়। এমনিতেই গা ছম ছম করতে পারে। আরে আমিও তো মানুষ!'

'বলছিলাম,' বলে ঢোক গিলল, অধীর।

'কি বলছিলি?'

'কাল সকালে গেলে পারতে না।

'সকালে গেলে খুশি হতে পারতাম। কিন্তু'?

'কিন্তু কি?'

'কাপ্তান যে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজে উঠে আসবেন। রিফ এক্সপ্লোরার থেকে ডিনার সেবে ফিরতে কতটা আর রাত হতে পারে? সুহাসকে ডাক তো। কি করছে।'

সুরঞ্জন বলল, 'শুয়ে আছে। গাঁটে গাঁটে ব্যথা। কেমন মিইয়ে গেছে।'

'মিইয়ে গেলে তো চলবে না। বিপদে ভেঙে পড়লে চলে! প্রতিপক্ষ তবে জোর পাবে না? ডাক। ওর সঙ্গে কথা আছে। ডরোথি কারেকার না ক্যারিকো, ছাই মনেও রাখতে পাবি না, পাঠালাম তো—কি খবব আনল কে জানে!'

সুহাস ভিতরে ঢুকে বলল, 'আমায় ডাকছিলে দাদা?'

'দরজাটা বন্ধ করে দে। মুখ এত চুন করে রেখেছিস কেন! কাছে আয় দেখি। যা দেগালি।' বলে তিনি গায়ে হাত দিতেই সুহাস ককিয়ে উঠল। বলল. 'লাগছে।'

'লাগছে। তা লাগুক। ছাল চামড়া উঠে গেছে? যাক। পুরো ছাল চামড়া খসিয়ে নের্যনি তোমাব চোদ্দ গোষ্ঠির ভাগ্য। বোস। ডরোথি ক্যারিকোর খবর কিছু পেলি!'

'চার্লি তো দিল। কোথায় ফেলে এলাম!'

'কি দিল!'

'আরে একটা বই। বলল, ডরোথি ক্যারিকোর ছবিটবি আছে। লাউঞ্জের ছবি আছে। লাউঞ্জ, সুইমিং পুল, টেনিস খেলার মাঠ সবই নাকি জাহাজটায় ছিল। বইটা নাকি তার ঠাকুবদাব জীবন এবং বাণী।'

'কোথায় সেটা। কোথায় ফেলে এলি!'

'মনে করতে পারছি না।'

'ইনজিনরুমে নামাব সময় হাতে ছিল?'

'ছিল।'

'বইটা দেখছি হাপিজ! বোঝো এবার—আমরা বেড়াই ডালে ডালে, তেনারা বেড়ান পাতায পাতায়।'

'একবার দেখে আসব ইনজিনরুমে?'

'একা নামতে পারবি?'

সুহাসের মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

'পারবি না জানি। ওটা নেইও। এত খোঁজাখুঁজি—বইটা কোথাও পড়ে থাকলে চোখে পড়ত না! দাঁড়া দেখি। বলে তিনি লকার খুলে কি সব টেনে নামাবার সময় বললেন, চার্লির কেবিনে সারা সকাল কি করছিলি? কখন গেলি—'

তিনি নিজেই গজ গজ করছেন।

'ডারোথি ক্যারিকোর লাউঞ্জের ছবিটা যে খুব দরকার। ওটা দেখলে বুঝতে পারতাম। কলিজ জাহাজের সঙ্গে মিল অমিল কতটুকু। ওটা হাতের পাঁচ। কোথায় পাই এখন।'

কিছু কাগজপত্র টানাটানি করতে গিয়ে নিচে পড়ে গেল। সুরঞ্জন হাঁটু মুড়ে বসল! কাগজগুলি জড়ো করতে থাকল।

মুখার্জির সময় নেই হাতে। তিনি কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছেন—আব নানা প্রশ্ন—কিছু তিনি খুঁজছেন—তবু কথার কামাই নেই।

'চার্লি আর কি বলল। কেবিনেই চার্লিকে পেলি?'

'না, ও তো ছবি আঁকছিল। আমি গেলে কেবিনে ঢুকে গেল। দরজা বন্ধ করল। রোমে কি সব ছবি দেখে বেড়িয়েছে, বাপের সঙ্গে, তার গল্প করল। প্রোসরপিনা—না কি যেন নাম ঠিক মনে করতে

পারছি না, মাইকেল অ্যানজেলো, র‍্যাফেল কত সব শিল্পীদেরও নাম বলল। আমি তাদেব নাম জানি কি না, বলল, সে আমাকে রোমে নিয়ে যাবে।'

'প্রোসরপিনাটা কি?'

'ওটা একটা ভাস্কর্য। ভয়ঙ্কর ভাস্কর্য। চার্লি তো তাই বলল। কোনও দানব এক সুকুমারীকে টেনে বুকের কাছে তুলে নিচ্ছে। প্রায় উলঙ্গ করে ফেলেছে। দানবের শরীরটা মানুষের মতো, মুখটা সিংহের মতো। মূর্তিটির নৃশংস মুখ দেখে চার্লি নাকি ভিরমি খেয়েছিল। একটা কুকুর মূর্তিটির পায়ের কাছে বসে আর্ত চিৎকার করছে।'

মুখার্জি বললেন, 'গুঁফো লোকটার সঙ্গে দেখছি খুব মিল আছে। হিপনোটাইজ বিষয়টা বড়ই গোলমেলে—কে জানে কি হচ্ছে জাহাজে!'

পকেট হাতড়াতে থাকলেন মুখার্জি।

'কি খুঁজছ?'

'আরে বাটলার দিল—তালিকা!'

'কিসেব তালিকা।'

'ধুস কিচ্ছু ঠিক থাকছে না। কোথায় রাখলাম!' তারপর লকারে উঁকি ঝুঁকি মারলেন উঠে—'পেয়েছি।'

খাম খুলে মুখার্জি দেখলেন, সব ঠিক আছে কি না। সবার নাম আছে কি না। আছে, কাপ্তান থেকে থার্ডমেট, চিফ ইনজিনিয়ার থেকে ফিফ্‌থ ইনজিনিয়ার, রেডিয়ো অফিসার, কার্পেন্টার, কেউ বাদ নেই। ডেক জাহাজি, ইনজিন জাহাজিরাও কেউ বাদ নেই। নাম, বাড়ির ঠিকানা, স্থায়ী ঠিকানা সব সুন্দর হস্তাক্ষরে বাটলার কপি করে দিয়েছে। কিছুটা স্বস্তি বোধ করায় মনে হল, শেষবারের মতো মগড়াকে বাজিয়ে দেখা দরকার। তাঁর সব সিদ্ধান্তগুলি যে সঠিক নয়—রেডিযো অফিসারের দরজার সামনে চার্লিকে হামলা করতে দেখে টের পেয়েছেন।

মুখোস হয় দুজন পরে ঘুরে বেড়ায় নয় তিনজন। মগড়া, সেকেন্ড ইনজিনিয়ার, এখন হাজিব বেডিয়ো অফিসাব। সেকেন্ড সত্যি মুখোস পরে সেদিন জঙ্গলে বসেছিল, না অন্য কেউ, একবাব মগডাকে বাজিয়ে দেখা দরকার। কারণ সেকেন্ডকে তিনি দেখেছেন ওদিকটায় যেতে, তিনি পরে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্যও হয়ে গিয়েছিলেন। মাইলখানেক রাস্তা অদৃশ্য থাকার পর সেকেন্ড কোন্‌দিকে চলে গেছে জানেন না। তারপর গভীর জঙ্গল, গাছপালা এবং মাঠ। অন্য কেউ যদি হয়। মগড়াকে ডেকে ফের ধাঁতানো দরকার।

'মগড়াকে একবার ডাক তো?' মুখার্জি কাগজপত্র দেখছেন, কিছু খুঁজছেন। গাইডবইও আছে ডরোথি ক্যারিকোর। সবই খুঁটিয়ে দেখা দরকার। বের হয়ে যাবার আগে অন্তত মুখোসটির যদি কিনারা করতে পারেন, কারণ চার্লি তো বলেছে, সে তার ঠাকুরদাকে দেখতে পায়। ঠাকুরদা তাকে অনুসরণ করছে। মুখোস টুখোস সে আর কোনও গুরুত্ব দিচ্ছে না।

মগড়া ঢুকল বলির পাঁঠার মতো। মগড়াকে সুরঞ্জন টেনে নিয়ে এসেছে বলির পাঁঠা যেভাবে টেনে নিয়ে আসে। বোঝাই যায়, মগড়া জাহাজের কাণ্ডকারখানা দেখে খুবই ঘাবড়ে গেছে। বিচলিত। কাল থেকে জাহাজে যা উৎপাত চলছে।

মুখার্জি চোখ তুলে মগড়াকে দেখলেন—হাতের ইশারায় বসতে বললেন—এত সব কাগজপত্রের মধ্যে ডুবে থাকলে যা হয় খুবই খাপছাড়া কথাবার্তা মুখার্জির। বললেন, 'মগড়া আর যাস না। বার বার বলছি। তোর কু স্বভাব ছাড়।'

মগড়া বলল, 'আমি কোথাও যাই না বাবু।'

'ফের মিছে কথা বলছিস?'

'না বাবু সাচবাত বুলছি।'

'বুলে কি পার পাবি!' তিনি সুরঞ্জনকে বললেন, 'সিগারেট দে।' সিগারেট দিলে বললেন, 'ধরিয়ে দে।'

সুবঞ্জন সিগারেট ধরাল। নিজেও নিল একটা। দাদার দু-হাতই কাগজপত্র খোঁজাখুঁজিতে ব্যস্ত। সে সিগারেটটা দাদার ঠোঁটে গুঁজে দিলে তিনি ফের কথা বলতে থাকলেন। দু-ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেটটা নড়ানড়ি করছে কথা বলার সময়।

'তা হলে ধরে নিতে হবে সাচবাত। তুই একবারই উঁকি দিয়েছিলি চার্লিব পোর্টহোলে! আর দিসনি! চার্লি টের পেয়েছে—মুখোস পরে তার পোর্টহোলে কেউ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে। খুন। খুন বুঝিস! রেডিয়ো অফিসার দবজা বন্ধ করে রেখেছিল বলে রক্ষা। তবে আর যাই বল্ তোকে রক্ষা কবতে পারছি না। মুখোসটা তোর লকারে আছে। তুই চার্লির পিছু নিয়েছিস পোর্ট অফ সালফার থেকে। গায়ের রংটি তো বাবু তোমার কাফ্রিদের মতো। মুখ তো তোমার প্রোসরপিনা--প্রোসরপিনা বুঝিস।'

মগড়া হতাশ হয়ে পড়ছে।

'ধরা পড়ে গেছিস। সত্যি কথা বল্, সুহাস তোকে যদি বাঁচাতে পারে। সুহাস বলতেই পারে, চার্লি ওকে তুমি ক্ষমা করে দাও, মাথা খারাপ লোক, বোধবুদ্ধি কম। সে তোমার কোনও অনিষ্ট কবতে চায় না। আজ চোখের উপব দেখলি পিস্তল নিয়ে ঘুবতে। তাবপর তখন তুই কি করবি, সেটা তোব ইচ্ছে। তোর ভালোর জন্য বললাম। এখনও সময় আছে। বাতিল বাথরুমে ওটা দেখিয়ে ভেবেছিলি পার পাবি!'

মুখার্জি জানেন, চাপ সৃষ্টি করতে হবে। সত্য মিথ্যা তিনি কিছু জানেন না। তিনি জানেন শুধু মগড়া তাকে বাতিল বাথরুমে নিয়ে মুখোসটা দেখিয়েছে—যেন সে আর কিছুই জানে না। কৌতূহল থেকে সেও একবার মুখোস পরে পোর্টহোলে উঁকি দিয়েছে। কৌতূহল থাকতেই পারে—মালবাহী জাহাজে পরিস্থরির মতো দেখতে কেউ যদি ঘুরে বেড়ায় কেবিনে, তবে মাথা ঠিক রাখাও দায়।

তিনি হাতে সিগাবেটটা নিয়ে ছাই ঝাড়লেন। বললেন, 'দেখাটা দোষের না। সুযোগ পেলে আমরাও উঁকি দিতাম। চার্লি সাহাব না মেমসাব তুই ই প্রথম টের পেয়েছিলি। তোকে দোষ দিয়েও লাভ নেই। এখন কথা হচ্ছে, কি করবি। খুন হবি, না বেঁচে থাকবি। ম্যাক তো চলে গেল। তুইও চলে যাস আমরা চাই না।'

আব সঙ্গে সঙ্গে হাউমাউ করে মুখার্জির পা জড়িয়ে ধরতে গেল মগড়া। কোনও কথা বলছে না। বলির পাঁঠার মতো কাঁপছে। সে কি বলছে, বোঝাও যাচ্ছে না। তবে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না, মগড়াই মুখোস পরে জঙ্গলে বসেছিল। সেই মুখোস পরে যেত। সর্বত্র সে। সুহাস আব চার্লি বনে জঙ্গলে ঢুকে গেলে তার লোভ হত। গায়ের রঙ আর মুখের জন্য কাছাকাছি থাকলে বিশেষ সুবিধা হত না। ঘোরে পড়ে যেত। মগড়ার কথাবার্তায় তাও বোঝা গেল। নারী পুরুষের লীলা খেলা দেখার লোভেই সে এমন একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজ করে ফেলেছে।

সুরঞ্জন বলল, 'একদম হাউমাউ করবি না। আস্তে। যা ওঠ। মুখোসটা এনে দাদাকে দে।'

মগড়া বের হয়ে গেল, সুরঞ্জনও সঙ্গে বের হয়ে গেল। মগড়া কেমন জড়বুদ্ধি। সে তার লকারে চাবি পর্যন্ত ঢোকাতে পারছে না। লকার থেকে মুখোসটা বেব করতেও সাহস হচ্ছে না। আতঙ্কে চোখ মুখ লাল। সুরঞ্জন নিজেই ওটা নিয়ে দাদার ফোকসালে ঢুকে যাবার সময় বলল, 'তোর যাতে কোনও অনিষ্ট না হয় আমরা দেখছি। মুখার্জিবাবুকে তো জানিস! মাথা গরম লোক। সবার সামনে বেইজ্জত করলে তোব কিছু বলার থাকত!'

মগড়া সুরঞ্জনেব পাও জড়িয়ে ধরতে চাইল!

'কি হচ্ছে, ছাড়। যা, বের হ ঘর থেকে।'

সুরঞ্জন বলল, 'এই নাও। তবে দাদা একটা কথা বলি। যদি মনে কিছু না কর!'

'বলে ফেল্। কিছু মনে করব না। তার আগে যে মগড়াকে আবার ধরে আনতে হবে।'

সুরঞ্জন উঠে চলে গেল।

মগড়া এলে মুখার্জি বললেন, 'মুখোসটা তুই পেলি কোথায়? ম্যাক কি মুখোসটা তোকে দিয়েছে?'

'নেহি বাবু।'

'তবে! মুখোস আসে কি করে।'

তারপর মগড়ার কথা থেকে তিনি বুঝতে পারলেন, মুখোসটি সে চুরি করেছে। ম্যাক খোঁজ-খবর যে না করেছে তা নয়। তবে মাতাল লোকের যা হয়, বেহুঁশ অবস্থায় কাউকে মুখোসটা দিয়েছে, নাম মনে রাখতে পারেনি। তারপর সুরঞ্জনের দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'বলে ফেল্। দেখছিস তো খুঁজে পাচ্ছি না। কিছু খুঁজছি বুঝতে পারছিস! কাজ যতটা এগিয়ে রাখা যায়।'

কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি দেখে সুরঞ্জনও খুব একটা সাহস পাচ্ছে না। কারণ তারা সবাই এখন দর্শক মাত্র। কারও কিছু বলার থাকলে, অন্য সময়ে বললেই ভাল হয়।

এত সব বুঝেও সুরঞ্জন না বলে পারল না—'দাদা তোমার সিদ্ধান্তগুলি কিঞ্চিত লঘু পাকের হয়ে যাচ্ছে না!'

'লঘুপাক বলছিস। সামান্য গুরুপাক দরকার!'

'তাই তো বুঝতে পারছি না, বলছ এক ঘটছে অন্য। ম্যাকের মৃত্যু নিয়ে সিদ্ধান্তগুলির কথা ভেবে দ্যাখ—তুমি কি বলেছিলে, মনে করতে পারছ! মুখোস তার কোনও ওপরওয়ালাকে দিয়েছে, যাকে ম্যাক বাঘের মতো ভয় পায়।'

'ভুল সিদ্ধান্ত মানছি। আরে বুঝিস না, ট্রায়াল অ্যান্ড এরার মেথড। খুনের অকুস্থল একটা। কিন্তু তার রাস্তা অনেক। সব রাস্তাগুলি ধরে হেঁটে না গেলে বুঝবে কি করে, অকুস্থলে কারা যেন রাস্তায় ঢুকেছিল।'

'না, বলছিলাম, ডরোথি ক্যারিকো নিয়েই বা পড়লে কেন। প্রমোদ তরণী ডরোথি ক্যারিকো প্রেসিডেন্ট কলিজ ভাবছ কিসের ভিত্তিতে! সন্দেহ সেকেন্ডকে, এখন দেখছি, রেডিয়ো অফিসার। সন্দেহ বুড়ো মানুষের মুখোস নিয়ে, এখন দেখছি সেটা দাঁড়িয়ে গেছে গিরগিটি গোঁফের মুখোস। শেষ পর্যন্ত এত লঘুপাক সহ্য হবে তো!'

'হবে।' বলেই তিনি ফের 'ইউরেকা'।

বললেন, 'পেয়েছি।'

'কি পেয়েছ।'

'এই সেই ফটো—রিফ এক্সপ্লোরারের তোলা। কলিজ জাহাজের লাউনজ থেকে কেউ পাচার করেছে। সুহাসের দিকে তাকিয়ে বললেন, কি দেখছিস?'

'ফাঁকা। বিশাল গ্রিক দেবীর দুই মূর্তি আর একসিঙ্গি ঘোড়ার দেয়ালটা ফাঁকা। মনে হয় কলিজ জাহাজ থেকে কেউ সেটা চুরি করে নিয়ে গেছে।'

'এটা কি!' বলে তিনি আর একটি বই এগিয়ে দিলেন। তিনি যে কাপ্তানের ঘর থেকে কাগজপত্র তুলে এনেছেন, ফটোগুলি তারই ভেতর আছে তবে!

সুহাস অধীব সুরঞ্জন ঝুঁকে দেখল—গাইড বুকটিতে ডরোথি ক্যারিকোর অসংখ্য ছবি জাহাজের। পাতা ওলটাতে গিয়ে সবার চোখ আটকে গেল। ডরোথি কারিকোর লাউনজ—হুবহু কলিজের মতো। সেই তিনটি কারুকাজ করা বিশাল থাম পর পর। দেয়ালের কারুকার্য এক। সেই ডান দিকের দেয়ালে দুই গ্রিকদেবী এবং একসিঙ্গি ভাস্কর্যটি শোভা পাচ্ছে।

চার্লির পাচার করা কলিজের ছবি তাদের কাছে আছে। ছবিটি বের করে মিলিয়ে দেখলেন। না, ভাবা যায় না।

মুখার্জি গম্ভীর।—'সিদ্ধান্তগুলি বোধ হয় খুব একটা লঘুপাকের নয়।'

সুরঞ্জন চুপ। বেকুফ বলতে গেলে।

সুহাস বলল, 'জানো, রিফ এক্সপ্লোরার থেকে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন। জাহাজের ডুবুরিরা কলিজের ভিতর ঢুকে অনেক ছবি তুলে এনেছে। কাপ্তানকে ছবিগুলি দিয়ে গেছে। আমাকে সব

দেখিয়েছে চার্লি। কেবল লাউনজের ছবিটা কেন যে খুঁজে পেল না বুঝতে পারলাম না।'

'রহস্য!' বলে থেমে গেলেন মুখার্জি।

'চার্লি তো বলল, জাহাজটা নাকি ষাট সত্তর ফুট গভীর জলে ডুবে আছে। মরটেলি উন্ডেড্ বার্ডের মতো কাত হয়ে আছে। জলের নিচে বারো বছরে কলিজ জানো, হ্যাভ বিকাম এ রিফ, এ ফেস্টিভ গার্ডেন হোম ফর থাউজেন্ড ক্রিয়েচারস। ওব ঠাকুরদার ইচ্ছেই পূর্ণ হল দেখছি।'

'দ্যাখো ঠাকুরদার আরও কত ইচ্ছে আছে', বলেই মুখার্জি তুরুপের তাসের মতো তিনটে ছবিই পাশাপাশি বিছিয়ে দিলেন—আঙুলে ছবিগুলি পটাপট ছুঁয়ে বললেন, প্রথম ছবিটা কলিজের লাউনজ, দ্বিতীয় ছবিটা ডবোথি ক্যারিকোব, তৃতীয় ছবিটা বিফ এক্সপ্লোরারেব সম্প্রতি তোলা। তিনটি ছবিই এক—শুধু শেষের ছবিটার দেয়াল ফাঁকা। ডানদিকের দেয়াল। ভাস্কর্যটি নেই। সম্ভবত চুরি গেছে।'

থেমে মুখার্জি বললেন, 'সেভেন্‌থ মিলিটারি মিশানের প্রেসিডেন্ট কলিজ জাহাজটি আগে প্রমোদতরণী ছিল তা বোধ হয় তোমাদেব মনে থাকতে পারে। খোল নলচে পালটে মিলিটারি ট্রান্সপোর্ট সিপ কলিজ। শুধু লাউনজটি অক্ষত রাখা হয়েছিল, তাও তোমরা জান। কাপ্তানবয়কে দিয়ে পাচার করা কাগজপত্র থেকে আমরা তা জেনেছি। কি কোনও গড়বড় আছে! থাকলে বলবে। বুঝতে পারছ সিদ্ধান্তগুলি নিশ্চয়ই লঘুপাকের নয়। প্রমোদ তরুণীটি যে ডরোথি ক্যারিকো—ছবি তিনটি তাব প্রমাণ! আম আই বাইট।'

অধীব বিস্ময়েব গলায় বলল, 'এত জলেব নিচে জাহাজটাকে খুঁজে পেল কি করে! কত জাহাজ তো এই দরিয়ায় ডুবে আছে। আর চুরি করাও তো কঠিন। লোহার দেয়াল কেটে ছবিটাকে পাচার কবা হয়েছে। কার কাজ!'

সুরঞ্জন বলল, 'কাবও কাজ নিশ্চয়ই। না হলে গ্রিক দেবীবা যাবেন কোথায়।'

মুখার্জি কাগজপত্র ভাঁজ করছিলেন। তাঁর আব কথা বলাব সময় নেই। ঘড়ি দেখলেন, ছ'টা বাজে। বের হয়ে পড়তে হবে। একটা ব্যাগে ঢুকিয়ে নেওযা দরকার সব। কাগজপত্রগুলি এখন এতই মূল্যবান যে তিনি কিছুই খোযাতে চান না। সুবঞ্জনকে বললেন. 'দ্যাখ তো কারও কাছে চটের থলে টলে পাস কি না।'

'চটের থলে!'

'আরে এগুলি নিয়ে যাব. গ্যাঙওয়েতে দেখতে চাইলে কি করব। চটেব থলে থাকলে বলা যাবে, জামা কপাড় আছে।'

সুরঞ্জন চটেব থলের খোঁজে বেব হয়ে যেতে চাইলে মুখার্জি অধীরকে বললেন, 'তুই যা। যাবাব আগে আব একবার ঝালিয়ে নেওয়া দরকাব। সুরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমাকে একেবারে ফালতু লোক ভাবছিস এটাই দুঃখ। সাবধানে থাকবি। সুহাসকে কোথাও একা ছাড়বি না।' আর কি বলাব থাকতে পাবে—তিনি পা নাচাতে থাকলেন।

সুরঞ্জনের মনে হল দিগ্বিজয়ে বেব হচ্ছেন. পা তো নাচাবেনই। এদিকে যে আমবা একা পড়ে থাকছি সেটা কি বুঝছ! তবে সে কিছু বলল না।

মুখার্জি চটের থলে কিংবা কাপড়ের ব্যাগ এসে গেলেই উঠে পড়বেন—আর কি বলা যায়. সহসা মনে হল বংশীকে অনেকক্ষণ হল দেখছেন না।

'বংশী কোথায়?'

'দাঁড়াও দেখে আসছি। বলে সুবঞ্জন বের হয়ে গেল। ফিরেও এল মুহূর্তের মধ্যে। বলল, বংশী মগড়া ধুনুচি নিয়ে ঘুরছে। ডেকে উঠে গেছে। ইনজিনরুমের দরজায় ধূপ ধুনো দেখাতে গেছে। গোটা জাহাজ ঘুবে আসবে বলে গেছে।'

'এটা ভাল। মনে শান্তি থাকলেই হল।'

সুরঞ্জন বলল, 'দ্যাখো, আমি তোমার সহকারী। কিছু বললে কষ্ট পাও চাই না। তবে তোমার যাওয়ার কারণটা শুধু পাচার করা কাগজপত্র রক্ষার্থে ভাবলে খুব তুখোড় গোয়েন্দার কাজ মনে হবে না। ফিলই চার্লির আঙ্কেল রাচেল ভাবছ কোন্ সুবাদে!'

'কোন্ সুবাদে? পিদগিন ভাষার সুবাদে। ওই দ্বীপে আরও একবার ঘুরে গেছি। ফিলের কথা মনেই ছিল না। চার পাঁচ বছর আগেকার কথা। তারপর কত বন্দর, কত দেশ—জায়গাটার নামও ভুলে গিয়েছিলাম। পিদগিন ভাষার বিজ্ঞাপন না পড়লে মনেই পড়ত না, ফিল এই দ্বীপেই থাকেন। ফিল আর ফিলিপ—ধন্দ। চিবকুটে লেখা—চিরকুটটা অবশ্য কাপ্তানবয় পাচার করেছিল—চিরকুট না বলে চিঠি বলাই ভাল—বোথ-বে হারবার থেকে জনৈক অ্যালেন পাওয়ার লিখেছে, ফিলিপ, অ্যান অসি ডাইভার হু ফেল আন্ডার দ্য স্পেল অফ দ্য কলিজ টুয়েলভ ইয়ার্স এগো, অ্যান্ড স্টেইড অন অ্যাজ এ কাইন্ড অফ কিপার অফ দ্য রেক। পলকে কেন যে ফিলের কথা মনে পড়ে গেল। ওর ঘরে ডুবুরির পোশাক দেখেছিলাম।'

'থেমে বললেন, 'বুঝলি কিছু?'

'বলে যাও।'

'এক নম্বর কলিজ সম্পর্কে কাপ্তানের আগ্রহ। চিঠিটা তার প্রমাণ। দু-নম্বর কে ফিলিপ, যে বারো বছর ধরে ডুবন্ত জাহাজের প্রহরী হয়ে আছে! ফিল যদি ফিলিপ হয়! তিন নম্বর কলিজ সম্পর্কে খোঁজ খবর করার কথা শুধু চার্লির বাবা মিলার বংশের কারোর। ওটাতে এমন কিছু আছে, কিংবা ছিল, যার জন্য মিলার বংশের কাছে জাহাজটা খুঁজে বের করা দরকার হয়ে পড়েছে। চার্লির বাবা ছাড়া কার আর এত গরজ!'

'তা হলে তুমি ভাবছ, ফিল অসি ডাইভার নয়।'

'না। ফিল ফিলিপও নয়। ফিল অস্ট্রেলিয়ানও নয়। ফিলই আসলে চার্লির আঙ্কেল রাচেল। কলিজ জাহাজটা সেই ডুবিয়েছে। অন্তর্ঘাত। জাহাজটার উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল না, মাইনফিল্ডে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল—হয়! জাহাজে এমন কিছু বংশগৌরব কিংবা ধর গুজব, এই গুপ্তধন-টনের আর কি, তোকে কি করে বোঝাই, শুধু বুনো ফুলের সাম্রাজ্য বিস্তারে এত বড় প্রমোদ তরণী নিয়ে ইস্টার দ্বীপ থেকে শুরু করে গ্যালাপ্যাগাস. হাইব্রিডস দ্বীপপুঞ্জে ঘুরে বেড়াতে পারে কেউ, কোনও গোয়েন্দাই বোধ হয় বিশ্বাস করবে না। জাহাজে কোনও যে গুপ্তধন ছিল না কে বলবে! শুধু ভাস্কর্যটি সরিয়েছে—বিশাল চোরা কুঠুরিতে আর কি ছিল! চোরা কুঠুরি কখনও খালি থাকে! ভাস্কর্যটি তুলে নিয়ে যাওয়ায় পেছনের চোরা কুঠুরিও দেখতে পেলি রিফ এক্সপ্লোরারের সম্প্রতি তোলা ছবিতে। কার কাজ!'

সুরঞ্জন ব্যাজার মুখে বলল, 'কার কাজ আমি কি করে বলব?'

'ফিলেব কাজ। ফিলের প্রাসাদে ভাস্কর্যটি খুব যত্নের সঙ্গে দেয়ালে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। বিশাল জায়গা জুড়ে। দুর্গা প্রতিমার মতো ঝলমল করছে।'

সুরঞ্জন ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'জেনে শুনে সিংহের গুহায় উঁকি মারতে যাচ্ছ!'

'দেখি না কি হয়। দস্যু কবি হয়ে যেতে পারে—আর রাচেল সন্ন্যাসী হতে পারে না! রাচেলকে দেখে বুঝেছি, সরষেতে শুধু ভূত থাকে না। ভগবানও থাকে। তেলের গুণ বলতে পারিস।'

'এত রাতে তাই বলে! মনে সায় পাচ্ছি না।'

'ভয়ের কি আছে! এই দ্যাখ না', বলে পকেট থেকে একটি মুদ্রা বের করে দেখালেন। বললেন, 'ফিল দিয়েছে। প্রণামী। বিপদে আপদে মুদ্রাটি আমাকে রক্ষা করবে বলেছে।'

ওরা চারজনই মুখার্জিদার সঙ্গে ডেকে উঠে গেল। মুখার্জিদা ডেকসারেঙের অনুমতি নিতে গেলেন। রাতে ফিরবেন না, কখন ফিরবেন তাও জানেন না। ডেক সারেঙকে না বলে গেলে কথা হবে।

মুখার্জিদা ছুটে আসছেন। বোঝা যায় মুখার্জিদা তুখোড় ম্যানেজমাস্টার। জাহাজের দায় দায়িত্ব কারও কম না। হুট করে জাহাজ থেকে নেমেও যাওয়া যায় না। বিশেষ কবে রাতের বেলা।

গ্যাংওয়েতে নেমে নৌকায় ওঠার সময় হাত তুলে দিলেন। উপরে চোখ যেতেই দেখলেন, চার্লি রেলিঙে ভর করে তাঁকে দেখছে। চার্লিকেও তিনি হাত তুলে বাই করলেন। এবং নৌকা কিনারায় গেলে লাফিয়ে কিনারায় উঠে গেলেন তিনি। এখন সোজা আস্তাবলের দিকে যেতে হবে। কিনার থেকেও আবছা দেখতে পেলেন অধীর, সুরঞ্জন, সুহাস, কেষ্ট তখনও রেলিঙে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে।

উপরে, বোট-ডেকে চার্লিও। যতক্ষণ দেখা যায়—মুখার্জির মনটা কেন যে ভারী হয়ে গেল। রাস্তায় গ্যাসের আলোগুলি টিম টিম করে জ্বলছে।

দেখা যাক—চার্লির ছেলে সেজে থাকার পেছনে আসল রহস্যটা কি। ফিল যদি সত্যি চার্লির আক্কেল রাচেল হয়ে যায়! কত যে ভাবনা—তিনি আশা করছেন পাচার করা কাগজপত্র থেকে কিছু অন্তত সূত্র খুঁজে পাবেন। এই সব চিন্তাভাবনা মাথায় নিয়ে হাঁটলে, দূরের রাস্তাও কাছের হয়ে যায়। আস্তাবলের সামনে তিনি। ঘোড়ার দাম দর—রাতে ঘোড়া ছাড়তে রাজি না কেউ। আস্তাবলগুলি প্রায় ফাঁকা—রাতের দিকে ঘোড়াগুলি ফিরে আসে। ভাল ঘোড়া একটাও পেলেন না। পেলেও অশ্বরক্ষক ছাড়তে রাজি না। কি করা! একবার মুদ্রাটি বাজিয়ে দেখলে হয়।

মুদ্রাটি পকেট থেকে তুলে হাতের তালুতে রাখলেন। অশ্বরক্ষক যেন ভূত দেখছে। মুদ্রাটি অশ্বরক্ষকের নাকের ডগায় ছুঁড়ে দিয়ে ফের অত্যন্ত কৌশলে লুফে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাজ হয়ে গেল। একেবারে নতজানু। ঘোড়াটিকে আদর করে বাইরে বের করতেই মুদ্রাটি তিনি পকেটে পুরে ঘোড়াটির লাগাম ধরে ফেললেন। লাফিয়ে উঠে গেলেন পিঠে। বেশ তাজা এবং বলিষ্ঠ ঘোড়া। মুদ্রাটির যথার্থই জোর আছে।

সাদা রঙের ঘোড়াটি কদম দিচ্ছে।

শহরের মানুষজন দোকানপাট পার হয়ে গেলেন। কাঠেব গুদাম পেছনে পড়ে থাকল। লাইট-হাউস পার হয়ে গেলেই বনজঙ্গল—পাকা সড়কের দু-পাশে। কিছুটা এই রাস্তায় যাবেন, পরে বাঁ দিকে উঠে যাবেন—দুটো টিলা পার হয়ে যেতে হবে। জ্যোৎস্না গাছপালায় মাখামাখি হয়ে আছে—কারণ টিলার উপরে তিনি দেখলেন গোলাকার বিশাল বৃত্তের মতো চাঁদটি আকাশে ঝুলে আছে। সমুদ্রের এই এক কুহক—পাশে সমুদ্র এবং বাঁ-দিকে—কারণ ফিল বলে দিয়েছেন অলওয়েজ লেফট। সমুদ্র সব সময় চাঁদকে বড় করে দেখায়।

কিছুটা পথ এসে মনে হল, সমুদ্রের গর্জন আর শুনতে পাচ্ছেন না। তিনি ফেব উঠে যেতে থাকলেন সন্তর্পণে। দ্বীপের এদিকটায় মাটি তুলে নিয়ে যাওয়ায় নানা আকারের খাদ সৃষ্টি হয়েছে। রাতে মানুষজনের কোনও সাড়াও পাওয়া যাচ্ছে না। যতই জ্যোৎস্নায় প্রকৃতি মাখামাখি হয়ে থাকুক—খাদগুলি ঘাসের আড়ালে ডুবে আছে। পড়ে গেলে অশ্ব এবং তার আরোহী দুই জখম হবে।

ইচ্ছে করলেই ঘাস মাঠ, লোকালয় পার হয়ে যাবার জন্য তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে দিতে পারছেন না। তাঁর একটাই নিশানা। সমুদ্রের ধারে ধারে—সব সময় তুমি সমুদ্রের গর্জন শুনতে পাবে। বাতের নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে যাচ্ছে ঘোড়ার খুরের শব্দে। পাথরের চত্বর শুধু মাইলের পর মাইল। ক্যাকটাস এবং স্টোন বার্ড নামক এক প্রকার ক্ষুদ্রকায় পাখির কলরব ছাড়া কিছুই যেন তাঁর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়।

মাথার উপর বড় বড় গাছের ছায়া—গাছগুলি উকন হতে পারে। পাইন, ম্যাপল হতে পারে—রাতের এই নিঝুম জ্যোৎস্নায় চেনা মুশকিল। দ্বীপের বৈশিষ্ট্য অদ্ভুত। দ্বীপে আখ আনারস হয়, আবার আঙুরের চাষও হয়। পাথবের সাম্রাজ্য বিস্তারও কম নয়, ঘাসের জঙ্গলও মাইলের পর মাইল। আবার ম্যাপল গাছেরও ছড়াছড়ি। উষ্ণ মণ্ডল থেকে নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের গাছগাছালি জীবজন্তু সবই দ্বীপগুলিতে যে কি করে সহাবস্থান করে বেঁচে আছে বুঝে উঠতে পারেন না। এমন এক বিচিত্র দ্বীপে তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে কোথায় শেষে নেমে এলেন কিছুতেই বুঝতে পারছেন না। কারণ যেদিকেই যাচ্ছেন, সমুদ্রেব সাড়াশব্দ নেই।

সঙ্গে একটি টর্চ আছে। সুরঞ্জন ব্যাগে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। ঘড়ি দেখলেন—প্রায় ঘণ্টা তিনেক ঘোড়ার পিঠে—আশ্চর্য এখন পর্যন্ত কোনও লোকালয় চোখে পড়ল না। যতদূর চোখ যায় শুধু নিরন্তর আকাশ আর মাঠ এবং অরণ্য। এমনকি তিনি এয়ারস্ট্রিপও খুঁজে পেলেন না। অন্তত একটা পেলেও তাঁর ভরসা থাকত। কারণ এয়ার স্ট্রিপগুলির মাথাও সমুদ্রের ধারে গিয়ে শেষ হয়েছে।

এ-ভাবে এত রাতে ঘোড়ার পিঠে বসে থাকাও কষ্ট। এবং গাছের ডালপালা হাওয়ায় দুলছে। বেশ

জোরে হাওয়া বইছে—তিনি টর্চ মেরে গাছের ডালে কি খুঁজলেন—কোনও পাখির কলরব যদি শুনতে পান। যেন এতে সাহস ফিরে পাবেন। মানুষ-বর্জিত এক বিশাল প্রান্তরে নেমে এসেছেন। তাঁর ঘাম হচ্ছিল। রুমালে ঘাম মুছে বসে আছেন ঘোড়ার পিঠেই। দেখা যাক—বলে আবার ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। পাহাড়ের মতো কিছু সামনে একটা দেখা যাচ্ছে। কোথাও কোনও আলো জ্বলছে না। ঘাসের ভিতর জোনাকিরা ওড়াউড়ি করছে। কীট পতঙ্গের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল।

অনেকটা পথ তিনি নেমে এলেন। কোন্‌দিকে যাচ্ছেন, চাঁদের অবস্থান দেখে দিক নির্ণয়ের চেষ্টা করছেন। এখনও চাঁদ আকাশেব গায়ে হেলে আছে। শুক্লপক্ষের রাত। আজ পূর্ণিমা—কারণ ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদ আকাশে ঝুলছে না। ক্রমে রাত বাড়ছে।

ক্রমে তিনি একটা দেয়ালের মতো লম্বা পাথরের প্রাচীর দেখতে পেলেন। সামনে এগোবার আর কোনও পথ নেই। পাঁচিলটি খুবই খাড়া। পাঁচিলের পাশ দিয়ে আবার ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। মধ্য যামিনী। ভয়ঙ্কর দাপাদাপি চলছে জঙ্গলে—কারা দাপাদাপি করছে। টর্চ জ্বালতেই দেখতে পেলেন বীভৎস দু জোড়া চোখ। আকৃতি ডাইনোসোরসদের। সত্যি প্রাগৈতিহাসিক জীব, তবে আকারে বড় নয়। তিনি তারপর আরও দ্রুত নেমে যেতে থাকলেন আর শুনতে পেলেন, সমুদ্রের বিশাল গর্জন। কিন্তু সমুদ্র তাঁর ডানদিকে বিরাজ করছে। তিনি বুঝতে পারলেন ফিলের প্রাসাদে যাবার রাস্তাটি ভুল করে ফেলেছেন।

ডানদিকে সমুদ্র পড়লে ফিলের প্রাসাদে যাওয়া যায় না, এটা তিনি ভালই বোঝেন। দ্বীপের কোনও দুর্গম অঞ্চলে নেমে এসেছেন। কিছুটা অস্থিরও হয়ে পড়েছেন—কি করবেন—কোনও লোকালয় পেলেও রক্ষা। তারও উপায় নেই। ঘোড়া ছুটিয়ে উপরে যাবার পথও বন্ধ। কারণ পাশেই খাড়া পাহাড় এবং সমুদ্র। পাহাড়ের পাশে ফুট দশেক উপত্যকা—আর তার অনেক নিচে সমুদ্র। ঘোড়া দু-পা তুলে দাঁড়িয়ে গেছে। এগোলেই নিচে সমুদ্রের জলে পড়ে যেতেন।

হঠাৎ তাঁর মাথায় কি যে বুদ্ধি খেলে গেল। ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে দিলেই সমুদ্র বাঁ-দিকে পড়বে। এত কেন যে ভাবছেন। ভাবা মাত্রই লাগাম টেনে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিলেন ঠিক—কিন্তু আশ্চর্য ঘোড়াটি আর কিছুতেই নড়ছে না। যেন বিপদের গন্ধ পাচ্ছে। নিচে পড়ে গেলে উঠে আসা যাবে না। জোরজার করে ক' কদম এগিয়ে যেতেই মনে হল, পাহাড়ের বিশাল দেয়াল মাথার অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। সামনে এগোবার আর রাস্তা নেই। নিচে খাদের মতো—সেখানে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে।

বোধহয় তিনি ভুলই করে ফেলেছেন—তবু ভরসা, কাছে সমুদ্রটি আছে। আবার ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে দিয়ে ডাইনে সমুদ্র রেখে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায়ও নেই। কাছে কোথাও কোনও পাথরের উপত্যকার খোঁজ পেলে—ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়বেন—এবং চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়বেন—কারণ শরীর আর দিচ্ছিল না। দু'দিন ধরে জাহাজে যা চলছে। আশা ছেড়েই দিয়েছেন। জ্যোৎস্নায় নিস্তব্ধ প্রহরীর মতো সমুদ্রের ধারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েও থাকলেন। অজানা অচেনা দ্বীপে রাস্তা হারিয়ে ফেললে মাথা ঠিক থাকে না।

একা না বোকা—সুহাসকে সঙ্গে আনা উচিত ছিল। তা হলে এতটা নিরুপায় ভাবতে পারতেন না নিজেকে। কিছুটা যেন কি করা যায় এই গোছের যাত্রা। অনেকটা রাস্তা এগিয়েও এসেছেন—মধ্যযামিনীই বলা যায়—আর হঠাৎই মনে হল সমুদ্রে কারা দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। জ্যোৎস্নায় মনে হচ্ছিল ভেড়ার পাল বিশাল প্রান্তরে অথবা একদল হারিয়ে যাওয়া গাভী সমুদ্র পার হয়ে উঠে আসছে।

সঙ্গে সঙ্গে টর্চ জ্বাললেন। জ্যোৎস্নায় সব কিছুরই আভাস পাওয়া যায়। স্পষ্ট দেখা যায় না। টর্চ জ্বালতেই চক্ষুস্থির। হাজার হাজার ব্লু সার্ক সমুদ্রে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। ঘুরছে ফিরছে। লাফ দিয়ে উপরে উঠছে। ঝাঁকে ঝাঁকে ভেসে চলেছে। একটা আর একটার ঘাড়ে মাথা তুলে দিচ্ছে। সমুদ্র এখানে

খাড়ির মতো ক্রমে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। এদিকটায় এত ঝাঁকে ঝাঁকে নীল হাঙরেরা কোথা থেকে ঢুকে গেল! আর তখনই কি দেখে তাজ্জব হয়ে গেলেন। সমুদ্র থেকে বিশাল পিরামিডের মতো একটা ছায়া ভেসে উঠছে ধীরে ধীরে। তাঁর আর বিন্দুমাত্র সাহস থাকল না। ঘোড়া থেকে তিনি যেন গড়িয়ে পড়ে যাবেন।

এমন আশ্চর্য দৃশ্য জীবনেও দেখেননি। রুপোলি রঙের কুয়াশার মতো পাহাড়টা মাথা তুলে দিচ্ছে সমুদ্র থেকে। ক্রমে বড় হয়ে উঠছে। কিছুক্ষণের মধ্যে বিশাল আকার ধারণ করতে থাকলে, তাঁর রক্ত হিম হয়ে গেল। আর তখনই মনে হল গুঁড়ি মেরে জঙ্গল থেকে দুজন প্রায় অদৃশ্য ব্যক্তি লতাপাতায় ঢাকা উঠে এল। এরা কারা? তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। তিনি ভাবলেন, দেখাই যাক না—এই সব অপদেবতার পাল্লায় পড়তে হতে পারে, ভেবেই ফিল বোধহয় তাঁকে স্বর্ণমুদ্রাটি উপহার দিয়েছেন।

তিনি ঘোড়া থেকে নেমে পিঠে তার দুটো আদরের থাপ্পড় মারলেন—যেন বলা, তুমি আর আমি—ওরা আসছে। ওরা কারা জানি না। কারণ টর্চ জ্বালাতেও ভয় হচ্ছে। তারা আমাকে নিশ্চয়ই দেখেছে। টের পেয়ে ছুটে আসছে।

কাছে এসেই বুনো ঘোড়া ধরার ল্যাসো ছুঁড়ে দিল। এবং তিনি জড়িয়ে গেলেন। তাঁর কোমরে ল্যাসোটি আটকে গেছে— কি নিখুঁত ছুঁড়ে দেবার ভঙ্গি।

জোরজার করে কোনও লাভ নেই—তারা কি চায় দেখাই যাক না। তারা তো দ্বীপেরই কেউ হবে। এবং ফিলের প্রভাব প্রতিপত্তি এই সব দ্বীপে এত বেশি প্রবল যে তাঁকে ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া কঠিন। দ্বীপের মানুষেরা সরল অকপট। রাহাজানি, ছিনতাই চুরি-চামারি তারা জানে না। সরল অকপট হলে যা হয়, খুব ধর্মভীরু। কিন্তু তারাও যদি ইনজিনরুমের সেই অদৃশ্য অপদেবতার কেউ হয়। কেউ তার উপর যে সতর্ক নজর রাখছে না, তারই বা ঠিক কি? এত গোপনে সুহাসকে ইনজিনরুম থেকে তুলে এনেও শেষ পর্যন্ত রেহাই পেলেন না। তাঁর বাড়িঘর, ছেলেমেয়ে এবং প্রিয় নারীর মুখ মুহূর্তে চোখের উপর ভেসে উঠল, তারা জানেই না, কিছুক্ষণের মধ্যে বড় রকমের হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে।

দূরে একটা আলো জ্বলছে।

সেই ভেসে ওঠা পাহাড় শীর্ষ থেকেও একটা আলো যেন এপারে সাংকেতিক ভাষায় কাউকে খবর পাঠাচ্ছে, তিনি আক্রান্ত হতে হতে যতটা পারছেন চারপাশ দেখে নিচ্ছেন। যদি দৈবের বশে বেঁচে যান, তবে ফিলকে সব খুলে বলা যাবে। এখন একমাত্র কোনও দৈবই যেন তাঁকে রক্ষা করতে পারে।

আর আশ্চর্য লোক দুজনের একজন আর কেউ না। নিনামুর।

সে মুখার্জিকে দেখে ঘাবড়ে গেছে। বলল, স্যার আপনি।

তুমি এখানে?

সে কিছুটা তোতলাতে লাগল। বলল, না, আপনি আজ্ঞে আপনি, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কর্তা তাঁবুতে আছেন। আজ তো ফুলমুন স্যার। কিন্তু কি করি, ওদিকে যাবার কারও হুকুম নেই। সকাল না হলে—আজ্ঞে আপনি—এই পাহাড়ে, কেন, না মাথায় আমার আসছে না। নিনামুরের যেন ত্রিশঙ্কু অবস্থা।

মুখার্জি বললেন, তোমার কর্তা তাঁবুতে কি করছে।

নিনামুর একটা কথাই ঘুরেফিরে বলছে আজ ফুলমুন, কর্তা তাঁবুতে আছেন। বের হবেন।

মুখার্জি এবার তাঁর মুদ্রাটি বের করে নিনামুরকে দেখালেন, বললেন, ওকে গিয়ে দেখাও। বলগে, আমি তার কাছেই যাচ্ছিলাম। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। ডানদিকে সমুদ্র পড়ছে দেখেই বুঝেছি, সারা রাত সমুদ্রের ধারে ধারে ঘুরে বেড়াতে হবে। বলবে, খুব জরুরি কথাবার্তা আছে।

নিনামুর যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কারণ সে কর্তার কাছে গিয়ে এখন সব খুলে বলতে পারবে। ফুলমুনের রাতে তারা পাহারায় থাকে। জোয়ার ভাটা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এই দুর্গম এলাকাতে কখনও কেউ আসে না। তবু কর্তার সতর্কতার শেষ নেই। নিজের কিছু লোকজন নিয়ে, তার কর্তা বিকেলেই বের হয়ে পড়েন। তাদের একটাই কাজ, চারপাশে লক্ষ রাখা। জাহাজি সাহেবকে কর্তা খুবই মান্য

করেন—তোতোমেরি পাহাড়ে ভাটায় জল নেমে গেলে একটি বিশাল দরজা আবিষ্কার করা যায়। কেউ জানে না। জানেন কর্তা আর তারা। সে দৌড়ে চলে গেল। ফিরেও এল। এসে সেই নতজানু হওয়ার কায়দায় মুখার্জিকে অভিবাদন জানাল।

মুখার্জি ঘোড়া থেকে নেমে পাথরে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। কিছুটা দূরে পিরামিড সদৃশ পাহাড়টি ক্রমেই বড় হয়ে উঠছে এবং খুবই কাছে চলে আসছে যেন। অদ্ভুত কাণ্ড। পাহাড়ের জেগে ওঠার দৃশ্য দেখতে দেখতে তিনি খুবই বিচলিত হয়ে পড়ছিলেন। সমুদ্রে দাপাদাপি চলছে অজস্র হাঙরের। ফিলের প্রাসাদে যাবার রাস্তায় কখনও মনে হয়নি, এই সব এলাকায় নীল হাঙ্গরের উপদ্রব থাকতে পারে। পূর্ণিমা রাতে প্রজননের হেতুতে ঝাঁকে ঝাঁকে হাঙ্গর ঢুকে গেছে কি না কে জানে। গভীর জলে তারা বিচরণ করে তিনি জানেন। তবে কি জল এখানে খুবই গভীর—কি যে রহস্য বুঝতে পারছেন না। চাঁদের আলোয় পাহাড়টা রুপোলি হয়ে গেছে যেন। এবং পাহাড় থেকে নানা রঙের বিদ্যুৎছটা বের হয়ে আসছে। চোখ ঝলসে যাচ্ছে। ভুতুড়ে পাহাড় টাহাড় ছাড়া এ ভাবে জেগে ওঠার কার দায় পড়েছে তিনি তাও বুঝতে পারছেন না। কিছুটা বেকুবের মতো দৃশ্যান্তর দেখতে দেখতে তাঁর মনে হচ্ছিল, শরীর আতঙ্কে অবশ হয়ে আসছে।

নিনামুর সামনে এসে না দাঁড়ালে তাঁর কি গতি হত তিনি জানেন না। কারণ নিনামুর এসে ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছে। তিনি বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না এমন দুর্গম অঞ্চলে এত রাতে ফিল তাঁর লোকজন নিয়ে নেমে আসতে পারে। ফিলের কি কাজ থাকতে পারে! রহস্য ঘনীভূত হচ্ছিল —পিরামিড-সদৃশ পাহাড়ে ফিল কি খুঁজে বেড়ায়। যদি খুঁজে বেড়ায় সেটা কি কোনও অলৌকিক কিছু—!

নিনামুর তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ঘোড়াটির লাগাম ধরে আগে আগে যাচ্ছে নিনামুর। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, কেন নিয়ে যাচ্ছে, ফিলের কি ইচ্ছে—এমন সব চিন্তা ভাবনায় কিছুটা তিনি বিমূঢ়। পাহাড়ের মাথায় লাল আলোটা দুলছে। যেন সব সময়ই কোনও পাহারাদার এই পাহাড়ের মাথায় বসে থাকে হাতে লাল লণ্ঠন নিয়ে। বিপদসঙ্কেত পাঠাচ্ছে মনে হয়।

বাঁ-দিকে পাহাড়, ডান দিকে সমুদ্র—কিছুটা দূরে। জ্যোৎস্নারাত বলে বোঝা যাচ্ছে না, কতটা দূর—সেই অলৌকিক পাহাড়। ভাটার টানে জল নেমে যাচ্ছে—উঁচু নিচু অজস্র প্রবাল দ্বীপের অভ্যন্তরে এই অলৌকিক মহিমা দেখার জন্যই কি ফিল ফুলমুনের রাতে এখানে নেমে আসে! এ কি কোনও ঈশ্বর মহিমা উপলব্ধির জায়গা।

আর তখনই মনে হল, ফিল তাঁকে সাহস দিচ্ছে। দূর থেকে ডাকছে, 'মুখার্জি, ভয়ের কিছু নেই! সাহস হারিয়ো না। আমরা এখানে আছি। এত রাতে, এই দুর্গম অঞ্চলে ঢুকে গেলে কি করে! ঠিক রাস্তা হারিয়েছ!'

ফিল কি অন্তর্যামী!

তিনি রাস্তা হারিয়েছেন তাও জানেন। তারপরই মনে হল, নিনামুরকে তিনি হয়তো বলেছেন, ফিলের প্রাসাদে যেতে গিয়ে এই ফ্যাসাদ।

ফিল ছুটে আসছে। নিনামুর ঘোড়াটি নিয়ে তাঁবুর পাশে চলে গেল। ঠিক তাঁবু নয়। অস্থায়ী আস্তানা গোছের। হয়তো জোয়ারের সময় সমুদ্রের জলে ডুবে থাকে জায়গাটা। এ জন্য এখানে বোধ হয় ফিল স্থায়ী আস্তানা তৈরি করতে পারেনি। ফিলের সঙ্গে আরও সব লোকজন আছে—তারা ফিলের খুবই অনুগত বোঝা যায়। সঙ্গে তাদেরও টর্চ এবং লম্ফ আছে। একটা ছোট জাল এবং হলুদ রঙের কাচের জারও দেখলেন। কাঁচের জারে কালো রঙের একটি বিচিত্র আকারের মাছ। দেখলেই কেমন গায়ে কাঁটা দেয়।

ফিল বললেন, 'স্টোন ফিস। নাম শুনেছ।'

মুখার্জি বললেন, 'না।'

'খুব বিষাক্ত। মাছটি পাহাড়ে যাবার রক্ষী আমাদের। সামনের পাহাড়টায় যাব। ওটাই আমার ঈশ্বরের ভাণ্ডার। তুমি কি যাবে? আমার ঈশ্বরের ভাণ্ডারটি দেখে আসতে পারতে।'

'না না। তোমরা যাও। আমি অপেক্ষা করছি। তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম। শেষে এমন দুর্গতি হবে জানতাম না। ভাগ্যিস তোমাদের দেখা পেয়ে গেলাম।'

ফিল একটি টিনের চেয়ারে বসেছিলেন। মুখার্জি কাছে যেতেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। মুখার্জিকে বসতে বললেন। মুখার্জি বসলেন না। আর বাড়তি কোনও চেয়ার নেই বলে, ফিল দাঁড়িয়ে কথা বলছেন মুখার্জির সঙ্গে। পেছনে পাথরের ঝোপজঙ্গল থেকে কীটপতঙ্গের আওয়াজও ভেসে আসছিল। জায়গাটায় কোনও সমুদ্র গর্জনও নেই। অথচ নিচে কয়েক পা হেঁটে গেলেই সমুদ্র—ভাঁটার টানে জল নেমে যাচ্ছে বোঝা যায়।

ফিলের লোকজন ভূতের মতো ছায়া হয়ে যেন বিচরণ করছে।

এমন আজগুবি দৃশ্য অথবা পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যাবেন—তাঁর মনেই হয়নি। অবিশ্বাস্য ঠেকছে। কি করে সম্ভব, কোনও পাহাড় জলের তলা থেকে ফুলমুনে ভেসে ওঠে। তিনি কি সুস্থ আছেন? আতঙ্কে যে তাঁর চৈতন্য লোপ পায়নি কে বলবে! তাই সব আজগুবি দৃশ্য চোখে ভেসে উঠছে। স্বাভাবিক নন তিনি এমনও ভাবলেন, যা দেখছেন, মরীচিকা হতে পারে। চিমটি কেটে দেখলেন, লাগে। কথাবার্তায় স্বাভাবিক হতে পারছেন না কিছুতেই। কিছুটা বিমূঢ় অবস্থায় সব যেন দেখে যাচ্ছেন। ফিল প্রশ্ন করলে, জবাবে হুঁ হাঁ করছেন। ফিল চাইছে তাঁকে সঙ্গে নিতে। তিনি রাজি হতে পারছেন না। কে জানে, ফিল এই সমুদ্রে নামিয়ে দিয়ে তামাসাও দেখতে পারে। পাহাড়টাকে জলের তলায় হাঙ্গরেরা পাহাবা দিয়ে বেড়াচ্ছে এমনও মনে হল তাঁর। বিষাক্ত মাছটি তাদের রক্ষী! তাই বা কি করে হয়! আর কাচের জারে, জলের মধ্যে মাছটি চোখে ভেসে উঠলেই গায়ে তাঁর কাঁটা দিচ্ছে কেন!

ফিল তখন যেন মন্ত্র জপ করছেন। কারণ মুখার্জি দেখতে পেলেন, সেই পাহাড় শীর্ষের আলোটি আর লাল নেই, হলুদ, তারপর সবুজ হয়ে যাচ্ছে।

চেষ্টা করছেন মুখার্জি ফিল কি বলে শোনার—'অ্যান্ড ইয়েট ও মাই লর্ড, ইয়ো আর আওয়াব ফাদার। উই আর দ্য ক্লে অ্যান্ড ইয়ো আর দ্য পটার।'

মুখার্জি কেমন সম্মোহিত হয়ে পড়ছেন।

ফিল তখনও বিড় বিড় কবে বকছেন, 'দ্য কনজিওমিং ফাযার অফ ইয়োর গ্লোরি উড বার্ন ডাউন দ্য ফরেস্টস অ্যান্ড বয়েল দ্য ওসেনস্ ড্রাই।'

মুখার্জি দেখলেন, ফিলের পার্শ্বচরেরাও সেই ঈশ্বর ভজনায় যোগ দিয়েছে। তরা সবাই মাথা নিচু করে রেখেছে।

তারপর ফিল বলছেন, ইয়ো ওয়েলকাম দোজ হু চিয়ারফুলি ডু গুড, হু ফলো গডলি ওযেজ। প্লিজ অ্যাকসেপ্ট মাই অফারিঙ। বলেই ফিল কি নির্দেশ দিলেন, তাঁর একজন পার্শ্বচর দৌড়াতে থাকল, এবং জলের মধ্যে নেমে যেতে থাকল—হাঙরের ঝাঁক ভেসে বেড়াচ্ছে—আর আশ্চর্য লোকটি হাঁটু জলে নেমে যেতেই, সব অদৃশ্য হয়ে গেল। তিনি দেখছেন, লোটির হাতে সেই হলুদ রঙের জাল, এবং তার ভিতর কাচের জার থেকে মাছটিকে জলের ভিতর জালে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

আশ্চর্য মাথা ঠিক রাখাই মুশকিল। ফিল এ-সব কি করছে!

ফিল যেন ফের স্বাভাবিক হয়ে গেল। বলল, চল আমি যাচ্ছি। তুমি গেলে খুশি হব। ঈশ্বরের অপার মহিমা গেলে টের পাবে। আমি তোমার কোনও ক্ষতি করব না। ফিল তারপর কি হুকুম করল, কে জানে। দুটো ঘোড়া এনে কারা যেন সামনে হাজির করল। ফিল বলল, 'দাঁড়িয়ে থাকলে কেন! ঈশ্বর আমাকে এতটা দেবেন বুঝতে পাবি. ' পাহাড়টির চমকপ্রদ ঘটনায় তুমি বিহ্বল বুঝতে পারছি। আসলে জোয়ার ভাটার ব্যাপার। এত সব অজস্র দ্বীপে জোয়ারে জল উঠে এলে এমন সব অনেক দ্বীপ আছে ডুবে যায়—আবার জল নেমে গেলে ভেসে ওঠে। এটি গুপ্ত পাহাড়—ফুলমুনে এখানে আসি। বিশাল দরজাটি জল নেমে গেলে হাঁ করে থাকে। আমরা ঘোড়া নিয়ে ভিতরে ঢুকে যেতে পারি।'

সামান্য ঠেলা মেরে বলল, 'মুখার্জি, তুমি না একজন ভারতীয়। তোমার এত যোগবল থাকতে এতটা বিচলিত হওয়া সাজে না। চল। উঠে পড়। দেখছ না, নীলবাতিটা জ্বলে গেছে। একদম সময়

নেই। উঠে পড়। এটা তাঁরই ইচ্ছে, না হলে তুমি এখানটায় মরতে আসবে কেন!'

মুখার্জির বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পাচ্ছে। ফিলের ইচ্ছেই যেন তাঁর ইচ্ছে। তিনি ঘোড়ায় চেপে বসতেই ফিল নেমে যেতে থাকল। আগে সেই মানুষটি হেঁটে যাচ্ছে। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বিশাল হাঙ্গরের ঝাঁক লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছে বোধহয়—কারণ কাছাকাছি কোনও হাঙ্গরের ঝাঁক তিনি দেখতে পেলেন না—পেলেও তারা আট দশ ফুট দূরে থাকছে. ভেসে উঠেই ডুবে যাচ্ছে।

ফিল বলল, 'গুপ্ত পাহাড়ে ঢোকার এটাই একমাত্র রাস্তা। কোনও খাড়া প্রবাল প্রাচীর এখানে আছে। পাঁচ সাতশ ফুট জলের তলা থেকে উপরে উঠে এসেছে। সবই তাঁর ইচ্ছে। কি বল।'

ফিল বলল, 'পেছনে পেছনে আসবে। সাবধান, এদিকে ওদিক হলে গভীর জলে পড়ে যাবে। স্রোতের টানে ভেসেও যেতে পার।

মুখার্জি কোনও কথাতেই সাড়া দিতে পারছেন না। ফিল বলেই চলেছে, দ্য লর্ড ইজ গুড। হোয়েন ট্রাবল কামস্ হি ইজ দ্য প্লেস টু গো!

জলে ছপ ছপ শব্দ, জলের ঘূর্ণি, মৃদুমন্দ বাতাসে জলের ঢেউ, অদূরে হাঙ্গরের ঝাঁক, হুটোপাটি তাদের—ফিলের কথা প্রায় কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছিলেন না। ফিল তাঁকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। যত পিরামিড-সদৃশ ছায়াটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন তত জলকল্লোলে ভেসে যাচ্ছিলেন। ব্যাগটি ফেলে এসেছেন নিনামুরের কাছে, এই দুশ্চিন্তাও তাঁকে গ্রাস করেছে। ফিল বেশ জোরে জোরে কথা বলছে, প্রায় চিৎকার করে—তিনি জবাব না দেওয়ায় সহসা ঘাড় ফিরিয়ে চিৎকার করে বললেন, 'হোয়াট আর ইয়ো থিংকিং, মুখার্জি!'

মুখার্জি বললেন, 'আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ!'

'বেশি দূর না। সামনে, এসে গেছি।'

মুখার্জি বললেন, 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না। হাঙ্গরেরা ছুটে আসছে দ্যাখ।'

'আসবে না। সি, দ্য মেসেঞ্জার কাম রানিং ডাউন দ্য গেট উইদ গ্ল্যাড নিউজ।'

তিনি দেখতে পেলেন সামনেই পাথরের দরজা। ফিল মাথা নিচু করে ঢুকে গেল। মুখার্জিও মাথা নিচু করে দিলেন। জলের ছপ ছপ শব্দ আর নেই। অন্ধকার গুহাপথ। ফিল ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামল। তার এখন অনুসরণ করা ছাড়া যেন উপায় নেই। কালো চকচকে পাথরের গা বেয়ে জল গড়াচ্ছে। আর মাঝে মাঝে হুঁশিয়ারি। এ-এক যেন গর্ভ গৃহে ঢুকে গেলেন মুখার্জি।

ফিল প্রায় ছুটছে। সামনে দুটো লম্ফ নিয়ে দুজন ছুটছে। আঁকাবাঁকা সরু গুহাপথ—খুবই দ্রুত কাজ সারতে হবে অন্তত ফিলের ব্যস্ততা দেখে তাও টের পাচ্ছেন।

তাঁকে ফিল নানা কথা বলে আশ্বস্ত করছে—নতুবা ফিলকে অনুসরণ করারও ক্ষমতা থাকত না। টুং টাং শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। পাথরের দেয়াল ভেদ করে এই শব্দ কোথা থেকে বের হয়ে আসছে, কখনও ঝম ঝম, যেন নৃত্য করছে কেউ, পাথরের গভীর থেকে গভীরে, কখনও বাসন ঝনঝন করে পড়ে যাবার মতো শব্দ। সামনে শুধু লম্ফর আলোতে টের পাচ্ছেন, মাথা নুয়ে না ছুটলে, দেয়ালে মাথা ঠেকে যেতে পারে—ফিল তাঁকে নিয়ে অজস্র গলিঘুঁজি পার হয়ে যাচ্ছিল। ইঁদুরের গর্তের মতো আঁকাবাঁকা, কোথাও জল ঝমঝম করে তোড়ে নেমে আসছে। জুতো জামা সব ভিজে যাচ্ছিল। তারপর বেশ প্রশস্ত.পথ। দেয়াল অনেক উঁচু, এবং কোনও বিশাল বারান্দার মতো মনে হচ্ছে। পাথরের গা থেকে প্রস্রবণ ধারা—জল পাথরে পড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে। আর তার ভিতর থেকে ফিলের বিশ্বস্ত অনুচরেরা ডুবে ডুবে কি তুলে আনছে। আর যা দেখলেন—তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না—বেশ কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা এবং দুটো ছোট হীরকখণ্ডের মতো উজ্জ্বল পাথর। মুখার্জি জানেন না—এইগুলি নিছক পাথরই না অমূল্য রত্নরাজি।

এ-ভাবে আরও পাঁচ সাতটি জলপ্রপাতের ভিতর গিয়ে তার অনুচরেরা জলে ডুবে যাচ্ছে। ভেসে উঠছে—পাথরে গলিঘুঁজে অজস্র। কোনওটায় ইঁদুরের মতো ঢুকে যাচ্ছেন, ইঁদুরের মতো বের হয়ে আসছেন। ফিল নির্লিপ্ত। একটি কথাও বলছে না। ঈশ্বরের মহিমা টের পেলে, মানুষের মুখে যে প্রশান্তি জেগে ওঠে, ফিলের মুখে সেই প্রশান্তি। মাঝে মাঝে তার দিকে তাকাচ্ছে বটে, তবে কোনও

কথা না। এমনকি তাঁর দুজন অনুচরের মুখেও আহ্লাদে আটখানা ভাব নেই। নিছক কাজ কর্মে ব্যস্ত থাকার মতো হাবভাব।

বার বার ফিল ঘড়ি দেখছে কেন?

মুখার্জি আর না বলে পারলেন না, 'ফিল আমি কিছু বুঝছি না। তুমি কি কোনও গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছ?'

'গুপ্তধন! না না। তারপরই কেমন প্রার্থনার ভঙ্গিতে ফিল বিড়বিড় করে মন্ত্র জপ করছে—মাই লর্ড, মাই হোলি ওয়ান, ইউ হু আর ইটারনেল।'

না, কিছু বুঝছেন না! জনশ্রুতির ল্যাজা মুড়ো এক করা যায় না, মুখার্জি না ভেবে পারছিলেন না—সেই গুপ্তধন পাহারা দিচ্ছে বিশাল সব সমুদ্রদানব। কত জাহাজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কত নাবিক হারিয়ে গেছে। রক্তমাংসে সমুদ্রের জল লাল হয়ে গেছে, জাহাজ হারিয়ে গেছে কোনও এক অদৃশ্য অশুভ প্রভাবে—এমন সব জনশ্রুতির পেছনে তবে কি এই পিরামিড সদৃশ জলের অভ্যন্তরে গোপন করে রাখা পাহাড়টি সি-ডেভিল লুকেনারের। তাঁর শরীর ঝিমঝিম করছে ভাবতে গিয়ে। অজস্র ফোকর দেয়ালে। যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে কোনও মুদ্রার গড়িয়ে যাওয়াব ধ্বনি। কোনও প্রশ্ন করার ক্ষমতাও মুখার্জির ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে।

যখন তাঁরা ফিরে এলেন, গুহাপথের মুখে, জল তখন যেন কিছুটা বেড়েছে। মুদ্রাগুলি কার কাছে তারও যেন কোনও সতর্কতা নেই। ফিলের এত সব বিশ্বস্ত মানুষদের দেখেও অবাক। সেই মানুষটি, যার হাতে ক্ষুদ্র একটি হলুদ রঙের জাল এবং যে আগে আগে যায় জালটি জলে ভাসিয়ে—যার ভিতর সাঁতার কেটে বেড়ায় বিষাক্ত স্টোন ফিস—তারই বা এত কি মহিমা তিনি বুঝতে পারছেন না।

বোধ হয় জোয়ার শুরু হয়ে গেছে।

বোঝাই যায়, ঘোড়ার প্রায় পেটের কাছে জল উঠে এসেছে। দরকারে লাফিয়ে সমুদ্রে পড়ে যেতেও হতে পারে। সাঁতরে সমুদ্র পার হওয়ার দরকার হতে পারে—কিন্তু এতই প্রবল জোয়ার ভাটার হিসাব যে পাড়ে উঠে না এলে মুখার্জি টের পেতেন না। জলের গুম গুম আওয়াজ ভেসে আসছে। অজস্র দ্বীপ ভাসিয়ে জোয়ারের জল ফুলে ফেঁপে উঠছে—এ এক যেন কোনও জাদুকরের দেশ থেকে উঠে আসা।

ফিল এতক্ষণে কিছুটা স্বাভাবিক—তার কথাবার্তা শুনে এটা টের পেলেন মুখার্জি।

'তা হলে মুখার্জি, কি বুঝলে?'

'কিছু না।'

'ঠিক কিছু অনুমান করতে পারছ!'

'না, না আমি কিছু অনুমান করতে পারছি না। নিনামুর এদিকে এস। ব্যাগটি কোথায় রাখলে। যেন এতক্ষণে মুখার্জি তাঁর জাহাজের দুর্দৈবের কথা মনে করতে পারছেন। ফিলের সঙ্গে তাঁর যে জরুরি দরকার।

'সকালে এলে না কেন?'

'ফিল তোমার প্রাসাদে ফিরতে কি সকাল হয়ে যাবে?'

'কেন? যখনই ফিরি না কেন—তোমার কি তাড়া আছে?'

'না তাড়া নেই, তবে দেরিও করতে পারব না। তুমি গুপ্তধনের খোঁজ পেয়েছ?'

গুপ্তধন বলছ কেন! আমার কাছে এটা তাঁরই ইচ্ছে। দ্বীপগুলি দেখে বুঝছ না। তিনি না দিলে কোথায় পেতাম। তবে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কাছে গুপ্তধন ভাবাই স্বাভাবিক। বোসো। নিনামুর। তিনি নিনামুরকে ডাকলেন, বললেন, দ্যাখ কি পাওয়া গেছে, ওগুলো নিয়ে চলে যাও। আমরা সামান্য বিশ্রাম নিয়ে পরে রওনা হচ্ছি। কফি হোক মুখার্জি। এত চুপচাপ কেন বল তো! এবারে তুমি যেন কেমন মনমরা হয়ে গেছ?

মুখার্জি ভাবলেন, আরও কি হয়ে যাই দ্যাখো। তবে বললেন না। শুধু বললেন, 'হাঙ্গরের ঝাঁকের ভিতর দিয়ে এ-ভাবে যাওয়া যায়, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করাও কঠিন। তুমি কি কোনও জাদু জানো?'

'তা জাদু বলতে পার। স্টোন ফিসের জাদু। বিষাক্ত মাছটি জলের তলায় ঘোরাঘুরি করলে হাঙ্গরেরা পালাতে থাকে। মাছটার গা থেকে লালা ছড়িয়ে পড়ে। অস্বাভাবিক সেই লালার গন্ধে পাগল হয়ে যায় হাঙ্গরেরা। মৃত্যু ভয় তাড়া করে তাদের।'

'কিন্তু এত কম জলে!'

'কম কোথায়। সাত আটশ ফুট খাড়া প্রবাল প্রাচীরটি দুটো দ্বীপের মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজ করছে। যে জানে, সে জানে।'

'মনে হয় তুমিই রাস্তাটা আবিষ্কার করেছ?'

'ডুবুরিদের অনেক কিছু জানতে হয়। অভিজ্ঞতাও মানুষকে কত কিছু যে শেখায়।'

'তা হলে তুমি ডাইভার?'

'বলতে পার।'

'ফিল, অকপট হও।'

'তোমার সঙ্গে কবে অকপট ছিলাম না!'

'ফিল, তুমিই ফিলিপ?'

'ফিলিপ বলে কেউ কেউ জানে।'

'তবে তুমিই কি কলিজ জাহাজের কিপার অফ দ্য রেক?'

'ইয়েস। প্রেসিডেন্ট কলিজ। জান মুখার্জি, মানুষ যখন শুধু নিজেকে ভালবাসে তখন তারা নানা আতঙ্কে থাকে। মানুষ যখন সবাইকে ভালবাসে, গাছ ফুল পাখি কীট পতঙ্গ তখন তার নিজেকে নিয়ে আর ভয় থাকে না। তুমি আর কি জানতে চাও। সেই ভাস্কর্যটির কথা! আমি জানি, তুমি কেন দুই গ্রিক নারীমূর্তি দেখে আঁতকে উঠেছিলে! কলিজ জাহাজ থেকে ওটি আমি তুলে এনেছি। এর মূল্য স্থির করা কঠিন। এথেন্সের বিখ্যাত ভাস্কর অ্যাপোলোনিয়াসের তৈরি। যুদ্ধ বিগ্রহে গ্রিক ভাস্করদের কত অমূল্য ভাস্কর্য যে নষ্ট হয়েছে—চুরি গেছে, লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে তার খবরই কেউ রাখে না। ছবিটির নিচে তার নাম খোদাই করা আছে। নাও কফি খাও। তোমার মুখ ব্যাজার দেখলে এত খারাপ লাগে! সকালে এলে না, কি যে খারাপ লাগছিল—এত করে বললাম, দু-একদিন থাকো, ঘুরে দেখাই সব। তোমার সময়ই হচ্ছে না।'

সকালেই জাহাজে খবর রটে গেল, চার্লি নিখোঁজ। চার্লিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কাপ্তানবয় হন হন করে হাঁটছেন। কাপ্তান, চিফমেট নেমে আসছেন বোট-ডেক থেকে।

সবার এক প্রশ্ন, জাহাজে এ কি অরাজকতা শুরু হল।

বোটে মাস্তার পড়ে গেল। কাজকাম ফেলে সবাই বোট-ডেকে হাজির। সেকেন্ড মেটের হুকুম, কিনারার কোনও লোক জাহাজে উঠবে না। জাহাজে মাল ওঠা-নামার কাজ বন্ধ।

টাগবোটগুলি ফিরে যাচ্ছে।

যারা উঠে এসেছিল, তাদেরও নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

সুহাস অস্থির হয়ে উঠছে। মাস্তারে সে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক, দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, না দাঁড়িয়ে উপায় নেই—কাপ্তানের হুকুম, সে কি করবে বুঝতে পারছে না—চার্লির তো এভাবে নিখোঁজ হয়ে যাবার কথা না!

তবে চার্লি ভাল ছিল না।

ভাল আর কবে ছিল!

রাতে সে একবার কেবিনে নক করলে দরজা খুলে উঁকি দিয়েছিল চার্লি। চোখ মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখলে ভয় হবার কথা। দরজা খুলে তাকে ভিতরে ঢোকার রাস্তাও করে দিয়েছিল। চার্লির ঘরে পর পর কটা অদ্ভুত ছবি টাঙানো। মনে হয় সে সারা বিকেল সন্ধে ছবিগুলি নিয়ে ব্যস্ত ছিল।

অন্যদিনের মতো ছবিগুলি দেখে সুহাসের কোনও মন্তব্যও সে যেন আশা করেনি। তাকে দেখে খুশি হওয়া তো দূরের কথা, কথা বলতে গেলেই চার্লির গলা ধরে যাচ্ছে।

'কি হয়েছে, বলবে তো!'

'কিচ্ছু হয়নি।'

'তোমার বাবা এখনও ফেরেননি?'

'না। ফিরবেন, সময় হলে ফিরবেন।' কাটা কাটা কথা।

'কিছু ভাল লাগছিল না, মুখার্জিদা ফিলের কাছে গেছেন। দ্বীপের রাস্তা-ঘাটও তো ভাল না। চিন্তা হয় না বলো! তোমাকে খবরটা দিতে এলাম। মনে হয় মুখার্জিদা আততায়ীকে এবার ঠিক কব্জা করতে পারবেন।'

কোনও কথা শোনার যেন চার্লির কোনও আগ্রহ নেই।

এত রাতে বোট-ডেকে গিয়ে সুহাস অন্যায় করেছে। চার্লির কথাবার্তায় ক্ষোভের আভাস ছিল।

'তোমার কোনও শিক্ষা হবে না দেখছি। কেন আসো! আর আসবে না। এত রাতে বোট-ডেকে কখনও আসবে না।'

'ঠিক আছে। আসব না।' বলে দরজা খুলে বের হতে চাইলে চার্লি খপ করে হাত ধরে ফেলেছিল। তারপর নানা কথা—একেবারে স্বাভাবিক। সে খেয়েছে কি না জানতে চেয়েছে। মুখার্জি ঠিক ফিরে আসবেন—ভেবো না, এই বলে আশ্বস্ত করেছে। বলেছে, ইট হ্যাজ বিন মাই জয় টু লার্ন দ্য ডাইভারসিটি অফ ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার্স। নিউ মেক্সিকোর ডগউড, ভারজেনিয়ার রডোডেনড্রেন, নিউইংলন্ডের ব্লু ফ্ল্যাগস থেকে প্রেইরির গোল্ডেন রড কিছুই বাদ ছিল না।

হেসে বলেছিল, 'আই অ্যাম নট এ বোটানিস্ট—আই অ্যাম জাস্ট অ্যান এনজয়ার। তবে জানো কোনও বন্য প্রান্তরে ঢুকলেই, আই ফিল এ সেনস অফ আরজেনসি। কি বলো, সবারই দরকার না—জীবনের চারপাশে থাকুক কোনও সুন্দর ল্যান্ডস্কেপস। সবুজ গাছপালা জীবনে কত দরকার তাই না! ইফ উই ডোন্ট, উই মাইট ফরফিট হিজ প্রেসাস হেরিটেজ।'

সে বলেছিল, 'উঠছি।'

'আরে বোসো না! জানো আমার ঠাকুরদার খুব আক্ষেপ—বিশ হাজার রকমের বুনো ফুলের মধ্যে তার নাকি সংগ্রহ ছিল মাত্র দু হাজার আটশোর কিছু বেশি। জানো টেকসাসেই পাঁচ হাজার বকমের বুনো ফুল আছে। ঠাকুরদা কি বলতেন জানো, উই লিভ ইন দ্য শ্যাডো অফ ডিজাস্টার। তিনি জানো, জন মুরের খুব ভক্ত।'

'জন মুর? সে কে?'

'জন মুরের নাম জানো না—দ্য ফার্স্ট গ্রেট আমেরিকান অ্যাডভোকেট ফর ওয়াইলডারনেস। ভেরি পপুলার রাইটাব অ্যান্ড ন্যাচ্যাবেলিস্ট। ও সুহাস, আমি যদি ক্যাডো লোকে ফিবে যেতে পারতাম—সঙ্গে তুমি—দারুণ। দারুণ মজা হত। সেই মেয়েটা কথা নেই বার্তা নেই নিখোঁজ!

মাস্তারে সবার সঙ্গে সেও দাঁড়িয়ে আছে। পাশে সুরঞ্জন, অধীর। সবার মুখ গম্ভীর। সুরঞ্জন মাঝে মাঝে তার কাঁধে হাত রেখে যেন সাহস দিয়ে যাচ্ছে। এ-সময় ভেঙে পড়লে চলবে না সুহাস। চার্লি কোথায় যেতে পারে? চার্লিকে কিডন্যাপ করা হয়নি কে বলবে। কাপ্তানের চাতুরি হতে পারে। তিনি জানেন, তার সর্বস্ব গেছে। ডরোথি ক্যারিকোর গুপ্তধন গেছে, মুখার্জিদার ইনস্টিংক্ট প্রবল। না হলে, তিনি কিপার অফ দি রেকের কাছে ছুটে যাবেন কেন। কাপ্তান দ্যাখ আরও কি চাল চালে। ভেঙে পড়িস না।'

তারা কেউ নড়তে পারছে না। হুকুম না হলে বোট-ডেক থেকে কারও নেমে যাবার সাধ্য নেই। সবারই মুন চুন। দু-লাইনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে ডেক আর ইনজিন জাহাজিরা। দুই সারেঙও চিন্তিত মুখে পায়চারি করছেন। কাপ্তান চিফমেট নেমে গেলেন কখন। তারা পিছিলে গেছেন, কাপ্তানের সঙ্গে চিফমেট সেকেন্ডমেট থার্ডমেটও নেমে গেছেন। ওদের মাস্তারে, দাঁড় করিয়ে রেখে চার্লিকে তারা বোধ হয় জাহাজে খুঁজে বেড়াচ্ছেন?'

অধীর বলল, 'বংশী কোথায়?'

তারপরই দেখা গেল বংশী লাইন ছেড়ে দিয়ে উইন্ডসহোলে গিয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তবে আছে এই যথেষ্ট। বংশী, সারেঙ, টিন্ডাল এমনকি মুখার্জিদাকেও আজকাল পাত্তা দিচ্ছে না। কাপ্তান চিফমেট সবাইকে তারা নিগ্রহের কারণ ভাবছে। বংশী আসায় সুরঞ্জন কিছুটা নিশ্চিন্ত।

শুধু তাদের একজন মাস্তারে নেই।

মুখার্জিদা।

কাপ্তান নাম ডাকতে পারেন। কাজের সময় জাহাজ ছেড়ে যাবার হুকুম নেই। কাজ থেকে ছুটি মিললে যে যেখানে খুশি যেতে পার, ময়ফেলও করতে পারে, কোনও রমণীকে নিয়ে তখন জাহাজে উঠে এলেও দোষের না—কিন্তু কাজের সময় জাহাজে মুখার্জি নেই কেন? কাপ্তান এমন অভিযোগ অনায়াসে তুলতে পারেন। কোথায় গেল! খোঁজো তাকে। সেই নরাধম—যদি কাপ্তান অভিযোগ করেন, চার্লিকে তিনিই কিডন্যাপ করেছেন।

সুরঞ্জন বলল, 'মুখার্জিদা কখন ফিরবেন, কিছু বলে গেছেন তোকে!' যদি সুহাস কিছু বলতে পারে।

সুহাস ভাল নেই। কে ফিবল, না ফিরল তা নিয়েও তার মাথা ব্যথা নেই। সে মাথা গোঁজ করে দাঁড়িয়েই আছে। সে কারও কথাই মনে করতে পারছে না।

সারা জাহাজ তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছেন কাপ্তান। চার্লি গেল কোথায়, থার্ডমেট সঙ্গে। হাতে এক গোছা চাবি। কেবিনগুলি খুলছেন, বন্ধ করছেন। ইনজিন রুমে নেমে গেলেন। টর্চ জ্বেলে দেখলেন। স্টোকোল্ডে ঢুকে গেছেন। কয়লার বাঙ্কারে। না, চার্লি জাহাজের কোথাও লুকিয়ে নেই।

তিনি শেষে বোট-ডেকে উঠে সব অফিসার ইনজিনিয়ারদেরও মাস্তারে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

সবাই হাজিব।

তিনি যে খুবই ব্যাকুল তার চলাফেরাতে টের পাওয়া যাচ্ছে। কারণ তার মাথাতেও বোধ হয় কিছু নেই—কোথায় থাকতে পারে চার্লি, এমনও ভাবতে পারেন। বিচলিত এবং অস্থির হয়ে পড়লে যা হয়—ছুটে যাচ্ছেন চার্লির কেবিনে, আবার দরজা টেনে চলে আসছেন—ক্রমে অধৈর্য হয়ে পড়েছেন বোঝা যায়। এবার সবার নাম ধরে ডাকছেন—জাহাজে কে আছে কে নেই!

দেখা গেল, মুখার্জি নেই!

চিৎকার করে ডাকলেন, 'ডেকসারেঙ!'

ডেকসারেঙ ছুটে গেলেন, 'গুড মর্নিং হুজুর।'

'কোথায় মুখার্জি?'

তিনি জানেন, মুখার্জি কিনারায় গেছেন। রাতে ফিরবেন না বলে গেছেন। সুতরাং মুখার্জিদা জাহাজে নেই কিনারায় গেছে, রাতে ফেরেননি! এর চেয়ে বেশ কিছু জানেনই না।

'কোথায় গেছে?'

'কথা আছে তো হুজুর হরসাগামে যাবে। তারপর কোথায় গেছে জানি না।' ডেকসারেঙ ভয়ে কাঁপছেন। অভিযোগ তার বিরুদ্ধেও উঠতে পারে—তুমি ডেক সারেঙ, জানবে না, কে কোথায় গেছে, কখন ফিরবে। জাহাজে কাম কাজ করে চুল পাকিয়ে ফেলেছ, এমন বেআইনি কাজ হয় কি করে!

'কোথায় তার ডিউটি। কখন তার ডিউটি।'

'রাতে। গ্যাঙওয়েতে।' সারেঙসাব রীতিমতো নার্ভাস। কারণ কথা বলতে গিয়ে তোতলাতে শুরু করলেন।

'তার মানে, রাতে কেউ তবে গ্যাঙওয়েতে পাহারায় ছিল না। কে নেমে গেল, উঠে এল হিসাব নেই!' তিনি চিৎকার করে উঠলেন, দু-হাত উপরে তুলে, আইই নিড ইয়োর হেলপ।' সারেঙকে ধরে ঝাঁকাচ্ছেন, 'কি করতে আছ জাহাজে! কেন আছ? চার্লি কোথায় জবাব দাও। কে তাকে অপহরণ করেছে জবাব দাও!'

সুহাসের দিকে এগিয়ে আসছেন তিনি—শীতল চোখ তার, মৃত মানুষের মতো চোখ, সাদা ঘোলাটে, তিনি এগিয়ে আসছেন! সুহাস হতবুদ্ধি। তার মনে হচ্ছিল দৌড়ে পালাতে পারলে বাঁচে।

সুরঞ্জন বলল, 'শালা যত্তসব নাটক। চার্লি জারজ সন্তান—না হলে জাহাজ ছেড়ে পালায়। কথা রাখে না! কার সঙ্গে পালাল! কাপ্তান কি ভেবেছে! এই তোর সুহাস, আই অ্যাম এলঙ উইথ ইয়ো, ইভিন টু দি এনড অফ দি ওয়ার্ল্ড। সবই দেখছি নাটক। কার কথা বিশ্বাস করব! জারজ সন্তান না হলে এত বড় নাটক করতে পারে না। শেষে আমাদের ফাঁসিয়ে গেল। হারামজাদি ইতর মেয়েছেলে!'

সুহাস আর পারছে না। সে সুরঞ্জনকেই ঘুসি মেরে বসল।

'খবরদার চার্লিকে অসম্মান করলে মেরেই ফেলব।'

আরে করছে কি ছোঁড়া। হাতাহাতি। তাও খোদ কাপ্তানের সামনে। মাথাটি গেছে, কিচ্ছু নেই। নিজের পরিণামের কথাও ভাবছে না। ছোঁড়া যে মরবে।

সব জাহাজিরা প্রায় ছুটে যাবে ভাবছিল। কাপ্তান সুহাসের দিকে হেঁটে যাচ্ছেন। জুতোর গট গট শব্দ উঠছে। পুরো ইউনিফরম পরা। কতটা বিভীষিকা না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। জাহাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তাকে পর্যন্ত তোয়াক্কা করছে না। ইনজ্ঞিন সারেঙ খুবই বিব্রত বোধ করছেন। সুরঞ্জন ঘুসি হজম করে গেছে। কারণ সে তো জানে, চার্লির কোনও নিন্দেমন্দ সহ্য করার ক্ষমতা সুহাসের নেই। চার্লি নিখোঁজ আর তখন সে চার্লিকে কুৎসিত কথা বলে অপমান করেছে! লাইনের শেষ মাথায় বলে তার কথা কারও কানে যাবার কথা না। সুহাস এক ঘুসি মেরে বুঝিয়ে দিয়েছে, সে ইচ্ছে করলে চার্লির সম্মান রক্ষার্থে গোটা জাহাজে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে।

সুরঞ্জনের কোনও অভিযোগ নেই। সে রাগও করেনি—তার উচিত হয়নি এভাবে সব না জেনেশুনে চার্লিকে খাটো করে দেখা। সুহাস না পাগল হয়ে যায়। হয়নি কে বলবে।

তখনই সুহাসের সামনে চিৎকার—'হাই।'

সুহাস মাথা তুলে একবার শুধু সোজাসুজি তাকাল। তারপর মাথা নামিয়ে নিল।

'চার্লি কোথায়?'

'জানি না।'

'জান। আমি বলছি জান। ইউ নো।'

'জানি না, জানি না।' সুহাস চিৎকার করে উঠল।

'মিছে কথা। সব কটাকে দড়িতে ঝোলাব। আনসার মি সে কোথায়? চার্লির ঘরে রাতে ঢুকে কি করছিলে! আনসার মি। সে কিছু বলেছে তোমাকে?'

'বলেছে।'

'কি বলেছে?'

'জীবনের চারপাশে থাকুক সুন্দর ল্যান্ডস্কেপ। সে গাছপালা ভালবাসে। বলেছে ইট হ্যাজ বিন হার জয় টু লার্ন দ্য ডাইভারসিটি অফ ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার্স। সে ফুল ভালবাসে। সে গাছের সঙ্গে, পাহাড়ের সঙ্গে, নদীর সঙ্গে কথা বলতে ভালবাসে। বনজঙ্গলে তার ঘুরে বেড়ানো নেশা। বলেছে, শী ইজ ওনলি এনজয়ার! কোনও বন্য প্রান্তরে ঢুকলেই শী ফিলস এ সেনস্ অফ আরজেনসি।'

'হোয়াট!'

'ইয়েস, শী ইজ ওনলি এনজয়ার।'

'ইউ হেল, শী ইজ ওনলি এনজয়ার।'

'ইয়েস স্যার শী ইজ...' নট হি।

কাপ্তানের মুখ মুহূর্তে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। জোঁকের মুখে নুন ঢেলে দেবার মতো সবাই দেখল তিনি গুটিয়ে গেছেন। তাঁর যেন হেঁটে যাবারও ক্ষমতা নেই। একজন নেটিভের এত আস্পর্ধা তিনি কিছুতেই হজম করতে পারছেন না। শী, নট হি! সব জাহাজিদেরই মনে হল সুহাসের দুঃসাহসই বলতে হবে। শী, নট হি! সব জাহাজিদেরই মনে হল সুহাসের দুঃসাহসই বলতে হবে। কাপ্তানের বাচ্চাটি যে পুত্র নয়, কন্যা—শী বলে বুঝিয়ে দিয়েছে। কিছুতেই তাকে দিয়ে হি বলাতে পারেনি। মুখে মুখে তর্ক। কাপ্তানের সামনে দাঁড়িয়ে এ-ভাবে মাথা উঁচু করে কথা বলার ক্ষমতা রাখে সুহাস, সুরঞ্জনও বিশ্বাস করতে পারছে না। সিঁড়ি ধরে কোনওরকমে যেন ব্রিজে উঠে যাচ্ছেন কাপ্তান।

অভয় দেবার জন্য সুহাসের কাঁধে ফের হাত রাখল সুরঞ্জন।

সুহাস কাঁধ থেকে সুরঞ্জনের হাত নামিয়ে দিল। সে যেন কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। চার্লি নিরুপায় না হলে জাহাজ ছেড়ে পালাত না। কোথায় কোন্ বনজঙ্গলে হারিয়ে যাবে—ইস, সে যদি তখন চার্লির কথার সামান্য গুরুত্ব দিত। চার্লির এমনিতেই বনজঙ্গলের নেশা আছে। একবার বুনো ফুলের জঙ্গলে, কিংবা আখের জঙ্গলে ঢুকে গেলে তাকে নড়ানো যেত না। আই হ্যাভ নেভার ফরগটেন দ্যাট গিফট অফ মাই চাইল্ডহুড। কত কথা বলত। তাকে যেন হাত পা বেঁধে জাহাজে ফেলে রাখা হয়েছে। বনজঙ্গলের ভিতর চার্লির স্বাভাবিক সৌন্দর্য কিছুতেই ভুলতে পারছে না। তার চোখ ফেটে জল বের হয়ে আসছে।

তখনই কাপ্তান আবার নেমে আসছেন ব্রিজ থেকে। তাকে খুব কাহিল দেখাচ্ছে। জাহাজিদের সামনে এতটা বিচলিত হয়ে পড়া বোধ হয় তাঁর ঠিক উচিত হয়নি। ব্রিজে উঠে গেলেই চারপাশের কিনার। বনজঙ্গল পাহাড় চোখে পড়ায় তিনি নিজেকে হয়তো সামলে নিতে পেরেছেন।

চিফ্‌মেট হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, রেডিও অফিসার মাস্তারে আসেনি। সে কোথায়!

সেকেন্ড ইনজিনিয়ার দৌড়ে গেল।

'উইলিয়াম কোথায়!' খুঁজছে।

সেকেন্ড ইনজিনিয়ার ঘাড় ফিরিয়ে কি দেখলেন—সত্যি তো উইলিয়াম আসেনি। ভাগ্যিস কাপ্তানের চোখে পড়েনি। উইলিয়াম কি জানে না, বোট ডেকে মাস্তার দেবার হুকুম হয়েছে! আত্মকেন্দ্রিক হলে যা হয়। জাহাজে কারও সঙ্গে মেশে না—কথা বলে না। যতটুকু দরকার, তার বেশি না। সে হয়তো খবরই রাখে না। তিনি চিমনি পার হয়ে ট্রান্সমিশান রুমের দিকে গেলেন। তারপর কেবিনে—কেবিনের দরজা বন্ধ। ডাকলেন, 'উইলিয়াম কি করছ! এই উইলিয়াম।'

সাড়া নেই।

জোরে দরজা ধাক্কালেন।

না সাড়া নেই। সেকেন্ড আর মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা না করে ছুটে এলেন। চিফকে বললেন, 'দরজা বন্ধ—উইলিয়াম বোধ হয় কেবিনে নেই।'

মাস্তারে রেডিয়ো অফিসার আসেননি। এবার সব জাহাজিদেরই নজরে পড়ল—মার্কনিসাব মাস্তারে আসেননি। কেন মার্কনিসাব এলেন না—কোথায় তিনি—এবং কাপ্তানের কাছে খবর যেতেই থার্ডমেটকে সঙ্গে নিয়ে কেবিনে গেলেন। ডুপ্লিকেট চাবির গোছা থেকে নম্বর মিলিয়ে কেবিনের চাবি বের করতেও যেন পারছিলেন না। 'ইয়ো পুওর ডেভিল—' বলে কাপ্তান কেড়ে নিলেন চাবির গোছা। চাবি খুঁজে দরজার লক আলগা করতেই দেখলেন, না কেউ নেই। সবার ধারণা—মার্কনিসাব যদি কিছু একটা করে বসেন। কাপ্তান দ্রুত ঘরে ঢুকে গেলেন—জাহাজিরা মাস্তার ভেঙে ছুটে আসছে। এখন যা পরিস্থিতি, কার কখন কপালে কি ঘটবে কেউ যেন বলতে পারে না। চিফ মেটের ধমক খেয়ে সবাই থমকে গেল।

মার্কনিসাব ট্রান্সমিশান রুমে নেই। কেবিনে নেই। কোথায় গেল। তিনি কিনারায়ও নামেন না।

আবার তোলপাড়। বোটের মাস্তার ডিসমিস করে দেওয়া হয়েছে। জাহাজিরা যে যার মতো ভেবে নিচ্ছে। কিনারার আকর্ষণে বন্দরে জাহাজ ভিড়লে যখন তখন জাহাজিরা নেমে যায়। মার্কনিসাব আর চার্লি দুজনে মিলেই তবে ভেগেছে। কাপ্তানের পুত্রটির চরিত্র-দোষও আছে। কারণ তারা দেখেছে, বন্দর এলে সুহাসকে নিয়ে খারাপ জায়গায় যেত।

কত যে গুজব চাউর হয়ে যেতে থাকল।

অধীর বলল, 'আপনি জানেন, চার্লি সুহাসকে নিয়ে খারাপ জায়গায় গেছে?'

নম্বর সুখানি বলল, 'দ্যাখ বাবু, জাহাজে কাজ করতে করতে হাতে কড়া পড়ে গেল। সব বুঝি। বন্দর এলে রোজ নেমে যাবার নেশা কেন বোঝো না। কিসের নেশা। জাহাজিরা পাগল হয় কিসের নেশায়। সুহাসকে কত বারণ করেছি, বাপজি যাস না। গোরাদের সঙ্গে মিশিস না। জাত ধর্ম আছে। যা পায় তাই খায়। জন্মের ঠিক আছে গোরাদের! আমরা জানি না মনে করো। বিধর্মী, বেজাত, মা

বোন মানে না—তার সঙ্গে তুই মিশে গোল্লায় যাচ্ছিস। মুখার্জিবাবুকে পই পই করে বলেছি, বাঙালিবাবুকে সামলান—শেষে কি আকাম কুকাম করে বসবে। শত হলেও বয়সের দোষ বোঝেন না। কে শোনে কার কথা! কাপ্তানের ব্যাটা কার পাল্লায় পড়ে দ্যাখো দেশান্তরী হয়েছে।'

অধীর বুঝল, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আর এ সময় বংশীর উদয়—সে পা টিপে টিপে হাঁটছে। পিছিলে উঠে আসার সময় সিঁড়ির রেলিঙ ঝাঁকিয়ে দেখছে—নড়বড়ে রেলিঙে হাত রেখে উঠতে গিয়ে যদি জখম হয়। এমন কি সিঁড়িও ভাঙছে পা টিপে টিপে! সে কেবল বলছে, 'ভাল না, কিছুই ভাল না। বলা যায় না কোথায় কে কখন হাপিজ হয়ে যাবে! আসলে জাহাজে হাপিজের পালা শুরু। শয়তান জাহাজটারই কাজ। গিলে খাচ্ছে। চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে। কি মজা! বুড়া জানে দাঁত উঠেছে, কারে খায়, কে যায় দ্যাখো। সুহাস দেখছি বেপরোয়া—আরে তুই শয়তানের পাল্লায় পড়ে গেছিস! তোকে ইনজিন রুমের ট্যাঙ্কে কে চুবিয়েছে! তোরা মনে করিস আমরা কানা! আমার চোখকে ফাঁকি দেয় কোন্ শালা। হজম করতে পারল না।, কাপ্তানের ব্যাটা ইনজিন রুমে নেমে গেল। হজম হয়ে গেল নিজেই।

বংশীর সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। সে রোজ ধূপধুনো দিচ্ছে। যে কোনওভাবে এ-যাত্রা রক্ষা পেলে সে আর যে জাহাজে উঠছে না, বার বার কসম খেয়েছে। সুতরাং অধীর নেমে গেল নিচে। সুরঞ্জন সুহাসকে নিয়ে আগেই নিচে নেমে গেছে। চার্লি শেষে মার্কনিসাবের সঙ্গে ভেগে গেল! তার যে কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না।

সে নেমে দেখল, সুহাস মুখার্জিদার বিছানায় চুপচাপ শুয়ে আছে। সুরঞ্জন পাশের বাঙ্কে দু-হাতে মাথা রেখে বসে আছে। মুখার্জিদা না থাকলে কত অসহায় তারা, দুজনের বসে থাকা, শুয়ে থাকা থেকেই বোঝা যাচ্ছে। চার্লি আর মার্কনিসাবকে নিয়ে নানা কথারও ওড়াউড়ি।

সুহাস উঠে দরজা বন্ধ করে আবার এসে শুয়ে পড়ল। বাইরের ওড়াউড়ি কথাবার্তা সে সহ্য করতে পারছে না। চার্লির রহস্যময় অন্তর্ধানের হেতু কি সে! চার্লি কি বুঝেছিল, জাহাজে থাকলে তার নিগ্রহ বাড়বে। সে না থাকলে, সুহাসের ক্ষতি করার কেউ চেষ্টা করবে না। সুহাসকে বাঁচাবার জন্যই কি চার্লি নিখোঁজ হয়ে গেল! না এটা অপহরণ! মার্কনিসাব চার্লিকে অপহরণ করে ভেগে গেলেন।

চার্লিকে নিয়ে জাহাজের রহস্যটাও বোঝা যাচ্ছে না—সুহাস উঠে বসল। জামা গায়ে দিল, প্যান্ট পরল। জুতো পরার সময় সুরঞ্জন আর ধৈর্য ধবতে পারল না।

'জামা প্যান্ট জুতো পরে কোথায় বের হচ্ছিস?'

'দেখি কোথায় যাওয়া যায়।'

আর তখনই মনে হল, সিঁড়ি ধরে কেউ নেমে আসছে। কে! মুখ বাড়িয়ে অধীর দেখল সারেঙসাব। তাঁর হাতে একটা লম্বা কাগজ। কাগজটা দেখিয়ে বললেন, 'কাপ্তানের হুকুম, সুহাসকে আটকে রাখতে হবে।' সুহাসের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আল্লা মুবারক। চিন্তা করিস না। আমি তো জানি তুই কোনও খারাপ কাজ করতে পারিস না। কাপ্তান, চিফমেট বাইরে নেমে গেছেন। মাদাঙে খবর দিয়েছেন। পুলিশ ফাঁড়িতে যাবেন।'

সুহাস বসে পড়ল!

'আমি কি করেছি!'

'কি করছিস জানি না। হুকুম তামিল করলাম। আমার কোনও কসুর নেই।'

আর তখনই কেন যে সুহাসের মনে হল, চার্লিকে কেউ জোরজার করে মোটরবোটে তুলে নিচ্ছে। তাকে নিয়ে দ্বীপ থেকে পালাচ্ছে। চার্লি পাগলের মতো যেন চিৎকার করছে। মার্কনিসাবের মুখও সে ভাল চেনে না। কেবল একটা অতিকায় বীভৎস মানুষের শরীর তার সামনে নাচানাচি করতে থাকল।

সে ভেঙে পড়ল 'মুখার্জিদা, চার্লিকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আমি যে দেখতে পাচ্ছি।'

অধীর সুরঞ্জন বলল, 'এত ভেঙে পড়লে চলে!' প্রিয়জন নিখোঁজ হযে গেলে দুর্ভাবনার শেষ থাকে

না। শত্রুও যা ভাবতে পারে না, প্রিয়জনের জীবন আশঙ্কায় মনের মধ্যে তাও উঁকি দেয়। সুহাস সত্যি ভেঙে পড়েছে। জাহাজ থেকে যে নেমে যাবে, খোঁজাখুঁজি করবে তারও উপায় আর থাকল না।

সুহাস নিজের ফোকসাল ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না। কাপ্তান কি পাগল হয়ে গেলেন! শেষে সুহাসকে তিনি সন্দেহ করছেন! সুহাস কখনও পারে—এতটা তার ক্ষমতা আছে! সুহাস চার্লিকে কোথায় লুকিয়ে রাখতে পারে একবার ভেবে দেখলেন না! সামান্য একজন জাহাজির কি ক্ষমতা তিনি তো ভালই জানেন।

কেন যে মুখার্জিদার উপর তার রাগ গিয়ে পড়ল—সুরঞ্জন বাঙ্কে থাপ্পর মেরে বলল, 'বোঝো এখন! চার্লি রহস্য উদ্ধারে গেলে—আর সেই চার্লিই নিখোঁজ। তাকে নিয়ে মার্কনিসাব ভেগে গেছে। অপহরণ, না ভাব ভালবাসা—কিছুই বুঝছি না।'

জাহাজে কাজকাম বন্ধ থাকলে যা হয়—সর্বত্র গুলতানি—চার্লিকে নিয়ে কারও দুর্ভাবনা নেই। উৎপাত গেছে—রক্ষা পাওয়া গেল, এমনও ভাবছে কেউ। কেউ দেশ বাড়ির গল্প মেতে গেছে। জল্পনা-কল্পনারও শেষ নেই। এবারে কাপ্তান জাহাজ নিয়ে দেশে ফিরতে বাধ্য হবেন। তার তো আর কেউ থাকল না।

দুপুরের খাবার সুরঞ্জন নিচে নামিয়ে আনল। অধীর, কেষ্ট, সুরঞ্জন খাচ্ছে। সুহাসকে খাওয়ানো গেল না।

অধীর বলল, না খেলে চলবে! আর মুখার্জিদাই বা কিরকম। ফেরার নাম নেই! তারা বার বার উপরে উঠে রেলিঙে দাঁড়িয়ে দেশী নৌকগুলি দেখছে, মোটরবোটে যদি আসেন। কিনারার রাস্তায়ও চোখ গেছে। তবে মানুষজনের ভিড়ে এত দূর থেকে তাঁকে আলাদা করে চেনার সুযোগ কম।

কি যে তারা করে! সুহাস চুপচাপ পড়েই আছে। তাকে কিছুতেই খাওয়ানো গেল না। তারা বুঝ-প্রবোধ দিচ্ছে, ঘাবড়ে গেলে চলবে। দ্যাখ মুখার্জিদা কি খবর নিয়ে আসে। চার্লিরও প্রশংসা করছে। চার্লি তাকে আগলে রেখেছিল, চার্লি না থাকলে কি যে হত! আরে তুই বুঝছিস না, চার্লির তুই গ্লিটারিং সোর্ড। সোর্ডটি সে সহজে হাতছাড়া করবে বলে মনে হয় না। নে ওঠ। খা। কত কথাই না বলছে তারা। সারেঙসাবকে বলাও যাচ্ছে না, দেখুন গে সুহাস কিচ্ছু মুখে দিচ্ছে না।

সারেঙসাব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারেন।

'চার্লি তোর কে হয়। বল্!' আবার বলতে পারেন, 'ভয় ধরে গেছে! চার্লি নেই, মার্কনিসাব নেই—আবার কে থাকবে না, এই আতঙ্ক! চার্লি ঠিক ফিরে আসবে। মার্কনিসাবও। কোথাও কিনারায় হয়তো বিনা নোটিসে নেমে গেছে। ঘাবড়ালে চলবে!'

বংশীর যেন পোয়াবারো। তার কথাই ঠিক। ভুতুড়ে জাহাজ। ঘরে ঘরে উঁকি দিচ্ছে। সঙ্গে লতিফ। দুজনেই বলছে, 'মুখার্জিবাবু মিছে কথা বলেছে। চাবি খোঁজা হচ্ছিল, বুঝছেন না মিঞারা সুহাসকে জাহাজের শয়তান ট্যাঙ্কে ঢুকিয়ে মারতে চেয়েছিল। পারেনি। স্রেফ ধাপ্পা মুখার্জির। জানে বাঁচতে চান তো জাহাজ ছেড়ে দিন! চার্লি কেন পালাল বুঝছেন না! কোন আতঙ্কে মার্কনিসাব হাওয়া। অদৃশ্য সেই শয়তান লুকেনার। তার আতঙ্কে হাওয়া হয়ে যাচ্ছে সব। বোট-ডেকে মধ্য রাতে নারী আসে কোত্থেকে! আহামদ বাটলার বরফ ঘরে লাশ দেখে কি করে! বলেন আপনারা! আবার কে নাকি এক বুড়ো মানুষ—বরফের মতো সাদা দাড়ি, মরা চোখ, মরা মানুষ হেঁটে বেড়ায় কখনও শুনেছেন, জাহাজে মরা মানুষও উঠে এসেছে। দিনের বেলায় ঘাপটি মেরে থাকে রাতে ঘুরে বেড়ায়। এই হারামজাদা মগড়া—বল্, তুই তো জানিস।'

মগড়া ছুটে পালাল।

'না না, আমি কিছু জানি না। আমি কিছু দেখিনি!'

এই সব নানা উপদ্রবের মধ্যে মুখার্জি যখন জাহাজে উঠে এলেন, তখন প্রায় গভীর রাত।

আর তিনি ফিরতেই হল্লা। পিছিলে লোকজন জমে গেছে। কে আগে খবরটা দেবে। তাঁকে ফোকসালে ঢুকতে দিচ্ছে না—তাঁকে ঘিরে রেখেছে সবাই। যার যা খুশি বলে যাচ্ছে—কাপ্তান তাঁর খোঁজ করেছেন, সুহাস কাপ্তানের মুখে মুখে তর্ক করছে, মার্কনিসাব নিখোঁজ, চার্লি নিখোঁজ—সবাই

এক এক করে জাহাজ ছেড়ে দিচ্ছে। প্রাণে বাঁচতে হলে তাদেরও জাহাজ ছেড়ে দিতে হবে—না হলে রক্ষা নেই—ঘোঁট তবে ভালই পাকিয়েছে বংশী—।

মুখার্জিসাব সবাইকে আশ্বস্ত করলেন, 'ঠিক আছে, জাহাজ ছাড়তে চাও তো সবাই মিলে বিচার-বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

তিনি দেখলেন, ভিড়ের মধ্যে সুহাস সুরঞ্জন অধীর কেউ নেই। চার্লি নিখোঁজ—কেন? এ তো আর এক বিড়ম্বনা। মার্কনিসাবও নিখোঁজ। চার্লি রহস্য, কলিজ রহস্য, গুপ্তধন রহস্য—সবই যে তিনি জেনে এসেছেন। তার সব আনন্দ চার্লির নিখোঁজ হওয়ার খবরে বৃথা হয়ে গেল। তিনি সহসা কেন যে ক্ষেপে গেলেন—'রাস্তা ছাড় বংশী। রাস্তা ছাড় বলছি। যা ঘরে যা। বাইরে ফের দেখেছি তো ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব। ঘোঁট পাকানো হচ্ছে!'

তার আর কথা বলতেও ভাল লাগছিল না। সোজা নিজের ঘরে ঢুকে দেখলেন, সুহাস শুয়ে আছে। অধীর সুরঞ্জন সুহাসকে পাহারা দিচ্ছে।

মুখার্জি দরজা বন্ধ করে জামা প্যান্ট ছাড়লেন। বাথরুমে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে ফিরলেন। কারও সঙ্গে আর যেন একটা কথাও বলবেন না। বাঙ্কে বসে শুধু বললেন—'জাহাজে তবে সত্যি অরাজকতা শুরু হয়ে গেল।' সুরঞ্জনকে বললেন, 'সময় নেই, সংক্ষেপে বল্।'

সুরঞ্জন যা জানে বলল, 'চার্লি হাওয়া। মার্কনিসাব হাওয়া।'

অধীরকে বললেন, 'তোর কি বলার আছে?'

অধীর যা জানে বলল।

সুহাসের দিকে তিনি তাকাচ্ছেন না। তাকালেই তাঁর মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে। আবে তুই কি, এখন শুয়ে থাকার সময়! ঘর থেকে তোব বের হওযা নিষেধ! কে মানে। লাথি মেরে ভেঙে দিতে পারলি না সব। শুয়ে আছিস! জলগ্রহণ করিসনি! তুই মানুষ। মেয়েটা কোথায়, কে নিয়ে ভেগে গেল, মার্কনি সাবের যে চক্রান্ত নয় কে বলবে। কত ধনসম্পদের মালিক চার্লি জানিস!

কিন্তু তিনি জানেন, মেজাজ খারাপ করে লাভ নেই।

'বল্ সুহাস? তারপর।'

'চার্লি ফুলের কথা বলেছে।'

'আর কি বলেছে?'

'তার ঠাকুরদার কথা বলেছে। দেয়ালে ফের ছবি এঁকে ঝুলিয়ে রেখেছে।'

'থেমে গেলি কেন? তারপব, কুইক।'

'তারপর আর কিছু জানি না।'

আর সঙ্গে সঙ্গে মুখার্জি টর্চটা নিয়ে বোট-ডেকে ছুটলেন। সুটের মুখ পাটাতন ঢাকা আছে কি নেই, চার্লি সুটের মুখে ঝুঁকে এত কি দেখত! ঘর থেকে বের হবার সময়, সুরঞ্জন বলল, 'একা যাবে না।' বলে সে-ও উঠতে গেলে এক ধমক।

'ওখানে কি তামাসা। যাচ্ছি চুপচাপ। সঙ্গে যেতে চান।'

মুখার্জি উঠে যাবার সময় দেখলেন, এখনও জাহাজিরা অনেকে জেগে আছে। সবার মুখ ব্যাজার। কি যে হচ্ছে জাহাজে। টর্চটা আড়াল করে উঠে গেলেন। ডেকে উঠে দেখলেন, শুনশান। একটা পাখি পর্যন্ত মাস্তুলে বসে নেই। ফল্কাগুলি সব খোলা পড়ে আছে। এখানে সেখানে ফসফেট তোলার পিপে গড়াগড়ি খাচ্ছে। জাহাজের লণ্ডভণ্ড অবস্থা। এলিওয়েতে আলো জ্বলছে, কিন্তু কেউ হাঁটাহাঁটি করছে না। চিফকুকের গ্যালিতেও কেউ নেই। সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে চার্লির দরজা খুলতেই অবাক। একের পর এক ছবি দেয়ালে। ছবিগুলি দেয়াল থেকে তুলে নিলেন। কাজে লাগতে পারে। একটা বাণ্ডিল বগলে নিয়ে বের হয়ে এলেন। কেবিনের পাশেই উইন্ডসহোল, তার পাশে সুটের মুখ—সেই ছোট্ট পাটাতন। কয়লা ফেলার সময় পাটাতন তুলে নেওযা হয়। তারপর খোলের তলায় বাঙ্কারগুলিতে কয়লা হড়হড় করে পড়তে থাকে।

তিনি খুব সন্তর্পণে কাজ সারছেন। টর্চ জ্বালতেই দেখলেন, ক'টা পেতলেব ছোট বল যত্রতত্র

ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। পেতলের বলগুলি কুড়িয়ে নিলেন। পাটাতন বন্ধ। এবং সংশয় থেকেই তাঁর এই অনুসন্ধান। চার্লি কি শেষ পর্যন্ত! না ভাবতে পারছেন না। হাঁটু মুড়ে পাটাতন আলগা করে এক হাতে ধরে রাখলেন, ডান হাতে পকেট থেকে টর্চ বের করে বাঙ্কারের খাদে ফোকাস মারতেই শরীর হিম হয়ে গেল।

সুটের তলায় বিশ পঁচিশ ফুট গভীবে একটা লোক মরে পড়ে আছে। আরে এটা কি দেখছেন! কে যেন তার পাশে এসে গলা বাড়িয়ে দিচ্ছে সুটের মুখে। ঝুঁকে দেখছে।

'কে? কে?'

বংশী ছুটছে।

'আবার মরেছে, জাহাজে আবার মরেছে। জাহাজে আবার খুন।' সে ডেকে নেমে পাগলের মতো দু হাত তুলে ছুটতে গেলে মুখার্জি খপ করে তার চুলের মুঠি চেপে ধরলেন। 'খবরদার, চিল্লাচিল্লি করবি তো ঘুসি মেরে সব কটা দাঁত খসিয়ে দেব। বাড়াবাড়ি করলে তোকেও খুন করে জাহাজে পুঁতে দেব।'

সুরঞ্জন আর অপেক্ষা করতে পারছে না। সুহাসও তাড়া লাগাচ্ছে, 'কোথায় ছুটে গেল দ্যাখ। কখন তো গেল! আসছে না কেন।' অধীরও পায়চারি করছিল। সিঁড়ি ধরে নেমে এলে বোঝা যাবে, সবাই সিঁড়িতে শব্দ শোনার অপেক্ষা করছে।

সুরঞ্জন বলল, 'যা না উপরে। গিয়ে দ্যাখ।'

'আমি পারব না। ভয় করছে।' ভয়ে কাঠ অধীর।

'তবে বোস এখানে। আসছি।' বলেই সুরঞ্জন ডেকে উঠে দেখল প্রায় শুম্ভ-নিশুম্ভ যুদ্ধ। মুখার্জিদা বংশীর চুল ধবে টেনে আনছেন। বংশী হাতে পায়ে ধরেও রেহাই পাচ্ছে না। 'লোক খেপানো হচ্ছে। আমাকে ফলো করা হচ্ছে। হতভাগা! কোনও আর কাজ নেই, আমার পেছনে লাগা। বল্ যা দেখেছিস, ভুলে যাবি। কাকপক্ষী টের পেলেও রেহাই নেই।'

সুরঞ্জনকে দেখে আরও ক্ষেপে গেলেন তিনি। 'আরে আমি তো যাচ্ছি। আমার পেছনে তোরা জোঁকের মতো লেগে আছিস!'

'তুমি বংশীকে নিযে পড়লে।'

মুখার্জি বংশীকে ছেড়ে দিযে বললেন, যা। বেঁচে গেলি।' তারপর সুরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চল্।'

এ-সময় আরও দুচারজন জাহাজি বেব হয়ে এসেছিল—'ওদিকে যেন কিসের গোলমাল!'

'কোথায়।' মুখার্জি স্রেফ ধোয়া তুলসিপাতা সেজে গেলেন। 'মিঞাসাবরা সবারই দেখছি এক দশা। তিল পড়ল তো তাল হয়ে গেল। গোলমাল ছাড়া কানে কিছু যাচ্ছে না।

'কে যেন ওদিকটায় আবার মরেছে, জাহাজে আবার খুন, চিল্লাচ্ছিল!'

'এরকম শোনা যায়। যান নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোন গে। আমি তো ডেকেই ছিলাম, কোথাও গোলমাল হলে টের পেতাম না!'

'তা অবশ্য ঠিক। কি যে হচ্ছে মুখার্জিবাবু। রাতে একা ডেকে উঠে আসতেও গা শির শির করে। কি সব হচ্ছে বলুন তো!'

মুখার্জিদা অদ্ভুত কথা বললেন, 'কিছু তো হচ্ছেই। না হলে গা শির শির করবে কেন। পোকা মাকড়ও তো হাঁটাহাঁটি করছে না যে গা শির শির করবে।'

কয়লার সুটে কেউ মরে পড়ে আছে—এটাই মুখার্জির সান্ত্বনা। সঙ্গে সঙ্গে কেন যে মনে হল চার্লি নয় তো! চার্লিকে কেউ খুন করে ফেলে রাখেনি তো। জাহাজ থেকে দুজন নিখোঁজ—চার্লি আর উইলিয়াম। দুজনই, দুজনকে তাড়া করতে পারে। অথচ তাঁর কেন যে মনে হচ্ছিল, চার্লি শেষ পর্যন্ত তার দুরভিসন্ধি কাজে লাগাল। উইলিয়ামকে জালে জড়িয়ে সুটের গর্তে ফেলে দিল! মন প্রসন্ন ছিল, অন্তত চার্লির কিছু হয়নি ভেবে। চার্লির অভিসন্ধি তিনি ধরে ফেলেছেন বলেই তো ছুটে গিয়েছিলেন! উইলিয়ামের দরজায় পিস্তল নিয়ে হামলার পরই তো তাঁর মনে হয়েছে চার্লি তাকে ছেড়ে দেবে না।উল্টোটাও হতে পারে। অত উঁচু থেকে টর্চের আলোতে বোঝাও মুশকিল। তিনি

কেমন দমে গেলেন। জোর পাচ্ছেন না। দু-রাত ধরে চোখের পাতা এক করতে পারেননি। শরীর আর দিচ্ছে না।

তবু তিনি ডেকে উঠে দম নিলেন। এখন একমাত্র উপায় গঙ্গাবাজুর বাঙ্কারে ঢুকে যাওয়া। গঙ্গাবাজুর বাঙ্কার ফাঁকা। তা না হলে, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হৈ চৈ শুরু হয়ে যেত। যমুনাবাজুর বয়লার চালু রাখা হয়েছে—যমুনাবাজুর বাঙ্কারে কোনও কোলবয় কয়লা ফেলছে—সে জন্যই না গঙ্গাবাজুর বাঙ্কারে সুটে একটা লোক মরে পড়ে আছে। জানলে জামাপ্যান্টও নষ্ট করে ফেলতে পারে। গভীর রাত, চার্লি নিখোঁজ, উইলিয়াম নিখোঁজ—কে জানে, স্টোকার আর কোলবয় ভয়ে জড়সড় হয়ে বয়লার রুমে বসে আছে কি না! তিনি সুরঞ্জনকে বললেন, 'তুই যা। আমি আসছি।'

'কি যে মাথায় থাকে। হঠাৎ হঠাৎ কি হয় তোমার বলো তো!'

'যা না! বললাম তো আসছি, তবে প্রশ্ন করতেই পারিস। তুই আমার সহকারী বুঝি! এই একটু কাজ, যাব আর আসব।'

'আমি দাঁড়াচ্ছি। তুমি যাও।'

'ঠিক আছে।' বলে সতর্ক নজর রেখে ফের বোট-ডেকে উঠে গেলেন। চিমনিব গোড়া ধরে নামছেন। টর্চ জ্বালছেন না। কম পাওয়ারেব আলো নিচে জ্বলছে। স্টোকহোলডে ঠিক দুজন পরিদার গা লাগালাগি করে বসে আছে। ভয়ে কেউ কাউকে ছেড়ে দিচ্ছে না।

সহজেই তিনি গঙ্গাবাজুর বাঙ্কারে গোপনে ঢুকে যেতে পারলেন। গভীর অন্ধকার। সত্যি যেন ব্ল্যাকেস্ট অফ দি ব্ল্যাক নাইটস। টর্চ জ্বালালেন। কয়লার পাহাড় পার হয়ে সুটের মুখে যাবার আগে কেমন যেন গা ছমছম করতে থাকল। আর এগোতে সাহস পাচ্ছেন না। টর্চের আলো নিভিয়ে দিলেই যেন তাঁকে মৃত লোকটা উঠে এসে জাপটে ধরবে। আর তখনই যেন পাশে তাঁর কেউ নিঃশ্বাস ফেলছে। ভয়ে হাত থেকে টর্চটা পড়েই যেত। যদি বংশী হয়। ভেবেই সাহস পাচ্ছেন। আলো জ্বেলে দেখলেন, তার পিছু পিছু সুরঞ্জনও নেমে এসেছে!

'—তুই!'

'কি ব্যাপার বল তো?'

'দেখবি?'

'কি দেখব!'

'সুটের ভিতর উঁকি দিয়ে দেখ না। যদি চিনতে পারিস।' বলে, তিনি সুটের মুখে টর্চ জ্বালতেই সুরঞ্জন আতঙ্কে মুখার্জিকে জড়িয়ে ধরল। চোখ বুজে ফেলেছে। প্রায় দলা পাকিয়ে গেছে। মুখ অক্ষত। বাঁ হাতটা ছড়ানো।

সুরঞ্জন বলল, 'দাঁড়াতে পারছি না। শিগগির চল্‌!'

'চিনতে পারলি?'

'না। মানে ঠিক বুঝছি না। জাহাজে তো কোনও গুঁফো লোক নেই।'

'আমি চিনতে পারছিলাম না। যাক চার্লি নয়। ইস, কি যে গেছে! চল্‌ উঠি। তা হলে গিরগিটি গোঁফের মুখোশ এই!'

সুরঞ্জন পেছনে পড়ে যাচ্ছিল। সে দৌড়ে আগে চলে গেল। ঘুটঘুটে অন্ধকার পার হয়ে সন্তর্পণে বোট-ডেকে উঠে এল। হামাগুড়ি দিতে থাকল। মেসরুম মেটদের কেবিনে আলো জ্বালা। সবাই আজ যে যার কেবিনে ফোকসালে এত রাতেও আলো জ্বালিয়ে রেখেছে। সবার মধ্যে ত্রাস।

তাব মাথা নিচু করে দৌড়ে ডেক পার হয়ে এল। তারপর ফোকসালে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বসে পড়ল। দুজনই বেদম হাঁপাচ্ছে।

তারা কথা বলতে পারছে না। অধীর বার বার বলছে—'কি হল! হাঁপাচ্ছ কেন? কোথায় গিয়েছিলে।'

মুখার্জি হাত তুলে দিচ্ছেন। কথা বলছেন না। দম নেই কথা বলার। হাত তুলে বুঝিয়ে.

সুরঞ্জন এতক্ষণে যেন নিজেকে সামলে নিয়েছে। সে কৌতূহল দমন করতে পারছে না। বলেই ফেলল, 'লোকটা কে?'

মুখার্জি চান না, সুহাস জেনে ফেলুক, জাহাজে আর একটি খুন হয়েছে। তবে খুনী খুবই কাঁচা কাজ করে ফেলেছে। পাটাতন হড়কে উইলিযাম সুটে পড়ে গেছে। জাল পাতা থেকে হড়কে যাওয়া সবই ঠিক ছিল। লোহার পাতে পেতলের বল সাজিয়ে পাটাতন বসিয়ে দিলে যেই পা দিক হড়কে সুটের পাতালে পড়ে যেতে পারে। তবে সব ঠিকঠাক করলেও শেষ রক্ষা করতে পারেনি। খুনী জানে কখন পড়েছে। কারণ পোর্টহোল থেকে সে গোপনে হয়তো নজর রেখেছে। পড়ার সময় উইলিয়াম চিৎকার করারও সুযোগ পায়নি। বিনা মেঘে প্রায় বজ্রপাত বলা চলে। খুনী ফের পেতলের বলগুলি সরিয়ে পাটাতন পেতে না রাখলেই পারত। আসলে সে হয়তো চায়নি, আর কেউ খুন হোক। পাটাতন খোলা থাকলে যে কেউ জখম হতে পারত অন্ধকারে। পা দিলেই পাতালে। পেতলের বলগুলিও সব কুড়িয়ে নেবার বোধহয় সময় ছিল না। অকুস্থলে পেতলের বল পড়ে থাকলে তদন্তকারী যে সহজেই সূত্র পেয়ে যেতে পারে তাও বোধহয় খুনির মনে হয়নি।

'আরে কিছু বলছ না কেন?' সুরঞ্জন অস্থির হয়ে উঠছে।

'কেউ না।' বলে, চোখ টিপে দিলেন মুখার্জি। মুখে কপট গাম্ভীর্য। 'তোর এই এক দোষ সুরঞ্জন, উঠল বাই তো কটক যাই। একজন সহকারীর এত অস্থিরতা ভাল না।'

সুহাস অধীর কিছুই বুঝতে পারছে না। বোকার মতো তাকিয়ে আছে।

মুখার্জি বললেন, 'সময় নেই। এই যে সুহাসবাবু, জামা প্যান্ট পরে নিন। আপনার অনেক দায়িত্ব। গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ালে চলবে না। এক্ষুনি আপনাকে বের হয়ে পড়তে হবে। আমার এদিকে মেলা কাজ। ফিলকে খবরটা দিতে হবে। খুব জরুরি। চার্লি নিখোঁজ, ফিলকে জানানো দরকার।'

'ও বের হবে কি করে! কাপ্তানের নিষেধাজ্ঞা জারি হয়ে গেছে।' অধীর কিছুটা অস্বস্তির গলায় বলল।

'নিষেধাজ্ঞা! দ্যাখ নিষেধাজ্ঞায় কি হয়? পরে ফ্যাল, বসে থাকিস না। আমাদের এখন দরকার, চার্লিকে কোনও কারণে সত্যি যদি কেউ অপহরণ করে থাকে। করতেই পারে। আমরা যাচ্ছি ডালে ডালে, তারা হাঁটছে পাতায় পাতায়। চার্লির বন-জঙ্গলের নেশা আছে বলেই ধরে নিতে হবে সে জঙ্গলে চলে গেছে, একজন হবু গোয়েন্দারও সামান্য কাণ্ডজ্ঞান থাকলে বিশ্বাস করা কঠিন। কাপ্তানের এটা যে আর একটা জালিয়াতি নয় কে বলবে! মেয়েটা জালিয়াতির শিকার। যাকগে ও-সব পরে ভাবা যাবে। তবে সাবধানের মার নেই।'

মুখার্জি এবার সুহাসের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শোন, একটা কথা বলি, দ্বীপটা বেশ বড়ই। ফিলের প্রাসাদে যাবার রাস্তাও তোর জানা নেই। পথভ্রষ্ট হতে পারিস। দু-চারদিনের রাস্তাও ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া যায়। দ্বীপটায় মানুষজন ধর্মভীরু। চুরি ছিনতাই ডাকাতির ভয় নেই। সরল অকপট মানুষ তারা। পরিশ্রমী। চার্লি জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালেও তার ক্ষতির আশঙ্কা নেই কিন্তু অপহরণের কেস হলে চার্লির বিপদ।

তিনি থেমে বললেন, 'মুশকিল চার্লির, সে ধরা পড়বেই। জঙ্গলে পালিয়ে থাকলে আজ হোক, দু'দিন পরে হোক। মনে রাখিস চার্লি রাজার জাত। জঙ্গলে কেউ দেখে ফেললে দেবী-টেবি ভেবে পুজো আর্চা করে দেবে না তাও বলা যায় না। ফিলকে দেখে বুঝেছি। আর ফসফেট কোম্পানির গোরারা সংখ্যায় নগণ্য। তারা দ্বীপটার লোকালয়ে প্রায় যায় না বললেই চলে। আর সেখানে ডানাকাটা পরী যতই দুর্গম অঞ্চলে চলে যাক, একদিন সে ধরা পড়ে যাবেই। ফিলকে শুধু বলবি, মুখার্জি পাঠিয়েছেন। আর এটা রাখ।' বলে পকেট থেকে স্বর্ণমুদ্রাটি বের করে তার হাতে দিলেন। ফিলকে বলবি, 'সে যেন নজর রাখে! একটাই আতঙ্ক, চার্লিকে না কেউ অপহরণ করে!'

সুরঞ্জন বলল, 'দু লাইন লিখে দিতে পারছ না?'

'দিচ্ছি।' বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। লকার খুলে চার্লির ঘর থেকে সংগ্রহ করা ছবিগুলি তুলে রাখলেন—

'শোন, সব বোটে, দেশী নৌকার, খাঁড়ির মুখে, স্টিমারে সর্বত্র ফিল যেন নজর রাখে। তার

লোকজন খবর পেলেই বের হয়ে পড়বে। সে চার্লিকে আমাদের চেয়ে বেশি ভাল জানে। একরোখা মানুষ। চোটপাট করলে ঘাবড়ে যাবি না। স্বর্ণমুদ্রাটি তোর কাজে লাগবে। রাস্তায় কিংবা বনে জঙ্গলে এটি তোকে রক্ষা করবে। আর সব সময় মনে রাখবি সমুদ্র বাঁ-দিকে। রাতের বেলা, গাছপালা পাহাড়ের আড়ালে সমুদ্র লুকিয়ে থাকলেও তার ফোঁসফোঁসানির শেষ নেই। অহরহ গর্জাচ্ছে। চুলটা আঁচড়ে নে। জ্যোৎস্না রাতে ঘোড়াও বেশ কদম দিতে পারে।'

মুখার্জি প্যাড বের করে দু-ছত্তর লিখে দিলেন, ফিল, সুহাস যাচ্ছে। তুমি তাকে দেখতে চেয়েছিলে। দেখাও হবে, কাজ হবে ভেবে পাঠালাম। চার্লি কোথায় চলে গেছে। নিখোঁজ কথাটা লিখতে কেন যে মুখার্জির কলম সরল না। মেয়েটার মুখে, কেন যে বার বার তিনি নিজের আত্মজাকে দেখতে পান। কলম তাঁর থেমে গেল। সুহাস যেন তাঁর আত্মজ। না হলে এত ঝকমারিতে বোধহয় নাকই গলাতেন না।

'জুতোর ফিতে বাঁধলি না!'

সুহাস যেন বের হয়ে পড়তে পারলেই বাঁচে।

মুখার্জি বললেন, 'মেয়েটা তোমার জন্যই মনে রেখ সাঁতার জলে নেমে গেল। তুমি দ্যাখো হাঁটু জলে নামতে পারো কি না। পিছিলে নৌকা আছে। সঙ্গে নিয়ে এসেছি। দড়ির সিঁড়ি ফেলা আছে। যে যার ঘরে শুয়ে পড়েছে। এই সময়। আশা করি পারবে। আমরা কেউ যাচ্ছি না। মনে রাখবে সব জাহাজে মুখার্জিদা থাকবে না। বাবা মা কারও চিরদিন থাকে না। একা এসেছ একা যাবে।'

সুহাস বেব হয়ে গেলে কিছুটা বিষণ্ণ মুখার্জি। তিনি কি সব আঁচ করতে পারছেন। জেনেশুনে কি সুহাসকে বাঘের খপ্পরে ফেলে দিলেন! অধীর সুরঞ্জন কখনও মুখার্জিদাকে এতটা দুর্বল হয়ে পড়তে দখেনি। কি হল, কেন পাঠালেন, কেন বললেন, একা এসেছ একা যাবে। এত রাতে কেন সুহাসকে জাহাজছাড়া করলেন! সকালে গেলে কি হত! সকালে গেলে কতটা আর সময় নষ্ট হত! সবার নজরে পড়ে যেতে পারে ভেবেই হয়তো, অজানা অচেনা দ্বীপে সুহাসকে চার্লির খোঁজে পাঠিয়ে দিলেন! সুহাসের জীবন কি এখনও তবে জাহাজে বিপন্ন হতে পারে। কি জানি—কিছুই বুঝছে না সুরঞ্জন অধীব। তারা চুপচাপ বসে আছে। দু-হাতে মাথা রেখে মুখার্জিদা কিছুটা শোকাহত মানুষের মতো বসে আছেন। কারও মুখে রা নেই।

অগত্যা কি করা!

সুরঞ্জন বলল, 'এভাবে বসে থাকলে চলবে। বলছ হাতে একদম সময় নেই। ফিলের কাছে গেলে, কথাবার্তা শুনে তো মনে হচ্ছে ফিল তোমার গুরুভাই। তোমার কোনও ঠাকুর দেবতা আছে বলেও তো জানি না। মরা লোকটা কে তাও বলছ না!'

'লোকটা মার্কনিসাব। লোকটা সেই মেঘের ওপারের কণ্ঠস্বর। লোকটা উইন্ডসহোলে গোঁফের মুখোশ পরে চার্লিকে শাসাত। আসলে যার গোঁফ-দাড়ি নেই সে যদি লম্বা গোঁফ জুলফির ছদ্মবেশে থাকে, তবে ধরবেটা কে? দ্যাখ আর অবান্তর কথা বলবি না।'

যাক মুখার্জিদা সামলে উঠেছেন। সুরঞ্জন খোঁচা দিয়ে ভুল করেনি। মুখার্জিদা যেন কিঞ্চিত লজ্জাই পেয়েছেন। অন্তত তাঁর এই দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ুক তিনি বোধহয় চাইতেন না। সুহাসের জন্য মানুষটার মধ্যে বিশ বাইশ মাসে এত মায়া গড়ে উঠতে পারে মুখার্জিদার দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ায় তারা টের পেয়েছে। কাঠখোট্টা স্বভাবের মানুষ বলেই তারা মুখার্জিদাকে জানে। কিন্তু মার্কনিসাব, গোঁফ, সবই কেমন তার মাথা গুলিয়ে ফেলছে।

অধীর বলল, 'তোমার খাবার চাপা আছে। খেয়ে নাও।'

'আমার আর খেতে ইচ্ছে করছে না। তোরা সবাই খেয়েছিস? বংশী!'

'খেয়েছি।' অধীর বলল।

সুরঞ্জনের খেদোক্তি, 'হয়েছে বেশ, তোমারও খেতে ইচ্ছে করছে না। সুহাসকেও জলগ্রহণ করানো গেল না। সারাদিন কিছুই খায়নি বলতে গেলে। তাকে হুট করে কিনারায় পাঠিয়ে দিলে।'

'যাক, কষ্ট আছে তবে। চার্লির জন্য মন পুড়ছে। এটা দরকার ছিল। একদিন না খেলে কিছু হয় না।'

তারপর তিনি সতর্ক গলায় বললেন, 'মার্কনি সাব মানে উইলিয়ামকে নিয়ে আর কোনও কথা না। কে কোথা থেকে শুনে ফেলবে। আমরা যেন কিছু জানি না। আর আগেই বলেছি বিনা আগুনে ধোঁয়া সৃষ্টি হয় না। বিনা কারণে গুজবও রটে না। লুকেনারের গুপ্তধন আছে। এখনও এটা আমার কাছে স্বপ্ন না মরীচিকা বুঝতে পারছি না। পাহাড়টা জোয়ার-ভাটায় ভাসে ডোবে। অজস্র ফাঁক-ফোকর। কোথা দিয়ে জল ঢুকছে, কোথা দিয়ে বের হচ্ছে বোঝাই কঠিন। অমাবস্যা পূর্ণিমায় পাহাড়ে একটা দরজা উঁকি দেয়। দরজার ভেতরে ঘোড়ায় চড়ে ঢোকা যায়। লুকেনারের গুপ্তধন, না অন্য কিছু জানি না। ফিল অবশ্য বলেনি—সে বলে, ঈশ্বরের ভাণ্ডার। মানুষের সেবার জন্য ঈশ্বরই নাকি তাঁকে এই ভাণ্ডারের খোঁজ দিয়েছেন। এখন বুঝে দ্যাখ—অবিশ্বাসও করতে পারি না। সারাক্ষণ পাথরের পাহাড়ে ঝম ঝম শব্দ। ঝন ঝন করে কি বাজছে। টুং টাং সেতারের আওয়াজ, মনে হয় জলের স্রোতে সেই গুপ্তধন নড়ানড়ি করছে। দু-চারটে গড়িয়ে নেমে আসছে। জলের সঙ্গে জায়গায় জায়গায় পড়ছে। শুধু কুড়িয়ে নেওয়া। পাহাড়ের গায়ে এখানে সেখানে ঝোরা। পাথরের খাদ। জল জমছে, জল উপছে পড়ছে। নদী থেকে ডুবে ডুবে তামার পয়সা তোলার মতো। দু-একটা স্বর্ণমুদ্রা ডুবলেই পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে নূপুরের ধ্বনি।' তিনি যে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলেন তাও বললেন। অধীর সুরঞ্জন রুদ্ধশ্বাসে শুনছে। জাহাজের খোলে একটা মরা মানুষ পড়ে আছে, তার কথাও ভুলে গেছে। 'পাহাড়টা কোথায়?' সুরঞ্জন না বলে পারল না।

মুখার্জি বললেন, 'পাহাড়টা কোথায় জানি না। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলাম। পিরামিডের মতো দেখতে। হাঙরের ঝাঁক পাহাড়টাকে ঘিরে রেখেছে—যাক সে সব কথা—এখন তোমাদের কিছু জরুরি কথা জানা দরকার। আমি যদি না থাকি, ধর আমার যদি কিছু হয়—হবেই এমন বলছি না, তবু সতর্ক থাকা দরকার। কাপ্তান আমাকে ছেড়ে দেবেন না।'

তিনি বাঙ্ক থেকে নেমে লকার খুলতেই কিছু কাগজপত্র বাইরে গড়িয়ে পড়ল। কাগজগুলি তোলার সময় শুধু বললেন, 'মহিষাসুর বধ পালা সাঙ্গ। ম্যাকের হত্যাকারী কিংবা চক্রান্তকারীও শেষ। ছবিগুলি দেখে বোঝ। মা আমার রণচণ্ডী রূপ ধারণ করেছিলেন। তাঁরই বিভূতি। তিনি তো জাহাজ থেকে হাওয়া। তা দুর্গতিনাশিনী তিনি, ভয়ের কি আছে!' বলে কাঠে তিনি কয়েকটি ছবি পর পর পিন পুঁতে দেবার সময় বললেন, আগেই বলেছি, 'দেবী তার ছবিতে বুনো ফুল এঁকে দেখাত। মনে আছে বোধ হয় তোদের।'

ছবিগুলি ওলটাবার সময় বললেন, 'সুহাসকে দেখাত। নিজেও এঁকে দেখত। ডালপালায় কখনও কাঁটার মধ্যে কিংবা মাকড়সার জালে ছিন্নভিন্ন প্রজাপতিও এঁকেছে। ছবিগুলিতে কখনও ক্রোধ ফুটে উঠত—কখনও সুষমা। মনে আছে তোদের!'

যেন তিনি দম নিচ্ছেন। বললেন, 'চক্রান্তকারী উইলিয়াম, সেকেন্ডকে অযথা সন্দেহ করেছি। উইলিয়াম এবং ম্যাক দুজনেই। ডেরিক তারাই শেষ রাতে তুলে রেখেছিল জাহাজ অন্ধকার করে দিয়ে। তার হাতে ক্ষত থাকলেও লুকিয়ে গেছে। তাকে হয়তো হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধারই দরকার হয়নি। কাল লাশ তোলার সময় দেখতে হবে।'

সুরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, মুখোশ পরে মগড়া ঝোপে জঙ্গলে বসে থাকে জানব কি করে বল্। ধাতানি না দিলে বেটা স্বীকারও করত না। চার্লি, পিস্তল, তাকে খুঁজছে চার্লি, সুহাসই তাকে রক্ষা করতে পারে, কত কিছু বললাম। তবু কি মচকায়! অথচ সেকেন্ডকে সন্দেহ করেছি। লাইট-হাউজ পার হয়ে গেছি। তুই তো দেখেছিস লাইটহাউজের জায়গাটা খুবই গোলমেলে। কোন্ ফাঁকে ঝোপে ঢুকে বসে আছে বুঝব কি করে! সেকেন্ডকে বাতিঘর পার হয়ে যেতে দেখেই আমি কিনা বোকার মতো জঙ্গলে ঢুকে গেলাম।

অধীর বলল, 'মগড়ার সত্যি মাথা খারাপ।'

সুরঞ্জন বলল, 'মাথা খারাপ কি ভাল ভেবে লাভ নেই। পাস্ট ইজ পাস্ট। কী হয়রানিটা করল!'

মুখার্জি বললেন, 'মগড়াকে আমি থ্যাঙ্কস দিচ্ছি। মুখোশের তাড়া না খেলে চার্লি-রহস্য বোধহয় উদ্ধারও হত না। শুধু কি চার্লি-বহস্য—যাক গে কি যেন বলছিলাম?'

অধীর কিন্তু মগড়ার মোটিফ বুঝতে পারছে না। সে তো সব জানে না। কিছুটা জানে।

সে বলল, 'মাথা খারাপ না হলে, কী মোটিফ তার?'

মুখার্জি বললেন, 'মোটিফ একটাই। জঙ্গলে চার্লি সুহাস কি করে। বুনো ফুল দেখতে যায় কেন? ওরা দুজনে জঙ্গলে যদি ফুর্তিফার্তা করে। দেখে সুখ আর কি! নেশা। ব্যাটার গায়েব যা রং, আর মুখের যা চেহারা, যত দূরেই থাক, চার্লি ঠিক টের পেত, কোনও নেটিভ তাকে ফলো করছে। ধরা পড়ে যেত। মুখোশ পরে চতুর হতে গেছে। সামনাসামনি পড়ে গেলে রক্ষা থাকত। সহজেই চার্লি চিনে ফেলত।

তারপরই মুখার্জি বললেন, 'বাজে কথা থাক। মগড়া আমাদের কোনও ইস্যু নয়।'

মুখার্জি তাঁর লকারের দরজা খোলার সময় বললেন, 'ও হ্যাঁ, ডেরিক তোলার কথা বলেছিলাম। তোরা যে কি! খেই হারিয়ে ফেলছি। লকারের দরজাই বা খুললাম কেন। এত জট এক সঙ্গে খোলা কঠিন। ডেরিক ম্যাক আর উইলিয়াম তুলে রেখেছিল। দড়িটা প্রমাণ। দড়িটার একটা অংশ রক্তাক্ত। আততায়ীর হাত খুঁজলে ক্ষতের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে। কাল লাশ তোলার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে।'

'এই দ্যাখ।' বলে কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট বের করে দেখালেন। ডাইরি থেকে রসিদ বেব করে দেখালেন। 'ডেক-কশপের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি। তোরা তো জানিস ডেক কশপ, মাল পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। মগড়া খবরটা দেয়—সেই থেকে ডেক-কশপ কাপ্তান-বয়, বাটলার আমার বান্দা বলতে পারিস।'

'তবে শেষ উপকারটা করেছে কাপ্তানবয়।'

'ডেরিকের কথা কি শেষ?' সুরঞ্জন বলল।

'না শেষ নয়।'

'তবে হুট করে লঙ জাম্প মারছ কেন।'

'না বলছিলাম, কাপ্তান কিন্তু ডেরিক তোলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত নয়।'

'আবার হাই জাম্প! দড়িটা কে নিল, কে দিল বলবে না!'

'দড়িটা ডেক-কশপ সাপ্লাই করেছে। ঠিক সাপ্লাই বললে ভুল হবে। নিউপ্লিমাউথের শিপিং ট্রান্সপোর্ট এন্টারপ্রাইজ থেকে কেনা। জাহজে যারা মাল সরবরাহ করে তারাই এ ধরনের দড়ি সাপ্লাই করতে পারে। রসিদে নাম আছে কোম্পানির। দড়িটা কিভাবে হাতাল বলতে পারিস। সোজা—ডেক কশপ বলিস, ইনজিন-কশপ বলিস সাহেব সামনে দেখলেই ভূত দেখে। কাকে দিয়েছে ডেক-কশপ ঠিক মনে রাখতে পারেনি। এ তো তোর ইনজিন কশপের হাতুড়ি বাটালি হ্যাকস নয়, স্টোরে ফের ফেরত দিতে হবে। দড়িদড়া খরচখরচা জাহাজে সবসময় হয়েই থাকে। লেখাপড়াও জানে না। অভিজ্ঞতার জোরে কাজ চালিয়ে যায় বুঝতেই পারিস।'

'তুমি আবার বল গোলের বাইরে মারছ দাদা। কাপ্তান জড়িত নয় বললে কি সূত্রে!' সুরঞ্জন ছবিগুলি ভাঁজ করতে করতে কথা বলছে।

'নয়, তার কারণ লগবুক। কাপ্তান লগবুকে শো কজ করেছেন সেকেন্ড ইনজিনিয়ারকে! দুটো জেনারেটারই অচল হয়ে কি করে? কে আছে জাহাজে! ম্যাক যে স্ট্যান্ডবাই জেনারেটারের তার-ফার আলগা করে সর্টসার্কিটের ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছে, সেকেন্ড জানবে কি করে! ডগ ওয়াচেই কাজটা সারা হয়েছে। কারণ ডগ ওয়াচেই জাহাজের আলো নিভে গিয়েছিল। ব্রিজে ইমারজেন্সি লাইট জ্বলছিল বলে আমি ঠিক টের পাইনি। ইনজিন-রুমে যখন ধস্তাধস্তি, টর্চ নিয়ে ছোটাছুটি তখন ম্যাকের পাত্তা পাওয়া যায়নি। তাকে সেকেন্ড খেপে গিয়ে পরে লাথি মেরেছিলেন।'

'ম্যাকের সত্যি বাড়াবাড়ি। বেটা এত রাতেও মদ খেয়ে চুড় হয়ে থাকতে পারে। যেখানে সেখানে পড়ে থাকতে পারে?'

'মদ ম্যাক ছুঁতই না!' মুখার্জির কথায় সুরঞ্জন অধীর যেন আকাশ থেকে পড়ল।

'মদ ছুঁতই না! বলছ কি। নিজের চোখে দেখা—মাতাল হয়ে সিঁড়ির গোড়ায় টলছে।'

'ক্যামোফ্লেজ। যে মদ খায়, যে অ্যালকোহলিক, জন্মদিনে সে মদ স্পর্শ করে না, হয় না বুঝলি! সিম্যান মিশনেও দেখছি, আড্ডা দেয়, নাচে, কিন্তু বারে ঢোকে না।'

'যা বাব্বা! এ তো আর এক কেলো।' অধীর কিছুরই থই পাচ্ছে না-মতো বোকা বনে গেল।

'মাতলামি করে বুঝিয়ে দিয়েছে, কোনও গণ্ডগোলে সে নেই। সে মুখোশ বানিয়েছে একুশটা। গিরগিটি গোঁফের মুখোশটার জন্যই বাকি বিশটা মুখোশ। গিরিগিটি গোঁফের মুখোশটা দেখতে হুবহু উইলিয়ামের মুখের মতো। গোঁফের জন্য প্রায় মুখের অর্ধেকটা হাপিজ। চার্লিকে মুখোশটা উপহারও দিতে চেয়েছিল। আসলে উইলিয়ামের মুখের সঙ্গে গোলমাল সৃষ্টি করা আর কি। উইলিয়াম নকল গোঁফ লাগিয়ে চার্লিকে অনুসরণ করলে, মনে করতেই পারে একটা মুখোশ তাড়া করছে। গিরিগিটি গোঁফের মুখোশটাই তুরুপের তাস। সে নকল গোঁফ পরে গিরগিটি গোঁফের মুখোশ হয়ে যেত।' বলে তিনি, এক জোড়া লম্বা গোঁফ এবং জুলপি লকার থেকে বের করলেন। ছোট্টমতো শিশি। এক জাতীয় আফ্রিকান গাছের আঠা। গোঁফ টানাটানি করলেও উপড়ে আসবে না। জল দিলে আপনি আলগা হয়ে যায়। শিশিটা ওর লকারে আছে। গোঁফ জোড়া এবং জুলপি পরে তিনি সুটের গর্তে পড়ে আছেন। অধীরকে নিয়ে দেখাতে পারিস! যা না, দেখে আয়।'

'আরে আমরা দেখে করবটা কি? গোয়েন্দার সহকারী বলে শেষে আমার গলা কাটা যাবে!' অধীর কিছুই দেখতে রাজি না।

মুখার্জি বললেন, 'যা খুশি করবি! আমার কর্তব্য বুঝিয়ে দেওয়ার দিলাম। ভালমন্দ সব এখন তোদের উপর!'

অধীর না পেরে বলল, 'কাপ্তান কি তবে ধোয়া তুলসী পাতা! লগবুক দেখে খুশিমতো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললে! কাপ্তান শো-কজ করেছে। কাপ্তান জড়িত থাকলে জেনারেটরের গণ্ডগোল নিয়ে শো-কজ করত না ভাবছ। ডেরিক তোলার ব্যাপারে কাপ্তানের কোনও দুরভিসন্ধি নেই বললেই হল!'

মুখার্জি বললেন, 'দ্যাখ অধীর, আমি কিন্তু এখনই বলিনি কাপ্তান ধোয়া তুলসীপাতা। ধোয়া তুলসীপাতা হলে ফিলের কাছে এত ছোটাছুটিরও দরকার ছিল না। যাকগে আমি যতটুকু বুঝেছি—তোরা খুবই অধীর হয়ে পড়ছিস! মাথা তোদেরও ঘুরছে। গোলের মুখে যতই ছুটছি, তোরা মিসপাস করে গুবলেট করে দিচ্ছিস। তবে নাচতে যখন নেমেছি ঘোমটা খুলে ছাড়বই।'

'সে যা খুশি ছাড়। আমাদের কিছু বলার নেই। জাহাজে একটা মানুষ মরে পড়ে আছে, ভেবেই নিয়েছ উইলিয়াম। কি বলব বল! গোঁফের আমি, গোঁফের তুমি। উইলিয়ামের গোঁফ কবে ছিল!'

'উইলিয়ামই। ওটা ওর ছদ্মবেশ! বিশ্বাস না হয়, ঠিক কি না কাল লাশ তোলার সময় দেখে নিলেই হবে। উইলিয়ামকে নিয়ে আর কোনও প্রশ্ন নয়।'

'কে তাকে খুন করল?'

'দেবী, দেবী দুর্গতিনাশিনী।'

'শোনো, মুখার্জিদা তোমার দুর্গতিনাশিনীকে নিয়ে থাক। আমরা উঠছি। কে সুহাসকে ট্যাঙ্কের টবে নিয়ে চুবিয়েছে?

মুখার্জিদা কোনও জবাব দিচ্ছেন না। ছবিগুলি সব উলটে-পালটে দেখে পরপর পিন দিয়ে ভাল করে দেয়ালে আটকে দিলেন। লকার খোলা। নিজের জিনিসপত্র বলতে কিছু নেই—কেবল আজেবাজে কাগজে ভর্তি। সব ছোট বড় ছবি আঁকা আর্ট পেপার।

তিনি আর কোনও কথা বলছেন না। ছবিগুলি টাঙিয়ে দিতেই অধীর সুরঞ্জন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল, এ কি রকম ছবি! কোনটা ফুলের, কোনটা মুখের, কোনটা শুধু জামা প্যান্ট টুপি পরা অদৃশ্য মানুষের ছবি।

চার্লির ছবি সম্পর্কে বোধ হয় তিনি এবার নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা করবেন। সুরঞ্জন অধীর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে।

'এটি দেখছ? ফুলের ছবি। কি সুষমা! নিচে কি লেখা। আটামাসকু লিলি। চারপাশে গাছপালা। এক জোড়া দম্পতি লিলিটার পাশে বসে আছে। নিচে কি লেখা আছে—প্র্যাগন্যান্ট।

'এটি একটি আগুনের ছবি। সারা মাঠজুড়ে মনে হয় আগুন জ্বলছে।নিচে কি লেখা আছে—টল ব্লেজিং স্টার। যতদূর চোখ যায় শুধু ফুল। দুজন পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে নারী এবং পুরুষ। কোথায় যাচ্ছে তারা যেন জানে না।'

'আর এ ছবিটা দ্যাখ—চার পাপড়ির ফুল। ফুলের কোরকে মাকড়সার জাল। প্রজাপতি আটকে গেছে। ছটফট করছে। চার্লি ছবিটার নাম দিয়েছে, মেক্সিকান হ্যাট। সম্ভবত ফুলের নামে ছবির নামকরণ করেছে।'

তারপরই আর একটি ছবি টাঙিয়ে দিলেন—মানুষের মুখ। নীচে কি লেখা? 'উঠে আয়। পড়ে দ্যাখ।'

সুরঞ্জন অধীর উঠে গেল। ঝুঁকে লেখাটা পড়ল—বাট নাউ আই স্ন্যাপ মাই ফিঙ্গারস অ্যান্ড কল এ হল্ট টু হিজ ডিজঅনেস্ট গেইন অ্যান্ড ব্লাডসেড। ছবিটার নিচে অত্যন্ত ছোট হস্তাক্ষরে লেখা।

'কিছু বুঝতে পারছিস? কে সে? কার মতো দেখতে। কার বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ! বুঝতে পারছিস না! তিনি আমাদের মার্কনিসাব উইলিয়াম। ওদিকে আমাদের কাজও থাকে না, যাইও না। সে যে বের হয় না তাও না। কিনারায় যায় না, নামে না তাও না। সে জাহাজে কাজের সময় কিনারায় নামত। ফিরত রাত করে। গোঁফজোড়া ছিল তার ছদ্মবেশ! গ্যাঙওয়েয়ের অন্ধকারে তাকে ঠিক চেনা যেত না হয় তো। যাকগে, পরের ছবিটা দ্যাখ?'

'কিসের ছবি?'

'ওটা তো গিরগিটি গোঁফের মুখোশ।' সুরঞ্জন দেখে আঁতকে উঠল।

'এবারে দ্যাখ। ছবিটার গোঁফ সাদা রং দিয়ে মুছে দেওয়া হয়েছে। কার মতো লাগছে দেখতে?'

'আগেকার ছবিটার মতো।'

'মানে উইলিয়ামের মতো। মানে মার্কনিসাবের মতো। নিচে কি লেখা আছে?'

'ইয়ো স্যাল বি কমপ্লিটলি ওয়াইপড আউট।

'কি হল ঘাবড়ে গেলি কেন? দুর্গা দুর্গতিনাশিনী বলায় তো তোরা খেপে বোম। অত সহজে আমরা ছাড়ছি না, আমাদেরও কাপ্তান ছাড়ছে না। আমাকে উপহাস করা! হাই তোলা। বোঝো এবার। দ্যাখ শেষ ছবিখানা!'

বলে, তিনি লম্বামতো কাগজটা আগের ছবির ওপরই টাঙিয়ে দিলেন। চারকোনায় চারটে পিন পুঁতে দিতেই কেমন অতিকায় অদৃশ্য এবং ভয়ঙ্কর প্রেতাত্মা ছবিতে ভেসে উঠল। টুপি, জামা, প্যান্ট সাদা। মুখ দেখা যাচ্ছে না, হাত পা কিছুই দেখা যাচ্ছে না। জামা প্যান্ট টুপির ভিতর মানুষটা অদৃশ্য। মুখার্জি বললেন, 'ভাল করে দ্যাখ।'

হাতে কালো গ্লাভস। মুখে কালো ছায়া। পায়ে কালো মোজা। সুরঞ্জন ভূত দেখার মতো তাকিয়ে আছে।'

'এই সেই অদৃশ্য প্রেতাত্মা।' বলে, তিনি গ্লাভস এবং পোশাকটি লকার থেকে খুলে দেখালেন। বললেন, 'কাপ্তানবয় সাহায্য না করলে অন্ধকারই থাকতাম। জাহাজে ফেরার সময় প্যাকেটটা হাতে তুলে দিল! কে নাকি তাকে দিয়ে গেছে আমাকে দেবার জন্য। গ্যাঙওয়েতে দিয়ে গেছে। কোথায় পেল জানি না।'

'নিচে কি লিখছে, সুহাসের দুর্গতিনাশিনী। পড়ে দ্যাখ।'

ওরা ফের ঝুঁকে পড়ল—লেখা আছে, আই উইল পুট অ্যান এন্ড টু অল উইচক্র্যাফট।

'বুঝলি কিছু, দুর্গা দুর্গতিনাশিনী কাজটি সেরে হাওয়া। এখন ঠেলা সামলাতে হবে আমাদের। সুহাসকে ভাগিয়ে দিয়ে আপাতরক্ষা করা গেল। পরে কি হবে জানি না। চার্লি যে মেয়ে জানাজানি

হয়ে গেছে। কাপ্তানের মাথা ঠিক নেই। চার্লিকে খুঁজে না পেলে আমাকে সুহাসকে তিনি শেষ করে দিতে পারেন। প্রতিশোধ চরিতার্থে মানুষ সব করতে পারে। সমুদ্রে জাহাজ ভাসিয়ে খুনের অপরাধে মাস্তুলের দড়িতে লটকে দিতে পারেন। মনে রেখ সমুদ্রে কাপ্তানই সব। তাঁর অসীম ক্ষমতা। আইন, আদালত তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। এখন সুহাস ফিলকে খবর দিয়ে যত তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে পারে—সে ফিরে এলে আমাদের স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতে হবে। ফিল খবর পেলে চার্লিকে অপহরণ করা খুবই কঠিন।

এক নিরুপায় নৈঃশব্দ্যের ভিতর তারা চার্লির আঁকা ছবিগুলি ভূতগ্রস্তের মতো দেখছিল। মুখার্জি বাঙ্কে বসে আছেন। সুরঞ্জন অধীর ছবিগুলি দেখুক। কোথাও আর বিন্দুমাত্র সংশয় নেই চার্লি উইলিয়ামকে খতম করে ভেগেছে। সুহাসকে এ-ভাবে রক্ষা করা ছাড়া তার বোধহয় আর কোনও উপায়ও জানা ছিল না। চার্লি জাহাজ ছেড়ে দিয়ে সুহাসকে বিপদমুক্ত করে গেল—এমনও ভাবলেন মুখার্জি। সে না থাকলে সুহাসের শত্রুপক্ষও থাকে না চার্লি ভালই জানত। অনেকের গলায় কাঁটা ফুঁটে থাকার কারণ সে।

আজ সমুদ্র থেকে ঝোড়ো হাওয়াও উঠে আসছে না। এই গভীর রাতে তারা তিনটে মাত্র প্রাণী জাহাজে জেগে আছে। কাপ্তান, চিফমেট সেকেন্ডমেট কিনার থেকে ফেরেননি। হয়তো কোনও হোটেলে রাত্রিবাস কিংবা মাদাঙ থেকে ফেরার কোনও স্টিমার ধরতে পারেননি। সকাল হলে, সবাই দেখবে সুটেব মুখ খালি। পাটাতন সরানো। তিনি ইচ্ছে করেই পাটাতন তুলে রেখে এসেছেন। নয়তো কেউ জানতেই পারবে না সুটোর গর্তে উইলিয়াম মরে পড়ে আছে। ফুলে ফেঁপে পচা দুর্গন্ধ না উঠলে টের পাবার কথা না। পাটাতন তুলে রেখে এসেছেন—পাটাতন তোলা দেখলেই সংশয় দেখা দিতে পারে। ছোটাছুটি শুরু হতে পারে।

আর তখনই মনে হল, দরজার ওপাশে কেউ যেন দাঁড়িয়ে গোপনে তাদের কথাবার্তা শুনছে। ছুটে গিয়ে খটাস করে দরজা খুলতেই অবাক—বংশী। মেজাজ খিচড়ে গেল—এ তো আচ্ছা ঝামেলা পাকাচ্ছে।

'আবার! তোর চোখে ঘুম নেই। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছিস! একা ফোকসালে থাকতে ভয় লাগলে সুরঞ্জনের ব্যাঙ্কে গিয়ে শুয়ে থাক।'

'দাদাগো, আমরা তবে কেউ বাঁচব না। কাপ্তান সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে আমাদের ফাঁসি দেবে! কি গো কিছু বলছ না কেন? আমরা তবে দেশে ফিরতে পারব না!'

আর মাথা ঠিক রাখা যায়। সব যজাবে। মুখার্জি যে কি করেন। বংশীর চোখ লাল। চুল উসকো-খুসকো। কত রাত যেন ঘুমোয়নি। কষ্টও হয়। তিনি বললেন, 'আস্তে। পাগলামি করিস না। আমি তো আছি। অত সোজা। যা শুয়ে পড়গে।'

বংশী বলল, 'শুয়ে পড়তে বলছ। যাই তবে। শুয়ে পড়ি। কিন্তু আমার যে ঘুম আসে না।'

'আসবে। আমরা তো আছি। যা লক্ষ্মী ভাইটি,' বলতেই বংশী নিজের ফোকসালে ঢুকে গেল। বলল, 'দরজা বন্ধ করে শোব?'

'বন্ধ করে শুয়ে পড়াটাই উচিত।'

'বাইরে থেকে খুলে যদি কেউ ঢোকে?'

'তবে দে চাবিটা। বাইরে থেকে লক করে দিচ্ছি।' বলতেই মুখার্জি দেখলেন, দরজার চাবিটা পরম বিশ্বাসে মুখার্জির হাতে তুলে দিল বংশী। মায়াও হয়। সবই শুনে ফেলতে পারে। অধীর সুহাস ফোকসালে না থাকায় বোধহয় ঘাবড়ে গেছে। একা থাকতে পারছিল না। উঠে এসেছে। হয়তো সব কথাই শুনেছে—কাপ্তান যে ছেড়ে কথা কইবে না—সামনে মুখার্জির সমূহ বিপদ তাও কান খাড়া করে শুনতে পারে—কি যে শেষ পর্যন্ত হবে তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না। বংশীর দরজা লক করে নিজের ঘরে

ঢুকে গেলেন। বললেন, 'ভাল না। বংশী দিন দিন কি হয়ে যাচ্ছে। যেখানে আমি, বংশী সেখানে। তাকে সত্যি ভূতে তাড়া করছে। একেবারে শিশুর মতো আচরণ। যাকগে—সব ভবিতব্য।'

সুরঞ্জন বলল, 'বংশীকে এ-ঘরে নিয়ে এলে হত না?'

'না। তোমাদের কিছুই বলা হয়নি। চার্লি-রহস্যও না। প্রেসিডেন্ট কলিজই প্রমোদ তরণী ডরোথি ক্যারিকো। তার লাউনজের ছবি দেখে আগেই আমরা টের পেয়েছি। রিফ এক্সপ্লোরারের পাঠানো ছবি দেখে বুঝেছি, লাউনজের ভাস্কর্যটি খোয়া গেছে। কার কাছে ভাস্কর্যটি আছে তোমরা জানো। তবে রহস্য আরও গভীর। রক্ষা পেতে চাইলে সব ভাল করে জেনে নাও।'

মুখার্জি কেন যে কিছুটা অন্যমনস্ক।

কি ভেবে বললেন, "ভাস্কর্যটি দামি না অদামি আমাদের জেনে লাভ নেই। এত সব কথা বলতে আমার ভালও লাগছে না। ফিলই চার্লির নিখোঁজ কাকা। ফিল অকপটে সব স্বীকার করেছে। প্রমোদ তরণী ডরোথি ক্যারিকোর সেই কাপ্তান। প্রেসিডেন্ট কলিজেরও। গুজব, চার্লির ঠাকুরদা জোহানস মিলার গুপ্তধন খুঁজে পান। গুজব, তিনি তাঁর প্রমোদ তরণী নিয়ে গুপ্তধনের খোঁজে মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ থেকে, নাউরো, এলিস, ইস্টার, ফোনক্স, রাবাউল পর্যন্ত ছুটে বেড়িয়েছেন—অসংখ্য দ্বীপে তাঁবু ফেলেছেন, গুটিয়েছেন—প্রমোদ তরণীর যাত্রীরা যখন দ্বীপে ফুর্তিফার্তায় মগ্ন, তিনি তখন ঘোড়ায় চড়ে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে বের হয়ে পড়েছেন। দ্বীপের বুড়োদের সঙ্গে গোপনে শলাপরামর্শ করেছেন—এমন সব গুজব যখন চাউর হয়ে যাচ্ছিল—বলেছি না, বিনা আগুনে ধোঁয়া সৃষ্টি হয় না, গুজবে দুই পুত্রেরও মাথা খারাপ। গুজবের শিকার দুজনেই! এই গুজবই কাল হল দুজনের। ফিল, মানে রাচেল 'প্রেসিডেন্ট কলিজ' জাহাজটি অন্তর্ঘাতে ডুবিয়ে দিল। যেখানে জাহাজটি ডুবিয়ে দিল, জল কম। মাত্র ষাট সত্তর ফুট। অনেক ভেবে চিন্তেই কাজটা সে করেছে। সে বিশ্বাস করত বাবার গোপন ধন সম্পদ কলিজের কোথাও রক্ষিত আছে।' মুখার্জি থামলেন। তারপর আবার কি কি বলা দরকার কিছুতেই যেন মনে করতে পারছেন না।

'ফিল পেয়েছে গোপন ধন সম্পদ?' অধীরের প্রশ্ন।

'না পায়নি। সে শুধু পেয়েছে ভাস্কর্যটি। কলিজ জাহাজ থেকে ভাস্কর্যটি খোয়া যায় দেখেছিস ছবিতে। ফিলের প্রাসাদে ভাস্কর্যটি দেখে অবাক। সন্দেহ থাকে না সেই ছদ্মবেশী অসি ডাইভার। কিপার অফ দি রেক।'

'কি বলছ? ফিল অসি ড্রাইভার, কই কখনও তো বলনি।'

'বলিনি, অনেক কিছুই বলিনি। তা হলে আর গোয়েন্দাগিরি কেন? কাপ্তানবয়কে সালাম—সে না থাকলে এই রহস্যের সূত্র ধরার ক্ষমতা আমার চোদ্দ গোষ্ঠিরও ছিল না। ও খবরটা দিল বলেই—কাপ্তানকে ফাঁসাবার মতো হাতে অস্ত্র পেয়ে গেলে। আরও কিছু দিচ্ছি। আমি না থাকলে দরকারে কাজে লাগাবে।'

'ফিলই কি তবে অদৃশ্য আততায়ী! সে সুতো টানছে!' সুরঞ্জন প্রশ্ন করল।

'ধুস। তোরা যে কি! সে কেন আততায়ী হতে যাবে?'

'না, বলছিলাম, সে-ই কি ম্যাককে খুন করিয়েছে?'

'ম্যাককে খুন করেছে উইলিয়াম। কতবার এক কথা বলব! বলছি না, অন্ধকারে দড়ি কাটতে গিয়ে হাতে ক্ষত সৃষ্টি করেছে। সেই ডেরিক ফেলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, তার এক হাতে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। উইলিয়াম, ম্যাক সুহাস দুজনকেই সরিয়ে দিতে চেয়েছিল। সংশয় ছিল বলেই, ম্যাক কাজের সময় তার শিশুদের ছবি পকেটে রেখে দেয়। এতে আমরা নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত নিতে পারি ম্যাক জানত। ফসকা গেরো। ম্যাকও উইনচের তলায় থাকবে। আতঙ্ক থাকতেই পারে। ছবি পকেটে থাকলে ম্যাক নিরাপদ ভাবত।' তারপরেই কেমন হতবাক হয়ে সুরঞ্জনের দিকে তাকালেন। 'তুই এতটা নবিশ! কি করে ভাবতে পারলি ফিল এই খুনের সঙ্গে যুক্ত। ফিল কি জাহাজে ছিল!'

'না, মানে, কোথায় বীজের অঙ্কুর জন্মায়, কোথায় গাছ তার ডালপালা মেলে দেয়, খুঁজতে গেলে, ফিলকে সন্দেহ না করারও কারণ নেই। রেষারেষি বলো, ক্ষোভ বলো, ধনসম্পদ বলো সব তো ডরোথি ক্যারিকোর গুপ্তধন নিয়ে।'

'না, শুধু গুপ্তধন নিয়ে নয়। ডরোথি ক্যারিকোতে কোনও গুপ্তধনই ছিল না। বড় বড় মেহগিনি কাঠের পেটি উঠতে দেখে জাহাজে, ফিল, ফিল বলব না, রাচেল বলব, বাপের কাজকর্মে ধন্দে পড়ে যায়। কারুকাজ করা দামি কাঠের পেটিতে কি তোলা হচ্ছে? নির্ঘাত হিরে জহরত। সোনা দানা।'

অধীর বলল, 'যখন এত যত্ন, তখন হিরে জহরত পেটিতে আছে আমি দেখলেও ভাবতাম।'

কিছুই ছিল না। ছিল তামার ফলক। তাতে লেখা জোহন্‌স মিলার যা বিশ্বাস করতেন। মানুষের ধর্মই হল, অমূল্য সম্পদ। পেটিতে তিনি সব ফলক তুলে নিয়েছিলেন, সব দ্বীপে ফলকগুলি পুঁতে অসবেন বলে—ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান। ফলকে এমনই সব সাধু বাক্য লেখা আছে বুঝলি। ফিলের প্রাসাদে যাওয়ার রাস্তায়ও পাঁচ-সাতটা ফলক দেখছি। অবিশ্বাস করারও কারণ থাকতে পারে না। সে পেটিগুলি দেখিয়েছে। এখনও আট-দশ পেটিতে তামার ফলক পড়ে আছে। ফিল দ্বীপে দ্বীপে ঘুরে বেড়ায়। বাপের স্বভাব পেয়েছে। বুনো ফুলের বীজ ছড়িয়ে দিয়ে আসে। জনহীন দ্বীপে মানুষের বসতি গড়ে তুলছে। লোকজনের টানাটানি। তুই থাকতে চাইলে তোকেও জায়গা দেবে। চাষবাস থেকে আহার, আশ্রয় উত্তাপের ব্যবস্থা করবে। গির্জা বানাচ্ছে। স্কুল গড়ছে। তার এক দণ্ড ফুরসত নেই। সব খুলে বললে, ফিল কি বলল জানিস, এ-সব নোংরা কাজে আমাকে জড়িয়ো না। সে জাহাজেও আসতে চাইল না।'

'নোংরা কাজ বলছে কেন ফিল?'

'বলছি। সব গুলিয়ে দিস না। দ্যাখ যত বড় বড় যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে, তার আড়ালে একজন নারী। কি, ঠিক কি না বল, রাম-রাবণের যুদ্ধ, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ, ট্রয়ের যুদ্ধ বলিস, সেখানে হয় সীতা, দ্রৌপদী না হয় হেলেন। কি রাইট?'

'রাইট। অক্ষরে অক্ষরে সত্য।' অধীর সমর্থন করল।

'জাহাজেও চার্লি। ম্যাক আর উইলিয়াম দুই ভায়রাভাই। ওরা একমাত্র লুসিয়ানার লোক। এখন বলবি লুসিয়ানাটা আবার কোথায়। লুসিয়ানার নিউপার্থে দুজনেরই বাড়ি। চার্লির দুই ভগিনীপতি। দুজনই উগ্র বর্ণ-বিদ্বেষী। বলতে পারিস এত খবর কে দিল। বাটলারের খামটা থেকে নাম ঠিকানা পেয়েছি। রাচেল, মানে ফিল দেখে বলল, 'সে কাউকেই চেনে না। তবে উইলিয়াম এবং ম্যাকের পুরো নাম দেখে সে বুঝতে পারে তাদের বাড়ির জামাই—জানিসই তো যম জামাই ভাগনা কেউ নয় আপনা।'

সুবঞ্জন বলল, 'একটু চা করে আনি। গলা তোমার শুকিয়ে গেছে।'

'আনবি? আন।'

'তবে কাপ্তান তাদের চিনতেন বলে মনে হয় না।'

'কি কারণ,' অধীর হাতের আঙুল মটকাচ্ছে? ঘুম নেই চোখে। চোখও জ্বলছে। খুবই বিভ্রান্ত ব্যক্তির মতো পাও নাচাচ্ছে।

'চার্লি শেষ বয়সের বুঝলি। কাপ্তান জাহাজে জাহাজে—জামাইদের সঙ্গে দেখা দু'একবার হলেও পনেরো বিশ বছরে মনে রাখার কথা নয়। তিনি তো তখন পাগলা কুকুর। বাপের ধন সম্পত্তি হস্তান্তর হয়ে যাচ্ছে। বাপ উইল করেছেন, তাঁর অবর্তমানে সমস্ত সম্পত্তি তিনি ন্যাশনাল ওয়াইল্ডফ্লাওয়ার রিসার্চ সেন্টারকে দান করে যাচ্ছেন। একটাই শর্ত, তাঁর পুত্রদের যদি কারও পুত্র সন্তান হয়, তবে উইলটি বাতিল বলে গণ্য হবে।'

'বোঝো এবার। পুত্রদের তো দিলেনই না, নাতনিদেরও বঞ্চিত করলেন। চার্লির দিদিরা তো ছিল। তারা খাপ্পা।' থেমে বললেন, 'ছিল। তবে এটাই একমাত্র দোষ বলতে পারিস চার্লির ঠাকুরদার। নারী-বিদ্বেষী। যৌবনেই তাঁর স্ত্রী পলাতক। পুত্রদের অধার্মিক কাজকর্মে বুড়ো ক্ষিপ্ত। মুখ দেখতেও রাজি ছিলেন না। ফিল শেষ পর্যন্ত নিজের স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হয়ে পড়ায় বুড়ো কিছুটা নরম হয়েছিলেন, তবে সম্পত্তির কানাকড়ি দিতেও রাজি হলেন না। প্রমোদ তরণী ডরোথি ক্যারিকোর কাপ্তানের কাজটি দয়া করেই যেন ডেকে দিলেন।'

'এ-সব কে বলল?'

'কে বলবে। ফিল।'

'গুল ঝাড়ছ।'

'ওঠ। গুল ঝাড়ছি! ফিলকে দেখিসনি! ফিলকে আমিও ভুলে গিয়েছিলাম। কাপ্তানের চিরকুটটি না দেখলে মনেই হত না, ফিল বলে কারও সঙ্গে আমার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। ওর প্রাসাদে নিয়ে গেছে। ভাল পিয়ানো বাজায়—ধর্মসঙ্গীত গায়। বলেছি না সরষেতে শুধু ভূত থাকে না, ভগবানও থাকে। সামান্য সরষে তেল—তার কৃতজ্ঞতা এত ভাবা যায় না।

অধীর বলল, 'দৈব সহায় তোমার দেখছি। ঘানিতে ভূত পিষে তেল বের করে ভগবান পেয়ে গেছ। বাহাদুরি আছে তোমার। একেবারে দরকারে সব হাতের কাছে হাজির। গোয়েন্দাগিরির দাম কোথায়! চিরকুট থেকে ফিল। ফিল থেকে লুকেনারের গুপ্তধন, চিরকুটে শুধু অসি ডাইভারের উল্লেখ ছিল, না আরও বেশি কিছু! তার মানে ভগবান যখন দেন ছপ্পর ফুঁড়ে দেন!'

মুখার্জি বিরক্ত হতে পারতেন। এখনও ঠাট্টা তামাসা। আর সহ্য হল না। বললেন, 'দেখবি!' লকার খটাস করে খুলে চিরকুটটা দেখালেন, কি লেখা আছে। বোথ বে হারবার থেকে জনৈক অ্যালেন পাওয়ার কি লিখেছে দ্যাখ কাপ্তানকে।'

অধীর সুরঞ্জন দুজনেই ঝুঁকে পড়ল। দেখল লেখা আছে, 'সি ওয়াজ এ গ্র্যান্ডসিপ—নোটস ফিলিপ, অ্যান অসি ডাইভার হু ফেল আন্ডার দি স্পেল অফ দি লাকজারি লাইনার টুয়েলভ ইয়ার্স এগো অ্যান্ড স্টেইড অন অ্যাজ-এ কাইন্ড অফ কিপার অব দি রেক।'

'কে দিল চিরকুটটি?' অধীর বলল।

'যেই দিক। কি বুঝলি! ডুবন্ত জাহাজ কে পাহারা দেয়। ডুবন্ত জাহাজের খোঁজে কে আসে। কোনও রহস্য নিশ্চয় থেকে যায়। এই রহস্য-তাড়িত হয়েছিলাম বলেই, এখানে এসে পৌঁছতে পেরেছি। এই রহস্য থেকেই কলিজের আবিষ্কার। চার্লি পাটাতন তুলে উঁকি দিয়ে কি দেখে? এই রহস্যই টেনে নিয়ে গেছে বোট-ডেকে। চার্লির সঙ্গে সুহাসের এত গা মাখামাখি কেন, এই রহস্যই টেনে নিয়ে গেছে কিনারায়। বুনো ফুলে ঘ্রাণ আছে বুঝতে অসুবিধা হয়নি। সব দৈব নয় বুঝলি!'

'তা হলে বলছ, দুই ভগিনীপতি জানত যে চার্লি মেয়ে?'

'জাহাজে ওঠার আগে সংশয় ছিল। কারণ চার্লির জন্মের আগে তার ঠাকুরদা উইলটি প্রকাশ করেন। লাস্ট উইল অ্যান্ড টেস্টামেন্ট অফ জোহান্স মিলার—উইলের কপি আমার কাছে আছে। কাপ্তান জানেনই না এখনও, তাঁর মূল্যবান কাগজপত্র সব চুরি গেছে। তবে টের পাবেন। উইলের কপিটি তোমরা দ্যাখ। পড়। বুঝতে না পারলে বলবে। আমিও সব জায়গায় বুঝতে পারিনি! ফিল্ বুঝিয়ে দিয়েছে। কাপ্তান ফিরে এলে ধরা পড়বই।'

এবারে ঢোক গিলে সুরঞ্জন বলল, 'চা করে আনি। তারপরে বের করবে। এ তো চমকপ্রদ নাটক। তুমি যে দেখছি শার্লক হোমসের বাবা। তাঁর ভূমিকাটি ভালই ফুটিয়ে তুলতে পেরেছ। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। চা না খেয়ে তোমার উইল দেখতে গেলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যেতে পারি। তুমি কি তা চাও।'

'বললাম তো চা করে আন।'

'বের করবে না। আমি এলে বের করবে।'

'বের করছি না। যা তো!'

সুরঞ্জন সিঁড়ি ধরে কিছুটা উঠে গিয়েই মনে পড়ল, সুটের তলায় লোকটা মরে পড়ে আছে। সে একা ডেকে যেতে সাহল পেল না। সে ফিরে আসার সময় হঠাৎ মনে হল বংশী ভিতরে গোঙাচ্ছে। সে নেমে এসেছিল অধীরকে সঙ্গে নিয়ে উপরে যাবে বলে, আর বংশীর দরজাতেই তাকে থেমে যেতে হল। বংশীর কি হল আবার! ছুটে এসে বলল, 'মুখার্জিদা বংশী...।'

'বংশী কি!'

'বংশী গোঙাচ্ছে।'

সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে পড়লেন। দরজা পার হয়ে বংশীর ঘর খুলে অবাক। বংশী কম্বল গায়ে দিয়ে হি হি করছে। শীতে কাঁপছে। এত গরমে বংশীর এই পরিস্থিতি দেখে মাথায় রক্ত উঠে গেল। ব্যাটা ভয়ে জুজু। ভয়ে কাঁপছে! তবু তিনি গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন, না জ্বরটর হয়নি! একা সে কিছুতেই ফোকসালে থাকতে রাজি না। আতঙ্কেই মরে যাবে। কি করেন!

অধীরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি ইচ্ছে হয় বল! তোমার কি ইচ্ছে হত?'

না মাথা গরম করে লাভ নেই।

তিনি পাশের ফোকসালে ঢুকে কেষ্টকে সন্তর্পণে ডেকে ওঠালেন। বললেন, 'আয়।'

কেষ্ট কিছুই বুঝতে পারছে না! সেও ভাল নেই।

মুখার্জিদা বললেন, 'বংশীর পাশের বাঙ্কে শুয়ে থাক। বোধ হয় জ্বর আসছে। তিনি বললেন না, সুটের তলায় মরা মানুষ পড়ে আছে দেখে ভয়ে কাবু। আতঙ্কে ব্যাটা কম্বলে মুখ মাথা শরীর ঢেকে শুয়ে আছে।

সুরঞ্জন বাইরে এসে বলল, 'অধীর চল না উপরে।'

'তা হলে এই সব বীর ভারতবাসী নিয়ে আমার জাহাজে যাত্রা। হয়েছে ভাল! যা অধীর। তারপর কিছু হলে দোষের ভাগী। সব দৈব! দৈব যখন, ডেকে উঠতে ভয় পাচ্ছিস কেন। মারব এক লাথি।'

'মার দাদা। সব মারতে পার। বাধা দেব না।'

মুখার্জি নিজের ফোকসালে ঢুকে আবার শুয়ে পড়লেন। চা এলে উঠবেন। পাচার করা উইলের কপিটি বালিশের তলায় রেখে দিলেন। ওরা নিজের চোখে দেখুক। মূল উইলের কপিটি কি করে কাপ্তান সংগ্রহ করেছেন তিনি জানেন না। তবে যে এত বড় জালিয়াতি করতে পারে তার পক্ষে সব সম্ভব। চার্লি যে ছেলে নয়, মেয়ে, চার্লিকে জাহাজে তুলে নিয়ে আসার পরও বোধ হয় কাপ্তান নিশ্চিন্ত ছিলেন না। ফিলের ধারণা, সে বেটসিকে খতম করে দিতে একজন ট্রাকারকে ভাড়া করতেই পারে।

চা নিয়ে সন্তর্পণে দরজা খুলে ঢুকল সুরঞ্জন। অধীর গায়ে গায়ে। যেন এমন পরিস্থিতি, একলা পড়ে গেলেই উইলিয়ামের প্রেতাত্মা তাকে ছুঁয়ে দেবে।

মুখার্জি বললেন, 'দ্যাখ জাহাজে ভূতটুত নিয়ে একটু বেশি বাড়াবাড়ি হচ্ছে না। মধ্যরাতে বোট-ডেকে নারী। এখন বুঝতেই পারছি তিনি কে। তিনি যে আদ্যাশক্তি মহামায়া চার্লি, বুঝতে কি কোনও অসুবিধা আছে! বেকুফের মতো সবাই জাহাজটাকে দুষছে। জাহাজটা দোষ পেয়েছে। আহমদ পালাল। ব্যাটা দেখবি তো কম্বল তুলে কি আছে বাঙ্কে। মরা মানুষের আর কাজ নেই, হেঁটে গিয়ে আহমদের নরম বিছানার লোভে শুয়ে না পড়লে যেন ঘুম হবে না। সুতরাং ঘোর থেকে সব হয় বুঝতেই পারছ। ঘোরে পড়েই আহমদ বরফ-ঘরে মেয়েমানুষের লাস ঝুলতে দেখে। ঘোর বড় বিষম বস্তু। এক ধরনের মানসিক রোগ এটা বুঝিস?'

'সব বুঝি দাদা। না বুঝলেও আর তোমাকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করছি না।' অধীর বড়ই কৃতজ্ঞ যেন মুখার্জির উপর।

'এই ঘোরে পড়েই আদ্যাশক্তি মহামায়া বুড়ো মানুষের মুখ দেখতে পায়। মুখোস না, সে দেখে তার ঠাকুরদার মুখটি তাকে অনুসরণ করছে। সে আসলে মেয়ে—কিন্তু বাপের চাপে ছেলে সেজে আছে। ডাঙ্গায় থাকলে যদি ধরা পড়ে যায়, তার জন্য জাহাজে জাহাজে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছেন কাপ্তান।

'কে বলল, ঠাকুরদার মুখ তাকে অনুসরণ করছে। আমরা তো জানি না।' প্রায় সমস্বরে অধীর সুরঞ্জন একসঙ্গে বলে উঠল।

'কে বলবে বোঝ না! কে বলতে পারে! কাকে চার্লি বিশ্বাস করে সব বলত!'

'শেষে চার্লি তার ঠাকুরদার পাল্লায় পড়ে গেল! সুহাসকে নিয়ে চার্লির তবে এত খোঁজাখুঁজি কেন?'

'খোঁজাখুঁজির অজুহাতে সুহাসকে হয়তো ডেরিকের নিচ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। কারণ ডেরিক পড়বেই সে হয়তো জানত। অবশ্য এটা আমার ধারণা। আবার এমনও হতে পারে, পোর্টহোলে গভীর রাতে মুখোশটি দেখে মনে হয়েছে, কেউ তাকে ঠাকুরদার মুখোশ পরে ভয় দেখাচ্ছে না তো! শোন, বোঝার চেষ্টা করবি। চার্লি মাঝে মাঝে মানসিক অবসাদের শিকার হত। অচ্ছন্ন হয়ে পড়ত। তখনই সে দূরের ঝোপ জঙ্গলে মুখোস উঁকি দিলে ভাবত কেউ তাকে অনুসরণ করছে! সে পোর্টহোলেও দেখেছে, মধ্যরাতে মুখোশ। বন্দরে খোঁজাখুঁজি করে বের করা কঠিন। কিন্তু জাহাজে? খুব সোজা। সে তো মুখোশ ভাবত না। বুড়ো মানুষ ভাবত। জাহাজে বুড়ো মানুষটাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে পেল না। এক কথা বার বার বলতেও ভাল লাগে না। তোরা তো জানিস সব।'

'জানলেও রহস্য থেকে যায়। তারপর আর খোঁজখুঁজি করল না কেন?'

'করল না, সে ধরেই নিয়েছিল, তার ঠাকুরদাই ঘুরে ফিরে তার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। অন্য কেউ নয়। কারণ চার্লি জানত, তাকে কেন্দ্র করে পরিবারে একটি বড় পাপচক্র গড়ে উঠেছে। ঠাকুরদাকে সে ঠকিয়েছে। ঠাকুরদা বড় লেটে বুঝতে পারেন। চার বছরের চার্লি বাথরুম থেকে উলঙ্গ অবস্থায় ছুটে যাকে দেখেছিল, সে তার ঠাকুরদা। বেটসি ছুটে গেছে, সামলাতে পারেনি। মহামায়ার মায়াপাশে সঙ্গে সঙ্গে দগ্ধ। পক্ষাঘাত। যতদিন বেঁচেছিলেন, চোখ বরফের মতো শীতল। বীভৎস। মায়াপাশে বদ্ধ চার্লির ঠাকুরদা বাক্‌রহিত। চার্লি এমনিতেই তার ঠাকুরদাকে যমের মতো ভয় পেত। এটা বেটসির চক্রান্ত বলতে পারিস। ঠাকুরদাকে দেখলেই ভয়ে পালাত। কাছে থাকত না। অবশ্য তিনি ক্যাডো লেকের প্রাসাদে কমই যেতেন। গেলে বেশিদিন থাকতেনও না। বুনো ফুলের নেশায় যুদ্ধের মধ্যেও দ্বীপে দ্বীপে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হঠাৎ থেমে বললেন মুখার্জি, কি তোদের কিছু জিজ্ঞাস্য নেই?'

'না দাদা!'

নারীর মূলাধারটিই শেষে বুড়োকে আহম্মক বানিয়ে দিল। তিনি এত বড় আঘাত সহ্য করতে পারলেন না। সঙ্গে সঙ্গে নাগপাশে বদ্ধ হয়ে গেলেন। পক্ষাঘাত। দেবীর এই মহিমাটুকু এখানে শেষ করতে পারলে বোধ হয় ভাল হত।' থেমে বললেন, 'লম্বা সাদা দাড়ি, চুল বড়। সাদা চুল আর দাড়ি কিন্তু পক্ষাঘাতে কাবু হয় না। হয় কি?'

'বোধহয় হয় না?'

'বোধহয় বলছিস কেন?'

অধীর বলল, 'আমি কোনও পক্ষাঘাতের রুগী দেখিনি—কি করে জানব, পক্ষাঘাতের চুল দাড়ি বাড়ে না কমে?'

'তোদের এটাও জেনে রাখা ভাল, মূলাধারটিকেই আমাদের মুনিঋষিরা দেবী বলেছেন, বিশ্বরূপেণ সংস্থিতা বলেছেন। খুবই উচ্চমার্গের কথা। আর কাপ্তান মিলার কি করলেন, তাকেই অপমান করলেন! খাটো করলেন।'

মুখার্জিদা লকারে আবার কি খুঁজছেন। পেয়েও গেলেন। আসলে তিনি জানেন, তাঁর সহকারীদের সব দেখিয়ে রাখা ভাল—বলেই একটি চিঠি বের করলেন।

এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'পড়।'

কয়েক ছত্রে মেয়েলি হস্তাক্ষরে চিঠি।

ওরা পড়ে বলল, 'কে লিখেছে?'

'কেন, বুঝতে পারছিস না?'

'বেইসি?'

'বেইসি নয়, বেটসি। কি লিখেছে পড়লি!'

অধীর পড়তে লাগল, 'লিখেছে, চার্লি মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চড়ে বের হয়ে যায়। কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সে মেয়েদের পোশাক পরে বের হয়ে যায়। সব প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে—যতই বন জঙ্গলে ঘুরে বেড়াক কার নজরে কখন পড়ে যাবে। এ-ভাবে তাকে রাখা আর নিরাপদ ভাবছি না। আমার শাসন একদম গ্রাহ্য করে না। ধরা পড়ে গেলে সমূহ বিপদ। তাকে বার বার বুঝিয়েছি—প্রেইজ দ্য লর্ড। হাউ গুড ইট ইজ টু সিঙ হিজ প্রেইজেস। হাউ ডিলাইটফুল, অ্যান্ড হাউ রাইট। সে কিছুই গ্রাহ্য করছে না। বুঝিয়েছি, এটাই তোমার নিয়তি। জালিয়াতির শাস্তি কত কঠিন তুমি জান না। তোমার বাবা জালিয়াতির মামলায় জড়িয়ে পড়বেন। নিজেকে সংশোধন কর। শুধু তোমার ঠাকুরদার এস্টেটই বেহাত হবে না, তোমার বাবারও জেল জরিমানা হবে। কোনও কথাতেই কর্ণপাত করছে না। আপনি অনুগ্রহ করে জানান, এমত অবস্থায় এই নির্জন জঙ্গল প্রাসাদে আমার কি করণীয়।'

সুরঞ্জন বলল, 'তা হলে বলতে হয় দেবী স্বমহিমায় আবির্ভূতা হলেন।'

অধীর বলল, 'দেবী আর ছদ্মবেশে থাকতে রাজি হলেন না।'

মুখার্জি চিঠিটি ভাঁজ করে আবার কি বের করার সময় বললেন, 'চার্লির জন্ম থেকে চূড়াকরণে সর্বত্র কারচুপি।'

'ষোল বছরে ষোলকলা পূর্ণ। সেই ষোল বছরের ষোলকলা পূর্ণ করার জন্যই চার্লিকে জাহাজে তুলে আনা। কোনরকমে ষোলটা বছর পার করে দেওয়া। তারপরই কাপ্তান চার্লির সোল একজিকিউটার। একুশ বছর বয়সে চার্লি সম্পত্তির মূল অধিকারী। অর্থ পাগল মানুষ এত বড় এস্টেট হাতছাড়া হয়ে যাবে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছিলেন না। তিনি জালিয়াতির আশ্রয় নিলেন। এমন চতুর লোক এত বড় একটা কাঁচা কাজ করতে পারে ভাবাই যায় না। দেবী কখনও স্বরূপে প্রকাশিত না হয়ে পারেন বল্!'

'পারে না।'

'তা হলে বুঝতে পারছিস, সুহাসকে কেন তিনি প্রশ্রয় দিতেন।'

'চার্লিকে শান্ত রাখতে।'

'সবই তো বুঝিস দেখছি। জাহাজে উঠে দেখিসনি—রোজ চার্লি একটা না একটা আপদ সৃষ্টি করত। সারা জাহাজ ছুটে বেড়াত। দড়িদড়ায় ঝুলে বাপের মাথায় পা রেখে ব্রিজে উঠে যেত। ল্যাং মেরে চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে ফেলে দিত। আরও কত আপদ। সবাই তটস্থ হয়ে থাকত। চার্লিকে দেখলে সবাই পালাত। সবই তো দেখা। কেবল সুহাস সামনে পড়ে গেলে, শান্ত হয়ে যেত। ফিরে যেত মুখ নিচু করে। চোখ নামিয়ে নিত। কাপ্তান সুযোগ পেয়ে গেলেন। কার্য উদ্ধারে সুহাসকে ভাবলেন, সাময়িক হাতিয়ার। তাকে তিনি সরিয়ে দেবার কথা ভাবতেই পারেন না।

'কি আমি ঠিক বলছি?' বলে সুরঞ্জনের দিকে তাকালেন। তারপর সেই চরম নিদর্শনটি বের করলেন, বালিশের তলা থেকে—

'আমি পড়ে যাচ্ছি—শুনে যা।'

'লাস্ট উইল অ্যান্ড টেস্টামেন্ট অফ জোহান্স মিলার, ক্যাডো লেক, টেকসাস। ডেটেড দিস টুয়েলভথ ডে অফ নুন, নাইনটিন থার্টি সেভেন। নিচে সলিসিটারের ঠিকানা, ফ্র্যাঙ্ক ওরেলস, স্টানফোর্ড, ক্যালিফোর্নিয়া।'

মুখার্জি সহসা উঠে গিয়ে লকারে ফের কি খুঁজলেন—একটা চিরকুট—মেলে ধরলেন, 'এতে কি কিছু বোঝা যায়?' আমি ঠিক ধরতে পারছি না। মনে হয় মিডওয়াইফ ডক ক্যাথির হস্তাক্ষর। যিনি প্রচুর অর্থের বিনিময়ে চার্লিকে পুত্রসন্তান বলে ঘোষণা করেছিলেন—তিনি এবারে চিরকুটটি মেলে ধরলেন, ছেঁড়া কাগজও কাজে লাগতে পারে ভেবে রেখে দিয়েছেন। মাত্র দুটো লাইন—ডক ক্যাথি অর দ্য মিডওয়াইফ, নিউ হু হি ওয়াজ, দ্য আইডিয়া দ্যাট এ্যা ম্যান মাইট বি সামবডি এলস অল হিজ লাইফ অ্যান্ড নেভার বি অ্যাওয়েয়ার অফ ইট—অসম্পূর্ণ, আগেও কিছু নেই পরেও কিছু নেই।'

'কোথায় পেলে!' সুরঞ্জন অধীর এর অর্থ সঠিক ধরতে না পেরেও চার্লি যে জালিয়াতির শিকাব ভাবতে আর দ্বিধা করল না।

তারপরই মুখার্জি দুজন সাক্ষীর বয়ান এবং তাদের নাম পড়ে গেলেন। একজন জর্জ মরিস, ক্যাডো লেক, এবং অন্য জন খোদ উইলি বেটসি।

'কি লেখা আছে? পড়, শুনি।'

মুখার্জিদা চোখ বুজে থাকলেন—

সুরঞ্জন পড়ছে, 'সাইনড বাই দি সেইড জোহানস মিলার অ্যাভাব নেমড টু বি হিজ লাস্ট উইল অ্যান্ড টেস্টামেন্ট ইন দি প্রেজেন্স অফ আস...। মনে রাখবি উইল কিন্তু একটি জন্মের আগে এবং অন্যটি চার্লির জন্মের পর। প্রথম উইলে লেখা, এনি গ্র্যান্ডসন, দ্বিতীয় উইলে লেখা মাই গ্র্যান্ডসন জন মিলার।

'এখানে কি লেখা আছে? পড়।'

'ইন কেস মাই সেইড টু সনস ডু নট হ্যাভ এনি সনস দেন অ্যান্ড ইন সাচ কেস মাই সেইড এস্টেট উইল বি গিভেন টু ন্যাশনাল ওয়াইলড ফ্লাওয়ার রিসার্চ সেন্টার—সানফ্রানসিসকো।'

'অ্যাম আই রাইট! কাপতান মিলার প্রথম উইলের ভিত্তিতে মিডওয়াইফ ডক ক্যাথি এবং স্ত্রী ক্যালির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে চার্লিকে পুত্রসন্তান ঘোষণা করে নিজের পিতৃদেব জোহনস মিলারকে ধোঁকা দেন। প্রতারণা, জালিয়াতির শাস্তি স্টেটগুলোতে এক একরকম। টেকসাসে কি শাস্তি হয় আমার জানা নেই। তবে ফিল বলেছেন, আদালতে প্রমাণিত হলে নির্ঘাত দশবছরের জেল। উইল বাতিল। তাহলেই বুঝতে পারছ, চার্লিকে খুঁজে না পেলে তিনি পাগল হয়ে যাবেন।'

'এটা বোধ হয় চার্লির আঁকা শেষ ছবি।' লকার থেকে ছবিটা বের করলেন। তোরা তো জানিস ময়লা ফেলার ঝুড়ি থেকে চার্লির সব পরিত্যক্ত ছবি আমি রাতের অন্ধকারে সংগ্রহ করতাম। তোদের বলেছি—ছবিগুলিতে ক্রোধ এবং সুষমা দুইই ফুটে উঠত। এটা অবশ্য চার্লির কেবিন থেকে তুলে এনেছি। দেয়ালে টাঙানো ছিল। বোধ হয় চার্লির এটাই শেষ ছবি।'

তিনি যত্নের সঙ্গে ছবিটা দেয়ালে গেঁথে দিতে থাকলেন।

'আকারেও বড় ছবিটা। চার্লির প্রোসরপিনা। সিংহের মতো মুখ, এক সুকুমারীকে উলঙ্গ করে বাঁ হাতে জাপটে ধরেছে। ছবিটা রোমের আর্ট গ্যালারিতে দেখে সে একবার ভিরমিও খেয়েছিল। অবশ্য তোরা দেখতে পাচ্ছিস ছবিটাতে চার্লি খুব বেশি কালো রং ব্যবহার করেছে। দূর থেকে দেখলে নিশীথের গাঢ় অন্ধকার ছাড়া কিছু টের পাওয়া যায় না। এমনও নয় ছবিটা সে-ই প্রোসরপিনার নকল। কাছে এলে বুঝতে পারবি, অন্ধকারে উইন্ডসহোলে হেলান দিয়ে সুটের পাটাতনে দাঁড়িয়ে আছে কেউ। লম্বা টুপি মাথায়। গায়ে কালো পোশাক। হাত পা মুখ স্পষ্ট নয়। সুটের পাটাতনে সে এসে গভীর রাতে দাঁড়াবেই চার্লি জানত।'

'তা হলে কি বুঝলি?'

'হাত পা মুখ স্পষ্ট নয়।' অধীর দেখে বলল।

চার্লি পেতলের বলগুলি জোগাড় করেছে উইনচের বাতিল স্ট্যাপার থেকে। উইলিয়ামকে সে চিনতে পেরেছে। যতই গিরগিটি গোঁফ পরে ছদ্মবেশ ধারণ করুক, সুহাসকে ঘুষি মারার সময় সামনাসামনি দেখে চিনে ফেলেছে। মিশনে দেখেছিল দূর থেকে—চিনতে পারেনি। ঘোড়ার পিঠে উঠে চিৎকার করে উঠেছিল, আই উইল রিওয়ার্ড ইভিল, উইদ ইভিল। নাথিং ক্যান স্টপ মি। কেউ পারেওনি। অ্যাম আই রাইট!'

'রাইট।' সুরঞ্জন বলল। 'তা হলে সূত্রটা কি। ম্যাক আর উইলিয়াম শ্বশুরের জাহাজে উঠে এসেছিল উড়ো খবরের ভিত্তিতে। যদি সত্যি চার্লিকে আবিষ্কার করা যায়। সমুদ্রের ধারে আবিষ্কারের কাজটি সম্পূর্ণ হাসিল। ম্যাক আর উইলিয়াম দুজনই ব্ল্যাকমেল করে সম্পত্তির অংশ আশা করতে পারে, কাপ্তান না মানলে, আদালতগ্রাহ্য অপরাধ—উইল বাতিল। অ্যাম আই রাইট? নানা দিক ভেবেই তারা উঠে এসেছিল। কেন চার্লিকে নিয়ে জাহজে ঘুরছেন মিলার!'

'উইল বাতিল বলছ কেন?' সুরঞ্জনের সোজা প্রশ্ন।

মুখার্জি কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছেন। তিনি কি কোনও বড়রকমের পয়েন্ট মিস করে গেছেন। এত সহজ বোধগম্য কারণগুলি তো এদের না বোঝার কথা না।

তিনি বললেন, 'ফের আর একবার চার্লি রহস্যের পয়েন্টগুলো পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি। বোঝার চেষ্টা করবি। বলে তিনি তাঁর ছড়ানো আঙুলে এক একটা পয়েন্ট ছুঁয়ে যেতে থাকলেন।

'এক—চার্লির ঠাকুরদা জোহান্স মিলার চার্লির জন্মের আগে যে উইলটি করেন, চার্লির জন্মের পব তা ফের পালটান। ওটাই জোহান্স মিলারের লাস্ট টেস্টামেন্ট। আগের উইলে তিনি তাঁর গ্র্যান্ডসনকে সম্পত্তি দান করে যান। গ্র্যান্ডসন না থাকলে সম্পত্তির মালিক ন্যাশনাল ওয়াইলড ফ্লাওয়াব রিসার্চ সেন্টার। তোমরা নিশ্চয়ই জানো চার্লির নিজের দিদিরা তখন বড় হয়ে গেছে। যে যার মতো উড়ে গেছে। চার্লির তখন জন্মই হয়নি।'

অধীর বলল, 'তা হলে দুটো উইল।'

মুখার্জি ধমক দিয়ে বললেন, 'দুটো উইল হয় না। বুঝ..:। উইল একটাই। শেষ উইলটি আদালত-গ্রাহ্য। প্রথম উইলটি আমাদের কাপ্তান ফাঁস করে জানতে পাবেন, তাঁর কোনও পুত্রসন্তান থাকলে

সম্পত্তির মালিক হয়ে যাবেন। এখন তোরা আমাকে প্রশ্ন করতে পারিস, দুটো উইলের কথা বলছি কেন তবে। কাপ্তান চার্লিকে পুত্র বলে ঘোষণা করেন প্রথম উইলের ভিত্তিতে। কিন্তু পরের উইলে কি আছে—তাতে দেখছি সরাসরি সব বিষয় সম্পত্তি চার্লিকে লিখে দিয়েছেন তার ঠাকুরদা। সঙ্গে একজন সোল একজিকিউটারও নিযুক্ত করে গেছেন। চার্লি, তার বাবা কাকাদের মতো উচ্ছন্নে না যায়, সে জন্য ঠাকুরদা তাঁর বড় পুত্রকেই সোল একজিকিউটার নির্বাচিত করে যান। তবে চার্লি অপঘাতে মারা গেলে, অপহরণ কিংবা নিখোঁজ হলে অথবা উন্মাদ হয়ে গেলে ঠাকুরদার সব বিষয় আশয় চলে যাবে ওয়াইলড ফ্লাওয়ার রিসার্চ সেন্টারের হাতে। আশা করছি প্রথম উইল এবং দ্বিতীয় উইলের বয়ানের তফাত কোথায় কতটুকু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। গোলমালও থাকার কথা না।'

'না।' খুবই অকাট্য যুক্তি দাদার। ঘাড় কাত করে সুরঞ্জন অধীর দুজনেই মেনে নিল।

'এত উজবুক তোরা! কোনও গোলমাল নেই ভেবে ফেললি! গোলমালটা কোথায় বুঝলি না! সব সময় মাথায় রাখবি, জোহনস মিলার তাঁর লাস্ট টেস্টামেন্টে সব বিষয়-আশয় গ্র্যান্ডসন চার্লিকে দিয়ে গিয়েছেন। প্রতিটি বাক্যের প্রথমে কিংবা শেষে তিনি গ্র্যান্ডসন কথাটা উল্লেখ করেছেন। মাই গ্র্যান্ডসন জন মিলার। চার্লির আসল নাম জন মিলার। একবারও বলেননি, শুধু জন মিলার। সব শর্তের শেষে তিনি লিখেছেন, মাই গ্র্যান্ডসন। কোথাও কি লেখা আছে গ্র্যান্ডডটার? বলে তিনি তাঁর ফাইল থেকে উইলের পাচার করা কপিটি খুলে পড়তে দিলেন। বললেন, খুঁজে দ্যাখ কোথাও শুধু জন মিলার লেখা আছে কি না?'

কিছুটা দেখে উলটে-পালটে সুরঞ্জন বলল, 'ঠিক আছে বলে যাও—বলে কপিটি মুখার্জিকে ফেরত দিলে তিনি বললেন, বুঝতে পারছিস আমার সিদ্ধান্তগুলি খুব একটা লঘুপাকের নয়।'

'বার বার এক কথা বলছ কেন বলত।' অধীর বিরক্ত প্রকাশ না করে পারল না।

'বাট আসলে শী ইজ এ গ্র্যান্ডডটার। নট গ্র্যান্ডসন। যদি প্রমাণ হয় উইলের মূল শর্তটিই উপেক্ষিত, জন মিলার ইজ নট এ সন, বাট এ ডটার তা হলে ঠাকুরদার লাস্ট টেস্টামেন্ট ফালতু হয়ে যায় না! ষড়যন্ত্র, কারচুপি, জালিয়াতি মামলার আসামি কাপ্তান এবং তার ছদ্মবেশী পুত্র দুজনেই—এমন প্রমাণ করা কি আদালতে খুব একটা কঠিন কাজ হবে?'

'আদৌ কঠিন হবে না। জলবৎ তরলং হয়ে সোজা জেলখানার অন্ধকারে।'

মুখার্জি খুবই তৎপরতার সঙ্গে বলে গেলেন—'আর এ-কারণেই ব্ল্যাকমেলের সূত্রপাত। সংশয়, কাপ্তান তাঁর পুত্রকে নিয়ে জাহাজে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন! দিদিরা তো খাপ্পা। ভগিনীপতিরাও। কিছু একটা আছে। উইলিয়াম, ম্যাক দুজনেই উঠে এসেছিল—চার্লির সঙ্গে ম্যাকের ঘনিষ্ঠতাও এ-কারণে। আঁচ করতেও পারে, নাও পারে। তবে আঁচ করতে পেরেছিল মনে হয়। চার্লিকে নিয়ে কোনরকমে দেশে ফিরে যাওয়া। অপেক্ষা, কখন উত্তরাধিকার চার্লির উপর বর্তায়। বর্তালেই মামলা ঠুকে দেওয়া মহামান্য আদালতের কাছে। মাই লর্ড, জন মিলার আদপেই জোহানস মিলারের গ্র্যান্ডসন নয়। চার্লি জোহানস মিলারের গ্র্যান্ডডটার। চার্লির দফা রফা। কাপ্তানের হাতকড়া। কি, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে?'

'না।'

'মাথায় তোদের কিছু নেই। চার্লির দফা রফা হলে কি হচ্ছে। বিষয়-আশয়ের কি কোনও নিষ্পত্তি হচ্ছে। উইল বাতিল হলে স্থিতাবস্থা অথবা ন্যাশনাল ওয়াইলড ফ্লাওয়ার রিসার্চ সেন্টার বিষয়-আশয়ের মালিক হতে পারে। তা কোর্টের ডিসিশান। ফলে উইলিয়াম আরও একটি সাংঘাতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। ডেরিক ফেলে ম্যাককে নিকেশ করে দেওয়া হল। সুহাস থাকলে, সেও যেত। এক ঢিলে দুই পাখি। হল না। বার বার ফাঁদ পতে সুহাসকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। মধ্য রাতে উইন্ডসহোলের মুখে চিৎকার করে চার্লিকে শাসাত— দ্যা প্ল্যান্ট ইজ নট প্ল্যান্টেড বাই আওয়ার ফাদার শ্যাল বি রুটেড আপ। আর চার্লি ছেলেমানুষ, এটা তোদের মনে রাখা দরকার। তাকে ব্ল্যাকমেল করাও সহজ। কিন্তু লোকটা জানতই না, চার্লি সরল সোজা এবং ঈশ্বর বিশ্বাসী হলেও কত সাংঘাতিক হতে পারে। ভালবাসার মহিমা যে ঈশ্বরের চেয়েও প্রবল। কিছুই সে তখন ভ্রূক্ষেপ করে না। প্রোসরপিনা যে উইলিয়াম বুঝতে কি কোনও অসুবিধা হচ্ছে! জালিয়াতির ভয় দেখিয়ে বাপ বেটাকে কাবু করাও সহজ।

উইলিয়াম ব্ল্যাকমেল করে চার্লিকে তার তাঁবে রাখতে চেয়েছিল। পরিকল্পনাটি নিখুঁত এবং ভয়ঙ্কর। তাঁবে রাখতে পারলে গাছেরও খাবে তলারও কুড়াবে। একজন তরুণীর পক্ষে এটা কত বড় মর্মান্তিক বিভীষিকা বুঝতে তোমাদের অসুবিধা হবার কথা নয়। চার্লির কাছে উইলিয়াম সেই প্রোসরপিনা হয়ে গেল। একজন দানব কোনও সুকুমারীকে রেপ করছে। দৃশ্যটা চোখে ভেসে উঠলেই চার্লি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলত। সুহাস ছাড়া আর কে আছে জাহাজে, উইলিয়ামের কাছে ডেনজারাস ট্র্যাপ হতে পারে? সুহাসের সঙ্গে চার্লি পালিয়ে গেলে ওর যে সর্বনাশ। আমও গেল। ছালাও গেল। একজন নেটিভের এতটা বেয়াদপি সে সহ্য করবে কেন? কি আমি ঠিক? ঈর্ষা ঘৃণা. লোভ যৌন লালসায় মানুষ অমানুষ হয়ে যায়। দানব হয়ে যায়। প্রোসরপিনা হয়ে যায়। উইলিয়াম তার জলজ্যান্ত উদাহরণ।'

'যা বলছিলাম, তার আগেই জাল পাতা হল। কেন? ম্যাক জানত, চার্লি মেয়ে। ম্যাকের কথার উপর ভিত্তি করে জালটা পাতা হয়েছিল। মরবে, তবে খুন বলে গ্রাহ্য হবে না। নেহাতই দুর্ঘটনা। চার্লি যে ফাঁদ পাতল, মরবে, তবে খুন বলে গ্রাহ্য হবে না। দুর্ঘটনা। পাটাতন হড়কে লোকটা পড়ে গেছে। টিট ফর ট্যাট। অর্থাৎ শঠে শাঠ্যং সমাচরেত। যাকগে অন্য কথায় চলে যাচ্ছি। আইন-আদালত ভাল বুঝিও না। যা বুঝি তাই বললাম। ঠিক বেঠিক জানি না। কি বলছিলাম?' মাথা চুলকোতে থাকলেন মুখার্জি।

'হ্যাঁ মনে পড়ছে। ডেক কশপ লতু মিঞা স্বীকার করেছে ম্যাক কি দরকারে তার কাছ থেকে একটা খালি রঙের টব চেয়ে নিয়েছিল। নেটিভটার বাড়াবাড়ি তাদের পছন্দ হচ্ছিল না বোধহয়। সুহাসের সঙ্গে চার্লির মেলামেশা দুজনেরই চোখের বিষ। উগ্র বর্ণবিদ্বেষীরা কি করতে না পারে! ফিল তো বলল, উইলিয়ামের পূর্বপুরুষ নিগ্রো রমণীদের দিয়ে ব্রিড করাত। হাঁস মুরগি পালন—ডিম ফুটে বাচ্চা হলে বড় করা, তারপর বিক্রি। ক্রীতদাস প্রথা বেআইনি হয়ে যাওয়ায় ব্যবসায় রমরমা। নিগ্রো রমণীদের ক্ষেত্রটি অনুর্বর হয়ে গেলে খামারের কাজে লাগাত। অন্তত আট দশটি নিগ্রো যুবককে পরিবারটি গাছে ঝুলিয়ে চামড়া তুলে হত্যা করেছে। নিউ পার্থের এই পরিবারটির কুখ্যাতির কথা লুসিয়ানার নিগ্রোদেব এখনও দুঃস্বপ্ন। এরা দুজনেই সেই পরিবারের। দুজনেরই এক পদবী—লিনচার। উইলিয়াম লিনচার। ম্যাকি লিনচার।

অধীর সুরঞ্জন দুজনেই উঠে গিয়ে ছবিটা দেখতে দেখতে বলল, 'তিনিই তবে আমাদের মেঘনাদ। মেঘের ওপার থেকে কথা বলতেন। চার্লির এ ভয়েস ফ্রম দ্য ক্লাউড।'

'ইয়েস। উইলিয়াম রোজ মধ্যরাতে বের হয়ে অন্ধকারে উইন্ডসহোলে ঠেস দিয়ে দাঁড়াত। পাইপ টানত। শাসাত, দ্যা প্লান্ট ইজ নট প্ল্যান্টেড বাই আওয়ার ফাদার শ্যাল বি রুটেড আপ।'

'কি জঘন্য? সত্যি ভাবা যায় না।' সুরঞ্জন বলল।

মুখার্জি বললেন, 'ছবিটার নিচে চার্লি কি লিখেছে দেখ।'

'লিখেছে, গড ক্রিয়েটেড অল ক্রিয়েচার্স অ্যান্ড অলসো উইকেড টু বি পানিসড।'

'এরপর আর কোনও সংশয় আছে তোদের, পাটাতনের নিচে চার্লি ছাড়া কে আর পেতলের বল সাজিয়ে রাখতে পারে। নাও যাও। এবার শুয়ে পড়গে। সুহাস এসে কি খবর দেয় দ্যাখো। কাপ্তানও ফিরে আসবেন। লকারে পাচার করা কাপ্তানের কাগজপত্র থাকল। ফিলের কাছে কপি আছে। মনে হয় না কাপ্তান সহজে পার পাবেন।'

অধীর সুরঞ্জনের ওঠার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। মুখার্জি বললেন, 'এখনও কি তোদের কোনও সংশয় আছে?'

অধীর মাথা চুলকে বলল, 'না বলছিলাম, সুহাসকে অন্ধকার ইনজিন মে নিয়ে গিয়ে কে চুবিয়ে মারতে চেয়েছিল। সুহাস তো বলল, কোনও অদৃশ্য প্রেতাত্মা। তার নাকি মুখ হাত পা কিছুই সে দেখতে পায়নি।'

মুখার্জি যেন কিছুটা হাঁপিয়ে উঠছেন। তা উঠতেই পারেন। দুদিন ধরে যা ধকল যাচ্ছে। বিছানায় শুয়ে শুধু বললেন, 'আর শরীর দিচ্ছে না। কত রাত যেন ঘুমাই না। কিছুতেই কিছু বুঝতে চাস না। তবে জেনে রাখ কাজটা উইলিয়ামের। শেষ পর্যন্ত না পেরে ট্যাঙ্কের জলে দম বন্ধ করে সুহাসকে খুন

করতে চেয়েছিল। কি নিষ্ঠুর বল্‌। পারে। এরা সব পারে। রক্তে দোষ থেকে গেছে।'

অধীর বলল, 'কেউ তো দেখেনি তাকে? তুমিও না। চার্লিও না। সব ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া থেকে অনুমান করছ!'

'না, না, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া নয়।' প্রায় উঠে বসেছিলেন মুখার্জি। তারপর শুয়ে পড়লেন। 'তোরা ওর কেবিনে গেলে দেখতে পাবি চার্লির ঠাকুরদার জীবন ও বাণী বইটি উইলিয়ামের কেবিনে পড়ে আছে। চার্লি বইটি সুহাসকে দিয়েছিল। বইটি আমার খুব দরকার। ইনজিনরুমে নামার সময় বইটি যে সুহাসের হাতে ছিল বুঝতে কি অসুবিধা হচ্ছে। বইটি পরে খুঁজে পাওয়া যায় নি। কে নিল! সুহাস বইটি আমাকে দিতে পারেনি। চার্লির কাছ থেকে সে চেয়ে এনেছিল। তারপর সে তো কিছুই মনে করতে পারছিল না। ইনজিনরুম থেকে দাদাশ্বশুরের বইটি উইলিয়াম তুলে নিয়েছে।'

'তুমি দেখেছ, উইলিয়ামের কেবিনে আছে?'

'না দেখেনি। এটা অনুমান। ঠিক অনুমানও বলতে পারিস না। এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার কি হয়?'

অধীর বলল, 'এ স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার?'

'এও তাই। দেখে আসতে পারিস। বইটি কোথায় যাবে। ইনজিনরুমে সুহাস উইলিয়াম ছাড়া আর কে ছিল যে বইটা নিতে পারে। জাহাজ তো এখন বাপ মা মরা অনাথ। গিয়ে দেখে আয় না। ওর কেবিন তো খোলা আছে।'

'ওরে বাব্বা। ওদিকে যেতেই পারব না। মেরে ফেললেও না।'

'তবে চল্‌ দেখে আসি। সূত্রটি ঠিক কিনা?'

তিনি যাবার সময় বললেন, 'ফরোয়ার্ড ডেক ধরে যাওয়াই ভাল। কারও চোখে পড়বে না। তবে কেউ বাইরে নেই। খুব সতর্ক থাকারও কিছু নেই।' তিনি উইলিয়ামের কেবিন ঠেলা মারতেই খুলে গেল। খোলাই ছিল। তার টেবিলে অধীর সুরঞ্জন দেখল, সত্যি ডরোথি ক্যারিকো নামে বইটি পড়ে আছে। ভিতরে আলো জ্বালাই ছিল। এখন পর্যন্ত কেউ নেভায়নি।

'এটা এখানে আসে কি করে?'

অধীর সুরঞ্জন মুখার্জির পায়ে গড় হতে গেল। 'তুমি সত্যি গুরুদেব।'

ওরা বের হয়ে আসার সময় দেখলেন সব সুনসান। এমন মৃত জাহাজে হেঁটে বেড়াতেও আতঙ্ক হচ্ছে। কে আগে যাবে তাই নিয়ে ঠেলাঠেলি।

মুখার্জি সিঁড়ি ধরে নামার সময় বললেন, 'তাহলে বুঝলি, অদৃশ্য আত্মা কিংবা প্রেতাত্মার কাজ নয়। সি-ডেভিল লুকেনারেরও কাজ নয়। আসলে আমরা নিজেরাই কখন ডেভিল হয়ে যাই। কখন হোলি স্পিরিট হয়ে যাই জানতে পারি না। যত দোষ সব অপদেবতাদের।'

ওরা ঘরে ঢুকে গেলে অধীর দরজা বন্ধ করে দিল। কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেল। সুরঞ্জন বলল, 'আমিও খাব।' বলে সেও ঢক ঢক করে এক গ্লাস জল খেল। তারপরই বলল, 'আচ্ছা তোমার মনে আছে, চার্লি কিন্তু বলেছিল, তার জন্মাবার আগেই ঠাকুরদা গত হয়েছেন। কেন বলল, বল তো?'

'আরে বুঝছিস না কেন? চার পাঁচ বছরের স্মৃতি তার মনে থাকার কথা না। শুধু হিম শীতল, দাড়ি গোঁফয়ালা একটা মৃতপ্রায় লোককে দিনের পর দিন দেখেছে, স্টাডিরুমে পড়ে আছে। চার্লি সেদিকে যেতই না। ভয়ে ভিরমি খেত। বড় হলে নিশ্চয় বেটসি বুঝিয়েছে, সে জন্মবার আগেই তার ঠাকুরদা মারা গেছে। চার্লির দোষ নেই।'

'কিন্তু দড়িটা কে টানল?'

'কে টানবে? উইলিয়াম। উইন্ডসহোলগুলিই ছিল তার ষড়যন্ত্রের ক্ষেত্র। সে সহজে তার কেবিন থেকে বের হত না। আমরা কখনও ওর এলাকায় যেতে পারতাম না। নিষিদ্ধ এলাকা। তাকে আমরা এই জাহাজে কে কবার দেখেছি বল! সে তার কেবিনে খাওয়া-দাওয়া করত। কেবিন আর ট্রানসমিসান রুম। ওর শ্বশুর চিনত না, চেনার কথা নয়। গোটা পরিবারটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। পনেরো বিশ বছর ধরে কেউ কারও খোঁজ রাখত বলে মনে হয় না!'

'না বলছিলাম, তবে কাপ্তান কেন মাই ফেইথফুল সেলর বলে লেকচার ঝাড়লেন।'

'শেষদিকে তিনি টের পেয়েছিলেন। বিশেষ করে চার্লি ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে বাপকে গালাগাল দেবার সময় উইলিয়াম সম্পর্কে নালিশও দিতে পারে। উইলিয়াম যে কাপ্তানের পুত্রটিকে শাসাচ্ছে, তাও বলতে পারে। ব্ল্যাকমেল করতে পারে। এগুলি কিন্তু কোনও রহস্যের মধ্যেই পড়ে না। অযথা আমাকে আর প্রশ্ন করে জ্বালাতন করিস না। মনটা ভাল নেই। সুহাস না আবার রাস্তা হাবিয়ে ফেলে। বড় দুশ্চিন্তা মাথায়।'

ওরা দুজনেই চুপ।

কি আর বলা যায়।

তিনি যা বলছেন, সবই তো মিলে যাচ্ছে। কেবল মুখোস নিয়ে মগড়ার ধোঁকা ছাড়া আর কিছুতেই তিনি বোকা বনে যাননি।

ওরা বসেই আছে।

অগত্যা মুখার্জি বললেন, 'কাপ্তান শেষদিকে টের পেয়েছিলেন মেয়ের ছদ্মবেশ ধবা পড়ে গেছে এবং জাহাজে তাঁর প্রতিপক্ষ উঠে এসেছে। বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। মাথাও ঠিক থাকতে না পাবে। মাই ফেইথফুল সেলর নিয়ে তোদের মাথা ঘামানোর কি দরকার পড়ল বুঝছি না।'

তারা উঠে পড়ল।

যেন দরজা খুলতেও ভয় পাচ্ছে।

তখনই মুখার্জি ডাকলেন, 'মনে রাখিস এটাও দুর্ঘটনা। চার্লিকে খুনী ভাবিস না। আত্মরক্ষার্থে শুধু নয়, সুহাসকে উইলিয়াম আজ হোক কাল হোক খতম করতই। চার্লি ঈশ্বরবিশ্বাসী। সে মনে করে, উইলিয়াম, সিনার। সে মনে করে সিনারকে শুধু সে সাতবারই ক্ষমা করেনি। আরও বেশিবার করেছে। তা না হলে সেভেনটি টাইমস সেভেনের কথা বলত না। চার্লিই বা কোথায় চলে গেল! কি যে খারাপ লাগছে! তবে আবার বলে রাখছি—এই ঈশ্বরবিশ্বাসী মেয়েটিকে নিয়ে কাপ্তান যা করলেন, কিছুতেই তিনি পার পেতে পারেন না।'

পার পেলেনও না। সকালেই জাহাজে খবর এল, কাপ্তান মাদাঙে গুরুতর অসুস্থ। চিফমেট ফিবে এসেছেন। জাহাজে ফিরেই লাশ নিয়ে ফের থানা পুলিশ —পুলিশও এসে গেল। দুর্ঘটনা ছাড়া আর কি হতে পারে! লাশ সুটেব নিচ থেকে কপিকলে টেনে তোলা হচ্ছে। জাহাজিরা সব বিভ্রান্ত। লোকটিকে ঠিক চেনা যাচ্ছে না। কিনারার লোক কি না কে জানে। কয়লার কালি মাখা মুখে জল ঢেলে দিতেই গোঁফ আলগা এবং উইলিয়াম হাঁ করে তাকিয়ে আছে। সুরঞ্জন দেখল বাঁ-হাতে ক্ষতের দাগ। বীভৎস শবীর। মুখার্জিদা আসেননি। পুলিশও জেরা করল, সাক্ষীগোপালের মতো। তাবপব নৌকায় লাশ নিয়ে চলে গেল।

সারেঙের নজর পড়ল, জাহাজে সবাই আছে, সুহাস নেই। ছেলেটির প্রতি তাঁর মায়া আছে। ভদ্র ছেলে। কোনও কারণে মাথা গরম করতে শেখেনি। না পেরে মুখার্জিবাবুকে তিনি বললেন, 'সুহাসকে দেখছি না। সে কোথায়!'

'কিনারায় গেছে। মনে হয় বিকেলে ফিরে আসবে। কাজে পাঠিয়েছি।' সারেঙ চলে যাচ্ছিলেন, মুখার্জিবাবু দৌড়ে গেলেন, 'চার্লির কোনও খবর পাওয়া গেছে।'

'না।'

'শুনলাম, কাপ্তান গুরতর অসুস্থ।'

'ঠিকই শুনেছেন। চিফমেট কাপ্তানেব কাজকর্ম দেখবে। মাদাঙে যাবার সময়ই কাপ্তান সংজ্ঞা হারান। হাসপাতালে আছেন। কোম্পানি তাঁকে দেশে নিয়ে যাবাব ব্যবস্থা করবে।'

'চার্লির কি হবে? কোনও খোঁজই যে পাওয়া গেল না। ছেলেকে ফেলে চলে যেতে পারছেন!'

সারেঙ বললেন, 'কাপ্তানের বোধবুদ্ধি লোপ পেয়েছে। বোধ হয় পক্ষাঘাত।'

মুখার্জি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এখন সুহাস ফিরে এলে হয়! চার্লি ফিরে এলে হয়। জাহাজেব সব অবদেবতা বিনাশ। ওরা ফিরে এলেই তাঁর আর কোনও অস্বস্তি থাকছে না।

কিন্তু এল না।

বিকেলেও এল না।

রাতেও ফিরল না। সকাল হয়ে গেল। মুখার্জিবাবু না পেরে ছুটে গেলেন ফিলের কাছে। ফিল তো অবাক! বললেন, 'সুহাস তো আসেনি। রাস্তা গোলমাল করে ফেলেনি তো!'

তিনি গেলেন আস্তাবলে। খোঁজ নিলেন, খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, ডিনা ব্যাঙ্কের দুজন জাহাজি ঘোড়া নিয়ে গেছে। দু'দিন হল তাদের পাত্তা নেই। ঘোড়ারও না। খাতায় দেখলেন, সুহাস, চার্লি একদিন হেরফের। কে কোন্‌দিকে যে চলে গেল!

গেল কোথায় ছেলেটা। রাস্তা হারিয়ে ফেলল! কি করেন। ফিলের কাছে ফের গেলেন। দু-দিন হয়ে গেল পাত্তা নেই। ফিল শুনে বললেন, 'চল দেখি।' ফিল তাঁর লোকজনকে খবর পাঠালেন। না কোথাও খোঁজ নেই, না চার্লির, না সুহাসের।

মুখার্জি পাগলের মতো খুঁজছেন। রোজ ঘোড়া নিয়ে চলে যান। টিলায় উঠে দাঁড়িয়ে থাকেন। সামনে যতদূর চোখ যায় ঘাসের প্রান্তর না হয় ঝোপজঙ্গল। সঙ্গে কোনও দিন সুরঞ্জন না হয় অধীর থাকছে। নিনামুর এবং স্থানীয় লোকজনও থাকছে।

রোজ একবার ফেবার সময় আস্তাবলে খবর নেন। কোনও খোঁজ যদি থাকে। একদিন বন জঙ্গলে ঘুরে ফেরার সময় জানতে পারলেন, ঘোড়া দুটো ফিরে এসেছে।

'কোথা থেকে ফিরে এল?'

'তাঘড়ি টিলার নিচে ঘোড়া দুটো ঘাস খাচ্ছিল।'

তাহলে চার্লি আর সুহাস ঘোড়া ছেড়ে দিয়েছে। মুখার্জি তাঘড়ি টিলায় গেলেন। সারা সকাল দুপুর রোদ মাথায় করে টিলার উপর দাঁড়িয়ে থাকলেন। ফিলও সঙ্গে আছে। ফিল বলল, 'চল মুখার্জি। এভাবে সারাদিন রোদে ঘোড়ার পিঠে বসে থাকলে অসুস্থ হয়ে পড়বে।'

'তোমরা যাও। আমি যাচ্ছি।'

আসলে মুখার্জির কেন যে মনে হত সঙ্গে লোকজন আছে বলেই, সুহাস ডাকলেও সাড়া দিচ্ছে না। একা থাকলে, লম্বা ঘাসের ভিতর থেকে দুজনেই উঠে দাঁড়াতে পারে। হাত তুলে দিতে পারে। তিনি এ-ভাবে একা একা দিনের পর দিন টিলার পর টিলায় দাঁড়িয়ে থেকে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। চার্লি, ব্লু স্টেম ঘাসের জঙ্গলে সুহাসকে নিয়ে যদি পালিয়ে থাকে। থাকতেই পারে। সমুদ্রে ঝিনুকের মাংস আর লেবুর রস, দুই উপাদেয় খাদ্য। সমুদ্রের ধারে ধারেও ঘুরে বেড়ালেন।

সুরঞ্জন বলত, 'চল। ফিরি।'

মুখার্জি বলতেন, 'তোরা যা আমি যাচ্ছি। এমন সুন্দর বুনো ফুলের উপত্যকায় ওরা থাকবে না হয় না।'

'গায়ে জ্বর নিয়ে ঘুরছ। তুমিও দেখছি শেষে বিছানা নেবে। চল প্লিজ।'

মুখার্জি ভাবতেন, ফুল ফুটবেই। যেখানেই ফুটুক, তিনি তাদের ঠিক দেখতে পাবেন। সুহাস এতটা বেইমানি করবে না। একবার অন্তত দেখা করে বলবে না, দাদা আমার জন্য ভেব না—আমি ভালই আছি। চার্লি অন্তত একবার দূর থেকে হাত তুলে বলবে না, হি প্রটেকটস! আমাদের জন্য ভেবো না সুখানি! কিন্তু কারও পাত্তা নেই! এত বেইমান তোরা!

মুখার্জি এবার বিছানা নিলেন।

ফিল দেখতে এলেন। বললেন, কি ঝড়টা না গেছে! ডাক্তার সঙ্গে। ডাক্তার শুধু বললেন, বিশ্রামের দরকার।

তাঁকে সুরঞ্জন অধীর জাহাজ থেকে কিছুতেই আর বের হতে দিচ্ছে না। এমনকি সিঁড়ি ভেঙে উপরেও উঠতে দিচ্ছে না। ডাক্তার বারণ করে গেছেন।

একদিন এসে সুরঞ্জনই খবর দিল, দাদা জাহাজ দেশে ফিরছে। নিউক্যাসেলে মাল খালাস করে সোজা বাড়ি।

মুখার্জি যেন খুশি হতে পারলেন না। ব্যাজার মুখে বললেন, 'ছেলেটা পড়ে থাকল। চার্লি পড়ে থাকল!'

সুরঞ্জন বলল, 'আমার মনে হয় সব খবর রাখে। জাহাজ ছাড়ার আগে দুজনেই উঠে আসবে।'

মুখার্জির কোনও প্রতিক্রিয়া নেই।

জাহাজ ছেড়েও দিল।

মুখার্জি বললেন, 'আজ আর আমাকে বাধা দিস না।' বলে তিনি একাই উপরে যেতে চাইলে, সুরঞ্জন বলল, 'ধরছি। ওঠো, এত দুর্বল হয়ে গেলে কেন বলো তো! যেন সর্বস্ব খোয়া গেছে তোমার।'

মুখার্জি হাসলেন।

তারপর জাহাজ ছেড়ে দিল। সমুদ্রে পড়ল। দ্বীপ দেখা যাচ্ছে। সবাই রেলিঙে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। যেন যতক্ষণ দ্বীপটা দেখা যায়। ধীরে ধীরে দ্বীপটা সরে যেতে থাকল। মুখার্জি চোখের পলক ফেলছেন না। আর তখনই মনে হল, টিলার মাথায় দাঁড়িয়ে দূরে দুই মানব-মানবী হাত নাড়ছে। মুখার্জিও অতি কষ্টে হাত নাড়লেন। অন্ধকার নেমে আসছে। পাখির ওড়াউড়ি চারপাশে। সবাই ডাঙায় ফিরছে।

সুরঞ্জন হাত ধরে বলল, 'এবার চলো। অন্ধকারে কিছুই তো আর দেখা যাচ্ছে না। কি দেখছ?'

মুখার্জি ওঠার সময় বললেন, 'ফুল ফোটা দেখছি। বুনো ফুলের রাজত্বেই চার্লি শেষে সুহাসকে নিয়ে থেকে গেল। ধর আমাকে।'

'ধর' বলেও চুপচাপ বসে থাকলেন মুখার্জি। ডেক ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। এখনও দ্বীপের বিন্দু বিন্দু আলো দূরে নীহারিকার মতো রহস্যময়। আকাশ নীল। সমুদ্রগর্জন শুনতে পাচ্ছেন। নক্ষত্রমালায় টের পাচ্ছেন নদী নারী নির্জনতার ছবি। সুহাস দ্বীপে তবে চার্লিকে নিয়ে থেকে গেল।

এই অসীম অনন্ত জলরাশির ভিতর জাহাজের গতি ক্রমে বাড়ছে। তিনি বসেই আছেন। এক সময় দেখলেন, দ্বীপের সব বিন্দু বিন্দু আলো নক্ষত্রমালার সঙ্গে মাখামাখি হয়ে গেছে। দ্বীপটিকে আলাদা করে আর চিনতে পারছেন না। বুক তাঁর কেমন ফাঁকা হয়ে গেল। সুহাস এখন অন্য গ্রহের বাসিন্দা। ভাবতেই তিনি নিজেকে আর শান্ত রাখতে পারলেন না। চোখে জল এসে গেল। বাবা তার পুত্রের ফেরার অপেক্ষায় আছে। মা তার গাছের নিচে। অপেক্ষা, কবে তার চিঠি আসবে। মা বাবা তো বোঝে না, বুনো ফুলের গন্ধ টের পেলে কেউ আর বাড়ি ফেরে না! যে যার মতো নদী নারী নির্জনতার খোঁজে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়।

সমুদ্রে বুনো ফুলের গন্ধ

সমুদ্রযাত্রা

॥ তিন ॥

কার্ডিফে আমরা বিশ-বাইশ দিন ছিলাম। নাকি তারও বেশি! এতকাল পর ঠিক মনেও করতে পারছি না। আমাদের জাহাজ তো কার্ডিফ বন্দরেই ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মাল খালাস করার জন্য জাহাজ ছিল ড্রাইডকে আর আমরা পোর্টের কাছাকাছি লম্বা একটা টিনের চালায় উঠে গেছিলাম। তিন-চারদিন ছিলাম।

না। বোধ হয় আরও বেশি।

স্মৃতি ধূসর হয়ে আসছে। ঠিক মনে কবতে পারছি না। অস্বস্তি হচ্ছে ভেবে, ড্রাইডক করাতে কতদিন সময় লাগার কথা। সাতদিন, দশদিন, না দু-দিনেই শেষ করা যায় কাজটা।

অবশ্য তিন দশক আগে একরকম, এখন অন্যরকম। আমি ছিলাম কয়লা জাহাজের নাবিক। জাহাজের তিনটে বয়লার হাইমাই করে সমুদ্রে রাক্ষসেব মতো কয়লা গিলত। এখন তো শুনছি, কয়লায় আর জাহাজই চলে না। হয় মোটর ভেসেল, নয় ডিজেলে চলে।

আমাদের সময় মোটর ভেসেলে নাবিকের কাজ পাওয়াটা সৌভাগ্যের প্রতীক ছিল।

আর আমার তো ছেঁড়া কপাল। পড়বি তো পড়বি এমন জাহাজে, যার সব কিছু লরঝরে। বোট-ডেকে উঠতে কতবার যে রেলিঙ খসে পড়েছে। ডেরিক ভেঙে পড়েছে। ইনজিন-রুম চিপিং করতে করতে হয়রান হয়ে গেছি। কখনও বালকেডে চিপিং করার সময় দেখি ফুটো। সমুদ্রের নীলজল দেখা যায়। দৌড়ে উঠে গেছি ইনজিন-রুম থেকে। আসানুল্লাকে খবর দিয়েছি। তিনি ছুটে গেছেন মেজ মিস্ত্রি লেসলির কেবিনে। মেজ মিস্ত্রি তড়াক করে লাফিয়ে নেমে এসেছেন। অন্ধকারে টর্চ মেরে দেখে আবাব দু-লাফে সিঁড়ি ডিঙিয়ে সোজা বড় মিস্ত্রির কাছে। বড় মিস্ত্রি কাপ্তানের ঘরে। কাপ্তান ইনজিন-রুমে নামছে, নাবিকেরা জড়ো হয়েছে টুইন-ডেকে। আতঙ্কে সবার মুখ কালো। কারণ ফুটো দিয়ে জল ঢুকে যেতেই পাবে।

কশপ, আসানুল্লা আর লেসলি তিনজনে মিলে কোনওরকমে জোড়াতালি দিয়ে বলে গেলেন—নো চিপিং। সাদা খড়ি দিয়ে দাগ কেটে দিলেন। জাহাজ বন্দরে না ভেড়া পর্যন্ত চিপিং বন্ধ। চকখড়ির দাগ দেওযা জায়গাটার দিকে যেতেও তখন ভয় করত। জং ধরে ভিতরে খেয়ে গেছে। বালকেডের প্লেট খুলে আবার লাগানো এবং আমার যতদূর মনে আছে ড্রাইডকের সময়ই কাজটা সেরে ফেলা হয়েছিল।

দিনক্ষণের হিসাব দূরে থাকুক, রাস্তার নাম, বাড়ির নাম, ক্যাসেলের নাম কিছুই মনে নেই। মনে বাখার বাসনাও ছিল না। একজন অভাবী তরুণের কাছে জীবন তখন ছিল ভারি ক্ষুধার্ত।

সুতরাং কতদিন ছিলাম কার্ডিফে সঠিক বলতে পারব না। আমাদের ভাঙা জাহাজের দুর্গতি দেখলে আমার চোখেই জল চলে আসত। একবাব তো পোর্ট-মেলবোর্নে টানা তিন মাস। বড় বড় অক্‌সিজেন সিলিন্ডার, দিনরাত হাতুড়ির ঘা, খোলের প্লেট কেটে নতুন প্লেট বসানো, রিপিট মারা কত না হঠকারি তাণ্ডব চলত জাহাজটাতে। কেবল দেখতাম খুলে নেওয়া হচ্ছে, কেবল দেখতাম ছেঁড়া কাঁথার ওপর সেলাই ফোঁড়াই হচ্ছে। ক্রস বাঙ্কারে মেরামত, বয়লার-চক তুলে নতুন চক বসানো, হুড়মুড করে কিনার থেকে মিস্ত্রিরা শুকুনের মত খাবলে খাবলে খাচ্ছে জাহাজটাকে। টানা তিনমাস, না আরও বেশি! না তাও মনে নেই।

এখন আর দিনক্ষণের হিসাব মাথায় নেই। শুধু কিছু ঘটনা, কিছু মুখ এই অপরাহু বেলায় মনে পড়ে কিংবা কোনও দৃশ্য। বড় একঘেয়ে সমুদ্রযাত্রা। জাহাজে উঠে এটা আরও বেশি টের পেয়েছিলাম।

যেমন ড্রাইডকের সময় ঘরে বসে গল্পগুজব, বিকেলে বেড়ানো—তখন তো জাহাজিদের হাতে কোনও কাজ থাকে না। খাও দাও ফুর্তি কর। আমার কপালে ফুর্তি বিষয়টা ছিল একটু অন্যরকমের। যে পারিবারিক পরিমণ্ডলে মানুষ তাতে শত হঠকারিতা সত্ত্বেও কোনও নারীর ঘরে রাত কাটানো দুঃস্বপ্নের সামিল।

অথচ ইচ্ছে করত। দুরারোগ্য ব্যাধির আতঙ্ক ছিল তীব্র। যে যার মতো বের হয়ে গেলে আমি কার্ডিফ-ক্যাসেলের পাশ দিয়ে হাঁটতাম। সারা বিকেল, কখনও সন্ধ্যা হয়ে যেত, কত উঁচু পাঁচিল

পাথরের—মনে হয় গ্র্যানাইট পাথরে তৈরি প্রাচীন কোনও পুরাতত্ত্ব আমাকে ধাওয়া করত। ফাঁক পেলেই পাঁচিলের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতাম। কোনও দোকানে ঢুকে টুকিটাকি জিনিস কিনতাম। কাউন্টারে কোনও যুবতী থাকলে তার সঙ্গে দু-দণ্ড কথা বলার জন্য বসে থাকতাম—কখন তার হাত খালি হবে। অপ্রয়োজনে ফলের দোকানে ঢুকে ফল কিনতাম—কারণ তরুণী আমারই বয়সী। সে বুঝত কি না জানি না, সে আমাকে দেখলেই হাই করে ডাকত।

একজন গরিব বামুনের ছেলের পক্ষে এটা ছিল বিপজ্জনক খেলা। তবু মনে হত যাই। বসি, তার ব্যস্ততা দেখি। কথা বলুক না বলুক, কাউন্টারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকারও স্বভাব ছিল আমার। অগত্যা শেষ বেলায় কিছু কেনা কাটা—সে ভারি যত্নের সঙ্গে দুটো আপেল দেবার সময় বলত, গুড-নাইট সেলর।

অথবা কোনও অপরাহ্ণে বসে থাকতাম, কার্ডিফ বন্দরের লাগোয়া পাহাড়ি উপত্যকায়। বসে থাকলে, অনেক জাহাজ এবং দূরের নীল সমুদ্র চোখে ভেসে উঠত। নৌবাহিনীর জাহাজ দেখতে পেতাম, ঘোরাফেরা করছে। আর রঙবেরঙের হাজার হাজার পাখির ওড়াউড়ি। কিচির মিচির শব্দ, কখনও রাত হয়ে যেত। সমুদ্রে চাঁদ উঠত। নক্ষত্ররা জেগে থাকত মাথার উপরে। কখনও বেশ রাত হয়ে যেত ফিরতে। আসানুল্লা ধমক দিতেন, ব্যাটারে কোন্‌খানে গ্যাছিলা! এত রাইত হইল ফিরতে। মন্দ জায়গায় যাও নাইত!

আমি হাসতাম। পিতৃতুল্য তিনি। একদিন তো ইনজিন-ভাণ্ডারীর উপর খাপ্পা। বাঁধাকপিতে বিফের টুকরো ডুমো ডুমো করে কেটে দিয়েছে।

বনার্জি খাইব কী দিয়া! যাও মিঞা! আলুভাজা কইরা দ্যাও। ডাল আলুভাজা দিয়া খাইব! তুমি কি চা'ও পোলাডা না খাইয়া মরুক। তুমি খাইতে পারবা রোজ রোজ!

আমরা মাত্র পাঁচ-সাতজন হিন্দু জাহাজি। বিফ খাই না। সপ্তাহে দু-দিন মটন রেশনে থাকে। বাদবাকি দিনগুলি বিফ। আমাদের হিন্দু সতীর্থরা সবাই পাঁচ-সাত সফর দেওয়া নাবিক। তাদের আটকায় না। আমার আটকায় কারণ এটাই আমার প্রথম সমুদ্র সফর।

আসলে আমি কেন এত একা ছিলাম, এবং নির্জনতা পছন্দ করতাম এখন বুঝি। হৈ চৈ ধাতে একদম নেই। জমিয়ে আড্ডা দিতে পারি না। সঙ্কোচ, এই বুঝি ধরা পড়ে গেলাম। তবু মানুষের তো কিছু নিয়ে থাকতে হয়। সমুদ্রে আমার দিনরাত ছিল একটাই ভাবনা, আবার দেশে কবে ফিরে যাব। ফিরতে পারব কিনা, এও ছিল ভয়। তাপ্পি মারা জাহাজে উঠেছি, দৈব দুর্বিপাকে যেন হাঙরের মতো সব সময় ঘোরা-ফেরা করত।

ক্রস বাঙ্কারে কয়লা টানছি, এক চাকা হুইলের গাড়িতে কয়লা ভরছি, ধুলো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, শ্বাস নিতে কষ্ট—বারবার বোট-ডেকে উঠে বুক ভরে শ্বাস নিতাম। সমুদ্র দেখতাম—বড় নিস্তরঙ্গ। জাহাজ যাচ্ছে, জল কেটে প্রপেলার জাহাজের গতি তৈরি করছে। রেলিঙে ঝুঁকে দাঁড়াতে ভয় পেতাম। পড়ে গেলে প্রপেলার আমাকে ছিন্নভিন্ন করে দেবে। মাংসের টুকরো এবং রক্তের ঘ্রাণ পেয়ে গভীর সমুদ্র থেকে উঠে আসবে হাঙরের ঝাঁক। তাদের কোনওটার পেটে আমার হাত, আমার পা, কিংবা মুণ্ডু। আমি তাদের পেটের বাসিন্দা হয়ে গেছি এমনও মনে হত কখনও। রেলিঙে ভর করে দাঁড়াতে ভয় করত।

দেশে ফেরার পর বন্ধুদের একটাই প্রশ্ন, বন্দরে নারীসঙ্গ করেছি কি না।

আমি হাসতাম।

বলে তো লাভ নেই। 'ইচ্ছে ছিল, পারিনি।'

আর বললে, বিশ্বাসই বা করবে কেন। জাহাজে সফর করতে বের হয়ে কোনও নারী সংসর্গ হয়নি, এটা যেন বন্ধুদের বিশ্বাসের বাইরে। কী করে বলি, আসানুল্লা বলে একজন মাথার উপর ছিলেন জাহাজে। জাহাজে ফিরতে দেরি হলে গ্যাংওয়েতে পায়চারি করতেন। দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়তেন। আমি ফিরে এলে তার প্রশ্ন, 'কই গ্যাছিলি। এত রাত করলি!'

'আর বল না চাচা, সামোয়ার পিকনিক গার্ডেনে চুপচাপ বসেছিলাম।

কী করে বোঝাই ডাঙা মানুষের কত প্রিয়। গাছপালা, পাখি এবং সুন্দরী বালিকার মুখ আমাকে টানে। জাহাজে ফিরতে ইচ্ছে হয় না। ফিরলেই তো রঙ বার্নিশের গন্ধ। চিফ কুকেব গালিতে মাংস পোড়া গন্ধ। আমার যে ওক্ উঠে আসে।

এমন কথায় তিনি কেন যে ক্ষেপে যেতেন বুঝি না। প্রায় তেড়ে মারতে আসার মতো!

কেন মরতে আইছিলা জাহাজে। কেডা কইছিল আইতে! ভাল লাগব ক্যান! কার ভাল লাগে। তাই বইলা, এত রাতে ফিরবি। চিন্তা হয় না!

আচ্ছা চাচা অযথা রাগ করছ কেন বলত!

কই গেলি ক'। আমি ছাড়ুম না। জাহান্নামে যাইতে চাস। ক' তুই। আমি কেবল ঘর-বাব হইতেছি! রাস্তাঘাট ভাল না। তর বুদ্ধি সুদ্ধি কবে হইব। কিছু হইলে...

কী হবে!

কী হয় না জাহাজে! কত দেখলাম, ঘিলু চিবাইয়া খায়। রাস্তা খুঁইজা পায় না। পরী হুবির দেশ—মাথা ঠিক রাখন সোজা কথা! জাহাজ থাইকা যদি পালানোর চেষ্টা করস পুলিশ দিয়া ধইবা আনমু! আমাব নাম আসানুল্লা। আল্লার বান্দা। তারে ছাড়া কারে ডরাই ক!

ঠিক আছে, মাথা গবম করবেন না। আমি বের হচ্ছি না। কি খুশি!

বাইর হইতে বাবণ কবছি! মন-মেজাজ বলে কথা! তা ঘুইরা ফিরা দেখবি। ফাঁইসা যাবি না।

জাহাজে দুর্ঘটনার শেষ থাকে না। ওই তো পাশের জেটিতে কে গ্যাংওয়ের সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে জলে ডুবে গেল। নেশা করে উঠতে গিয়ে পা হড়কে গেছে। আমাদের জাহাজ থেকে দুজন বেপাত্তা। আসলে জাহাজ বিলাতে এলেই অনেকে পালায়। আমি না আবার কিছু করে বসি।

এই বনার্জি শোন।

কাছে গেলে বললেন, বড়টিন্ডাল তরে কুপরামর্শ দেয়!

কু-পরামর্শ অবশ্য দেয়। বড়টিন্ডাল অবশ্য ভাবে এটা তার সৎ পরামর্শ। বড়টিন্ডালের সঙ্গে দেখা হলেই এক কথা, দেশে ফিরা করবাডা কি। বার্মিগ্রামে আমার খালাত ভাই আছে, তার কাছে চইলা যাও। সে হিল্লা কইরা দিব। লেখাপড়া জানা পোলা তুমি, একবার যখন আইসা পড়ছ ফিবা যাওন ঠিক না। বার্মিগ্রাম যে আসলে ব্রিমিংহাম পরে জেনেছিলাম।

ড্রাই-ডকের সময় বড়টিন্ডাল দু-দিনের ছুটি নিয়ে বার্মিগ্রামে তার মেমান বাড়িতে ঘুরে এসেছে। মেমান নিজেও এসেছিলেন। কী একটা বেস্তোবাঁর মালিক। বিবি সঙ্গে। মেমসাব। কন্যা সঙ্গে মেমসাব। টিন্ডালসাব তাঁর বালিকা ভাইঝিটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার সময় বলেছিলেন, বামুনের বেটার দশা দ্যাখ। মেয়েটি তো বাংলা বোঝে না। সে আমার দিকে শুধু তাকিয়েছিল—তার অপরূপ লাবণ্য, এবং কালো চুল, গভীর নীল চোখ কোনও মায়াবী দ্বীপের কথা মনে করিয়ে দেয়।

সারা দিন সে আমাকে নিয়ে শহরে ঘুরেছে। কখনই মনে হয়নি আমি একা। স্টেশনে তাকে তুলে দিতে গিয়ে মনটা এত খারাপ হয়ে গেছিল—কী বলব—যেন মেয়েটি আমাকে ইশারায় থেকে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে গেছে।

ওব কথা আমার মনে হয়।

সে পরেছিল সাদা রঙের ভয়েলের স্কার্ট। লাল রঙের জ্যাকেট। উরু পর্যন্ত নাইলনেব মোজায় পরম স্নিগ্ধতা বিরাজ করছিল। আশ্চর্য ঘ্রাণ শরীরে। বিদেশী পারফিউমের এমন মৃদু সৌরভ এর আগে কখনও টের পাইনি।

ট্রেনটা চলে যাবার পরও আমি স্টেশনে চুপচাপ বসেছিলাম। হঠাৎ আমার মা-র দু-চোখ কোথা থেকে যেন উঁকি দিয়ে গেল। চারপাশে ভাই, বোনেরা দাঁড়িয়ে আছে। ডাকছে—দাদারে ফিরবি না। বসেই থাকবি।

সম্বিত ফিবে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝাঁকুনি খেলাম। দেখি আসানুল্লা পেছনে দাঁড়িয়ে।

বললেন, মন খারাপ!

না না।

ওঠ। চল্। মন খারাপ করিস না। দেখবি, দেখতে দেখতে দিন কাইটা যাইব।

সেই থেকে তিনি সতর্ক হয়ে গেলেন। বড় টিন্ডালের সঙ্গে তাঁর অসাক্ষাতে কথা বললেই ক্ষেপে যান তিনি।

সম্ভবত আমি কার্ডিফে গেছিলাম জুন-জুলাইয়ে।

দু-পাঁচদিন বেশ রোদ, হালকা মেজাজ মানুষের—সুন্দর মনে হয়েছে মানুষের ঘরবাড়ি। ঘোরাঘুরিও মন্দ চলছিল না। তারপর টানা বিশ-বাইশ দিন সূর্যের মুখ দেখাই গেল না। প্যাচপ্যাচে বৃষ্টি। টিন্ডাল ডাকলেই টের পাই, সারেঙসাব একবার ঠিক উঁকি দিয়ে গেছেন।

টিন্ডাল বলেছিল, কি রে যাবি? তিন চার মাস পুলিশের চোখে ধুলা দিয়া থাকতে হইব। ব্যবস্থা খালাত ভাইসাব কইরা দিব কইছে।

যদি রোদ থাকত এবং ঝলমলে আকাশ কিংবা এত শীতের কামড় না থাকত হয়তো থেকে যেতাম। আর যখন জানতে পারলাম, সূর্যের মুখ দেখা সৌভাগ্যের সামিল, তখনই মনটা দমে গেল। চোখের উপর তো দেখছি শুধু সারাদিন ঝিরঝিরে বৃষ্টি। টানা বিশ-বাইশ দিন এমন দুঃসহ অভিজ্ঞতার পর আর জাহাজ থেকে পালাবার ইচ্ছে হয়নি।

বড় টিন্ডাল তো একদিন খোদ ভাইঝিকে নিয়ে ফের হাজির। জাহাজে মেয়ে উঠে এলে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। কিন্তু বড়টিন্ডাল গোমড়ামুখো মানুষ, বেয়াদপি একদম পছন্দ না। তাঁর ভাইঝি নাজিরা আমাদের সঙ্গে খেল। গল্প করল, জানাল—যদি থেকে যেতে চাই, তার বাবা ব্যবস্থা করে দেবে। তার বাবার লেখা একটা চিঠিও সে আমাকে দিল। তখনই কেন যে শুনতে পাই, দাদারে বাড়ি ফিরবি না।

না আমার পালানো হয়নি।

আসলে মন্দ কপাল। ঘরমুখো মন, এই যে জাহাজে ভেসে পড়েছি শুধু একটি দুর্গত পরিবারকে রক্ষা করাব জন্য। অন্তত আমার তখন এমন অবস্থা মুরুব্বির জোর নেই, কলোনিতে থাকি, গরিব মানুষের ঘরে টিউশনি জোটে না, কোনওরকমে আই. এ পাশ যুবক— অর্থাভাব, কিছু একটা করতে হয়।

কিছু একটা করতে হয় বলেই জাহাজ উঠে পড়া। তার আগে হালিশহরে ট্রেনিং, ভদ্রা জাহাজে ট্রেনিং, জাহাজে ওঠার ছাড়পত্র, সি ডি সি সংগ্রহ—এতসব করার পর জাহাজ।

পাঁচ-সাত মাসও হয়নি। সেই কবে কলকাতা বন্দর থেকে জাহাজে উঠেছি। যেন কতকাল আগে, যেন কোনও পূর্বজন্মে ঘটনাটা ঘটেছে, এ জন্মে আমি নাবিক, এই অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছু টের পাই না। আঠারো উনিশ বছর বয়সের যুবক স্বপ্ন দেখতে ভালই লাগত। জাহাজে উঠে টের পেলাম, বাড়ির কথা মনে হলেই মন খারাপ হয়ে যায়।

কলকাতা থেকে জাহাজ ছাড়বার পর কলম্বো হয়ে ডারবান, কেপটাউন। মাস দুই লেগে গেছিল। একনাগাড়ে মাসখানেক সমুদ্রে, শুধু জল আর জল—ইনজিন রুম থেকে উঠে আসছি, ওয়াচ শেষ, বিধ্বস্ত। ঝড় সাইক্লোন, ডেকের উপর কয়লা, জাহাজ দুলছে, তবু কয়লা টেনে নিয়ে যেতে হবে ইনজিন রুমে। কখনও রক্ত বমি—নিস্তার নেই। জাহাজে মার মার কাট কাট লেগেই থাকত। সি-সিকনেস বড়ই কঠিন আপদ। সব সামলে সমুদ্রে ঘোড়সওয়ার আমি। কখনই ভেঙে পড়ি না।

কেবল মাঝে মাঝে প্রশ্ন—ডাঙা কবে পাব।

ডাঙার কথা বললেই সারেঙসাব মুখ গোমড়া করে থাকতেন। ডাঙা কেন এত মধুর তিনি যেন বুঝতেই পারেন না। ডাঙা মানে তো জাহান্নমে যাওয়া। নেশা, নয় কার্নিভেলে ঘোরা, জুয়ার ঠেকে আটকে পড়া, আর রাতে পরী হুরির কব্জায়। তার চেয়ে যেন এই অনন্ত অসীম সমুদ্র তার কাছে খুবই পবিত্রতার কথা বলে। পাঁচ ওক্ত নামাজ তিনি সকাল আর সাঁজবেলায় সেরে নেন। সাইক্লোন থাকলে মেসরুমে মাদুর পেতে, না থাকলে ফল্কার উপর মাদুর বিছিয়ে তিনি যখন নামাজ পড়েন, মাথায় কুরুশ কাঁটায় নকশা তোলা সাদা টুপি, পরনে লুঙ্গি, গায়ে সাদা পাঞ্জাবি এবং মুখে সাদা দাড়ি যেন কোনও ফেরাস্তা। এই জাহাজ, এই সমুদ্র, এমন কী আরও গভীর নৈঃশব্দে ডুবে যাওয়া প্রাণীকুলের জন্য তাঁর মোনাজাত— আমাকে উদ্বুদ্ধ করে। ঈশ্বরপ্রীতি হয়তো মানুষকে কোনও বড় জায়গায় নিয়ে যেতে

পারে—কিন্তু আমি হঠকারি যুবক, না ভেবেচিন্তে জাহাজে উঠে পড়ায় তিনি খুশি না।

বুয়েনসএয়ার্স বন্দরে জাহাজ ভেড়ার দিন তিনি আমাকে ডাকলেন। এত বেশি খবরদারি কখনও বিরক্তির কারণ হত। তিনি সোজা বলে দিলেন, জাহাজ ছেড়ে বেশি দূর যাবি না। হারিয়ে গেলে আমি কিচ্ছু জানি না।

হারাব কেন চাচা। আমাকে কী ভেবেছেন!

শোন, কিচ্ছু ভাবিনি। তোর ভালর জন্যই বলছি। কেউ তোর কথা বুঝবে না। একটা লোকও বাংলা-ইংরাজি কিছু বোঝে না!

তার মানে।

লোকগুলো ইংরাজি জানে না। হাতেব ইশাবায় কথা বলতে হবে। পারবি। তুইও বোবা, তাবাও বোবা। ভাষা না জানলে এটা হতেই পারে।

দূর থেকেই মেঘমালা ভেসে ওঠে আকাশের গায, বুঝি সামনেই বন্দর। প্রথমে দিগন্ত রেখায় এক টুকরো মেঘ ভেসে থাকে তারপব জাহাজ যত নিকটবর্তী হয় ধীরে ধীরে মেঘ থেকে যেন বৃষ্টির ফোঁটা আলাদা হবার মতো—বোঝা যায় ঘরবাড়ি, বোঝা যায় জেটি, বোঝা যায় জাহাজ নোঙর করে আছে। প্রথমে মাস্তুল, পবে চিমনি, আরও পরে মানুষজন।

রাতের বেলাতে বন্দরে জাহাজগুলো আলোব মালা পরে থাকে—ঢেউ ওঠে নামে, জাহাজ ওঠা-নামা করে— আমরা টুইনডেকে শুধু দাঁড়িয়ে থাকি। ওয়াচ না থাকলে, সারা সকাল, অথবা দুপুর এমন কী গভীর রাতেও উঠে যাই উপরে। সামনে ডাঙা। জাহাজিদের কাছে এর চেয়ে বড় সুখবর কিছু নেই।

সারাক্ষণ জাহাজের আফটারপিকে, খোলাডেকে, নয় ফল্কার উপর বসে থাকা, তাসের আড্ডা। কখনও, কেউ কেউ কোরান পাঠও করেন। যে যার মত ডাঙার প্রত্যাশায় বসে থাকে।

আমারও মন আনচান করে।

জাহাজ বাঁধাছাঁদা হলে সারেঙসাব বলেছিলেন, বসে থাকবি কেন। যা ঘুরে আয়। মন হালকা হবে।

আপনি যে বললেন, কথা বোঝে না কেউ।

বেশি দূরে যাস না। দেবনাথ, বনার্জিরে নিযে যা। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ডাঙায পা বাখলে জাহাজিদেব আয়ু বাড়ে।

ডাঙায় পা বাখলে জাহাজিদের আয়ু বাড়ে এটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। জাহাজ কলকাতা থেকে ছাড়ার পর কী যে ঝড়-ঝঞ্ঝা, সমুদ্র উথাল পাতাল, কলার খোলের মতো বে অফ বেঙ্গলে জাহাজের পিচিং—তারপর কী অমানুষিক কষ্ট, চারঘণ্টার ওয়াচ শেষ করতে পাঁচ ঘণ্টা লেগে যায়, কাজ শেষ করতে পারি না—কয়লা টেনে ফেলছি 'সুটে', আর হুড়হুড় করে নেমে যাচ্ছে। জাহাজের দুলুনিতে মাথা তুলতে পারছি না। তবু 'সুটের' মুখের দিকে সতর্ক নজর। কারণ মুখ থেকে কয়লা নেমে গেলেই, স্টোকহলডে হাইহাই শুরু হয়ে যায়। তিনটি বয়লার কেবল কয়লা গিলছে। স্টিম পড়ে যাচ্ছে। টন টন কয়লা পুড়িয়েও স্টিম ধরে রাখা যাচ্ছে না। ঝড়ের দরিয়ায়, আমার মতো পযলা সফরের জাহাজির যে প্রাণান্ত হবে যেন এটা প্রথমে টের পেয়েছিলেন সারেঙসাব।

কিছুতেই তিনি সঙ্গে নিতে রাজি না।

জাহাজ পাচ্ছিলাম না।

হাতে 'সি ডি সি' নিয়ে রোজ শিপিংঅফিসে 'মাস্তারে' দাঁড়াচ্ছি। জাহাজ আসছে, ক্ল্যান লাইন, সিটি লাইন, বি আই কোম্পানির জাহাজ। জাহাজের সফর সেরে ফেরা জাহাজিরা নেমে যাচ্ছে। নতুন জাহাজি রিক্রুট হচ্ছে। আমিও সেই আশায মাস্তারে দাঁড়াচ্ছি রোজ। জাহাজের কাপ্তান আমার চোখ মুখ দেখছে। 'নলি' দেখছে। সমুদ্র সফরের কোনও অভিজ্ঞতা নেই। শরীরে বামুনের রক্ত। কিংবা শরীর শক্ত কিংবা ঋজু নয়, যে জন্যই হোক, বুড়ো কাপ্তান কিংবা যুবা চিফ ইঞ্জিনিয়ার কারও আমাকে পছন্দ না—পারবে না, ভাল করে দাড়ি-গোঁফ ওঠেনি ছেলের, সে আব কতটা কাজ পারবে। বমি টমি কবে অসুস্থ হয়ে পালাবার জন্য মবিয়া হয়ে উঠবে। এমনও ভাবতে পারে। যাই হোক বোজ মাস্তাব

দেওয়াই সার যখন, এবং মাসখানেক ধরে জাহাজ ধরার আশায় শিপিং অফিসে যাচ্ছি, বুড়ো মানুষটা লক্ষ্য করে থাকতে পারেন।

তিনিই একদিন ক্যান্টিনে ডাকলেন, 'এই যে ব্যাডা রোজ আইসা লাভডা কি। পারবা না। জাহাজের মার মার কাট কাট সহ্য করতে পারবা না। দরিয়ায় পানি সহ্য হইব না। কেডা তোমারে বুদ্ধি দিছে জাহাজে যাইতে।

কী বলি, বুদ্ধি যে কারও নয় বুদ্ধিটা যে আমারই এবং উদ্বাস্তু পরিবারটি এ-দেশে এসে জলে পড়ে যাবার পর, আমিই যে একমাত্র বাবার সক্ষম পুত্র। তার কাজ বসে থাকা নয়, যা হয় করে কিছু উপার্জন করা এ-সব একে একে তিনি জানতে পারলেন, বলেছিলেন, করবি। জাহাজে উঠলে না-পাক হয়ে যাবি। না-পাক অর্থ কী পরে বুঝেছিলাম। পাক কথার অর্থ পবিত্র, না-পাক মানে অপবিত্র।

তিনি আরও বলেছিলেন, 'তোর বয়সটা ভাল না।'

আমি তাঁর পাশে বসে থাকতাম। জাহাজের নানাবিধ গল্প বলতেন। বলতেন তাঁরা চার পুরুষের জাহাজি। তাঁরা বাঁধা ধরা সিটি লাইনের সারেঙ। তিনি নিজেও আমার বয়সে জাহাজে উঠে এসেছিলেন।

এবং তিনি যখন বুঝতে পারলেন, আমি নাছোড়বান্দা তখন একদিন বলেই ফেললেন, ঠিক আছে আমার জাহাজ আসছে। ওতে যাবি। বলে কিছুক্ষণ চুপচাপ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

তারপর কী ভেবে বলেছিলেন, 'জাহাজটা কয়লার জাহাজ। ধকল খুব। পারবি?'

আমার তখন এক কথা, পারব।

ওয়াচে তিন টন কয়লা খায় কসবিটা।

ওয়াচ অর্থাৎ চার ঘণ্টায় তিনটন কয়লা খায়। কসবিটা কে বুঝতে অবশ্য কষ্ট হয়নি—আসলে জাহাজটিকেই তিনি হয়তো কসবি বলেছেন। কসবি কথাটা মন্দ কথা। এটাও বুঝেছিলাম। জাহাজটাকে তিনি কখনও ইবলিশের বাচ্চা বলে গাল পাড়তেন। যেন জাহাজ না, একটা আস্ত শয়তানের বাচ্চা। এবং দুজন মাত্র সারেঙ আছে, যারা এই শয়তানের বাচ্চার মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে পারে।

এমন একটা জাহাজে তিনি আমাকে নিয়ে উঠতে অবশ্য শেষ পর্যন্ত রাজি হলেও, মুখে তার প্রায়ই দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠতে দেখতাম। জাহাজিদের ওপর-ওয়ালা বলতে আসানুল্লা। তাঁর সুপারিস থাকলে জাহাজ পেতে অসুবিধা হয় না। শিপিং অফিসে মাসখানেক যাতায়াত করেই তা টের পেয়েছিলাম।

যেদিন জাহাজ এল, তিনি ডেকে বললেন, ভেবে দ্যাখ, যাবি কি না। পরে দোষ দিতে পারবি না।

বললাম তো পারব। আমি নিজের ওপর কিছুতেই আস্থা হারাতে রাজি না।

তিনি আমাকে বলেছিলেন, লরঝরে জাহাজ। সারাদিন ঠায় খাটুনি। বন্দরে গেলেও রেহাই পাবি না। স্মোকবক্স পরিষ্কার করতে জান কয়লা হয়ে যাবে।

তাঁর উপর মাঝে মাঝে তখন থেকেই আমি বিরক্ত। বড় বেশি ভাবনা। আমি তার কে, এমন মনে হত। এই যে তিনি বুয়েন্সএয়ার্স বন্দর ধরার আগে বললেন, যাবি। বের হবি। না বের হলে চলবে কেন। ডাঙায় নামলে জাহাজিদের আয়ু বাড়ে—হাড়ে হাড়ে এটা টের পেয়েছি জাহাজে থেকে। দিনের পর রাত, রাতের পর দিন, শুধু জল আর জল। নীল আকাশ। সমুদ্রে ঝড় থাকুক, সাইক্লোন থাকুক, ইনজিন চালু রাখতেই হবে। চালু রাখতে না পারলেই মরণ। কয়লা টেনে 'সুটে' ফেললে ফায়ারম্যানদের কাজ শুরু। চকাচক বেলচায় কয়লা তুলে মারছে। ফার্নেসডোর খুলে দিলেই আগুনের হলকায় মুখ লাল। কয়লা মেরে, র‍্যাগ নিয়ে টেনে, কয়লা উলটে-পালটে আঁচ তোলা। এয়ারভালভ খুলে দিলে হাওয়ায় আগুন আরও তখন ঝলসে ওঠে। কেবল বেলচায় কয়লা হাকড়ানো—তিনটে বয়লার, তিনটে করে ফার্নেস, বয়লারে, কয়লা খাচ্ছে তো খাচ্ছেই। আর পোর্টসাইডের ক্রশ বাঙ্কারে টানা চারঘণ্টা আমার কাজ। লম্প জ্বালিয়ে কোনও প্রাচীন গুহাবাসীর মতো অস্পষ্ট অন্ধকারে টানা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কয়লা ভরছি গাড়িতে, সুটে এনে ফেলছি। বয়লার থেকে ছাই টেনে ফেললে, জল দিয়ে নেভাচ্ছি—অ্যাশরিজেকটারে আবার ছাই তুলে স্টোকহোলড পরিষ্কার করে দিতে হচ্ছে। ওয়াচ শেষে বিধ্বস্ত।

সিঁড়ি ধরে যে বোট-ডেকে উঠব তার পর্যন্ত ক্ষমতা থাকত না।

এবং এভাবেই বুঝেছিলাম, আসানুল্লা সারেঙ আমার ভাল চান। কয়লা টানতে টানতে বমি করছি হড় হড় করে খবর পেয়ে জাহাজের বাঙ্কারে ছুটে এসেছেন, দাঁড়িয়ে থেকেছেন, কখনও নুনজল এগিয়ে দিয়েছেন—নুন জল খেলে সি-সিকনেস কমে, এটা জানি, কিন্তু তিনি অন্য কাউকে ডেকে দেননি। বলেন নি, ঠিক আছে তুই যা। এনামুলকে পাঠাচ্ছি।

কোল-বয আমরা মাত্র সাতজন।

দু-জন করে আমাদের ওয়াচ।

পোর্ট-সাইডের বাঙ্কারে মনু অর্থাৎ মৈনুদ্দিন। আসলে সে আমার ওয়াচের জুরিদার।

চারঘণ্টার ওয়াচে যতই আমি বিপাকে পড়ি না কেন, সারেঙ-সাব অবিচল।

তার এক কথা, সব জাহাজে কি আমি থাকব। অভ্যাস হোক। তিনি চাইতেন, জাহাজে যখন উঠেই পড়েছি, তখন জাহাজের ধকল আমাকে মেনে নিতেই হবে।

অবশ্য জানতাম না, কার পরামর্শে মনু এসে আমার বাঙ্কারে ঢুকে বলত, আরে বনার্জী সুট যে খালি হয়ে গেছে।

আমি তখন হয়তো ক্লান্ত। অবসন্ন। লোহার বাঙ্কারে বেলচা মাথায় দিয়ে শুযে আছি। নীল জামা প্যান্ট কয়লার ভুসোয় মাখা-মাখি। মুখ ভুসো কালিতে কযলা খাদের মজুরের মতো। কয়লা টানা ছাড়া জীবনে যেন আর কোনও কাজ নেই আমার। এ জন্য জন্মেছি, এ জন্য বড় হয়েছি—ভাবলে তখন বিপন্ন বোধ করতাম, মাঝে মাঝে নিজের উপব আস্থা হারালেই বেলচা ছুঁড়ে মারতাম কয়লাব উপর। তারপর চিৎপাত হয়ে পড়ে থাকলেই মনু এসে কয়লা টেনে দিত আমার হয়ে।

আমার খারাপ লাগত। উঠতাম। বলতাম, তুই যা। তোর 'সুট' কে ভরবে!

সে বলত, পয়লা সফরে পারবি কেন! পেটে তোর বিদ্যার জাহাজ, একাজ তোকে দিয়ে হয়!

এটা ঠিক, জাহাজিবা প্রায় সবাই নিরক্ষর। তাবা দেশে খত পাঠাবার সময লেখাপড়া জানা আদমির খুবই কদব দেয়। দু' এক-জন চিঠি লেখার মতো বিদ্যা পেটে নিয়ে উঠলে, জাহাজিদেব কাছে সে মাস্টার। তার প্রতি আলাদা সম্মান। আমি এ-জন্য সবার কাছেই সমাদর পেয়ে থাকি। ডেক আর ইনজিন জাহাজি মিলে ষাট পঁয়ষট্টি জন জাহাজে উঠে এসেছিলাম—অনেক মুখ হারিয়ে গেছে কিন্তু বড় টিন্ডাল, ছোট টিন্ডাল, সারেঙসাব কিংবা আমাদের দেবনাথ, অমিয, হীরেনের কথা মনে কবতে পারি। মনু আমার জুরিদার—তার কথাও মাঝে মাঝে ভাবি। এতদিন পর কে কোথায় আছে জানি না। কারও খোঁজও রাখি না।

তবে ডাঙা যে জাহাজিদের পরমায়ু বাড়ায় এটা প্রথম বুঝেছিলাম কলম্বো বন্দবে। বাতেব বেলায নোঙর ফেলল, ভোর রাতে নোঙর তুলে ফেলা হল। প্রায় দশ দিন এক টানা জাহাজে থেকে ডাঙাব জন্য পাগল হয়ে আছি। আমরা জাহাজিরা ডাঙা দেখার জন্য সারারাত জেগেছিলাম ডেকে। একমাত্র প্রাচীন নাবিকদের কাছে ডাঙা এবং জল যেন সমান। কিন্তু যারা পাঁচ সাত কিংবা দশ সফবেব জাহাজি তাদের কাছেও ডাঙা পরমায়ু বাড়ায়। তা না হলে কে সারারাত জেগে ডেকেব উপর বসে থাকে। কলম্বো থেকে জাহাজে রসদ তোলা হয়েছিল।

জাহাজ নোঙর করা। নামার সুযোগ থাকলেও নিষেধ—কারণ ভোররাতে জাহাজ ছেড়ে দেবে। শুধু বন্দরের দূরবর্তী আলো এবং কখনও কোথাও লোহার পাত পড়ার শব্দ অথবা জাহাজ ছেড়ে যাবার সময় সাইরেন ছাড়া আর যা শব্দমালা টের পেয়েছি—সে শুধু সমুদ্রের জল এবং তার কল কল আওয়াজ। কিংবা কিছু সমুদ্রপাখিব উড়ে যাওয়া, কখনও তারা ডানা মেলে মাস্তুলে বসে থাকলে বাড়ির জন্য মন কি যে খারাপ করত!

বুয়েনএয়ার্স বন্দরে ঢোকার সময় এটা আরও বেশি টের পাচ্ছি। আফ্রিকার ডারবান কেপটাউন বন্দরে স্রেফ পাঁচদিনের বিরতি।

সেখানে পাটের গাঁট নামানো হয়েছে। ডারবান বন্দরে জাহাজ ভিড়লে আসানুল্লা এসে আমার ফোকসালে উঁকি দিয়ে বলেছিলেন, 'বনর্জী উপরে আয়—কথা আছে।'

তিনি কখনও তার ঘরে কাউকে ঢুকতে দিতেন না। এমন কি আমাকেও না। কেন এটা করতেন বুঝতাম না। আমাকে উপরে ডেকে নিয়ে আফটার পিকের পেছনে গেলেন। রেলিঙে ভর করে দাঁড়ালেন।

তিনি বেশ গুম হয়েছিলেন। কথা বলছিলেন না। আমি বললাম, 'কী হল! ডাকলেন কেন!'

তুই আবার ছোট টিন্ডালের সঙ্গে মিশছিলি!

মিশলে কী হয়।

বড় টিন্ডাল যে তার সুনজরে নেই, সেটা যেমন বুঝেছিলাম কার্ডিফ বন্দরে গিয়ে, তেমনি ছোট টিন্ডালও যে তার কোপে পড়ে গেছে, সেটা বুঝেছিলাম ডারবান বন্দরেই।

তা বলবেন তো, কথা বলছেন না কেন। ধুস, বুড়োর যত সব বাতিক। আমি নষ্ট হয়ে না যাই এই এক ভিমরতিতে তিনি ভুগছেন। এ জন্য মাঝে মাঝেই ক্ষেপে যেতাম।

শোন, তিনি মুখে সুপারি ফেলে বললেন, 'জায়গাটা ভাল না। রাতে বের হোস না। ছোট টিন্ডালের ঘর আছে, এখানটায়। ওর পাল্লায় পড়ে গোল্লায় যাস না।

ঠিক আছে যাব না!

না তোকে যেতে বারণ করছি না। বন্দরের কাছাকাছি থাকবি। ওদিকটায় মাছ ধরতে পারিস। আমার ছিপ নিয়ে যা, বসে না থেকে দু-চারটে ম্যাকরল মাছ ধরে আনলে জাহাজে বেশ ভোজ লাগানো যাবে।

আসলে বুঝি, তিনি আমাকে মাছের নেশায় ফেলে দিয়ে ডারবান বন্দরটা পার করে নিয়ে যেতে চান।

এটা আমার মনে আছে জাহাজের খাওয়া বড় একঘেয়ে ছিল।

সকালে চর্বি ভাজা রুটি।

দুপুরে ডাল গোস্ত ভাত।

বিকালে চর্বি ভাজা রুটি।

রাতে আবার ডাল, আলুভাজা, গোস্ত।

এই ছিল নিত্যদিনের খাবার। বরফঘরের বাসি পচা মাংস বিস্বাদ, কিন্তু এমন যমের ক্ষিধা পেত শুধু ডাল দিয়েই সব ভাত তোলা হয়ে যেত।

কাজেই জাহাজিরা বন্দর পেলে, মাছ শিকারেও যায়। যেমন আসানুল্লা সাব জাহাজে ওঠার সময় দুটো আলাদা কাঠের পেটি তুলে এনেছিলেন। একটা পেটিতে জাল তৈরি করার সুতো, আর একটা পেটিতে কয়েক রকমের ছিপ। ছিপগুলো ছিল, মাছ ধরার জন্য এবং তিনি বন্দরে গেলেই ছিপ ফেলে জাহাজের আফটার পিকে বসে থাকতেন। কখনও ছোট ছিপ। কোন্ বন্দরে কি ছিপ ফেললে, কোন্ মাছ পাওয়া যায় তিনি তা এত জানতেন যে আমরা অবাক হয়ে যেতাম।

জাহাজে ওঠার পর প্রথম ডারবান বন্দরে টের পেলাম, তিনি আমাকে হুকুম করছেন, 'বনার্জী, যা বাটলারের কাছ থাইকা, লিষ্ঠি মিলাইয়া জিনিসগুলি নিয়া আয়।'

বাটলার হাসান খুবই সেয়ানা লোক সে জানে, ডেক সারেঙ আর ইনজিন সারেঙকে হাতে রাখতে পারলে, জাহাজিদের রেশন মারতে পারবে। গোস্ত ওজনে চুরি করতে পারবে, চিনি, টোবাকো সব চুরি করা সম্ভব শুধু দুই সারেঙসাব হাতে থাকলে। এ-জন্য ইনামও দেয়, যেমন জাহাজের অফিসারদের রেশনেই শুধু ডিম আছে—ডিম নয় শুধু, এক এলাহি ব্যবস্থা খাদ্য তালিকার। ইংলিশ মেনু। সকালে ওরা ব্রেকফাস্ট করার পর প্রায়ই দেখতাম পকেটে আপেল নিয়ে বের হয়ে আসত ডেকে। কাজ করত আর আপেলে কামড় বসাত।

তাদের খাওয়াদাওয়ার বহর দেখলে আমাদের জিভে জল আসত। চিফ কুক, সেকেন্ড কুক আট দশ জন অফিসারের লানচ ডিনার মেনু মাফিক তৈরি করতে গলদঘর্ম। আর আমাদের ইনজিন ভাণ্ডারী, ডেক ভাণ্ডারী এক হাতে সব সামলায়।

মনে আছে অফিসারদের মধ্যে একজনও বাঙালি ছিলেন না। এমন কি ভারতীয়ও নয়। সিটি

লাইনের জাহাজে অফিসারেরা হোম থেকে উঠতেন। পরে জেনেছিলাম, অধিকাংশই ওয়েলসের বাসিন্দা।

অফিসারদের হরেক রকম খাদ্য তালিকার বহর এবং আমাদের একঘেয়ে খাবার নানা কারণে জাহাজিদের মনে ঈর্ষার উদ্রেক করত। আসানুল্লাই পারতেন সব সামলাতে। এবং এ জন্য আসানুল্লাকে হাতে রাখার নৈতিক দায়িত্ব বাটলারের। ডেক সারেঙ, ইনজিন সারেঙ অফিসারদের মেনু থেকে ফল ডিম আলাদা করে পেতেন। এ ছাড়াও যখনকার যা।

সুতরাং ডারবান বন্দরে আসানুল্লা সাব আমার হাতে যে লিস্ট ধরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, যা নিয়ে আয়, সেটা নিশ্চয়ই হরেক কিসিমের খাবার—যেমন কিসমিস লবঙ্গ জায়ফল। এগুলি কখনও যদি কোনও অনুষ্ঠান হত, যেমন ঈদের পরবে বিরিয়ানি করার জন্য পাওয়া যেত। আমার ধারণা ছিল তেমনই কিছু। কিন্তু আশ্চর্য আসানুল্লা সাব ও-সব দিয়ে একসঙ্গে আদা এবং চিনির গাদ মিশিয়ে জাফরান দিয়ে মাছের চার তৈরি করে বলেছিলেন, বসে যা। পাঙ্গাস মাছ গাঁথতে পারিস কি না দ্যাখ।

বন্দরের জলে, হরেক রকমের সামুদ্রিক মাছের আড্ডা থাকে। কারণ জাহাজের উচ্ছিষ্ট খাবার জলেই ফেলে দেওয়া হয়। গভীর সমুদ্র থেকে মাছ যেমন উঠে আসে, তেমনি ভাল মাছ শিকারী হলে বড় দু-চারটে গলদা চিংড়িও কপালে মিলে যেতে পারে। এক ঘেয়ে খাওয়া, বৈচিত্র খোঁজাই স্বাভাবিক। তা-ছাড়া ভাতখেকো বাঙালির মাছ যে কি প্রিয় সবারই জানা। বন্দরে জাহাজ ভিড়লেই বঁড়শি নিয়ে কেউ কেউ বসে থাকে। আমিও বসেছিলাম আসানুল্লা চাচার পাশে। মাছ ভিড়লই না।

কাহাতক ভাল্লাগে। খোঁট দিচ্ছি, উঠছে না। জাহাজ থেকে বন্ধু নেমে যাচ্ছে দেখেই মনটা দমে গেল।

বলেছিলাম, চাচা, বের হচ্ছি।

তিনি বোধহয় বুঝতে পারছিলেন মাছ শিকারের লোভ দেখিয়ে আমাকে আর আটকে রাখা যাবে না। শুধু বললেন, যা। তবে একা বের হোস না। পারিস তো মাইজলা সাবের লগ ধরার চেষ্টা কর।

মাইজলা সাব অর্থাৎ জাহাজের সেকেন্ড অফিসার খুবই রসিক মানুষ। জাহাজিদের নেটিভ বলে ঘেন্না পেত্তা করে না। বরং হাই হুই করে একে ডাকে, ওকে ডাকে। দু-একটা হিন্দি বাতও বলতে পারে। যেমন খানা মিলে গা! ইন্ডিয়ান কারি বহুত আচ্ছা।

অবশ্য সে মাঝে মাঝে আমাদের গ্যালিতে এসে প্রায় চুরি করে গোস্ত ভাত খেতে মজা পেত। তার দেশোয়ালি ব্রাদার অফিসারদের কাছে ধরা পড়ে না যায়, এই ভেবে সবসময় সতর্ক।

হ্যালো বাবা, প্লিজ লুক দেয়ার।

অর্থাৎ সে আঙুল তুলে কেবিনে ঢোকার রাস্তাটার দিকে নজর রাখতে বলত। কেউ বের হয়ে যদি এদিকে চলেই আসে, তবে মুখ মুছে, প্যান্টে হাত মুছে শিস দিতে দিতে নেমে যাবে। কারণ সে জানত, কাপ্তানের কানে খবর পৌঁছে গেলে আস্ত রাখবেন না। ন্যাস্টিম্যান বলে গালাগালি করবেন।

মনে আছে সে আমাকে বাবা বলেই ডাকত। কারণ এই সম্বোধনেরও একটা ইতিহাস আছে। কলকাতা থেকে জাহাজ ছাড়ার সময়ই আমার সঙ্গে তার কিছুটা সখ্যতা গড়ে তোলার চেষ্টা ছিল। সবার নাম জানারও কৌতূহল আছে। আমার নাম জিজ্ঞেস করতেই বন্ধু বলেছিল, সাহেব হি ইজ বাবা। হিজ নেম ইজ বাবা। অর্থাৎ আমার নাম বাবা। সারা সফরই সে আমাকে বাবা বলে ডাকত। খোঁজাখুঁজি করত, হোয়ার ইজ মাই বাবা?

সেই বাবা যখন ডারবানে জাহাজ ভিড়তেই নেমে পড়ার জন্য আকুল এবং আমি কোনও ফাঁদে পড়ে না যাই বন্দরে সেই আতঙ্কে আসানুল্লা সাব যখন কাবু তখন আমার প্রিয় পুত্র অর্থাৎ আমারই বাবার বয়সী মানুষটির সঙ্গে যাবার কথা শুনে এক পায়ে খাড়া হয়ে গেছিলাম।

জাহাজ থেকে নামার সময় আসানুল্লা সাব বললেন, সাহেব ওকে কিন্তু ফেলে এস না।

নো নো। হি মাস্ট কাম ব্যাক। ডোন্ট বি ওরি।

মনে আছে আমার, ডারবানে তখন হাড় কাঁপানো শীত। এত শীত যে আমরা দুজনই ওভারকোট পরে বের হয়েছিলাম।

বন্দর থেকে জেটি এলাকা পার হয়ে রাস্তায় পড়তেই ছিমছাম ঘরবাড়ি। পার্ক। দৈত্যের মতো সব

নিগ্রো পুরুষ রমণী। কী পুরুষ, কী রমণী কারও মাথায় প্রায় চুল নেই বললেই হয়। মনে হয় টাক মাথা। কোঁকড়ানো চুল থাকলেও ঘন নয়, খুবই পাতলা। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রোয়া ধান পাতার মতো কেউ যেন চুল টাকের যত্র তত্র পুঁতে রেখেছে। সৌখিন নিগ্রো মেয়েদের মাথায় সবারই স্কার্ফ বাঁধা। শীতের জন্যও হতে পারে। আবার টাক আবৃত করার জন্যও হতে পারে।

এতকাল পর অবশ্য মনে করতে পারছি না, প্রথম দিনই কি না, দু-পাঁচদিন পরে তিন নিগ্রো ছিনতাইকারীর হাতে পড়েছিলাম। মনে আছে ট্রলি বাসে চেপে ইন্ডিয়ান মার্কেটের দিকে যাচ্ছিলাম। যাবার সময় দু-পাশের পার্কে দেখেছিলাম লেখা আছে, নাই ইয়োরোপিয়ান। এগুলো লেখা থাকে কেন পরে জেনেছিলাম। ভাষাটা যে ওলন্দাজ ভাষা তাও সেকেন্ড অফিসারই বলে দিয়েছিলেন। পার্কে, বাসে সর্বত্র এ ধরনের লেখা দেখে ঠিক করে নিতে হবে কার কোথার জায়গা। কে কোন্ পার্কে ঢুকতে পারে, কে ট্রলি বাসের নিচের বা উপরের তলায় উঠে যাবে।

বর্ণবৈষম্য কী প্রবল ক'দিন বন্দরে ঘুরেই টের পেয়েছিলাম।

সাঁঝবেলায় আমরা বন্দরে ঢুকব বলে শর্টকাট করতে যাচ্ছি—এদিকটায় কিছু বস্তি অঞ্চল, কালো মানুষের বসবাস, নিজের সঙ্গে কিছুটা যেন আত্মীয়তাও অনুভব করছিলাম—কারণ এ দেশে আমি তাদের সমগোত্রীয়, কাজেই আমার ভয়ডর কম ছিল।

সেকেন্ড অফিসার বললেন, এদিকটায় না ঢুকলেই হত। তার চেয়ে লিউস্ট্রিট ধরে চল যাই।

আমি ঠিক বুঝলাম না, কেন এ কথা তিনি বলছেন। এতদিন কোনও উপদ্রবে পড়িনি। আর তখনই তিনজন নিগ্রো যুবতী। তিনজনই আমাদের চেয়ে উঁচু এবং লম্বা। বিশাল এই তিন যুবতী আমাদের ওভারকোট ধরে বলেছিল, হাউ মুচ।

তার মানে হাউ মাচ। তার মানে কত দাম।

আমরা জানতাম, এই সব বন্দর শহরে নাবিকরা পুরানো কোট ওভারকোট কিংবা গরম জামাকাপড় বিক্রি করে টু পাইস কামায়। সেকেন্ড অফিসার এমন তিন যুবতীকে পেয়ে খুব খুশি। সে প্রায় দেখলাম মজেই যাচ্ছিল। দু-একটা ফাজিল কথাবার্তাও হয়ে গেল। আর ঠিক সে সময়ে দুই যুবতী আমাদের এমন আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল যে আমরা বুরবকের মতো কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। সাঁঝবেলায় রাস্তার উপর—এটা তাদের কোনও আদব কায়দা কিনা অন্তরঙ্গ হবার তাও বুঝেছিলাম না, এই যখন অবস্থা তখন তৃতীয় যুবতী হাতের ওভারকোট দুটো টেনে নিয়ে অন্ধকারে উধাও হয়ে গেল। আর বাকি দুজনও সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে পালাল।

আমি তটস্থ হয়ে পড়েছিলাম। এমনিতেই বিদেশ বিভুঁই-এ কোনও অপরিচিত শহরে একা বের হতে একটা অস্বস্তি আছে। দল বেঁধে বের হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। দুজন আমরা তখন ছুটে পালাচ্ছি। কারণ হাতঘড়ি খোয়া যায়নি—এটাও কম ভাগ্যের কথা না। বন্দরে ঢুকে সেকেন্ড অফিসার বললেন, বাবা, প্লিজ ডোন্ট ডিসক্লোজ ইট টু এনিবডি।

আসলে সেকেন্ড অফিসার চাননি, সবার কাছে বোকা বনতে। জাহাজে কে কতভাবে যে ঠকে আসে কিনার থেকে! ডাঙার এমনই মোহ। এবং জাহাজিরাও কেমন অন্ধের মতো আচরণ করে ফেলে যুবতী নারীর সামান্য সঙ্গ পেলে।

এরপর আর আমার ডারবান বন্দরে বের হওয়া হয়ে ওঠেনি। আসানুল্লা সাবের পাশে বসে মাছ ধরায় মনোযোগ দিয়ে ফেললাম। একদিন দুটো বেশ বড় সাইজের গলদা চিংড়ি গেঁথে ফেললাম। ওভারকোট হারিয়ে যে কষ্টে ভুগছিলাম, দুটো চিংড়ি শিকারে তার কিছুটা লাঘব হয়েছিল এখনও তা মনে করতে পারি। তবে বন্দর ছাড়ার আগে এক সকালে, একজন নিগ্রো এসে আমার ফোকসালে হাজির। তাকে আমি চিনি। জাহাজ থেকে মাল খালাসের সময় এজেন্ট অফিসের হয়ে শ্রমিকের কাজ করে গেছে। হাসি-খুশি মানুষ। ডেকে উঠেই দু জ্যাব ভর্তি ভাত নিয়ে মুঠো করে খেত আর বলত ওয়ান ওয়াইফ নো গুড, টু ওয়াইভস গুড। থ্রি ওয়াইভস ভেরি গুড। সে আমার ওভারকোট ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিল ডোন্ট মাইন্ড, আই হ্যাভ থ্রি ওয়াইভস।

তবে আমি কেন যে আসানুল্লা সাবের উপর মাঝে মাঝে ক্ষেপে যেতাম বুঝতে পারতাম না। আর

যারা ইনজিন জাহাজি আছে, তাদের উপর খবরদারি করার যেন বিন্দুমাত্র তাঁর ইচ্ছে নেই। কাজ কাম শেষে কে কোথায় যায়, কোথায় রাত কাটায় কিছুই জানতে চান না। জানার নিয়মও নয়।

অথচ আমার বেলায় তাঁর ষোল আনা মেজাজ।—এত রাত করে ফিরলি! কার সঙ্গে গেছিলি! কোথায় গেছিলি! কোথায় গেছিলি বল্! চুপ করে আছিস কেন।

আসলে কখনও কখনও রাত হয়ে যেত। দু-চারদিন জাহাজি বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে নেশা করেও ফিরেছি। নেশা করলেই তিনি তার ফোকসালের দরজা বন্ধ করে দিতেন। রাতে খেতেন না। ভাণ্ডারী নিচে নেমে আমার ফোকসালে ঢুকে যেত, বলত, যান বনার্জী আসানুল্লা সাবের গোসা ভাঙান গিয়া। ক্যান যে খান, বেততামিজ হতে ভাল লাগে!

পরে কেন যে নিজেরই খারাপ লাগত—বাঙ্ক থেকে উঠে পড়তাম। সিঁড়ি ভেঙে ওপরের ফোকসালে যেতাম। আসানুল্লা সাব একা একটা ফোকসালে থাকেন। একটা কাঠের পেটি বাঙ্কের নিচে। একটা হুকা ঝোলানো বাঙ্কের কোনায়। একটা বড় এনামেলের হাঁড়ি দড়ি দিয়ে বাঁধা। এবং সেটা ছাদেব আংটায় ঝোলানো। তাতে রাব ভর্তি। তামাকের বস্তা আছে। বস্তা দিয়ে তামাক পাতা খুব যত্নের সঙ্গে জড়ানো। লকারে তার কী থাকে জানি না। আমি নেশা করে ফিরলে তাব সেদিন কোরান পাঠ শুরু হয়। যেন আমার গুনাহ তিনি কোরান পাঠ করে নষ্ট কবে দিতে চান। নামাজ শেষ করে দুলে দুলে পাঠ শুরু হবে, আর তখনই জাহাজে সবার যত চোটপাট আমার উপব।

আর তারা এসে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। কিংবা যার সঙ্গে যাই, সেও অপবাধী সাব্যস্ত হত। এমন হয়ে গেল শেষে কেউ আর আমাকে ডাঙায় সঙ্গে নিয়ে নামতে চাইত না।

তাদেরও দোষ নেই।

কারণ আসানুল্লা সাব আমার চেয়ে তাদের বেশি তড়পাতেন। হারামজাদা, বেয়াকুবের দল, নিজেরা জাহান্নামে গেছিস বলে, সেদিনের ছেলেটাকে নষ্ট করে দিচ্ছিস।

বুয়েনএয়ার্স বন্দরেও সেই ঘটনা। আমি যেতে চাইলে কেউ সঙ্গে নিতে চায় না।

আর তখন আসানুল্লা সাব নিজেই হন্তদণ্ড হয়ে উপবে উঠে আসতেন!—এই দেবনাথ—বনার্জীবে নিয়া যা!

দেবনাথও ছেড়ে কথা বলে না, দেখুন আসানুল্লা সাব, দেরি টেরি হলে তেড়ে আসতে পারবেন না।

যা, তোরা মাথা গরম করিস কেন যে বুঝি না। যা। বনার্জীরে নিয়া যা। ডাঙায় ঘুবে বেড়াক। মনটা পরিষ্কার থাকব।

দেবনাথ বলত, আমি বারণ করেছি! আপনার তড়পানি কে এত সহ্য করে!

যা বাবা। রাগ করিস না, বনার্জীরে নিয়া যা। বনার্জী বসে থাকলি ক্যান। যা।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলতেন, কিরে যাবি না! জাহাজে বসে বিকালটা কাটাবি কী কবে! একা একা ভাল লাগবে!

শবহটা বড় বেশি সাজানো গোছানো। আমাদের জাহাজ জেটিতে বাঁধলে টের পেলাম, সামনে গাছের সারি। প্রকাণ্ড বড় বড় গাছ। গাছগুলো আমার চেনা নয়। ওক গাছ-টাছ হবে। নাও হতে পারে। প্রায় শ-খানেক গাছ সার দিয়ে লাগানো। গাছের নিচে সব কিনারার লোক এসে জড়ো হয়েছে। জাহাজ থেকে নামলেই শহরে ঢুকে যাওয়া যায়। লেন্দ্রোঅ্যালন জায়গাটা বেশি দূরও নয়। শহরের জাঁকজমক এলাকা ওটাই। জেটি থেকে আধ কিলোমিটারও রাস্তা হবে না। অনেক বন্দরে গেছি।, কিন্তু একেবারে বন্দর বুকে নিয়ে একটা শহর গড়ে উঠেছে, এটা আর কোথাও দেখিনি। কোনও কাস্টম চেকিং নেই। জাহাজ থেকে নেমে দু-পা হেঁটে গেলেই শহর। কার্নিভেল। আর ফুলের সব দোকান। ফলের দোকান। যখন খুশি নেমে যাওয়া যায়—যখন খুশি ফেরা যায়। আর যুবতীরা এক একজন যেন মিষ্টি আপেল হাতে নিয়ে হাঁটছে। আপেলের মতই গায়ের রঙ। এবং সরস, কী নারী কী পুরুষ সবাই কী সুন্দর দেখতে! চোখ নীল, চুল নীলাভ, গায়ের রঙ গোলাপি এবং রঙ বেরঙের স্কার্ট, জ্যাকেট, দামি গাড়ি। বাড়ির পাশে ফুলের বাগান, তকতকে ঝকঝকে।

এই শহরে নেমে না যেতে পারলে আমি মরেই যাব। হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে বলেছিলাম, আমি একাই যাব। দেবনাথদা তোমরা যাও।

আসানুল্লা সাব যেন জলে পড়ে গেছিলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, একা যাবি! তোর এত সাহস! পরী-হুরির দেশ। বাইন্দা রাখলে আমি কিছু জানি না।

আসানুল্লাসাব কখনও তাঁর দেশের ভাষায় কথা বলেন। রাগ কিংবা ক্ষোভ অভিমান হলেই মাতৃভাষা বের হয়ে পড়ে। তিনি গুম মেরে গেলে বলেছিলাম—ওরা নেবে কেন সঙ্গে বলুন! আমার জন্য ওদের তাড়াতাড়ি জাহাজে ফিরে আসতে হয়। কে আপনার ধমক সহ্য করবে।

দেবনাথ, বঙ্কু, অমিয় চলে যাচ্ছিল। আসানুল্লা সাব তাদের পেছনে ছুটছেন। আমি বসেছিলাম বিমর্ষ মুখে। আফটার-পিকের বেঞ্চিতে বসে দূরের সমুদ্র দেখছি। গাছগুলি পার হয়ে ছোট্ট মতো পার্কটা পার হয়ে গেলে আবার সমুদ্র। অথচ গাছপালার জন্য দূরের কিছু দেখাও যায় না। ইন্ডিয়া থেকে জাহাজ গেলে যারা পার্কে বেড়াতে আসে, তারা জাহাজে ওঠে, কিছু কেনাকাটাও করে। যেমন যারা পুরানো জাহাজি, যারা সিটি লাইনের জাহাজে সফর করেছে কয়েকবার, তারাই জানে, ময়ূরের পালক কিংবা কাঠের হাতি চড়া দামে বিক্রি করা যায়।

জাহাজটা মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য কলম্বো বন্দরে থেমেছিল।

নিচে নৌকার ভিড়। কিনারায় লোক কাঠের হাতি, কাঠের বুদ্ধমূর্তি কিংবা ময়ূরের পালকে তৈরি পাখা বিক্রি করতে চলে এসেছে নৌকায় করে। যারা জানে, তারা ঠিক কিনে নেয়! এতে যে দু-পয়সা কামানো যাবে বুয়েনস্‌-এয়ারস বন্দরে গেলে তারা তাও জানে। এবং সেইসব জাহাজিরাই আফটার-পিকে বেশ দোকান সাজিয়ে বসার মতো বসে গেছে। স্প্যানিস নারী পুরুষদের যে কোনও কারণেই হোক এই সব ময়ূরের পালক, কাঠের হাতি, কাঠের বুদ্ধ মূর্তির প্রতি বিশেষ আগ্রহ আছে টের পেলাম। জোড়ায় জোড়ায় উঠে আসছে। দর-দাম করে কিনে নিয়ে যাচ্ছে।

আমি এদের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসেছিলাম—আসানুল্লা সাব ফিরে এসেই ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছিলেন, ওরে বনার্জীরে দেখছ! গেল কোথায়! অ বনার্জী গেল কোথায় বাবা। যা। জামাকাপড় পালটে নে। সু বুরুশ করে নে। দেবনাথ কিনারায় অপেক্ষা করছে।

আসানুল্লা সাবের এই কাতর ডাক আমাকে খুবই বিচলিত করে তুলত। শেষ পর্যন্ত রাগ পুষে রাখতে পারতাম না। দৌড়ে টুইন-ডেক পার হয়ে গ্যাংওয়ে ধরে নেমে যেতাম—ডাকতাম, দেবেনাথদা দাঁড়াও। আমি আসছি।

গাছগুলি পার হলেই, শহরের বড় রাস্তা।

ওরা বড় রাস্তায় পড়ার জন্য হাঁটছিল।

যেদিকে তাকাই চোখ জুড়িয়ে যায়।

কোথাও একটা মেয়ে সাদা ফ্রক আর সাদা প্যান্ট পরে একটা টেনিস বল নিয়ে পাঁচিলে মারছে, আবার ফিরে আসছে বলটা আবার মারছে। শহরের মাথায় রোদ নেমে আসছে। এ-দেশের লোকদের কাছে এটা শীতকাল না বসন্তকাল আমরা ঠিক জানি না। আমাদের কাছে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার দেশ। কোট প্যান্ট, শালদরাজ কী নেই—তবু সমুদ্র থেকে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসে আমরা কুঁকড়ে থাকি। অথচ মেয়েটা একটা স্কার্ট আর ফ্রক গায়ে নিজের মনে পাঁচিলটার সঙ্গে খেলছে। রাস্তায় কোনও ভিড় নেই। ইতস্তত মানুষের হাঁটাহাঁটি। নর-নারীদের পোশাকেও বিশেষ বাহুল্য নেই। কটনের শার্ট, প্যান্ট পরে অনায়াসে ঘুরতে পারছে। আমরা পারছি না।

আমি যেখানে যা কিছু দেখি কেমন অবাক হয়ে যাই। নীলচে রঙের বব করা চুল, মুখ আপেলের মতো মসৃণ, শরীরে বোধ হয় আশ্চর্য সুবাস আছে। আমার বয়েসী এই মেয়েটা এখানে আছে ভাবতে কেমন অবাক লাগে।

ইচ্ছে হত কথা বলি।

কিন্তু সাহস হত না।

দেনাথদা ডাকলেন, এই তুই কিরে! কি দেখছিস! কোনও লাভ নেই।

সত্যি কোনও লাভ নেই। তবু দেখার জন্য মনের মধ্যে এমন টান জন্মায় কেন বুঝি না। ওদের পছন্দ হচ্ছিল না।—এই হাঁ করে কী দেখছিস! দেবনাথদা চিৎকার করে বলল, হারামজাদা কী দেখছ বুঝি না!

আসলে আমি কী দেখছিলাম, ওর স্তন! কারণ ভারী স্তন খেলতে গিয়ে দুলে উঠছিল—ওর থাই এত মসৃণ, যেন হাত দিলে মোমের মতো পিছলে যাবে।

শুধু পিছলে যাবে, না আরও কিছু, যেমন জল জঙ্গলের অন্তর্গত সেই নিদারুণ ভূমি—আমি কী তার আঁটো প্যান্টের ভিতর সেই আকস্মিক হতচ্ছাড়া তরুণকে খুঁজছিলাম। যার মধ্যে আছে অন্তহীন এক অন্তর্গত খেলা। কেমন যেচে বন্ধুত্ব করতে ইচ্ছে হচ্ছে। সে যদি খেলতে গিয়ে পড়ে যেত, তাকে তুলে দিতাম। তার এই নমনীয়তা আমাকে আকর্ষণ করতেই পারে।

আর তখনই সাদা বলটা মাথার উপর দিয়ে ফসকে গেল। আমি দৌড়ে গেলাম। বলটি কুড়িয়ে আবার তার কাছে। বলটি দিলে সে সামান্য হেসে কিছুটা জানু নত করে আমাব কাছে বোধহয় কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল।

আমি নড়ছিলাম না।

দেবনাথদার হুঙ্কার, মব বেটা। হারামজাদা তুমি শালা ঈশ্বরের পুত্র। কেউ তোমাকে কিছু বলতে পারে না। তোমার নিন্দা শুনলে আসানুল্লা সাব মাথা ঠিক রাখতে পারেন না!

কিরে যাবি?

এই যাচ্ছি দাদা।

রাস্তাগুলি এত চওড়া যে ইচ্ছে করলে যেন ফুটবলও খেলা যায়। এটা বন্দরে ঢোকার বাস্তা, গাড়ি-টাড়ি কম। আর তা-ছাড়া এই প্রশস্ত বাস্তায় ইচ্ছে করলেই বেগে গাড়ি চালানো যায় না। কারণ সামনে সমুদ্র। বিচের দিকে যাবা যায়, তারা এদিকটায় গাড়ি পার্ক করে যায়। পাশের মাঠে বেশ গাড়ির ভিড়।

আমি দাঁড়িয়ে আছি ওর থেকে প্রায় গজ দশেক দূরে। এইসব রাস্তাকেই বুলেভার্ড বলে কিনা জানি না। মাঝখানে গাছপালার সারি। কোনও গাছে হলুদ রঙের ফুল ফুটে আছে। সমুদ্রের হাওয়ায় ফুলের ওড়াউড়ি ছিল বেশ। কেন যে তরুণীকে ফেলে শহরের ভিতরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। কেন যে দাঁড়িয়ে থেকে তার সঙ্গে খেলায় মেতে ওঠার ইচ্ছে হচ্ছিল! কেমন নেশার মতো পেয়ে বসেছিল—আর দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম, আবার একটা বল মিস করলে সুযোগ পেয়ে যাব।

আমি পরেছিলাম, কালো সুট। জামার উপর লাল বঙের পুলওভার। আর গলায় আমার স্কার্ফ জড়ানো।

থাক বেটা দাঁড়িয়ে থাক। রাস্তা হারিয়ে ফেললে আমরা জানি না।

মনে আছে, আমি বলেছিলাম, তোমরা যাও না। একা জাহাজে ঠিক ফিরে যাব। আমার জন্য তোমরা এত ভাববে না বলে দিলাম।

অবশ্য আমি ঠিক রাস্তা চিনে জাহাজে ফিরে এসেছিলাম।

মেয়েটি গেট দিয়ে সেদিন দৌড়ে ঢুকে গেলে আমি কিছুটা অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। লোহার গেট—বাড়িটার সামনে কোমর সমান পাঁচিল। সদ্য রঙ করা মনে হয় বাড়িটা। সামনে অনেকটা জায়গা জুড়ে ফুল ফলের বাগান। সব বাড়িগুলিই প্রায় দেখতে একরকম। একটা বাড়ি থেকে আর একটা বাড়িকে আলাদা করা যায় না। কেবল এ-বাড়িটার বিশেষত্ব বাগানে একটা ইউক্যালিপটাস গাছ আছে। তার সাদা পাতা, সাদা রঙের ডালপালা দেখলেই আমি ঠিক চিনতে পারব, এ-বাড়িটার পাশেই কোমর সমান পাঁচিলের সামনে মেয়েটি দাঁড়িয়ে টেনিস খেলে। একা একা এই টেনিস খেলারই বা কী মজা আমি তখন জানতাম না।

ভয় হচ্ছিল।

দেবনাথদারা চলে গেছেন। বন্দরের জাহাজ, কিংবা মাস্তুলও অদৃশ্য।

চলে গেলে ভাববে পালিয়ে গেছে। এটা একজন ভারতীয় নাবিকের পক্ষে শোভা পায় না এমন মনে হচ্ছিল। অবশ্য জাহাজে যে বন্দরেই গেছি, দোকানে ঢুকলে এটা-ওটা কেনার পর প্রশ্ন করত, কোথা থেকে এসেছ!

বলতাম, ইন্ডিয়া থেকে।

তারপরই বেশ সমীহ জবাব, আই সি, ইউ আর গ্যান্ডি পিপ্‌ল!

ভারতীয় যে আমরা, তা যেন সে-সময়ে খুবই গৌণ হয়ে গেছিল। গান্ধী পিপল বলেই যেন খারাপ কাজ শোভা পায় না। আর তখনই ভদ্রা জাহাজে ট্রেনিং-এর সময়কার সেকেন্ড অফিসারের সতর্ক কথাবার্তা শুনতে পাই।

মাই বয়েজ।

তিনি এ-ভাবেই কথা বলতেন।

মাই বয়েজ, তোমরা জান, স্বাধীন হওয়ায় আমাদের দায়িত্ব বেড়ে গেছে। তোমরা জান, জাহাজে নাবিকের কাজ যাঁরা করতেন, তারা অধিকাংশই এখন পূর্ব পাকিস্তানের লোক।

মাই বয়েজ, মনে রেখ, তোমাদের কাজ দেখে যেন জাহাজের কর্তা-ব্যক্তিরা খুশি হন। বেঙ্গলি পিপল, লেজি, বাগার, এ-ধরনের একটা ধারণা আছে তাঁদের।

এখানে বলে রাখা ভাল, জাহাজে ওঠার পর সবাই আমাদের বাঙ্গালিবাবু বলতেন। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে যারাই জাহাজে উঠতেন, তারা সবাই মুসলমান। তাদের থেকে আমরা যে আলাদা, বাঙ্গালিবাবু বলে সেটা যেন মনে করিয়ে দিত? এই নিয়ে মনু, ইমতাজ, আমাদের সঙ্গে কতদিন তর্ক করেছে। আমরা বলতাম, তোরা কী, তোরা বাঙ্গালি না। আমাদের বাঙ্গালিবাবু বলিস!

ওরা কিছুতেই এটা মানতে পারত না। তারাও যে বাঙ্গালি মুসলমান, বাংলা ভাষা তাদের মাতৃভাষা কিছুতেই বুঝতে চাইত না। আরবি ফারসিও নয়, এমন কী উর্দুও নয়, বাংলা ভাষা ছাড়া তাদের আর কী আছে, তারা বাঙ্গালি জাতি ভাবতে এত উদাসীন যে মাঝে মাঝে ক্ষেপে গিয়ে বলতাম, তোমাদের মিঞা আক্কেল হবে না, কথা বলবে বাংলায় অথচ বাঙ্গালি হতে রাজি না।

কেউ কেউ অবশ্য আমাদের যুক্তি ধরতে পেরে চুপ করে যেত।

বলতাম, পাকিস্তানি পাকিস্তানি বলে পার পেয়ে গেলে! এত দেমাক! আর বাংলাদেশটাকে ভাগ করে পাকিস্তান বানালেই হল! খেজুর গাছ আছে, মরুভূমি আছে? আর মরুভূমির দেশটা অনেক দূর জানিস? মুসলমান বলেই তারা তোদের সব, আমরা কেউ নয়! আবার কোনওদিন শুনছি তো, এই বাঙ্গালিবাবু চা আছে, চিনি আছে, সিগারেট আছে—বললে কোনও সাড়া পাবি না বলে দিলাম।

তারপর এ নিয়ে তর্ক এত প্রবল হয়ে উঠত যে সারেঙসাব এসে বলতেন, জাত আবার কিরে। মানুষের গোত্র বিচার মনুষ্যত্ব দিয়ে। তা না থাকলে, বাঙ্গালি হও পাকিস্তানি হও কিছু আসে যায় না।

সারেঙসাবের সামনে কেউই তর্ক করতাম না। তিনি বলতেন, যার ইমান নেই, সে হিন্দুও না মুসলমানও না। সে কাফের বুঝলি।

তিনি চলে গেলেই, আমেদ ক্ষেপে গিয়ে বলত, বুড়োর একমাত্র ছেলেটা লন্ডনে নেমে যাবার পর থেকেই কেমন হয়ে গেছেন। শুনলি তো কথাবার্তা! আমেদ আমার দিকে তাকিয়ে বলতেন, তোর বয়সী। জাহাজে সঙ্গে নিয়ে উঠেছিলেন। জাহাজের কাজ কাম শিখলে সফরে বের হতে পারবে। আর সফর! বিলাতের ঘাটে সেই যে উধাও হয়ে গেল আর কোনও খোঁজ নেই।

সেদিনই আমি টের পেয়েছিলাম, বুড়ো মানুষটি আমি দেরি করলে কেন এত ক্ষেপে যান। তিনি কী তার পুত্রের কথা ভেবে বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি কী বোঝেন, এই বয়সটাই খারাপ! কী জানি, এতদিন পর জীবনের সে সব রহস্যময়তার কথা ভাবলেও মন কেমন উদাস হয়ে যায়।

যা বলছিলাম, ভদ্রা জাহাজের সেকেন্ড অফিসার বলতেন, মনে রেখ, প্রায় দেশে আমাদের দূতাবাস আছে। তাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোনও যোগাযোগ থাকে না। তোমারই হলে আসলে, এ-দেশের পরিচয় —তোমাদের আচরণে এই দেশ সম্পর্কে বিদেশীরা অনুমান করতে পারবে, ভারতীয়রা গরিব, তবে তাদের শালীন আচরণের তুলনা নেই। তোমরা জংলি নও। তোমরা হলে আসলে ভারতবর্ষের প্রকৃত দূত।

আসলে ভারতীয় দূত, এই উক্তি জাহাজে উঠে মনে থাকার কথা না। বিপদে পড়লে মনে পড়ত।

যেমন মেয়েটি না খেলে, বল নিয়ে দৌড়ে পালাল। বেশ সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছিল। বুলেভার্ডে মসৃণ

ঘাস, গালিচার মতো! খুব যত্ন নেওয়া হয়, ল্যান্ড মোয়ারে কাটা ঘাসে হাঁটলেই বোঝা যায়।

দেখাই যাক না কী হয়!

আমি ঘাসের উপর বসে পড়লাম।

দোতলার কোনও ঘরে কে আলো জ্বেলে দিল। রঙিন কাচের ভিতর এক নারীমূর্তিকে হাঁটাহাঁটি করতে দেখলাম। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

কেমন সব মরীচিকার মতো, এই আছে এই নেই। কিন্তু বাড়ি থেকে আর কেউ প্রায় বেরই হল না। কিছুক্ষণ পর একটা গাড়ি বের হয়ে গেল। আবছা আলোয় টের পেলাম, গাড়িতে সে আছে।

জাহাজে ফিরতে ইচ্ছে করছিল না।

আমি সাদা টেনিস বল যতবার তার হাতে তুলে দিয়েছি, ততবার সামান্য নত হয়ে বাউ জানিয়েছে।

কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল।

হাজার হাজার মাইল দূরে আমি ঘাসের উপর শুয়ে আছি। ছোট ছোট ভাইবোনদের অনাহার থেকে রক্ষা করার এ-ছাড়া আমার আর কোনও উপায়ই ছিল না। জাহাজে কাজ নিয়ে চলে এসেছি।

বাবার বিষণ্ণ মুখ মনে পড়ছে।

মা-রও।

ঘাসের উপর শুয়ে থাকি। রাত বাড়ে। জাহাজে ফেরার কথা মনে থাকে না। কী যে হয়, দেশ-বাড়ির কথা মনে হলে ছোট ভাইরা যেন তখন চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের এক কথা, দাদারে।

আমি নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলি।

দাদারে!

বল্।

ফিরবি না! কত রাত হল?

আমার মধ্যে আবার সে জেগে ওঠে—আমি পিতার একমাত্র লায়েক পুত্র। কোথাও পালিয়ে গেলে চলবে না।

আমি উঠে বসি। জাহাজে ফিরে যাই।

গ্যাঙওয়ে ধরে উঠে যাবার জন্য সিঁড়ি ভাঙছি। কেমন ক্লান্ত মনে হত নিজেকে। জাহাজ কবে ফিরবে দেশে কেউ বলতে পারে না। কতকাল এ-ভাবে জাহাজ নিয়ে বন্দরে বন্দরে ঘুরব তাও জানি না। জাহাজ সমুদ্রে ভাসলেই আতঙ্ক। সেই ওয়াচ, টন টন কয়লা টেনে নিয়ে যাওয়া, রাশি রাশি ছাই হাপিজ করা, কাজ সেরে ডেকে উঠে এসে স্নান আহার, তারপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়া।

কিন্তু কী যে আতঙ্ক ছিল, কিছুতেই ঘুম আসত না।

এই বুঝি উঠে এল—ইনজিন রুমে যাদের 'পরি' থাকে, তাদেরই কাজ জাগিয়ে দেওয়া, আমার দিনের 'পরি' অর্থাৎ ওয়াচ ছিল আটটা-বারোটা। রাতেও আটটা বারোটা। চার ঘণ্টা করে কাজ আট ঘণ্টা বিশ্রাম ঠিক তবে কী দিনে, কী রাতে আমার ছিল অস্বস্তি। ওয়াচে যেতে হবে শুনলেই আতঙ্কে মুখ কালো হয়ে যেত।

তবে তিন চারমাসে রপ্ত হয়ে উঠেছিলাম। আগের মতো ওয়াচের আতঙ্কে ভুগতাম না। ডাঙা এলে খুশির জোয়ারে ভেসে যেতাম। শহরের রাস্তা ধরে হেঁটে গেছি, পাহাড়ি বন্দর হলে, টিলায় উঠে সমুদ্রে সূর্যাস্ত দেখেছি, আর সব বন্দরেই একটা না একটা মোহে পড়ে গেছি।

ফিরতে বেশি রাত হওয়ায় সারেঙসাব মুখ গোমড়া করে ফেলেছেন। নিশ্চয়ই দেবনাথদারা এসে সব বলেছে। কোনও তরুণীর টেনিস বল কুড়িয়েছি শুনে সারেঙসাব নিশ্চয়ই ভেবেছেন ছোড়ার না হয়ে গেল! কিন্তু তার জন্য এত রাত তো হবার কথা নয়। রাস্তা হারিয়ে ফেললে, বন্দরে ফেরা যাবে না। এই দুশ্চিন্তাও থাকতে পারে।

আমাকে দেখে তিনি কথা বললেন না। আমি ফেরায় তিনি নিশ্চিন্ত দেখে তাও মনে হল না। কেবল সিঁড়ি ধরে নিচে নামার সময় বললেন, তোর খাবার ভাণ্ডারী ঢাকা দিয়ে রেখেছে। হাতমুখ ধুয়ে খেয়ে এবারে উদ্ধার কর।

পরদিন সেজে-গুজে একাই বের হয়ে গেছিলাম। যেন হেঁটে গেলেই দেখতে পাব একটা ইউকিলিপটাস গাছ দাঁড়িয়ে আছে। পাচিলের পাশে সাদা খাটো ফ্রক গায়ে টেনিস খেলছে কেউ। আবার রোজই কেন যে মনে হত, আজ হয়তো গিয়ে তাকে দেখব না।

ঠিক দূর থেকে দেখলাম গাছটা।

কিন্তু কেউ খেলছে না।

তবে কী আমার মতো একজন অপরিচিত তরুণের বল কুড়িয়ে দেওয়া পছন্দ নয়।

তা-ছাড়া মারধর করবার জন্য দলবল দিয়ে বাড়ির ভিতর সে ঘাপটি মেরে নেই তো! এমনও মনে হত।

মনটা দমে গেল।

জাহাজে ফিরে যাব ভাবছি। যদি সত্যি গেট খুলে ওরা ছুটে আসে। মেরে ছাল চামড়া তুলে দিতে পারে। এ-সব যখন ভাবছিলাম, তখনই দেখি মেয়েটা গাছের নিচ দিয়ে ছুটে আসছে। এক হাতে র‍্যাকেট অন্য হাতে টেনিস বল।

আমাকে দেখে মিষ্টি করে হাসল। তারপর বলটা উপরে ছুঁড়ে দিয়ে সার্ভ করতেই আমার সব সংশয় জল হয়ে গেল। না, আমাকে সে খারাপ লোক ভাবেনি। আমি যে জাহাজি তাও বুঝতে পেরেছে। কারণ আমার চেহারা এবং পোশাকে দূর সমুদ্রের ঘ্রাণ আছে মেয়েটি বোধ হয় টের পেয়েছিল।

সেদিন সে ইচ্ছে করেই দেরি করেছিল, না টানে-টানে আমিই সকাল সকাল জাহাজ থেকে নেমে গেছিলাম মনে করতে পারছি না। কেবল মনে আছে দুধে আলতা রঙ তার। চোখ কালো, চুল নীলাভ। মুখে তার আশ্চর্য দেবী মহিমা।

সে সেদিন ইচ্ছে করেই বল বেশি মিস করছিল, আর আমি দৌড়ে দৌড়ে বল কুড়িয়ে দিয়ে যখন কৃতার্থ হচ্ছিলাম, তখনই একবার র‍্যাকেটটা বগলদাবা করে আমার দিকে এগিয়ে এল। মিষ্টি হেসে কী বলল, তার এক বর্ণ বুঝলাম না। তবে আমি বললাম, 'ইয়েস মি সেলর।'

কী বুঝল সেই জানে।

আবার বল নিয়ে সার্ভ করল। পাঁচিলে ঠেকে বল ফিরে আসছে, ডান হাতে বাঁ হাতে সে বল পাঁচিলে ফিরিয়ে দিচ্ছে। একটা বলও মিস করছে না।

আমি বোকার মতো পাশে দাঁড়িয়ে তার এই মজার খেলা দেখছি।

সে যে কী বলল!

আমার ভাল লাগছিল না। আশ্চর্য সে একটা বলও মিস করছে না। মিস না করলে আমার আর থেকে কাজ কী। আমি তো তার বল কুড়িয়ে দেবার জন্যই দাঁড়িয়ে থাকি। বোধহয় ভিতরে কোনও অভিমান কাজ করে থাকতে পারে। আমি হাঁটা দিচ্ছিলাম, আর তখনই—হুই। শিস দেবার মত আমাকে উদ্দেশ্য করে কিছু যেন বলল।

কাছে গেলে দেখি সে র‍্যাকেটটা আমার দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। বলটাও।

আমি যে এ-ব্যাপারে একেবারে আনাড়ি মেয়েটা বোধহয় জানে না। এও ভাবতে পারে সাদা বলের প্রতি এত যখন আগ্রহ, তখন আমারও খেলার ইচ্ছে আছে। সে আমার হাতে র‍্যাকেট তুলে দিতে এলে সরে দাঁড়ালাম—বললাম, নো নো।

তারপর বললাম, আই নো নাথিং অফ দিস গেমস।

আমার কথা সে কিছুই যে বুঝতে পারছে না, হাব ভাবেই বোঝা গেল।

সে আমার হাতে র‍্যাকেট দেবেই।

আমি খেলব সে বল কুড়োবে। খুব কাছে থেকে বুঝলাম, সে সবে বালিকা বয়স পার করেছে। একজন প্রৌঢ় মতো লোক বের হয়ে এলে তাকে কিছু বলল মেয়েটা। সেও আমার দিকে তাকিয়ে হাতের ইশারায় কিছু বোঝাবার চেষ্টা করল।

তখনই টের পেলাম হাতের ইশারায় কিংবা মুখের অঙ্গভঙ্গি দিয়ে বোঝাতে না পারলে মেয়েটা আমার কোনও আগ্রহের কথাই বুঝবে না।

খেলার চেয়ে বল কুড়িয়ে আনার আগ্রহ যে বেশি বোঝাই কী করে।

এ-ছাড়া র‍্যাকেট কি ভাবে ধরতে হয় জানি না। যদি এটা কোনও সমস্যা নয়—কিন্তু বল ছুঁড়ে মারতে গেলে ফসকে যাবারই সম্ভাবনা বেশি।

খুবই কাঁচা কাজ হয়ে যাবে ভেবে র‍্যাকেটটা কিছুতেই নিচ্ছিলাম না। জোর কবে গছাবেই। অজস্র কথাও বলছে, যার এক বর্ণ বুঝতে পারছি না।

ওর শরীবে ভারি সুঘ্রাণ।

সামান্য হাওয়ায় ওর বব করা চুলে ঢেউ খেলে যাচ্ছিল। যেন এই যে বালিকা কিংবা তরুণী যাই বলা যাক, তার মুখে সামান্য অভিমানও ফুটে উঠতে দেখলাম।

এত নাছোড়বান্দা হলে পারা যায়।

যেন খুশি করার জন্যই র‍্যাকেট হাতে সাদা বল মাথার উপর ভাসিয়ে দিলাম।

যা হবার তাই হল।

কোথায় যে গেল বলটা!

ফসকে গেছে। এত জোরে মেরেছিলাম যে র‍্যাকেটও ফসকে গেল হাত থেকে।

আর আশ্চর্য, দেখি মেয়েটা ফুলে ফুলে হাসছে। হা হা করে হাসছে। এত হাসছিল, আমি খুবই অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম।

বয়সের দোষে অপমানবোধ প্রখর।

আমি হাঁটা দিতেই মেয়েটা এসে পিছন থেকে আমাকে জড়িয়ে ধরল।

না, এতটা আমি আশা করিনি, সমবয়সী এক তরুণ তার খেলা দেখাব জন্য একা দাঁড়িয়ে থাকে—এটা তার কাছে কোনও বিস্ময়ের কারণ হতে পারে—কিংবা এপ্রিসিয়েট করছে তাব খেলাব, এটাও ভাবতে পারে—সে যাই ভাবুক, আমি নড়তে পারলাম না।

সে হাতে টেনে আমাকে নিয়ে গেল। কি কবে ব্যাকেট ধরতে হয় দেখাল, কী কবে বল ছুঁড়ে দিতে হয় দেখাল। এবং সে আবার হাতে ব্যাকেট দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকল, আমি ঠিক মাবতে পারি কি না!

র‍্যাকেটটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছি। আর হাসির খোরাক হতে রাজি না। সে দু-হাত নাচিয়ে আমাকে এনথু দিতে চাইছে। আমি যে কী করি।

সে এসে এবার র‍্যাকেটটা আমার হাত থেকে তুলে নিল। কী ভাবে ধরতে হয় ফের দেখাল। বল লুফে মারতে হয় কী ভাবে তাও দেখাল। টেনিস র‍্যাকেট এত ভারী তাও আগে জানতাম না। দেখিওনি। খুব বেশি হলে ব্যাডমিন্টন খেলেছি কলেজে। দু-র‍্যাকেটের অ'কাশ পাতাল তফাৎ। কব্জির জোর না থাকলে হয় না।

তারপর আমি আবার মিস করলাম।

সে আবার দেখিয়ে দিল।

একবার সত্যি লেগে গেল।

আর মেয়েটা হাততালি দিয়ে আমাকে চিয়ার্স করল।

এই হল আমার মরণ।

আমাদের জাহাজ বুয়েনসএয়ার্স বন্দরে বোধহয় মাসখানেক ছিল। পাটের গাঁট নামানো, তারপর মাল বোঝাই হবার সময় আচমকা বন্দরে শ্রমিক ধর্মঘট।

জাহাজ টানা একমাসই বন্দরে লেগে থাকল। আর ক্রমে আমি চেরির ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলাম। তার নাম চেরি। একদিন সে হাতের অঞ্জলীতে কিছু ফুল এনে দেখাল। কি ফুল চিনতে পারলাম না। তারপর ফুলগুলি নিয়ে সে বুকে ঠেকায়। এটা কোনও প্রেম ভালবাসার ইঙ্গিত কিনা তাও বুঝলাম না। একদিন

সে ইশারায় বোঝাল, আমার জাহাজ দেখতে আসবে। কিন্তু আমি যে ফোকসালে থাকি, তা খুবই অপরিষ্কার, তাকে এনে কোথায় বসাব এই দুশ্চিন্তায় মাথা খারাপ। সারা সকাল বাঙ্ক পরিষ্কার করলাম। বিছানার চাদর কেচে ফেললাম। নোংরা পোশাক সব লকারের এক কোনায় কাগজ দিয়ে মুড়ে ফেললাম। আসানুল্লা সাবকে বলে বাঙ্কে রঙ লাগালাম। বাঙ্কে সাদা রঙ। তারপর কসপের কাছ থেকে একটা পুরোনো কম্বল এনে গালিচার মতো মেঝেতে বিছিয়ে দিলাম। আমার সাফসুতরোর বহর দেখে সব জাহাজিরা বেশ তাজ্জব বনে গেছে।

বনার্জির এই সুমতি— তার তো কিছুই ঠিক থাকে না। হপ্তার পর হপ্তা সমুদ্রে এক জামা-প্যান্ট পরে কয়লা টানি। ঘাম বসে গিয়ে শক্ত খড়খড়ে প্যান্ট। আসানুল্লা সাব দেখলে শুধু প্যান প্যান করেন। বলেন, তোর ঘেন্নাপিত্তি নেই। বাঙ্কের নিচে উপরে আমরা দুজন থাকি। উপরে থাকে বাহারুদ্দিন। ওকে বাহার বলে ডাকি। গরমের সময় সমুদ্রে সে ফোকসালে হয় গামছা নয় তোয়ালে পরে থাকে। খালি গা। তবে বুয়েনসএয়ার্সের প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় লুঙ্গি পরলেও, ওপরে পুল ওভার গায়ে দেয়।

ওকে নিয়েই ঝামেলা।

ওর শতরঞ্জি শতচ্ছিন্ন। নানা জায়গায় সেলাই করা। কৃপণ স্বভাবের। ওর ফুটো কম্বল এবং মোটা কাঁথা এখন কোথায় যে রাখি। একমাত্র আসানুল্লা সাব যদি রাজি হন।

আসানুল্লা সাব রাজি। একজন কয়লাওয়ালার পেটি তার ঘরে রাখা খুব সম্মানের না! তবু মেয়েটি জাহাজে আসবে শুনে আসানুল্লা সাব কেন যে আমার সম্মানরক্ষার্থে নিজেই দায়িত্ব নিয়ে ফেললেন। বাটলারের কাছ থেকে ফুলদানি পর্যন্ত চেয়ে আনলেন। এক গুচ্ছ মিমোসা ফুল ফুলদানিতে রাখলাম। প্রায় পূজাপার্বণের মতো ঘরটাকে সাজিয়ে ফেললাম।

আমরা ইশারায় ততদিনে কথা বলতেও শিখে গেছি। দুটো একটা ইংরাজি সেও জেনে নিয়েছে। সে এলে কফি সার্ভ করা হল। এক প্লেট বিরিয়ানি দেওয়া হল। সে খেয়ে খুব খুশি। সবার সঙ্গে সে ইশারায় কথা বলার চেষ্টা করেছে। তাকে আমি ইনজিনরুমে নামিয়ে সব ঘুরে ঘুরে দেখিয়েছি।

সেও আমায় তার গাড়ি করে এক বিকেলে এভিতাতে নিয়ে গেল। এভা পেরনের সমাধি ক্ষেত্র দেখলাম। কী শান্ত আর নির্জন। বড় বড় গাছের ছায়ায় নায়িকা এভা পেরনের সমাধি। গাড়ি করে দূর দূর থেকে লোক আসে। সেখানে আমি আর চেরি ঘাসের উপর চুপচাপ শুয়ে থাকতাম। পাখিরা সমুদ্র থেকে উড়ে আসত। যেন এক মায়ায় জড়িয়ে যাচ্ছিলাম চেরির সঙ্গে। তার মা বাবা একদিন আমাকে জাহাজ থেকে নিয়ে গেল। আমরা খাওয়াদাওয়া সেরে সে দেশের বিখ্যাত আপেলবাগান দেখতে বের হয়ে গেলাম।

অথবা কোনও বিকেলে, কিংবা সাঁজবেলায় আকাশের নক্ষত্র দেখতে দেখতে আমার মনে হত, কতদূরে আমি। ঘাসের উপর বসে আমরা কখনও হাতে হাত মিলিয়ে অদ্ভুত এক খেলা খেলতাম। এক দুই পাঁচ, তিন সাত চার, এমন ছিল খেলার হিসাবটা। কোথায় হাতের পাতা পড়বে, কোন্ দিকে, নিচে না উপরে, না কোমরের কাছে, মাঝে মাঝে ভুল করে ফেললে প্রথম থেকে আবার শুরু করতে হত খেলাটা—এইভাবে এক বিকেলে কেন যে আমার মনে হয়েছিল, এ-দেশ ছেড়ে গেলে আমি বাঁচব না। সে আর কোনও দিন পাঁচিলের পাশে এসে র‍্যাকেট হাতে নিয়ে দাঁড়াবে না। আমিও আর কোনওদিন সাদা বল হাতে কুড়িয়ে দিতে পারব না। যখন চেরির জন্য টান ধরে গেছে, ও-দেশে থাকারও একটা হিল্লে হয়ে যেতে পারে—চেরিই বলেছিল, ওহ ইন্ডিয়ান।

'ওহ ইন্ডিয়ান' কথাটা এত বেশি গেঁথে গেছিল মনে যে সে আর আমি তাদের বাগানে ফুল চোর সেজে ছোটাছুটি করেছি কত বিকেলে।

এক বিকেলে গিয়ে দেখলাম, চেরি নেই।

সে চলে গেছে।

কোথায় গেছে?

তারা যা বলে বুঝি না!

কবে ফিরবে! তাও তাদের ভাষা থেকে ধরতে পারি না। কেমন ভেঙে পড়েছিলাম। না বলে

কোথায় গেল! কবে ফিরবে। একবারও তো বলেনি। আবার বলতেও পারে, আমিই হয়তো তার ইশারা ধরতে পারিনি। বু লেভার্ডে রোজ গিয়ে বসে থাকি। জাহাজ ছাড়ার সময় হয়ে যাচ্ছে। এ-দেশে থাকি না থাকি, যাবার আগে তার সঙ্গে একবার দেখা হবে না ভাবতে পারি না।

গেটে তালা।

দরজা জানলা বন্ধ।

কেউ নেই বাড়িটাতে।

আর আমার কেন যে প্রত্যাশা ছিল, যেখানেই থাক, জাহাজ ছাড়ার আগে ঠিক চেরি চলে আসবে। অন্তত ও-দেশ ছেড়ে যাবার আগে তার সঙ্গে আর দেখা হবে না ভাবতে পারি না।

রোজ যাই।

গাছের ছায়ায় বসে থাকি।

দূর থেকে কোনও গাড়ি এলে মনে হত বাড়িটার সামনে থামবে। গেট খুলে চেরি তার বাবা মা একজন কাকাও ছিল বোধহয়, তবে সম্পর্কটা সঠিক কি বুঝতে পারিনি।

এ-ভাবে একদিন দেখলাম জাহাজ ছাড়ার নিশান উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

চব্বিশ ঘণ্টা আর মাত্র আছি এ-বন্দরে।

ভোর রাতে জাহাজ ছাড়বে।

জাহাজ ছাড়ার আগে কিছু কাজ থাকে, ডেক পরিষ্কার করা, ফল্কার কাঠ ফেলে ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দেওয়া, কিল এঁটে দেওয়া চারপাশে—এই সব কাজ যত দেখছি, তত মুখ আমার শুকিয়ে যাচ্ছে। বিকেলে গেলাম। সাঁঝ বেলায় ফিরে এলাম। ভিতরে কেন যে ছটফট করছিলাম জানি না। জাহাজ ছেড়ে দিচ্ছে। আমরা বন্দর ছেড়ে চলে যাব, আর হয়তো জীবনে চেরির সঙ্গে দেখা হবে না ভাবতেই চোখ ফেটে জল বের হয়ে এল।

এবং কেমন ঘোরে পড়ে গেছিলাম। মাঝরাতে জাহাজ থেকে পালিয়ে ভেসে যাব ভাবছি—এবং ডেক ধরে যাবার মুখেই দেখি পেছনে কে আমাকে অনুসরণ করছে। আসানুল্লা সাব।

কোথায় যাচ্ছিস?

মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। সারা মুখে তিক্ততা। ভেবেছে কী! আমি কোথায় যাচ্ছি, না যাচ্ছি, এতে তাঁর কী দায় থাকতে পারে। আমি মরি বাঁচি, তার কি তাতে আসে যায়।

প্রায় আর্তনাদ করে উঠেছিলাম—আমি যেখানেই যাই, আপনার কী তাতে!

আমার কী! তিনি আমার কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন, আমার কিছু না। তোর বাপ্-মা'র কথা ভাবলি না। পালাচ্ছিলি।

আর তখনই মনে হল, কে যেন ডাকছে, দাদারে বাড়ি ফিরবি না।

কত দূর দেশে আমার বাবা-মা, আমার ভাই-বোনেরা রয়েছে। আর আমি কবে ফিরব এই অপেক্ষায় আছে। এজেন্ট অফিস থেকে বাবার নামে মাসোহারা পাঠিয়ে দেয়। জাহাজ ছেড়ে দিলে সব বন্ধ হয়ে যাবে।

আমি ফিরে এলাম। বাঙ্কে শুয়ে গোপনে অশ্রুপাত। কার জন্য এখন আর সঠিক মনে করতে পারছি না। বাবা-মা, ভাই-বোন, না চেরি!

যাই হোক, জাহাজ ছেড়ে দিলে চুপচাপ গ্যালির পাশে বেঞ্চিতে বসে থাকলাম। যতক্ষণ না বন্দর চোখের উপর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল, বসে থেকেছিলাম।

কার্ডিফ বন্দর ছাড়ার সময়ও এক পরিস্থিতি। আসানুল্লা সাব নজর রাখছেন। এমন ভাবলেই আমার মাথা গরম হয়ে যেত আসানুল্লা সাবের উপর। কেবল মনে হত আমার ভাল-মন্দ দেখার এত দায় কে দিয়েছে আপনাকে! আমি জাহান্নামে গেলে আপনার কি! কিছু বললেই চটে যেতাম। এবং মনে হত, তিনি আপদবিশেষ। জাহাজের কাজকর্ম ছাড়া তার আর কোনও খবরদারি করার কথাও নয়। বন্দরে কে কোথায় রাত কাটায়, জানার তাঁর কোনও অধিকার নেই। আমার বেলায় তাঁর যত নজর! কেমন যেন জেদী হয়ে যাচ্ছিলাম। উচিত শিক্ষা দিতে হবে। যাতে তিনি কখনও আর আমার ব্যক্তিগত

কাজকর্মে নাক না গলান, সে-জন্য মরিয়া হয়ে উঠলাম।

বোধহয় সময়টা জুন-জুলাই। প্যাচপ্যাচে বৃষ্টি। কার্ডিফ থেকে এই বৃষ্টির মধ্যেই খালি জাহাজ নিয়ে আমরা রওনা হলাম।

কাছাকাছি আর কোনও বন্দরে জাহাজ ধরছে না।

বুয়েনসএয়ার্স থেকেও আমরা খালি জাহাজ নিয়ে রওনা হয়েছিলাম। ভিক্টোরিয়া পোর্টে মাত্র দু-দিনের জন্য থেমেছিল। ব্রাজিলের এই বন্দরটি লৌহ আকরিক রপ্তানির জন্য বিখ্যাত। দু-দিনেই লৌহ আকরিকে জাহাজ বোঝাই। সেখান থেকে টানা সমুদ্র ভেসে গেছি বে অফ বিসকে পর্যন্ত। প্রায় মাসখানেক জাহাজ সমুদ্রে।

কার্ডিফে মাল খালাস। ড্রাই-ডক সারতে বিশ-বাইশ দিন কী বেশি সময় লেগেছিল সঠিক এখন আর মনে নেই।

শুধু মাসখানেক পর আমরা পোর্ট অফ জামাইকা যাব। যেখানে জাহাজের রসদ নেওয়া হবে।

ক্যারাবিয়ান সি তে দু-একদিনের জন্য নোঙর ফেলা হবে। জাহাজের চার্টে এমন খবর পেয়ে আমরা বেশ মুষড়ে পড়েছিলাম কারণ তারপর কোন্‌দিকে কী নিয়ে রওনা হবে, জানি না বলে মন বেশ খারাপ।

এমনিতেই জাহাজটা লরঝরে। সাউথ-ওয়েলসের উপকূল থেকে একটানা এতদিন জাহাজটা ভেসে চলতে পারবে কি না সংশয়। প্রায়ই মনে হত জাহাজ বন্দর ধরার আগেই সমুদ্রে ডুবে যাবে। ঝড় সাইক্লোনে পড়লে এটা বেশি মনে হত। এই বুঝি স্টিয়ারিং ইনজিন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। কারণ আমাদের ঠিক মাথার উপরেই ছিল হালের যন্ত্রপাতির ঘর। ঝড়ে মাঝে মাঝে উদ্ভট সব শব্দ পেতাম।

একদিন তো দৌড়ে উঠেও গেছিলাম—দেখি, না ক্রাঙ্ক ওয়েভগুলো ঠিকমতোই কাজ করছে।

আসলে আমরা যাচ্ছি নিউপোর্টে।

তার আগে পোর্ট অফ জামাইকা থেকে শুধু রসদ তোলা।

জাহাজ ছেড়ে দেবার পর কার্ডিফ বন্দরও অদৃশ্য হয়ে গেল। এ যে গভীর সমুদ্রে জাহাজ। আবার সেই ওয়াচ, কয়লা টানা, ছাই হাপিজ করা, চান, খাওয়া ঘুম। প্রতিদিন একই দৃশ্য, নীল আকাশ। নীল সমুদ্র। কিছু অ্যালবাট্রস পাখি। অনন্ত অসীম এই সমুদ্রযাত্রা কবে যে শেষ তবে তাও জানি না।

বুঝতে পারছি, এবারে আমি একটু বেশি বেপরোয়া হয়ে উঠছি। আসানুল্লা সাবের কাছে নাজিরা যেন ডাইনি। তার সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম বলে দু-দিন কোন কথাই বললেন না।

মাঝে মাঝে আসানুল্লা সাবের এমন ছেলেমানুষী দেখে আমার হাসি পেত।

নাজিরা কি আমাকে খেয়ে ফেলবে। আমি কী সত্যি কোনও বন্দরে হারিয়ে যেতে পারি! হারিয়ে গেলে, তাঁর কী! আর যদি আমার ব্যক্তিগত অভিরুচিতে বার বার তিনি হস্তক্ষেপ করেন তবে রাগ হয় না!

জানি না, কেন, অনেকের মতো আমিও 'ফুল' নেব জানতে পেরে আবার আসানুল্লা সাব খাপ্পা।

ছোট টিন্ডাল করিম মিঞা লাইনের পুরোনো জাহাজি। সে অনেক খবর রাখে। কারণ নিউপোর্ট থেকে জাহাজ সালফার বোঝাই হয়ে পানামা ক্যানেল অতিক্রম করে আবার দূরে সমুদ্রে যাত্রা। পানামা ক্যানেল অতিক্রম করার সময় কে ফুল নেবে, এমন কথাবার্তা আমার কানে এসেছিল। বঙ্কুই এসে খবর দিয়েছিল, ছোট টিন্ডালের ঘরে যা। ডাকছে।

আমি তখন লকার গোছাচ্ছিলাম। মা শীতে কষ্ট পান বলে একটা কম্বল কিনেছি। সেটা যত্ন করে ভিতরে গুছিয়ে রাখছিলাম।

'ফুল নেব' এমন খবর যে আসানুল্লা সাবের মাথা খারাপ করে দিতে পারে আমি জানতাম। অনেক হয়েছে আর না। ঘোমটার তলে খ্যামটা নাচ আর ভাল লাগছে না। জাহাজিরা যা আমিও তাই। অত শুচিবাই জাহাজে উঠলে চলে না।

বঙ্কুকে বললাম, যা আমি যাচ্ছি।

আমার ফোকসালে দুটো বাঙ্ক।

উপরের বাঙ্কে থাকত বাহার। সে আসানুল্লার 'ফালতু' ছিল। অর্থাৎ অতিরিক্ত কোলবয়। আমাদের সাতজনের একজন। কারও কঠিন অসুখ-বিসুখ হলে সে তার হয়ে পরি দিত। অন্য সময় আসানুল্লা সাবের ফুটফরমাস খাটত বাহার।

বাহারের মেজাজ বেশ দবাজ, উঠেই টের পেয়েছিলাম। সে নিচের বাঙ্কটা আমাকে ছেড়ে দিয়েছিল। উপরের বাঙ্কে শুলে ঝড় সাইক্লোনে ঘুমোতে বেশি অসুবিধা। বেশি ওঠানামা করে বাঙ্ক। সে আমার সুবিধার দিকটা সব সময়ে নজর দিত। আমার টোবাকো কিংবা চিনি রেশনে সেই তুলত। সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস ছিল না। সেও ধূমপায়ী ছিল না বলে আমাদের টোবাকো জমে যেত। এবং কিনারায় সে টোবাকো তিন গুণ দামে বিক্রি করে আমার প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দিত। এই করে আমাদের হাতে অতিরিক্ত পয়সা এসে গেছিল। যার জন্য সহজেই একটা দামি কম্বল কিনে ফেলতে পারলাম। ঘাটে জাহাজ ভিড়লে কোম্পানির ঘর থেকেও কিছু পয়সা তোলা যায়। সব মিলিয়েই কম্বল কেনার পয়সা যোগাড় হয়ে গেছিল। ফন্দিটা যুগিয়েছিল বাহারই। সেই বাহার কার্ডিফ বন্দরে হাওয়া হয়ে যাওয়ায় পুরো ফোকসালটা আমার একার দখলে এসে গেছিল।

আমরা তখন মিসিসিপি নদীর মোহনাব সামান্য ভিতরে ঢুকে গেছি।

সেই এক ফুলের খবর। করিম টাকা পয়সা তুলছে।

যত শুনি তত নারীসঙ্গ পাবার জন্য মনটা উতলা হতে থাকে! বার বার আসানুল্লা সাব নিষেধ করলেন, ছোট টিন্ডালেব ফাঁদে যেন না আটকে যাই।

কেন যে এটা আসানুল্লা সাবের বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছিল এখন মনে হলেও কষ্ট পাই।

সে যাই হোক, নিউপোর্টে আমরা নামতে পারলাম না। পোর্ট অফ সালফারেও না। কাপ্তান আসানুল্লা সাবের কাছে খবব পাঠালেন, কিনারায় আমরা যেন কেউ না নামি।

আমেরিকার দক্ষিণ মুল্লুক এটা।

বর্ণবিদ্বেষ প্রবল। কিছুদিন হল কালো-সাদায় দাঙ্গা হয়ে গেছে। ভারতীয় জাহাজিদেব নামাব ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়ে গেল।

এতেও হয় তো মনটা আরও বেশি উৎক্ষিপ্ত হয়ে গেছিল। গোপনে ছোট টিন্ডালের হাতে রেগেমেগে ফুলের দাম পৌঁছে দিলাম।

এত কাছে ডাঙা! জেটি পার হলে বড় বড় তেলের পিপে রোদে ঝলমল করছে। শহর এলাকা একটু দূরে। তবু বোট-ডেক থেকে নারী-পুরষের ফারাক বুঝতে পারি। আমরা প্রায় বন্দী জীবন যাপন করছি। কাঁহাতক সহ্য হয়।

আমার সঙ্গে সেকেন্ড অফিসাবের কিছুটা দোস্তি আছে জাহাজিরা জানে। তার সঙ্গে ইচ্ছে করলে নেমে যেতে পারি। কারণ আমি এমনিতেই বেশ ফর্সা। জাহাজে উঠে সমুদ্রের নোনা হাওয়ায় রঙ আরও খুলে গেছে। সাহেবের স্বজাতি বলে চালাতে কষ্ট হবার কথা নয়। ইচ্ছে করলে নেমে যেতে পারি। ঘুরে আসতে পারি। কিন্তু ওই যত গোঁড়ো আসানুল্লা সাব। তার চোখে ফাঁকি দেওযা কঠিন। আর কিনারায় নেমে যদি শেষে ধরা পড়ে যাই তবে আর এক কেলেঙ্কারি। সাত পাঁচ ভেবেই পোর্ট অফ সালফারেও নামা হল না।

আর এতে নিজের ভিতরে সেই চিরন্তন নাবিকের নেশা যে আরও পাক খেয়ে উঠছে বুঝতে কষ্ট হত না। তা না হলে বোধহয় এত মরিয়া হয়ে উঠতাম না।

সালফার নিয়ে আবার পাড়ি দিতে হবে দূর সমুদ্রে। মাসখানেক, কি তারও উপর জাহাজ ক্রমাগত সমুদ্রে ভেসে চলবে। কেবল আমরা পানামা ক্যানেলের দু-পাশের ডাঙা দেখতে পাব। এ-ছাড়া শুধু দিনরাত সমুদ্র, নীল আকাশ, ঝড় জল আর মাঝে মাঝে সমুদ্রপাখিদের ওড়াউড়ি দেখা।

জাহাজ পোর্ট অফ সালফার থেকে দড়িদড়া খুলে দিল। মোহনা থেকে জাহাজ ভেসে পড়েছে সমুদ্রে। জাহাজের পেছনে সব সমুদ্রপাখি। ডানা সাদা, হলুদ ঠোঁট কবুতরের মতো দেখতে বিশাল আকারের পাখিগুলি টানা কতদিন যে জাহাজের পেছনে উড়ে চলবে আমরা জানি না।

কখনও কখনও দু-এক জোড়া পাখি আমাদের জাহাজের মাস্তুলে এসেও বসে থাকত। তাদের সঙ্গে আমরা কথাও বলতাম —বেশ আছ তোমরা, তোমার নারী তোমার পাশেই বসে আছে, উড়ছে। ঢেউ-এর মাথায় বসে সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছ। তোমাদের হিংসা হয়। এমনই কথাবার্তা হত পাখিরা এসে মাস্তুলে বসে থাকলে।

জাহাজ তখন গভীর সমুদ্রে। খুব একটা ঝড়-ঝাপটা নেই। কাজ সামাল দিতে কষ্ট হয় না। অবলীলায় কাজ-কাম সেরে শিস দিতে দিতে সিঁড়ি ভাঙতে পারি। উঠতে পারি বোট-ডেকে। শরীর দানবের মতো মজবুত হয়ে উঠেছে। হাতে-পায়ের পেশী শক্ত হয়ে গেছে। সমুদ্র আমাকে অজ্ঞাতেই তার মতো সহনশীল করে নিতে পেরেছে। স্বাধীন হতে শিখিয়েছে। আমার ব্যক্তিগত অভিরুচির উপর কারও খবরদারি একদম আর সহ্য করতে পারছি না।

এক রাতে আসানুল্লা আমাকে ডাকলেন। তিনি সেদিন আমাকে নিয়ে উপরে উঠে গেলেন না। দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে। খোপকাটা লুঙ্গি পরেন। মাথায় সাদা টুপি। গায়ে ফতুয়া।

তিনি বললেন, তুই নাকি ফুল নিবি বলেছিস!

নেব বলেছি।

আসানুল্লা সাবের মুখ থম থম করছে ক্ষোভে দুঃখে। তিনি বললেন, তুই নিবি!

হ্যাঁ নেব।

তুই নিবি বলতে পাবলি। তোবা আল্লা! বলে আসানুল্লা সাব দরজা বন্ধ করে দিলেন মুখের উপর।

নিচে এসে দেখি বঙ্কু আমার ফোকসালে বসে চা খাচ্ছে।

বঙ্কুকে দেখেই ক্ষেপে গেলাম। আসলে আমি আসানুল্লার তল্পিবাহক, আমার বেশিদূর যাবার ক্ষমতা নেই, কারণ আসানুল্লা সাব যখন ডেকে পাঠিয়েছেন, আমার ক্ষমতার দৌড় শেষ—এবং এ সব ভেবেই সে মজা পাচ্ছিল, কিংবা মজা দেখার জন্যই আমার ফোকসালে ঢুকে বসে আছে। বললাম, তুই এখানে কেন!

না, দেখতে এলাম, সাধু পুরুষের কী সাধ যায়।

না পেরে বললাম, কেন ফুল নিতে পারি না।

পারবি না কেন! পারবি। তবে শেষ পর্যন্ত পারবি কি না জানি না। আসানুল্লা সাব মাথার উপর আছেন তো!

সবই কেমন বিদ্রূপের মতো শোনাচ্ছে। আমি বললাম, ঠিক আছে, যা। এখন আমি শোব।

ওপরের বাঙ্ক খালি দেখে বঙ্কু আমার ফোকসালে চলে আসবে বলেছিল। কিন্তু আসানুল্লা সাব রাজি হননি। রাজি না হবার কারণ পরে বুঝতে পেরেছি। দেশের খত কতজনার আমি লিখে দিই। দরকারে আসানুল্লা সাবেরও। আমার ফোকসালে অন্য কেউ থাকলে অসুবিধা। খতে কত ব্যক্তিগত কথা থাকে। এ-সব কথা দশকান হলে মন্দ ব্যাপার। আসানুল্লা সাব সেই ভেবেই হয়তো বঙ্কুকে আমার ফোকসালে উঠে আসতে দেয়নি। এখন বুঝতে পারছি না দিয়ে ভালই করেছেন। ইচ্ছেমতো দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়তে পারি। পেছনে লাগার কেউ নেই।

তা-ছাড়া বঙ্কু এলে লকারটার ভাগ দিতে হত। জাহাজে আস্ত একটা ফোকসাল, একটা লকার একজন জাহাজির ভাবাই যায় না। লকারটা পুরো আমার। ওতে আমার কোট-প্যান্ট, কিছু গরম জামা কাপড়, রেশনের কনডেনসড মিল্ক, চা, চিনি, আব মা'র জন্য তুষের মতো নরম কম্বলটা আছে।

বঙ্কুও দেখি বেশ ক্ষেপে আছে। বলল, আসানুল্লা সাবের এটা বাড়াবাড়ি। আমরা কী ভূত! এ ভাবে পারা যায়! তারপর বলল, তুই বুঝিয়ে বললে হয়তো রাজি হবে।

আমি আবার কী বুঝিয়ে বলব। কিছু বলতে পারব না। যা।

মাথা গরম করছিস কেন। সবাই আশা করে আছে।

থাকুক। আমি পারব না। ওঠ আমার বাঙ্ক থেকে। ওঠ বলছি। আচ্ছা তুই কিরে, ঘড়ি দেখে বললাম, দু'ঘণ্টাও নেই, পরিতে যেতে হবে। একটু শুতেও দিবি না।

ওর কেন জানি কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। সে বাঙ্কের নিচ থেকে একটা টব বের করে গবাগুব বাজাতে

থাকল। তার গলা ভাল, হঠাৎ এত প্রসন্ন হবার কারণ কি বুঝতে পারলাম না। সে কী ভেবেছে কে জানে—যাই হোক মনে আছে গাইছিল, ও ফুল তুমি ফোট না ক্যানে, ফুলরে আমার কেশের চুল।

আসলে গানটি যে বাংলা সিনেমার, 'কবি' বই-এর নকল বুঝতে কষ্ট হল না। গানটি হবে, কালো যদি মন্দ তবে, কেশ পাকিলে কান্দ ক্যানে। সেই সুরেই গাইছিল শুধু শব্দ কিছু কিছু কেন প্রায় সবটাই পালটে দিয়ে ফুলের লাইনে চলে এসেছে। কেশের লাইনে আর থাকেনি।

ওর গান শুনে আমিও হেসে ফেলেছিলাম।

তখনই যেন বঙ্কু সাহস পেয়ে গেল। বলল, জানিস আসানুল্লা সাব ক্ষেপে গেছেন। বলেছেন, না কেউ জাহাজে উঠতে পারবে না। ছোট টিন্ডালকে ডেকে ফতোয়া জারি করে দিয়েছেন।

বুঝলাম, ছোট টিন্ডাল তালিকায় আমার নাম রেখেই ভুল করেছে! আমি না থাকলে, তালিকাটিতে তার আপত্তি ছিল না। পানামা খালে কে উঠে এল, কে নেমে গেল, তা নিয়েও বোধহয় ভাবতেন না। আসানুল্লা সাব হুকুম জারি করে দিয়েছেন। ক্যানেলে কাউকে তোলা যাবে না।

রাত দশটা বেজে গেছে। রাত বারোটায় আমার ওয়াচ। বাহার কার্ডিফে নেমে যাওযায় আমার ওয়াচ বদল হয়েছে। বঙ্কুর কী বুদ্ধিসুদ্ধি নেই। বসেই আছে। উঠছে না! আর তখনই দেখি ছোট টিন্ডাল দলবল নিয়ে এসে হাজির। আমার মতো ওবাও সবাই ফুলের গাহেক।

যদি আসানুল্লা সাব ক্যানেলে কোনও নারী জাহাজে তোলার অনুমতি না দেন, তবে আমিই তাব জন্য দায়ী।

ছোট টিন্ডাল বলল, এই নাও টাকা। হবে না।

বাদবাকি বলল, কেন হবে না। আসানুল্লা কী ভেবেছে!

আমি বললাম, ঠিক আছে দাও। এবাবে আসানুল্লা সাব হয়তো বাজি হয়ে যাবেন। গিয়ে বল, বনার্জি ফুল নেবে না বলেছে।

জাহাজ তখন লেমন-বেতে ঢুকবে। আর দু-দিন বাকি। আমি পড়লাম মহাফাঁপড়ে।

ছোট টিন্ডাল এসে বলল, না, আসানুল্লা সাবের এক কথা, হবে না।

আমিও চোটপাট শুরু করে দিলাম, কেন হবে না। অন্য জাহাজে কি হয়ে থাকে! জাহাজিদের মেজাজ মর্জি বুঝতে হবে না। আমি তো ফুল নেব না বলেছি। তবে আর আটকাচ্ছেন কেন!

ছোট টিন্ডাল বলল, তুই বুঝিয়ে বললে হবে। জানিস গরিবগুরবো মেয়েগুলোব এই একটা উপার্জনের পথ। জাহাজিদেব কাছে টিউলিপ ফুল বিক্রি কবে কিছু পয়সা রোজগাব করে। ওতেই ওদের চলে। দুটো খেতে পায। জাহাজ দেখলে, কত আশা নিয়ে থাকে।

বিষয়টা আমার কাছে তখনও খুব যে পবিষ্কার ছিল বলতে পারব না। আসলে ভেবেছিলাম, ওরা ফুল বিক্রি করতে উঠে আসে। জাহাজ প্রশান্ত সাগরে পড়ার আগে আবার নেমে যায়। ফুল নিয়ে ডেকে সামান্য বঙ রসিকতা হতে পাবে—কিংবা কারও গরজ থাকলে সহবাসও হতে পারে—তবে এ নিয়ে জাহাজিদের মাথা-ব্যথা থাকার কথা না। কাপ্তানেরও না। কাপ্তান তো সব সময চান, জাহাজিরা কিনারায় এনজয় করুক। বরং না করলেই দুশ্চিন্তার কারণ—অনন্ত অসীম সমুদ্রে জীবন হাতে নিয়ে ঘোরাঘুরি, একটু বেচাল না হলে চলবে কেন!

বাধ্য হয়ে উঠে পড়লাম। আসানুল্লা সাবের দরজায টোকা মাবতেই তিনি দরজা খুলে দিলেন। সব শুনে বললেন, যা খুশি কর। আমার কি! ইমান কে কার রক্ষা করে! বন্দরে নেমে কে কোথায় যাস আমার জেনে দরকার নেই। আমার তোদের সঙ্গে কাজ নিয়ে কথা। কাজ পেলেই হল।

আসলে এ ব্যাপাবে সাবেঙ সাবেরও কোনও এক্তিয়ার নেই, না করার। দীর্ঘ সমুদ্র সফরে কোনও জাহাজি বন্দরে না নামলেই ভয়। এক ঘেয়ে সমুদ্রযাত্রায় কেউ কেউ পাগল পর্যন্ত হয়ে যায়। কিনারায় নেমে ফুর্তিফার্তা না করলে এটা বেশি হবার কথা। তবে জাহাজিদের বলতে গেলে সর্বময় কর্তা আসানুল্লা সাব। তাকে সমীহ না করলে জাহাজিদেবও ইজ্জত থাকে না। তিনি অনুমতি দিতেই সবাই হা হা করে লাফিয়ে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল। শিস দিল কেউ। কেউ রাতদুপুরে রঙেব টব নিয়ে বসে গেল। ডুবাডুব বাজনা আর সমস্বরে গান। মুহূর্তে জাহাজিদের চেহারাই পালটে গেল।

দু-দিন বাদে সাঁঝবেলায় দেখি আসানুল্লা সাব আমার ফোককালে উঁকি দিয়ে কী দেখছেন। আমি উঠে বসলাম। তিনি সাধারণত জাহাজিদের ফোকসালে ঢোকেন না। উঁকিও দেন না। একমাত্র দরকারে আমার ফোকসালে গলা বাড়িয়ে কথা বলেন। তার দেশে চিঠি লেখার প্রয়োজন হলে এটা করে থাকেন।

বললাম, কিছু বলবেন চাচা?

তিনি বললেন, শুয়ে থাকলি। উপরে উঠে যা। পানামা ক্যানেলে জাহাজ ঢুকে যাচ্ছে। কী করে জাহাজটাকে টিলায় তুলে দিচ্ছে দেখবি না!

আমি বুঝি তিনি আমাকে নিয়ে বিশেষ ভাল নেই। তাঁর অহরহ দুশ্চিন্তা। একজন নতুন জাহাজিকে এ-ভাবে দমিয়ে রাখা সুবিবেচনার কাজ কি না তাই নিয়েও ধন্দে পড়ে গেছেন। তাঁর অস্বস্তি বুঝি। বললাম, যাচ্ছি।

তাঁর মুখ ভারি প্রসন্ন হয়ে গেল। বললেন, যা বাবা যা। শুয়ে থাকিস না। শুয়ে থাকলে মন খারাপ থাকে।

আসানুল্লা সাবের কথা ভেবে আমার চোখ জলে ভারী হয়ে গেল।

আসলে, শুয়েছিলাম—ডাঙা দেখলে বাড়িঘরের জন্য মন বড় বেশি খারাপ হয়ে যায়। এতক্ষণ উপরেই বসেছিলাম। দুটো লকগেট পার হবার পর কিছুই কেন জানি ভাল লাগছিল না। একটার পর একটা লক গেটে ঢুকে জাহাজ যেন সিঁড়ি ভাঙছে। জাহাজ উপরে উঠে যাচ্ছে ক্রমে। সামনে বিশাল কৃত্রিম হ্রদ। পাহাড়ের উপত্যকায় এই কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি জাহাজ পারাপারের জন্য। চারপাশে গাছপালা জঙ্গল নিয়ে ডাঙা জমি দ্বীপের মতো ভেসে আছে।

জাহাজ কাপ্তানের জিম্মায় নেই। জ্যোৎস্না রাত। দূরের জলরাশি এবং পাহাড়ের ছোটখাটো টিবি পড়ছিল।

জাহাজ পাইলটের জিম্মায়। সে খাড়ি ধরে জাহাজ নিয়ে যাচ্ছিল।

ডেকের উপর বসে মনে হচ্ছিল, জাহাজটা যেন পূর্ব-বাংলার বর্ষাকালের নদী মাঠ কিংবা গ্রামগঞ্জ ফেলে চলে যাচ্ছে। এখানে-ওখানে ঝোপ-জঙ্গল, টিলা, কলাগাছ, কচুগাছ। বুনোফুলের গন্ধ পর্যন্ত পাচ্ছিলাম ডেকে বসে। এই প্রথম দেখলাম জাহাজের সার্চলাইট জ্বলছে।

আর কেন যে সে-সময় বাড়ির কথা, মা, বাবা, ভাইবোনের কথা ভেবে চোখে জল চলে আসছিল। মনটা এতই দমে গেছিল যে আর বসে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। নিচে নেমে শুয়ে পড়েছিলাম। আসানুল্লা সাবের বোধহয় সতর্ক নজর এড়াতে পারিনি। তিনি সিঁড়ি ধরে নেমে আমাকে শুয়ে থাকতে দেখে ঘাবড়ে যেতে পারেন।

অগত্যা আবার উপরে উঠে যেতে হল। ভাণ্ডারীর গ্যালিতে ভিড়। কেউ আর নিচে নেই। একমাত্র ইনজিন রুমের পরিদাররা নিচে বয়লারে কয়লা হাঁকড়াচ্ছে। জাহাজের স্টিম খুব বেশি দরকার ছিল না। বড় বেশি ঢিমেতালে জাহাজ চালানো হচ্ছে।

উঠে দেখলাম, আমাদের আগে যে জাহাজটা যাচ্ছিল, ওটা সামনের ঝোপ-জঙ্গল টিলার—ওপাশে হারিয়ে গেছে। কেমন স্বপ্নের মতো দূরাতীত ছবি—মগ্ন হয়ে যেতে হয়।

মেসরুমের পাশে একটা বেঞ্চিতে বসে আছি। আর সব জাহাজিরা আমার পাশে বসে গল্পগুজব করছে। তারা সবাই অপেক্ষা করছে, কখন ফুলওয়ালীরা সব উঠে আসবে।

তারা ফুল দেবে। মাত্র একটি করে ডিউলিপ ফুল। ফুল তাদের চুলে গোঁজা থাকে। জাহাজিরা যে যার পছন্দমত ফুল নেবে। মাত্র এক ডলার।

এক ডলার তখনকার সময়ে বেশ দাম।

আর এ-সময়ই দেখলাম লক-গেটের দিক থেকে একটা ডিঙি নৌকা ভেসে আসছে।

জাহাজটি থেমেছিল কেন তা অবশ্য তখন জানতাম না। জাহাজটা হঠাৎ স্ট্যান্ডবাই হয়ে গেল।

এখন আর সব ঠিকঠাক মনেও করতে পারছি না। দুটো কারণ থাকতে পারে। হয়তো কাপ্তান, জাহাজিরা নারীসঙ্গ পাক ভেবে, থামাবার অনুমতি দিতে পারেন, অথবা দূরবর্তী জাহাজের কোনও

সিগন্যালিং থেকে জাহাজ থেমে যেতে পারে। অথবা, এই জায়গাটায় এলে কোনও কারণে জাহাজকে দাঁড়িয়ে পড়তেই হয়।

দেখছি তরতর করে দড়ির সিঁড়ি বেয়ে কারা উপরে উঠে আসছে। ডেকের উপর জাহাজিরা হল্লা জুড়ে দিয়েছে। সবাই প্রায় ছুটছিল। প্রাচীন নাবিকেরা শুধু চুপচাপ বসেছিলেন। তাঁবা যাননি। বরং তাঁরা জাহাজিদের গালমন্দ করছিলেন।

দেখছি গাউন-পরা ক'জন নারী।

ছোট টিন্ডালের মাতব্বরি শুরু হয়ে গেছে। কেউ বেশি বেলেল্লাপনা কবলে ধমক ধামক দিচ্ছে।

গাউন-পরা ক'জন নারী যেন জাহাজটার প্রাণ। বেশ সাড়া পড়ে গেছে ডেকে। ওরা খোলা ডেকে দাঁড়িয়ে আছে। আমি নিজেও বসে থাকতে পারলাম না। ছুটে গেছি। যারা ফুল নেবে বলে কথা দিয়েছে, তারা বেশ সামনে ঝুঁকে দেখছে।

আমার নামও ছিল তালিকায়। তবে নামটা কাটা।

এক একজন যে যার ফুল নিয়ে জাহাজের ঘুপচি অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের ছোট টিন্ডাল মোল্লা, তার চাই সবচেয়ে তাজা ফুল। সেই কিনারার লোকের সঙ্গে দরদাম করে এদের তুলে এনেছে। তার হক আছে। সে সবচেয়ে কচি খুকিটির খোঁপার ফুল তুলে নিতেই মেয়েটা কেমন কুঁকড়ে গেল।

মেয়েগুলো প্রায় সবাই রদ্দি—ওদের শরীর মুখ দেখে টের পেলাম। মাস্তুলের আলোতে মুখ স্পষ্ট। ঠোঁট ভারী, চুল কোঁকড়ানো। তামাটে রঙ। কম বেশি সব নারীরাই মাঝারি বয়সের। দু-চারজন যুবতী এবং তরুণীও দলে আছে। ওদের কদর বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সব চেয়ে তাজা তরুণীটিকেই ছোট টিন্ডাল পাকড়েছে।

ছোট টিন্ডাল হাত ধরতে গেলে মাথা গোঁজ করে দাঁড়িয়ে থাকল মেয়েটা। পছন্দ নয়। সে তার ফুল ফেরত নিতে চায়। খুবই নিয়মের বাইরে বলে, বুড়ি মতো মেয়েটা ধমকাচ্ছে।

ছোট টিন্ডাল বেঢপ। গোলগাল গাট্টাগোট্টা মানুষ। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। এই নরম উষ্ণতা যেন ছোট টিন্ডালের পাল্লায় পড়লে তছনছ হয়ে যাবে। খুব খারাপ লাগছিল। ইস্ নাম কেটে দিয়ে কী যে ভুল করেছি। কারণ মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে ভরসা খুঁজছিল। কিন্তু আসানুল্লা সাবের জন্য ভরসা দেবার মতো ক্ষমতাও আমার নেই। ভাঙা ভাঙা ইংরাজিতে কথা বলে। সবই বুঝতে পারছিলাম। কিচ্ছু করার নেই। মনটা দমে গেল। ডেক ধরে ফিরে আসছি। মেসরুম পার হয়ে দেখি আসানুল্লা সাব দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে একা দেখে বেশ আশ্বস্ত।

আসানুল্লা সাব আমাব পেছনে সিঁড়ি ধরে নামছেন। কাঠের সরু সিঁড়ি। একজনের বেশি নামা যায় না। তিনি হঠাৎ কেন যে বলেছিলেন, আজও তার রহস্য স্পষ্ট নয়—কারণ আমি তালিকায় ছিলাম না, তবু কেন যে বলেছিলেন, কি রে পছন্দ হল না!

যেন মজা করছেন।

পছন্দ-অপছন্দের চেয়েও আমার মনে হচ্ছিল এরা রুগ্ণ। অর্থাভাব প্রচণ্ড। হতদরিদ্র হলে যা হয়। না হলে এত কম বয়সে একজন কিশোরী জাহাজে উঠে আসে।।ঠোঁট ভারী হলে কী হবে, ভারি মিষ্টি দেখতে।

আর এ সব সময়ে কেন যে আমার মা'র কথা বেশি মনে পড়ত, ভাইবোনদের কথা বেশি মনে পড়ত—কিছু তখন ভাল লাগত না। বাঙ্কে এসে চুপচাপ শুয়ে পড়লাম।

জাহাজটা ভোররাতের দিকে সামনের লকগেটে গিয়ে পড়বে। এই সাত-আট ঘণ্টা ফুলওয়ালিরা উষ্ণতায় ভরিয়ে রাখবে জাহাজিদের। শুয়ে শুয়ে এ-সবই ভাবছিলাম।

আর তখনই দেখি আসানুল্লা সাব নিজেই চলে এসেছেন। মানুষের মনে কখন যে কি উদয় হয়, কে যে কি ভাবে—না হলে আসানুল্লাসাব আমাকে এসেই বা খবরটা দেবেন কেন।

এই ওঠ। মেয়েটা কাঁদছে।

কাঁদছে কেন।

কে জানে! যা একবার। জাহাজে আবার ঝামেলা না হয়।

তারপর আসানুল্লা সাব নিজেই কেন যে সব খুলে বলেছিলেন, তার মাথামুণ্ডু বুঝছি না। বললেন, ছোট টিণ্ডাল নাছোড়বান্দা। মেয়েটা কিছুতেই রাজি নয়। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আয় তো দেখি। এ তো ভাল কথা না! ছোট টিণ্ডাল বুড়িকে শাসাচ্ছে। অফিসাররাও বাদ নেই। নিজেদের ঘরে লকগেট থেকেই মেয়েমানুষ তুলে নিয়েছে। নেটিভদের কাণ্ড-কারখানা দেখতে হবে ভয়ে এলিওয়েের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

কাছে গিয়ে হতবাক। সত্যি ফুঁপিয়ে কাঁদছে মেয়েটা। একদম নড়ছে না। নড়ানো যাচ্ছে না। শত হলেও এ-সব যৌন অভ্যাস মানুষের গোপনেই থাকবার কথা। আর তখন একটা ছোট পরীর মতো মেয়ে যদি ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে, শেষে আবার কোন্ কেলেঙ্কারিতে পড়ে যেতে হবে কে জানে! মেয়েটা তার খোঁপার ফুল কিছুতেই ছোট টিণ্ডালকে দেয়নি।

আর আশ্চর্য তখন কিনা আসানুল্লা সাব আমার দিকে তাকিয়ে বলছেন, দেখ তো ফুলটা তোকে দেয় কিনা! চেয়ে দেখ।

আমি কেমন বিব্রত বোধ করছিলাম। আমার নামে তো কোনও টাকা জমা নেই। আমার কাছে কোনও ডলারও নেই। আমি কী করব বুঝতে পারছিলাম না।

আসানুল্লা সাবই বললেন, চেয়ে দেখ না। দাঁড়িয়ে থাকলি কেন?

আর অবাক, হাত পাততেই মেয়েটা চুল থেকে ফুল তুলে দিয়ে দিল। লজ্জায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। একজন বালিকার স্বভাব যেমন হয়ে থাকে—সবার সামনে সে যেন কিছুতেই আর মুখ তুলে তাকাবে না।

খুব কাছ থেকে দেখে বুঝলাম, চোদ্দ পনেরোও হবে না তার বয়স। ছোট টিণ্ডাল ক্ষেপে গিয়ে শেষে বুড়িকে নিয়েই অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

আসানুল্লা সাব বললেন, যা, ফোকসালে নিয়ে যা। বসিয়ে রাখ। ঘাটে নামিয়ে দেওয়া যাবে।

মেয়েটির আত্মসম্মান রক্ষার্থে তিনি হয়তো আর কোনও রাস্তা খুঁজে পাননি। আমার উপর দায় চাপিয়ে রেহাই পেতে চান। সারারাত তো আমি তাকে ডেকে পাহারা দিতে পারি না—অগত্যা আফটার পিকের দিকে হাঁটা দিলাম। আফটার পিকের উপরে ইনজিন এবং ডেক-জাহাজিদের গ্যালি। সঙ্গে মেসরুম। তার পাশ দিয়ে কাঠের সিঁড়ি ধরে নেমে গেলে প্রথমে দু-পাশে পড়বে ডেক সারেঙসাব এবং ইনজিন সারেঙসাবের ফোকসাল। এখানেই দুটো রাস্তা দু-দিকে নেমে গেছে। একটা গেছে পোর্ট-সাইডে। স্টাবোর্ড-সাইডে থাকি আমরা ইনজিন-জাহাজিরা। নিচে নামলেই আমার ফোকসাল।

সে আমাকে অনুসরণ করছে বুঝতে পারছি।

কী যে করি।

ফোকসালে ঢুকে যেতেই দেখি সেও পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

বললাম, কি নাম?

ভাঙা ইংরেজিতে কথা বলতে পারে। বুঝতেও পারে সব। নাম বলল, লেসি।

এই নারীর সঙ্গে ইচ্ছে করলেই এখন যৌন সংসর্গ করা যায়। সে তার খোঁপার ফুল দিয়ে তা বুঝিয়ে দিয়েছে। উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলাম। নিজেকে দমন করতে পারছি না। কী ভেবে একলাফে সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেলাম। দেখি আসানুল্লা সাব দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। আমার উপর মেয়েটির ভার চাপিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত—দরজা বন্ধ দেখেই তা টের পেলাম।

ফোকসালে ঢুকে পড়লাম ফের। বেশ হাঁপাচ্ছি। মেয়েটিও আমার পাশে বসে পড়ল।

আমার হাত পা কাঁপছে। গলা শুকিয়ে উঠছে। কী যে বিড়ম্বনায় পড়া গেল। জল তেষ্টা পাচ্ছে। কী করব ঠিক করতে পারছি না। তারপরই মনে হল, আমার তো টাকা নেই—যৌনসংসর্গ করার জন্য কোম্পানির ঘর থেকে ডলারও তুলিনি। নাম কেটে দিয়েছি বলে তার প্রয়োজনও হয়নি। মেয়েটি টাকার বিনিময় ছাড়া অমার সঙ্গে যৌন-সংসর্গ করবে কেন! যাক বাঁচা গেল।

বললাম, লেসি, তুমি নিচের বাঙ্কে শুয়ে থাক। উপরের বাঙ্কে আমি উঠে যাচ্ছি।

লেসি কথা বলছে না। অপলক তাকিয়ে আছে আমার দিকে। কী করুণ চোখমুখ!

বললাম, চা খাবে?

ঘাড় কাত করে জানাল, খাবে।

বোসো।

লকার খুলে দুধ চিনি চা বের করে উপরে উঠে গেলাম। গ্যালিতে দু-গ্লাস চা বানালাম। তাবপর গ্লাস দুটো হাতে নিয়ে নিচে নেমে এলাম। নামার সময় শুনতে পেলাম, আসানুল্লা চাচা কোবান পাঠ করছেন ফোকসালে। তখনই কেন যে এক অপার্থিব পৃথিবীর খোঁজ পেলাম ভেতরে। মনে হল শরীরই সব নয়। অর্থের বিনিময়ে কেউ এ-কাজ করলে প্রেম ভালবাসা কিংবা জীবনের রহস্যময় উষ্ণতা মরে যায়।

নিচে নেমে ওকে চা দিলাম। পাউরুটি দিলাম। খুব আগ্রহ নিয়ে খাচ্ছে। তার হাঁটুর উপবে গাউন উঠে এসেছিল। সে বারবার পাতলা গাউন টেনে হাঁটু ঢেকে দেবার চেষ্টা করছে। চোখের মণিদুটোতে আলো পড়ায় তাকে বড়ই মায়াবী মনে হচ্ছিল-- কিংবা কোনও দুরবর্তী সংকেত—অথচ আমি তার সঙ্গে সারাক্ষণ বাড়িঘবেব গল্প কবলাম।

লেসি জানাল, তার বাবা নেই। মা থেকেও নেই। কোন্ এক খামাবে কাজ কবত। সেখান থেকে নিখোঁজ। মেয়েটির ধারণা, অভাবের তাড়নাতেই মা কোথাও চলে গেছেন। ভাইবোনেদের দুটো পেট ভরে খেতে দেবার জন্য সে লাইনে নতুন এসেছে। লোকটাকে দেখে ওর ভয় ধরে গিয়েছিল বলে কাঁদছিল।

সবারই আজ কিছু না কিছু উপার্জন হবে অথচ লেসিকে শুধু খালি হাতে ফিরে যেতে হবে। লেসির দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে ভীষণ খারাপ লাগছিল।

আমার নিষ্ক্রিয় কথাবার্তায় লেসি বোধহয় অস্বস্তি বোধ করছিল। দরজা খোলা—বাব বার দরজাব দিকে তাকাচ্ছিল।

আমি মাথা নিচু করে বললাম, তোমার ছোট ভাইটার কত বয়স?

জানি সে আমার কোনও কথা শুনতে চায় না। শোনার আগ্রহ নেই। ভাইয়ের কী বয়স শোনানোর জন্য জাহাজে উঠে আসেনি। সে খুব চঞ্চল হয়ে উঠছিল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, দরজাটা বন্ধ করে দিন না!

না।

কেন না।

আমি বন্ধ করে দিচ্ছি।

না।

কেন যে এত একগুঁয়ে হয়ে উঠছিলাম, আজও তার সঠিক ব্যাখ্যা পাই না। বরং হাসি পায়, আমাব পাপবোধের কথা ভেবে। না কি তার কোনও ব্যাধি আছে এই ভয়ে কাছে যাইনি। অথচ এত সুন্দর যে নারী, যে যৌন-সংসর্গের বিনিময়ে পয়সা রোজগার করতে এসেছে তাকে আমি সত্যি ঘৃণা করছি! তা তো নয়। বরং আমার মনে হয়েছে এমন নারী জীবনে সত্যি দুর্লভ। অথচ আমি কেমন বিপাকে পড়ে গেছি। পাপ-পুণ্য কি বুঝতে পারছি না। কোম্পানির ঘর থেকে টাকা তুলে রাখলেও হত। অন্তত যৌন-সংসর্গ করি না করি হাতে টাকাটা দিতে পারতাম। তাও আমার সম্বল নেই।

লেসিও মরিয়া হয়ে উঠেছে। বলছে, আমার কোনও অসুখ নেই। মা মেরির দিব্যি। বলে সে দাঁড়িয়ে গাউন খুলে ফেলতে গেলে আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম।

তুমি রাগ করছ?

মুখ না তুলেই বললাম, না।

তবে আমাকে দেখছ না কেন? দরজা বন্ধ করে দিলাম।

সে ফের বলল, না, তুমি দেখছ না। তুমি আমার কিছুই দেখছ না। প্রায় আমাকে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল, কেন তবে ফুল নিলে। আমাকে কেন অপমান করলে! ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল।

কী বলি! সত্যি ফুল নেওয়ার অর্থই তো গ্রহণ করা। আমি লেসির দিকে না তাকিয়েই বললাম, তুমি খুব সুন্দর। গাউন পরে ফেল। আমারও ভাইবোন আছে।

তারপরই লকার খুলে বললাম, দেখ তো কম্বলটা কেমন হয়েছে! শীতের সময় মা'র খুব কষ্ট। শীতে মা কষ্ট পান বলে এটা কিনে নিয়েছি। ভাল হয়নি!

ও দেখে আমার কি হবে! সে মুখ ফিরিয়ে আরও বিরক্ত প্রকাশ করে ফেলল। তারপরই কেমন চিৎকার করে বলার মতো, কেন ও সব দেখাচ্ছ। আমি তোমার মা'র কম্বল দেখতে জাহাজে উঠে আসিনি। প্লিজ। তুমি আমাকে আর খাটো কোরো না!

আমি কেমন পাগলের মতো বলছিলাম, লেসি প্লিজ গাউনটা পরে ফেল। তোমার দিকে তাকানো যাচ্ছে না।

লেসি তখনও উন্মত্তের মতো বলে যাচ্ছে, না, না তুমি আমাকে ঘৃণা করছ। আমি মনে কর কিছু বুঝি না। আমার সত্যিই কোনও রোগ নেই।

সে আমার সামনে এসে দাঁড়ালে আমার মা-এর কম্বলটা দিয়ে ওর নগ্ন শরীর ঢেকে দিয়ে বললাম, পাগলামি কোরো না। গাউনটা পরে ফেল।

সে এবার আমার হাত টেনে ধস্তাধস্তি শুরু করে দিয়েছে। বলছে, আর দেরি নেই। আমাদের নামিয়ে দেবে। শিগগির কর। আর যাই কর, তুমি আমাকে প্লিজ ঘৃণা কোরো না।

বললাম, লেসি আমি তোমার উপার্জনে সাহায্য করতে পারলাম না। দুঃখিত। এটা নাও। তোমাকে দিলাম। ঘৃণা করলে আর যাই করি মা'র জন্য কেনা কম্বলটা তোমাকে দিতে পারতাম না।

সে কম্বলটা নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরল।

বলল, সত্যি দিচ্ছ।

হ্যাঁ। কেন বিশ্বাস হচ্ছে না!

এত দামি কম্বল! আমি যে তোমাকে কিচ্ছু দিতে পারলাম না।

বললাম, কেন ফুল তো দিয়েছ। এর চেয়ে সুন্দর পবিত্র আর কী থাকতে পারে। একজন পুরুষ তো নারীর কাছে এর চেয়ে বেশি কিছু পেতেও চায় না।

দেখি লেসি কাঁদছে। কম্বলে মুখ লুকিয়ে হাউ হাউ করে কাঁদছে।

এই অপরাহ্ণ বেলায় আজকাল মেয়েটির মুখ কেন যে এত বেশি মনে পড়ছে তাও জানি না। যৌন-সংসর্গ না করলেও সেদিনই জীবনে যৌনসম্ভোগ কী টের পেয়েছিলাম। অপরাহ্ণবেলায় তাও মনে করতে পারি।

সকালের দিকে জাহাজ সমুদ্রে নেমে গেল।

নিচে আমি সারারাত জেগে ক্লান্ত। ভোররাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পানামা ক্যানেল পার হলেই জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগরে পড়বে, ইচ্ছে ছিল বাকি রাতটুকু না ঘুমিয়ে ডেকে বসে থাকব। প্রশান্ত মহাসাগরে সূর্যোদয় দেখব। ঘুমিয়ে পড়ায় তা আর হয়ে উঠল না।

ক্যানেল অতিক্রম করার সময়, ইনজিন রুমে কাজকামের চাপ খুবই কম থাকায় আমাকে বাঙ্কারে নেমে যেতে হয়নি। মনু একাই দুটো সুট সামলেছে। আমি জানি আমার ওয়াচ বারোটায় ফের শুরু হবে। কাজেই ঘুম থেকে ওঠার কোনও তাড়া ছিল না।

তখনই দেখি কেউ ফোকসালের দরজা ঠেলছে। তাড়াতাড়ি বাঙ্ক থেকে নেমে দরজা খুলে দিলে দেখলাম আসানুল্লা সাব দরজায় দাঁড়িয়ে।

কি রে তোর ঘুম ভাঙে না! কত বেলা হল!

জাহাজ যে ফুলস্পিডে চলছে, তাও টের পেলাম। বারোটায় ওয়াচ, এত সকালে কেউ ফোকসালে ঢুকে গেলে, খারাপই লাগে। মাথার উপর স্টিয়ারিং ইনজিনের ঘর। ঝিক ঝিক শব্দ, এবং জাহাজ ওঠানামা শুরু করায় আসানুল্লা সাব এত সকালে আমার কেবিনে ঢুকে কী বলছেন, বুঝতে পারিনি।

বললাম, কি হল!

ওঠ। তোকে আজ আর ওয়াচে যেতে হবে না।

এত সদয়! কিছুটা হতভম্ব হয়ে বললাম, কেন?

কেন আমি বলতে পারব না। উপরে যা। পাঁচ নম্বর মিস্ত্রি মাস্তুলের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। ওর সঙ্গে আজ থেকে কাজ করবি।

এটা আমার কাছে বড় কোনও খবর ছিল না। কারণ এর আগেও সময়ে অসময়ে আমি পাঁচ নম্বর মিস্ত্রির সঙ্গে উইনচে কাজ করেছি। বাঙ্কারে কয়লা ঠেলার চেয়ে এই কাজটা যে খুবই হালকা জাহাজিরা সবাই জানে। ইনজিন-রুম অ্যাপ্রেন্টিস কাজটা করে থাকে। আমাদের জাহাজে ইনজিন-রুম অ্যাপ্রেন্টিস নেওয়াই হয়নি। কোম্পানির টাকা বাঁচাবার ধান্দা। পাঁচ নম্বর একাই উইনচ মেরামতির কাজটা চালিয়ে এসেছেন। নতুন পাঁচ-নম্বর মিস্ত্রি একা এত কাজ সামলাতে রাজি না।

যা হয়, হোমে জাহাজ গেলেই কাপ্তান থেকে সব অফিসার ইনজিনিয়ার জাহাজ থেকে নেমে যান। নতুন আর একদল আবার উঠে আসেন। কার্ডিফ থেকে জাহাজ ছাড়ার পরই আমি টের পেয়েছিলাম, এবারের পাঁচ নম্বর ইনজিনিয়ার খুবই ঢিলেঢালা লোক এবং কিছুটা কুঁড়ে প্রকৃতিব। তাঁর সঙ্গে হেলপার না দিলে কাজ করবে না। এমনও বোধহয় জানিয়ে দিয়েছেন।

যাই হোক হাত-মুখ ধুয়ে উপরে উঠে গেলাম।

কিংবা এও মনে হল, আমাব ঘরে যে মেয়েটি রাত কাটিয়ে গেছে, যাকে বিন্দুমাত্র সম্ভোগ না করে মায়ের জন্য কেনা কম্বলটি দিয়ে দিয়েছি, আসানুল্লা সাবের কানে সেই খবর যদি পৌঁছে যায়, তিনি খুশি হয়ে অ্যাপ্রেন্টিসের কাজে লাগিয়ে দিতেই পারেন। যদিও আমার এতে পদোন্নতি হয়েছে বলে ধরতে পারি না, এই ঠেকা কাজ চালিয়ে দেবাব মতো সারা সফর যদি উইনচ মেরামত করে যেতে পারি, তবে 'নলিতে' তার উল্লেখ থাকতে পারে। আবার নাও পারে। কিংবা যদি আসানুল্লা সাব চিফ-ইনজিনিয়ারকে ধরে একটা সার্টিফিকেট আদা" করে দিতে পারেন, তাতেও আখেরে আমার ভালই হবে।

আসানুল্লা সাবের প্রতি এতে আমার কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত—তবু কেন যে গুম মেরে ছিলাম, আসলে সেই কিশোরী মেয়েটি যে আমাকে তাড়া করছে বুঝতে কষ্ট হল না। কেন জানি তার মুখ কিছুতেই ভুলতে পাবছি না। কিশোরী মেয়েটি যদি মনে করে থাকে, আমি তাকে সম্ভোগ না করে অপমান করেছি, ভাবতেই পারে, তাকে কম্বল গায়ে জড়িয়ে দেওয়ায় সে খুশিই হয়েছিল। এসব ভেবেও গুম মেরে থাকতে পারি।

তখনই দেখি ওয়াইজার ছুটে আসছে ডেক ধরে।

ডেক অ্যাপ্রেন্টিস ওয়াইজার। কার্ডিফ থেকে সেও উঠেছে। আমরা সমবয়সী এবং এই একমাসেই তার সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। সমবয়সী হলে যা হয়। আমরাই জাহাজে কমবয়সী নাবিক।

সে এসে বলল, দারুণ দারুণ। বলে আমায় হাত তুলে হ্যান্ডসেক করল।

তাহলে কি জাহাজের সবারই কানে কম্বল দানের কথাটা উঠে গেছে। তাও কিনা একজন বেশ্যা মেয়েকে! না হলে আমার প্রতি আজ সবাই এত সদয় কেন!

আমি বললাম, ওয়াইজার তোমাকে একটা কথা বলব!

আজ আর কোনও কথা না! কাপ্তান খুব খুশি তোমার উপর। কাপ্তান নিজে আসানুল্লাকে ডেকে বলেছেন, শোনো আসানুল্লা, আমাদের জাহাজে ইনজিন-অ্যাপ্রেন্টিস নেই। সফর খুবই লম্বা হবে মনে হচ্ছে। তোমাদের ফোকসালের ইয়াং বয়কে, অ্যাপ্রেন্টিসের কাজটা দিয়ে দাও। কাজটা শিখুক। ভেরি ব্রাইট বয়। পারবে মনে হয়।

ওয়াইজার কেবল বকবক করছে। থামছে না।

এখন আর তোমাকে ফোকসালে ঢুকে খুঁজতে হবে না। ডেকেই আমরা পড়ে থাকব। সারাটা দিন ডেকে কাজ—প্রথম সমুদ্রযাত্রা আমাদের, দারুণ মজা হবে। তারপর ফিসফিস করে বলল, নাইট ওয়াজ ভেরি ইয়াঙ। কী বল!

দ্যাখো ওয়াইজার, আমাকে তুমি ভুল বুঝবে না। মেয়েটি খুবই গরিব। টাকার জন্য সে এমন

একটা খারাপ কাজ করবে, কিছুতেই মেনে নিতে পারিনি। দেশে আমারও ভাইবোন আছে।

তবে যাই বল ব্যানার্জি, বেশ্যা মেয়েদের নিয়ে তোমার এই আদিখ্যেতা আমার পছন্দ না।

পরে তোমার সঙ্গে কথা বলব ওয়াইজার। পাঁচ নম্বর ডাকছেন।

আমাদের জাহাজের পাঁচ নম্বর এবার বলতে গেলে একটু বেশি বেঁটে। উইনচ ড্রামের উপর ঝুঁকে, স্ট্র্যাপারের নাগাল পাওয়া তার পক্ষে খুবই কঠিন। উইনচ খোলাখুলির কাজ তাঁরই। আমার কাজ স্ট্র্যানার পাইপে ঢুকিয়ে নাট আলগা করে দেওয়া, কেরোসিনের টবে নাট-বল্টু ভিজিয়ে ন্যাকড়ায় মুছে পরিষ্কার করে দেওয়া—এর বেশি আমার কাজ থাকার কথা না।

দৌড়ে কাছে যেতেই আমার হাতে তিনি একটা লিস্ট ধরিয়ে দিলেন। কশপের ঘর থেকে কিছু জিনিসপত্র তুলে নিয়ে আসতে হবে। যেমন সিরিস কাগজ, কিছু নানা সাইজের রেন্‌চ এবং নানা গেজের তামার পাত। দুটো ফাইল সঙ্গে।

সব নিয়ে এসেছিলাম ইনজিন রুমে নেমে।

তারপর দেখি, তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থাকলেন, আমাকে ওয়ারপিন ড্রাম অতিক্রম করে উইনচের একজস্ট পাইপ খোলার হুকুম দিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন।

আমি সহজেই পাইপ খুলে আনলে তিনি খুশিই হলেন।

কাজ শেখার এমন সুযোগ যেন হাতছাড়া না করি, পাঁচ নম্বরের ফুট ফরমাস দরকারে যেন তামিল করি—এমন সব উপদেশই খেতে বসে আসানুল্লা আমাকে দিয়ে গেলেন।

আমরা যাচ্ছি নিউপ্লিমাউথ। সালফার নিয়ে রওনা হয়েছি পোর্ট অফ সালফার থেকে। পানামা ক্যানেল অতিক্রম করে জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগরে ভেসে চলেছে। প্রায় মাসখানেক সমুদ্রেই আমাদের থাকতে হবে। অবশ্য ঝড় কিংবা সাইক্লোনে পড়ে গেলে আরও বেশি সময় লেগে যেতে পারে।

আমার আর ওয়াচে কয়লা ঠেলার আতঙ্ক না থাকায়, শুয়ে পড়লেই ঘুম চলে আসে। আস্ত একটা ফোকসাল আমার জিম্মায়। বন্ধু আমার ফোকসালে উঠে আসতে চেয়েছিল, আসানুল্লা সাবের হুকুম নেই।

ডেকে রোজই বন্ধুর এক কথা, কিরে সারেঙসাবকে বলেছিলি?

কী যে বলি তাকে। আসানুল্লা সাবকে যে বলিনি, তাও তো নয়। কিন্তু বন্ধুর বিশ্বাস আমি বললে আসানুল্লা সাব, ফেলতে পারবেন না। মুশকিল, বন্ধু ডেকজাহাজি, ডেকসারেঙ তার মোল্লা। আসানুল্লা রাজি হলেই শুধু হবে না, ডেক সারেঙেরও অনুমতি চাই।

জাহাজ যাচ্ছিল—ঝড়ও নেই। আকাশ নীল এবং সমুদ্র আরও গভীর নীল। এত রোদ, দুপুরে ডেকে কাজ করাই কঠিন। প্রায় ফোসকা পড়ার মতো গরম। পাঁচ নম্বর মাস্তুলের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকেন, আমি তার হয়ে নাট-বোল্ট খুলি, যেখানে মরচে পড়ছে, কিংবা তেলকালিতে জ্যাম হয়ে গেছে পাইপের মুখ, তাই পরিষ্কার করি। এমনকি স্ট্র্যাপার খুলে ফাইলও মারতে হয় আমাকে। তিনি শুধু তামার পাতলা পাত বসিয়ে ফিটিঙস ঠিক আছে কিনা দ্যাখেন। আমি ক্রমে তাঁর কাছে খুবই জরুরি কাজের লোক হয়ে গেছি।

কোনওদিন তিনি কাজ হয়ে গেলে বেশ তাড়াতাড়িই আমাকে ছেড়ে দেন। ওয়াইজারকে খবর দিই, অধিকাংশ সময়ে তাকে ডেকেই পাওয়া যায়। নীল জামা নীল প্যান্ট পরে সে হয় ডেক টিন্ডালের সঙ্গে, নয় মেজ ম্যালোমের সঙ্গে কাজে ব্যস্ত থাকে। জাহাজে দড়িদড়ার আছে অজস্র রকমের গিট—ডেক টিন্ডালের সঙ্গে বসে সে দড়ির গিট দেয়, এটাও যে শিক্ষণীয় কাজ, ওয়াইজার ব্যস্ত থাকলেই বুঝতে পারি। বন্দরে জাহাজ বাঁধাছাদার কাজ থাকলেও ওয়াইজার ব্যস্ত থাকে। আমার ছুটি হয়ে গেল, সে কোথায় খুঁজি। কারণ সন্ধ্যার দিকে ডেকে দুজনেই বসে যাই দাবা নিয়ে। ওয়াইজারই জাহাজে উঠে দাবা খেলার সব নিয়মকানুন শিখিয়ে আমাকে সে তার খেলার জুড়িদার করে নিয়েছিল।

কখনও জ্যোৎস্না থাকে ডেকে।

কখনও থাকে না। মাস্তুলের আলোই তখন যথেষ্ট। হাফ-প্যান্ট পরে খালি গায়ে অসীম অনন্ত সমুদ্রে ভেসে যেতে যেতে দাবায় খুবই মগ্ন হয়ে পড়ি।

বাড়িঘরের জন্য যে কষ্ট ছিল, ওয়াইজারের সাহচর্যে সহজেই তা কেটে যেতে থাকল। কিছুটা জাহাজি চরিত্র যে আমার মধ্যে গড়ে উঠছে, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না।

কখনও শিস দিয়ে সিঁড়ি ভেঙে বোট-ডেকে উঠে যাই। ওয়াইজার আমার জন্য অপেক্ষা করে।

এক বিকেলে আমার স্নানটান সারা। জাহাজে আগের মতো গরম নেই। জাহাজ ক্রমশ নিচের দিকে নেমে যাওয়ায় রাতের দিকে ঠাণ্ডা থাকে। বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখতে দেখতে খুবই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি। কখনও সেই সব মুখ উঁকি দেয়। নাজিরা, চেরি এবং সেই কিশোরী মেয়ের মুখ চোখে ভেসে ওঠে। তাকে বেশ্যা মেয়ে বলায় ওয়াইজারের সঙ্গে দিনতিনেক কথাও বন্ধ ছিল। ওয়াইজার আমাকে পেছন থেকে জাপটে না ধরলে হয়তো তার সঙ্গে আর কথাই বলতাম না। সে তার বিশ্রী উক্তির জন্য ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছিল। সেদিনও কি হয়েছিল জানি না, একাই বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি ওয়াইজারের জন্য—

সমুদ্র শান্তই ছিল। প্যাচপ্যাচে গরমও আর নেই। ঠাণ্ডা হাওয়া উঠে আসছে সমুদ্র থেকে। সূর্য অস্ত গেছে। লাল এবং নীল রঙে মাখামাখি হয়ে আছে সমুদ্র। আফটার-পিকের রেলিং-এ ভর করে সমুদ্র দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে গেছি—জাহাজের কোনও ব্যস্ততাই চোখে পড়ছে না। গ্যালিতে ভাণ্ডারী চাচা সবজি কাটায় ব্যস্ত। চাচার হেলপার নিয়ামত বিশাল হাঁড়িতে পেঁয়াজ, রসুন সম্ভারে মুসরীর ডাল নামিয়ে স্টাবোর্ড সাইডে ছুটে গেল। বড়শি ফেলা আছে, কোনও বড় মাছটাছ শিকারের নেশায় নিয়ামত সারাদিনই কাজের ফাঁকে সমুদ্রে বড়শি ফেলে রাখে। ডেক-টিন্ডাল সারা জাহাজে ঘুরে ঘুরে মাস্তুলের আলো জ্বেলে দিচ্ছে। ডেক-জাহাজিরা গুলতানি মারছে পাশের মেসরুমে। তাস পাশার আড্ডাও আছে। রাত আটটাব ওয়াচে যারা পরি দিতে যাবে, তারা নিচ থেকে উঠে এসেছে উপরে। চা চর্বিভাজা রুটি নিয়ে বসে গেছে রেলিং-এর বেঞ্চিতে।

ওয়াইজার কেন যে আসছে না! কেবিনের দিকটায় যখন তখন ঢোকা যায় না। কাজ ছাড়া জাহাজিদের কেবিনের দিকটায় ঘোরাঘুরির ব্যাপারেও নিষেধ আছে। ওয়াইজার তা জানে। সে নিজেই এ-জন্য বিকালে স্নানটান সেরে বেশ সেজেগুজে বের হয়ে আসে। হাতে থাকে দাবার বোর্ড আর হাতির দাঁতের মিন করা বরফ-সাদা আর কালো রঙের ঘুঁটি।

খেলা শুরু হয়ে গেলে, দুজনেই চুপচাপ—আমরা যে হাজার হাজার মাইল দূরে নির্বাসিত হয়ে আছি খেলায় মগ্ন হয়ে গেলে ভুলে যেতে পারি। খেলায় আমরা কেউ কখনও হারি কিংবা জিতি। তাতে আমাদের দুজনার মধ্যে উত্তেজনারও সৃষ্টি হয়। তবে আমি যে বেশি হারতেই ভালবাসি ওয়াইজার তা টের পেয়ে গেছে। আনাড়ি চাল দিলে, সেই কখনও বলে দেয়, চালটা না দেওয়াই ভাল, সে বুঝিয়ে দেয় এই চালে আমার কি ক্ষতি হতে পারে।

মাঝে মাঝে যখন কিছুই ভাল লাগে না, দুজনে ফল্কার উপর চিত হয়ে শুয়ে থাকি। জাহাজ দুলে দুলে ভেসে যায়—কখনও আকাশে জ্যোৎস্না থাকে, নক্ষত্রমালাও বিরাজ করে। কিংবা কখনও জাহাজের পিছু নেওয়া বিশাল অ্যালবাট্রস পাখির পাখা বিস্তারে মুগ্ধ হয়ে যাই।

তখনই ওয়াইজার অদ্ভুত সব কথা বলে আমাকে অবাক করে দিত।

কেন যে আসছে না।

আফটারপিক থেকে সামনের ডেক পার হয়ে এলিওয়েয়ের সরু করিডোর স্পষ্ট। এমন কি লালরঙের কার্পেটে কেউ হেঁটে গেলেও বোঝা যায়, মেজ মালোম না বড় মালোম। করিডোরের পাশের কেবিনগুলিতেই ডেক অফিসাররা থাকেন। ওয়াইজার থাকে শেষদিকের কেবিনে। এত দেরি তো সে কখনও করে না।

নানা ধন্দ দেখা দিচ্ছিল মনে।

আমার সঙ্গে ওয়াইজারের এতটা খোলাখুলি মেলামেশা ইংরাজ অফিসারদের যে খুব একটা পছন্দ নয় জানি। ছোট মালোম একদিন কথায় কথায় আমার সম্পর্কে বিরক্তি প্রকাশও করেছেন। একজন নেটিভের সঙ্গে এত কিসের মাখামাখি এমনও অভিযোগ উঠেছে। তবে মেজ মালোম খুবই সহৃদয় মানুষ। তিনি এতে দোষের কিছু আছে স্বীকার করেন না। ওয়াইজার আমার সমবয়সী, আর আমার

চলাফেরা এবং কথাবার্তায় তিনি যে খুবই খুশি তাও বুঝি। ওয়াইজার এবং আমি রেলিঙে ঝুঁকে কথাবার্তায় নিবিষ্ট হয়ে গেলে মেজ মালোমও আমাদের পাশে এসে দাঁড়ান। সমুদ্রের নানা কিসিমের গল্পও বলেন। কোন্‌টা হাঙ্গারের সমুদ্র, কোথায় হাজার হাজার ডলফিন ভেসে বেড়ায়, এমন কি সমুদ্রের অতলে পাহাড় এবং আগ্নেয়গিরিরও খবর দেন। অ্যালবাট্রস পাখিদের ওড়াওড়ি কেন জাহাজের পেছনে তারও ব্যাখ্যা দিতে ভালবাসেন। মাস্তুলে কোনও পাখি বসে থাকলে তাঁর এক কথা খুব যে ফূর্তি করছ দুজনে, জাহাজের অতিথিটিকে কিছু অন্তত খেতে দাও।

মেজমালোমই যে ওয়াইজারের প্রকৃত ওপরয়ালা তাও জানি। ওয়াইজার তার কথামতোই ডেকের কাজকাম বুঝে নেয়। ডেক-টিন্ডালের ফুট ফরমাসও ওয়াইজারকে পালন করতে হয়। তাকে তো ডেকটিন্ডালই হাতে-কলমে কাজ শেখাচ্ছে, যেমন দড়িতে নানাবিধ গিঁট, বালকেডে রঙ, মাস্তুলের ডগায় উঠে ক্রোজনেস্টে আলো জ্বালিয়ে দেওয়া, ফক্কার দেখভাল, সবই ডেক-টিন্ডালের নির্দেশ মতো সে করে থাকে। ডেকটিন্ডালের আধ-খাঁচড়া ইংরাজি বুঝতে না পারলেই সে ছুটে আসত আমার কাছে। কিংবা ডকটিন্ডালই ডেকে পাঠাত আমাকে। আমি তখন টিন্ডালের হয়ে দোভাষীর কাজ করতাম।

আমাদের বন্ধুত্ব বলতে গেলে এই সূত্রেই শুরু।

ওয়াইজার অসুস্থ হয়ে পড়েনি তো!

জাহাজে উঠে সি-সিকনেসে সে বেশ কিছুদিন কাবুই ছিল। সে তো কবেকার কথা। নতুন করে সি-সিকনেস, না তাও ভাবা যায় না। আমরা যাচ্ছি ডুনেডিন হয়ে নিউপ্লিসাউথ বন্দরে। কিছুদিন হল পানামা ক্যানেলও পার হয়ে এসেছি। সমুদ্র শান্তই আছে। জাহাজে বিন্দুমাত্র পিচিং নেই, ঢেউ-এ জাহাজ গড়াগড়িও যাচ্ছে না, বিকেলের দিকে ডেকে অবশ্য আজ তাকে দেখা যায়নি, শুধু ডেকেই তার কাজ থাকবে এটা ভাবাও ঠিক না।

ওয়াইজার কি নিজের কেবিনেই বসে আছে। পোর্টহোলে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখছে! দেখতেই পারে। জাহাজে উঠে নানা কারণেই দেশবাড়ির জন্য মন খারাপ থাকে। একঘেয়ে সমুদ্রযাত্রা ভালও লাগে না। কথা বলতেও না। চুপচাপ কেবিনে বসে থাকতে পারে। আবার ফরোয়ার্ড-পিকে গিয়ে বসে থাকতে পারে কিংবা গল্পের বইয়ে যদি ডুবে যায়। একবার গ্যাঙওয়ে ধরে ফরোয়ার্ড-পিকে গেলে হয় ওয়াইজারকে খুঁজতে। কিংবা চিফকুকের গ্যালিতে খোঁজ নিলে হয়। মেসরুমমেটরাও খবর দিতে পারে। আবদুল, ওয়াইজারকে চা পানি দেয় জানি। তারা থাকে বোট-ডেকে।

এতসবই বোধহয় ভাবছিলাম সেদিন। এসব যে কবেকার কথা!

ওয়াইজার না থাকলে বন্ধু দেবনাথের ঘরে গিয়ে বসে থাকতে পারি।

আমার পাশের ফোকসালে তারা থাকে। একটু বেশিমাত্রায় তারা জাহাজি চরিত্রের মানুষ বলে তাদের ঠিক ভাল লাগে না। আমি নতুন জাহাজি। শরীর থেকে পারিবারিক গন্ধ এখনও যায়নি। ওয়াইজারও জাহাজে সবে মাসদুয়েক আগে কার্ডিফ বন্দর থেকে উঠেছে।

সেদিন আকাশে জ্যোৎস্না ছিল মনে আছে। কারণ দূর থেকেই ওয়াইজারকে ফরোয়ার্ড-পিকে আবিষ্কার করেছিলাম। মাস্তুলের আলো জ্বলছে ঠিক, তাতে আলো কেমন নিস্তেজ হয়েছিল। নিস্তেজ আলোতে ওয়াইজারকে দেখা সহজ ছিল না। উইন্ডসেলের আড়ালে সে যে দাঁড়িয়ে আছে, জ্যোৎস্না ছিল বলেই বোধহয় টের পেয়েছিলাম।

সে কী দেখছে! রেলিঙ এখানেও আছে। রেলিঙে ঝুঁকে সে এত কী দেখছে! সেই তো সমুদ্র, জাহাজের সোঁ সোঁ আওয়াজ এবং নক্ষত্রমালায় ডুবে আছে সামনে যতদূর দেখা যায়। কেমন এক রহস্যাবৃত মায়াবী সমুদ্র। ওয়াইজার ও-ভাবে না দাঁড়িয়ে থাকলে সমুদ্রকে এতটা যেন মায়াবী মনে হত না।

তারপরেই কেন যেন মনে হয়েছিল, আমাকে এড়িয়ে থাকার জন্য সে যদি এখানে চলে আসে। সে তো জানে, তা র দেরি হলে, আমি তার কেবিনেও চুপিচুপি চলে যেতে পারি। কাছে গিয়েও সহজে ডাকতে পারলাম না, ওয়াইজার। কিছুটা যেন সঙ্কোচের মধ্যে পড়ে গেছি।

ডেক ধরে হেঁটে গেলে জুতোর শব্দ হবেই। আমার জুতোর শব্দেই ওয়াইজার পেছন ফিরে তাকাল।

তুমি! এখানে!

কি করব, তোমার পাত্তাই নেই। চলে এলাম।

ওয়াইজার ব্রিজের দিকে একবার চোখ তুলে তাকাল। বিশাল কাচের ঘরে স্টিয়ারিং-এব পাশে চার্ট ঝোলানো থাকে। থার্ড অফিসারের ডিউটি চলছে। কিছু একটা হয়েছে। আমার সঙ্গে এত বেশি মেলামেশা থার্ড অফিসার অর্থাৎ ছোট মালোমেব যে পছন্দ নয়, জানি। এই নিয়ে অফিসার মহলে কথাও উঠতে পারে। কাপ্তানের কানে গেলে তিনি ওয়াইজারকে ডেকে ধমকও দিতে পারেন। এইসব চিন্তা মাথায় কাজ করছে বলেই, ওয়াইজার সহসা ব্রিজের দিকে তাকানোয় আমার মনটা দমে গেল। ব্রিজে এই সময় একটা ডেকচেয়ারে কাপ্তান চুপচাপ বসে থাকেন। কাচে-ঘেরা বিশাল হুইল হাউজটি আড়াল করে রেখেছে অফিসার কিংবা কাপ্তানকে। তাঁরা আমাদের সহজেই দেখতে পাবেন, কিন্তু আমরা টেরই পাব না, তাঁরা আমাদের লক্ষ্য করছেন।

কেমন একটা ভয় ধরে গেল। আমি পালাতে গেলাম। কী দরকার ওয়াইজারকে বিপদে ফেলে।

তখনই ওয়াইজার ডাকল, কী হল, চলে যাচ্ছ কেন?

আমি উপরে আঙুল তুলে দেখালাম।

ধুস, কে কি বলবে! গুলি মারো ইয়ার, এমনই যেন বলতে চেয়েছিল থার্ড অফিসার সম্পর্কে।

যাক, তবে কাপ্তানের কানে কথাটা ওঠেনি। তিনি ওয়াইজারকে ডেকে ধমকও দেননি। ব্রিজে কেউ দাঁড়িয়ে নাও থাকতে পারে। শুধু সুখানি একলাই স্টিয়ারিং হুইল ধরে বসে থাকতে পারেন। জাহাজ গভীর সমুদ্রে, অফিসাররা যে যার কেবিনে, কিংবা ডাইনিং হলে, কাজেই আমাদের মেলামেশা নিয়ে কারও চোখ টাটাবার কথা না। নেটিভ বলে সাহেরসুবোদেব যতটা পারি এড়িয়ে চলি। কিন্তু ওয়াইজারকে কেন যে কিছুতেই এড়িয়ে চলতে পারি না!

ডাকলাম, ওযাইজার।

সে আমার দিকে তাকাল।

চল, গ্যাঙওয়েব পাশে গিয়ে দাঁড়াই। কেউ দেখতে পাবে না।

তারপর নিজেই কেমন বেকুফ হয়ে গেলাম। ওয়াইজার তো একজন তরুণ যুবা, তার সঙ্গে পালিয়ে কথা বলার এই স্পৃহাতে খারাপের কী আছে! নিজেকে সংশোধন কবে স্বাভাবিক গলায় বললাম, কখন থেকে ভাবছি তুমি আমাদের পিছিলের ফক্কায় আসবে। তোমার পাত্তাই নেই। খুঁজতে বের হয়ে দেখি এখানে উইন্ডসহোলের পাশে দাঁড়িয়ে আছ।

ওয়াইজার কেমন ম্রিয়মাণ গলায় বলল, জেনের খবর ভাল না। মনে হয় ওর কিছু একটা হয়েছে।

বন্ধুত্ব হলে যা হয়, জেন সম্পর্কে অনেক কথাই আমি জানি। ওয়াইজার যে ওয়েলসের ছেলে তাও আমি জানি। কার্ডিফ থেকে রেলে চড়ে যেতে হয়। বাস্তায় কোনও নির্জন স্টেশনে নেমে গেলে তাদের গাঁয়ের খবর পাওয়া যায়। কিছুটা পাহাড়ি এলাকা। একটি বার এবং ডাকঘর ছাড়া তাদের গাঁয়ের তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য খবর সে আমাকে দেয়নি। জেন তার গাঁয়ের মেয়ে। স্কুলের পড়াশোনা দুজনের একই সঙ্গে একই স্কুলে।

পাকা রাস্তা ধরে গেলে দুটো ছোট শহর ছাড়িয়ে তাদের বাড়ি। সে প্রায়ই ব্রেজিংস্টার নামক এক ধবনের ফুলের কথা বলত। জেনির খুব পছন্দ এই ফুল। ফুলটি খুবই দুর্লভ। বনে-জঙ্গলে খুঁজে পাওয়া কঠিন।

ফুলে গন্ধ নেই। আবার আছেও। যে পায়, সে পায়।

অথচ সাদা-লাল এই ফুলগুলি লম্বা। এবং ওরা সাইকেলে বাড়ি ফেরার সময় জেনির চোখ থাকত উপত্যকার বনে-জঙ্গলে। দুটো একটা ফুলই ফোটে। খুঁজে পাওয়াই কঠিন। যেদিন জেন ফুলটা খুঁজে পেত, খুবই খুশি দেখাত তাকে। এই ফুল খুবই সৌভাগ্যের প্রতীক এমনও ভাবত জেন।

জেন রাস্তায় সাইকেল রেখে জঙ্গলে ঢুকে গেলে রাস্তায় ওয়াইজার পাহারায় থাকত। রাস্তাটা খুব ভাল না। লোক চলাচল কম। কিছু ছিনতাইবাজের উপদ্রবও আছে। এমন নির্জন নিরিবিলি সবুজ বনভূমিও সারা দ্বীপে খুঁজে পাওয়া কঠিন। জেনির জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার মধ্যেও ছিল তার তীব্র আনন্দ।

রোজই যে ফুল পেত জেন তাও নয়। জেন নানা স্বপ্ন দেখত মনে মনে। ফুলটা পেয়ে গেলে ভাবত, তার স্বপ্ন স্বার্থক হল। ওয়াইজার তখন সবে উঁচু ক্লাসে উঠেছে। জেনকে নিয়ে সাইকেলে ফেরার সময় বার্চ কিংবা ওক জাতীয় গাছের ছায়ায় দাঁড়াত। পাইনের বনও পার হয়ে যেতে হত, গাঁয়ে ঢুকতে গেলে। এমন এক নিরিবিলি প্রাকৃতিক পরিবেশে জেন আর ওয়াইজার একসঙ্গে বড় হয়ে উঠেছিল।

সেই জেন এক বিকেলে জঙ্গল থেকে বের হয়ে এল, হাতে ব্লেজিং-স্টার। স্কুলের ইউনিফর্ম গায়ে। তারা দুজনেই যে বড় হয়ে উঠছে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না। ফুলটি জেন সেদিন তার হাতে দিয়ে বলেছিল, দারুণ মজা হবে। তুমি যদি দেখতে চাও দেখাতে পারি। দেখলে, আমার মতো তুমিও সৌভাগ্যের অধিকারী হয়ে যাবে।

আমি ওয়াইজারকে না বলে পারিনি, জেন কি সেই মজার মধ্যে নিয়ে গেয়েছিল তোমাকে?

ওয়াইজার কিছুটা সম্ভ্রম এবং সঙ্কোচের গলায় বলেছিল, জেনি একটি আস্ত ক্ষেপি! তার নানা রকমের বিশ্বাস—যেমন উইলবরো চার্চের মাথায় সে একটি নক্ষত্র দেখতে পায় মাঝে মাঝে। নীলরঙের সেই নক্ষত্রটির খবর সেই রাখে। রোজ দেখা যায় না। ঐ নক্ষত্র দেখলেও সে ভাবে তার দিন ভাল যাবে।

আমি বুঝতে পেরেছিলাম, ওয়াইজার জেনের মজার জগৎ সম্পর্কে নিস্পৃহ থাকতে চায়। এটা যেন অত্যন্ত গোপন বিষয়, আর কাউকে বললে জেনকে খাটো করা হবে।

জেনের খবর ভাল না, ওর বোধহয় কিছু একটা হয়েছে। সেটা কী, কিছুই বলছে না। হয়তো এইটুকু বলেই আমাকে রহস্যের মধ্যে রেখে দিতে চায়।

আমরা ডেক ধরে হাঁটছিলাম। হাওয়া দিচ্ছে, মাস্তুলের আলোগুলি দুলছিল। সামান্য পিচিংও শুরু হয়ে গেছে। জাহাজ বেশ দুলছে। আরও বিশ বাইশ দিনের আগে বন্দর পাচ্ছি না। কাজকামে একরকম থাকি। কাজ না থাকলে সময়ই কাটতে চায় না। জেন ভাল নেই কথাটাতে কিছুটা কথা বলার সুযোগ পাওয়া গেছে। জেন কেন ভাল নেই, এত দূর থেকে জেনের খবরও পাবার কথা না। বন্দর না এলে দেশের চিঠি পাওয়া যায় না, অথচ জেনের খবর বোধহয় ভাল না—কোনও সঙ্কেত থেকে ওয়াইজার এমন কথা বলতেই পারে। সারাদিন দেখাও পাইনি, জেনের কথা ভেবে কেবিনে ওয়াইজার মনমরা হয়ে বসে থাকতেও পারে।

তার কি হয়েছে, বলবে তো!

ওয়াইজার বলল, আমি কি জানি তার কি হয়েছে! সারারাত তার সঙ্গে ঘুরেছি, সেই অ্যালসোরের জঙ্গল, রাস্তায় আমাকে দাঁড় করিয়ে ফুল খুঁজতে জঙ্গলে চলে গেছে। কখনও দেখি একটা টিলার উপর থেকে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। পাহাড়ের নিচেই হটব্রো লেগুন। লেগুনে পড়ে গেলে উঠতে পারবে না। জেন সাঁতার জানে না। আমাকে ভয় দেখানোর জন্য সে টিলা থেকে দৌড়ে নামছে কখনও। এত জোরে নামলে যে কোনও সময় পা ফসকে নিচে পড়ে যেতে পারে। যত বলছি, জেন, প্লিজ এ ভাবে নামবে না, কে শোনে কার কথা।

জেনের এক কথা।

বল, আমাকে তোমার সঙ্গে সমুদ্রে নিয়ে যাবে? বল, বল। টিলার মাথায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে। পারা যায়। সে তো বোঝে না, সমুদ্রে তাকে নিয়ে যাবার কোনও উপায়ই নেই। তবু জেদ, এক কথা, না নিয়ে গেলে, আবার টিলা থেকে দৌড়ে নামবে। বাড়ি ফিরবে না। কিছু হলে তখন আমাকে সবাই ধরবে।

ওয়াইজার এবার ঠিক গ্যাঙওয়ে পার হয়ে দুটো বিট পেয়ে গেল। একটায় সে বসল, আর একটায় ইঙ্গিতে আমাকে বসার কথা বলল।

আমি বসলে বলল ওয়াইজার, অগত্যা কি করি, বললাম ঠিক আছে নিয়ে যাব, জাহাজে কিন্তু দুষ্টুমি করা চলবে না। আমার কথামতো চলতে হবে।

খুউব খুশি।

তারপর দেখি নেই, শুধু ঝোপজঙ্গলে নড়ানড়ি শুরু হয়েছে। জেন জঙ্গলের ডালপালা ফাঁক করে

ছুটছে, তার চাই ব্লেজিংস্টার, জঙ্গলে ঢুকে ওটা পেলেই বুঝবে, আমি মিছে কথা বলিনি, প্রকৃতই তাকে নিয়ে সমুদ্রে যাব।

আমি ডাকছি, জেন, খুব কিন্তু দেরি হয়ে যাচ্ছে। তোমার বাবা কাজ থেকে ফিরে এসে দেখতে না পেলে ছাদে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখবে। তোমাকে খেতে দেওয়া হবে না। তুমি কষ্টের মধ্যে পড়ে যাবে।

আমার দিকে তাকিয়ে ওয়াইজার খুবই কাতর গলায় বলল, তুমি তো জানো ব্যানার্জি, ওর স্টেপ-ফাদার কারণে-অকারণে কী রকম কষ্ট দেয়। কত রকমের নির্যাতন চালায়। বড়ই দুঃখী মেয়ে।

আমি চুপ করেই আছি। জেনির কথা ভাবলে ইদানিং আমারও কষ্ট হয়। বিমাতার কথা আমরা জানি, কিন্তু বিপিতার কথা আমরা বিশেষ শুনিনি। এটা আমার একটা জেনের জন্য বিশেষ কষ্টের কারণ ছিল।

ওয়াইজার বলল, তারপরই দেখি জেন আমার সামনে দাঁড়িয়ে। পরনে সাদা রঙের স্কার্ট, গায়ে লাল রঙের জ্যাকেট। সোনালি চুলের মেয়ে, বড় বড় নীল চোখে আমাকে দেখছে। হাতে সেই ফুল। বলছে, চল কেবিনে, সমুদ্রে ঝড় ওঠার আগে ঢুকে না গেলে, কোথায় গিয়ে ছিটকে পড়ব ঠিক কি!

স্বপ্নে এত সব দেখছিলে?

স্বপ্ন না সত্যি, না ভৌতিক কিছু, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ব্যানার্জি।

ভৌতিক বলছ কেন ওয়াইজার?

আরে আমি যে ওকে নিয়ে বের হয়েছিলাম. তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব বলে। দরজা খুলে এলিওয়ে ধরে ডেকেও নেমে গেলাম। মাস্তুলের আলোটা দুলছিল। বেশ হাওয়া উঠে আসছে। আকাশ পরিষ্কার। কত নক্ষত্র—জেন ঠিক আবিষ্কার করে ফেলল, তার নীল রঙের নক্ষত্রটি। বালিকার মতো আহ্লাদে চিৎকারও করে উঠেছিল, ঐ দেখ, দেখ, এই জাহাজেও নক্ষত্রটি আমাদের মাথায় ভেসে বেড়াচ্ছে।

কোথায়?

ঐ দেখ।

যা হয়, আমি তো জানি না, সে কি দেখাতে চায়, কোন্ নক্ষত্র তার, সেই নীল রঙের নক্ষত্র, ওকে তবু প্রবোধ দেবার জন্য মিছে কথা বললাম, হ্যাঁ ঐ তো। ঠিক সমুদ্রের দক্ষিণ দিকে, ঐ যে, ঠিক বলছি না।

তুমি মিছে কথা বলছ। তুমি দেখতে পাওনি—আমাকে তুমি এখনও ছোট খুকি ভাবো। তারপর ওয়াইজার আর একটা কথাও বলছে না। একেবারে চুপ।

আমি বললাম, কি হল! তাবপর কি হল। সমুদ্রে জেন আসতে পারে না। তুমি স্বপ্ন দেখেছ। ভৌতিক হতে যাবে কেন।

তাই বলে দরজা খুলে বের হয়ে এলাম। স্বপ্নে কেউ এতটা ঘোরে পড়ে যেতে পারে।

পারে। তুমি জানো, আমাদের দেশে গভীর রাতে অনেককে নিশিতে পায়। নিশি ডেকে নিয়ে কোনও গভীর অরণ্যে কিংবা নদীর পাড়ে মানুষকে দাঁড়ও করিয়ে দেয়। আমরা শিশুদের নিশির আতঙ্কের কথা বলে শান্ত করে রাখি। আসলে স্বপ্ন থেকেই এগুলো হয়। স্বপ্নের ঘোরে দরজা খুলে বের হয়ে যায়—কেউ যেন তাকে ডাকে।

নিশি বলে কিছু আছে বলছ!

আমি ঠিক কিছু জানি না। আমি তো কখনও নিশির ডাকে রাতে ঘর থেকে বের হয়ে যাযনি! কী করে বলব, আছে কি নেই।

না, তুমি কিচ্ছু জান না ব্যানার্জি। রাতে জেন আমার কাছে এসেছিল। ঠিক এসেছিল। ওব কিছু হয়েছে। জেনের আত্মা আমার সঙ্গে দেখা করে গেছে। সে একটা ফুলও রেখে গেছে। ফুলটা যে ব্লেজিংস্টার, দেখলেই চিনতে পারবে।

ব্লেজিংস্টার ফুলই দেখিনি জীবনে, চিনব কি করে?

ও তাই তো, ব্রেজিংস্টার তুমি চিনবে কি করে! আমিও কি ভাল চিনি। জেন দেখাত, তারপর জেন লুকিয়ে ফেলত— কি জানি আমি যদি তার কাছ থেকে ফুলটা কেড়ে নিই। আমি তো জঙ্গলে কখনও ফুলটা ফুটতে দেখিনি। সেই কেবল দেখতে পেত, সেই তুলে আনত।

ওয়াইজারকে খুবই কাতর দেখাচ্ছে। গোপনে চোখের জলও ফেলছিল বোধহয়। মাস্তুলের আলোতে তা স্পষ্ট ছিল না। সহসা ওয়াইজার আমার হাত চেপে ধরল, এস আমার সঙ্গে। এস না।

এ সময়ে তার সঙ্গে না গেলে খারাপ দেখায়। আমি তার সঙ্গে কেবিনে ঢুকতেই বলল, ঐ দ্যাখ ফুলদানিতে।

আমি কিছুই দেখতে পেলাম না। ফুলদানিতে কোনও ফুলই নেই। মেসরুমমেট আব্দুল যে ফুল রেখে যায় না তাও না। সে ওয়াইজারের জামাকাপড় কেচে দেয়। কেবিনে দরকারে চা-কফি-ব্রেকফাস্ট দেয়। সে ফুল রেখেই দিতে পারে। ওয়াইজারের কেবিন সাফ সুতরো থেকে সাজিয়ে রাখার কাজ আব্দুলের। সে যদি ফুলের গুচ্ছ রেখে দেয়, দিতেই পারে, জাহাজে রসদ ওঠার সময় কিছু ফুলও তুলে নেওয়া হয়, এই যেমন গোলাপ, টিউলিপ, লিলি ম্যাগনোলিয়া, রজনীগন্ধা, যেখানকার যা ফুল। ডাইনিং হলের মিনা করা বড় বড় সাদা চিনেমাটির ফুলদানিতেও নানা রঙিন ফুল দেখেছি। এত সব ফুলের সঙ্গে একটা ব্রেজিংস্টার যদি মিশেই থাকে—কিংবা সেই ফুলটাই যদি আব্দুল, ওয়াইজারের ফুলদানিতে গুঁজে দিয়ে যায় বলারও কিছু নেই। কিন্তু ফুলদানিতে ফুলই নেই। ওয়াইজারকে বলি কি করে, এখনও তুমি স্বপ্নের ঘোরে আছ। প্লিজ মাথা খারাপ করো না। আব্দুলকে দু-কাপ বরং কফি দিতে বল। সেই ফাঁকে আমরা দাবা নিয়ে বসেও যেতে পারি।

আসলে ফুলদানিতে ফুলই নেই, বলা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছিলাম না। এতে যে ওয়াইজারের আরও মাথা খারাপ হয়ে যাবে। একা কেবিনে থাকে, ভয়ে আতঙ্কে সে কেবিনে থাকতে রাজি নাও হতে পারে। এবং যা হয়, সমুদ্রের একঘেয়েমি থেকে অদ্ভুত সব মানসিক অবসাদ সৃষ্টি হয়—সে কেবিনে না থাকতে চাইলে, কাপ্তানের কানে কথা উঠবে, এবং ওয়াইজারের মাথা ঠিক নেই ভেবে সামনের বন্দরে তাকে নামিয়েও দেওয়া হতে পারে।

ফুলদানিতে ফুলই নেই বলা বোধহয় ঠিক হবে না। ওয়াইজারকে আশ্বস্ত করার জন্য বললাম, আব্দুল ফুল রেখে যেতে পারে। সে তো মাঝে মাঝে বরফঘর থেকে ফুল এনে রেখে দেয়। ফুলের সঙ্গে দু-একটা ব্রেজিংস্টার জাহাজে উঠে এসেছে মনে হয় রসদের সঙ্গে। ফুলটা খুব সুন্দর বলেই আব্দুল লোভ সামলাতে পারেনি।

ফুলটা খুবই সুন্দর। তাই না ব্যানার্জি?

খুব সুন্দর। ফুলের তারিফ করলে যদি খুশি হয়, তারপরই টের পেলাম, সে কাজের জামা-প্যান্টও পালটায়নি। ওয়াইজার যে সত্যি ঘোরে আছে এতে টের পেলাম।

দাবার বোর্ড হাত বাড়িয়ে নেওয়ার সময় বললাম, তুমি ফ্রেস হয়ে নাও। আব্দুলকে কফি দিতে বলছি।

ওয়াইজার নিজের পোশাকের দিকে তাকাল। তার হাতে মুখে যে কালি লেগে আছে তাও টের পেল। সে ভারি কৃতজ্ঞ যেন আমার ওপর। তোয়ালে কাঁধে ফেলে বাথরুমে ঢুকে গেল। আর ঠিক সেই সময়ই মনে হল ফুলদানিতে সত্যি একটা সাদা ফুল। লম্বা, কিছুটা ধুতুরা ফুলের মতো, তবে পাপড়ি আলগা, ফুট ফুট লাল সবুজ রঙ পাপড়িতে। বিস্ময়ে হতবাক। চোখ কচলে কিছুটা কাছে গেলে মনে হল, কই কিছুই তো নেই! খালি ফুলদানি।

এটা অলৌকিক না ভুতুড়ে বিষয় বুঝতে পারছিলাম না। তবু স্বাভাবিক থাকার জন্য মনের ভুল ভেবে আমরা দুজনেই দাবা খেলায় বসে গেলাম। আর কেন যে মাঝে মাঝে চোরা চোখে তাকাতে গিয়েই টের পেলাম, ফুলটা সত্যি আছে। এবং ফুলের সুঘ্রাণও পাচ্ছিলাম।

পরদিন ওয়াইজার এসে খবর দিল, জানো ব্যানার্জি, ফুলটা নেই। সকালে উঠে দেখি ফুলদানি খালি। কেউ চুরি করেছে। ধরতে পারলে লোকটাকে আমি খুন করব।

যাই হোক, বিশ-বাইশ দিন বাদে আমরা বন্দর পেলে, ওয়াইজার ডেক ধরে ছুটে এসে বলল,

জান ব্যানার্জি, মা চিঠি দিয়েছে। তারিখটা তোমার মনে আছে! ২৪ জুলাই। সেদিন বিকেলেই সে টিলা থেকে পা ফসকে পড়ে যায়। তারপর সারারাত তার কোনও হুঁশ ছিল না। পরের দিনও না। তখনই সে আমার কাছে চলে এসেছিল। জেন জ্ঞান ফিরতেই ম্রিয়মাণ গলায় বলেছে, ওটা কোথায় রেখে এলাম। আমার হাতেই যে ছিল।

ওটা কী?

ওটা ব্রেজিংস্টার। একটা ফুল।

আমি আর কি বলি। বললাম, হবে হয়তো।

আমি ঠিক ভ্রমণবিলাসী মানুষ নই। ভ্রমণে আগ্রহ কম। নিজের গণ্ডি ছেড়ে কোথাও যেতে আমার ভাল লাগে না। ঘরকুনো স্বভাবের হলে যা হয়। সমুদ্র থেকে ফেরার পর খুব বেশিদূর আর যাইনি। যাওয়ার অজস্র সুযোগ উপেক্ষা করে ভ্রমণের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছি—ইচ্ছে যে করে না তাও না, তবে হয়ে ওঠেনি। সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছি, পাঁচ পাঁচটা মহাদেশের কোথাও না কোথাও গিয়েছি। তার সঙ্গে সমুদ্র এবং দ্বীপের অজস্র ছবি কিংবা বর্ণমালা বলা যায় এমনই গেঁথে আছে স্মৃতিতে যে, মনেই হয়নি আর কোথাও গিয়ে নতুন কিছু আরও দেখা যেতে পারে।

আসলে অলস এবং কুঁড়ে মানুষের যা হয়। ফলে আমার যা ঘোরাঘুরি ওই সমুদ্রে। নিছক ভ্রমণের জন্য সমুদ্রে যায়নি, আহার এবং উত্তাপের খোঁজেই এই যাওয়া। সখের ভ্রমণ এটা যে নয় বুঝি, সামান্য নাবিকের কাজ, উদয়াস্ত পরিশ্রম, এতে সখ এবং সৌখিনতা কিছুই থাকে না।

যাই হোক, পৃথিবী ঘুরে দেখায় ছোট ছোট অনেক স্মৃতিই যে আশ্চর্য ভ্রমণ হয়ে আছে আমার কাছে, এখন সেটা ভালই বুঝি।

সেবারে নিউপ্লাইমাউথ বন্দর থেকে মাটি টানার কাজে দক্ষিণ সমুদ্রে যাওযাব কথা। 'কোরাল সিতে আমরা যাচ্ছি। কোম্পানির নতুন চুক্তি, বছরখানেক ধরে আমাদের জাহাজ এস এস সিওলব্যাঙ্ক, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডের উপকূলে ফসফেট সরবরাহ করবে।

জাহাজীদের মন খুবই খারাপ। কবে দেশে ফেরা যাবে কি আদৌ যাবে না এমন নানা উৎকণ্ঠাতে আমরা ভুগছিলাম।

সালফার বোঝাই জাহাজ নিয়ে আমরা নিউপ্লাইমাউথ বন্দরে এসেছিলাম। মিসিসিপি নদীর কিনার থেকে জাহাজে সালফার তুলে নেওয়া হয়েছিল। শহরটার নামই পোর্ট অফ সালফার। নদীর পাড়ে ছোট্ট ছিমছাম শহর। দূরে অদূরে অজস্র তেলের পিপে এবং নদীর পাড়ে কিছুদূর গেলে আশ্চর্য এক বনভূমি।

নদীর প্রায় মোহনার কাছে বন্দরটি। জাহাজ বোঝাই হতে আটদশ দিন লেগেছিল। এক সকালে জাহাজ দড়িদড়া তুলে ছেড়েও দিয়েছিল—তারপর ক্যারেবিয়ান সমুদ্র এবং পানামা ক্যানেল পার হয়ে প্রশান্ত মহাসাগর এবং সোজা প্রায় একমাস জাহাজ চালিয়ে এই নিউপ্লাইমাউথ বন্দরে এসে হাজির হয়েছিলাম।

সালফার বোঝাই জাহাজ খালি করতে একটু বেশি সময় লাগে। সালফারের উগ্র ঝাঁজে নাক-মুখ জ্বালা করত। সারা ডেকময় সালফার উড়ছে। প্রায় কুয়াশার মতো বাতাসে ঝুলে থাকত সালফারের গুঁড়ো।

উইনচ্ মেরামতের জন্য সারাদিনই ডেকে ছোটাছুটি করতে হত আমাকে। পাঁচ নম্বর ইনজিনিয়ারের দোসর আমি। সারাদিন খাটাখাটনির পর ডেক অ্যাপ্রেন্টিস ওয়াইজার কিনারায় নেমে যাবার জন্য ছটফট করত। কাজকাম শেষ করে স্নান সেরে এবং পোশাক পালটে তার কাছে হাজির না হলে সে ডেক থেকে নামত না। আমি আর ওয়াইজার বন্দরে ঘুরে বেড়াতাম।

জাহাজ খালি করতে এখানেও প্রায় পক্ষকাল লেগে গেল। জাহাজ সাফসোফ, ধোওয়া মোছার কাজ চলছে। যে কোনওদিন চব্বিশ ঘণ্টার ফ্ল্যাগ উড়িয়ে দেওয়া হতে পারে। জাহাজ যে দক্ষিণ সমুদ্রে যাচ্ছে কানাঘুষায় চাউর হয়ে গেছে। কিন্তু কোনও নোটিশ না পড়ায় জাহাজিরা বড়ই দুশ্চিন্তায় আছে।

দক্ষিণ সমুদ্র তো ভাল জায়গা নয়। যদিও দক্ষিণ সমুদ্রই আসলে কোরাল সী, জাহাজীরা জানেই না। এই হচ্ছে জাহাজীদের নসীব। তারা সব সমুদ্রের নামকরণ করে থাকে নিজেদের পছন্দ মতো। কোরাল-সীকে তাবা দক্ষিণ সমুদ্র বলেই জানে। সেখানে সব ফসফেট দ্বীপের ছড়াছড়ি। সেই দরিয়ায় যুদ্ধের সময় জাপ সেনাদের বিশাল নৌঘাটি ছিল—তার খবর সব জাহাজিরাই রাখে। আসলে ওটি একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকা। শয়ে শয়ে জাহাজডুবি, জাহাজের সব কঙ্কাল সমুদ্রের গভীরে ডুবে আছে, এবং এমন আতঙ্ক যে তাদের, ওখানে জাহাজ নিয়ে গেলে ফেরা দায়।

ওয়াইজার ছেলেটি আমার বয়সী। ফলে বন্ধুত্ব। আমরা দুজনই একমাত্র কমবয়সী নাবিক জাহাজে।

সারাদিন কাজকামের পর ছুটি। আমি আর ওয়াইজার একসঙ্গে নেমে যেতাম জাহাজ থেকে। বন্দরটি পাহাড়ি এলাকায়। শহর ধাপে ধাপে উপরে উঠে গেছে। বন্দর এলাকাতেই ট্রাম পাওয়া যেত। ট্রামে চড়ে শহরে ঢুকে যেতাম। দালান কোঠা পাহাড়ের ঢালুতে প্রায় নেই বললেই চলে। লাল নীল রঙের কাঠের ঘরবাড়িই বেশি। আর সব বাড়ির সামনে ফুলগাছের ছড়াছড়ি। অজস্র লাল সাদা গোলাপের ওড়াউড়ি বাগানে লক্ষ্য করতাম। যাবার সময় কেউ জানালায় দাঁড়িয়ে হাই করলে, আমরা হাত তুলে দিতাম। কখনও কোনও সমবয়সী মেয়ে সুযোগ পেলে ফুলের গুচ্ছও তুলে দিত হাতে। আমরা যে হাজার হাজার মাইল সমুদ্র অতিক্রম করে তাদের দেশে হাজির হয়েছি, আমাদের চলাফেরা কিংবা আচরণে তারা বোধহয় টের পেত।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময় বলে ঠাণ্ডা কম। সমুদ্র থেকে উত্তুরে হাওয়া উঠে এলেও, শীতের আমেজ খুবই উপভোগ্য। অদূরে লায়ন রকে পাখি উড়ে যেত সমুদ্র পার হয়ে, শহরের পেছনে এগমন্ট হিলের তুষার রেখাও গোচরে আসত। এক আশ্চর্য ছবি হয়ে থাকত বিকেলটা, আমরা দুজন কমবয়সী জাহাজির কোনই যে গন্তব্যস্থল নেই, আমাদের চলাফেরায় টের পাওয়া যেত। কোনও সন্ধ্যায় সীম্যান ক্লাবেই হয়তো আমরা মজে গেলাম। ক্যান ভর্তি বিয়ার, আর নানা রকমের ইনডোর গেমসের ছড়াছড়ি। কখনও মঞ্চে গান বাজনারও আয়োজন হত। বারের দিকটায় উঁচু লম্বা এবং এক মুখ দাড়ি নিয়ে যে লোকটি কাউন্টার সামলাত তাকে দেখলে মনে হত নির্ঘাত লোকটি একসময় সমুদ্রে তিমি শিকার করে বেড়িয়েছে। তাঁর একটা পা কাঠের।

তার সম্পর্কে আমার কৌতূহলে ওয়াইজার বিরক্ত হয়ে বলত, আরে না না, কোনও উপন্যাসের নায়ক হতে পারে না। সে সামান্য একজন সী-ম্যান ছাড়া কিছু নয়। চল না, লোকটা কি বলে শুনি।

আমার, লোকটাকে দেখলেই ভয় হত। এক থাবড়ায় আমার যে খুলি উড়িয়ে দিতে পারে, তার কাছে আমার মতো অর্বাচীনের যাওয়া সাজে না। এত কৌতূহলও মানায় না। লোকটির মুখ মাউরিদের মতো দেখতে। এই এলাকার এরা উপজাতি, এবং এরাই আসলে দ্বীপের আদি অধিবাসী। মাউরিরা অবশ্য এত উঁচু লম্বা হয় না। বেঁটেখাটোই হয় তারা। দোকানে, কিংবা রাস্তায় ফল বিক্রির দোকানে অথবা নানা কাজেই তারা জাহাজ ডেকে উঠে আসে—চুল ধূসর, গায়ের রঙও ধূসর, বেঁটেখাটো হয়ে থাকে, হাত পা খুবই মজবুত, কিন্তু এই দীর্ঘাকায় মানুষটা দাঁড়িয়ে থাকে নিজের মতো, ইশারায় কাজ সামলায়। তাকে কারও সঙ্গে কথা বলতেও দেখিনি।

ওয়াইজারের পাল্লায় পড়েই কাউন্টারে গিয়ে কথা বলতেই অবাক, সে ইশারায় কথা বলছে।

আসলে ওয়াইজারের সঙ্গে আমার বাজি ছিল, লোকটি নির্ঘাত একজন তিমি শিকারী। ওয়াইজারের যুক্তি, ধুস তিমি শিকারীরা কখনও কাউন্টার সামলায় না। ওদের জাত আলাদা।

বাজি ধরতে গিয়ে হ্যাপা সামলাতে হল। সত্যি লোকটা তিমি শিকারী তো নয়ই, এমন কি কথাও বলতে পারে না। লোকটি বোবা। পকেটে তার একটি নোটবুক এবং পেনসিল।

কিন্তু লোকটির হাতের লেখা দেখে আমরা অবাক।

বোবা, তবে জন্মগত দিক থেকে নয়, এটা বুঝতেও অসুবিধা হল না। সেই আমাদের খবর দিল, এই শহরের প্রাচীন বনভূমিটি না দেখে গেলে আমরা আশ্চর্য কিছু মিস করব।

প্রাচীন বনভূমিটির নাম পিকোকোরা পার্ক।

পিকাকোরা পার্কের নাম আমাদের শোনা। কিন্তু এটি একটি প্রাচীন বনভূমি, এবং তার গাছপালা

বিশেষ করে কৌরিপাইনগুলির বয়স তিন চার হাজারের বেশি এমন খবর আমাদের কেউ দেয়নি।

বন্দরে নেমে শহরের দ্রষ্টব্য জায়গাগুলি ঘুরে দেখার প্রবণতা কম বেশি আমাদের দুজনেরই আছে।

যেমন, এই বন্দরের ঠিক নিচে একটি সুন্দর বেলাভূমিও আছে। জাহাজঘাটার ঠিক পাশেই। এমন কি সূর্যাস্তের সময় ক্রেনের লম্বা ছায়া সেই বেলাভূমি পার হয়ে সমুদ্রে মিশে যায় এবং শহর থেকে সকালে যে সব সুন্দরীরা নেমে আসে অবগাহনের নিমিত্ত, তারাও সেই ক্রেনের ছায়া সমুদ্রে মিশে না গেলে উঠতে চায় না। সমুদ্রে সাদা জাহাজ এবং দূরে অদূরে অ্যালবাট্রস পাখিদের বিচরণ তাদের সারাদিন মুগ্ধ করে রাখে। ওয়াইজার ছুটির দিনে সেই বেলাভূমিতে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকত। আমি তার পাশে খুবই অনুগ্রহভাজনের মতো ফিসফাস কথা বলতাম। আমরা দুজনেই যে হোম-সিকনেসে ভুগছি—একটা পাখি উড়ে গেলেও তা টের পেতাম।

পিকাকোরা পার্কে যেতে হলে ট্রামে করে যাওয়াই সুবিধেব। এতটা রাস্তা হেঁটে যাওয়া কঠিন, অবশ্য শহরের আনাচে-কানাচে ছোট ছোট উপত্যকায় আপেলের বাগান আছে—এবং চেনা জানা কাউকে পেলে, উপত্যকা পার হয়ে ঘাসের মসৃণ চত্বর অতিক্রম করে কখনও সিঁড়ির মতো পাহাড়ি ধাপ ভেঙেও সেখানে যাওয়া যায়। যারা সত্যি সেই প্রাচীন বনভূমির সৌন্দর্য উপভোগ করতে যায়, তারা কেউ ট্রামে চড়ে যায় না। ট্রামে কবে শহরের শেষদিকে নেমে কিছুটা হেঁটে গেলেই পিকাকোরা পার্কের শুরু। পাকা রাস্তাও আছে ভেতবে। এমন কি সুন্দর সাজানো কাচে ঢাকা দোকানও আছে। খাবার এবং পানীয় সবই পাওয়া যায়। গাছের ছায়ায় লম্বা খাল কেটে নৌকা বিহারের বন্দোবস্তও আছে। সোজাসুজি সহজ রাস্তায় গিয়ে গাছগুলির মহিমা টের পাওয়া যে কঠিন, কল্পনার তিমি শিকারী মানুষটিই তার নোটবুকেব সাহায্যে আমাদের ব্যাখ্যা করেছিল।

তিনি নোটবুকে লিখে জানিয়েছিলেন, গাছ দাঁডিয়ে থাকে।

ওয়াইজার ইশারায় বলেছিল, গাছ দাঁড়িয়ে থাকবে না তো হাঁটবে?

তিনি হেসে দিয়েছিলেন।

গাছ হাঁটে বলেছি! গাছ হাঁটে না। একই জাযগায় দাঁড়িয়ে থাকে হাজাব হাজাব বছর ধবে। একই জায়গায় নিজের মতো বেঁচে থাকে। খ্রিস্টের জন্মের আগে, কিংবা তারও আগে থেকে তারা পৃথিবীর জলবায়ু ভোগ কবছে। কোনও গাছের বয়স তো রোমান সভ্যতার কাছাকাছি। এতকাল বেঁচে থেকে গাছ কি আর গাছ আছে! যাচ্ছ যখন, মনোবাসনা জানিয়ে দিয়ো। যার যা মনোবাসনা, হাতে হাতে ফল পাবে।

তারপর জানিয়েছিল, যত দুর্গম পথ তত তীর্থক্ষেত্রের মাহাত্ম্য। সোজাসুজি সহজ রাস্তায় গেলে মাহাত্ম্য যে কমে যায় বোঝো না! যাও না, গেলেই বুঝতে পারবে, সহজ রাস্তায় গেলে গাছগুলো দেখে অভিভূত নাও হতে পারো। পাহাড়ের ধাপ ভেঙে, জঙ্গল পাব হয়ে যাও, বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে দেখবে তারা তখন তোমার অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে আছে। কী মনোরম ভঙ্গি, ডালপালা দুলছে, আকাশ ঢেকে রেখেছে ডালপাতার ছায়ায়, বিশাল কাণ্ড—শিকড়গুলো তিমি মাছের মতো কিছুটা ভেসে আছে, কিছুটা প্রোথিত হয়ে আছে মাটিতে।

ওয়াইজার ওর পরামর্শে যেন কিছুটা বিরূপ। সে আমার কানের কাছে মুখ এনে বলেছিল, মাথায় ছিট আছে। আমরা সোজাসুজিই যাব। পাহাড ডিঙিয়ে যাই, আর জঙ্গলে হারিয়ে যাই—

আমার কিন্তু তাঁর পরামর্শ খুবই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছিল। দু-ভাবেই গেছি। ছুটির দিন ছাড়া উপত্যকা পার হয়ে ঘাসের মসৃণ চত্বর অতিক্রম করে, সিঁড়ির মতো পাহাড়ী ধাপ পার হযে বনজঙ্গলের ভিতর দিয়ে গাছগুলোর কাছে পৌঁছানো যেত না।

ট্রামে গেলে ঘণ্টাখানেকও লাগত না। আমরা দু-ভাবেই গিয়েছি। বনজঙ্গলের ভিতর দিযে উপত্যকার আপেল বাগান পার হয়ে গেছি। সকালে বের হলে দুপুর হয়ে যেত। সঙ্গে খাবার। পাহাড়ের মাথায় গাছের ছায়ায় বসে ডিম পাঁউরুমি কিংবা, আপেল খাওয়ার আনন্দই আলাদা।

এমনিতে গাছগুলো দেখতে খুবই সাদামাটা। শুধু বিশাল আকৃতি ছাড়া তার কোনও মোহ নেই। সমস্ত পার্ক জুড়েই এই সব গাছের সমারোহ। ভিড়ও কম হয় না। সাদামাটা গাছগুলোর নিচে বসলেই,

হাজার হাজার বছর আগের কোনও সভ্যতার ছবি চোখে ভেসে উঠত। যার যেমন। যেমন তিন চার হাজার বছর আগেকার গাছ হলে মনে তো হবেই—তখন কুন্তী দময়ন্তী মন্দোদরীরা তরুণী ছিলেন—তখনকার সেই সব মানুষ, রথ, ঘোড়া, অশ্বমেধ যজ্ঞ, সত্যবতীর কথাও মনে হত। গাছের বয়সের সঙ্গে আমার নিজের দেশের প্রাচীন সভ্যতার কথা মনে হত—গাছটা তখন চারাগাছ এবং কোনও নদীতে ধীবরের নৌকায় সম্রাটের উপগত হবার বাসনা জাগছে এ-সবও কেন জানি মনে হত আমার। কারণ এই সব গাছ যেন রামায়ণ মহাভারতের সময়কার গাছ। গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে বসে থাকার মজাও কম না। গাছের কাণ্ডে হাত বুলিয়ে প্রাচীন সভ্যতার স্পর্শ পাবার চেষ্টাও কম করিনি।

গাছগুলির এত বয়স হয় কি করে, এতকাল বেঁচে আছে কী করে এমনও মনে হত। গাছের বয়স কীভাবে ঠিক করা হয় তাও জানি না। গাঁছের কাণ্ডে প্লেট ঝোলানো, তাতে কোন্ গাছটি কবে জন্মেছে তার ঠিকুজি কুষ্ঠি দেওয়া আছে। গাছ একটি প্রাণ পিকাকোরা পার্কে গিয়েই প্রথম টের পাই। নিউজিল্যান্ডারদের গাছের প্রতি মায়া-মমতা একটু বেশি। কী যত্ন গাছের! কাছে যাওয়া যায়, হাত দিয়ে দেখাও যায়, তবে গাছের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয় এমন চেষ্টা না করাই ভাল। ডাল, পাতা, ছালবাকল কিছুই সঙ্গে নেওয়া যায় না স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে।

জাহাজ সাফসোফ হয়ে গেল অথচ দক্ষিণ সমুদ্রে যাত্রার কোনও উদ্যোগ আয়োজন নেই। সুতরাং শহরে ঘুরে বেড়ানো, বেলাভূমিতে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকা অথবা কোনও আপেল বাগানে ঢুকে মাউরি যুবকের সঙ্গে সমুদ্রে মাছ ধরার গল্পে মসগুল হয়ে থাকা ছাড়া অন্য কোনও উপায়ও নেই। পিকাকোরা পার্কে যেতেও আর ভালো লাগে না। জাহাজ কেন যে দড়িদড়া তুলে আবার সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছে না তাও জানার উপায় নেই। জাহাজ কবে ছাড়বে, বলতে পারেন একমাত্র কাপ্তান, তিনিও বোধ হয়, সঠিক কিছু জানেন না, এজেন্ট অফিস থেকে নির্দেশ না এলে তার কিছুই করার উপায় নেই।

জাহাজ বন্দর ধরলে এমনিতেই কাজকর্মের চাপ কম থাকে। সমুদ্রেই মেরামতির কাজগুলো সেরে ফেলতে হয়। বিশেষ করে উইনচ ম্যাসিন—জাহাজ ঘাটে ভিড়লেই উইচগুলির উপর বেশি চাপ পড়ে। জাহাজটি খুবই পুরোনো। তার মেসিন আর কতটা ভাল হতে পারে। ঝড়ের সমুদ্রে ঢেউ আছড়ে পড়লে নোনাজলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ডেক। স্টিম পাইপ থেকে স্ট্রেপার কিছুই বাদ যায় না। নাট-বল্টু জ্যাম হয়ে থাকে। কাজেই উইনচে মেরামতির কাজ সারা সফর লেগেই থাকে। কাজটা করে করে এত হাত পেকে গেছে যে ইচ্ছে করলে সারা ডেকের দায়িত্ব অনায়াসে নিয়ে নিতে পারি। ঘাটে জাহাজ ভিড়লে শুধু দেখা কোনও মেসিন গড়বড় করছে কিনা। ডেরিকে মাল নামানোর সময় একটা উইনচও গড়বড় করেনি। ফলে কাজ থেকে তাড়াতাড়িই ছুটি পেয়ে যাই।

জাহাজে আমাদেব জাহাজির সংখ্যাও কম না। ডেক সারেঙ, ইনজিন সারেঙ, সুখানি, কশপ, বয় বাচুর্চি, ডংকিম্যান, গ্রিজার—কত কিসিমের যে লোক লাগে। ইনজিনরুমের জাহাজি বলে, আমার কাজ পাঁচ নম্বর ইনজিনিয়ারের সঙ্গে। কাজের ব্যাপারে কৈফিয়ত তলব করতে পারেন একমাত্র তিনিই। আমার ওপরওয়ালা বলে তিনিই জাহাজে আমার বেশি খোঁজখবর রাখেন। ওয়াইজার ডেক অ্যাপ্রেন্টিস, তাকেও সারাদিন ডেকে পড়ে থাকতে হয়—ফলে দুজনের ভাব ভালবাসা আমাদের একটু বেশি।

শহরটায় বড়দিনের উৎসব—বেশ সাজগোজ শুরু হয়ে গেছে। বাড়িগুলি রঙিন কাগজে আর ফানুসে সেজেগুজে, দেবদারু পাতায় কিংবা গোলাপের রঙিন পাপড়িতে ওড়াউড়ি শুরু করে দিয়েছে। জাহাজেও ভাল মন্দ খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। সকালের দিকে কুয়াশা থাকলেও দুপুরের হিমেল হাওয়া তা উড়িয়ে নিচ্ছে। রাতের আকাশে অনেক তারাও ফুটে থাকে—আলোর মালা পরে থাকে শহরটা। দূরে প্রেসবিটারিয়ান চার্চের চুড়ো আলোকমালায় সজ্জিত—রাতে ডেকে দাঁড়ালে স্বপ্নময় এক দেশের ছবি চোখে ভেসে ওঠে।

রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর ডেক-এ দাঁড়িয়ে থাকি। রেলিঙে ঝুঁকে শহরের বাড়িঘর দেখি। ওয়াইজার পাশে কখনও থাকে, কখনও থাকে না। একরাতে দেখি ডেক ধরে কেউ পিছিলের দিকে আসছে। বুড়োমতো কেউ। একা নন তিনি, সঙ্গে তার কেউ আছে। ওয়াইজারই তাঁকে আফটার পিকের দিকে নিয়ে আসছে। আর আশ্চর্য, হাতে লণ্ঠন নিয়ে বুড়ো ডেকে কেন যে উঠে এসেছেন। এত

আলো ডেকে, কিংবা রাস্তায়ও তো আলোর রোশনাই—সব কিছু ঝলমল করছে, তিনি কেন যে এত রাতে লণ্ঠন হাতে ডেকে উঠে এসেছেন, জাহাজিরা কৌতূহলী হয়ে ভিড় বাড়িয়ে তুলছে ডেকে। ওয়াইজার আগে আগে।

সে-ই পথ চিনিয়ে যেন নিয়ে আসছে। ওয়াইজারের পেছনে বুড়োমানুষটি কালো কোট গায়ে, মাথায় কালো টুপি, মাস্তুলের আলোতে সবই খুব স্পষ্ট। পেছনে আরও কেউ যে আছে তাও বোঝা যায়।

ওয়াইজার প্রায় দৌড়ে পিছিলে উঠে এল।

এসেই বলল, এই ব্যানার্জি, ওরা আসছে। ওদের সঙ্গে তুমি কথা বল।

ওরা কারা কিছুই জানি না, কি কথা বলব তাও বুঝতে পারছি না, কিছুটা বিমূঢ় গলায় বললাম কারা আসছে?

ক্যাথরিন আর ওর ঠাকুরদা।

কে ক্যাথরিন, কে ঠাকুরদা। তারা আমার সঙ্গে দেখা করবেন কেন, কি দরকার, তখনই দেখলাম পিছিলের সিঁড়ি ভেঙে তিনি উপরে উঠে এসেছেন। তার আড়ালে আর একজন। ডেকে তাকে দেখাই যায়নি, দাদুর পেছনে খুব সঙ্কোচের সঙ্গে জাহাজে উঠে এসে স্বস্তিতেও ছিল না, আমারই বয়সী, কিংবা তরুণীই বলা চলে। সাদা স্কার্ট এবং লাল জ্যাকেট গায় মেয়েটি কিছুতেই বুড়োমানুষটির আড়াল থেকে বের হয়ে যেন আসতে চাইছে না। তখন বাধ্য হয়ে যেন ওয়াইজার না বলে পারল না, ইনি উইলিয়াম বুচার, আর—বলে সে মেয়েটিকে খুঁজে বেড়াল, এবং দাদুর পেছনে দাঁড়িয়ে থাকলে যা হয়, কিছুটা লজ্জা এবং সঙ্কোচ তার—ওয়াইজার বলল, এরা সবাই ইন্ডিয়ান, খুব ভালো মানুষ এরা।

জাহাজ যে ভাল জায়গা নয় মেয়েটা হয়তো ভালই জানে।

মেয়েটি হ্যান্ডশেক করার সময় সামান্য হাঁটু নুয়ে দাঁড়াল।

ওয়াইজার বলল, চল ফোকসালে, কথা আছে।

জাহাজীদের খাবার আলাদা, আস্তানা আলাদা। নিচে নেমে যেতে হয় সিঁড়ি ধরে। ফোকসালের বাঙ্কে আমরা থাকি। এক একটা ঘরে চার পাঁচজনের আস্তানা, জামাকাপড় বিছানা-পত্তর সবই এলোমেলো হয়ে পড়ে থাকে। বললেই নিচে নিয়ে যাওয়া যায় না।

বাধ্য হয়ে বললাম, কি ব্যাপার বলবে তো!

ওয়াইজার বলল, বড়দিনে ওদের বাড়িতে তোমরা খাবে।

তোমরা মানে?

মানে কিছু জানি না। প্রতিবারই বড়দিনে তিনি দু-তিনজন ভারতীয়কে নেমন্তন্ন করে খাওয়ান।

তারপর সবই ভেঙে বলল ওয়াইজার। কাপ্তানই ওঁদের ওয়াইজারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই জাহাজ নোঙর ফেলে আছে, ভারতীয়রা কাজে-কামে জাহাজে উঠে এসেছে, উৎসবের দিনে দুজনকে নিয়ে গেলে কাজের কোনও অসুবিধা হবে না, অবশ্য সেদিন জাহাজেও কাজ-কাম থেকে ছুটি থাকবে।

কাপ্তান পাঠিয়েছেন, আর কিছু আমাদের বলার থাকে না। তবু বললাম, ওয়াইজার, তুমি যাবে না?

আমি যাব কেন? তিনি তো ইন্ডিয়ানদের খোঁজে এয়েছেন, আমার যাওয়া ঠিক হবে না।

আমার সঙ্গে বঙ্কু এবং অনিমেষ যাবে ঠিক হল।

উৎসবের দিন সকালেই ক্যাথরিন এসে হাজির।

ক্যাথি বলল, আমি তোমাদের ওয়েস্ট কোস্ট রোড ধরে নিয়ে যাব।

ক্যাথি নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিল। শহর ছাড়ালেই বড় রাস্তা। এটাই হয়তো ওয়েস্ট কোস্ট রোড।

ক্যাথি বলল, ঐ দেখ, এগমন্ট হিলের চুড়ো। কি, দেখতে পাচ্ছ!

আমরা কিছুতেই অবাক হতে পারি না। কারণ জাহাজ ডেকে দাঁড়ালেই দেখা যায় পাহাড়ের শীর্ষদেশ।

ক্যাথি তার নিজের দেশটা যে কত সুন্দর তারই প্রমাণ দেবার জন্য চঞ্চল হয়ে পড়েছে।

অনিমেষ খুব ডিটো মারছে।

খুবই সুন্দর দেশ ক্যাথি।

অমার বলতে ইচ্ছে হল, তুমি আরও সুন্দর।

ক্যাথির পাশে আমি বসে আছি। তার শরীরের উষ্ণতাও টের পাচ্ছি যেন। সে যে আমাকেই বলছে, যদিও চোখ তার সামনের দিকে, আমাদের নামও বোধহয় তার মনে থাকছে না, আমাকে ব্যানার্জি বলতে শুধু আটকাচ্ছে না তার, সহজেই বলতে পারছে, আমাদের ছোট শহরটা এগমন্ট ন্যাশনেল পার্কের ভিতরে। ডানদিকে ডসন ফল্‌স ফেলে চলে যাচ্ছি। সময় থাকলে সেখানে নিয়ে যেতে পারতাম। ঐ যে দেখছ পাহাড়ের উপর বাড়িটা, ওটা ডসন ফল্‌স টুরিস্ট লজ। ইচ্ছে করলে ছুটি নিয়ে দু-একদিন এখানে থেকে যেতে পার। তবে এখন খুব ভিড়। ফেব্রুয়ারিতে ন'দিন ধরে আমাদের পাইন ফেস্টিভ্যাল। অবশ্য তোমরা হয়তো তখন এখানে থাকবে না।

বন্ধু বলল, থেকে যেতেও পারি। যা একখানা জাহাজ। লজঝরে জাহাজে কেউ কার্গ তুলতেও রাজি থাকে না। কবে ছাড়বে, কোথায় যাবে কিছুই ঠিকঠাক নেই। মাটি টানার কাজ—তাই সই—তাও জাহাজ ছাড়ার কোনও লক্ষণ নেই।

ক্যাথি খুবই সহজভাবে আমাদের গ্রহণ করায় কোনও আর সঙ্কোচ নেই। তিন-চারদিন আগে আলাপ কে বলবে! যেন কত নিকটজন ক্যাথি। সে কিছুটা বিহুল গলায় বলল, ওহ, থেকে গেলে কি যে মজা হবে না।

আমি বললাম, ক্যাথি, মি. বুচার এলেন না, তুমি একা এলে!

দাদুর কি সময় আছে! খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। পৃথিবীর আশ্চর্যতম খাবার তিনি তোমাদের খাওয়াতে চান।

আশ্চর্যতম খাবার, সেটা আবার কি?

ক্যাথি খুবই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল হঠাৎ। আশ্চর্য খাবার, সেটা কি—এমন প্রশ্নে সে যেন কাবু। গুছিয়ে ঠিক বলতে পারবে কিনা, অথবা সেই সব খাবার আমাদের মুখরোচক হবে কিনা, কিছুই সে জানে না। তার কথা বলার ভঙ্গিও এত খটমটো যে বুঝতে খুবই অসুবিধা হয়।

ভেড়ার বাচ্চার আস্ত রোস্ট। কী পছন্দ!

হয়ে গেল! পোড়া মাংস। রোস্ট মানেই আমাদের কাছে পোড়া মাংস ছাড়া কিছু না। চিফ কুকের গ্যালিতে সকালের দিকটায় যাওয়াই যায় না! মাংস পোড়ার গন্ধে বমি উঠে আসে। আমাদের শ্মশানে গেলে যে গন্ধটা পাওয়া যায়, মনে হলেই কেমন গা গুলিয়ে ওঠে। হয় ভেড়া, টার্কি না হয় মুরগি, শূকর, আর রোজ বিফ রোস্ট করা হয় চিফ কুকের গ্যালিতে।

আমরা চুপ করেই আছি।

ক্যাথি বুঝতে পারছে না, আমরা খুশি না অখুশি। সে এক ফাঁকে কান্নি মেরে আমাকে দেখে কি বুঝল, সে জানে, বলল, গ্র্যান্ড-ফাদার এখন মহাব্যস্ত মানুষ। অতিথিদের জন্য ভেড়ার বাচ্চা রোস্ট, আর তোহেরু স্যুপ। পৃথিবীর সবচেয়ে দামি ওস্টার থেকে তৈরি। অকল্যান্ড থেকে তিনি নিজে গিয়ে নিয়ে এসেছেন।

তারপর বলল, তোমাদের এবারে হোয়াইট বেইট না খাইয়েও ছাড়বেন না।

আসলে ঘুরে ফিরে দেশটাকে দেখার লোভে আমরা যাচ্ছি। যত না খাওয়ার লোভ, তার চেয়ে বেশি লোভ ঘুরে ফিরে এই দেশটাকে যতটুকু চেনা যায়।

বন্ধু বলল, আর কতদূর?

ক্যাথি বলল, আর বেশি দূর না। সে ঘড়ি দেখে বলল, মাত্র ঘণ্টা দুই গাড়ি চালিয়েছি। আর আধঘণ্টা লাগবে। আমাদের বাড়ির সামনেও একটা বিশাল কৌরিপাইন গাছ আছে। তোমাদের খারাপ লাগবে না। ক্যাথি নিজে থেকেই অনেক খবর দিল, যেমন ছুটির সময় সে মি. বুচারের কাছে চলে আসে। এখন তো তার অনেক ছুটি—ক্রিসমাস ডে, বকসিং ডে, পাইন ফেস্টিভ্যাল সব একসঙ্গে পড়েছে।

ক্যাথি ফের বলল, আমরা ওয়াতেমো ভিলেজের পাশ দিয়ে যাচ্ছি। ভিলেজ পার হলেই আমরা একটা গুহার মধ্যে ঢুকে যাব। গুহার ভিতর ঢুকলেই দেখবে বিশাল একটা হ্রদ। মাথায় তার পাথরের ছাদ। মৌমাছির বিশাল একটা চাক, যেন লক্ষ কোটি মৌমাছির গুঞ্জন। আসলে ছাদ স্পঞ্জ পাথরে

তৈরি, তার ভিতর থেকে লাল নীল আলো হ্রদের জলে চুঁইয়ে পড়ছে। কোনও আলো ছাড়াই গুহার হ্রদটি এত উজ্জ্বল যে চোখ তোমাদের ধাঁধিয়ে যাবে।

সেখানে না গেলেই কি নয়? অনিমেষ কেমন ভয়ের গলায় কথাটা বলল।

আমি, অনিমেষের মেজাজ কেন যে কিছুতেই বুঝতে পারি না। ব্যাটার কি খাবার লোভ বেশি! খিদে পেলে সে বেশি দেরি করতে পারে না। সকালের ব্রেকফাস্ট না খেয়েই বের হয়েছি। বললেই হয়, কোথাও গাড়ি থামিয়ে কিছু মুখে দিলে ভাল হত।

ক্যাথি, অনিমেষের কথায় কোনও পাত্তা দিল না। সে তার কথাই বলছে।

দেখবে নৌকায় ভেসে বেড়াচ্ছে কত সব মানুষ। মনে হবে একটা রঙিন ছবি দেখছ। গ্লো ওয়ার্মি গ্রুতোতে কয়েক হাজার কোটি লার্ভা পাহাড়ের ছাদে দেয়ালে যাদুকরের মতো আলোব মালা তৈরি করছে। এ-সব দেখার জন্য পৃথিবীর কত দেশ থেকে কত লোক চলে আসে। এত কাছ দিয়ে যাচ্ছি, তোমাদের না দেখিয়ে নিয়ে গেলে গ্র্যান্ডফাদার রাগ করবেন।

অনিমেষ ঢোক গিলে বলল, কিছু খেয়ে নিলে হত না।

ক্যাথি এবার গাড়ি থামিয়ে রাস্তার পাশে রেখে নেমে গেল। পেছনের হুড খুলে ঝাঁকা ভর্তি নীল কাগজে মোড়া প্যাকেট বের করে হাতে হাতে দিয়ে দিল। আপেল কেক স্যান্ডউইচ সবই পাওয়া গেল প্যাকেট খুলে ফেললে। বেশ আয়াস করেই পাওয়া গেল। এবং ফ্লাসকে চা কফি, যার যা পছন্দ।

তারপর গ্রো ওয়ার্মি গ্রুতো ঘুরে ঘুরে দেখা গেল। হ্রদের জলে নৌকায়ও উঠে গেলাম। মন্দ লাগল না। বিশেষ করে ক্যাথির মতো সরল সহজ একজন মেয়ে কাছে থাকলে সব কিছুই ভাল লাগার কথা।

যাইহোক, রাস্তাতেই ক্যাথি বলল, তোমাদের কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো? আমার গ্র্যান্ডফাদারের এটা বলতে পার বাৎসরিক কাজ। তিনি তাঁর দেশকে ভুলতে পারেন না। আমাদের পূর্বপুরুষরা বৃটিশ। ভারতে তাদের সাত আট পুরুষের বাস। আমার গ্র্যান্ডফাদারের সব প্রিয়জনই তোমাদের দেশের মাটিতে শুয়ে আছেন। আমার বাবাও। ইন্ডিয়া স্বাধীনতা পেল, গ্র্যান্ডফাদার এখানে চলে এলেন!

আমরা কেমন ক্যাথির এই কথাতে দমে গেলাম। ক্যাথির বাবা নেই। ভারতবর্ষের মাটিতেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়েছে।

তোমার মা?

মা দুনোদিনে আছেন আমার স্টেপ ফাদারের সঙ্গে।

আমরা আর কেন জানি কথা বলতে পারছিলাম না। এই আমন্ত্রণের সঙ্গে বিষাদের ছোঁয়া আছে। স্মৃতি। ক্রিসমাস উৎসবে কোনও ভারতীয়ের উপস্থিতি, সেই প্রিয়জনদের যেন স্মরণ করার জন্যই।

এরপর আর লঘুভাবে ক্যাথির সঙ্গে কথা বলা যাবে না। আমরা গম্ভীর হয়ে গেলাম।

পাশেই ছোট্ট মাউরি গ্রাম ভনিভুতো। ঠিক বড় রাস্তার উপরে। মাঠে ভেড়ার পাল চরাচ্ছে একজন মাউরি যুবক। প্রায় চারপাশটা যেন তৃণভূমি। ছোট ছোট কাঠের বাড়িঘর, পাশ দিয়ে বয়ে গেছে কোনও শীর্ণকায় নদী। ওপরে কাঠের পাটাতন। তার উপরে উঠে গেলে প্রায় ফার্লং-এর মতো দূরে দেখতে পেলাম ক্যাথির গ্র্যান্ডফাদার সাদা পোশাকে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছেন।

ক্যাথির গ্র্যান্ডফাদার বাড়িটা করেছেন কিছুটা বনাঞ্চলের ভিতর। বাড়ির পেছনে সামনে বটগাছের ছড়াছড়ি। ডানদিকে লন, তারপর সেই গোলাপ ফুলের সমারোহ—ফুল ফোটেও অনেক, এ-দেশে বাড়ি থাকবে ফুলের বাগান থাকবে না, ভাবাই যায় না। বিশাল কাঠের পাটাতনের উপর বাড়িটা। সবুজ লতাপাতা আঁকা কার্পেট পাতা ঘরগুলিতে। আমরা কাঠের সিঁড়ি ধরে কিছুটা উপরে উঠে গেলাম। বসার ঘরে এনে ক্যাথি আমাদের বসাল। বুচার সাহেব সাদা উলের পাতলা সোয়েটার গায়ে এসে বসলেন আমাদের পাশে। আমাদের দেশ বাড়ির গল্প শুরু হবার মুখেই ক্যাথি আমাকে হাতের ইশারায় ডাকল।

তার কাছে উঠে গেলে, সে আমাকে ভিতরের দিকের একটা ঘরে নিয়ে গেল। সে এক দৃশ্য, মা মেরি এবং কোলে যীশু, পাইন গাছের ডাল এবং তাতে অসংখ্য টুনি বালব জ্বলছে। পাইন গাছের আড়ালে একটি ছোট মূর্তি।

ক্যাথি হাঁটু গেড়ে বসল।

সে পরেছে সুন্দর সাদা গাউন। চকমকে পাথরে গাউনে লাল রঙিন কাজ। তাকে খুবই মহার্ঘ মনে হচ্ছিল। সে আমাকে তার পাশে হাত টেনে বসাল। আমরা নতজানু হয়ে বসলাম। হঠাৎ কেন যে কনুই দিয়ে সে আমায় ঠেলা দিল বুঝলাম না।

সে চোখ বুজে আছে। আমি চোখ খোলা রেখেছি। এটা বোধ হয় ঠিক হয়নি। যাই হোক, আমিও চোখ বুজে ক্যাথির ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করাতে সে বোধ হয় খুবই খুশি। সে দৌড়ে গিয়ে তার গ্র্যান্ডফাদারকে ডেকে আনল। আমি বসেই আছি চোখ বুজে। এতে ক্যাথির গ্র্যান্ডফাদারও খুব মুগ্ধ। দেবদ্বিজে ভক্তি থাকলে বুড়ো মানুষেরা খুশি হয় আমিও জানি। বন্ধু অনিমেষ বুড়োর সঙ্গে বাড়িটা ঘুরে দেখছে। ক্যাথি আমাকে বাড়ির ভেতরকার ঘরগুলো দেখাচ্ছে। খুবই দামি কাঠের দেয়াল, এবং মেহগিনি কাঠের দরজা, জানলা, দেয়ালে দামি সব ছবি, কোনওটায় অশ্বারোহী পুরুষ, কোনওটায় এক বালিকা দাঁড়িয়ে আছে নদীর পাড়ে।

ক্যাথির পিসিরাও এসেছেন। তাদের ছেলেমেয়েরা আমাদের একদম পাত্তা দিচ্ছে না। নাই দিতে পারে, শত হলেও আমরা নেটিভ, ইংরাজি ভাষাটাও ভাল জানা নেই—তাদের কাছে আমরা অপোগণ্ড ছাড়া কিছুই না। কোনওরকমে কাজ চালিয়ে নিতে পারি আমরা, ক্যাথির কথাবার্তাও মাঝে মাঝে ঠিক বোধগম্য হয় না। তার উচ্চারণ বিশেষ সুবিধের না, আমাদের কথাতেও নানা গোজামিল থাকে—বিশেষ করে আমি ক্যাথির সঙ্গে স্বাভাবিক কথাবার্তা চালিয়ে যেতে পারলেও, বুচার কিংবা তাঁর মেয়েদের সামনে কথা বলতে আড়ষ্ট বোধ করি। ভুলভাল ইংরাজি বলতে অনিমেষ বন্ধু দুজনেই খুব ওস্তাদ। ওয়াইজার সঙ্গে থাকলে খুবই সুবিধে হত। আফসোস করে লাভ নেই, এখন যত সত্বর লাঞ্চের আয়োজন হয় ততই মঙ্গল। বেলা তো কম হল না। ক্যাথি বাড়ির সবই দেখাল। কেবল খাওয়ার ঘরটা দেখাল না। এমন কি এ বাড়িতে যে তিনজন মহামান্য অতিথিকে নিয়ে আসা হল, তাদের কি খাওয়ানো হবে, তার কোনও ব্যবস্থা দেখছি না।

ক্যাথি এখন আমাকে নিয়ে পড়েছে।

এই।

বল।

চল, আমরা এখন গীর্জায় যাব।

চল। যেতে হবে যখন, কি আর করা।

গাড়িতে হৈ হৈ করে সবাই উঠে পড়ল। বাড়ির কাছাকাছি কোনও গীর্জা যে নেই গাড়িতে উঠে বসতে বলায় তা টের পেলাম। তিনটে গাড়ি, দুজন মাউরি ড্রাইভার এবং ক্যাথি তার গাড়িটা নিয়ে রওনা হল। আমি আগের মতোই ক্যাথির পাশে। সে আমাকে কিছুতেই ছাড়ছে না।

যা ইচ্ছে করুক। বিকেলে আমাদের রেখে আসতেই হবে জাহজে। ঘড়িতে দেখলাম, এগারোটা কুড়ি।

মিনিট কুড়ি গাড়ি চালিয়ে আধা শহর মতো একটা জায়গায় আমাদের নিয়ে আসা হল। গাড়ি থেকে নেমে গেলাম। তারপর একটা টিলা পার হয়ে দেখলাম, বিশাল এলাকা জুড়ে একটা মাঠ। চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া। দূরে সান বাঁধানো রাস্তার মুখে গির্জা।

মাঠে মেলা গাড়ি, এবং মেলার মতো মনে হয় জায়গাটা। এ-সব মেলাতেই আমাদের দেশে তালপাতার বাঁশি বিক্রি হয়। যদিও আমার হাত ধরে আছে ক্যাথি, সে কি আমার কথাবার্তায় কিছুটা আমাকে নির্বোধ ভেবেছে। রাস্তার ক্যাথি, আর গির্জার ক্যাথি যেন একেবারে আলাদা মেয়ে।

ক্যাথি আমার হাত ধরে সামনের সিটে বসিয়ে দিল। গির্জার হলে একটি আসনও আর খালি নেই। চেয়ারের ভিতর থেকে একটা বই বের করে নিল। সে ওটা আমার হাতে দিল। সে নিজেও পাশের আসনে বসে আর একটা ছোট্ট বাইবেল বের করে খুব মনোযোগ সহকারে পাতা ওলটাতে থাকল। সামনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছেন ফাদার। মঞ্চের নিচে পিয়ানো, দেয়ালে যীশুর জীবনের নানা কাহিনী ছবিতে ধরা আছে। সুগন্ধ উঠছিল। আমাদের ঠাকুর দেবতার ঘরে যেমন ফুল এবং চন্দনের গন্ধ

পাওয়া যায়। উপাসনালয়ে ঢুকে আমি নিজেও খুব একটা ভাল ছিলাম না। ছিমছাম এক শান্ত পরিবেশ। ধর্মীয় সঙ্গীত বোধ হয় সবাই গাইছে। পকেট বুকের সাইজে সব বাইবেল, সবার হাতে ধরা। ফাদার কি বলছেন, সঙ্গে সঙ্গে সবাই পাতা উলটে প্রার্থনারত মানুষেরা আরও বেশি মনোযোগী হয়ে উঠছে। আমি এ-সবের কিছুই বুঝছি না। ক্যাথি যে ভাবে বাইবেলের পাতা উলটে আমার হাতে তুলে দিয়েছিল, ঠিক সেই একইভাবে বসে থাকলে সে কনুই দিয়ে আবার একটা ঠোক্কর না দিয়ে পারল না।

কোন্ পাতায় কি আছে আমার তো কিছুই জানা নেই। দূরের মঞ্চ থেকে ফাদার কি যে বলছেন, কিছুই বুঝতে পারছি না।

ক্যাথি ঝুঁকে প্রায় খুবই গোপনে পাতা উলটে দিল।

দেখলাম লেখা আছে পাতার উপর—গড ইজ নেভার উইকেড অর আনজাস্ট।

আবার পাতা উলটানোর পালা। পাতা উলটাইনি। ক্যাথি হাতে চিমটি কেটে দিল।

এবারেও ক্যাথি বই-এর পাতা উলটে দেবার সময় সামান্য ঝুঁকে পড়ল আমার মুখের কাছে। ক্যাথির চুলে ভারি মিষ্টি গন্ধ। গভীর নীল, চুলেব গন্ধ ভগবানের চেয়ে বেশি কাছের। আমি কিছুটা অস্থির হয়ে উঠলাম।

এবারের পাতায় লেখা আছে, উই লিভ উইদিন দ্য শ্যাডো অফ দ্য অলমাইটি, শেলটারড বাই দ্য গড, হু ইজ এভাব অল গডস।

ধুস, আমার কিছু ভাল লাগছে না। কতক্ষণ চলবে এই প্রার্থনা সভা বুঝছি না। কেউ টু শব্দটি করছে না। উঠে পড়াও যায় না।

আবার কনুই—আবার পাতা উলটানো—ইউ আর গড উইদাউট বিগিনিং অর এন্ড। আবাব ঠোক্কর।

ক্যাথির সান্নিধ্য আমার খুবই ভাল লাগছে ঠিক তবে তার এই আচরণ আমার ভাল লাগছে না। যাই হোক প্রার্থনা শেষে সবাই এক সময় বের হয়ে এল। ক্যাথিও। বাইরে এসে দেখলাম বন্ধু আর অনিমেষ মেলা থেকে বেলুন কিনে হাওয়ায় উড়িয়ে দিচ্ছে। তারা ভেতরেই ঢোকেনি।

আমি যে ক্যাথির পাল্লায় পড়ে আহাম্মক বনে গেছি সুড় সুড় করে তার পেছনে গির্জায় ঢুকে যাওয়া ঠিক হয়নি। তারা ঢোকেনি—এইসব গম্ভীর উপাসনা-টনা তাদের ভাল লাগার কথা না। কিছুটা বিধর্মীর মতো কাজ করেছি, এতেও তারা বোধ হয় ক্ষুব্ধ।

যাই হোক, ক্যাথি আমাকে শেষ পর্যন্ত ছাড়ল না। কার মুখ দেখে যে বের হয়েছিলাম। খাওয়ার টেবিলে আবার বিড়ম্বনা। আচ্ছা ক্যাথিকে কে এত দায় সঁপে দিয়েছে। খাওয়ার টেবিলেও ক্যাথি আমার পাশে। তার যেন জানাই আছে আমি কিছু ভুলভাল করব, এবং সে সেটা শুধরে দেবে।

বিশাল টেবিল বড় হলঘরটায় কোত্থেকে যে হাজির। পায়ে চাকা লাগানো। টেবিলে নানা খাবার। চিনেমাটির বাসনে গ্রিনপিজ, ময়েস্ট পটেটোজ, তুহেরো সুপ, ফ্রায়েড চিকেন এবং ভেড়ার রোস্ট। পুডিং কেক, এবং আরও নানা রকমারি খাবার মেনুতে যেগুলির নাম আমার মনে নেই। আমি ঠিক চিনিই না, কোন্‌টা কি।

খিদেও পেয়েছে খুব। সবাই এসে টেবিলে একে একে বসে গেল। বন্ধু অনিমেষকে নিয়ে আমিও খাবার টেবিলে গেলাম ঠিক, কিন্তু ক্যাথি এসে আমরা কে কোথায় বসব ঠিক করে দিলে দেখলাম, আমার ঠিক পাশেই তিনি। বুচার সাহেব এবং তাঁর স্ত্রী এক পাশে—খেতে শুরু করা যাক—ম্যানারস না জানলে যা হয়—ক্যাথির বাঁ-হাতের কনুইটি ফের আমায় একটা খোঁচা মারল। ঠিক কিছু ভুল করেছি। চোখ তুলে দেখি সবাই মুখ নিচু করে টেবিলে প্রার্থনা করছে। সবাই প্রার্থনা করছে আর আমি গবগব করে মুখে গ্রিনপিজ ঠেসে দিচ্ছি চামচে—খুবই দৃষ্টিকটু বিষয়। প্রার্থনায় এত নিবিষ্ট সবাই যে কেউ আমার এই বোকামি লক্ষ্যই করেনি। শুধু ক্যাথি ছাড়া। অগত্যা আমিও মাথা নিচু করে ফেললাম।

তারপর গ্লাসে ওয়াইন সার্ভ করা হল।

খাওয়া শুরু করব কখন তাই বুঝছি না।

খালি পেটে মদ, তা ছাড়া মদ আমাদের তিনজনের কাছে না হলেও আমার কাছে অস্পৃশ্য বস্তু।

নতুন জাহাজি, গা থেকে বাঙালের গন্ধই যায়নি—মদ খাই কি করে?

ক্যাথি জোরাজুরি শুরু করে দিল। যীশুর নামে খেতে হবে। না খেলে টেবিলের অপমান, যীশুর অপমান। কি করা, খেতেই হয়। ক্যাথি নিজে খাচ্ছে এবং আমাকে লক্ষ্য রাখছে। চোরামি করছি কি না, নিচের গামলায় ফেলে দিচ্ছি কিনা। রেগে মেগে শেষে সবটাই চোঁ মেরে খেতে গিয়ে এমন বিষম খেলাম, আর এত গলা জ্বালা করতে থাকল, যে সব উলটে পালটে একেবারে যাচ্ছেতাই অবস্থা। সবাই ছুটে এল, আমি কেশেই যাচ্ছি—খুব ধীরে ধীরে খাওয়া দরকার, ক্যাথির মুখ চুন, বুচারও স্বস্তিতে নেই, জল মিশিয়ে দেওয়া উচিত ছিল, এ-সব কথাবার্তা কানে এল এবং যখন ফের খেতে শুরু করলাম, তখন কিছুটা দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়েই খাচ্ছি বলা চলে। যা দেবে সবই খেয়ে নেব। টেবিলের অপমান হোক এমন কিছু করব না।

কেকটি চামচে কেটে খেতে গিয়েই বিড়ম্বনা। একটা আস্ত পেনি কেকের মধ্যে, দেখতে একটি আস্ত তামার পয়সার মতো। ন্যাড়া আর বেলতলায় যায়! কেকটির সঙ্গে পেনিটিও মুখে ফেলে দিলাম। তারপর কোঁৎ করে গিলে ফেললাম। পেনিটি পাশে সরিয়ে রেখে আর যাই করা যাক যীশুকে অপমান করা যায় না। কেকের অপমান করা যায় না। কেকের ভিতরে দিয়েছে যখন খেয়ে নেওয়াই উচিত।

আর তখনই ক্যাথি আমার দিকে তাকাল। পুরো কেকটি আমি ততক্ষণে সাবাড় করে দিয়েছি।

সে সামনে হাত পেতে রাখল।

আমি তাকিয়ে আছি ক্যাথির দিকে।

কোথায় রাখলে? দাও।

কি, কোথায় রাখব!

পেনিটা।

ওটা তো খেয়ে ফেলেছি। কেকের ভিতর যখন...

আরে ব্যানার্জী তুমি কি! ওটা স্মৃতি। সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়।

সঙ্গেই তো নিয়ে যাচ্ছি। বলে টেবিল থেকে ন্যাপকিনে মুখ মুছতে মুছতে উঠে পড়লাম।

আস্ত একটি পেনি গিলে ফেলায়, আমি কত বড় আহাম্মক ক্যাথি বুঝতে পেরে ক্ষেপে গেল বোধ হয়। বলল, চল, মানে মানে তোমাদের রেখে আসি জাহাজে।

ক্যাথি গাড়ি চালিয়ে জাহাজে পৌঁছে দিল ঠিক, তবে একটা কথাও বলল না।

জাহাজ থেকে নেমে যাবার সময় শুধু বলল, যেখানেই যাও চিঠি দিয়ো। যেখানেই থাক ভাল থেকো। এখানে এলে ফের খবর নেবে। একটা কার্ড আমার পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, যখনই আসবে, ইউ আর ওয়েলকাম। অলওয়েজ ওয়েলকাম।

এই অপরাহ্ণ বেলায় আমার সব ঠিকঠাক মনে পড়ছে না, ক্যাথি আমাদের জাহাজঘাটায় ছেড়ে দিয়েছিল, না ক্যাথি নিজেও আমাদের সঙ্গে জাহাজে উঠে এসেছিল ঠিক মনে করতে পারছি না। সে যাই হোক, তবে স্মৃতিতে ক্যাথির চলে যাওয়ার দৃশ্যটা এখনও আমার চোখে ভাসে।

নিচে ক্রেনের ছায়ায় গাড়ি, ক্যাথি কিছুক্ষণ গাড়িতে হেলান দিয়ে আমাদের জাহাজটা দেখছিল। কি দেখছিল, জানি না। বন্ধু আগেই ডেক ধরে ফোকসালের দিকে উঠে গেছে। সে আমার উপর খুশি ছিল না। আমি বেশি মাত্রায় খেয়েছি, এবং যতক্ষণ ছিলাম, কিছুটা নাকি মাতলামিও করেছি। আসলে আমি জানিই না, কতটা খেলে কি হয়, শরীরে প্রচণ্ড অবসাদ টের পাচ্ছিলাম, রেলিঙে ঝুঁকে ক্রেনের ছায়ায় কেবল দেখছিলাম, ক্যাথি গাড়িতে হেলান দিয়ে জাহাজটার দিকে তাকিয়ে আছে।

একবার নেমে যাব ভাবলাম। ডেকে, ওয়াইজারকে দেখতে পাচ্ছি না। ফিরে এসে আশা করেছিলাম, ওয়াইজার আমার অপেক্ষায় থাকবে। তারপরই মনে হল, বড়দিনের উৎসবে সে হয়তো কোনও গীর্জায় চলে গেছে। এই উৎসবের দিনে একা জাহাজে সময় কাটাতে কার ভাল লাগে! ওয়াইজার থাকলে, তাকে নিয়ে সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে যেতে পারতাম, কোনওরকমে খাড়া সিঁড়ি বেয়ে জাহাজে উঠে এসেছি ঠিক, তবে ফের খাড়া সিঁড়ি ধরে নিচে নামতে সাহস পাচ্ছি না।

ক্যাথির সান্নিধ্য আমার মধ্যে এতটা উত্তাপ সঞ্চার করবে বুঝতেই পারিনি। টের পেলাম, ক্যাথি ধীরে ধীরে দরজা খুলল, তারপর আরও অতি ধীরে গাড়ি চালিয়ে ক্রমে ক্রেনের ছায়ায় হারিয়ে গেল। সেই অপসৃয়মান দৃশ্যটুকু আমার চোখে এখনও লেগে আছে। আমি যে খুবই আনাড়ি, বেশি মাত্রায় খাওয়ায় আরও ধরা পড়ে গেছি। নিজের বেকুফির জন্য, আমার খুবই খারাপ লাগছিল, উচিত ছিল নেমে গিয়ে ক্যাথিকে আমার অনুতাপের কথা জানানো

ক্যাথি কি দূর থেকে রাতের অন্ধকারে আমাকেই চুরি করে দেখছিল! জেটিতে আলো ছিল ঠিক, জাহাজের মাস্তুলেও আলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে, তবু আমার কেন জানি মনে হয়েছে আবছা আলোয় ক্যাথি বোধ হয় আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। সারাদিনে শুধু গীর্জায় যতটুকু সময় পেয়েছে, আমার সঙ্গে একা ছিল। তারপর সে আর আমাকে একা পায়নি। জাহাজ থেকে নেমেও যেতে পারিনি, পড়ে যাবার ভয়ে। পড়ে গেলে একেবারে জাহাজেব খোলের নিচে।

এমনিতে জাহজে কার্গো থাকলে সিঁড়ি খাড়া থাকে না। যত কার্গো নেমে যায় তত জাহাজ উপরে ভেসে ওঠে। এ-জন্যই জাহাজের মাল খালাস হলে সিঁড়ি ধরে সন্তর্পণে উঠতে হয। আব যারা বেশি মাতাল হয়ে ফেরে তারা সিঁড়ি ধরে উঠতেই সাহস পায় না। আমাদের চার নম্বর ইনজিনিয়ার যতক্ষণ কিনার থেকে ফিরে না আসবে ততক্ষণ তার কেবিন বয় মতিউর গ্যাঙওয়েতে অপেক্ষা করবে। তিনি ফিরলে তাকে ধরে জাহাজে তুলে আনা তার কাজ। এ-জন্য সাহেবের কাছ থেকে মোটা রকমের বখশিসও আদায় করে থাকে। ওয়াইজার থাকলে আমি নেমে যেতে পাবতাম। সে নিশ্চযই আমাকে সাহায্য করত। আর যিনি জাহাজে অপেক্ষা করে আছেন, আসানুল্লা সাব, তিনি ভাবতেই পারেননি ক্যাথির বাড়িতে ক্রিসমাসের উৎসবে গিয়ে. আমি শেষে এমন একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে বসব।

আর তখনই লক্ষ্য করলাম ডেকে গ্যালির দরজার পাশে কেউ দাঁড়িয়ে আছে।

গ্যাঙওয়ের পাশে দাঁড়িয়ে অত দূরে কে দাঁড়িয়ে আছে বোঝা কঠিন। তবু আমাব কেন জানি মনে হল, আসানুল্লা সাব ছাড়া তিনি আর কেউ নন। জাহাজ তিনি বাদে আর কেউ যে কিনারায না নেমে থাকতে পারেন এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। সারা-দিনের খাটাখাটনির পর জাহাজে কে আর পড়ে থাকতে চায়। প্রায় সবাই যে যার মতো কিনারায় নেমে যায় এবং বেশ রাত করে ফেরে। তা-ছাড়া বড়দিনের রাত এমনিতেই নানা মোহ সৃষ্টি করে থাকে।

আমি যে ক্যাথির দাদুর পাল্লায় পড়ে গেছিলাম এটাও বোধ হয় কোনও মোহ থেকে। বড়দিনের খাওয়ার টেবিলে মদ্যপান বোধ হয় অত্যন্ত ধর্মীয় ব্যাপার। একটু খেয়েই আমার অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসার উপক্রম হয়েছিল, গলায় তীব্র জ্বালা অনুভব করেছিলাম, এবং প্রচণ্ড বিষম খেয়েছিলাম, এতে বুড়ো মানুষটি বোধ হয় খুবই মজা বোধ করেছিলেন, এবং যথেষ্ট হেসেছিলেন এটাও আমার মনে আছে। অবশ্য ক্যাথি গুম মেরে থেকেছে, আমি ছোট হয়ে গেলে ক্যাথিও যে ছোট হয়ে যাবে বুঝতে পারিনি। খাওয়ার শেষে আবার ড্রিঙ্কস সার্ভ করা হল, আমার উঠে পড়া উচিত ছিল, কিন্তু টেবিল ম্যানর্সের যদি অঙ্গহানী হয় ভেবেই বসে থাকা। তিনি কিছুটা গ্লাসে ঢেলে বরফের টুকরো ফেলে দিলেন এবং সামান্য জলও মেশালেন। তারপর কি করে খেতে হয়, ধীরে ধীরে, সময় নিয়ে এবং রেলিশ করে খেলে মেজাজ প্রসন্ন হয়ে যায়, বুচার সাহেব তাও যেন আমাকে শিখিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। পরিমাণে খুবই কম, ঠাণ্ডাও জোর পড়েছে, অন্তত আমার কাছে, আমরা ভারতীয়রা যে সামান্য ঠাণ্ডাতেই কাবু হয়ে যাই, ক্যাথির পরিবারের সঙ্গে মিশে ওটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলাম। খুবই হালকা পানীয় বলে, ধীরে ধীরে খেতে মন্দ লাগছিল না, বুড়োমানুষটি তার দেশের জলবায়ু সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছিলেন। অথবা এ-দেশে প্রথম যারা উপনিবেশ স্থাপনে অভিযানে বের হয়ে পড়েছিলেন, এবং মাওরি উপজাতির সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহের কিছু গল্পে বেশ মনোরম পরিবেশ তৈরি করেছিলেন। দেবনাথ, বঙ্কু, আমার মতো আনাড়ি নয়, তারা খেতে খেতে বুড়োর গল্প যে রেলিশ করছিল—বুঝতে পারছিলাম।

ক্যাথি নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বসেছিল। তার দাদু অর্থাৎ বুচার সাহেব আমাকে খাইয়ে মজা পাচ্ছে, এমন একটা সুযোগ বুড়ো বোধ হয় ছাড়তে রাজি ছিল না, আর আমার রক্তকণিকা যে গরম হয়ে উঠছে

টের পাচ্ছিলাম, আমি আর আগের আমি ছিলাম না, বেশ বুদ্ধিদীপ্ত হয়ে উঠেছিলাম, এবং কথাবার্তায় কোথাও বিন্দুমাত্র জড়তা ছিল না। তারপর বোধ হয় ধীরে ধীরে আমার অবস্থা ক্রমে ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছিল, আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলাম এবং ভারতবর্ষ সম্পর্কে এক অতিশয় মর্মান্তিক খবর দিয়েছিলাম। ভারতবর্ষ বড় গরিব দেশ। মিশনারিজরা সেখানে নানা সমাজকল্যাণে যুক্ত এমনও বলে থাকতে পারি। যাই হোক, ভারতবর্ষকে খাটো করার আমার কোনও অধিকার নেই, বঙ্কু এবং দেবনাথের আচরণে এটা ভালই টের পেয়েছিলাম। ক্যাথির এক পিসি তো বলেই ফেলল, তোমাদের দেশে আমি চলে যাব। তার অগাধ সম্পত্তি। বিধবা ভদ্রমহিলার স্বপ্ন এ-দেশে নান্ হয়ে কুষ্টরুগীর পরিচর্যা করবেন। ফুটপাথে হাজার হাজার মানুষ দিন যাপন করে থাকে, এবং দারিদ্র অতি মহৎ ব্যাপার, দারিদ্র না থাকলে, নান হবার মতো সুযোগও থাকে না। যীশুর অপার মহিমা, তিনি কোনও কোনও দেশে এখনও যথেষ্ট পরিমাণে দারিদ্র জিইয়ে রেখেছেন, এবং তার দৌলতে ক্যাথির পিসির জীবনে নান হবার সৌভাগ্য ঘটে যাবে। বোধ হয় এ-সব কথাই হচ্ছিল। আর আমি খেতে খেতে একবার ক্যাথিকে দেখছিলাম, একবার ক্যাথির পিসিকে দেখছিলাম। পিসি, মানুষের সেবার জন্য বড় কাতর হয়ে পড়ছে। ভারতবর্ষে তার চলে যাওয়া এখন একান্ত জরুরি যেন।

ক্যাথি সেই থেকে চুপ করেছিল। সে শুধু শুনছে। এবং আমার আচরণে বিরক্ত হচ্ছে।

সে শেষে না পেরে বলেছিল, ওদের আমি দিয়ে আসছি। এখন বের না হলে ফিরতে বেশ রাত হবে।

ক্যাথির পিসি এত সহজে ছাড়তে রাজি ছিল না। তার ইচ্ছা একবার আমরা তার বাড়ি হয়ে যাই।

ক্যাথি সোজাসুজি না করে দিল।

এরপর রাস্তায় ক্যাথি আমার সঙ্গে একটাও কথা বলেনি। আমি হাত পা ছড়িয়ে সিটে মাথা এলিয়ে দিয়েছিলাম। মাঝে মাঝে ক্যাথির কাঁধে গড়িয়ে পড়ছি। সে গাড়ি চালাচ্ছিল, তার গাড়ি চালাতে যে খুবই অসুবিধা হচ্ছে বুঝতে পারছি, একটা আস্ত দামড়া যদি ক্যাথির মতো নরম স্বভাবের মেয়ের কাঁধে মাথা এলিয়ে রাখে, তার যথেষ্ট অসুবিধা হবার কথা, তবে ক্যাথি আমার আরামে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় তেমন কাজ কখনও করেনি। সারা রাস্তা গম্ভীর মুখে গাড়ি চালিয়েছে। পেছনে বঙ্কু এবং দেবনাথ বসে আছে, তারাই রাস্তার দু-পাশের বাড়িঘর সম্পর্কে দু-একটা প্রশ্ন করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছিল।

অবশ্য বঙ্কুর ফোপরদালালিতে ক্যাথি যে যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছে তাও টের পেয়েছিলাম!

বঙ্কু কিছুতেই আমাকে ক্যাথির পাশে বসতে দেবে না। আমাকে পেছনে সিটে ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছিল—আমি নিমরাজি, কী করা, কিছুটা হুঁশ হারালে ক্যাথির উপর আমার কোনও অধিকার থাকারই কথা নয়, ক্যাথিও বুঝি চায় না আমি তার পাশে বসি, একজন মাতালকে পাশে বসিয়ে গাড়ি চালানো খুবই কঠিন, এ-জন্য ক্যাথি হয়তো চায় আমি পেছনের সিটে বসি, এ-সব ভাববার সময়ই ক্যাথি আমার হাত ধরে সামনের দরজা খুলে বসিয়ে দিল, সে ঘুরে গিয়ে পাশের দরজা খুলে স্টিয়ারিঙের সামনে বসে পড়েছিল। তারপর হুস করে গাড়ি ছেড়ে দিতেই ওর কাঁধে মাথা এলিয়ে পড়েছিলাম। ক্যাথি আমার সঙ্গে আর একটা কথাও বলেনি। এমন কি আমার গোটা শরীর তার উপর ঝুঁকে আছে—গাড়ি চালাতে যথেষ্ট অসুবিধা হবার কথা, তবু সে কোনও কথা বলেনি।

ক্যাথি চলে যাওয়ার পর আমার কেন যে মনে হয়েছিল, জাহাজে এ-ভাবে বেঁচে থাকা বড় অর্থহীন। ক্যাথির সান্নিধ্য হারিয়ে আমি কেমন জাহাজে আরও একা হয়ে গেলাম। মেয়েদের মধ্যে কী যে মায়া থাকে—আমার সম্মান রক্ষার জন্য ক্যাথি সারাক্ষণ আমাকে আগলে রেখেছিল—ভাবতেই কেন যে চোখে জল চলে এসেছিল। ক্যাথির কাছে আমার আর ফিরে যাবার উপায় নেই। তার বাড়ির রাস্তা চেনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কোন্ রাস্তায় কি-ভাবে সে আমাদের নিয়ে গেছে তাও জানি না। যাবার সময় ঘণ্টা দুই লেগে গিয়েছিল, অথচ আসার সময় আধঘণ্টাও লাগেনি, বোধ হয় তার দেশের কিছু দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়ে নিয়ে যাবার লোভে এ-রাস্তা ও-রাস্তায় সে ঘুরেছে। তা-ছাড়া তার গাঁয়ের নামও আমার মনে নেই। ডসন ফলস নামটা মনে পড়ছে। এ-সবই যখন ভাবছিলাম, দেখি ডেক ধরে

তিনি হেঁটে আসছেন। আর বোধহয় গ্যালির দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে পারছিলেন না।

কী যে করি। কাছে এলেই টের পাবেন, আমি আজ সত্যি ভাল নেই। আমার ইমান নেই এমনও ভাবতে পারেন। নেশা করা যে কী সাংঘাতিক অপরাধ আসানুল্লা সাবকে যে দেখেনি, বুঝতে পারবে না। আমাকে পোকামাকড় তুল্য ভেবে তিনি দূরে থাকবেন, এটাই স্বাভাবিক। অচ্ছুত হয়ে গেছি।

তিনি ফের কিছুক্ষণ ডেকে দাঁড়িয়ে থাকলেন। আমাকে কি তিনি দেখতে পাননি! গ্যাঙওয়ের এদিকটায় স্পষ্ট নয় তারপর মনে হল, না তিনি আমাকে ঠিকই দেখেছেন। বন্ধু, দেবনাথ ঠিক তাঁকে খবর দিয়েছে, দেখুন গে সারেঙ সাব, ব্যানার্জির কাণ্ড। গ্যাঙওয়ের দেয়ালে থম মেরে দাঁড়িয়ে আছে। বাগে রাখতে পারলেন না। খুব খেয়েছে। বেহেড্ডু মাতাল। আমাদের সঙ্গে কিছুতেই আসতে রাজি হল না।

কাজেই জাহাজে উঠে আর লুকিয়ে থাকার উপায় নেই। ধার পড়তেই হবে। জাহাজে আমার শুধু ওপরওয়ালাই নন তিনি, আমার অভিভাবকও। এই প্রথম কেন জানি মনে হয়েছিল, প্রকৃতই তিনি আমার পিতৃতুল্য।

খুবই সঙ্কোচ হচ্ছে এগিয়ে যেতে। বকা ঝকা শুরু হয়ে গেল বলে। নিজের ভিতর গুটিয়ে যাচ্ছিলাম। কিছুতেই কাছে যেতে সাহস পাচ্ছিলাম না।

আশ্চর্য দেখি, তিনি আমাকে পোকামাকড় ভেবে বিন্দুমাত্র এড়িয়ে গেলেন না। কাছে এসে বললেন, সবার সব সহ্য হয় না ব্যানার্জী। এটা বুঝতে শেখ। সব জাহাজে আমি থাকব না। সব জাহাজে কেউ তোর পেছনেও লাগবে না। তোর ভালর জন্যই বলি। আয়, আমার হাত ধর। নিজের রাস্তাটা নিজে চিনতে না পারলে আখেরে কষ্ট পেতে হয়।

তিনি আমাকে আর কিছু বললেন না। হাত ধরে ফোকসালে নিয়ে গেলেন। জামা প্যান্ট খুলে ফেলতে সাহায্য করলেন। জুতো মোজা খুলে স্লিপার এগিয়ে দিলেন। পাজামা পাঞ্জাবি পরিয়ে আমার বিছানায় শুইয়ে দিয়ে উপরে উঠে গেলেন। আমি কিছুটা নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছি। দবজাটা যে বন্ধ করব তারও যেন শক্তি ছিল না। তারপর যা দেখলাম, তাতে আরও ঘাবড়ে গেলাম। হাতে এক গ্লাস তেঁতুল গোলা জল।

গ্লাসটা হাতে দিয়ে বললেন, খেয়ে ফেল। সব বমি হয়ে যাবে। শরীরটা তোর ঝরঝরে হবে।

কী যে করেন না! ও আমি খাব না।

না খেলে সারারাত কষ্ট পাবি। ঘুমাতে পারবি না। অভ্যাস না থাকলে যা হয়।

এক রাতে কিছু হবে না।

আর তারপরই যে কী হল, বমি বমি ভাবটা আগেই ছিল, এবারে সত্যি ওক উঠছে। বমি করে সারা ঘর ভাসিয়ে দিলাম।

আসানুল্লা সাব, টোপাসকে ডেকে, নিজে বালতি বালতি জল এনে মেঝে পরিষ্কার করতে লাগলেন। টোপাস যেন সারেঙ সাবকে সাহায্য করছে। আমি পড়ে আছি বাঙ্কে। মুখ মুছিয়ে, আমার শরীরে কম্বল টেনে তিনি বের হয়ে গেলেন। তারপর আশ্চর্য! দেখি বগলে বিছানা নিয়ে হাজির। আমার পাশের বাঙ্কে দরজা বন্ধ করে বিছানা পেতে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন।

আমার হুঁস ছিল।

খুবই কাতর গলায় বললাম, আপনি খাবেন না সারেঙ সাব!

না।

আমার কিছু হবে না। কিছু মুখে দিয়ে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ুন। উপরে যান। আমার ঘরে শুলে আপনারও ঘুম হবে না। কিছু হলে ডাকব।

এখন ঘুমো। কথা বলিস না।

আমার উপর রাগ করে রাতে না খেলে আমি ঘুমাতে পারি, বলুন। আমি কি মানুষ না!

ঠিক আছে খাব। তুই আমার জন্য ভাবিস না। তারপর কেমন ফেরাস্তার মতো কিছু অলৌকিক কথাবার্তা বললেন, মানুষের জীবনটাই সমুদ্রযাত্রা। ঝড় সাইক্লোন থেকে আত্মরক্ষা করতে না পারলে

জাহাজডুবী। মনে রাখিস। বলে তিনি দরজা খুলে উপরে উঠে গেলেন।

এই অপরাহ্ণ বেলায় চুপচাপ একা থাকলেই তাঁর কথা বেশি মনে হয়। আমার সমুদ্রযাত্রায় তিনি ছিলেন সঙ্গী। সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য সব তিনি আমার সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছিলেন। মানুষটা এখন কোথায়, বেঁচে আছেন, না শুয়ে আছেন কবরে, তাও জানি না। তবু চোখ বুজলেই তাঁর মুখ, প্রলম্বিত শ্মশ্রু, এবং সাদা কুরুশ কাঁটার নামাজি টুপির কথা মনে করতে পারি। জীবন যে প্রকৃতই সমুদ্রযাত্রা, যে কোনও সময় জাহাজডুবীর আশঙ্কা থাকে, ধূসর বন্দরের আশায় শুধু অপেক্ষা, এই অপরাহ্ণ বেলায় তাও হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও জন্ম থেকেই এই অলৌকিক যাত্রায় মানুষকে বের হয়ে পড়তে হয়। তাও এখন বুঝি। ক্যাথিও শেষে বোধ হয় এই অলৌকিক যাত্রার খোঁজে এ-দেশে সন্ন্যাসিনী হয়ে চলে এসেছিল। আমাকে খুঁজে বেরও করেছে। তাকে দেখে আমি প্রথমে চিনতেই পারিনি। পরিচয় দিলে টের পেলাম তার চোখে মুখে এক স্বর্গীয় মহিমা বিরাজ করছে। ঈশ্বর সম্পর্কে দুটো একটা কথা ছাড়া সে আর কিছু বলেনি। টের পেয়েছিলাম, সে পৃথিবীর অন্য এক খবর পেয়ে গেছে। তাকে নিরস্ত করতে পারি এমন ক্ষমতা আমার নেই। সেও কবেকার কথা। কোথায় সে আছে জানি না। লণ্ঠন হাতে কোন্ বনে জঙ্গলে সে তার ঈশ্বরকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তাও জানি না।

সমুদ্রযাত্রা